তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীৎ তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

দ্বাবিংশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

১৮৫০ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৫। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

দ্বাবিংশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৫০ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

বিষয় — লেখক — পৃষ্ঠা।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—দ্বিতীয় ভাগ

বৈশাখ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

১০১৭ সংখ্যা　　　　১৮৫০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রং নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫।

নববর্ষে অভিবাদন।

ব্রাহ্মসমাজের এক শতাব্দী পূর্ণ হইতে আর দুই একবৎসর বাকী আছে। এই শতাব্দীর মধ্যে ব্রাহ্মসমাজ জগতের চতুর্দ্দিকে চিন্তাশীল ও কর্ম্মী এবং নেতৃবৃন্দের যে দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছে, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। ইহার কারণ এই যে, ব্রাহ্মধর্ম্ম ভগবানের প্রতি সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি ও তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনরূপ মূলমন্ত্র লইয়া আবির্ভূত হইবার কারণে সর্ব্ববিধ সমস্যা নিরাকরণের সুন্দর উপায় হইয়া পড়িয়াছে। তাই ব্রাহ্মসমাজের সহিত অন্য কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের বিরোধ আসিবার কোনও অবসর নাই। যাঁহারা বিরোধ-বিবাদ আনয়ন করেন, আমরা নিঃসন্দেহ বলিতে পারি যে, হয় তাঁহাদের ব্রাহ্মধর্ম্মের যথার্থ প্রকৃতি উপলব্ধি করিবার অসামর্থ্য বশত অথবা সাম্প্রদায়িক একদেশদর্শিতার কারণেই তাঁহারা বিরোধ উপস্থিত করেন। সকল জাতি, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে বিবাদ-বিসম্বাদ, ধনীশ্রমিকের মধ্যে কলহ-বিরোধ প্রভৃতি সর্ব্ববিধ বিরোধ-বিবাদ শান্ত করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্মের আবির্ভাব। প্রত্যেক ব্রাহ্মোপাসকের স্মরণ রাখা কর্ত্তব্য যে তিনি বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসক।

এই সকল কথা কেহ যেন নিরর্থক বিবেচনা না করেন। রাজা রামমোহন রায় জগত হইতে বিরোধ-বিবাদ বিদূরিত করিবার অমোঘ উপায় স্বরূপে ব্রহ্মোপাসনা প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। তাঁহার দৃষ্টি যে কত দূরে প্রসারিত হইয়াছিল, আজ শতাব্দীপরে তাহার পরিচয় পাইতেছি। পাছে বিরোধের কোন কারণ উপস্থিত হয়, তাই তিনি যে ব্রহ্মমন্দির সুপ্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন, তাহাতে কোন সাম্প্রদায়িক মূর্ত্তির পূজা প্রভৃতি অথবা কোন প্রকার সাম্প্রদায়িক অনুষ্ঠানাদি করিতে নিষেধ করিয়াছেন—নিছক ব্রহ্মোপাসনামাত্র করিবার অধিকার সম্প্রদায় বা জাতি-ধর্ম্ম নির্ব্বিশেষ সকলকেই প্রদান করিয়াছেন। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, রাজা রামমোহন রায় আদিব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া যে ধারা প্রবর্ত্তিত করিয়া গিয়াছেন, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মূলত যে ধারা স্থিরতর রাখিয়া গিয়াছেন, সেইধারা বজায় রাখিয়া ব্রাহ্মসমাজের কাজকর্ম্ম পরিচালিত করিলে একমাত্র ব্রাহ্মসমাজই সকল দেশের সকল জাতির সকল সমস্যাই নিরাকরণ করিতে পারিবে, কারণ

ব্রাহ্মধর্ম্মের ভিত্তি সর্ব্বাপেক্ষা উদার ও অসাম্প্রদায়িক।

আমরা নববর্ষের প্রারম্ভে সকলকেই নির্ব্বিশেষে যথাযোগ্য অভিবাদন পূর্ব্বক আহ্বান করিতেছি যে, যাঁহার যেটুকু ক্ষমতা, তিনি সেইটুকু পরিমাণেই আমাদিগকে শুভ কার্য্যসমূহে সাহায্য করুন এবং নিজেদের জীবনকে ধন্য করুন। ব্যক্তিবিশেষের বা সম্প্রদায়বিশেষের অন্যায় বা অসঙ্গত ব্যবহারের কারণে আমরা যেন ব্রাহ্মসমাজের প্রতি কোন প্রকার বিদ্বেষভাব পোষণ না করি।

অঞ্জলি।

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১৫ অঞ্জলি—অন্তর্যামী দেবতা।

১। তুমি দূরে আছ; তুমি আমাদের নিকটে আছ। তুমি আমাদের অন্তরে অন্তর্যামী থাকিয়া আমাদের প্রার্থনাসকল নিত্য শ্রবণ করিতেছ। তুমি আমাদের প্রার্থনার উত্তরে নিত্য সাড়া দিতেছ। আমরাও নিত্য তোমার বন্দনা করিয়া আনন্দিত হইতেছি।

২। শতসহস্র শত্রু মিলিত হইয়া যখন আমাদিগকে আক্রমণ করে এবং আমাদের বিনাশসাধনে কৃতসংকল্প হয়, তখন একমাত্র তুমিই আমাদের সহায় হইয়া আমাদিগকে মহাবিনাশ হইতে রক্ষা কর। তুমি আমাদের রক্ষকেরও রক্ষক।

৩। তুমি স্বপ্রকাশ। তুমি আমাদের অন্তরে নিত্য প্রকাশিত থাক। তোমাকে আমাদের বন্ধু দেখিয়া শত্রুগণ পলায়ন করুক। যাহাতে তোমার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে পারি, সেই জন্য তুমি আমাদিগকে নিত্য ধনরত্ন প্রদান কর।

৪। আমাদিগকে এমন শক্তি ও ক্ষমতা প্রদান কর, যাহাতে আমরা আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে ধর্ম্মে, জ্ঞানে ও কর্ম্মে গরিষ্ঠ ব্যক্তিগণকে আহ্বান করিয়া সভাপ্রাঙ্গণকে শোভনীয় করিতে পারি এবং বিদায়কালে তাঁহাদিগকে ধনদানে পরিতৃপ্ত করিতে পারি।

৫। তোমার বল অসীম; কেহই তাহা পরিমাণ করিতে পারে না। তোমার আদেশে যে ব্যক্তি নিজকর্ম্ম সুনিয়মিত করে, তাহারও দেহ বলিষ্ঠ হয়, মন জ্ঞানে গরিষ্ঠ হয় এবং আত্মা ধর্ম্মধনে পরিপূর্ণ হইয়া সুশোভন আকার ধারণ করে।

৬। তুমি জ্যোতিস্বরূপ। তুমি আমাদিগকে অন্ধকার হইতে জ্যোতিস্বরূপে লইয়া যাও। আমাদের চক্ষু হইতে অজ্ঞানের আবরণ খুলিয়া দাও, যাহাতে তোমাকে সুন্দররূপে জানিয়া পরিতৃপ্ত হই।

৭। তোমার বার্ত্তা আমরা যেন সর্ব্বত্র বহন করিতে পারি। নিশীথে শিশিরবিন্দু যেমন নিঃশব্দে নীরবে নামিয়া আসে, তোমার বাণীও আমাদের অন্তরে তেমনই নীরবে ধ্বনিত হয়।

৮। তোমারই কৃপা লাভ করিলে মূক যে, সে বাচালতা লাভ করে; পঙ্গু যে, সেও গিরি উল্লঙ্ঘনে সমর্থ হয়; নীচ যে, সেও প্রকৃত সম্মান লাভ করে; এবং দরিদ্র যে, তাহারও গৃহ ধনরত্নে পরিপূর্ণ হইয়া উঠে।

৯। হে দীপ্যমান পরমেশ্বর! আমরা যেন বিপথে না যাই—তোমারই নির্দ্দিষ্ট সরল পথে যেন বিচরণ করি। তুমি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিও না; তুমি আমাদিগকে বিনাশ করিও না। তুমি আমাদিগকে তেজ ও বীর্য্য প্রদান কর। তুমি আমাদিগকে জগতের সভায় উচ্চ আসন লাভের অধিকার প্রদান কর।

১৬ অঞ্জলি—বন্ধু দেবতা।

১। হে ঈশ্বর! তুমি আমাদের স্তব-স্তুতি স্নেহ ও প্রীতি সহকারে গ্রহণ কর এবং আমাদের জীবন মধুময় কর।

২। তুমি শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ। তুমিই আমাদের অন্তরে বুদ্ধিবৃত্তি সকল প্রেরণ করিতেছ। আমরা আমাদের অন্তরের শ্রদ্ধাভক্তি তোমার চরণে অর্ঘ্যরূপে নিবেদন করিতেছি। তুমি তাহা গ্রহণ কর।

৩। তুমি পুরাকালে ধ্রুব ও প্রহ্লাদের পরম বন্ধু হইয়া তাঁহাদিগকে সমস্ত বিপদ-আপদে রক্ষা করিয়াছিলে। তুমি আমাদেরও বন্ধু। তুমি আমাদের সমস্ত আপদ-বিপদ ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া

দাও। শত্রুগণ অবাক হইয়া তাহা দেখুক এবং তোমার মহিমা অবগত হইয়া তোমার শরণাপন্ন হউক।

৪। এই বিশ্বজগতে তুমি যে কর্ম্মযজ্ঞ খুলিয়াছ, তাহার ভার বহন করিবার ক্ষমতা তোমা ব্যতীত অপর কাহারও নাই। তোমাকে সকলেই অন্বেষণ করিতেছে, কিন্তু তুমি তোমার যে ভক্তকে সন্ধান দাও, সে ব্যতীত আর কেহই তোমার সন্ধান পায় না।

৫। প্রাণ ভরিয়া তোমাকে নিয়ত হে বন্ধু! হে বন্ধু! বলিয়া ডাকিতে ইচ্ছা হয়। তুমিই আমাদের একমাত্র প্রিয় মিত্র, সখা ও সুহৃৎ। তুমিই একমাত্র আমাদের সম্ভজনীয়। আমরা তোমাকে প্রতিদিন অর্চ্চনা করি। তুমিই আমাদের একমাত্র পিতামাতা। আমাদিগকে এই ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান কর, যেন আমরা প্রতিনিয়ত তোমারই প্রিয়কার্য্য সাধনে নিরত থাকি।

বর্ষশেষে উদ্বোধন।

আমাদের সেই প্রাণের প্রিয়তম বন্ধু পরমেশ্বরকে ছাড়িয়া কোথায় ভাসিয়া চলিয়াছি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস তো কাটিয়া গেল—বৎসরের এই শেষ-ভাগে জীবনের কার্য্য আলোচনা করিয়া ম্রিয়মাণ হইতেছি। পুণ্যের পথে, মঙ্গলের পথে কত অল্প অগ্রসর হইয়াছি—ভগবানের দানকে কি অবহেলার সহিত ব্যবহার করিয়াছি। ইচ্ছা হয়, হৃদয়খানাকে শতখণ্ডে টুকরো টুকরো করিয়া সেই করুণাময়ী জননীর চরণে নিবেদন করিয়া দিয়া বলি—জননী! জননী! আমার সকল অপরাধ ক্ষমা কর—পাপের আঘাতে আলস্যের গরলে ক্ষতবিক্ষত হৃদয়ের এই টুকরাগুলিকে তুমি তোমার করুণা-বারি দ্বারা পরিশুদ্ধ করিয়া লও এবং আমাকে নবজীবন প্রদান কর।

একবার তোমরা জ্ঞাননেত্রে ধ্যানদৃষ্টিতে দেখ, মানুষ প্রকৃতই কি ক্ষুদ্র! তাহার যাহা কিছু মহত্ব, তাহা সে অনাদ্যনন্ত পুরুষের চরণস্পর্শ করিবার অধিকার লাভ করিয়াছে বলিয়াই। সেই প্রাণের দেবতার চরণে যদি আমাদের জীবনকে নিবেদন করিয়া দিতে না পারি, তবে তো সে জীবন অতি ক্ষুদ্র, অতি তুচ্ছ। এখানে তো আমরা সকলেই সুখের প্রত্যাশায় এই সংসার-মরুভূমির মাঝে দিশাহারা লক্ষ্যশূন্য হইয়া অনবরত পরিভ্রমণ করিতেছি; কিন্তু বেশ করিয়া ধীরভাবে ভাবিয়া দেখ, ভগবানকে ছাড়িয়া প্রকৃত সুখের সন্ধান কেহ কি পাইয়াছে? তাহা যদি পাইত, তবে অগাধ সম্পত্তির অধিকারী আত্মহত্যা করিতে উদ্যত হইতেন না; লালা বাবুর ন্যায় ধনী ব্যক্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে বিষয়তৃষ্ণা অতিক্রম করিয়া ভগবৎসন্ধানে বহির্গত হইতেন না; মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও অন্তরে শ্মশানবৈরাগ্য জাগ্রত হইত না। তাই সাধক কবি গাহিয়াছেন—"ঐহিকের সুখ যত জানি তায়, কাজ নাই সে সুখে সে ধনে"।

যদি অতীতের ক্ষুদ্রতা পরিত্যাগ করিয়া মানুষের উপযুক্ত মহত্ব লাভ করিতে চাও, তবে সেই প্রাণের দেবতা, যিনি "মহান্ বৈ পুরুষঃ" সেই পরম পুরুষের চরণ ধরিয়া থাক, আপনাকে তাঁহার স্পর্শলাভের অধিকারী করিয়া তোল। যে সত্যের বলে বিশ্বজগত সুশাসিত হইয়া চলিতেছে, সেই সত্যের দিকে আত্মার দৃষ্টিকে সুসংযত করিয়া রাখ। যিনি দয়াময় পিতা, যিনি করুণাময়ী জননী, সেই ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি কর এবং তাঁহারই প্রিয় কার্য্য জানিয়া শতবিধ পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হও। তাঁহার আদেশ জানিয়া যখন যাহা করিবে, তখন সংসারের কোন বিভীষিকায় ভীত হইও না। স্থির জানিও, সকল ভয়ের যিনি ভয়, সকল ভয়ানকেরও যিনি ভয়ানক, তিনি নিত্যই তোমার সঙ্গে সঙ্গেই আছেন। আমরা যে কয়েকজন আজ এখানে উপস্থিত হইয়াছি, তাঁহাদের প্রত্যেককেই আলিঙ্গন করিয়া আমার বলের সহিত বলিতে ইচ্ছা হইতেছে—সকল প্রকার ভয়কে পদদলিত করিয়া নির্ভয় হও এবং অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া নূতন জন্ম লাভ কর; সর্ব্ববিধ দীনতা, সর্ব্ববিধ সংশয় পদদলিত করিয়া সকল ঈশ্বরের মহেশ্বর, সেই সত্যস্বরূপ ভগবানকে উপলব্ধি কর এবং অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া নূতন জন্ম লাভ কর; সকল স্বার্থ তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া তোমার যোগক্ষেমের ভার তাঁহার হস্তে সমর্পণ করিয়া জীবনকে ভারমুক্ত করিয়া অমৃতপুরুষের কার্য্যে আপনাকে চির নিযুক্ত করিয়া দাও, এবং অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া নূতন জন্মলাভ কর।

পাপ ও প্রায়শ্চিত্ত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান পূর্ণ পুরুষ। ইহা স্বতঃসিদ্ধ সত্য যে, জগতে দ্বিতীয় পূর্ণ পুরুষ থাকিতে পারে না। যিনি পূর্ণ, তিনি নিশ্চয়ই সকল বিষয়েই পূর্ণ—কোন এক বিষয়ে অপূর্ণতা থাকিলে তাঁহার পূর্ণতা স্বীকার করা যাইতে পারে না। সুতরাং তিনি নিরবয়ব—অবয়ব থাকিলেই তিনি অন্তত

দেশে ও কালে সীমাবদ্ধ হইতেন। নিরবয়ব বলিয়াই তিনি শিরা ও ব্রণরহিত। সুতরাং তিনি রোগের অতীত। তিনি যে কেবল শারীরিক রোগ বা ব্যাধির অতীত তাহা নহে; তিনি মনেরও সীমার অতীত, সুতরাং শোকাদি মানসিক রোগ বা আধিও তাঁহাকে স্পর্শ করিতে পারে না। তিনি শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ—তাঁহাতে পাপের লেশমাত্র নাই। তিনি সত্যস্বরূপ, অনাদ্যনন্ত পরম পুরুষ।

ভগবান যেমন পূর্ণ পুরুষ, আমরা তেমনি অপূর্ণ ও পরিমিত—প্রত্যেক বিষয়েই আমরা কোন না কোন সীমা দ্বারা পরিবেষ্টিত। সুতরাং আমাদের রোগশোক বা আধিব্যাধি স্বাভাবিক। আমরা অপূর্ণ বলিয়াই আমাদের জীবন সুখে দুঃখে গঠিত, হর্ষ ও শোকের বিচিত্র উপাদানে বিরচিত, সম্পদ ও বিপদে লালিত-পালিত। কিন্তু অতীতের শ্মশানক্ষেত্রে ফিরিয়া চাহিলে সুখসম্পদের কথা স্মৃতিপথে আসিতে চাহে না, কেবল দুঃখকষ্টের স্মৃতি, রোগশোকের বেদনার স্মৃতি হৃদয়ে অবিরল ক্রন্দনধ্বনি জাগাইয়া তুলিতে চায়। এই সমস্ত স্মৃতির মধ্যে তখনই শান্তি পাই, যখন প্রাণের মধ্যে ভগবানকে সকল রোগের চিকিৎসক এবং সকল দুঃখশোকে শান্তিদাতা বলিয়া উপলব্ধি করি।

ভগবানই আমাদের একমাত্র প্রকৃত চিকিৎসক। তাই আমরা প্রকৃতিতে চতুর্দ্দিকে রোগের ঔষধ ছড়ানো দেখি—আমরা অবশ্য সকল রোগের সকল ঔষধ নিঃশেষে আবিষ্কার করিতে পারি নাই। ভগবান সকল রোগের একমাত্র প্রকৃত চিকিৎসক, এই বিশ্বাসের উপরেই ধর্ণা দেওয়া প্রভৃতি প্রথা প্রচলিত হইয়াছে। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভগবানই একমাত্র প্রকৃত চিকিৎসক। আমরা যাহাদিগকে চিকিৎসক বলি, তাঁহারা কেবল আবিষ্কার করিয়াছেন যে, কোন্ দ্রব্যের সাহায্যে কোন্ রোগ ভাল হয়। কিন্তু ভগবান যদি আরোগ্যদায়ক সেই সকল দ্রব্য প্রকৃতিতে না রাখিয়া দিতেন, তবে কোন্ চিকিৎসক কোন্ রোগ ভাল করিতে পারিতেন? কেবল তাহাই নহে; এই সকল দ্রব্যের যথাযথ যোগাযোগ সংঘটিত করিতে না পারিলে চিকিৎসকের সমস্ত বিদ্যাবুদ্ধি নিষ্ফল হয়। আমার এক বন্ধুর দক্ষিণহস্ত সহসা পক্ষাঘাতে পঙ্গু হইয়া গিয়াছিল। তিনি কলিকাতায় বড় বড় চিকিৎসককে দেখাইলেন। তাঁহারা সকলেই তাঁহার রোগকে অসাধ্য বলিয়া ছাড়িয়া দিলেন। কিন্তু তিনি একমনে ভগবানকে আরোগ্য দিবার জন্য কাতর প্রাণে ডাকিতে লাগিলেন। এক সন্ন্যাসী তাঁহার বাড়ীর দুয়ারে সহসা উপস্থিত হইলেন। তিনি খুব সামান্য গাছ-গাছড়ার সাহায্যে তাঁহার রোগ ভাল করিলেন। এই ঘটনার মূলে গিয়া দেখিলে একমাত্র ভগবানকেই তাঁহার চিকিৎসক বলা ছাড়া আর কিছুই দেখিতে পাই না—সন্ন্যাসী ত নিমিত্তমাত্র।

শারীরিক সম্বন্ধে যেমন বলিলাম, মানসিক ব্যাধি বা আধি সম্বন্ধেও সেইরূপ ভগবানকেই একমাত্র প্রকৃত চিকিৎসক বলা যাইতে পারে। পিতামাতার বিয়োগে বা স্ত্রীপুত্রের বিয়োগে যখন দুঃখশোকে অধীর হইয়া পড়ি, তখন আমাদিগকে কে সান্ত্বনা প্রদান করিয়া অন্তরে শান্তি আনয়ন করেন? বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজন দুইটী মিষ্ট কথা বলিয়া সান্ত্বনা দিবার চেষ্টা করেন বটে, কিন্তু সান্ত্বনার অন্তরতম উৎস না উন্মুক্ত হইলে কাহার সাধ্য যে দুটী মিষ্ট কথায় সান্ত্বনা আনয়ন করিতে পারে? সেই উৎস খুলিয়া দিতে পারেন সেই অনন্যচিকিৎসক ভগবান। তিনি প্রত্যেকের অন্তরের কথা, প্রত্যেকের মর্ম্মব্যথা বিশেষভাবে বুঝিয়া সেই উৎস খুলিয়া দেন এবং প্রত্যেকের অন্তরে যথাযথ সান্ত্বনা প্রদান করেন। "দুঃখ-সুখে সম বন্ধু এমন কে, শোক-তাপ-ভয়হারা"? তখন শোকতপ্ত মানব নিজের চতুর্দ্দিকে ভগবানের মঙ্গলহস্তের ছাপ উপলব্ধি করিয়া এবং সেই সঙ্গে নিজের অন্তরেও তাঁহার মঙ্গলভাবের পরিচয় পাইয়া শান্তিলাভ করে।

আত্মীয়-স্বজন বন্ধু-বান্ধবের বিয়োগব্যথা নিতান্ত অকিঞ্চিৎকর বলিয়া মনে হয়, যখন পাপযন্ত্রণার সহিত তাহার তুলনা করি। পাপজনিত মর্ম্মদাহ যিনি ভোগ করিয়াছেন, সেই ভুক্তভোগী ব্যতীত অপর কেহই পাপযন্ত্রণা উপলব্ধি করিতে পারে না। ভগবানের মঙ্গলনিয়মের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হওয়াই পাপ। তাঁহার এমনই মঙ্গলবিধান যে, পাপ করিলেই তাহার জন্য দৈহিক বা মানসিক শাস্তি ভোগ করিতেই হয়। দৈহিক শাস্তি পাপযন্ত্রণার খুবই অল্প অংশ। অন্তরে যখন পাপের যন্ত্রণা অনুভূত হয়, তখন মানুষ দিশাহারা হইয়া যায়; অনেক সময়ে সেই যন্ত্রণা সহ্য করিতে না পারিয়া আত্মহত্যা করিতেও কুণ্ঠিত হয় না।

কিন্তু এই দারুণ যন্ত্রণা হইতে উদ্ধার পাইবার কি কোন উপায় নাই? যিনি আমাদের দয়াময় পিতা, যিনি আমাদের করুণাময়ী মাতা, যিনি আমাদের সখা ও সুহৃৎ, যিনি আমাদের দুঃখে বিপদে শান্তিদাতা, তিনি যখন শত শত শারীরিক ব্যাধি হইতে মুক্তি দিবার জন্য শতবিধ ঔষধ প্রস্তুত করিয়া রাখিয়াছেন, ইহা কি সম্ভব যে, তিনি এই দারুণ পাপযন্ত্রণা হইতে মুক্তি পাইবার উপযুক্ত কোন প্রকার প্রতীকারের ব্যবস্থা করেন নাই? যাঁহার শক্তিতে এই বিশ্বচরাচর নিয়মিত হইতেছে; যিনি একটী কীটেরও আহারের সংস্থান করিতে ভুলেন না; কোটী কোটী যুগ পূর্ব্বে যিনি কোটী কোটী

পরবর্তী যুগের জীবজন্তুগণের জন্য অন্নজলের ব্যবস্থা করিতে ভুলেন নাই, ইহা কি সম্ভব যে, তিনি মনুষ্যের আত্মার পাপজনিত মর্ম্মভেদী দাহযন্ত্রণা নির্ব্বাপিত করিবার কোনও ব্যবস্থাই রাখিবেন না ? তাহা কখনই সম্ভবপর নহে।

অগ্নির দাহবেগ নিবারণের সর্ব্বোৎকৃষ্ট উপায় যেমন জল, সেইরূপ ভগবান অনুতাপকেই—মুখের নহে, কিন্তু অন্তরের অনুতাপকেই পাপযন্ত্রণার শান্তিপ্রদ ঔষধরূপে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। পাপের গরল আমাদিগকে পরম পিতা পরম মাতা পরমেশ্বর হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে চায়, তাই পাপের গরলে আমাদের প্রাণ এত মুহ্যমান হয়, মৃত্যুযন্ত্রণায় এত ছটফট করিতে থাকে। কিন্তু যদি পাপের জন্য অন্তরে যথার্থ অনুতাপ উপস্থিত হয়, মৃত্যুযন্ত্রণার পরিবর্ত্তে প্রাণে অমৃতপূর্ণ শান্তিবারি বর্ষিত হয়। অনুতাপই পাপদগ্ধ শোকতপ্ত মানবের পরমাত্মার সহিত মিলনসাধনের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অমোঘ উপায়। এই মিলন সাধিত হইবার ফলেই অনুতাপের সাহায্যে হৃদয় শান্তিতে ভরিয়া যায়।

আমরা যদি আমাদের পিতামাতাকে অন্তরের সহিত ভক্তিশ্রদ্ধা করি, তবে ইহা বলা বাহুল্য যে, তাঁহাদের আদেশ-উপদেশের বিরুদ্ধ কর্ম্ম করিলে হৃদয়ে নিশ্চয়ই আঘাত পাইব। আঘাত পাইয়া দারুণ ব্যথায় জর্জ্জরিত হইয়া আবার যদি তাঁহাদের চরণে আসিয়া দাঁড়াই ও ক্ষমা ভিক্ষা করি, তবে, তাঁহাদের প্রাণ যতই কঠিন হউক না কেন, তাঁহারা আমাদিগকে ক্ষমা না করিয়া এবং তাঁহাদের ক্রোড়ের অভিমুখে আমাদিগকে না টানিয়া লইয়া থাকিতে পারেন না। সেইরূপ যাঁহার কৃপায় আমরা জীবিত থাকিয়া জ্ঞানের অক্ষয় ভাণ্ডারের মধ্যে, জগতের অনুপম সৌন্দর্য্যের মধ্যে বর্দ্ধিত হইতেছি, মাতৃগর্ভে অবস্থান অবধি যাঁহার প্রসাদে পিতামাতার অতুলনীয় দয়াস্নেহের মধ্যে লালিত-পালিত হইয়াছি, তাঁহার আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া তাঁহার প্রতিষ্ঠিত সুন্দর নিয়মের মধ্যে পাপ আচার পাপচিন্তা পাপঅনুষ্ঠান প্রভৃতি দ্বারা বিঘ্ন আনয়ন করিলে আমাদের হৃদয়ে যে গুরুতর আঘাত লাগিবে তাহা কিছু আশ্চর্য্য নহে। কিন্তু সেই আঘাতে ব্যথিত হৃদয় লইয়া যদি বিশ্বপিতা অখিলমাতার চরণে আছড়াইয়া পড়ি, এবং কাতর কণ্ঠে তাঁহাকে ডাকিয়া বলি—জননী ! জননী ! আমাকে ক্ষমা কর ; আমি তোমার আদেশের বিরুদ্ধে গিয়া পাপাগ্নিতে দগ্ধ হইতেছি ; এ মর্ম্মদাহ আর সহ্য হয় না ; তুমি আমায় কৃপা কর, তুমি আমার হৃদয়ে শান্তি দাও"—তখন তাঁহার প্রাণ কি আমার জন্য আকুল হইবে না ? তিনি আমাদের রক্ষাসাধনের জন্য, আমাদের লালনপালনের জন্য যাঁহাদিগকে প্রেরণ করিয়াছেন, আমাদের দুঃখে আমাদের কষ্টে যদি তাঁহাদের হৃদয় বিগলিত হয়, তাঁহারা যদি আমাদিগকে সান্ত্বনা ও শান্তি দিবার জন্য শতবিধ উপায়ের সন্ধানে প্রবৃত্ত হন, তখন আমরা ইহা কল্পনাও করিতে পারি না যে, ভগবান আমাদের মর্ম্মদাহে শান্তিবারি বর্ষণ করিবার জন্য উৎসুক হইবেন না। আমরা প্রকৃতি হইতেই প্রকৃতির অতীত পরম পুরুষের সন্ধান পাই। সুতরাং এই পৃথিবীর পিতামাতার অনুপম দয়া-স্নেহের ভিতর দিয়াই আমরা নিঃসন্দেহে বলিতে পারি যে, ভগবানকে ডাকিবার মত ডাকিলে তিনি আমাদের দুঃখকষ্টের সময় আমাদিগকে কোলে লইয়া আমাদের অশ্রু না মুছাইয়া থাকিতে পারেন না। এই সত্য বিশ্বাসের উপর দাঁড়াইয়াই সাধক জোরের সঙ্গে বলেন যে, ব্রহ্ম-পিপাসায় যাঁহারা আকুল হন, ভক্তবৎসল ভগবান স্বয়ং আপনাকে দিয়াও তাঁহাদের তৃষ্ণা নিবারণ করেন।

পাপের পর যথার্থ আন্তরিক অনুতাপ যেমন পবিত্রতার পথ খুলিয়া দেয়, এমন আর কিছুই নহে। ভারতের ঋষি তাই এই মহান আশার কথা আমাদের কর্ণে শুনাইয়াছেন—

কৃত্বা পাপং হি সন্তপ্য তস্মাৎ পাপাৎ প্রমুচ্যতে।
নৈতৎ কুর্য্যাং পুনরিতি নিবৃত্ত্যা পূয়তে নরঃ। মনু।

"পাপ করিয়া অনুতাপ করিলে সেই পাপ হইতে মনুষ্য মুক্তিলাভ করে, এবং এই পাপ পুনরায় করিব না এই ভাবে তাহা হইতে নিবৃত্ত হইলে মনুষ্য পবিত্র হয়"।

"মনুষ্য পাপে ক্রমে ক্রমে নিমগ্ন হইয়া যাহাতে বিনাশ প্রাপ্ত না হয়, সেই জন্য করুণাময় পরমেশ্বর পাপের সহিত যন্ত্রণাকে সংযুক্ত করিয়া দিয়াছেন। যেমন শরীরে রোগ উৎপন্ন হইলেই শারীরিক যন্ত্রণা উপস্থিত হয়, সেইরূপ আত্মাতেও পাপ উৎপন্ন হইলেই আত্মার আনন্দ ও শান্তি তিরোহিত হয় এবং গ্লানি ও অশান্তি আত্মাকে ক্ষতবিক্ষত করে। ইহাই পাপানুষ্ঠানের দণ্ড। মনুষ্য এইরূপ আন্তরিক দণ্ডভোগ করিয়া অনুশোচনা করে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইয়া পুণ্যপথে গমন করিতে উৎসুক হয়। পাপকারী মনুষ্য যাহাতে আপনার বিকৃত অবস্থা জানিতে পারে, ঈশ্বর সেইরূপ চৈতন্য উদয় করিয়া দিবার নিমিত্ত দণ্ডদান করেন ; দণ্ডাঘাতে চৈতন্যোদয় হইলেই অনুশোচনা উপস্থিত হয় ; অনুতপ্ত হইলেই দণ্ডদানের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইল।"*

যতদিন ভারতে সত্যধর্ম্মের একাধিপত্য ছিল ; যতদিন ভারতবাসী সত্যস্বরূপ মঙ্গলবিধাতা পরমেশ্বরকে সকল কার্য্যের কেন্দ্রে প্রতিষ্ঠিত করিতেন ; যতদিন ভগবানকে সমুদয় হৃদয় দিয়া প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনকেই প্রকৃত উপাসনা বলিয়া ভারতবাসী

* ব্রাহ্মধর্ম।

গ্রহণ করিতেন, ততদিন অনুতাপই পাপের মহৌষধ বলিয়া গৃহীত হইত। কিন্তু যখন ধর্ম্মবিপ্লব রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতি নানাবিধ উপদ্রবের কারণে উপধর্ম্মের অন্ধকার মেঘরাশি সত্যধর্ম্মের সূর্য্যালোককে আচ্ছন্ন করিল, সেই দিন হইতে ভগবানের উপর নির্ভর কোথায় অন্তর্হিত হইতে লাগিল; স্বকপোলকল্পিত শান্তিপ্রদ মঙ্গলভাবের পরিবর্ত্তে জনসাধারণ ভ্রান্তপথে পরিচালিত হইয়া যাগযজ্ঞ শরীরশোষণ প্রভৃতি নানাবিধ বহিরাড়ম্বরকেই পাপক্ষয়ের মহৌষধ বলিয়া গ্রহণ করিতে লাগিল। জনসাধারণ বুঝিল না যে, পাপাচরণের ফলে দৈহিক পীড়া যদি কিছু হয়, শরীরশোষণ প্রভৃতি দ্বারা তাহার কিয়ৎপরিমাণে শান্তি হইতে পারিলেও, পাপ-কার্য্য অন্তরে যে আঘাত দিয়াছে, সে বিষয়ে বিশেষ কোন উপকার হওয়া সম্ভব নয়। ঈশ্বরের আদেশের বিরুদ্ধে চলিয়া, তাঁহার বিশ্বপরিচালক নিয়মের বিরুদ্ধ করিয়া অন্তরে কঠিন আঘাত পাইলে অনুতপ্তহৃদয়ে তাঁহার নিকটে ক্ষমা প্রার্থনা করিয়া ঐপ্রকার কর্ম্ম হইতে বিরত হওয়া ব্যতীত পাপের শ্রেষ্ঠতর প্রায়শ্চিত্ত আর কিছু আছে বলিয়া আমরা জানি না।

প্রায়শ্চিত্ত সম্বন্ধে এদেশে আর একটী ভ্রান্ত ধারণা বড়ই প্রচলিত আছে। এখানে জনসাধারণের বিশ্বাস, "দায়িত্ব-হস্তান্তর" করিলে গুরুতর পাপেরও প্রায়শ্চিত্ত সাধিত হয়। বলিতে কি, পাপ যতই কঠিন ও গুরুতর হয়, "দায়িত্বহস্তান্তরের" ঘটাও ততই বৃহত্তর হয়। "দায়িত্ব-হস্তান্তরের" অর্থ এই যে, পাপী মনুষ্য নিজের ও ঈশ্বরের মধ্যে কোন পুণ্যবান মনুষ্যকে মধ্যবর্ত্তী দূতরূপে স্বীকার করিবে; তিনি স্বীয় স্কন্ধে পাপীর সমস্ত পাপের দায়িত্ব গ্রহণ করিলে, এবং ভগবানের সহস্র বা দশসহস্র বা লক্ষ নাম জপ, ঠাকুরপূজা প্রভৃতি বিবিধ উপায়ে তিনি পাপীকে নিজের দায়িত্ব হইতে নিষ্কৃতি এবং পাপের আঘাত হইতে মুক্তিদান করিবেন। রাষ্ট্রবিপ্লব প্রভৃতির কারণে, জনসাধারণের মধ্য হইতে প্রকৃত শিক্ষা বিলুপ্ত হইবার কারণে পাপীহৃদয়ে শান্তি সান্ত্বনা আনয়নচেষ্টার কি বিসদৃশ পরিণাম! শত সহস্র মধ্যবর্ত্তী আমার হইয়া লক্ষ লক্ষ নাম জপ করিলেও যথার্থ অনুতাপরূপ প্রায়শ্চিত্তের দ্বারা আমার অন্তরে প্রকৃত পরিবর্ত্তন সাধিত না হইলে পাপের আঘাত ও বেদনা হইতে মুক্তিলাভের আশা বৃথা। অপরের স্কন্ধে পাপের দায়িত্ব নিক্ষেপ করিয়া নিজের মুক্তিলাভ সম্ভব হইলে শত সহস্র ব্যক্তিকে মধ্যবর্ত্তী স্বীকার করিলেও স্ব-কৃত পাপের জন্য আমরা স্বয়ং আত্মগ্লানি ভোগ করিতাম না। মানবমাত্রেরই ইহা প্রত্যক্ষ যে, পুণ্যকর্ম্ম করিলে সে স্বয়ংই আত্মপ্রসাদ উপভোগ করে; পাপাচরণ করিলে সে স্বয়ংই আত্মগ্লানি ভোগ করে।

অনুতাপ পাপের প্রায়শ্চিত্তের একটী প্রধান অংশ হইলেও অনুতাপেই প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয় না। অনুতাপের ফলে পাপ হইতে বিরত হইয়া পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইলেই প্রায়শ্চিত্ত সম্পূর্ণ হয়। মানুষ কখনও চুপ করিয়া থাকিতে পারে না। হয় সে পুণ্যের পথে চলিবে, অথবা তাহার বিপরীত পথে চলিবে। এই দুইটীর মধ্যবর্ত্তী কোন পথ দেখি না। মানুষ কখনই নির্ব্বিকার চিত্তে, সংসারের সহিত সম্পূর্ণ নির্লিপ্ত থাকিতে পারে না। কাজেই অনু-তাপের অগ্নিতে পাপ ভস্মীভূত হইয়া গেলে মনুষ্যের পুণ্যকর্ম্মে প্রবৃত্ত হওয়াই শ্রেয়স্কর। "অনুশোচনা ঈশ্বরের নিয়মানুসারে উপস্থিত হয়; (প্রায়শ্চিত্তের) অপর অঙ্গ মনুষ্যকে যত্নপূর্ব্বক সম্পাদন করিতে হইবে। সর্ব্বদা আপনাকে পরীক্ষা করিবে এবং পাপ হইতে নিবৃত্ত হইবে ও পাপ দ্বারা আপনার যাহা কিছু অনিষ্ট হইয়াছে, পুণ্য-কর্ম্ম দ্বারা তাহার পরিহার করিবে।" আমাদের কর্ত্তব্য এই যে, ভগবান আমাদের অন্তরে যে স্বাধীন ইচ্ছা নিহিত করিয়া দিয়াছেন, সেই স্বাধীন ইচ্ছা অবলম্বনে মঙ্গলের পথে চলি এবং প্রাণপ্রদ পুণ্য কর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠান করিয়া পৃথিবী হইতে অমঙ্গলকে বিদূরিত করি, মৃত্যুর বিভীষিকাকে বিদূরিত করি। "পুণ্যং প্রাণান্ ধারয়তি পুণ্যং প্রাণদমুচ্যতে"—পুণ্য জীবের প্রাণ ধারণ করে, পুণ্য প্রাণদাতা বলিয়া উক্ত হন। পুণ্যবান মনুষ্য ইহকালে পবিত্র কীর্ত্তিলাভ ও পরকালে উন্নত লোকে গমন করেন।

আজ বৎসরের শেষ দিবস। নূতন বৎসরের জন্মদান করিয়া আজ পুরাতন বৎসর আপনার সুখদুঃখের সহিত কালসাগরে বিলুপ্ত হইয়া যাইবে। সমস্ত বৎসর ধরিয়া আমরাও পাপপুণ্য যাহা কিছু করিয়াছি, তাহার হিসাব-নিকাশের সময় আসিয়াছে। বৎসরের প্রারম্ভে আমরা ভাবিয়াছিলাম যে, নিজের প্রাণের বিনিময়েও সংসার-মরুভূমিকে উর্ব্বর করিয়া তুলিবে; প্রেমধারা বর্ষণ করিয়া সরস করিয়া তুলিবে। একটী একটী করিয়া ৩৬৫ দিন তো চলিয়া গেল। আমাদের মধ্যে কে বলিতে পারিবে যে, তিনি তাঁহার সেই ইচ্ছাকে সার্থক করিতে পারিয়াছেন? আজ সম্বৎসরের কার্য্য আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, আমরা যতটা জীবন দিতে পারিয়াছি, তদপেক্ষা অনেক বেশী মশালোর চিতাভস্ম সংগ্রহ করিয়া আনিয়াছি, প্রেমাশ্রুর পরিবর্ত্তে শোকাশ্রুকেই বেশী জীবনের সম্বল করিয়া তুলিয়াছি। ভগবান অন্তরে যে পুণ্যের জ্যোতি দিয়াছিলেন পাপের অন্ধকার তাহা আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছে।

বটে; সম্বৎসরের ভিতর অনেক ভুলভ্রান্তি করিয়াছি সত্য, কিন্তু তাহার জন্য হা-হুতাশ করিবার কোনই

প্রয়োজন নাই। আমাদের অন্তরে সকল পুণ্যের এক-মাত্র উৎস, সকল মঙ্গলের একমাত্র আকর পরমাত্মা যে নিত্য সমাসীন। যাহা কিছু পাপাচরণ করিয়াছ, অন্যায় অধর্ম করিয়া জগতে যাহা কিছু অমঙ্গল আনয়ন করিয়াছ, অতীতের দিকে চাহিয়া সেই সকলের স্মৃতিতে হাহুতাশ করিলে তো কোনই লাভ নাই। যাও—যাও—অবিলম্বে যাও—ভগবানের চরণে—জননীর চরণে আছ-ড়াইয়া পড়িয়া অশ্রুজলে চরণ বিধৌত করিয়া দাও, ক্ষমা ভিক্ষা কর এবং উৎসাহ সহকারে জননীর আদেশ জানিয়া শুভকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানের দ্বারা হৃদয়ের পবিত্রতা সম্পাদন কর। সেই স্বপ্রকাশ ভগবানকে তোমার হৃৎপদ্মে সর্ব্বদাই প্রকাশিত দেখ। তোমার হৃদয়ে মঙ্গল বায়ু প্রবাহিত হউক এবং সুগন্ধ ভরিয়া উঠুক। আগামী বৎসরের পাপ পরিত্যাগ করিয়া পুণ্য অর্জ্জনের জন্য নববলে নবোৎসাহে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও—পরমেশ্বর তোমাদের মস্তকে আশীর্ব্বাদ বর্ষণ করুন।

হিন্দু ও বৌদ্ধ।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

হিন্দু ও বৌদ্ধ এতদুভয়ের উত্তমর্ণাধমর্ণ তত্ত্ববিষয়ে মতভেদের সৃষ্টি হইয়াছে। এক শ্রেণীর লোক মনে করেন যে, হিন্দুধর্ম্মই অনাদি; ইহার পূর্ব্বে জগতে আর কোনও ধর্ম্মের অস্তিত্ব ছিল না। পক্ষান্তরে অপর শ্রেণীর লোকের বিশ্বাস যে, বৌদ্ধধর্ম্মও অতি প্রাচীন। অনেকের লিখিভঙ্গী হইতেই প্রতীয়মান হয় যে, তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস—বৌদ্ধের নিকট হইতেই মৈত্রী করুণা অহিংসা প্রভৃতি উদার ভাব হিন্দুধর্ম্মে ক্রমে প্রবিষ্ট হইয়াছে। এমন কি, নির্ব্বাণ বা মুক্তি বিষয়টি যজ্ঞানুষ্ঠানরত প্রাচীন হিন্দুদিগের পরিজ্ঞাত ছিল না। সন্ন্যাসধর্ম্ম বৌদ্ধদিগেরই নিজস্ব। উহার অনুকরণেই মোক্ষপ্রতিপাদক উপনিষদের উৎপত্তি হইয়াছে, ইত্যাদি আরও অনেক মতবাদ শ্রুতিগোচর হইয়া থাকে। এই বিষয়ের তথ্যনির্ণয়ে প্রযত্ন আবশ্যক হইয়াছে।

কে কাহার নিকট ঋণী, তাহা অবধারণ করিতে হইলে প্রথমত ঋণের সত্যতা নির্ণয় আবশ্যক। কারণ ঋণ কি নিরূপ, ইহা নির্ণীত না হইলে উত্তমর্ণতা বা অধমর্ণতা স্থির হইতে পারে না। উক্ত বিষয়ের মীমাংসা-কল্পে হিন্দুর ও বৌদ্ধের মৌলিকতার অনুসন্ধান আবশ্যক। হিন্দুধর্ম্মের মূল বেদ প্রভৃতি গ্রন্থে নিহিত। পক্ষান্তরে বৌদ্ধ ধর্ম্মের মূল ত্রিপিটক প্রভৃতি বৌদ্ধগ্রন্থে নিহিত। হিন্দুর ধর্ম্মগ্রন্থের তাৎপর্য্য হিন্দু পণ্ডিতগণ যেমত অবধারিত করিয়াছেন, সেই মতই উপাদেয়। পক্ষান্তরে বৌদ্ধগ্রন্থের তাৎপর্য্যও বৌদ্ধাচার্য্য কর্ত্তৃক অবধারিতই উপাদেয়। কারণ সম্প্রদায়-প্রসিদ্ধ ব্যাখ্যা ব্যতীত সাধারণের মনঃ-কল্পিত ব্যাখ্যা সুধীসমাজে গৃহীত হইতে পারে না। এ বিষয়ের যুক্তি একটু নীরস এবং কঠিন হইলেও তথ্য-নির্ণয়ের উপযোগিতাবোধে উপন্যস্ত করিতে বাধ্য হই-লাম। যুক্তি—যে ব্যক্তি কোনও একটি বিষয় অন্যকে বুঝাইবার জন্য শব্দ প্রয়োগ করে, সে তাহার অর্থ অবগত হইয়াই উচ্চারণ করে। আমি যাহা বলিতেছি, উহা হইতে শ্রোতা অমুক অর্থ অবগত হউক, বক্তার ইত্যাকার অভিপ্রায় থাকে। এই অভিপ্রায়ের অপর নাম তাৎ-পর্য্য। বক্তার তাৎপর্য্য যে শ্রোতা ঠিক বুঝিতে পারে, তাহারই সেই বাক্যজন্য যথার্থ জ্ঞান হয়। তাৎপর্য্য অবগত না হইলে বিপরীত জ্ঞান ঘটিয়া থাকে। এই জন্যই সম্প্রদায়ানুযায়ী ব্যাখ্যা এবং সিদ্ধান্তই চিরদিন প্রমাণ বলিয়া বিবেচিত হইয়া আসিতেছে। হিন্দুশাস্ত্রের তাৎপর্য্য ভগবান্ বেদব্যাস প্রভৃতি শিষ্যদিগের নিকট বর্ণনা করিয়াছিলেন, সেই গুলিই গুরুপরম্পরাক্রমে চলিয়া আসিতেছে। সুতরাং সেই সকল মতই অভ্রান্ত বলিয়া বিবেচনীয়।

বৌদ্ধগ্রন্থেও এইরূপ সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা যাহা আছে, তাহাই প্রমাণ বলিয়া বিবেচনীয়। কারণ প্রত্যেক সম্প্রদায়েরই স্ব স্ব মতানুযায়ী অনুষ্ঠানপদ্ধতি অনুসারেই স্মরণাতীত কাল হইতে উপাসনা চলিয়া আসিতেছে। যাহারা উভয় সম্প্রদায়ের সাম্প্রদায়িক রহস্য অবগত হইতে পারেন, পরমার্থতঃ তাঁহারাই উভয়ের স্বত্ব সাব্যস্ত করিতে সমর্থ। যাঁহারা কোনও অনুষ্ঠানের ধার ধারেন না, কেবল মৎকল্পিত মতবাদ প্রচার করেন, তাঁহাদের কথার কোনও মূল্যই নাই।

হিন্দুর গ্রন্থ এবং গ্রন্থকারদিগের মত পাঠ করিলে যেমন হিন্দুধর্ম্মের অনাদিতা প্রতীয়মান হয়, তেমনই বৌদ্ধগ্রন্থ পাঠে গ্রন্থকারদিগের মতপাঠে বৌদ্ধধর্ম্মেরও অনাদিতাই প্রতীয়মান হয়।

বেদের ব্রাহ্মণ-ভাগে যেমন "যাজ্ঞিকা আহুঃ, ব্রহ্ম-বাদিনো বদন্তি" ইত্যাকার বর্ণনা দেখা যায়, বৌদ্ধগ্রন্থেও তেমনই পূর্ব্ববর্ত্তী তথাগতদিগের মতবাদের উল্লেখ দেখা যায়।

বৌদ্ধমতের অনাদিতা প্রতিপাদন প্রসঙ্গে প্রথমতঃ বুদ্ধবাচক শব্দগুলির বিশ্লেষণ করিলে কতদূর কি বুঝা যায়, তাহাই চেষ্টা করিয়া দেখা যাউক। প্রসিদ্ধ কোষকার অমর সিংহ সাধারণ বুদ্ধের অষ্টাদশটি নাম নিবদ্ধ করিয়াছেন।

"সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুদ্ধঃ ধর্ম্মরাজঃ তথাগতঃ।
সমন্তভদ্রঃ ভগবান্ মারজিৎ লোকজিৎ জিনঃ॥
ষড়ভিজ্ঞঃ দশবলঃ অদ্বয়বাদী বিনায়কঃ।
মুনীন্দ্রঃ শ্রীঘনঃ শাস্তা মুনিঃ॥

সর্ব্বং জানাতি সমস্ত বিষয় যিনি জানেন। এই অর্থে সর্ব্ব পূর্ব্বক জ্ঞা ধাতুর পর কর্ত্তৃবাচ্যে ক প্রত্যয় যোগে সর্ব্বজ্ঞ শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। অনাবশ্যক বোধে সেইগুলি উল্লিখিত হইল না। প্রসিদ্ধ টীকাকার ভানুজী দীক্ষিত স্বকীয় টীকায় একটি কারিকা উদ্ধৃত করিয়াছেন, তাহার অর্থ হইতে বুঝা যায় যে, প্রাচীন কালে জিনেন্দ্র সুগত ও শঙ্কর এই তিনটি অর্থে সর্ব্বজ্ঞ শব্দ প্রযুক্ত হইত। অর্থাৎ সর্ব্বজ্ঞ বলিলে জৈনদিগের উপাস্য জিন, বৌদ্ধদিগের উপাস্য সুগত এবং হিন্দুদিগের উপাস্য পরমেশ্বর এই তিনটি উপাস্যই বুদ্ধির বিষয় হইত। "সর্ব্বজ্ঞ" শব্দের অর্থ জৈনের নিকট অর্হৎ বৌদ্ধের নিকট সুগত এবং হিন্দুর নিকট পরমেশ্বর।

কারিকাটি এইরূপ—

"সর্ব্বজ্ঞস্তু জিনেন্দ্রে স্যাৎ সুগতে শঙ্করেঽপিচ।"

"সুগত" শব্দের অর্থ শোভনং গতং জ্ঞানং যস্য। সুন্দর জ্ঞান আছে যাহার। "বুদ্ধ" শব্দের অর্থ প্রশস্ত বুদ্ধি আছে যাহার। বুদ্ধি শব্দের পর "অর্শ আদ্যচ্" ব্যাড়ির মতে বুধ শব্দেও বুদ্ধকে বুঝায়। তাঁহার কারিকাংশ ভানুজী উদ্ধৃত করিয়াছেন। "সর্ব্বজ্ঞঃ সুগতো বুধঃ"॥ বুধ কর্ত্তরি ক প্রত্যয়ঃ। ধর্ম্মরাজ শব্দের ব্যুৎপত্তি—ধর্ম্মেন রাজতে ধর্ম্মের দ্বারা যিনি শোভিত হন। তথাগত—ব্যুৎপত্তি—তথা সত্যং গতং জ্ঞানং যস্য। সত্য জ্ঞান আছে যাহার।

সমন্তং ভদ্রমস্য সঃ "সমন্তভদ্রঃ"। ভগবান ভগং মাহাত্ম্যমস্যাস্তি। মাহাত্ম্য আছে ইহার। মারং কামং জয়তি "মারজিৎ" মার-জি-কিপ্। বুদ্ধ কর্ত্তৃক কামজয়ের বৃত্তান্ত কালিকাপুরাণে বিস্তৃত ভাবে বর্ণিত হইয়াছে। লোকং জয়তি লোকজিৎ লোক-জয়কারী। লোক-জি-কিপ্। জয়তি "জিনঃ"—জি কর্ত্তরি উণাদি নক্ প্রত্যয়। উণাদি সূত্রগুলি পাণিনির বহু পূর্ব্ববর্ত্তী।

জিন শব্দটি অর্হৎ বুদ্ধ ও প্রকৃষ্ট জয়শীল এই তিন অর্থে প্রসিদ্ধ। "জিনোঽর্হতি চ বুদ্ধে চ পুংসি স্যাজ্জিত্বরে ত্রিষু। মহাবস্তু অবদানে বৌদ্ধদিগের প্রতি 'জিনপুত্র' এই সম্বোধন দেখা যায়। বুদ্ধের বিশেষণরূপেও "অর্হং" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। যথা—

"নমোঽর্হতে তথাগতায় ইতি সম্যক্ সংবুদ্ধায়। যস্যাস্তিকে অনেনৈব ভগবতা শাক্যমুনিনা প্রথমং কুশলমূল-প্রণিধানং কৃতম্।"

(মহাবস্তু-অবদান—প্রথম)

ষড়ভিজ্ঞাঃ—দিব্যং চক্ষুঃ-শ্রোত্রং, পরচিত্তজ্ঞানং, পূর্ব্বনিবাসানুস্মৃতিঃ, আত্মজ্ঞানং, বিয়দ্গমনং, কায়ব্যূহসিদ্ধিশ্চেতি ষট্ অভিজ্ঞো জায়মানানি যস্য সঃ। দিব্যচক্ষু, দিব্যকর্ণ, পরের মনোগত ভাব জানা, পূর্ব্বনিবাস স্মরণ অর্থাৎ পূর্ব্বজন্মবৃত্তান্ত-স্মৃতি, আত্মজ্ঞান, আকাশপথে গমন এবং অভিপ্রায়ানুসারে এককালে বহুশরীর নির্ম্মাণ, এই সকল ক্ষমতা যাঁহাতে সর্ব্বদা বর্ত্তমান, তিনি ষড়ভিজ্ঞ। অথবা ষট্সু দান-শীল-ক্ষান্তি বীর্য্য-ধ্যান-প্রজ্ঞাসু অভিজ্ঞা আদ্যং জ্ঞানমস্য। দান শীল ক্ষান্তি বীর্য্য ধ্যান ও প্রজ্ঞা বিষয়ে অভিজ্ঞা অর্থাৎ প্রথম জ্ঞান আছে যাহার তিনি ষড়ভিজ্ঞ।

দশবল-দশ বলান্যস্য। দশটি বল আছে ইঁহার।

দশটি বল—দান, শীল, ক্ষমা, বীর্য্য, ধ্যান, প্রজ্ঞা, বল, উপায়, প্রণিধি ও জ্ঞান।

"দানং শীলং ক্ষমা বীর্য্যং ধ্যানপ্রজ্ঞাবলানিচ।
উপায়প্রণিধির্জ্ঞানং দশ বুদ্ধ-বলানিচ॥"

অদ্বয়ং অদ্বৈতং বদতি অবশ্যং আবশ্যকেনেতি। যিনি অদ্বৈতমত প্রচার করেন। জ্ঞানের অতিরিক্ত কিছুই নাই, এই মত প্রবর্ত্তক। বিনয়তি অনুশাস্তি সত্ত্বানীতি নীঙ্ঞ্ ধাতোঃ ণ্বুন্। প্রাণীদিগকে যিনি বিনীত করেন তিনি বিনায়ক। বিনায়ক শব্দটি গণেশ বিঘ্ন জিন (বুদ্ধ) ও গরুড় এই কয়টি অর্থে প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছিল।

মুনিষু ইন্দ্রঃ শ্রেষ্ঠঃ মুনীন্দ্রঃ। মুনিদিগের মধ্যে শ্রেষ্ঠ।

শ্রিয়া ঘনঃ পূর্ণঃ শ্রীঘনঃ। শ্রীর দ্বারা ঘন অর্থাৎ পূর্ণ।

জ্ঞান পুণ্য সম্ভাবের নাম শ্রী, তদ্দ্বারা পূর্ণ। ক্ষুভ্নাদিগণে পঠিত হওয়ায় শ্রীঘন শব্দে ণত্ব হইল না। ইহা হইতে শব্দটির অতি প্রাচীনত্ব প্রতীত হয়। শাস্তীতি শাস্তা—শাসন করেন যিনি তিনি শাস্তা। শাস্ ধাতুর পর উণাদি তৃন্ বা তৃচ্ প্রত্যয়যোগে এইরূপ সিদ্ধ হয়।

"মুনে রুচ্চ" এই উণাদি সূত্রানুসারে মনধাতুর পর ইন্ প্রত্যয় যোগে মুনি শব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে।

এই আঠারটি শব্দ বুদ্ধমাত্রের বাচক। শাক্যবংশপ্রসূত বিশেষ বুদ্ধের সাতটি নাম অমরসিংহ কর্ত্তৃক নিবদ্ধ হইয়াছে।

"শাক্যমুনিস্তু যঃ। ১৪।
স শাক্যসিংহঃ সর্ব্বার্থসিদ্ধঃ শৌদ্ধোদনিশ্চ সঃ।
গৌতমশ্চার্কবন্ধুশ্চ মায়াদেবী-সুতশ্চ সঃ॥" ১৫।

এই কারিকার অর্থ—যিনি শাক্যমুনি তিনিই শাক্যসিংহ, সর্ব্বার্থসিদ্ধ, শৌদ্ধোদনি, গৌতম অর্কবন্ধু এবং মায়াদেবীসুত, এই কয়টি নামে অভিহিত হইয়া থাকেন। শাক্যমুনি ও শাক্যসিংহ শব্দে কর্ম্মধারয় সমাস অভিপ্রেত। যিনি শাক্য তিনিই মুনি, অভেদান্বয়। শাক্যঃ সিংহ ইব। শাক্যবংশপ্রসূত সিংহ তুল্য। উপমিত সমাস। শাক্য

শব্দের নিরুক্তি—"শাকবৃক্ষপ্রতিছন্নং বাসং যস্মাচ্চ চক্রিরে। তস্মাদিক্ষ্বাকুবংশ্যাস্তে শাক্যা ইতি ভুবি স্মৃতাঃ॥" ইক্ষ্বাকুবংশীয় কতিপয় রাজপুত্র পিতার আদেশানুসারে শাকবৃক্ষবনে বাস করিয়াছিলেন। তাঁহারা কপিলমুনির আশ্রমে শাকনামক বৃক্ষের নীচে বাস করিয়াছিলেন, তন্নিবন্ধন তাঁহাদের "শাক্য" এই নাম পৃথিবীতে প্রসিদ্ধ হইল। শাক্যমত বলিলে বৌদ্ধমত বুঝায়। কিন্তু শাক্য নামক অন্যপ্রকার বেদবিরুদ্ধ মতেরও পরিচয় পাওয়া যায়। তাহা পশ্চাৎ আলোচিত হইবে।

সর্ব্ব অর্থ (প্রয়োজন) ইহার সিদ্ধ অর্থাৎ নিষ্পন্ন, অতএব ইহার নাম সর্ব্বার্থসিদ্ধ। ইহার জন্মের পর সমস্ত নিধিরত্ন প্রভৃতি উৎপন্ন হইয়াছিল, অতএব ইহার জনক প্রভৃতি "সর্ব্বার্থসিদ্ধ" এই নাম রাখিয়াছিলেন।

"পুত্রজন্মনি সর্ব্বার্থসিদ্ধিং শুদ্ধোদনাদয়ঃ।
দৃষ্ট্বা সর্ব্বার্থসিদ্ধোঽয়মিতি নামাস্য চক্রিরে॥"

শুদ্ধোদনের অপত্য বলিয়া ইঁহার "শৌদ্ধোদনি" নাম হইয়াছে। ইনি গোতমের শিষ্য, তন্নিবন্ধন গৌতম নামে পরিচিত হইয়াছেন। "তস্যেদং" (৪।৩।১২০) এই সূত্রানুসারে অণ্ প্রত্যয় হইয়াছে। অর্ক সূর্য্য তদ্বংশ প্রসূতত্ব নিবন্ধন ইঁহার নাম "অর্কবন্ধু"। ইঁহার মাতার নাম মায়াদেবী, তন্নিবন্ধন ইঁহার নাম "মায়াদেবী-সুত"। বুদ্ধের এবং বিশেষবুদ্ধের আরও অনেক নাম অভিধানাদিতে সন্নিবেশিত হইয়াছে। সেগুলিও প্রয়োজনানুসারে প্রদর্শিত হইবে।

এখানে একটি কথা বলিয়া রাখিতেছি যে, অমরসিংহ একজন খ্যাতনামা বৌদ্ধপণ্ডিত। তিনি কলাপ ব্যাকরণের উপর বৃত্তি রচনা করিয়া গিয়াছেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে। কিন্তু কলাপ-বৃত্তিরচনা প্রসঙ্গে তিনি নিজেকে দুর্গসিংহ নামে পরিচিত করিয়াছেন। তাঁহার বৃত্তি মহাভাষ্যের প্রণালীতে লিখিত। কিন্তু তাঁহার বৌদ্ধত্ব নিবন্ধন হিন্দু পণ্ডিতগণ তাঁহার উপর কটূক্তি প্রয়োগের প্রলোভন পরিত্যাগ করেন নাই।

একটি কবিতা আছে,

"অমরসিংহো হি পাপীয়ান্ সর্ব্বং ভাষ্যমচূচুরৎ।"

ইহার অর্থ, পাপাত্মা অমরসিংহ সমস্ত ভাষ্য চুরি করিয়াছে।

প্রসঙ্গক্রমে ইহাও বক্তব্য যে, কাতন্ত্রবৃত্তির উপক্রমে গ্রন্থকার একটি নমস্কার-কবিতা নিবদ্ধ করিয়াছেন। যথা,

"দেবদেবং প্রণম্যাদৌ সর্ব্বজ্ঞং সর্ব্বদর্শিনম্।
কাতন্ত্রস্য প্রবক্ষ্যামি ব্যাখ্যানং সার্ব্ববর্ম্মিকম্॥"

এই কবিতার পূর্ব্বার্দ্ধের অর্থ হইতে জানা যায় যে, গ্রন্থকার সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শী দেবদেবকে নমস্কার করিয়াছেন। গ্রন্থকার বৌদ্ধ, সুতরাং তাঁহার অভিপ্রেত সর্ব্বজ্ঞ সর্ব্বদর্শি-বিশেষণ-বিশিষ্ট দেবদেব সুগত। কিন্তু হিন্দু টীকাকারগণ তাহা বুঝিতে পারেন নাই; অতএব তাঁহাদের মতে যথোক্ত বিশেষণবিশিষ্ট দেবদেব মহাদেব শিব। অসাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যায় সর্ব্বত্রই এই রীতি দেখিতে পাওয়া যায়।

অমরসিংহ নাগভট্টনামে পরিচিত হইয়া তন্ত্রাপর-নাম আগমশাস্ত্র বিষয়ে গ্রন্থ রচনা করিয়াছিলেন। এক অমরসিংহই যে বিভিন্ন নামে পরিচয় দিয়া নানা শ্রেণীর গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, তদ্বিষয়ে গুরুপরম্পরা-প্রচলিত একটি উদ্ভট শ্লোক সাক্ষ্য প্রদান করিয়া থাকে। যথা,

"আগমে নাগভট্টোঽহং কোষে চামরসিংহকঃ।
কলাপে দুর্গসিংহশ্চ এক এব ত্রিধা মতঃ॥"

এই কবিতার অর্থ হইতে জানা যায় যে, কবি আত্মপরিচয় প্রদানাভিপ্রায়ে বলিয়াছেন যে, এক আমিই আগমপ্রচারে নাগভট্ট, কোষপ্রণয়নে অমরসিংহ এবং কলাপের বৃত্তিরচনা সময়ে দুর্গসিংহ রূপে অভিমত হইয়াছি।

প্রাচীন গ্রন্থকারদিগের এই রীতি প্রচলিত ছিল। ইতিহাসপ্রসিদ্ধ চাণক্যপণ্ডিত অর্থশাস্ত্র প্রণয়নে "কৌটিল্য" নাম ধারণ করিয়াছেন। কামশাস্ত্র প্রণয়নে "বাৎস্যায়ন" নামে পরিচয় দিয়াছেন; এবং মোক্ষশাস্ত্র ন্যায়ভাষ্য রচনায়ও "বাৎস্যায়ন" নামই নিবদ্ধ করিয়াছেন। কিন্তু তাঁহার গ্রন্থ "বাৎস্যায়নভাষ্য" নামে প্রসিদ্ধ হইলেও পরবর্ত্তী গ্রন্থকারগণ তাঁহাকে পক্ষিলস্বামী বলিয়াও উল্লেখ করিয়াছেন।

ত্রিকাণ্ডশেষাভিধানে চাণক্যের আটটি নাম নিবদ্ধ হইয়াছে। যথা,

"বিষ্ণুগুপ্তস্তু কৌটিল্যশ্চাণক্যো দ্রামিলোঽঙ্গুলঃ।
বাৎস্যায়নো মল্লনাগ-পক্ষিলস্বামিনাপি চ॥"

ব্রহ্মবর্গ। ৩৬০।

এইরূপ উপবর্ষ, পাণিনি, ব্যাড়ি, বররুচি, পতঞ্জলি, ভর্তৃহরি প্রভৃতি প্রসিদ্ধ গ্রন্থকারদিগের প্রত্যেকেরই একাধিক নামের পরিচয় পাওয়া যায়। যথা,

"উপবর্ষো হলভূতিঃ কৃতকোটি-রযাচিতঃ।
পাণিনিস্তু হিকো দাক্ষীপুত্রঃ শালঙ্কিপাণিনৌ॥
মালাতুরীয়োঽথ ব্যাড়ি র্বিন্ধ্যস্থো নন্দিনীসুতঃ।
মেধাবী চাথ মেধাজিৎ কাত্যঃ কাত্যায়নশ্চ সঃ॥
পুনর্বসু-র্বররুচি-র্গোনর্দীয়ঃ পতঞ্জলিঃ।
চূর্ণীকৃদ্ভাষ্যকারশ্চ হরির্ভর্তৃহরিঃ স্মৃতঃ॥ ৩৬৮

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থকার অমরসিংহ স্বকীয় গ্রন্থের উপক্রমে মঙ্গলাচরণস্বরূপ একটি পদ্য নিবদ্ধ করিয়াছেন।

"যস্য জ্ঞানদয়াসিন্ধোরগাধস্যানঘা গুণাঃ।
সেব্যতামক্ষয়ো ধীরাঃ স শ্রিয়ে চামৃতায় চ॥"
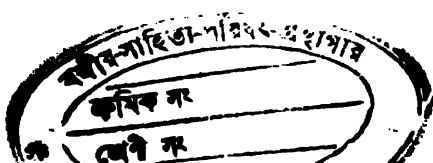
পদ্যটির অর্থ হইতে জানা যায় যে, আচার্য্য শাস্ত্রপাঠের অধিকারিবর্গের প্রতি উপদেশ করিতেছেন যে, হে পণ্ডিতগণ! অনন্ত মহিমান্বিত যে জ্ঞান-দয়াম্বুস্বরূপ তথাগতের গুণরাশি দোষলেশবিবর্জ্জিত, সেই অক্ষয় মহাত্মাকে সম্পদ্ এবং মোক্ষ এই উভয় লাভের জন্য তোমরা সেবা কর। ইহা হইতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, হিন্দুদিগের যেমন ধর্ম্ম অর্থ কাম মোক্ষ এই চতুর্ব্বর্গ, গ্রন্থ-বাহুল্যে বৌদ্ধদিগেরও তেমনই চতুর্ব্বর্গ অভিপ্রেত ছিল। কারণ গ্রন্থকার অন্যাক্ষরে সম্পদ্‌বাচী শ্রীশব্দের উল্লেখ করিয়া তদ্দ্বারাই ধর্ম্মার্থকামরূপ ত্রিবর্গের সূচনা করিয়াছেন; যেহেতু অর্থ হইতেই ধর্ম্মকাম সম্পন্ন হইয়া থাকে। অমৃত শব্দের দ্বারা মৃত্যুর অভাবরূপ মুক্তি অভিপ্রেত হইয়াছে। মুক্তির পর আর জন্ম নাই; সুতরাং মরণও নাই। যদিও বৌদ্ধমতে জ্ঞানদ্বারা-নিবৃত্তিমূলক আত্মার বিলোপরূপ মুক্তি হইতে হিন্দুসম্মত মুক্তির পার্থক্য আছে, তথাপি অমরণাংশে উভয়ের কোনরূপ বৈষম্য নাই। গোতমাদির অভিমত মুক্তাবস্থায় আত্মার সত্ত্বাতেও তাহাতে কোনরূপ সুখদুঃখ থাকে না, সুতরাং বৌদ্ধাভিমত দীপনির্ব্বাণবৎ মুক্তি হইতে পরমার্থতঃ ইহার কোনই ভেদ নাই। গ্রন্থকার স্বসম্প্রদায়ের উপাস্যকেই সেবা করিবার উপদেশ দিয়াছেন, তথাপি হিন্দুটীকাকারগণ শৈব-বৈষ্ণববাদিপক্ষে শ্লোকের ব্যাখ্যার ত্রুটি করেন নাই। অসাম্প্রদায়িকতাই ঈদৃশ ব্যাখ্যার মূল।

বৌদ্ধগণও হিন্দুদিগের মত সংস্কৃতভাষী ছিলেন। তাঁহাদিগের মধ্যেও জাতিভেদ ও আভিজাত্যের অভাব ছিল না। এমন কি, তথাগতগণ ব্রাহ্মণকুল অথবা ক্ষত্রিয়কুল ব্যতীত অন্যকুলে কখনও জন্মগ্রহণ করিতেন না। সুতরাং তাঁহাদের মধ্যে সংস্কৃতভাষার যথেষ্ট সমাদর ছিল। সংস্কৃতভাষা দ্বিজাতির ভাষা বলিয়াই প্রসিদ্ধ ছিল। হনুমান লঙ্কানগরীতে প্রবিষ্ট হইয়া সীতাসমীপে গমনের পর ভাবিয়াছিলেন যে, যদি আমি সীতার নিকট দ্বিজাতির মত সংস্কৃত ভাষা প্রয়োগ করি, তবে সীতাদেবী আমাকে রূপান্তরধারী রাবণ মনে করিয়া ভয় পাইতে পারেন।

"যদি বাচং প্রদাস্যামি দ্বিজাতিরিব সংস্কৃতাম্।
রাবণং মন্যমানা সা সীতা ভীতা ভবিষ্যতি॥"

স্বসম্প্রদায়ে সংস্কৃত ভাষা প্রচারের অভিপ্রায়েই বৌদ্ধাচার্য্যগণ ব্যাকরণ এবং কোষ এই দুই শ্রেণীর গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন। অমরসিংহও ব্যাকরণের বৃত্তি, টীকা এবং নাম লিঙ্গানুশাসন নামক কোষ রচনা করিয়া সংস্কৃত ভাষার পরিপুষ্টি সাধন করিয়াছেন, গৃহস্থের উপযোগী কাম্যকর্ম্মানুষ্ঠানের জন্য আগম শাস্ত্র-পর্য্যালোচনাপূর্ব্বকও গ্রন্থরচনা করিয়া গিয়াছেন।

হিন্দুগ্রন্থে যেমন সমস্ত দেবদেবীর উপর সর্ব্বনিয়ন্তা এক ঈশ্বরের অস্তিত্ব বর্ণনা দেখা যায়, বৌদ্ধগ্রন্থেও তেমনি ইন্দ্রচন্দ্রশক্রাদিবন্দিত-চরণ তথাগতের বর্ণনা দেখা যায়।

হিন্দুদিগের যেমন আশ্রমভেদ, জাতিভেদ, কর্ম্মানুসারে উচ্চাবচ বিবিধ যোনিতে জন্ম শাস্ত্রে বর্ণিত হইয়াছে, বৌদ্ধদিগেরও তেমনই দেখা যায়।

প্রসিদ্ধ বৌদ্ধগ্রন্থকারদিগের বর্ণনা হইতে হিন্দু দেবদেবীর প্রতি তাঁহাদের প্রগাঢ় ভক্তির পরিচয় পাওয়া যায়, এবং হিন্দুর পৌরাণিক বৃত্তান্তেও আস্থার নিদর্শন পাওয়া যায়। এমন কি, সমগ্র সুরনিকরের প্রতিও তথাগত-সেবকের প্রণতির অভাব নাই।

বৌদ্ধ বৈয়াকরণ গজপঞ্চানন পুরুষোত্তমদেব ত্রিকাণ্ডশেষ কোষের উপক্রমে যে নমস্কার-শ্লোক নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অর্থের প্রতি মনোনিবেশ করিলে তদানীন্তন বৌদ্ধেরও হিন্দুর দেবদেবীর প্রতি অনাদর অনুমিত হয় না। যথা,

"জয়ন্তি সন্তঃ কুশলং প্রজানাং
নমো মুনীন্দ্রায় সুরাঃ স্মৃতাঃ স্থ।
স্তুতাসি বাগ্দেবি দয়স্ব মাত
র্বিধেহি বিঘ্নাধিপ মঙ্গলানি॥"

ইহার অর্থ, সজ্জনের জয় এবং প্রজাবর্গের মঙ্গল হউক। মুনীন্দ্রের প্রতি নমস্কার, হে সুরগণ! তোমাদিগকে স্মরণ করিতেছি। মাতঃ বাগ্দেবি! তোমার স্তব করিয়াছি, দয়া কর। হে বিঘ্নাধিপ! (গণেশ!) মঙ্গলবিধান কর। গ্রন্থকার মুনীন্দ্র বুদ্ধকে নমস্কার করিয়াই বিরত হন নাই; কিন্তু অভীষ্টসিদ্ধি-কামনায় সমস্ত দেবতার স্মরণ, সরস্বতীর নিকট দয়াপ্রার্থনা এবং গণাধিপের নিকট মঙ্গল প্রার্থনা করিয়াছেন।

হারাবলী কোষের উপক্রমে উক্ত গ্রন্থকার হিন্দুর পরমারাধ্য গঙ্গাধরকে এবং সরস্বতীকে প্রণাম করিয়া গ্রন্থারম্ভ করিয়াছেন। যথা—

"ভুজগপতিবিমুক্ত-স্বচ্ছনির্ম্মোকবল্লী-
বিলসিত-মনুকুর্ব্বন্ যস্য গঙ্গাপ্রবাহঃ।
শিরসি সরসভাস্বন্মালতী-দাম-লক্ষ্মীং
লঘয়তি হিমগৌরঃ সোহস্তু বঃ সাধ্যসিদ্ধ্যৈ॥
কল্পাবসান-সময়ে হৃদয়ে কবীনাং
দেহান্তরং স্ফুরতি যা কিমপি প্রসন্না।
যস্যাঃ প্রসাদপরমাণুরপি প্রতিষ্ঠা-
মভ্যেতি কামপি নমামি সরস্বতীং তাম্॥"

প্রথম শ্লোকের অর্থ—যাঁহার মস্তকে হিমের মত শুভ্র গঙ্গাপ্রবাহ বাসুকিবিমুক্ত নির্ম্মল কঞ্চুকলতার ভঙ্গিমার অনুকরণ করতঃ মালতী-কুসুমমালার শোভাকে খর্ব্ব করিতেছে, সেই গঙ্গাধরদেব তোমাদের কার্য্য সিদ্ধিবিষয়ে সদয় হউন।

দ্বিতীয় শ্লোকের অর্থ—প্রলয়ের শেষ সময়ে অর্থাৎ সৃষ্টির উপক্রম সময়ে যিনি পণ্ডিতদিগের আনন্দানের জন্য অনির্ব্বচনীয় শব্দার্ণব সৃষ্টি করিয়া থাকেন, যাঁহার অনুগ্রহকণিকাও প্রতিভার কারণ হয়, সেই সরস্বতী দেবীকে প্রণাম করি।

উক্ত গ্রন্থকারই হারাবলীর উপসংহারে যে পদ্য নিবদ্ধ করিয়াছেন, তাহার অর্থ রহস্যপূর্ণ। শ্লোকটি এই—

"উপাস্য সর্ব্বজ্ঞ-মনন্তমীশং
ভূত্বার্তিথিঃ শ্রীধৃতিসিংহ-বাচাম্।
হারাবলী দ্বাদশমাসমাসে
বিনির্ম্মিতৈবং পুরুষোত্তমেন।"

সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত ঈশকে প্রণাম করিয়া ধৃতিসিংহ নামক গ্রন্থকারের বাক্যসমূহের অতিথি হইয়া, অর্থাৎ ধৃতিসিংহের গ্রন্থার্থ সম্যকরূপে অবগত হইয়া পুরুষোত্তম দ্বাদশ মাসে এই হারাবলী কোষ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। এই স্থলে ঈশ এই শব্দটি যদি সর্ব্বজ্ঞ শব্দবাচ্য বুদ্ধের বিশেষণ হয় তাহা হইলে বুঝিতে হয় যে, বুদ্ধ ঐশ্বর্য্যসম্পন্ন। কিন্তু এইরূপ অর্থ হইলে অনন্ত বিশেষণ সমঞ্জস হয় না। কারণ হিন্দুদিগের ব্রহ্মের মত বৌদ্ধাভিমত তথাগতের অনন্তত্ব প্রসিদ্ধ নহে। যদি সর্ব্বজ্ঞ অনন্ত ও ঈশ এই তিনটি বিশেষ্য পদ অভিপ্রেত হয়, তবে সর্ব্বজ্ঞ বুদ্ধ অনন্ত বিষ্ণু ও ঈশ শিব এইরূপ অর্থ সঙ্গত হয়। সুতরাং বৌদ্ধগ্রন্থকার বুদ্ধের ন্যায় বিষ্ণু এবং শিবকেও প্রণাম করিয়া গ্রন্থের উপসংহার করিয়াছেন।

পাণিনীয় ভাষাবৃত্তির উপক্রমে পুরুষোত্তম স্পষ্ট ভাষায় বুদ্ধকেই প্রণাম করিয়াছেন। বৈয়াকরণ বৌদ্ধ পুরুষোত্তম হইতে কোষকার পুরুষোত্তমের ভিন্নতা বোধেরও কোন কারণ নাই।

বৌদ্ধগ্রন্থপাঠে জানা যায় যে, "তথাগত" "তুষিত" লোক হইতে ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন। নানা যোনি ভ্রমণ করিতে করিতে তাঁহারা তথাগতত্বপ্রাপ্তির পূর্ব্বে "তুষিত" লোকে অবস্থান করেন, তথা হইতেই ধরাধামে অবতীর্ণ হইয়া তথাগতত্ব লাভ করেন। "তুষিত" লোকটি বৌদ্ধদিগের উদ্ভাবনাপ্রসূত বলিয়া মনে হয় না। কারণ "তুষিত"গণ হিন্দুদিগের পরিচিত গণদেবতার অন্তর্গত। অমরসিংহ আদিত্য প্রভৃতিকে গণদেবতা শ্রেণীতে নিবদ্ধ করিয়াছেন।

"আদিত্য-বিশ্ববসবস্তুষিতাভাস্বরানিলাঃ।
মহারাজিক-সাধ্যাশ্চ রুদ্রাশ্চ গণদেবতাঃ॥"

আদিত্য, বিশ্বদেব, বসু, তুষিত, আভাস্বর, অনিল, মহারাজিক, সাধ্য ও রুদ্র এই নয় প্রকার গণদেবতা। গণদেবতা শব্দের অর্থ দলবদ্ধ দেবতা। অর্থাৎ ইঁহাদের এক-একটি দলে নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কয়েকটি দেবতা আছেন। যথা—

"আদিত্যা দ্বাদশ প্রোক্তা বিশ্বেদেবা দশ স্মৃতাঃ।
বসবশ্চাষ্টসংখ্যাতা ষট্‌ত্রিংশত্তুষিতা মতাঃ॥
আভাস্বরাশ্চতুঃ ষষ্টি র্বাতাঃ পঞ্চাশদূনকাঃ।
মহারাজিকনামানো দ্বে শতে বিংশতিস্তথা॥
সাধ্যা দ্বাদশ বিখ্যাতা রুদ্রাশ্চৈকাদশ স্মৃতাঃ।"

ইহার অর্থ, আদিত্যগণের সংখ্যা দ্বাদশ, বিশ্বদেবের সংখ্যা দশ, বসুর সংখ্যা আট, তুষিতের সংখ্যা ছত্রিশ, আভাস্বরের সংখ্যা চৌষট্টি, বায়ুর সংখ্যা ঊনপঞ্চাশৎ, মহারাজিকের সংখ্যা দুই শত বিশ, সাধ্যের সংখ্যা বার এবং রুদ্রের সংখ্যা একাদশ।

তুষ্টার্থ তুষ্ ধাতুর পর ঔণাদিক কিতচ্ প্রত্যয় যোগে তুষিত শব্দ নিষ্পন্ন হইতে পারে। অথবা তুষ্ ধাতুর পর সম্পদাদিত্বে ভাববাচ্যে কিপ্ প্রত্যয় যোগে তুষ্ এই রূপ নিষ্পন্ন হইলে অনন্তর তদুত্তর তারকাদিত্বে ইতচ্ প্রত্যয় যোগেও "তুষিত" এইরূপ হইতে পারে। উভয় ব্যুৎপত্তিতেই তুষ্টিযুক্তরূপ অর্থের কোন প্রভেদ নাই। শব্দার্থ হইতে তুষিত লোকে সুখের প্রাচুর্য্য প্রতীয়মান হয়। তথাগতগণ তাদৃশ সুখময় স্থানে বাস করিয়াও বিবেক-বৈরাগ্য হইতে পরিভ্রষ্ট হন নাই; তাঁহাদের বৈরাগ্যে দৃঢ়তা প্রতিপাদনই তুষিত লোকে বাসকল্পনার মূল বলিয়া অনুমিত হয়। তাঁহারা সেখানে থাকিয়াও কর্ম্মস্থান ভারতে আসিয়া উৎকৃষ্ট যোনিতে উৎপত্তি লাভ করতঃ বুদ্ধিলাভের অভিলাষী হইয়া থাকেন।

ধরাধামে মনুষ্যরূপে উৎপত্তি বর্ণনায় হিন্দুর এবং বৌদ্ধের কতক বিষয়ে সাম্য এবং কতক বিষয়ে বৈষম্য দেখা যায়। ভগবান্ বিষ্ণুর দশটি অবতারের মধ্যে বামন হইতে কল্কি পর্য্যন্ত ছয়টি মনুষ্যরূপী। তন্মধ্যে দাশরথি রাম, বলরাম ও বুদ্ধ এই তিনটি ক্ষত্রিয়যোনিতে এবং বামন, পরশুরাম ও কল্কি এই তিনটি অবতার ব্রাহ্মণযোনিতে হইয়াছে। বৌদ্ধগ্রন্থেও লিখিত আছে যে, তথাগতগণ কখনও হীনবংশে জন্মগ্রহণ করেন না। কেবল ব্রাহ্মণবংশে অথবা ক্ষত্রিয়বংশেই জন্মগ্রহণ করিয়া থাকেন। সুতরাং বৌদ্ধমতে সর্ব্বজাতির সমান অধিকার স্বীকৃত হয় নাই; পরন্তু ব্রাহ্মণ-ক্ষত্রিয়েরই প্রাধান্য অভিমত হইয়াছে।

হিন্দুদিগের পরমারাধ্য গীতাগ্রন্থেও ভগবান্ স্পষ্ট ভাষায় অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন যে,

"মাং হি পার্থ ব্যপাশ্রিত্য যেঽপি স্যুঃ পাপযোনয়ঃ।
স্ত্রিয়ো বৈশ্যাস্তথা শূদ্রা-স্তেঽপি যান্তি পরাং গতিম্॥
কিং পুনর্ব্রাহ্মণাঃ পুণ্যা ভক্তা রাজর্ষয়স্তথা।

(৯৷৩২৷৩৩)

হে পার্থ! যাহারা পাপযোনি যেমন স্ত্রীলোক বৈশ্য ও শূদ্র, তাহারাও আমাকে আশ্রয় করিয়া উৎকৃষ্ট গতি প্রাপ্ত হয়, পবিত্র ব্রাহ্মণ এবং ভক্ত রাজর্ষিদিগের আর কথা কি?

প্রদর্শিত বিষয়ে হিন্দু-বৌদ্ধের সাম্যসত্ত্বেও কতক বিষয়ে বৌদ্ধদিগের অস্বাভাবিক গোঁড়ামীর পরিচয় পাওয়া যায়। হিন্দুর মনুষ্যরূপী অবতারগণ যোনিসম্ভব। কিন্তু তথাগত-ভক্তগণ অপবিত্র পথে বুদ্ধের নিঃসরণ বর্ণনা করা নিতান্ত অসঙ্গত মনে করিয়া জননীর পার্শ্ব বিদীর্ণ করিয়া জন্মগ্রহণ না করতঃ মহাপুরুষের পবিত্রতা রক্ষা করিয়াছেন।

পাছে পতির সহিত সংসর্গে মায়াজিন্‌ জননীর কাম-তৃপ্ততা প্রকাশ পায়, এই আশঙ্কায় বৌদ্ধগণ বুদ্ধজন্মের সপ্তাহ মধ্যে তদীয় মাতার দেহত্যাগ বর্ণনা করিয়াছেন। কিন্তু হিন্দুর অবতার-জননী পুত্রকে মানবরীতিতে প্রসব করিয়া প্রকৃত নিয়মে লালন-পালন করিয়াছেন। হিন্দুর গ্রন্থে এই স্বাভাবিক বর্ণনাই দেখা যায়।

ক্রমশঃ

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

ছায়ানট—তেতালা।

১ম গান।

ঝরর ঝরর ঝরর ঝরিছে বারি শতধারে
সারা নিশি আজি।
প্রিয়তম কোথা পরাণ চায় আকুল হে
ভয় বিদূরি এসো মম কাছে॥

২য় গান।

দুখের আঁধার ঘিরিয়া করিছে প্রাণ আকুলিত
জীবন নাথ হে।
তোমা ছাড়ি বল ছুটিয়া যাই কার পানে?
রাখ বিপদে তব চরণে হে॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

৩ ০ ১ + ৩
সা ন্‌্‌া সা রগরা। সা রা গমগা রা। গা মা গমধা পা I গা পা মা গা। রা ন্‌্‌া রা সা॥
ঝ র র ঝ•• র র ঝ•• র র ঝ রি•• ছে বা • রি শ ত ধা • রে
দু খে র আঁ•• ধা র ঘি•• রি য়া ক রি•• ছে প্রা • ণ আ কু লি • ত

০ ১ + ৩ ০
পা -া মধপপা -া। -া -া মপরা -া I -া -া গা -া। -া মগা -া মা। ধা পা -া -া।
সা • রা•• • • • •• • • • • • • • • • নি শি • •
জী • ব•• • • • •• • • • • • • • • ন না থ • •

১ +
পা গা মপা গমা I রগা ন্‌্‌া রা সা II
আ • •• •• •• • • জি
• • •• •• •• • • হে

০ ১ + ৩
পা পা ধা র্সা। র্সা র্সা -া র্সা I র্সা ধা না র্রর্সর্সা। -া নর্সা ধা পা।
প্রি য় ত • ম কো • থা প রা ণ চা•• • • • য়
তো মা ছা • ড়ি ব • ল ছু টি য়া যা•• • • • ই

০ ১ + ৩
পপা ধনা র্সা -ান। র্সা ধা ণধা পা I পা পা মা গা। মগা রা গা -া।
আ• •• • • কু ল •• হে ভ য় বি দূ রি• এ সো •
কা• •• • • র পা •• নে রা খ বি প দে• ত ব •

```
  ০                           ১                          +                    ৩
মগমা ধপপা গা মপা । গা মা রা নরসসা I -া -া -া -া । ন্সা রগা মপা মগা ।
 ••    •••   •   ••    •    •   ম   ম•••      •   •   •   •    কা•  ••   ••   ••
 ••    •••   •   ••    •    •   চ   র•••      •   •   •   •    লে•  ••   ••   ••

  ০                         ১                        +
রসা ন্সা রগা মপা । ধনা র্সরা র্সনা ধপা I মপা মগা রসা ন্সা IIII
 •  •  •  •  ছে•  ••    •  •  •  •  •  •  ••     ••  ••  ••  ••
 •  •  •  •  হে   ••    •  •  •  •  •  •  ••     ••  ••  ••  ••
```

১ম তান

```
  ০                        ১                          +
র্সর্সা ধপা মগা রসা । ন্সা রগা রগা মধা I পপা গমা রসা ন্সা ।
  আ•    ••   ••   ••     ••   ••   ••   ••     ••   ••   ••   ••
```

২য় তান

```
  ০                       ১
পপা ধধা পপা রসা । মধা পপা মগা রসা I র্সর্সা ধপা মগা রসা ।
 আ•  ••   ••   ••    ••   ••   ••   ••     ••    ••   ••   ••
```

৩য় তান

```
 +                     ৩                    ০                   ১                   +
পপা ধনা র্সরা -া । র্সর্সা র্সা ধা পা । ধপমা -া ক্ষপা রা । গা মা ধপপা গমা I রা সা -া -া ।
 বা•  ••  ••   •    রি শ ত  •  •     ধা•   •  •   •     •  •  •  •  •  •  •   •  বে  •  •
 প্রা•  ••  ••   •    ণ আ কু  •  •     লি•   •  •   •     •  •  •  •  •  •  •   •  ন্ত  •  •
```

অন্তরার ১ম তান

```
               +                      ৩
            I পপা ধনা র্সরা -া । নর্রা র্সরা র্সর্সা ধপা ।
প্রিয়তম কোথা     ••  ••  ••  •    ••  ••  ••  ••   প্রিয়তম কোথা পরাণ চায়
তোমা ছাড়ি বল     ••  ••  ••  •    ••  ••  ••  ••   তোমা ছাড়ি বল ইত্যাদি
```

অন্তরার ২য় তান

```
  ০              ১                  +                     ৩
পা পা ধা র্সা । র্সা র্সা -া র্সা I পপা ধনা র্সরা র্গর্মা । র্গরা র্সনা ধপা র্সা ।
প্রি য় ত •    য় কো • থা      ••  •••••••           •••••••       প্রিয়তম কোথা
তো মা ছা •    ড়ি ব • ল      ••  •••••••           •••••••       তোমা ছাড়ি বল
                                                  পরাণ চায় ইত্যাদি
                                                  ছুটিয়া যাই ইত্যাদি
```

দরবারী কানাড়া—ঝাঁপতাল।

তাঁহারে দেখ অন্তরে হে নর—
কাটায়ো নাকো বৃথা জগতে
জীবন ওরে মূঢ় জনের।
এই ভবসাগর পার হবে তাঁহারি নামে—
তিনি সেতু বিধরণ—গোচর ধ্যানের।

চরণে তাঁরি দাও চিত সঁপিয়া—
গাও সুন্দর পুণ্য নাম
চরণত সুরগণের—যুগে যুগে
অটল হৃদয়ে ধাও তাঁরি পানে
জয়গীত শতকণ্ঠে গাও মহেশের।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণীদেবী।

```
     ২´         ৩            ০             ১           ২´          ৩
রা II ণ্‌া সা । সা সা সা । জ্ঞা -জ্ঞা । মা -া পা । জ্ঞা জ্ঞা । মা রা সা ।
তাঁ   হা  রে    দে  খ  অ    ন্ত   •     রে • হে     ন   র     কা টা য়ো
```

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| রা -া | ণ্‌া সা রা | দ্‌া প্‌া | ণ্‌া সা সা | সা জ্ঞা | মা পা ণা |
না ০ কো ০ র্‌ ধা ০ জ গ তে জী ০ ব ন ও

২´ ৩ ০ ১
| জ্ঞা -া | মা রা সা | রা রা | সা -া II
রে ০ মৃ ০ ঢ় জ নে র্‌ ০

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II {মা পা | দা দা ণা | র্সা -া | র্সা র্সা র্সা | ণা র্সা | র্সাঃ ণঃ র্রা |
এ ই ভ ০ ব সা ০ গ র পা র হ বে ০ তাঁ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| ণা র্সা | দা ণা পা | } মা পা | জ্ঞা মা রা | মা পা | দা ণা র্সা |
হা রি না০ ০ মে তি ০ নি সে তু বি ০ ধ র ণ

২´ ৩ ০ ১
| ণা ণা | পা মা পণা | জ্ঞা মা | রা সা রা II
গো ০ চ র ০০ ধ্যা নে র্‌ ০ "তাঁ"

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
II মা মা | মা মা মা | পা -া | মা পা পা | পাঃ মঃ পা | ণা দা |
চ র ণে তাঁ রি ধা ০ ও চি ত্ত স ০ পি য়া ০

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| দা ণা | পা -া পা | মজ্ঞা মজ্ঞা | মা পা পা | মজ্ঞা মা | রা -া সা |
পা ০ ও ০ সু ন্দ০ ০০ র পু ণ্য ধা০ ০ ০ ০ ম

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
| ণ্‌া সা | রা পা মা | পঃ০ দ০ পা | জ্ঞা মা রা | {মা পা | ণদা ণদা ণা |
হৃ দ ল ভ সু র ০ গ০ পে ০ র যু গে যু০ গে০ অ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
| র্সা র্সা | র্রণা র্সা র্সা | র্সা -া | র্সা -া র্রা | ণা র্সা | ণদা ণা পা | }
ট ল হৃ০ দ য়ে ধা ০ ও ০ তাঁ হা রি পা০ ০ ন

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
| মা পা | পা জ্ঞা মা | পা ণদা | ণা র্রা র্সা | ণা ণা | পা মা পণা |
জ য় গী ত ০ প ০০ ভ ক ণ্ঠে গা ০ ও ম ০০

০ ১
| জ্ঞা মা | রা সা রা IIII
হে শে র্‌ ০ "তাঁ"

ঝিঁঝিট খাম্বাজ—একতালা।

জীবনে বর্ষ কত এল গেল জীবন ফুটিল না—
অন্ধ কামনা ভ্রান্ত বাসনা আজিও টুটিল না।
বেদনা-আঘাতে জয় জয় প্রাণ
গাহিল না তবু তব জয় গান
তনু মন ধন করি নিবেদন চরণে লুটিল না।
কবে যে ফুটিবে তুমিই জান তা'
হে আমার প্রিয় জীবন-দেবতা
আরো ব্যথা দাও স'ব আমি তাও কিছুতে টলিব না।
এক দিন তবু ওই তব পায়
ফুটে থাকি যেন অতুল শোভায়
এ মোর কামনা ব্যর্থ কর না— আঁধার ছুটিল না॥

কথা, সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল বি-এল্।

২´ ৩ ০ ১
II { মা ধা ধা | ধা -ণা ধা | পা ধা পা | মা গা মা I
জী ব নে ব ০ র্ষ ক ত এ ল গে ল

২´ ৩ ০ ১
I সা মা মা | মা পমা পা | পধা -া -া | -া -া -া} I
জী ব ন ফু টি০ ল না ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
I ধা -ণা ণধা | ধা ধা পা | ধা -র্সা র্সা | না র্সা র্সা I
অ ০ ন্ধ০ কা ম না ভ্রা ০ ন্ত বা স না

২´ ৩ ০ ১
I র্রা র্সা ণা | ধপা মা পা | পধা -া -া | -া -া -া II
আ জি ও টু০ টি ল না ০ ০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
II{ধা ণা ণধা | ধা ধা পা | ধা র্সা র্সা | র্রা র্রা -া I
বে দ না০ আ ঘা তে জ য় জ য় প্রা ণ্
ক বে যে০ ফু টি বে তু মি ই জা ন তা'
এ ক দি০ ন্ ত বু ও ই ত ব পা য়

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্মা র্মা | র্গা র্রা র্গর্রা | র্সা র্রা র্সা | ণা ধা -া}I
গা হি ল না ত বু০ ত ব জ য় গা ন্
হে আ মা র্ প্রি য়০ জী ব ন দে ব তা
ফু টে থা কে যে ন০ অ তু ল শো ভা য়

২´	৩	০	১
I{ধা র্সা র্সা |	না র্সা -া |	র্সা র্সা র্সা |	না র্সা -া I
ত স্থ ম	ন ধ ন্	ক রি' নি	বে দ ন
		[র্ঋা]	
আ বো বা	ধা দা ও	স বং আ	মি তা ও
		[সর্রা -র্সা র্সা |	র্সা না র্সা]
এ মো র্	কা ম না	বা০ ০ র্থ	ক র না

২´	৩	০	১
I র্রা র্সা ণা |	ধপা মা পা |	পক্ষা -া -া |	-া -া -া }II
চ র ণে	লু ০ টি ল	না ০ ০	০ ০ ০
কি ছু তে	ট ০ লি ব	না ০ ০	০ ০ ০
আঁ ধা র	ছু ০ টি ল	না ০ ০	০ ০ ০

নিভৃত-নিলয়ে।

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী)

আমাকে বিরক্ত কর কেন? আমার এই পবিত্র শান্তিময় কুটীরের উপর দিয়া তুমি প্রবাহিত হইয়া আমাকে ব্যতিব্যস্ত করিয়া তোল কেন? তোমার ভয়ে ত আমি পলাইয়া বেড়াইতেছি। তোমার যেখানে প্রাদুর্ভাব, তোমার যেখানে রাজ্য, সে স্থান ত আমি পরিত্যাগ করিয়া এই নিভৃত নিলয়ে আসিয়া বাস করিতেছি, এখানে আমার প্রাণের বন্ধুর জন্য আসন পাতিয়াছি, বন্ধু আমার এই আসনে বসিয়া আমাকে কতই আনন্দ দেন, কত প্রাণের কথা কন, আমাকে কত সুখে রাখেন; তুমি কেন আমার এ আনন্দে বাধা দেও? কেন আমার এ শান্তি ভঙ্গ কর? তোমার প্রলোভনে একদিন পড়িয়াছিলাম সত্য; একদিন তোমাকেই বড় আপন মনে করিয়াছিলাম। মনে করিয়াছিলাম, এ জগতে যাহা কিছু, তাহা তুমিই। তুমিই আমাকে চিরসুখে সুখী করিয়া রাখিবে। কৈ তা ত তুমি পার নাই? তুমি ত আমাকে মধুর বাক্যে ভুলাইয়া কণ্টকপূর্ণ পথে লইয়া গিয়াছিলে, অমৃতের প্রলোভন দেখাইয়া বিষবারি পান করাইয়াছিলে, শান্তির সুধা দিবে বলিয়া দুশ্চিন্তার দারুণ দাবানলে নিক্ষেপ করিয়াছিলে। নৈরাশ্যের দীর্ঘনিশ্বাস, অভিমানের তাড়না, মানের মত্ততা, উচ্চাভিলাষের ছটফটানি, অহঙ্কারের উন্মত্ততা, বিলাসিতার উচ্ছৃঙ্খলতা, দ্বেষ-হিংসার পৈশাচিকতা, স্বার্থের ক্ষুদ্রাশয়তা প্রভৃতি নরনারী কোথা হইতে পায়? এই সকল ত তোমারই দেওয়া জিনিষ—তোমারই পদসেবার ফল! তুমি মানুষকে ধনী, মানী, পদস্থ, ঐশ্বর্য্যশালী—এই সব সমস্তই করিতে পার সত্য; কিন্তু তোমার সেবক কদাচ শান্তির সুবাতাস সেবন করিয়া পরম আনন্দে অতিবাহিত করিতে পারে না। শান্তি তোমাকে দেখিলে ভয়ে পলাইয়া যায়, তোমার ত্রিসীমানায় যায় না। শান্তির আশা করিয়া তোমাকে যে আলিঙ্গন করে সে বঞ্চিত হয়। তুমি জগতের অনেক কার্য্য সাধন কর; ইহা সত্য। ঐসকল কার্য্য সাধনের জন্য তোমার প্রয়োজনও আছে, তোমার আশ্রয়গ্রহণও করিতে হয়। যে তোমাতে না মজিয়া তোমাকে অবলম্বন করিয়া কার্য্য সাধন করিতে পারে, সে বঞ্চিত হয় না। সে পরিণামে এই শান্তিপূর্ণ কুটীরেও আসিতে পারে। কিন্তু যে তোমাতে মজিয়াছে, তাহার পক্ষে এই শান্তিময় কুটীর অতি দুর্ল্লভ! নির্লিপ্ত হইয়া তোমাকে সেবা করা বড়ই কঠিন। সকলে পারে না। যিনি পারেন, তিনি মহান্, তিনি জগতে ধন্য! এই মহত্তের সংখ্যা জগতে দুচারিটি। সেই শিক্ষা চাই, পদ্মপত্রের মত হওয়া চাই, জল উপরে ভাসিবে, কিন্তু ভিজিবে না। এই শিক্ষা প্রাচীন ঋষিগণ জগৎকে দিয়াছিলেন। তাহা লোপ পাইয়া গিয়াছে, তাই আমাদের এই দুর্দ্দশা, আর তোমার এত দৌরাত্ম্য। তোমার দৌরাত্ম্যের হাত হইতে মুক্তি পাইবার জন্যই আজ আমি এই নিভৃত নিলয় আশ্রয় করিয়াছি। এখানেও তোমার হাওয়া বহে কেন? এখানে তোমার সেই উত্তেজনাকারী বৈদ্যুতিক প্রবাহ ছুটে কেন? আর ত তোমাকে আমি চাই না। কতকগুলি কার্য্য সাধনের জন্য তোমার আশ্রয় লইয়াছিলাম। সে কার্য্যগুলি হইয়া গিয়াছে। তোমার আশ্রয় আর আমার চাই না। তবুও

তুমি আইস কেন? কে তোমাকে ডাকিতেছে? আমি ত ডাকিতেছি না। তুমি এমনি জিনিষ যে একবার যদি কাহাকেও পাও, জীবনে আর তাহাকে ছাড়িতে চাও না। সেই অভিলাষগুলি, যাহার জন্য তোমার আশ্রয় লইয়াছিলাম, সেগুলি আর নাই, কিন্তু তুমি আছ। সেই শক্তি, যাহা দ্বারা তোমাকে চালাইয়াছিলাম, সে শক্তি আর নাই, কিন্তু তুমি আছ। সেই ইচ্ছা, সেই প্রবৃত্তি, সেই সঙ্কল্প, সেই উদ্দেশ্য—কিছুই নাই, সবই আমাকে ছাড়িয়াছে, কেবল তুমিই ছাড় নাই। কখনও বা পুরাতন কর্ম্মের স্মৃতিগুলি লইয়া আসিয়া আমার নিভৃত নিলয়ে শান্তির বাধা জন্মাও। কখনও বা গতজীবনের খেইহারা ভাবগুলিকে একটার পর একটাকে এলোমেলো ভাবে আমার মানসপটে অঙ্কিত করিয়া দিয়া আমার শান্তির স্রোতকে উল্টা দিকে বহাও, আবার কখনও বা অনাবশ্যক ও অস্বাভাবিক কল্পনা মনের মধ্যে আনিয়া কিছু কালের জন্য আমাকে বিচলিত করিয়া ফেল। এসব অত্যাচার কেন? তোমার রাজ্যে ত আর আসি নাই, তবে তোমার শাসন কেন? সাবধান হইয়া কাজলের ঘরে না ঢুকিলে গায়ে কালি লাগে, হাতে তেল মাখিয়া কাঁঠাল না ভাঙ্গিলে কাঁঠালের আঠা হাতে লাগিয়া থাকে, সাধুগণ ইহা বলিয়া গিয়াছেন। তোমার ঘরে ঢুকিতে হইলেও খুব সাবধানে ঢুকিতে হয়, তোমার কালি যেন গায়ে না লাগে। তাহাই করিতে পারি নাই, তাই আজ তোমার এত অত্যাচার। যে পারিয়াছে তাহার পিছু পিছু কি তুমি এই ভাবে আসিতে পার? ঐ দেখ না রাজা জনক ও তাঁহারই পন্থানুসারী কত কত রাজর্ষি মহর্ষিগণের পবিত্র আত্মা বসিয়া রহিয়াছে। সেখানে কি তুমি যাইতে সাহস কর? একদিন তাঁহারা তোমাকে কার্য্যসিদ্ধির জন্য হাতের অস্ত্র করিয়াছিলেন। আমারই উপর তোমার অত্যাচার! কেন না আমি সাবধান নই, গায়ে কালি লাগাইয়া ফেলিয়াছিলাম, একদিন তোমাতে মজিয়াছিলাম।

তুমি কে তাহা বলিয়া দিতে হইবে না। তোমাকে সকলেই চেনে। তুমি দুর্ব্বলের বল, জগতের হিতকারী, স্বয়ং ভগবানের হাতের অস্ত্র; তুমি ছাড়া জগত চলে না, কিন্তু তোমাকে যে সাবধানে ব্যবহার করিতে পারে না—সে নিজের হাতের অস্ত্রে নিজে কাটা যায়। কার্য্যক্ষেত্রে তুমি, অসাধ্যসাধনে তুমি, পাপীর বিনাশে তুমি, ধর্ম্মের সংস্থাপনে তুমি; কিন্তু আত্মার শান্তিদাতা তুমি নও, আত্মার আরাম তোমা হইতে হয় না। আত্মার আরাম এই নিভৃত-কুটীরে। এখানে যদি তুমি অনধিকারপ্রবেশ না কর, তবে পরম আনন্দ পরম শান্তি পরম সুখ। তোমাতে লিপ্ত না হইলে তুমি এখানে আসিতে পার না। তোমাকে লইয়া কার্য্য সাধন করিব, কিন্তু তোমাতে মজিব না, এই যে করিতে পারে সে এই নিভৃত-নিলয়ের পরম সুখশান্তি উপভোগ করিতে পারে।

সাবধান! গায়ে কালি লাগাইও না। উহাকে লইয়া সংসারে কার্য্য করিবে, কিন্তু উহাতে মজিবে না। কার্য্য শেষ হইয়া গেলে উহাকে ছাড়িয়া এই নিভৃত নিলয়ে আসিয়া বিশ্রাম করিবে। আমি গায়ে কালি লাগাইয়াছিলাম, উহার সঙ্গে একটা সম্বন্ধ স্থাপন করিয়াছিলাম, তাই সে মাঝে মাঝে আসিয়া আমার এই নিভৃত নিলয়ের নিভৃতত্ব নষ্ট করিতেছে। শান্তি মাঝে মাঝে পাইতেছি, আবার তাহার জ্বালায় শান্তিভঙ্গ হইতেছে। সাবধান! নির্লিপ্ততা, নিষ্কাম ভাব অবলম্বন কর, তবেই পরিণামে শান্তি, নচেৎ নয়।

আদিশূরের ঐতিহাসিকতা।

(শ্রীনৃসিংহদেব বন্দ্যোপাধ্যায়)

যাঁহারা বলেন,—আদিশূর ঐতিহাসিক ব্যক্তি নহেন, তাঁহাদের কথা সত্য বলিয়া স্বীকার করা যায় না। তাঁহাদের এ ধারণা সম্পূর্ণই ভ্রমাত্মক। আদিশূর নিশ্চিতই একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। বাঙ্গালার ইতিহাসের অনেকগুলি পৃষ্ঠা আদিশূরের কথায় পূর্ণ থাকিবার বিষয়। তিনি একজন ক্ষুদ্র রাজা ত ছিলেন না। অথচ এই রাঢ় ও গৌড়বিজয়ী অসাধারণ আদিশূরের সত্তা কেন যে ঐতিহাসিকগণ খুঁজিয়া পাইতেছেন না, তাহা বুঝা যায় না।

আদিশূর এই বাঙ্গালা দেশের একজন মহাপরাক্রমশালী স্বাধীন হিন্দু নরপতি ছিলেন। যে সময় বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে বাঙ্গালা তথা সমগ্র ভারতই ভাসিয়া চলিয়াছিল; এই বঙ্গেশ্বর আদিশূর সে সময়কার সেই বৌদ্ধধর্ম্মের প্রবল প্লাবনে ভাসমান বাঙ্গালাকে ফিরাইয়া বর্ণাশ্রম ধর্ম্মের কূলে তুলিয়া দিয়াছিলেন এবং ব্রাহ্মণ্যের প্রদীপ্ত আলোকশিখা তাঁহারই প্রভাবে ও প্রচেষ্টায় আবার নবভাবে জ্বলিয়া উঠিয়াছিল। বাঙ্গালায় যে সময়ে বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ও ব্রাহ্মণসমাজের অধোগতি দেখিয়া তিনি যে কান্যকুব্জ হইতে পঞ্চ সাগ্নিক ব্রাহ্মণ আনাইয়া বর্ণাশ্রমধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুসমাজের সংস্কারসাধন করিয়াছিলেন, তাহা ত সকলেই জানেন। আজ এই সকল কথা কেমন করিয়া অস্বীকার করা চলিবে তাহা আমরা বুঝিতে পারিতেছি না। বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণ সকলেই যে আদিশূরের আনীত সেই কান্যকুব্জাগত পঞ্চব্রাহ্মণেরই বংশসম্ভূত। তা' ছাড়া সেই পঞ্চ ব্রাহ্মণের সহিত যে পাঁচজন কায়স্থ আসিয়াছিলেন, তাঁহা-

দেরই বংশধর বলিয়া পরিচয় দেন যে, বাঙ্গালার বর্ত্তমান উচ্চবংশীয় কায়স্থগণও সকলেই। আজ আদিশূরের ঐতিহাসিকতা অস্বীকার করিলে বাঙ্গালার বর্ত্তমান এই সমাজ, সামাজিকতা, বর্ণাশ্রম, ব্রাহ্মণ্যধর্ম্ম সবই যে অস্বীকার করিতে হয়—সমস্তই যে ওলট-পালট হইয়া যায়। বাঙ্গালার ইতিহাসটাকে যে তাহা হইলে সম্পূর্ণ নূতনভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইতে হয়! কিন্তু তাহাই কি বাঙ্গালার যথার্থ ইতিহাস হইবে?
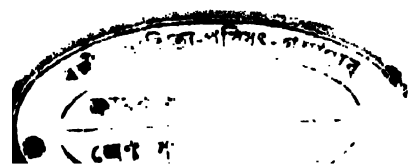
তাহা কখনই হইতে পারে না। আদিশূর বাস্তবিকই একজন চিরস্মরণীয় ঐতিহাসিক ব্যক্তি। আদিশূরের ঐতিহাসিকতা বাঙ্গালার ইতিহাসের একটা দিকের ভিত্তি। সে ভিত্তি উড়াইয়া দিয়া বাঙ্গালার ইতিহাস খাড়া করিতে গেলে সে ইতিহাস অসম্পূর্ণই থাকিয়া যাইবে। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সামাজিকতার পূর্ব্ব ইতিহাসটী তাহা হইলে সত্য হইবে না। বাঙ্গালার বর্ত্তমান সমাজগঠন ও সামাজিক পদ্ধতি, বর্ণাশ্রমধর্ম্ম ও ব্রাহ্মণ্য প্রভৃতি যেগুলি এখনও বাঙ্গালার বৈশিষ্ট্যের পরিচয় প্রদান করিয়া থাকে, আদিশূরের ঐতিহাসিকতা না মানিলে, এগুলির মধ্যে সত্যতা ও সারত্ব থাকিবে না। তবে কেমন করিয়া বলিব, তাহা বাঙ্গালার যথার্থ ইতিহাস? আদিশূরের ঐতিহাসিকতার সঙ্গে বাঙ্গালার বর্ত্তমান রাঢ়ী ব্রাহ্মণগণের ঐতিহাসিকতা অঙ্গাঙ্গীভাবে জড়িত। সে যুগের সেই হিন্দু নরপতি আদিশূরের প্রবর্ত্তিত নীতির উপরই এখনও বাঙ্গালার বর্ত্তমান বর্ণাশ্রমধর্ম্ম দাঁড়াইয়া রহিয়াছে।

সে যাহা হউক, আদিশূরের ঐতিহাসিকতা কেহ কেহ স্বীকার করেন না বলিয়া কি সকলেই করেন না? Vincent Smith বলেন,—পালরাজগণের অভ্যুদয়ের পূর্ব্বে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে আদিশূর নামক একজন ক্ষুদ্র রাজা থাকিতেও পারেন।

মহামহোপাধ্যায় শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় বলেন,—"দক্ষিণ রাঢ়ের বর্দ্ধমানবিভাগবাসী রণশূর বাঙ্গালায় শূরবংশের একজন রাজা ছিলেন। তিনি পঞ্চ ব্রাহ্মণ আনয়ন করিয়াছিলেন। ইঁহাদের রাজ্য পালরাজগণ কাড়িয়া লইয়াছিলেন। কাঞ্চীরাজ রাজেন্দ্র চৌলকে বাঙ্গালা দেশ হইতে বিতাড়ন করিবার চেষ্টায় এই রণশূর রাজা মহীপালকে ১০২৩ খৃষ্টাব্দে অনেক সহায়তা করিয়াছিলেন।"

ইহা হইতে আমরা দুইজন আদিশূরের সন্ধান পাইতেছি। একজনের রাজধানী গৌড়ে, অপর জনের রাজধানী রাঢ়ে। অথচ রাঢ় ও বারেন্দ্র শ্রেণীর ব্রাহ্মণগণ বলেন,—আমরা সেই এক পঞ্চ ব্রাহ্মণেরই বংশধর। অথচ রাঢ়ী ও বারেন্দ্রশ্রেণীর ব্রাহ্মণগণের উপাধি বর্ত্তমানে ভিন্ন ভিন্ন দেখিতে পাই এবং বেদও উভয়ের এক নহে। যাউক, ইহা লইয়া বহু বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। সে সকল কথার উল্লেখ এস্থলে আবশ্যক নাই। রাঢ়ভূমে যে একজন আদিশূর ছিলেন, সেই আদিশূরই আমাদের আলোচ্য বিষয়।

Vincent Smith যে ভাবে গৌড়ের নিকটবর্ত্তী স্থানে একজন আদিশূরের পরিচয় দিতেছেন, তাহাতে ঐস্থানে কোনও আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে সন্দেহের একটু অবকাশ থাকিলেও মহামহোপাধ্যায় শাস্ত্রী মহাশয়ের বর্ণিত দক্ষিণরাঢ়ে আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে নিঃসন্দেহ হওয়া যায়। ঘটকদের কুলগ্রন্থেও উল্লিখিত আছে যে, আদিশূরের সৈনিকগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন।

এই সকল কথার সহিত স্থানীয় জনপ্রবাদাদি মিলাইয়া এখন আমরা আদিশূরের ঐতিহাসিকতা কতদূর নির্ণয় করিতে পারি তাহাই দেখিব। দক্ষিণরাঢ়ের বর্দ্ধমান জেলায় আদিশূরের অস্তিত্ব সম্বন্ধে আমরা যে সকল প্রমাণাদি সংগ্রহ করিয়াছি, তাহাই প্রকাশ করিতেছি। ইতঃপূর্ব্বে এই সম্বন্ধে যে সকল প্রবন্ধাদি বিভিন্ন সাময়িক পত্রে প্রকাশিত হইয়াছে, এস্থলে আর সে সব কথা না বলিয়া বর্ত্তমানে আরও কিছু নূতন কথা প্রমাণ স্বরূপ উল্লেখ করিয়া আমরা আদিশূরের অস্তিত্ব প্রতিপন্ন করিতে চেষ্টা করিব। আমাদের অনুসন্ধানের ফলে যে সকল প্রমাণাদি সংগৃহীত হইয়াছে, নিম্নে তাহারই কয়েকটী প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলাম।

১। আদিশূরের সৈনিকগণ সপ্তশতী ব্রাহ্মণ ছিলেন এবং এই সপ্তশতী ব্রাহ্মণপ্রধান স্থান হইতেই তাঁহার অন্যান্য সৈনিকগণও নিয়োজিত হইত। এখনও আমরা দেখিতে পাইতেছি, বর্দ্ধমান জেলায় অনেক স্থানই, বিশেষতঃ যে অংশে আদিশূরের রাজধানী ছিল, সেই অংশ সপ্তশতী বা সাতশইয়া পরগণার অন্তর্গত। এখন ইংরাজ আমলে সাতশইয়া পরগণার আয়তন ক্ষুদ্র হইয়া গিয়াছে। নতুবা পূর্ব্বে এই সাতশইয়া পরগণা বোলপুর হইতে পূর্ব্বদিকে ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল। প্রবাদ এইরূপ যে, তাহারও অনেক পূর্ব্বে সমগ্র রাঢ়দেশই ছিল এই সাতশইয়া পরগণা।

তাহা অসম্ভব নহে। কারণ মুসলমান-আমলে বাঙ্গালাদেশ নব নব পরগণায় বিভক্ত হইলেও সাতশইয়া পরগণা ইহার অনেক পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এ পরগণা হিন্দু আমলের। হিন্দুযুগ হইতে মুসলমানরাজত্বে এবং তাহা হইতে ইংরাজ আমলে আসিয়া বাঙ্গালাদেশের আয়তনও যেমন কমিয়া গিয়াছে, সাতশইয়া পরগণারও আয়তন ক্রমশঃ সেইরূপে হ্রাস হইয়া গিয়াছে।

২। বর্দ্ধমান জেলার মধ্যে বর্ত্তমানে আমরা যে

"উগ্রক্ষত্রিয়" নামক একটী বিশেষ প্রভাবশালী সম্প্রদায় দেখিতে পাইতেছি, মনে হয় ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ সে যুগে আদিশূরের সৈনিকবিভাগে নিয়োজিত হইতেন। এইরূপ প্রবাদও আছে এবং বর্দ্ধমান জেলায় এই উগ্র-ক্ষত্রিয়-সমাজের প্রভাব, প্রতিপত্তি ও প্রতিষ্ঠা দেখিয়া স্বতঃই মনে হয় যে, ইহারা পূর্ব্বে এইরূপ একটা কিছু ছিলেন। এখনও সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে শতকরা ৭৭'৫ জন কি তাহারও বেশী উগ্রক্ষত্রিয় এক বর্দ্ধমান জেলায় বাস করে। এ জেলায় এই সুপ্রতিষ্ঠ সম্প্রদায়টী সমগ্র বাঙ্গালার মধ্যে বর্দ্ধমান জেলায় যে একটি স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করিতেছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

৩। সাতশহরা পরগণার জমিদারগণ পূর্ব্বে ব্রাহ্মণ ছিলেন। নবাবী আমল হইতে তাঁহারা মুসলমান হইয়াছেন। ইঁহাদের বাসস্থান সমুদ্রগড়। ইঁহাদিগকে এখনও সমুদ্রগড়ের রাজা বলে। সমুদ্রগড়ের ঠাকুর নামেও ইঁহারা অভিহিত হইয়া থাকেন। এখনও ইঁহারা একটী কারিয়া ব্রাহ্মণ নাম ধারণ করেন। ঐ বংশের সকলেরই নাকি একটী হিন্দু এবং একটী মুসলমানী নাম থাকে। বর্ত্তমান জমিদারের হিন্দুনাম কেশবলাল ঠাকুর ও মুসলমানী নাম ইয়াসিন খাঁ।

৪। বর্ত্তমান মুট্রা গ্রামে অন্ততঃ ২০০০ হাজার গজ লম্বা এবং ৬০ গজ চওড়া আদিশূরের রাজপ্রাসাদের যে ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, তাহার ইটগুলি পুরু, চৌকোণা টালির ন্যায় এবং ঠিক যেন পাথরের মত কঠিন। ইটগুলি আকারেও খুব বৃহৎ। এরূপ ইট সচরাচর অন্য কুত্রাপি দৃষ্ট হয় না। তবে মুর্শিদাবাদ জেলার রাজা শশাঙ্কের কাণসোণার ধ্বংসাবশেষের ইটগুলির সহিত এই ইটের মিল হয়। কিন্তু এই ধরণের ইট বাঙ্গালাদেশের আর কোথাও পাওয়া গিয়াছে বলিয়া শুনি নাই। অথচ ঐ ইট বর্ত্তমানে কাইগ্রামে অবস্থিত আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বরাহগোপালদেবের মন্দিরে এবং তৎসংলগ্ন প্রাচীরাদিতেই দেখা যাইত। এখন আবার অনুসন্ধানের ফলে কাইগ্রামের অনেক স্থানেই মৃত্তিকার ভিতর হইতে এই ধরণের ইষ্টকময় ভিত্তি বাহির হইয়া পড়িতেছে।

৫। যে গ্রামে আদিশূরদুর্গের ভিত্তি আবিষ্কৃত হইয়াছে, সেই গ্রামটীর বর্ত্তমান নাম মুট্রা। কিন্তু কিছুদিন আগেও সকলে বলিত—শূড়রো। এখনও অনেকে বিশেষতঃ প্রাচীন লোক মাত্রেই তাহাই বলিয়া থাকেন। তৎপূর্ব্বে ছিল শূরো। প্রাচীন দলীলাদিতে কুত্রাপি মুট্রা নাম নাই। শূঁরা বা শূরো এইরূপ নামই পাওয়া যায়। এই ধ্বংসাবশিষ্ট দুর্গের সন্নিকটেই যে প্রকাণ্ড দীর্ঘিকার চিহ্ন এখনও রহিয়াছে, সেটী আদিশূরের দীঘি বলিয়া এখনও প্রবাদ। এই দীঘির অনতিদূরে এবং বর্ত্তমান মুট্রা গ্রামের নিম্ন দিয়া যে খড়েশ্বরী বা খড়ী নদী প্রবাহিত হইতেছে, সে নদীর অস্তিত্ব যে পূর্ব্বে ছিল না, সে কথা স্থানান্তরে প্রকাশিত প্রবন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি। এ কথার আরও একটী প্রমাণ পাইয়াছি। কিছুদিন আগে এই মুট্রা গ্রামের খুব একখানি প্রাচীন নক্সা জনৈক গৃহস্থের কুটীরে পাওয়া গিয়াছিল। তাহাতে এই নদীর কোনও পরিচয় বা চিহ্ন মাত্র ছিল না। মুট্রা গ্রামের অনেক প্রাচীন ব্যক্তিই বলিলেন,—সেই নক্সায় নদীর চিহ্ন না থাকায় প্রথমতঃ সকলেই বিস্মিত হইয়াছিলেন এবং তাঁহারা সেই প্রাচীন নক্সাখানি দেখিয়া বর্ত্তমান গ্রামটীর সম্বন্ধে কিছুই স্থির করিতে পারেন নাই।

৬। আদিশূরের দুর্গের ভগ্নাবশেষ অনুসন্ধানের ফলে এখানে কয়েকটী রৌপ্যমুদ্রা পাওয়া যায় এবং তৎসহ যে একটী ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি এবং একটী স্বর্ণমুদ্রা পাওয়া যায়, তাহারই কথা বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। স্বর্ণমুদ্রাটীর আকার অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র—একটী শুট্কে পয়সার মত। অনেকটা পুরু। খাঁটি সোণায় নির্ম্মিত। মুদ্রাটীর একদিকে একটী বীরপুরুষ অস্ত্রশস্ত্রে সুসজ্জিত হইয়া বিভঙ্গঠামে দণ্ডায়মান। মস্তকে শিরস্ত্রাণ। কতকাল পূর্ব্বে ক্ষোদিত এই মূর্ত্তি! তবু সে মূর্ত্তির মুখখানি এখনও কত উজ্জ্বল—কত যেন দীপ্ত হইয়া রহিয়াছে! মুদ্রার অপর পৃষ্ঠে দুর্গাপ্রতিমার চালচিত্র অঙ্কিত। এই বহুদিনের পুরাতন মুদ্রার চাকচিক্য এখনও নষ্ট হয় নাই। অনেকে অনুমান করেন, এই শিল্পনৈপুণ্য গুপ্তযুগের শিল্পধারার অনুরূপ।

কাইগ্রামের একটী নিষ্ঠাবান্ সদ্ব্রাহ্মণের গৃহে এই মুদ্রা দৃষ্ট হইয়াছে। এই ব্রাহ্মণপরিবারে মুদ্রাটী দেবতা-রূপে সম্পূজিত হইয়া থাকেন। এই মুদ্রাটী কিছুদিন পূর্ব্বে একজন দরিদ্র ব্যক্তি আদিশূর-দুর্গের সীমার মধ্যেই হউক বা সীমার বাহিরেই হউক, এইরূপ কোন এক স্থানে পাইয়া বিক্রয় করিতে চাহিলে এই পরিবারস্থ একান্ত স্বধর্ম্মানুরাগী ও পরম ভক্তিমান্ পুরুষ স্বর্গীয় হরিদাস চক্রবর্ত্তী মহাশয় তাহার নিকট ক্রয় করিয়া রাখিয়া দিয়াছেন এবং তাঁহারই নির্দ্দেশমত তদবধি এই ভাবে মুদ্রাটীর পূজা হইয়া আসিতেছে।

৭। আদিশূরের প্রতিষ্ঠিত বরাহগোপালদেবের মন্দিরে "অনন্ত বাসুদেব" নামক আর একটী দেববিগ্রহ স্থাপিত রহিয়াছেন। বরাহগোপালদেবের সহিত সেটীরও নিত্য পূজা হইয়া থাকে। আমরা বিশেষ প্রণিধান করিয়া দেখিয়াছি—সেই অনন্ত বাসুদেবের একাংশে খোদিত অপর একটী প্রতিমূর্ত্তি এবং মুট্রা হইতে সংগৃহীত ভগ্ন প্রস্তরমূর্ত্তি, এই দুটীই একরূপ এবং এই দুটী মূর্ত্তির সহিত

পূর্ব্বোল্লিখিত ঐ স্বর্ণমুদ্রায় খোদিত মূর্ত্তিটীরও সম্পূর্ণ সাদৃশ্য রহিয়াছে।

এই সকল বিষয় এবং আরও অনেক বিষয় দেখিয়া শুনিয়া এই স্থানই যে আদিশূরের রাজধানীর অন্তর্ভুক্ত তাহাতে আর সন্দেহ থাকে না। ইতঃপূর্ব্বে এসম্বন্ধে আরও অনেক কথা সাধারণ্যে প্রকাশিত হইয়াছে। আমরা অনুসন্ধানে ব্যাপৃত আছি। পরে আরও প্রকাশের ইচ্ছা রহিল। আরও একটী কথা এইখানে বলিয়া রাখি। কয়েকদিন পূর্ব্বে সুট্‌রা গ্রামে মৃত্তিকাখননকালে ভূগর্ভ হইতে একখানি পাথরের চৌকী পাওয়া গিয়াছে। প্রস্তরটী লালবর্ণ এবং খুবই দীপ্তিময়। আদিশূরের দুর্গের পার্শ্বেই ইহা পাওয়া গিয়াছে। কয়েকটী রৌপ্যমুদ্রাও এইসঙ্গে বাহির হইয়াছে।

সঙ্গীতের মূর্ত্তি ও সার্থকতা।

(শ্রীবাণী দেবী)

ভগবান আমাদের শরীরের এক একটি অংশে এক এক প্রকার অনুভূতি লাভের শক্তি দিয়াছেন—ত্বকের এক প্রকার অনুভূতি, অস্থির একপ্রকার, মাংসপেশীর বা সংক্ষেপে পেশীর এক প্রকার। এই পেশীর অনুভূতি হইতেই সম্ভবতঃ তালের সৃষ্টি হইয়াছে। পেশীগুলি, দেখা যায়, অনেক সময়ে নির্দ্দিষ্ট কালবিভাগ বা Interval অনুসারে চলিতে ফিরিতে ও কার্য্য করিতে ভালবাসে। এই কালবিভাগকেই সঙ্গীতশাস্ত্রে মাত্রা বলে। অনেক স্থলেই পেশীগুলিকে কয়েকমাত্রা চলিয়া যেন প্রথম মাত্রাতেই ফিরিয়া আসিবার জন্য উন্মুখ হইতে দেখা যায়। ইহাই সম্ বা ঝোঁকের উৎপত্তির কারণ বলিয়া মনে হয়। মানুষ যখন চলে তখন তাহার পা তালে তালে পড়িতে চায়; একটি শিশু যখন নাচে, তখন সেও তালে তালে পা ফেলিতে ভালবাসে। এইরূপ তালে তালে চলিবার ইচ্ছাতে মাংসপেশী সাড়া দেওয়াতেই পেশীর অনুভূতির পরিচয় পাওয়া যায়। ঐরূপ নির্দ্দিষ্ট মাত্রায় পেশীর সাড়া দিবার কারণেই সুসঙ্গত সঙ্গীত অর্থাৎ তালনিবদ্ধ সঙ্গীত আমাদের ভাল লাগে—বেতালা সঙ্গীত কর্ণে খাপছাড়া লাগে। ঐ সাড়া দিবার ফলেই সঙ্গীত অনেক পরিমাণে সাফল্য লাভ করে। এই প্রকারে বিশেষভাবে সঙ্গীতের দ্বারা শ্রবণেন্দ্রিয় ও চালক (motor) কর্ম্মেন্দ্রিয় উভয়ের পরস্পরের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠতম যোগ সংস্থাপিত হয়। আমাদের স্নায়ুপ্রণালী যখন বিকল হইয়া যায়, তখন বিভিন্ন কর্ম্মেন্দ্রিয়ের পরিচালনায় উহাদের পরস্পরের সহকারিতায় স্বাভাবিকত্ব সহজে উপলব্ধ হয়।

অনেক সময় দেখা যায় যে, ছোট ছোট ছেলেমেয়ে কাজকর্ম্ম করিতে চাহিতেছে না। কিন্তু সেই সময় তাহাদের হৃদয় যাহা সহজে ধরিতে পারে এবং যাহার সঙ্গে সাড়া দিতে পারে, এ প্রকার তালের সঙ্গে কোন গান গাওয়া হউক বা বাজনা বাজানো হোক, তখনই তাহারা নাচিয়া গাহিয়া ও গানের তালের সঙ্গে তালি দিয়া বিবিধ উপায়ে আনন্দ প্রকাশ করিতে থাকিবে। ধ্রুপদের গুরুগম্ভীর তালের গান গাও, আমাদের মনের ভাবও উহার সঙ্গে গুরুগম্ভীরভাবে চলিতে থাকিবে। আবার ঠুংরী খেমটা প্রভৃতি দ্রুতগতি চুটকি তালের গান গাও, তখন আমাদের মনও তাহারই সঙ্গে ক্ষুদ্র তরঙ্গের মত নাচিয়া নাচিয়া চলিবে। কোন কোন তালের ছন্দ আমাদের প্রাণে এতই সায় পায় যে, আমরা আপনাদিগকে সংযত করিতে পারি না; তখন বাদ্যযন্ত্র পাই যদি তো ভালই, নচেৎ সম্মুখে টেবিল বেঞ্চি যাহা কিছু পাই, তাহারই উপর সেই ছন্দ অনুযায়ী ঘা মারিয়া আমাদের চালক কর্ম্মেন্দ্রিয়ের আত্ম-প্রকাশের ইচ্ছাকে সার্থক করিতে উদ্যত হই—প্রথমে ধীরে আরম্ভ করিয়া পরে দ্রুত গতিতে চলিতে চাই। কিন্তু এ সমস্তেরই ভিতর একটা সুনির্দ্দিষ্ট তাল বা মাত্রাবিভাগের অস্তিত্ব দেখা যায়। যখন দেখি যে, কেহ একটা তাল বা মাত্রা-বিভাগ প্রকাশ করিতেছে, তখন স্বভাবতই সেই তালের অনুযায়ী কোন গান ধরিতে ইচ্ছা হয়; গান ধরিলে শ্রোতৃবর্গের সকলেরই মনে ঐ তালই ঝঙ্কার দিয়া উঠে।

চিকিৎসা-শাস্ত্রে এইরূপ সাড়া দিবার অনেক দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়। একবার একটি স্ত্রীলোকের মন বড়ই উৎক্ষিপ্ত বা পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল। চিকিৎসকেরা অনেক ঔষধাদি খাওয়াইয়াও বিশেষ কোনই ফল পান নাই। অবশেষে তাঁহারা সূক্ষ্মভাবে নিরীক্ষণ করিয়া, স্ত্রীলোকটি যে ভাবে যে তালে পা ফেলিতেন সেই তাল ধরিয়া তদনুযায়ী বাজনা বাজাইতে বলিলেন। বাজাইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার সেই বিষাদের ভাব কাটিয়া গেল। তখন অবধি সেই বাজনার সঙ্গে সঙ্গে তাল রাখিয়া তিনি সমস্ত গৃহকর্ম্মই সমাধা করিতেন। সহসা যদি বাজনার সেই তাল কাটিয়া যাইত, তবে সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারও কাজকর্ম্ম বন্ধ হইয়া তিনি বিষাদে আচ্ছন্ন হইতেন। চিকিৎসকেরা তাঁহার এই অবস্থা দেখিলেন এবং একবার দেখিলেন যে, তাঁহার ঠোঁট দুটি অল্প অল্প নড়িতেছে। তাঁহারা তাঁহার ঠোঁটের কাছে কান লইয়া গিয়া শুনিতে পাইলেন যে তিনি মনে মনে কি যেন একটা গান করিতেছেন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন যে, তাঁহার মনের ভিতর একটা গান সর্ব্বদাই তোলাপাড়া খায়। সেই গান যখন বড় বেশী জোরে প্রাণের ভিতর

জাগিয়া উঠিত, তখন তিনি অনিচ্ছাসত্ত্বেও দ্রুত গতিতে না চলিয়া ফিরিয়া থাকিতে পারিতেন না। যখন সেই গানের তাল কাটিয়া যাইত, তখন তাঁহার সেই অনিচ্ছাকৃত নড়াচড়াও থামিয়া আসিত। অবশেষে সেই তালের গানের পরিবর্ত্তে অন্য তাল ধরাইয়া দিবার ফলে তাঁহার রোগ ভাল হইয়া গেল। ইহা হইতে সঙ্গীতের সঙ্গে আমাদের ভিতরকার স্নায়ুপ্রণালীর ঘনিষ্ঠ যোগ কেমন সুন্দর প্রকাশ পাইতেছে। তাল-নিবদ্ধ সঙ্গীতের সঙ্গে কেবল মানবের কেন, বিশ্বপ্রকৃতিরও এক অচ্ছেদ্য বন্ধন দৃষ্ট হয়। কোন্ অনন্তকাল হইতে ভগবদ্‌বিধানে এই বিশ্বচক্রের অসংখ্য সূর্য্যচন্দ্র, অগণ্য গ্রহতারকা নির্দ্দিষ্ট সময় ধরিয়া নিজ নিজ কক্ষে পরিভ্রমণ করিতেছে। ইহা স্থির দৃষ্টিতে পর্য্যবেক্ষণ করিবার ফলে যে, মানবের মনে সর্ব্বপ্রথম তাল ও ছন্দের আভাস জাগে নাই তাহা কে বলিতে পারে?

এইরূপ পেশীর অনুভূতি এবং শ্রবণেন্দ্রিয় ও চালক ইন্দ্রিয়ের মধ্যে ঘনিষ্ঠতম যোগ থাকাতেই সঙ্গীত শুনিবার জন্য মানবের প্রাণ আকুল হইয়া উঠে। জীবন যখন নানা দুঃখ-বিপদের ঘাত-প্রতিঘাতে শুকাইয়া যায়, শুষ্ক ফুলের মত ঝরিয়া পড়িতে চায়, তখন সঙ্গীতের তাল-নিবদ্ধ সুধাধারা লাভের জন্য প্রাণ তৃষ্ণাতুর হইয়া উঠে। তখন প্রাণের আকাঙ্ক্ষিত সঙ্গীতসুধা লাভ করিলে প্রাণ বিমুগ্ধ হয়—আত্মহারা হইয়া যায়। আকাশ হইতে শিশিরধারা ঝরিয়া যেমন ওষধিকে জীবনদান করে, সেই-রূপ সু-তাল সঙ্গীতও প্রাণকে সজীব করে। মরুভূমি যেমন সুমিষ্ট বারিধারার জন্য কাতর দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধমুখে চাহিয়া থাকে, আমাদের প্রাণ সেইরূপ অনেক সময়ে সঙ্গীতের রসধারা লাভের জন্য আকুলিতচিত্তে প্রতীক্ষা করিতে থাকে—না পাইলে প্রাণ হাঁপাইয়া উঠে, শুকাইয়া যায় এবং পাইলে জাগিয়া উঠে, সজীব হইয়া উঠে। সঙ্গীতসুধা যতই পান করি, ততই ইচ্ছা হয় আরও পান করি—বিরাম চাই না, বিশ্রাম চাই না। আমাদের প্রাণের উপর কর্ম্মজালের যে বেড়া থাকে, একমাত্র সঙ্গীতেরই কোমলতা সেই বেড়া ভাঙ্গিয়া ফেলিবার শক্তি ধারণ করে। দুঃখ-কষ্টের শৃঙ্খল যখন আমাদিগকে সর্ব্বাঙ্গে বাঁধিয়া রাখিতে চায়, তখন সঙ্গীতেরই মধুরতা সেই শৃঙ্খল কাটিয়া আমাদিগকে মুক্তিদানের অধিকার রাখে। সঙ্গীত যখন সুদূর হইতে বায়ুর সঙ্গে ভাসিয়া আসে, তখন আমাদের মনপ্রাণ প্রকৃতির ভিতরে মূর্চ্ছিত হইয়া পড়ে।

সঙ্গীত যদিও এখন একটি কঠিন বৈজ্ঞানিক কলা-বিদ্যায় পরিণত হইয়াছে, বস্তুতঃ ইহা জীবমাত্রেরই, বিশেষতঃ মানব-মাত্রেরই অন্তরে নিহিত বিশ্বস্রষ্টার এক বিচিত্র দান। মানব-সমাজে অতি প্রাচীনকাল অবধি আজ পর্য্যন্ত সকল জাতি ও সকল সম্প্রদায়েরই ভিতর সাঙ্কেতিক ভাব চিরনিহিত দেখা যায়। ভগবানের অন্যতর মঙ্গল-বিধানই এই যে, আমাদের চতুর্দ্দিকে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহা সদা সদা আমাদের প্রয়োজনে না আসিলেও আনন্দ-বিধান করিতে থাকে। এমন অনেক বস্তু আছে, যেগুলি আমরা চক্ষুঃ ব্যবহারে মাত্র জানিয়া অথবা আমাদের ব্যবহারে মাত্র লাগাইয়া ক্ষান্ত থাকি না; সেই সমস্ত বস্তু আমাদের মনে সৌন্দর্য্যের একটা অনুভূতি জাগাইয়া তোলে এবং সেই সঙ্গে আনন্দ বিধান করে।

এই অনুভূতি ও তজ্জনিত আনন্দ যে উপায়েই উৎপন্ন হউক না কেন, ইহা কোন বস্তু বা বিষয়ের মাত্র উপযোগিতার চিন্তা হইতে যে সম্পূর্ণ পৃথক তাহা বোধ হয় বলার প্রয়োজন নাই। একটি সুন্দর দৃশ্য আছে—তাহার ভিতরে কোথায় কোন্ জিনিষ আছে, কোন জিনিষের আকারপ্রকার কি, সকলই হয়তো জানিতে পারি, কিন্তু অন্তরে সৌন্দর্য্যবোধ নিহিত না থাকিলে তাহার সৌন্দর্য্যটুকু উপলব্ধি নাও করিতে পারি। যখন নিদাঘের সন্ধ্যাকালে রঙ্গীন মেঘের আড়ালে অস্তমিত সূর্য্যকে দেখি, অন্তরে সৌন্দর্য্যবোধ না থাকিলে তাহার ভিতর সন্ধ্যার পরে রাত্রিটা সুনির্ম্মল হইবে, ঝড়বৃষ্টির সম্ভাবনা নাই সেইটুকু মাত্র জানিতে পারি। সাগর-পৃষ্ঠে যখন চাঁদের লুকোচুরি খেলা দেখি, তখন অন্তরে সৌন্দর্য্য-বোধ থাকিবার কারণেই কেবল ভাবি না যে জাহাজগুলি নিরাপদে চলাচল করিবে, যাত্রীদিগের কোন বিপদের সম্ভাবনা নাই, কিন্তু অন্তরে একটা অনির্ব্বচনীয় আনন্দের উদ্ভব হয়। যখন দেখি মাঠে প্রচুর পরিমাণে কচি কাঁচ সবুজ ঘাস জন্মিয়া সমস্ত মাঠকে সবুজ রংএ রাঙ্গাইয়া বা চিত্র-বিচিত্রিত করিয়া দিয়াছে, পাহাড়ে পাহাড়ে অত্যুন্নত বৃক্ষগুলি পাতায় পাতায় ভরিয়া উঠিয়াছে, তখন না হয় চাষাদের মনপ্রাণ লাভের আশায়, তাহাদের গরুগুলি প্রচুর খাদ্য পাইবে ভাবিয়া উৎফুল্ল হইতে পারে, কিন্তু আমরা কিসের প্রভাবে বলিয়া উঠি যে দৃশ্য দেখিয়া চক্ষু জুড়াইল? সেইরূপ বাঁশরীর সুমিষ্ট ধ্বনি যখন কর্ণে প্রবেশ করে, তখন তাহার সুমিষ্টতার কারণ নির্দ্দেশে তো আমরা ব্যস্ত হই না, কিন্তু সেই ধ্বনি হইতে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দই উপভোগ করিতে থাকি। মলয় বায়ু যখন ঝুরুঝুরু বহিয়া মাঝে মাঝে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে, স্রোতস্বতী যখন কুলু কুলু ধ্বনিতে গান গাহিতে গাহিতে সাগরের বিশালবক্ষে আত্মহারা হইবার জন্য ধাবিত হয়, তখন তাহার ভিতর কি জ্ঞান লাভ করা যায়, কি শিক্ষা পাওয়া যায়, সেদিকে তো আমাদের অনেক

সময়েই লক্ষ্য থাকে না—বাতাসের সেই করুণ ধ্বনি, স্রোতস্বতীর সেই গান আমাদের সমস্ত মনপ্রাণকে কেবল এক আনন্দরসে ভরিয়া ফেলে।

ইহা হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে, কোন সুন্দর বস্তু বা বিষয়ের প্রয়োজন সম্বন্ধে যে জ্ঞান হয়, উহা হইতে তাহার সৌন্দর্য্যবোধ সম্পূর্ণ পৃথক। কাজেই মনে হয় যে, ভগবান আমাদের আনন্দবিধানের জন্যই অন্তরে এই সৌন্দর্য্যবোধ নিহিত করিয়া দিয়াছেন। এই সৌন্দর্য্যবোধ লাভ করিয়াছি বলিয়াই আমরা কুৎসিতকে সুন্দর হইতে সম্পূর্ণ পৃথক বলিয়া উপলব্ধি করিতে পারি। আনন্দবিধান ভগবানের উদ্দেশ্য বলিয়া তিনি আমাদের ইন্দ্রিয়সকলকে যন্ত্রণার যন্ত্র করিবার পরিবর্ত্তে সুখ ও তজ্জনিত আনন্দ লাভের উপায় করিয়া দিয়াছেন। আনন্দবিধান ভগবানের উদ্দেশ্য বলিয়াই প্রতিদিন প্রাতে সূর্য্যোদয়ের ভিতর, নবজলধর সমাগমের ভিতর, চন্দ্রমার উদয়াস্তের ভিতর আমরা নিত্য নব ভাব—নব আনন্দের সমুদ্ভব উপলব্ধি করি; বাতাসের উদাস ধ্বনিতে, নদীর কুলুকুলু ধ্বনিতে, বিহগের কলধ্বনিতে, ভ্রমরের গুঞ্জনে সর্ব্বোপরি "ভক্তি-ঘন-উজল ভকত মুখের" বাণী বা সঙ্গীতে আনন্দের তরঙ্গ উচ্ছ্বসিত হইয়া আমাদের মনপ্রাণ ছাইয়া ফেলে। আবার এই বাণী বা সঙ্গীত যখন ভাষায় ব্যক্ত হয়, তখন তাহা আশ্চর্য্য শক্তিসম্পন্ন হয়; তাহা মানবের মনে কেবল সুমিষ্ট স্বরলহরীর তরঙ্গ তুলিয়াই ক্ষান্ত হয়, তাহার সঙ্গে মনের উপর এমন একটী ক্রিয়া করে ও এমন একটি প্রভাব বিস্তার করে, যাহা কেবলমাত্র বাক্যের সাহায্যে সম্পন্ন হওয়া সম্ভবপর হয় না। তখন ভাষা ও সঙ্গীত পরস্পরকে সাহায্য করিয়া এক অপূর্ব্ব সঙ্গীতস্তম্ভ রচনা করে।

মানবের অন্তরে ভগবান সঙ্গীতের ভাব ও স্বরজ্ঞান নিহিত করিয়া দিয়াছেন বলিয়াই মানুষের অন্তর হইতে যখন সুর ও তাল বাহিরে ব্যক্ত হয়, তখন তাহা আমাদেরও অন্তরে সাড়া দিয়া উঠে। সেই কারণেই সুচারু তালনিবদ্ধ সঙ্গীত আমাদিগকে বড়ই আনন্দ প্রদান করে এবং কোন্ এক মায়াজালে যেন অভিভূত করিয়া ফেলে। মনে হয়, ভগবান মানুষের মনকে কোমল করিয়া তাঁহার দিকে আকর্ষণ করিবার জন্যই এবং মনুষ্যদিগকে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট করিবারও জন্য প্রকৃতিতে এবং মানবকণ্ঠে সুস্বর ঢালিয়া রাখিয়াছেন এবং মানবপ্রাণে তালের মাত্রাজ্ঞান নিহিত করিয়া দিয়াছেন। মানবকণ্ঠের এই স্বাভাবিক সুস্বর ও মানবপ্রাণের এই স্বাভাবিক মাত্রা সঙ্গীতের সরলতম ও আদিমতম স্তর। সঙ্গীতের এই মূলভাব জনসমাজের সর্ব্বত্র ও সকল অবস্থাতেই বর্ত্তমান দৃষ্ট হয়।

সঙ্গীত মানবের প্রাণের ভিতর হইতে প্রকাশ পায় সম্ভবত প্রকৃতির অন্তর্নিহিত সঙ্গীতের স্পর্শ অন্তরে অনুভব করিয়া। প্রকৃতি হইতে সঙ্গীত অনুক্ষণ উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে—অবিরাম, অবিশ্রাম। সে সঙ্গীতের ভাণ্ডার অফুরন্ত। যখন সমস্ত নিস্তব্ধ—চক্ষের সম্মুখেও নিস্তব্ধ, কাণের পার্শ্বেও নিস্তব্ধ, তখনও সেই নিস্তব্ধতা ভেদ করিয়া সঙ্গীত ধ্বনিয়া উঠে। যখন নির্ঝরিণী উপলখণ্ড হইতে উপলখণ্ডে লাফাইয়া লাফাইয়া চলিতে থাকে, তখন তাহার ঝরণা ধারার একই সুরের মধ্যে কত বিচিত্র সুরের গান জাগিয়া উঠে এবং আমাদের অন্তরে কত বিচিত্র গান জাগাইয়া তুলে। ধেনুগুলি যখন মধ্যে মধ্যে হাম্বারবে বৎসগুলিকে ডাকে এবং বৎসগুলি কচি কচি হাম্বারবে তাহার সাড়া দেয়; ছাগশিশুগণ যখন লাফাইয়া খেলা করে এবং মধ্যে মধ্যে কচি কচি ঘাস খাইতে খাইতে কচর-মচর আওয়াজ বাহির করে; চিলগুলি যখন তাহাদের সুপ্রশস্ত পাখা মেলাইয়া আকাশের এদিকে ওদিকে ঘুরিয়া বেড়ায় এবং মধ্যে মধ্যে ছোঁ মারিয়া আহার সংগ্রহ করে; গাছে গাছে শতবিধ পাখী যখন শিষ দিয়া সমস্ত অরণ্যানীকে মুখরিত করে; রাখাল বালকদিগের আনন্দ-ধ্বনিতে পাহাড়-পর্ব্বত যখন প্রতিধ্বনিত হয়, সেই সমস্তেরই মধ্য হইতে কি অনুপম সঙ্গীত না বাজিয়া উঠিয়া আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করে।

নিশীথে যখন পশুপক্ষীরা নিজ নিজ কুলায় ফিরিয়া গিয়া বিশ্রাম লাভ করে; প্রতিধ্বনি যখন নিদ্রার ক্রোড়ে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া প্রতিধ্বনিত হইতে ইচ্ছা করে না, তখন তাহার ভিতর হইতেও কি কোমল, কি নীরব সঙ্গীত ফুটিয়া উঠে—সেরূপ কোমল সঙ্গীত শত চেষ্টাতেও দিনের বেলায় অনুভূত হয় না। মলয় বায়ুর প্রতি নিশ্বাস যখন বন্যবৃক্ষের পুষ্পপত্রের স্পর্শে সুগন্ধপূর্ণ হইয়া বহিতে থাকে, এবং সেই মলয় বায়ুর কোমল অঙ্গুলীর স্পর্শে যখন বটের ঘন পত্র ও অশ্বত্থ প্রভৃতির কচি কিশলয়গুলি ঝুরুঝুরু শব্দ করে, তখন যেন শত গীতযন্ত্রের তার স্পন্দিত হইয়া প্রকৃতিরই অন্তর্নিহিত সঙ্গীতকে ধ্বনিত করিয়া তোলে। এইরূপে ভারতের অরণ্যে দক্ষিণে হাওয়ার প্রতি স্পন্দনে সহস্র সহস্র ক্ষুদ্র যন্ত্র অস্ফুটধ্বনিতে বাজিয়া উঠে। সেখানে গ্রীষ্মকালে যেমন আনন্দের সঙ্গীত দিবানিশি শোনা যায়, সেইরূপ বর্ষাকালে জলঝড়ের ভিতর দিয়া সঙ্গীতের আর এক মূর্ত্তি প্রকাশ পায়; এবং শীতকালের কুজ্ঝটিকার ভিতর দিয়া, বৃক্ষসমূহের পুরাতন পত্রের পতনের ভিতর দিয়া বিষাদের করুণ তান মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। কিন্তু সঙ্গীতে বিরাম নাই—কখনও সুখের, কখনও বা দুঃখের তান বিকশিত হইয়া উঠে। যখন ঝড় হয়, বৃষ্টি ঝম ঝম করিয়া পড়ে,

পাহাড়-পর্ব্বতের পাথরগুলা বজ্রনিনাদে খসিয়া পড়ে এবং নদনদীর জল যখন হুঙ্কার করিয়া কলকল নিনাদে ছুটিয়া চলে, তখন তাহার ভিতরে সংগ্রামের বলপ্রদ কি অনুপম সঙ্গীতের ধ্বনিই না শোনা যায়। আবার শীতের প্রারম্ভে যখন উল্কারাশি গগনের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্তে ছুটিয়া ছুটিয়া খেলা করিতে থাকে, তখন তাহাদের সেই খেলার ভিতরেও কত না আশ্চর্য্য সঙ্গীত ধ্বনিত হয়।

মানুষ যখন কর্ম্মযজ্ঞে নিযুক্ত হইল, কোথায় কোন্ একটু সমতল ভূমি পাইয়া শস্য উৎপাদনে প্রবৃত্ত হইল, কুঠারাঘাতে বৃক্ষ কাটিয়া গৃহনির্ম্মাণে উদ্যোগী হইল; মানুষ যখন রাস্তাঘাট নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইল, তখন সেই সমস্তের ভিতর হইতে কি সকল অনুপম কর্ম্মসঙ্গীত সকল উত্থিত হইল। জ্যোৎস্না রাত্রে যখন ছেলেমেয়েরা নাচিয়া নাচিয়া গান করে; কোল-ভীলেরা যখন সারাদিন পরিশ্রমের পর সন্ধ্যাবেলায় মনের সমস্ত বোঝা ঝাড়িয়া ফেলিয়া আনন্দের তানে গান গায় এবং তাহাদের হাসির রোলে যখন সমস্ত পল্লী মুখরিত হইয়া উঠে, তখন প্রকৃতির সঙ্গীত কি সুন্দর আনন্দরূপ পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হয়। নিদাঘের দ্বিপ্রহরে যখন ভ্রমরেরা গুঞ্জন করিতে করিতে খেলা করে, এবং সেই গুঞ্জনের ভিতর দিয়া আকাশ হইতে যখন সুরের ধারা ঝরিতে থাকে, তখন সঙ্গীত আর এক নবতর আনন্দ-মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আমাদের সম্মুখে প্রকাশিত হয়। কিন্তু ভগবদ্ভক্তের শ্রদ্ধা-ভক্তিতে উজ্জ্বল মুখশ্রীতে যে সঙ্গীত মূর্ত্ত হইয়া উঠে সেই সঙ্গীতই সর্ব্বাপেক্ষা মিষ্টতর, তাহা অপেক্ষা মিষ্টতর সঙ্গীত শোনা যায় কিনা সন্দেহ।

ঐ দেখ—এক ভক্ত দাঁড়াইয়া। দেখিতে যেমন সুন্দর, চক্ষুদুটি তেমনই বিনয়নম্র। বাহুদুটি সুদীর্ঘ আজানুলম্বিত। তাঁহার ভক্তি-উজ্জ্বল মুখ হইতে যেন কল্লোলিনী স্রোতস্বতীর মত গানের ধারা স্তবের আকারে উচ্ছ্বসিত হইয়া বাহির হইতেছে—মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে সঙ্গীতের নবনব রূপের সৃষ্টি হইতেছে। এইভাবে ঊর্দ্ধমুখে দাঁড়াইয়া থাকিয়াই ভক্ত আকাশ হইতে গ্রহতারা হইতে গীতগান ফুটাইয়া বাহির করিয়া আনেন। এইজন্য ভক্তের মুখচ্ছবিতে যে গান প্রকাশ পায়, তাহার নিকট মলয় বায়ু ফুলের সঙ্গে পাতার সঙ্গে মৃদুলমধুরস্বরে যে গান গায়, নির্ঝরিণী নির্জ্জনে পাহাড়-পর্ব্বতের সঙ্গে যে গান গায় অথবা সভা মধ্যে জ্ঞানীগুণীগণ বীণার তারে যে গানের ঝঙ্কার উঠান, সে সমস্ত কিছুই দাঁড়াইতে পারে না।

ভক্তপ্রাণের পূজা দিব্য সঙ্গীতে ব্যক্ত হয়। সুরের সঙ্গে কথার বাঁধন যখন ঠিক লাগিয়া যায়, তখনই দিব্য সঙ্গীতের উৎপত্তি হয়। উভয়ের নিখুঁত সম্মিলনে এক নবশক্তির উদ্ভব হয়—সে শক্তি মৃতপ্রাণেও জীবন আনয়ন করে। সেই শক্তি আমাদের কল্পনার চক্ষুকর্ণ খুলিয়া দেয়। আত্মার জ্যোতির্ম্ময় সিংহাসনে যিনি উপবিষ্ট আছেন, সেই ভগবানের চরণতলে দাঁড়াইয়া দেবতাদের সঙ্গে একতানে প্রাণ খুলিয়া দিব্য সঙ্গীতে গান গাও—সকল মানবের হৃদয়-বীণায় ভগবানের নামের বিজয়গীত বাজিয়া উঠুক; সেই গানের অমৃতরসে ধরাবাসী সিক্ত হউক। আমাদের প্রত্যেকের প্রাণে দিবানিশি তাঁহারই নাম ধ্বনিত হউক এবং আমাদের প্রত্যেকের প্রাণের অন্তর্নিহিত সঙ্গীত সার্থকতা লাভ করুক।*

হিমালয়পরিভ্রমণ।

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

একাকী নির্জ্জন পথে যখন চলিতাম তখন মনে হইত, ভগবদ্ধ্যানই মানবজীবনের চরম লক্ষ্য। তাঁহার অস্তিত্বেই জগতের অস্তিত্ব। সকল অস্তিত্বের মূলেই শ্রীভগবান। তিনি নিরন্তরই ত আমাদের হৃদয়ের নিভৃততম প্রদেশে অবস্থান করিতেছেন। তাঁহার অপার দয়াতেই আমরা বাঁচিয়া আছি। আমরা অজ্ঞান মানব, তাঁহার মহিমা বুঝিতে পারি না। জীবন্মুক্ত সাধুগণই সেই ভগবৎপ্রেম উপলব্ধি করিতে পারেন। সংসারের অসারতা আমরা সম্যক্‌রূপে জানিয়াও পতঙ্গের বহ্নি-প্রীতির ন্যায় আবার সেই সংসারকেই দৃঢ়রূপে ধরিয়া আছি। কিন্তু ভগবানের দয়া এত দূর, তিনি আমাদের সুখে দুঃখে রোগে শোকে বিপদে সম্পদে সর্ব্বদাই নিকটে থাকিয়া তাঁহার স্নেহের সুশীতল ধারা ঢালিয়া দিতেছেন। তাঁহার বিচিত্র মায়াশক্তির বলেই জীব নিশ্চিন্তমনে এই অনিত্য জগৎকে নিত্য ভাবিয়া আমিত্বের প্রসার লইয়া ভোগ-সুখে মগ্ন হইয়া আছে। এই কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে অনেক পথ হাঁটিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া একটী পাহাড়ের গায়ে ঠেস দিয়া বসিলাম এবং নিকটে যে একটী ঝরণা ছিল, তাহার জলপানে একটু ক্লান্তি দূর করিলাম। ঝাম্পিওয়ালা গোলাপসিং আসিয়া বলিল, মাইজী! আঁধার হোতি, আপ ঝাম্পিপর উঠিয়ে। তখন তাহার কথামত ঝাম্পিতে উঠিয়া বসিলাম। সঙ্গীরা আগে চলিয়া গেছেন। কতকগুলি পশ্চাতে আছেন। ক্রমে ক্রমে পথ চলিতে চলিতে ধরণী ধূসর অবগুণ্ঠনে অবগুণ্ঠিতা হইল। পাখীর দল কুলায় ফিরিল। ধীরে ধীরে সন্ধ্যাদেবী আসিয়া বনপথ আবৃত করিলেন।

আমরা যতই কেদারখণ্ডের নিকট যাইতেছি, ততই হৃদয়ের মধ্যে একটা আনন্দ অনুভব করিতেছি। আমাদের মনে একটা ক্ষীণ আশার আলোক দেখা দিতেছে। দূর হইতে রজতগিরির ন্যায় হিমালয় দেখা যাইতেছে।

---

* সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকা—বৈশাখ, ১৩০৫ সাল।

তাহার অনুপম সৌন্দর্য্য বর্ণন করা যায় না। এই উত্তরাখণ্ড তীর্থই ভারতের ধর্ম্মের বাস্তব লীলাক্ষেত্র ও দেবপ্রতিম ঋষিগণের চরণরেণুস্পর্শে উহা চিরপবিত্র ও পুণ্যময় হইয়া রহিয়াছে। ইহার অনন্ত অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য দেখিলে মনপ্রাণ আনন্দে গলিয়া যায়। এই নীরস পাষাণের বক্ষ ভেদ করিয়া শত শত উৎসধারা অসীম করুণাধারারূপেই বিগলিত হইতেছে। হায় মানব, আমরা এতই অজ্ঞান, এতই মূঢ়, এতই ভ্রান্ত যে, তাঁহার এত করুণা দেখিয়াও ত কেহ তাঁহাকে চিনিতে পারি না! ভগবানের কৃপায় অনেক স্থান ভ্রমণ করিয়াছি, কিন্তু এমন সুন্দর—এমন নয়নরঞ্জন স্থান আর দেখি নাই; প্রকৃতির এমন রম্যভূমি আর কোথাও নাই। আমরা যতক্ষণ গৃহের মধ্যে থাকি, গৃহের সংকীর্ণ বায়ুতে সংকীর্ণ স্থানে আমাদের মনটাও যেন সঙ্কীর্ণ হইয়া উঠে। কিন্তু বাহিরের উন্মুক্ত বাতাসে হৃদয়টা উন্মুক্ত হইয়া সেই অনন্তের পথেই ছুটে। বিষয়-ঐশ্বর্য্য মানবকে ক্ষুদ্রতার পথে লইয়া যায়। জীবনে যে কখনও পথের মুখ দেখে নাই, আজ সে কাহার বলে কাহার শক্তিতে এই জন-মানবহীন বিজনপথে চলিয়াছে? সেকালে পিতামহীরা বলিতেন, জগন্নাথের ডুরি গলায় পড়িলেই কুলের কুলবধূও ছুটিয়া জগন্নাথ দেখিতে যায়। এও তাঁহার আকর্ষণ।

ক্রমে আমরা হিমগিরির সন্নিকট হইতে লাগিলাম। অভ্রভেদী হিমশীতল হিমালয় দেখিয়া ভাবিলাম, এই সেই হিমালয়? ভারতের উত্তর দিকে যে তুষারকায় হিমমুকুটশোভিত গিরি কত যুগযুগান্তের অতীত পুণ্যস্মৃতি বক্ষে লইয়া সর্ব্বসংহা কালশক্তিকে পদদলিত করিয়া সগৌরবে শৃঙ্গমালা ঊর্দ্ধে তুলিয়া মহাযোগীর ন্যায় ধ্যাননিমীলিতনেত্রে দণ্ডায়মান? জগতের কাহারও প্রতি যেন ইহার ভ্রূক্ষেপও নাই! এই উন্নতশীর্ষ হিমালয় মহাযোগী মহেশ্বরের মত অটল অচল ও নিস্পন্দভাবে অবিচল হইয়া আছেন। প্রবলপ্রতাপ প্রভঞ্জন ইহাকে বিন্দুমাত্র টলাইতে পারে না। পর্জ্জন্যদেবের অজস্র বারিধারা ইহার বিশাল দেহ বিশীর্ণ করিতে পারে না। চঞ্চলা সৌদামিনী প্রতিনিয়ত ইহার শিখরে ক্রীড়মানা হইলেও ইনি দৃক্‌পাত করেন না। বাসবের গভীরনির্ঘোষী বজ্রও ইহাকে বিন্দুমাত্র কম্পিত করিতে পারে না। এই অভ্রভেদী হিমালয়ের পাদমূলেই সুবিস্তীর্ণ ভারতভূমি। সেই ভারতভূমিকে আবেষ্টন করিয়া বিশাল বারিধির সুনীল অম্বুরাশি শোভা পাইতেছে। প্রখর রবিকরসন্তাপে ঐ নীলাম্বুকণা বাষ্পে পরিণত হইয়া ঊর্দ্ধগগনে উঠিয়া অসীম মেঘের সৃষ্টি করে এবং উহা আবার নির্ম্মল বারিধারারূপে নিদাঘতপ্ত ধরণীর বক্ষ সুশীতল করিয়া অসংখ্য নদনদী নির্ঝরিণীর সৃষ্টি দ্বারা আমাদের শস্যশালিনী ভারতভূমির উর্ব্বরতা সাধন করিতেছে। এই হিমালয়ের কল্যাণেই আমরা নদ-নদী নির্ঝর হইতে সুমিষ্ট বারি পান করিয়া জীবন শীতল করি। এই নগাধিরাজ হিমালয় যোগীশ্রেষ্ঠ মহাদেবের ন্যায় চির সমাধিতেই মগ্ন হইয়া আছেন। শিবজটাবিহারিণী গঙ্গাকে মস্তকে ধারণ করিয়া ইনি গঙ্গাধর নামে আখ্যাত হইয়াছেন এবং কালশক্তিকে পদদলিত করিয়া মহাকাল নাম ধারণ করত চিরবৈচিত্র্যময় জগতের বুকে প্রকৃতিরূপিণী পার্ব্বতীর সহিত সংমিলিত হইয়া লীলা করিতেছেন। ইনি তুষারশুভ্র রজতগিরির ন্যায় বৃষভবাহন শিবরূপে বিশ্বের মঙ্গলসাধন করিতেছেন। ইহার পাঁচটী শিখর পৃথক পৃথক পাঁচটী নাম ধারণ করিয়াছে। নাংগাপর্ব্বত ও নন্দাদেবী, এবং নেপালপ্রদেশে কাঞ্চনজঙ্ঘা, ধবলগিরি ও গৌরীশঙ্কররূপে উহা বিরাজমান রহিয়াছে। ইহার রবিকরোজ্জ্বল ললাট হইতে যেন প্রদীপ্ত অগ্নিশিখা নিরতই জ্বলিতেছে। এই হিমালয় চিরতুষার-আচ্ছাদিত হইলেও কোন দিন ইহার ক্ষয়বৃদ্ধি নাই। ইনি অনন্তকাল একই ভাবে একই রূপে অবিচলভাবে রহিয়াছেন। একবার এই বিচিত্র বিশ্বের বিচিত্র রূপ দেখিলেই হৃদয় ভক্তি-অবনত হইয়া শ্রীভগবানের চরণে নমিত হয় ও তাঁহার রচনার কৌশল দর্শনে আনন্দে প্রাণ পরিপূর্ণ হইয়া উঠে। তখন মনে হয়—

> "সর্ব্বতঃ পাণিপাদন্তৎ সর্ব্বতোক্ষি-শিরোমুখং।
> সর্ব্বতঃ শ্রুতিমল্লোকে সর্ব্বমাবৃত্য তিষ্ঠতি॥

আমরা অন্ধ তাই তাঁহার স্বরূপ বুঝিতে পারি না।

আমার ঝাণ্ডিওয়ালা ও বোঝাওয়ালা আসিয়া আমায় একটী নূতন ক্ষুদ্র চটীতে লইয়া গেল; তাহার নাম ডিরি চটী। সেখানে গিয়া দেখি, আমাদের দলের সকলেই সেখানে আস্তানা গাড়িয়াছেন। আমিও একপার্শ্বে কম্বল বিছাইয়া বসিলাম ও ঝোলার মধ্যে একটু মিষ্টি ছিল তাই খাইয়া সেদিনকার মত শয্যা লইলাম। আবার রাত্রি প্রভাতের পূর্ব্বেই ঝাণ্ডিওয়ালা আসিয়া ডাকিল—মাই জী, যাত্রী সব বাহার হোতা। তাড়াতাড়ি কম্বলখানি বাঁধিয়া ঝাণ্ডিতে উঠিলাম। ভোরের আলোকে পাখীর গানে প্রাণে আবার যেন নূতন বল আসিল। মনে করিলাম, আর আট দিনের পরে শ্রীভগবান কেদারনাথকে দেখিব। কিছু দূরে আসিয়া দেখিলাম একটী ঝাঁপানে করিয়া চারিজন বাহক একজন সাধু বাবাকে পথের ধারে নামাইয়া রাখিয়াছে। সাধু স্থিরভাবে নিমীলিতনয়নে শয়ান আছেন। বোধ হয় তাঁহার অন্তিম কাল উপস্থিত। তাঁহাকে দেখিয়া মনে হইল, মানবজীবন ত জরা-মৃত্যুর অধীন। এই আজন্মগৃহত্যাগী ভগবদ্ভক্ত সাধুরও মৃত্যুর কবল হইতে

নিস্তার নাই। মানবজীবন ঠিক স্বপ্নের মত। মানুষ যখন নিদ্রিত অবস্থায় স্বপ্ন দেখে, স্বপ্নের শোক-দুঃখ অভাব-অতৃপ্তি ও বিরহ-বিচ্ছেদ তখন বাস্তব বলিয়াই মনে হয়। আমাদের জীবনটাও স্বপ্নের মতই বোধ হয়। ইহা ক্ষণিকের উন্মাদনার ন্যায় মনে হয়। কিন্তু মানুষ আবার যখন নিদ্রাভঙ্গে তাহার প্রকৃত অবস্থা লাভ করে তখন তাহার স্বপ্নটা ভ্রম মনে হয়। মানুষেরাও মায়ামোহের স্বপ্নে ভোর হইয়া নিজের প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে না। মায়া ও স্বপ্নের মোহ: কাটিলে সে আবার তাহার প্রকৃত অবস্থা বুঝিতে পারে। এজগতে যাহা কিছু সুন্দর এবং আনন্দময়, সকলই সেই পরম সত্যের বিকাশ মাত্র। আমাদের ক্ষুদ্র আমিত্বের মধ্য দিয়া তিনি জ্ঞান প্রেম ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছেন। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে একটী ছোট কাঁচা পুলের নিকট আসিলাম। পুলটী কয়েকটী বৃক্ষের ডালপালা দিয়া তৈয়ার হইয়াছে। ঝাণ্ডিওয়ালা বলিল—হামরা হাত পাকড়কে ধীরে ধীরে চলো। খুব সাবধানে সন্তর্পণে ধীরে ধীরে কাঁচা পুলটী পার হইলাম। নদীটী ছোট হইলেও অতি খরস্রোতা। জলও গভীর। সঙ্গিনীরা একে একে সকলেই পার হইলেন। ক্রমে বেলা বাড়িতে লাগিল। সকলেই ক্লান্ত হইয়া চটীর কাছে আসিয়া শ্রান্তভাবে বসিয়া পড়িল। তখন সকলেই ক্ষুৎপিপাসায় কাতর। একটু পরেই আহারের চেষ্টায় মুদির দোকানে চাল ডাল কাষ্ঠ কিনিতে গেল। গোলাপ সিং ঐগুলি কিনিয়া কাষ্ঠ আনিয়া উনান ধরাইয়া জল আনিয়া দিয়া গেল। আমি আলুর তরকারি ও ভাত রাঁধিয়া ভগবানকে নিবেদন করিয়া দিয়া আহার করিলাম ও দুই ঘণ্টা কম্বলে নিদ্রাসুখ ভোগ করিয়া আবার ধীরে ধীরে তল্পি বাঁধিয়া পথ চলিতে আরম্ভ করিলাম।

এই জগতের অনন্ত গতিবৈচিত্র্য দেখিলেই মনে হয়, ইহা সেই একই বিশ্বব্যাপী প্রেমের লীলামাত্র। মানবজীবনের অনন্ত তরঙ্গমালা সেই একই অনন্ত প্রেমময় ভগবানের প্রেমে ডুবিয়া যায়। এমন কি, ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র কীটও মাটীর নীচে দিয়া প্রেমভালবাসার মধ্য দিয়া আপনাকে শ্রীভগবানের চরণে মিশাইতে চাহে। এই উন্মাদ প্রেমের আকর্ষণেই সারা বিশ্ব পরস্পরকে আকর্ষণ করিতেছে। তাই পতি পুত্র কন্যা মাতা পিতা আমাদের সংসারে এক-একটী প্রেমের ছবি—তবে কোথাও প্রেম ভক্তিরূপে, কোথাও প্রেম বাৎসল্যরূপে, কোথাও প্রেম সখ্যরূপে, কোথাও বা পূর্ণরূপে বিরাজমান। এই বিশ্বপ্রেমময় ভগবানের রাজ্যে প্রেমের আকর্ষণেই জড়জগতে জীবজগতে পরস্পর পরস্পরকে প্রতিনিয়তই টানিতেছে। তাই মনে হয় প্রেমময় ভগবান এ বিশ্বব্রহ্মাণ্ডে সকলকেই সমান চক্ষে দেখিতে বলিতেছেন। এখানে বর্ণবৈষম্য বা জাতিবৈষম্য নাই। সবই সেই এক ভগবানের সন্তান। একই উপাদানে সকলেরই দেহ গঠিত। তাঁর রাজ্যে ছোট বড় নাই, উচ্চনীচ নাই, উত্তম অধম নাই। একই সুরে এই বিশ্ব চলিয়াছে। এই সকল ভাবিতে ভাবিতে প্রায় দুই মাইল অতিক্রম করিয়া একটী ক্ষুদ্র পাহাড়ের পার্শ্বে বসিয়া একটু ক্লান্তি দূর করিলাম। তখন সূর্য্যদেব প্রায় মাথার উপর। তাঁহার মধ্যাহ্ন কিরণও এখানে ম্লান। তুহিনকণায় সর্ব্বত্র শীতল করিয়া রাখিয়াছে। ইহার কিছু দূরেই আমরা একটী চটিতে উঠিয়া বিশ্রাম করিবার ইচ্ছায় সেই স্থানে আসিলাম। সমস্ত দিনটা আজ মেঘ বাদল কুয়াসায় আচ্ছন্ন। আজ আর কেহ পথে বাহির হইল না।

পরদিন আবার পথে বাহির হইলাম। আমার মনের মধ্যে উদ্বেগ বা ভয় একটুও ছিল না। যিনি আমার অনন্ত জীবনের সাথী ও সঙ্গী তিনি ত নিরন্তর আমার কাছেই রহিয়াছেন। তা না হইলে কাহার শক্তিতে এই দুর্গম গিরিবর্ত্ম সকল পার হইতেছি। এখানে ত আত্মীয় স্বজন বন্ধু আমার কেহই নাই। কিন্তু সেই নিত্য প্রেমময় ভগবান আমার সম্মুখে রহিয়াছেন। তিনি যেন আমার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার স্নেহময় করদুটী বাড়াইয়া দিয়া আমায় অভয় দান করিয়া বলিতেছেন, এস পান্থ! ভয় নাই, আমিই তোমার হাতখানি ধরিয়া ওই দুর্গম গিরিবর্ত্ম পার করিয়া দিব। ঠিক তাহার পরক্ষণেই গোলাপ সিং বলিল—হামলোক গৌরীকুণ্ড আকে পৌছায়। আমি মনে মনে ভগবানকে প্রণাম করিলাম। মোট-গাঁটরি গোলাপ সিং চটিতে নামাইলে আমরা কিছুক্ষণ কম্বল বিছাইয়া বসিয়া ক্লান্তি দূর করিলাম। আজ একাদশী কেহই অন্ন আহার করিবে না। আমরা আধসের করিয়া দুধ কিনিতে পাইয়াছিলাম ও পেঁড়া কিনিয়া একটু জল খাইলাম। আবার জল খাইয়া এক ঘণ্টা বিশ্রাম করিয়া সকলেই দলবদ্ধ হইয়া বাহির হইলাম। ভগবদ্দর্শনের আনন্দে আমার হৃদয়টা ভরিয়া উঠিয়াছিল। এখানে যত যাত্রীদল যাইতেছে, সকলেরই শ্রীভগবানের প্রতি লক্ষ্য। সকলেই গৃহ ভুলিয়া, স্বামী-পুত্রকন্যা ভুলিয়া একাগ্রমনে ভগবানের দিকে ছুটিয়াছে। ভগবৎপ্রেমে মানুষ যখন ডুবিয়া যায় তখন তাহার মনে এক ভগবৎচিন্তা ব্যতীত কোন চিন্তাই আর স্থান পায় না। পথের কোন কষ্টই আমার কষ্ট বলিয়া মনে হইতেছে না—হৃদয় মধ্যে যেন আনন্দের তুফান বহিতেছে। সেখানে যাহা পাওয়া যাইতেছে সেই যদৃচ্ছালব্ধ আহারেই পরম সন্তোষ বোধ হয়। আর, পথে

চলিতে চলিতে পথের দুই দিকে নিবিড় কান্তারভূমির অপূর্ব্ব শোভায় যেন মুগ্ধ হইয়া পড়ি! কোথাও উন্নত-শীর্ষ বৃক্ষশ্রেণী আকাশস্পর্শী হইয়া দাঁড়াইয়া আছে। কোথাও শাখায় শাখায় জড়িত হইয়া বিকসিত পুষ্পগুচ্ছে কমনীয় কুঞ্জের সৃষ্টি করিয়াছে। কোথাও হরিণীদল নির্ভয়ে দলবদ্ধ হইয়া বিচরণ করিতেছে। কোথাও বৃক্ষশাখায় বসিয়া পক্ষীকুল মধুর কূজনে দিকসকল মুখরিত করিতেছে। সন্ধ্যা আগত দেখিয়া তাহারা দলে দলে কুলায় ফিরিয়া আসিতেছে। কোথাও বা নির্ঝরিণীসকল সুনির্ম্মল জলধারা অযাচিতভাবে ঢালিয়া দিয়া পথিকদলের তৃপ্তিবিধান করিতেছে। এখানে আত্মপর নাই, দ্বেষ-দ্বন্দ্ব নাই। মনে হয়, সেই বিশ্বপ্রাণ ভগবানের পাদপদ্মে আপনাকে কেবল লুটাইয়া দিয়া জন্মজীবন সফল করি। দেখিতে দেখিতে সূর্য্যদেব পশ্চিমগগন আশ্রয় করিলেন। তাঁহার হেমাভ রশ্মিচ্ছটায় আকাশ সুরঞ্জিত হইয়া উঠিল। ধূমল শ্যামল গিরিশ্রেণী যেন নবীন শোভা ধারণ করিল। স্বভাবের মনোহর শোভা দর্শনে হৃদয়ে অসীম আনন্দপ্রবাহ বহিতে লাগিল।

সেদিনকার মত আমরা একটী ছোট চটীতে রাত্রি যাপন করিয়া আবার প্রাতে অনেক পথ হাঁটিয়া একটী ঝরণার ধারে আসিয়া বসিলাম। নির্ঝরিণীর শীতল শীকর-কণা দেহের মধ্যে যেন শীতলতা আনিয়া দিল। মন্দ মন্দ হিম-শীতল বায়ুতে শরীর যেন স্নিগ্ধ হইয়া গেল। অদূরে একটী গিরিপদতলে ক্ষীণা নদীটি কুলু কুলু তানে বহিয়া যাইতেছে। তাহার গতিও বোধ হয় সেই অনন্ত সাগরের দিকে। যেদিকে চাই, সর্ব্বত্র দেখি সেই বিশ্বদেবতার ভুবনভরা হাসি। নিত্যই প্রভাতে অরুণোদয়ের সঙ্গে কত ফুল ফুটিয়া উঠে; কত পাখী গান গায়; মন্দ সমীরে লতাপত্রকে দোলাইয়া দেয়। প্রকৃতির এই বৈচিত্র্য জগতের বুকে চিরদিন নূতন—চিরদিন। কোন দিন ত ইহার নূতনত্ব গেল না। তাই আমাদের শ্রীভগবানও চিরনবীন—চির-সুন্দর! তাঁহার সৃষ্টিও তাই চিরসুন্দর রূপে রূপময় হইয়া রহিয়াছে। চণ্ডীতে লেখা আছে—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং জগৎ।

মা যে আমাদের নিত্যা। এই জগতই তাঁহার প্রতিমূর্ত্তি। জগতের যা-কিছু শোভা, যা-কিছু সৌন্দর্য্য সকলই তাঁহার রূপের বিকাশ। মায়ের রূপেই ত এ বিশ্ব রূপময়। ফলে ফুলে, পত্রে, বিটপীতে, নদীর কলতানে পাখীর ললিত গানে মা যে বিশ্বব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছেন। তবে তাঁহাকে আবার নূতন করিয়া খুঁজিতে যাইতেছি কেন? আমরা ভ্রান্ত, তাই মোহে বদ্ধ হইয়াই সমস্ত জীবন ঘুরিতেছি। কবে আমাদের এ ঘোরার অবসান হবে জানি না।

পরদিন যখন গৌরীকুণ্ডের নিকট আসিলাম, দেখিলাম গৌরীকুণ্ড কি রমণীয় স্থান। তাহার পার্শ্ব দিয়া খরস্রোতা মন্দাকিনী অশ্রান্ত গতিতে কল-কল ঝঙ্কারে ছুটিয়াছেন। গৌরীকুণ্ডের সম্মুখভাগে বিশালবপু হিমালয় উন্নতমস্তকে দাঁড়াইয়া আছেন। প্রাতঃসূর্য্যের কিরণ পড়িয়া হিমালয় যেন হিরণ্ময় মুকুট পরিধান করত দশদিশি উজ্জ্বল করিয়াছেন। রবিকরমণ্ডিত তুহিনাচলে যেন শত শত মণি জ্বলিতেছে, আমি মুগ্ধনয়নে কিছুক্ষণ এই হিমালয়ের অপরূপ সৌন্দর্য্য দর্শন করিলাম। আমার মনপ্রাণ যেন ওই বিশ্ববিমোহন রূপে ডুবিয়া গেল। যতবারই দেখি ততবারই যেন নূতন নূতন শোভা দর্শন করি।

গ্রন্থপরিচয়।

দুইটী অভিভাষণ।—গত সন ১৩৩৪ সালের ৬ই কার্ত্তিক তারিখে গোয়ালপাড়া জেলার গৌরীপুরে "নিখিল গোয়ালপাড়া জেলা সমিতি"র এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল। উক্ত অধিবেশনে অভ্যর্থনা সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত রাজা প্রভাতচন্দ্র বড়ুয়া এবং মূল সমিতির সভাপতিরূপে শ্রীযুক্ত গৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী মহাশয় এই দুইটী অভিভাষণ প্রদান করিয়াছিলেন।

গোয়ালপাড়া জেলাটী বর্ত্তমানে আসাম প্রদেশের অন্তর্গত। কিন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিয়া জানা যায় যে প্রাচীনকালে উহা একটী স্বতন্ত্র রাজ্যের অংশ ছিল। ঐ রাজ্য আসামও নহে বাঙলাও নহে। উহার নিজস্ব সভ্যতা ও ভাষায় উত্তরবঙ্গের সভ্যতা ও ভাষার অংশতঃ সাদৃশ্য থাকিলেও অসমীয়া ভাষা ও সভ্যতার সহিত তাহার বিশেষ কোনই যোগ দেখা যায় না। স্থানীয় আচার-ব্যবহার ও পোষাক-পরিচ্ছদ প্রভৃতির আলোচনা করিয়া সভাপতিমহাশয়েরা নানাভাবে এই তথ্যই প্রকটীত করিয়াছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, যদিও গোয়ালপাড়ার কথাবার্ত্তায় প্রচলিত ভাষা "রাজবংশী" (Rajbansi dialect) তথাপি পূর্ব্ববঙ্গ ও উত্তরবঙ্গের কথিত ভাষার সহিত বাঙ্গালার সাধারণ সাহিত্যিক ভাষার পার্থক্য থাকিলেও যেমন ঐ সকল স্থলে জনসাধারণের সাহিত্য-সৃষ্টি বা সাহিত্য-রসবোধের কোন বাধা ঘটে নাই, গোয়ালপাড়া সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। এমন কি, প্রাচীন যুগে আসামেও বাঙলা হইতে কোনও স্বতন্ত্র সাহিত্যিক ভাষা প্রচলিত ছিল না। কারণ, তদানীন্তন সাহিত্য ও সভ্যতার কেন্দ্র ছিল কোচবিহার।

কিন্তু অধুনা যোরহাট্‌কে কেন্দ্র করিয়া আসামে যে নব ভাষা ও সাহিত্য গড়িয়া উঠিতেছে, ইহাই বাঙ্গালা হইতে আমাদিগকে পৃথক করিয়া দিতেছে। এরূপ ক্ষেত্রে, যোরহাটের সহিত গোয়ালপাড়া এক শাসনসূত্রে গ্রথিত হইয়া পড়িয়াছে বলিয়া যে আপন প্রকৃতির বহির্ভূত সুতরাং সকল উন্নতির পরিপন্থী এক ভাষা ও সাহিত্যের শৃঙ্খলেও তাহাকে বাঁধা পড়িতে হইবে, তাহার কোনও অর্থ নাই। এবিষয়ে ইঁহাদের অনুকূল দৃষ্টান্ত শ্রীহট্ট। যদিও ইহা শাসনবিভাগ হিসাবে আসামের অন্তর্গত, তথাপি ভাষায়, সাহিত্যে ও সভ্যতায় ইহা বাঙ্গলা। গোয়ালপাড়া সম্বন্ধেও ইঁহারা এইরূপ ব্যবস্থাই পছন্দ করেন; এবং প্রধানতঃ ইহার অনুকূলে জনমত গঠনের জন্যই উক্ত অধিবেশনের আয়োজন ও অনুষ্ঠান। আমরা অনুষ্ঠাতৃবর্গের সাফল্য প্রার্থনা করি।

ব্যথার পূজা—শ্রীমনোমোহন চক্রবর্তী প্রণীত। শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষ এম-এ কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য ॥০ আনা।

এখানি কবিতার বই। কবিতাগুলির মধ্য দিয়া গ্রন্থকারের ভক্তিভাবপূর্ণ হৃদয়ের ছবি ফুটিয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেকটি কবিতা আধ্যাত্মিক ভাবে পূর্ণ। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ক্ষেত্রনাথ ঘোষ ভূমিকায় লিখিয়াছেন "পাঠক যদি সাধক হ'ন, আধ্যাত্মযোগসূত্রে কবির সহিত অশ্রু মিলাইয়া ধন্য হইবেন"—এ কথা সত্য।

"তোমা ছাড়া—সব হারা—আমি কি আমারি?
দু-হৃদয় অন্ধকার—কি ক'রে সাঁতারি?"

ইহা ভক্তেরই যোগ্য বাণী।

ঝরাফুল।—হিমালয়ভ্রমণ, পূজার ফুল প্রভৃতি গ্রন্থ-রচয়িত্রী শ্রীমতী রত্নমালা দেবী প্রণীত। মূল্য ॥০।

এখানিও কবিতা পুস্তক। কবিতাগুলি সহজ সৌন্দর্য্য-পূর্ণ ও কবিত্বমণ্ডিত। প্রত্যেক কবিতাতেই সরল ভক্ত-হৃদয়ের পরিচয় পাওয়া যায়। কবিতাগুলির ভাষা ও শব্দচয়ন সুন্দর, তবে ছন্দ সম্বন্ধে একটু অবহিত হইলে ভাল হয়। এই পুস্তকের অনেকগুলি কবিতাই আমাদের ভাল লাগিল। প্রকৃতির ছবিগুলি বেশ সুন্দর ফুটিয়াছে। 'কাজরী'; 'শ্রেষ্ঠ দান' 'শিশুর প্রতি' 'স্মৃতি' 'তুমিই সব' প্রভৃতি কবিতা উল্লেখযোগ্য।

পত্রিকা-পরিচয়।

স্বাস্থ্য-সমাচার।—সম্পাদক ডাঃ শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র বসু এম-বি। ৪৫নং আমহার্ষ্ট ষ্ট্রীট—কলিকাতা 'স্বাস্থ্যধর্ম্ম-সঙ্ঘ' হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲ টাকা। প্রতি সংখ্যার মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

স্বাস্থ্য, শক্তি ও জাতীয় জীবন-বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় এই সচিত্র মাসিক-পত্রখানি বর্ত্তমান বৈশাখে সপ্তদশ বর্ষে পদার্পণ করিল। স্বাস্থ্যসম্বন্ধীয় আলোচনা ও জনসাধারণের মধ্যে স্বাস্থ্যজ্ঞান বিস্তার জন্য বঙ্গদেশে ও বঙ্গভাষায় ইহাই সর্ব্বপ্রথম পত্র। আলোচ্য সংখ্যায় ডাঃ শ্রীপঞ্চানন বসু এম-ডি (বার্লিন)-লিখিত রৌদ্রসেবন, ডাঃ শ্রীকার্ত্তিক চন্দ্র বসু এম-ডি-লিখিত 'বাঙ্গালীর অন্নসমস্যা' ও শ্রীউপেন্দ্রনাথ দে বি-ই সি-ই লিখিত 'বাঙ্গালার জল-সমস্যা'—এই তিনটী প্রবন্ধ বিষয়গুরুত্বে ও নানাবিধ জ্ঞাতব্য তথ্যে পরিপূর্ণ। 'বাঙ্গালার জলসমস্যা' প্রবন্ধে লেখক অনেকগুলি চিত্রসাহায্যে নলকূপের প্রয়োগপদ্ধতি বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। কলিকাতা স্বাস্থ্য প্রদর্শনী সম্বন্ধে যে বিবরণ প্রকাশিত হইয়াছে, উহা আরও ব্যাপকভাবে ও বিস্তৃত-আকারে সচিত্র হইয়া প্রকাশিত হইলে ভাল হইত; উহাতে জনসাধারণের অনেক-কিছু জ্ঞাতব্য ও শিক্ষিতব্য বিষয় ছিল। আমরা এই পত্রিকা খানির সাফল্যময় দীর্ঘজীবন কামনা করি।

মুকুল।—সম্পাদিকা শ্রীশকুন্তলা দেবী এম-এ। ৪০নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ২৲; প্রতি সংখ্যা ৵০ আনা মাত্র।

'মুকুল' বালক-বালিকাদিগের উপযোগী সচিত্র মাসিক পত্রিকা। ইহা প্রায় ২৫ বৎসর কাল বাঙ্গলার শিশু-সাহিত্যকে পুষ্ট ও শিশুদিগকে তুষ্ট করিয়া গত দশ বৎসর হইল উপযুক্ত সেবা ও সেবকের অভাবে শুকাইয়া গিয়াছিল। সম্প্রতি অনুকূল অবস্থায় নব বর্ষে নবপর্য্যায়ে ইহা আবার নূতনভাবে বিকসিত হইয়া উঠিল। সুখের বিষয়, বর্ত্তমান সম্পাদিকা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে যোগ্যতার সহিত ইংরাজী ও সংস্কৃত ভাষায় এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইলেও কর্ম্মসূত্রে স্বর্গগত জননীর সহিত বিগূঢ় সাহচর্য্যের আনন্দ ও আশীর্ব্বাদ লাভের জন্য ইনি তাঁহার জীবন হইতে প্রিয় এই অনারব্ধ সাহিত্য-ব্রত আপন জীবনে গ্রহণ করিয়াছেন। বর্ত্তমান সংখ্যায় ছবি, গল্প, কবিতা ও ধাঁধা প্রভৃতির দ্বারা শিশুচিত্তকে মুগ্ধ করিবার যেমন যুগোচিত আয়োজন হইয়াছে, তাহাদের জ্ঞাতব্য ও শিক্ষণীয় বিষয়েরও তেমনই সমাবেশ হইয়াছে।

প্রবাসী।—সম্পাদক শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়। ৯১নং আপার সারকুলার রোড, কলিকাতা 'প্রবাসী কার্য্যালয়' হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য সডাক ৬০ টাকা; প্রতি সংখ্যার নগদ মূল্য ॥০ আট আনা।

বাঙ্গালার প্রথম শ্রেণীর সাহিত্যিক পত্রিকাগুলির মধ্যে বর্ত্তমানে প্রবাসীই সকলের জ্যেষ্ঠ; বর্ত্তমান বৈশাখে ইহা অষ্টাবিংশ বর্ষে পদার্পণ করিল। আলোচ্য

সংখ্যাখানি রবীন্দ্রনাথের গদ্য-পদ্যের অনেকগুলি শ্রেষ্ঠ রচনায় অলঙ্কৃত। ইহা ব্যতীত, মহাত্মা রোমাঁ রোঁলার 'আত্মজীবনী' শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের 'ভারতশিল্প', সুযোগ্য সম্পাদকের 'স্বরাজের আবশ্যকতা ও আমাদের যোগ্যতা', সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের 'গৌড়ীয় শিল্পের আদিযুগ' এবং অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মেঘনাদ সাহার "ভোল্টা শতবার্ষিকী" প্রভৃতি উল্লেখযোগ্য বিশিষ্ট রচনা এবং বহু গল্প, কবিতা ও চিত্র প্রভৃতি বর্ত্তমান সংখ্যার গৌরব বর্দ্ধন করিয়াছে। কিন্তু কেবল এই জাতীয় রচনাসংগ্রহকেই আমরা প্রবাসীর শ্রেষ্ঠতার হেতু মনে করি না। প্রবাসীর 'বিবিধ প্রসঙ্গে' সমসাময়িক ঘটনাগুলির উপর সুযোগ্য সম্পাদকের যে সুচিন্তিত মন্তব্য সকল লিপিবদ্ধ হয়, উহাই আমরা প্রবসীর শ্রেষ্ঠতার অন্যতর প্রধান কারণ মনে করি। দুঃখের বিষয়, বর্ত্তমান সংখ্যায় নারীনৃত্যের উপর যে সুদীর্ঘ মন্তব্য লিপিবদ্ধ হইয়াছে, উহার মধ্যে প্রবীণ সম্পাদকের হৃদ্‌গত বাণী প্রকাশ হয় নাই বলিয়া মনে হয়, যেন অপর কাহারও মুখের দিকে তাকাইয়া তাকাইয়া প্রবন্ধটী রচিত হইয়াছে, প্রবন্ধটী পড়িলে ইহাই সুস্পষ্টরূপে প্রতিভাত হয়।

শোক-সংবাদ।

মহারাজা ৺পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও।—ময়ূরভঞ্জের মহারাজা পূর্ণচন্দ্র ভঞ্জ দেও গত ৮ই বৈশাখ শনিবার বেলা প্রায় ৩॥০ ঘটিকার সময় বোম্বাই নগরে ধনুষ্টঙ্কার-রোগে অকস্মাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুর দুই দিবস পূর্ব্বে ক্ষৌরকার্য্য করিতে করিতে হঠাৎ কাটিয়া গিয়া চিবুকে ক্ষত হয়। সেই ক্ষত বিষাক্ত হইয়া উক্ত দুর্ঘটনা সংঘটিত হইয়াছে। মৃত্যুকালে মহারাজার বয়স কেবলমাত্র ২৯ বৎসর হইয়াছিল। ইনি ইঁহার পূজনীয় পিতৃদেবের ন্যায় চরিত্রবান্, দয়াবান, বিনয়ী ও বিদ্যানুরাগী ছিলেন; এবং শিক্ষা বিস্তারের জন্য ইনি অকাতরে বহু অর্থ দান করিয়া গিয়াছেন। এরূপ জনপ্রিয় মহারাজকে অকালে হারান ময়ূরভঞ্জের পরম দুর্ভাগ্য। আমরা রাজপরিবার ও রাজমাতা সুচারু দেবীকে আমাদের আন্তরিক প্রগাঢ় সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান তাঁহাদের এই গভীর শোকে সান্ত্বনা দান পূর্ব্বক শোকান্তরিত আত্মার সুগতিবিধান করুন।

শ্রীসুহৃদকুমার গুপ্তের পুত্রবিয়োগ।—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অনুগত শিষ্য ৺তারিণীচরণ গুপ্তের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুহৃৎ কুমার গুপ্তের গত ১০ই আশ্বিন তারিখে জাত নবকুমার সপ্তমাস বয়ঃক্রম পূর্ণ হইতে না হইতে গত ৪ঠা বৈশাখ ভগবানের স্নেহক্রোড়ে ফিরিয়া গিয়াছে। আমরা শোকবিধুর পিতামাতা ও আত্মীয়-স্বজনকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়ের পুত্রবধূবিয়োগ। শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের চতুর্থ পুত্র শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের পত্নী গত ৯ই চৈত্র বৃহস্পতিবার অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। আমরা মাতৃবিয়োগবিধুর সন্তান-সহ শ্রীমান্ হেমেন্দ্রনাথকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান্ তাঁহার পত্নীর লোকান্তরিত আত্মার সুগতি বিধান করুন।

AN APPEAL.

In order to help the propaganda work of the Brahmo Samaj, we have organised a Brahmo Propaganda Centre at Gorakhpur, U. P., and provided it with a printing press of its own. We therefore think it necessary to keep in touch with all Brahmo Samajes in India and abroad, whether attached to the Adi, Nababidhan on Sadharan Somaj. For the pressent we have started a monthly paper the "Message" to which a special Brahmo Samaj supplimant is being added in which the activities of all samajes will be regularly published. We therefore most respectfully request the secretaries and members of all Brahmo Samajes to co-operate with us by subscribing to a copy of the "Message", the annual subscription of which is Rupee one only (post free) and by sending us notes on the activities in their respective centres and also helping us with articles and important sermons for inserting in the "Message." At present we shall confine ourselves to Engish only but arrangements are being made for Hindi also as medium of our propaganda. We hope our efforts will be appreciated by every member and sympathiser of the Brahmo Samaj.

Gorakhpur U. P. — SADANANDA. Editor, the Message.

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 46

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৫। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯। জ্যৈষ্ঠ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৷৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

১০১৮ সংখ্যা ১৮৫০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫।

নববর্ষে উদ্বোধন।

ভগবানের চরণে, সম্মুখের বৎসরের শতবিধ কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইবার পূর্ব্বে শত শত প্রণিপাত করিবার জন্য আজ আমরা শুভ নববর্ষের প্রথম দিবসে এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে সম্মিলিত হইয়াছি। গত বর্ষের দুঃখশোকের নিরাশা নিরানন্দের কত কঠিন আঘাত আমাদের বক্ষের উপকূলে আসিয়া লাগিয়াছে সত্য; কত অন্তর্ব্বিবাদ ও বহির্ব্বিবাদ আসিয়া আমাদিগকে কতবার কতনা কাতর ও বিমূঢ় করিয়া ফেলিয়াছে সত্য; কিন্তু আজ এই শুভক্ষণে সেই আঘাতবেদনার কথা, সেই বিবাদবিসম্বাদের কথা, ঝঞ্ঝাবাতের আঘাত সমস্তই ভুলিয়া যাইতে হইবে। অমৃতপুরুষের অমৃতসদনে উপস্থিত হইয়া মৃত্যুর বিভীষিকা অতিক্রম করিতে হইবে।

যে সত্যধর্ম্মের আহ্বানে আজ আমরা এখানে সম্মিলিত হইয়াছি, সেই সত্যধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, "সুখেদুঃখে, সম্পদেবিপদে, সকল অবস্থাতে সেই মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা পরমপুরুষের হস্ত উপলব্ধি করিতে হইবে। ইহাতেই আমাদের আনন্দ, ইহাতেই আমাদের গৌরব এবং ইহাই আমাদের উন্নততম অধিকার। সত্যধর্ম্মের বিজয়বিষাণ আজ জগত জুড়িয়া বাজিয়া উঠিতেছে। বিজয়লাভ এখন আমাদের হস্তগত বলিলেই চলে। এই শুভ মঙ্গল মুহূর্ত্তে সত্যধর্ম্মের আদিমতম উৎস এই পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসী—আমাদের পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। দৃষ্টান্ত দ্বারা, উপদেশের দ্বারা, সকল প্রকারে সর্ব্বতোভাবে সত্যধর্ম্মের দীপ্তদীপ অত্যুচ্চে ধারণ করিতে হইবে; প্রতি পল্লীকে প্রতি গৃহকে তাহার মঙ্গল আলোকে আলোকিত করিয়া তুলিতে হইবে; সমস্ত জীবন এই ব্রতের সাধনা করিয়া ভারতের সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতা বিদূরিত করিতে হইবে, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে—ভারতের মুখশ্রী উজ্জ্বল করিতে হইবে।

ভগবানে নির্ভর ও সাহস।

সত্যধর্ম্ম আমাদিগকে শিক্ষা দিতেছে যে, ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর কর এবং ধর্ম্মের পথে ও কর্ত্তব্যের পথে সাহসের সহিত অগ্রসর হও। আজ শুভ নববর্ষের প্রথম দিবসে তোমাদের সম্মুখে আমার এই অন্তরের বাণী উপস্থিত করিতেছি—ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর কর এবং ধর্ম্মের পথে ও কর্ত্তব্যের পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। যে ভগবান এই প্রকৃতির অধীশ্বর, যাঁহার আদেশে এই বিশ্বজগত যথানিয়মে স্বীয় কর্ত্তব্য সম্পাদন করিয়া চলিতেছে, তুমি সেই বিশাল প্রকৃতির, সেই বিরাট বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের অন্তর্ভুক্ত এক অতি ক্ষুদ্র প্রাণী হইয়া যদি সেই ভগবানের উপর নির্ভর করিতে না পার, তবে আর কাহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন করিয়া নির্ভয় হইবে? ইহা অভ্রান্ত ধ্রুব সত্য যে, তাঁহার উপর নির্ভর করিতে

না পারিলে অপর কাহারও উপর তোমার প্রকৃত নির্ভর আসিতে পারে না। বিশ্বস্রষ্টার উপর পরমপিতা পরম মাতার উপর যদি তুমি নির্ভর স্থাপন না কর, তবে তুমি কোন্ শক্তিবলে, কোন্ সাহসে অপরের উপর সেই নির্ভর রাখিবে? অপরের কথা দূরে থাক, তোমার ক্ষুদ্রতা যদি উপলব্ধি কর, তবে তুমি তোমার নিজের উপরেও সেই নির্ভর স্থাপন করিতে পারিবে না। নিজের ভিতর দিয়া প্রকৃতির অধীশ্বর ভগবানের সন্ধান লও এবং তাঁহাকে জানিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর কর; তোমার আত্মার স্বর্ণসিংহাসনে সমাসীন মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা পরম-পুরুষের মঙ্গলভাব উপলব্ধি করিয়া তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হও; তবেই তুমি তোমার নিজের উপরে এবং অপর সকলের উপরে প্রকৃত নির্ভর স্থাপন করিতে পারিবে। তখন তোমার নির্ভীকভাবে চিন্তা করিবার সামর্থ্য জন্মিবে; তখন তোমার নির্ভয়ে হৃদয়ের কথা বলিবার শক্তি ও অধিকার জন্মিবে; পদে পদে কথায় কথায় বিভীষিকার অন্ধকার তোমার অন্তরকে আচ্ছন্ন করিতে পারিবে না। সেই বিশ্বপতি পরম পুরুষের উপর নির্ভর সম্পূর্ণরূপে স্থাপন করিলে, তিনি স্বয়ং তোমার মনে যে তেজ ও সাহস প্রদান করিবেন, তাহার সন্মুখে কেহই দাঁড়াইতে পারিবে না।

ভীরু কাপুরুষের মত জনসংঘের কথায় সায় দিবার জন্য সায় দিয়া চলিও না। অন্তরে যাহা সত্য বলিয়া বুঝিবে, তাহাই নির্ভীক হৃদয়ে ধরিয়া থাকিবে এবং তাহাই নির্ভীকতার সহিত প্রকাশ করিবে। সত্যই হইল ভগবানের প্রত্যক্ষ স্বরূপ। সত্যকে ধরিলে ভগবানই তোমার আচারে ব্যবহারে, তোমার মনে ও বাক্যে সহজেই প্রকাশ পাইবেন। জোয়ারের সঙ্গে ভাসিয়া চলা, অধিকাংশ লোক যাহা চাহিবে, বিনা বিচারে তদনুসারে চলা কিছু কঠিন ব্যাপার নয়। অনেক স্থলেই দেখা যায়, জনসাধারণ কোন কার্য্যে আমোদ আহ্লাদ পাইলে হিতাহিত বিবেচনা না করিয়াই তাহার অনুসরণ করে। সেই আমোদ আহ্লাদে মাতিয়া সেই কার্য্যের সমর্থন করা কাহারও পক্ষে কিছুমাত্র কঠিন নয়। কিন্তু কঠিন হইতেছে—সেই কার্য্যকে অমঙ্গলজনক বলিয়া বুঝিলে, সত্যের জন্য নিজের ক্ষতি বা লাভ গণনা না করিয়া জনসংঘের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া সেই কার্য্যের বিরুদ্ধে নির্ভীকভাবে তোমার মত প্রকাশ করা। জনসংঘ হিতাহিত-বিবেচনাশূন্য হইয়া যখন বিপ্লব প্রার্থনা করে বা যুদ্ধ প্রার্থনা করে, তখন তাহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া শান্তিস্থাপনে উদ্যত হওয়া রাজার পক্ষে কিপ্রকার দুঃসাধ্য, তাহা ইতিহাসের ছত্রে ছত্রে সপ্রমাণ হয়। সমগ্র জাতি যখন প্রাচীন কালের জরাজীর্ণ কোন কুসংস্কারকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চায়, তখন তাহার সমর্থন করিয়া জনসাধারণের নিকট প্রশংসা লাভ করা কিছু কঠিন কার্য্য নয়। কিন্তু কঠিন হইতেছে—সেই কুসংস্কারের চরণে মস্তক অবনত করিবার পরিবর্ত্তে জনসাধারণের অপবাদ ও নিন্দালাভকেই পুরস্কাররূপে বরণ করিয়া সাদরে আলিঙ্গন করা। আমার এমন কি শক্তি আছে, এমন কি বল আছে যে, একটা সুবৃহৎ প্রবল সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে, একটা সমগ্র জাতির বিরুদ্ধে, সাড়ে তিনহস্ত পরিমিত ক্ষুদ্র মনুষ্য আমি—সত্যকে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য সাহসের সঙ্গে দাঁড়াইতে পারি, মৃত্যুভয়কেও তুচ্ছ করিতে পারি? আমার সে শক্তি নাই, আমার সে বল নাই। কিন্তু মৃত্যুঞ্জয় বিশ্বপতির দক্ষিণ হস্তকে যদি সহায়রূপে অবলম্বন করি, তবেই আমার সেই বল আসে, সেই শক্তি আসে। তখনই আমি নির্ভয়ে আমার নিজের নিকট খাঁটি থাকিবার সাহস লাভ করি। তখন আমি সত্যকে সত্য বলিতে, ভালকে ভাল বলিতে, এবং মিথ্যাকে মিথ্যা বলিতে ও মন্দকে মন্দ বলিতে কিছুমাত্র ভীত হই না।

এই প্রকার নির্ভীকভাবে কার্য্য করিবার পথে যে অনেক বাধা আসে, তাহা আমরা অস্বীকার করি না। সকল বিষয়ে মিথ্যা ভয় পাওয়া, প্রতিপদে বিভীষিকা দেখাই হইল সকল বাধার প্রধান বাধা। আমরা দেখিতে পাই যে, কোন শুভ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিতে গেলেই সর্ব্বপ্রথমে বিরুদ্ধ জনমতের বিভীষিকা বায়ু-গোলকের ন্যায় ফুলিতে থাকে এবং সত্যকে দেখিবার পথে কুজ্ঝটিকার একটা অন্তরাল দাঁড় করায়। কিন্তু শুভকার্য্যে সাহসের সহিত অগ্রসর হইলে সেই বিরুদ্ধ জনমতের বিভীষিকা মরীচিকার ন্যায় সহসা কোথায় অন্তর্হিত হইয়া যায়। সত্যের এমন এক শক্তি আছে যে, আমরা সত্যের সপক্ষে দাঁড়াইয়া অল্পমাত্র মনের দৃঢ়তা ও প্রতিজ্ঞাবল দেখাইলেই আমাদের অন্তরে তাহার শতগুণ শক্তি ও বল স্বতই সমুদ্ভূত হয়।

ভারতের ইতিহাস ছত্রে ছত্রে এই সত্য সপ্রমাণ করিতেছে। এই ভারতে প্রাচীন কালাবধি কত ধর্ম, কত প্রথা, কত অনুষ্ঠান সমুদিত হইয়াছে এবং কাল-ক্রমে জরাজীর্ণ হইয়া পড়িয়াছে। কিন্তু এদেশে শত সহস্র মহাপুরুষ সমুত্থিত হইয়া অবিশ্রামে সত্যের মাপ-কাঠিতে সেই সকল ধর্ম্ম প্রথা প্রভৃতি বিচার করিয়া উঁহাদের মধ্যে যেটুকু সজীব অংশ পাইয়াছিলেন, উত্তর-বংশীয়দিগকে জীবন প্রদান করিবার উপযুক্ত বিবেচনা করিয়াছিলেন, সেইটুকু অংশেই উত্তরাধিকারস্বরূপে আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা যে সত্যধর্ম্মের সন্ধান লাভ করিয়া আমাদের জন্য রাখিয়া গিয়াছেন,

তাহা সরল ও সবল এবং তাহা মানবমাত্রেরই প্রাণের গভীর তৃষ্ণা দূর করিতে সক্ষম। সেই সত্যধর্ম্ম অমৃতপুরুষ কর্ত্তৃক প্রবর্ত্তিত—তাহাতে কোন প্রকার জরাধর্ম্ম মৃত্যু-চিহ্ন লাগিবার সম্ভাবনা নাই।

বর্ত্তমানে সময় আসিয়াছে, যখন আমাদিগকে সেই সরল ও সবল সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া জরাধর্ম্ম অতিক্রম করিয়া নবজীবন লাভ করিতে হইবে। এখন আমরা যে সকল উপধর্ম্ম অনুষ্ঠান প্রভৃতি আঁকড়াইয়া ধরিয়া আছি, স্পষ্ট দেখিতেছি যে, সেগুলির অনেক অংশই জরাজীর্ণ হইয়া গিয়াছে, তাহাদের অন্তর্নিহিত মূল প্রাণটাই সজীব রহিয়াছে। কিন্তু যখন আমরা সেই জরাজীর্ণ অংশগুলি হইতে আপনাকে মুক্তিদানে অগ্রসর হই, তখন মৃত্যুর সহচর পর্ব্বতসমান বাধা আসিয়া আমাদের সেই কার্য্যে বাধা প্রদানে অগ্রসর হয়। তখন শ্রেয় ও প্রেয় দুই বিপরীত দিকে আমাদিগকে আকর্ষণ করে—শ্রেয় টানে মুক্তির দিকে, স্বাধীনতার অভিমুখে; প্রেয় টানে পরাধীনতার দিকে, মরণের অভিমুখে। সত্যধর্ম্মের নবতর আলোক লাভ করিয়া যিনি মুক্তির সুপ্রশস্ত গগনে বিচরণ করিতে চান, তিনি জরাজীর্ণ প্রাচীন প্রথা প্রভৃতি মূলক প্রেয়ের নিকটে যে বাধা প্রাপ্ত হন, সে বাধা অতিক্রম করা ভীরু কাপুরুষের কার্য্য নয়; তাহা অতিক্রম করিতে চাহিলে হৃদয়কে বীরের উপযুক্ত সৎসাহসে পূর্ণ করিতে হইবে। ঋষিরা সত্য কথাই বলিয়াছেন—নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ—দুর্ব্বল, পদে পদে ভয়ত্রস্ত ব্যক্তির পক্ষে ভগবানকে লাভ করা সম্ভব নয়, সত্যধর্ম্মকে হৃদয়ে ধারণ করা সম্ভব নয়।

সম্মুখের নূতন বৎসরে শ্রেয়ের পথে মঙ্গলের পথে সাহসের সহিত অগ্রসর হইবার জন্য ভগবান আমাদিগকে ডাক দিয়াছেন। সেই প্রাণস্য প্রাণঃ পরমাত্মার অনুপ্রাণনে আজ বিশ্বজগত স্পন্দিত হইয়া উঠিয়াছে। ভগবানের প্রেরণা আজ জগত জুড়িয়া নামিয়াছে। জননীর এই আদরের ডাক শুনিয়া কে অলসের ন্যায় পথের ধারে পড়িয়া থাকিবে? উত্থান কর, জাগ্রত হও। সর্ব্বপ্রকার কুসংস্কারের বিরুদ্ধে, সর্ব্বপ্রকার উপধর্ম্মের বিরুদ্ধে বুদ্ধং দেহি বলিয়া দাঁড়াইয়া যাও। আঘাত লাগিবার ভয়ে ব্যথা পাইবার ভয়ে উপধর্ম্ম, কুসংস্কার প্রভৃতির চরণে মস্তক অবনত করিলে চলিবে না। সুখভোগের লালসায়, সোয়াস্তির প্রত্যাশায় শুভকার্য্যের অনুষ্ঠানে, ধর্ম্মসংগ্রামে পরাংমুখ হইয়া থাকিলে, আলস্যবালিশে মাথা দিয়া নিদ্রাবিহ্বল হইয়া থাকিলে চলিবে না। ভগবানের যে প্রেরণা বিশ্বজগত ব্যাপ্ত করিয়া নামিয়াছে, সেই প্রেরণা আমরা সকলে অন্তরে ধারণ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইলে চক্ষের পলক পড়িতে না পড়িতে ধরাধাম স্বর্গরাজ্যে পরিণত হইবে। বুদ্ধদেব বল, চৈতন্য দেব বল, যিশুখৃষ্ট বল, মহম্মদ বল, বাবা নানক বল, কবীর বল, এই সকল মহাপুরুষ অন্তরে যে প্রেরণা লাভ করিয়াছিলেন, সেই প্রেরণার বিপরীত কথা তাঁহারা প্রচার করেন নাই; আচারে ব্যবহারে, মনে ও বাক্যে তাঁহারা স্ব-স্ব প্রেরণার নিকট খাঁটি ছিলেন। তাই জগতবাসী আগ্রহের সহিত ইঁহাদের বাণী শুনিয়া কৃতার্থ হয়। কিন্তু আমাদের প্রাণের ভিতর নীরব অনাহত শব্দে ভগবানের যে বাণী নিরন্তর ধ্বনিত হইতেছে, তাহা যদি আমরা প্রতিনিয়ত শ্রবণ করিয়া অনুসরণ করি, তাহা হইলে সহজেই উপলব্ধি করিব যে, আমাদেরও মহত্ত্ব কোন মহাপুরুষ অপেক্ষা কম নয়।

মহাপুরুষদিগেরও প্রতি যদি আমরা যথার্থ শ্রদ্ধা দেখাইতে চাই, তবে তাঁহাদের বাণী শুধু কানে শুনিয়া রাখিলেই চলিবে না। সকল বাধা অতিক্রম করিয়া তাঁহাদের মঙ্গল বাণীসকল কার্য্যে পরিণত করিবার উপযুক্ত সাহস অন্তরে ধারণ করা চাই। আমরা সংসারের পথে এমন লোক অনেক বেশী দেখি, যাঁহারা অন্তরে সত্যধর্ম্মের মহিমা উপলব্ধি করিয়াছেন, কিন্তু জীবনের কর্ম্মক্ষেত্রে সেই সত্যধর্ম্মকে সর্ব্বতোভাবে কেন্দ্রে রক্ষা করিতে পারেন নাই। তাঁহারা অন্তরে শ্রেয়ের আহ্বান শুনিয়াও প্রেয়ের আলিঙ্গন অতিক্রম করিতে পারেন নাই, সংসারের সুখসোয়াস্তির মধুর কূজন অতিক্রম করিতে পারেন নাই। তবু তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিবার, দূরে সরাইয়া রাখিবার অধিকার আমাদের নাই। আমাদের বুঝিতে হইবে—তাঁহাদের প্রাণে মুক্তির বিজয় বার্ত্তা বাজিয়া উঠিয়াছে; আজ না হোক, কাল না হোক এক সময়ে না এক সময়ে তাঁহাদিগকে এই মুক্তির পথে আসিয়া দাঁড়াইতেই হইবে। আমাদের বুঝিতে হইবে, প্রেয়ের কঠিন বাঁধন ভাঙ্গিয়া বাহির হইয়া পড়িবার জন্য যে শক্তি আবশ্যক, যে বলের প্রয়োজন, এখনও তাঁহারা সে শক্তি সে বল অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। আমরা তাঁহাদিগকে ঘৃণা করিব না সত্য, কিন্তু এই নববর্ষের মুখে আমরা এমন নরনারী চাই, যাঁহারা প্রেয়কে জয় করিবার, প্রেয়ের বাঁধন ভাঙ্গিয়া শ্রেয়কে অবলম্বন করিবার জন্য সমস্ত দুঃখকষ্ট আনন্দিতচিত্তে বহন করিবার সাহস রাখেন, যাঁহারা ভগবানের আহ্বান শুনিয়া চলিবার তুলনায় সকল সুখ সকল সোয়াস্তি অনায়াসেই তুচ্ছ করিতে পারেন।

আমরা যাঁহাদিগকে মহাপুরুষ বলি, শ্রেয়কে অবলম্বন করিবার দৈব সাহস যে কেবল তাঁহাদেরই ছিল বা আছে তাহা নহে। ভগবান আমাদের পিতা, ভগবানই আমাদের মাতা—এই সরল সত্যের উপর দাঁড়াইয়া

তাঁহার চরণে উপস্থিত হও, তোমাদেরও অন্তরে এই দৈব সাহস অনন্ত প্রদীপের ন্যায় জলিয়া উঠিবে। উহার দৃষ্টান্ত জগতের ইতিহাসে বিরল হইলেও নিতান্ত বিরল নহে। প্রহ্লাদ এইভাবে ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়াই না অগ্নিকে ভয় করেন নাই, জলকে ভয় করেন নাই; আত্মীয় স্বজন সকলেরই অত্যাচার হাসিমুখে বহন করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। ধ্রুবের কাহিনীও এই সত্যই সমর্থন করে। সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়াছিলেন বলিয়াই পাণ্ডবগণ ভগবানের সাক্ষাৎ পাইয়া বীরপদভরে ধর্ম্মসংগ্রামে অগ্রসর হইয়া কৌরবদিগের দ্বিগুণপ্রায় বাহিনীকেও বিধ্বস্ত করিতে পারিয়াছিলেন। এই প্রকার সত্যধর্ম্মকে উপলব্ধি করিবার কারণেই যিশু খৃষ্টের শিষ্যগণ কত না ভীষণ অত্যাচার অনায়াসে বুক পাতিয়া সহ্য করিয়াছিলেন। সত্যধর্ম্মের সাক্ষাৎ পাইয়াছিলেন, পরমাত্মাকে পিতামাতা বলিয়া উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই এই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা রাজা রামমোহন রায় অন্তরে শতবিধ অত্যাচার সহ্য করিবার সাহস ধারণ করিয়াছিলেন। ভগবান এমন বিধান করিয়াছেন যে, আমরা যদি একনিষ্ঠভাবে সুখসাচ্ছন্দ্যেরই প্রতি ধাবমান হই, প্রেয়মাত্র লাভের জন্যই যদি প্রাণপাত করি, তাহা পাইলেই যদি সন্তুষ্ট হই, তবে তাহা পাইতে পারিব; কিন্তু পরিণামে দেখিব যে, সে সমস্তের আসলে কোনই মূল্য নাই। আবার যদি সমস্ত হৃদয় দিয়া ভগবানকেই প্রার্থনা করি, তবে তাঁহাকেই লাভ করিব; নিজের নিকট যদি খাঁটি থাকিতে চাই, তবে আমার আত্মা সজীব হইয়া উঠিবে, নিত্য শান্তি ও আনন্দ লাভ করিবে; শত বিপদের তরঙ্গ, শত দুঃখের আঘাত আমাকে সেই মঙ্গলের পথ হইতে বিচলিত করিতে পারিবে না।

যদি শ্রেয়ের পথে চলিতে চাও, যদি দৈব সাহসের অধিকারী হইতে চাও, তবে ভগবানের উপর একান্ত নির্ভর কর এবং নির্ভয় হও। নিশ্চয় জানিও, যিনি এই বিশ্বের স্রষ্টা ও পালক, তিনি তোমার প্রতি পদক্ষেপ জানেন, তিনি তোমার প্রতি অশ্রুবিন্দু দেখিতেছেন। তাঁহার চরণে তোমার সমস্ত দুঃখ নিবেদন করিয়া দাও—তোমার জীবন কি আশ্চর্য্যরূপ লঘু হইবে, তোমার সর্ব্বাঙ্গের ব্যথা কোথায় অন্তর্হিত হইবে। তাঁহার উপর একান্ত নির্ভর কর—হয় তিনি তোমার সকল দুঃখ সকল ব্যথা বহন করিবার উপযুক্ত বল প্রদান করিবেন, অথবা তাঁহার আশ্চর্য্য প্রণালীতে তোমার অন্তরে শান্তিবারি বর্ষণ করিবেন। তাঁহার অভয় চরণ ধরিয়া থাকিলে সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা দূরে পলায়ন করিবে। সকল ভয়ের যিনি ভয়, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভর স্থাপন কর এবং সংসার-সংগ্রামে সাহসের সহিত অগ্রসর হও—কোনও বিষয়েই ভয় তোমাকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

বন্ধুগণ! সকল বিষয়ে ভয়ের গণ্ডী যদি অতিক্রম করিতে চাও, মৃত্যুর বিভীষিকার যদি উপরে উঠিতে চাও, তবে প্রাণের প্রভু যিনি, তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি সমর্পণ কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে, তাঁহার আদেশ পালনে আপনাকে সর্ব্বদাই নিরত রাখ, জগতের সর্ব্বত্র তাঁহার মঙ্গলভাবের পরিচয় পাইবে, সর্ব্বত্র তাঁহার প্রত্যক্ষ আবির্ভাব সহজেই উপলব্ধি করিবে—তাঁহার জন্য তোমাকে দিশাহারা হইয়া ছুটিয়া বেড়াইতে হইবে না। জীবন্ত জাগ্রত ভগবানের তুমি অনুচর হইয়া থাক এবং তাঁহাকে তুমি সর্ব্বদাই তোমার সঙ্গে লইয়া চল। তাঁহাকে তোমার করুণাময় পিতা, স্নেহময়ী জননী বলিয়া প্রাণের ভিতর উপলব্ধি কর; দুঃখ কষ্টে পড়িয়া যখন হাবুডুবু খাইবে, তখন তাঁহাকে বন্ধু বলিয়া কাতরকণ্ঠে ডাক, তাঁহার স্নেহপূর্ণ বাণী শুনিয়া তাঁহার পথে চল, তোমার সমস্ত দুঃখকষ্ট সকল বিপদ আপদ কি এক অমোঘ শক্তিতে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইবে—আমার অভিজ্ঞতালব্ধ এই প্রত্যক্ষ সত্য গ্রহণ কর। জ্যোৎস্নাধবলিত সুনীল আকাশে, বিশুভ্র পুষ্পের বিমল হাসিতেও তাঁহাকে প্রত্যক্ষ কর; আবার ভীষণ ঝঞ্চাবাতের মধ্যে, দুঃখবিপদের কঠোর কশাঘাতের মধ্যেও তাঁহার মঙ্গলহস্ত অনুভব কর। তিনি তোমার নিকট হইতেও নিকটে আছেন—এই সত্যটী প্রত্যক্ষভাবে উপলব্ধি কর।

আমি অন্তরে যে বাণী লাভ করিয়াছি, সেই বাণীই আমি সর্ব্বসমক্ষে প্রকাশ করিতেছি—কান পাতিয়া অন্তরে ভগবানের অভয় বাণী শ্রবণ কর, তাঁহার উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হও এবং সম্পূর্ণ নির্ভয় হও। দেখিবে, তোমার অন্তরে কি অদম্য সাহস আসে। সেই সাহসের সম্মুখে অধর্ম্ম অন্যায় প্রভৃতি মৃত্যুর সহচরগণ ভয়ে কম্পমান হইবে। এই জন্যই ভগবৎভক্তের চরণে কত রাজা, কত সম্রাটের মুকুট স্থাপিত হয়। এই প্রকার সাহসী বীর ভগবৎভক্তেরাই জগতকে সজীব রাখিয়াছেন। এই সাহসের ভিত্তি ক্ষণিক উত্তেজনা নয়; হৃদয়ের গভীর বিশ্বাসই ইহার ভিত্তি। সাময়িক মতামতের বাতাস যে দিকেই বহমান হোক না কেন, ভগবানে নির্ভরশীল ব্যক্তি সত্যের উপর পর্ব্বতের ন্যায় অটলভাবে দাঁড়াইয়া থাকেন। কথায় কথায় বিরোধ বিবাদ উপস্থিত করা এই সাহসের পরিচয় নয়, বিবেকের নিকট খাঁটি থাকাই এই সাহসের পরিচয়।

আমরা যে সত্যধর্ম্ম অবলম্বন করিয়াছি, যে সত্যধর্ম্মের আহ্বানে আজ আমরা এখানে উপস্থিত হইয়াছি,

তাহা সত্যই বীরের ধর্ম, সাহসী একনিষ্ঠ ভক্তের ধর্ম, সপ্তাহে একদিন দুই এক ঘণ্টা এখানে আসিয়া উপাসনায় যোগদান করিলেই আমাদের কর্ত্তব্যের পরিসমাপ্তি হয় না। সর্ব্ববিধ কুসংস্কার, সর্ব্ববিধ উপধর্ম্ম প্রভৃতির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যেদিন ভগবানকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করাই তাঁহার উপাসনা, সত্যধর্ম্মের এই বীজমন্ত্রকে জীবনের প্রতি বিভাগে কার্য্যে পরিণত করিতে পারিব; যে দিন ভীরু কাপুরুষের ন্যায় প্রেয়ের অনুসরণ না করিয়া বলের সহিত তেজের সহিত শ্রেয়কে সকল দুঃখের মধ্যে সকল আঘাত সহ্য করিয়াও আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিব, সেই দিন আমাদের সত্যধর্ম্ম গ্রহণ সার্থক হইবে। এসো, নববর্ষের প্রারম্ভে ভগবানকে সম্মুখে রাখিয়া সত্যধর্ম্ম গ্রহণকে সার্থক করিবার প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(শ্রী বসন্তকুমারী বসু)

কলিকাতার সুপ্রসিদ্ধ ঠাকুরপরিবারে ভক্তিভাজন দেবেন্দ্রনাথ জন্মগ্রহণ করেন। ১৮১৭ খৃষ্টাব্দে তাঁহার জন্ম, এবং ১৯০৫ খৃষ্টাব্দে তিনি পরলোক গমন করেন। কলিকাতা তাঁহার জন্মস্থান। তিনি দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র। ইঁহার ন্যায় ব্রহ্মানুরাগী ও মানবপ্রেমিক ব্যক্তি অতি বিরল। শৈশবে ইনি পিতামহী কর্ত্তৃক পালিত হন, এবং উভয়ে উভয়কে অত্যন্ত ভাল বাসিতেন। পিতামহীকে গঙ্গাযাত্রা করান হইলে সেই শ্মশানেই তাঁহার বৈরাগ্য জন্মে, এবং ভগবানকে জানিবার আকুল আগ্রহ এবং তত্ত্বানুসন্ধানের একান্ত অনুরাগ সঞ্জাত হয়। শ্মশান হইতে ফিরিয়া আসিবার পরই তাঁহার মন পবিত্র বৈরাগ্যানলে বিশোধিত হইয়া নিত্য নিত্য উর্দ্ধদিকেই গমন করিতে থাকে। কিছুদিন পরে ঈশোপনিষদের একখানি ছিন্ন পত্র তাঁহার সম্মুখ দিয়া উড়িয়া যাইতেছিল, তিনি তাহা কুড়াইয়া লইলেন, এবং তাহার মর্ম্ম অবগত হইয়া নিগূঢ় ব্রহ্মতত্ত্বের কিছু পাইলেন মনে করিয়া সাতিশয় প্রীত হইলেন। পরে ব্রহ্মপ্রতিপাদক তত্ত্বসমূহের প্রচারের জন্য 'তত্ত্ববোধিনী সভা' স্থাপন, ও 'তত্ত্ববোধিনী' মাসিক-পত্রিকার প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার উন্নত ও সুললিত ভাষা এবং তৎপ্রচারিত গূঢ়তম তত্ত্বজ্ঞান ও বিজ্ঞানসমূহ দ্বারা জনসমাজের অশেষবিধ কল্যাণ সাধিত হইয়াছে। আজিও এই পত্রিকা তাঁহার বংশপরম্পরা দ্বারা সুপরিচালিত ও প্রশংসিত হইয়া দেশের সুমহৎ মঙ্গল সাধন করিতেছে।

তিনিই আদিব্রাহ্মসমাজের প্রবর্ত্তক। আদিব্রাহ্মসমাজ হইতেও একাল পর্য্যন্ত গভীর তত্ত্বজ্ঞানসমূহ প্রচারিত হইয়া আসিতেছে। তাঁহার স্বরচিত জীবন-চরিত পাঠ করিয়া সকলকেই মুগ্ধ ও বিস্ময়ান্বিত হইতে হইয়াছে। এই জীবনচরিত বঙ্গসাহিত্যের একটী শ্রেষ্ঠ রত্ন। তাঁহার অতুলনীয় ব্রহ্মানুরাগ ও ধর্ম্মপ্রাণতায় বিমুগ্ধ হইয়া ব্রাহ্মগণ তাঁহাকে 'মহর্ষি' আখ্যায় ভূষিত করিয়াছিলেন। যথার্থই তিনি 'মহর্ষি' নামের উপযুক্ত মানব ছিলেন। তিনি প্রায় সর্ব্বদাই ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান ও ব্রহ্মানন্দরস-পানে নিমগ্ন থাকিতেন। ব্রহ্মজ্ঞানানুরাগ, ব্রহ্মধ্যান, সত্যনিষ্ঠা, স্বার্থত্যাগ, বৈরাগ্য, ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যসাধনানুরাগ প্রভৃতি কয়েকটী অনুপমেয় আদর্শস্থানীয় এবং লোকশিক্ষাপ্রদ সুমহৎ গুণে দেবেন্দ্রনাথ ভূষিত ছিলেন। তাঁহার জীবনে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য বিশেষভাবে পরিলক্ষিত ও পরিদর্শিত হইয়াছিল। তিনি রাজর্ষি জনকের ন্যায় সংসারী হইয়াও মহা বৈরাগী ছিলেন। ধন সম্পদ যশ মান ও পুত্রকন্যায় তাঁহার গৃহ সমুজ্জ্বল থাকিলেও তিনি নির্জ্জনবাস ভাল বাসিতেন; সেজন্য অনেক সময় তিনি সাধন-ভজনের অনুকূল উদ্যানভবন, কিম্বা উন্নত গিরিশৃঙ্গে যাইয়া বসতি করিতেন। যৌবন কালেই বৈরাগ্য তাঁহার হৃদয় অধিকার করিয়াছিল। যৌবনেই অতুল ধন-সম্পদ, ঐশ্বর্য্য-বিভব, রাজোচিত শয্যা ও পরিচ্ছদাদি, অধিকাংশই দান করিয়া কেবল আবশ্যকমত রাখিয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিয়াছিলেন।

তাঁহার দৃঢ়তম সত্যনিষ্ঠা সকলেরই অনুকরণীয়। তাঁহার পিতা সুবিখ্যাত দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাধনী হইলেও তাঁহার অত্যন্ত ব্যয়বাহুল্য ও দানশীলতা থাকাতে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকা ঋণ করিয়া গিয়াছিলেন; সেই পিতৃঋণের জন্য মহর্ষিকে ঋণদায়গ্রস্ত হইতে হইয়াছিল। যখন উত্তমর্ণগণ নিজ নিজ প্রাপ্য অর্থের প্রার্থী হইলেন, তখন আত্মীয়-স্বজন অনেকেই মহর্ষিকে ধন সম্পদ বেনামী বা গোপন করিয়া ফেলিতে বলিলেন, কিন্তু মহর্ষি ত সাধারণ মানব নহেন। তিনি সে সকল কিছুই শুনিলেন না, তিনি নিজের হীরকাঙ্গুরীয়কটী পর্য্যন্ত উত্তমর্ণগণকে দেখাইয়া দিলেন। তাঁহার ঋণের হিসাব গণনার জন্য একদিন একটী বৃহতী সভা আহূত হইয়াছিল, তাহাতে বহুতর গণ্য-মান্য, ধনী এবং রাজন্যবর্গ সমবেত হইয়াছিলেন। যখন হিসাবের খাতাপত্র দেখা শেষ হইল, তখন স্থির হইল যে, মহর্ষির কিছুই থাকিবে না, তিনি এখন হইতে পথের ভিখারী হইলেন;

তাহা শুনিয়াও মহর্ষি কিছুমাত্র বিচলিত হইলেন না, তাঁহার অতুলনীয় ধৈর্য্য, গাম্ভীর্য্য অটলভাবেই রহিল; কিন্তু বহুতর ধনী সম্ভ্রান্ত ও সহৃদয় ব্যক্তিগণ তাঁহার ভবিষ্যৎ অবস্থা স্মরণ করিয়া অশ্রু সম্বরণ করিতে পারিলেন না। উত্তমর্ণগণ অনেকে ত্যাগ স্বীকার করিলেন, ইহাতে মহর্ষির ঋণভার লঘু হইল বটে, কিন্তু তখনও বহু-পরিমাণে ভার রহিল। পরে, মহর্ষি পরিমিত ব্যয় ও নিজ পরিশ্রমলব্ধ উপার্জ্জিত অর্থের দ্বারা সেই অবশিষ্ট ঋণসমূহ পরিশোধ করিয়াছিলেন, তথাপি কিছুমাত্র অসত্যের অনুসরণ করেন নাই।

ঈশ্বরের প্রিয়কার্য্যানুরাগ তাঁহার এতই প্রবল ছিল যে, প্রিয় কার্য্যের নিমিত্ত তিনি অনেক সময় সাক্ষাৎভাবে তাঁহার আদেশবাণী শুনিতে পাইতেন। একদা তিনি কোন পর্ব্বতে ধ্যান ধারণার জন্য গমন করিয়াছিলেন। সেখানে একদিন ধ্যানান্তে পর্ব্বতের নির্ঝরিণীর নিকট উপবিষ্ট হইয়া তাহার অনুপম শোভা নিরীক্ষণ করিতেছিলেন, এমন সময় তাঁহার হৃদয় মধ্যে অন্তর্যামীর বাণী সমুচ্চারিত হইল। "দেবেন্দ্র! এই নির্ঝরিণী যেমন শত বাধা-বিঘ্ন অতিক্রম করিয়া নিম্নগামিনী হইয়া পৃথিবীর অশেষবিধ মঙ্গল সাধনের জন্য অগ্রসর হইতেছে, তুমিও তেমনই নিম্নে অবতরণ করিয়া বহুপ্রকারে ধরণীর হিতসাধনে রত হও।" এই বাণী শুনিবামাত্র তিনি অস্থির-চিত্ত হইয়া পড়িলেন। গৃহে আসিয়া ভৃত্যকে বলিলেন,— "আগামী কল্যই আমাকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে, তুমি যাত্রোপযোগী সমস্ত ব্যবস্থা কর।" সেই তাঁর প্রিয়তম ঈশ্বরের মধুময় বাণী শুনিয়া অবধি তিনি এতই বিমনা ও অস্থির হইয়াছিলেন যে, সমস্ত রজনী তাঁহার নিদ্রা আসিল না, পরদিবসই তিনি নিম্নে অবতরণ করিয়া কলিকাতায় যাত্রা করিলেন।

কলিকাতায় আগমন করিয়া তিনি ঈশ্বরের যে সমস্ত প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়াছিলেন, তাহা অতুলনীয় ও অনির্ব্বচনীয়। পুস্তকরচনায়, বাগ্মিতায়, সত্যনিষ্ঠায়, ব্রহ্মানুরাগে, নিজ জীবনের সুমহৎ দৃষ্টান্তে, মানবের যাহাতে শরীর মন আত্মার বিশেষ মঙ্গল সাধিত হয়, তাহার সাধনায় নিরত ছিলেন।

মহর্ষির জীবন—জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্য—পবিত্রতাময় ত্রিবেণী-সঙ্গম। ইহা মানবের পুণ্যময় মহাতীর্থ। এই মহাতীর্থের স্মরণ, মনন ও আদর্শানুসারে গমনরূপ মহাপুণ্যফলে—আমরা মানব নামধারী সকলে প্রকৃত মানব নামের যোগ্য হইতে পারি।

সাত্ম্য ও পথ্য।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

যে ব্যক্তির পক্ষে যে বস্তুর ব্যবহার দেহের অনুকূল তাহাই তাহাই তাহার পথ্য। এই অনুকূলতার নামই পরমার্থতঃ সাত্ম্য। আমি দীর্ঘকাল যাবৎ পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি যে, পথ্যাপথ্য ব্যক্তিগত এবং অবস্থাগত। চিকিৎসা শাস্ত্রে পথ্যাপথ্য বলিয়া যাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, তাহা নিতান্তই স্থূল। কাণাদদর্শনে বিশেষ নামক স্বতোব্যাবৃত্ত যে পদার্থ স্বীকৃত হইয়াছে; যাহার প্রভাবে এক পরমাণু হইতে অপর পরমাণুর ভেদ অনুমিত হয়, বিশেষভাবে পর্য্যালোচনা করিলে মনে হয় যে, সাত্ম্যের মূলেও সেই বিশেষ পদার্থই অবস্থান করিতেছে। রাম ঘি খাইলে খুব ভাল থাকে, কিন্তু শ্যাম একেবারেই তাহা সহ্য করিতে পারে না। ইহার কারণ খুঁজিতে প্রবৃত্ত হইলে, পরিণামে ইহাই বলিতে হইবে যে, রামের দেহে এমন পদার্থ আছে, যাহা ঘৃত জীর্ণ করিতে সমর্থ, পক্ষান্তরে শ্যামের দেহে তাহা নাই অথবা বিরোধী পদার্থ রহিয়াছে। সুতরাং সর্ব্বজনীন পথ্য ও অপথ্য পদার্থ জগতে অসম্ভব। চিকিৎসক যত বড়ই হউন না কেন, যদি তিনি রোগীর সাত্ম্যের প্রতি লক্ষ্য না করিয়া পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিতে যান, তবে বুঝিতে হইবে যে তিনি চিকিৎসা-কার্য্যে বড়ই অর্ব্বাচীন। চিকিৎসা-শাস্ত্রানুযায়ী পথ্যাপথ্য-ব্যবস্থা অনেকেরই সুবিদিত। কিন্তু ইহার ব্যভিচার যে পদে পদেই সপ্রমাণ হইয়া থাকে, তদ্বিষয়ে অনেকের জ্ঞান নাই। আমি ক্রমে কতিপয় পথ্য পদার্থের উল্লেখ করিয়া, দেশ-কাল-পাত্রভেদে দ্রব্যগুণের বৈচিত্র্য দেখাইব, সুধীগণ তদ্বিষয়ে মনোনিবেশ করিবেন।

পথ্যাপথ্য-জ্ঞাপক পুস্তকের প্রথম ভাগে পুরাতন তণ্ডুলের অন্ন সুপথ্য বলিয়া লিখিত হয়। আয়ুর্ব্বেদ প্রভৃতি শাস্ত্রেও পুরাতনান্নের ভূয়সী প্রশংসা দেখিতে পাওয়া যায়। নীতিশাস্ত্রেরও উপদেশ—

"সেবকান্নং পুরাতনম্"

কিন্তু আমি নিজের শরীরে এবং আত্মপরিবারে ইহার যে সুস্পষ্ট ব্যভিচার লক্ষ্য করিয়াছি এবং বিশ্বাসভাজন ব্যক্তিদিগের নিকট যাহা অবগত হইয়াছি তাহা লিপিবদ্ধ করিতেছি।

আমি অজীর্ণের একজন পুরাতন রোগী। ঊনত্রিংশ বৎসর যাবৎ রাজসাহী সহরে বাস করিতেছি। পেটে বায়ু হওয়া এবং কোষ্ঠকাঠিন্য এই দুইটী রোগ এখানে অনেকেরই আছে। আমার সহিত এতদুভয়ের নিত্যসম্বন্ধই

বলিষ্ঠতা। প্রকৃতিও আমারই অনুরূপ। বেলা তিনটার পর হইতে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত পেট ফাঁপা এবং উহার কম বেশ লক্ষ্য করিয়া তদনুসারে রাত্রিতে খাওয়া বা না খাওয়ার ব্যবস্থা করিতে আমরা অভ্যস্ত। সুতরাং খাদ্যদ্রব্যের মধ্যে কোন্‌টি অনুকূল ও কোন্‌টি প্রতিকূল তাহা বিশেষরূপে লক্ষ্য করিয়া থাকি।

এপ্রদেশে ফাল্গুন মাসের পূর্ব্বে নূতন চাউল ব্যবহার করা হয় না। আমরাও তাই পুরাতন সরু চাউলই মাঘ মাস পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতাম। আমাদের ময়মনসিংহ প্রদেশে কিন্তু অগ্রহায়ণ মাস হইতেই নূতন চাউল খাওয়া হয়। কারণ ঐ দেশের চাউল বর্ষা হইতেই অনাস্বাদ হইয়া উঠে। নূতন বড়ই মুখপ্রিয়। সুতরাং সর্ব্বসাধারণে নূতন চাউলই খাইতে ভালবাসে। সুস্থ শরীরে উহাতে অনিষ্টও হয় না। কিন্তু রাজসাহীতে দীর্ঘকাল থাকিয়া সেই রীতি ভুলিয়া গিয়াছিলাম। তিন বৎসর পূর্ব্বে ভাদ্রমাস হইতে প্রবল অজীর্ণে ভুগিতেছিলাম। তৎপর আশ্বিনের শেষ হইতে সম্পূর্ণ কার্ত্তিক মাস জ্বরে আক্রান্ত থাকিয়া অগ্রহায়ণের প্রথম ভাগে জ্বর হইতে অব্যাহতি পাইয়াও পেটে অত্যন্ত বায়ু হওয়ায় এবং প্রবল অরুচিতে খুব কষ্ট পাইতে লাগিলাম। এই ভাবে সমস্ত অগ্রহায়ণ মাস কাটিয়া গেল। শরীর ক্রমে কঙ্কালসার হইয়া পড়িল। সূক্ষ্ম হইতে সূক্ষ্মতম পুরাতন তণ্ডুল ব্যবহার করিলাম, কিন্তু ফল কিছুই হইল না। অবশেষে পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহেই একদিন নূতন চাউলের ভাত খাইলাম। মনে বড় ভয় হইল, কি জানি কি হয়। কিন্তু অনিষ্ট কিছুই হইল না; প্রত্যুত পেটে বায়ুর সঞ্চার কম হইল। ক্রমে উহাই খাইতে লাগিলাম, উদরাধ্মান কমিতে লাগিল, অরুচিও সারিয়া গেল। ইহাতে বেশ বুঝিতে পারিলাম যে, আমি এমত অবস্থায় উপনীত হইয়াছি, যাহাতে আমার পক্ষে নূতন তণ্ডুলই হিতকর। নিজের শরীরে পরীক্ষার পর পত্নীর শরীরেও নূতন তণ্ডুলের উপযোগিতা উপলব্ধি করিয়াছি।

আমার প্রতিবেশী স্বর্গীয় ঈশ্বরচন্দ্র তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ক্রমে তিন বৎসর রক্তামাশয়ে ভুগিয়া জীবনে নিরাশ অবস্থায় নূতন চাউলের ভাত খাইয়া অব্যাহতি পাইয়াছিলেন। কথাপ্রসঙ্গে তিনি আমার নিকট সেই কথা বলিয়াছিলেন। তাঁহার কথার স্মরণ আমার নূতন তণ্ডুল ভক্ষণপ্রবৃত্তির উত্তেজক হইয়াছিল। ইহাও বলা আবশ্যক যে, উক্ত তর্কসিদ্ধান্ত মহাশয় ত্রিশ বৎসরের অধিককাল রংপুরের অন্তর্গত পীরগঞ্জ গ্রামে বাস করিতেছিলেন।

উদরাময়ের পক্ষে কড়্‌লিতার অম্বল ব্যবস্থাসিদ্ধ নহে, তদ্বিরুদ্ধ নানা প্রক্রিয়ায় দ্রব্যান্তরের সহিত উহা মিশ্রিত করিয়া উদরাময়ী পথ্য প্রস্তুত হইয়া থাকে। কিন্তু আমার গ্রামবাসী শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের দেহে কড়্‌লিতারের গুণবৈচিত্র্য লক্ষ্য করিয়াছি। ইনি একজন উদরাময়ী, মাঝে মাঝে পাতলা দাস্ত হওয়ায় অনেক সময় জব্দ হইয়া পড়েন। ইঁহার শরীরে কফের আক্রমণও আছে। সুতরাং সময় সময় কড়্‌লিতার খাইতে বাধ্য হন। কিন্তু কড়্‌লিতার খাইতে আরম্ভ করিলেই ইঁহার পেটের গোলমাল দূর হইয়া যায়।

মাগুর মাছ রোগীর পথ্য বলিয়া সকলের নিকট পরিচিত। কিন্তু আমাদের গ্রামবাসী স্বর্গীয় শম্ভুচন্দ্র ভট্টাচার্য্য মহাশয়ের উদরে অজ্ঞাতভাবেও মাগুর মাছের ঝোল প্রবিষ্ট হইলে প্রবল বমন হইয়া সমস্ত খাদ্য উঠিয়া যাইত।

ব্যক্তিভেদে এইরূপ দ্রব্যগুণের বৈচিত্র্য অনেক স্থলেই প্রমাণসিদ্ধ। সুতরাং এতদ্বিষয়ের সমর্থনের জন্য অধিক পল্লবতা অনাবশ্যক।

আমি প্রথমতঃ বাঙ্গালীদিগের খাদ্যবর্গের মধ্যে প্রধান খাদ্য তণ্ডুলের বিষয়েই আলোচনায় প্রবৃত্ত হইলাম।

বাঙ্গালায় সিদ্ধান্ন বা সিদ্ধ চাউল অনেক স্থানেই প্রচলিত। উক্ত চাউল সম্বন্ধে এখন বিবিধ আলোচনা চলিতেছে। তন্মধ্যে এক প্রকার ধর্ম্মের দিক্ দিয়া, আর এক প্রকার পথ্যতার দিক দিয়া। একদল বলিতেছেন; সিদ্ধ চাউল খাওয়াতেই বাঙ্গালী ব্রাহ্মণের জাতিনাশ হইয়াছে। উহার ব্যবহাররূপ অনাচার আর কুত্রাপি নাই।

পাশ্চাত্য-শিক্ষানিরত বিশ্লেষণকুশল চিকিৎসকমণ্ডলী সপ্রমাণ করিয়াছেন এবং প্রচার করিতেছেন যে অন্নের সারভাগ (শ্বেতসার) ধান্যের স্বেদনপ্রক্রিয়ায় বিনষ্ট হয়, অধিকন্তু মণ্ডত্যাগ অর্থাৎ মাড় গালান প্রক্রিয়ায় অন্নের সারভাগ চলিয়া যায়। সুতরাং দেশবিশেষে চা ব্যবহারে যেমন সিদ্ধ চাএর কাথ পরিত্যাগ এবং তাহার অসার অংশ গৃহীত হইয়াছিল, এবং উপহাসের বিষয়রূপে অদ্যাপি উল্লিখিত হইয়া থাকে, বাঙ্গালীর এই অসমীক্ষ্যকারিতাও তদনুরূপ।

আমার অত্রত্য প্রতিবেশী ডাক্তার শ্রীমান্ গিরিজাকান্ত চক্রবর্ত্তী এম-ডি আমাকে একদিন কথাপ্রসঙ্গে জিজ্ঞাসা করিলেন যে, সিদ্ধান্নের ব্যবহার কতকাল হইতে বাঙ্গালায় প্রচলিত হইয়াছে? গুণানুসন্ধানে সিদ্ধান্নের উপকারিতা উপলব্ধ হয় না; প্রত্যুত গুণহীনতাই সপ্রমাণ হয়। সুতরাং অনাবশ্যক প্রয়াস-সাধ্য ব্যাপারে বাঙ্গালীর প্রবৃত্তির কারণ কি? তাঁহার কথায় বাস্তবিকই আমার বিস্ময়ের ও কৌতুকের যুগপৎ উপস্থিতি হইয়াছে। কারণ তাঁহার মত একজন চিকিৎসাশাস্ত্র-পারদর্শ

সুনিপুণ পণ্ডিত-বংশপ্রসূত বাঙ্গালী যে দেশের খবর জানেন না, আমাদের পক্ষে ইহা কম পরিতাপের বিষয় নহে। অতএব কতকাল হইতে বাঙ্গালায় সিদ্ধ চাউল ব্যবহৃত হইতেছে; এবং এই প্রক্রিয়ার উদ্ভাবন কোথা হইতে হইয়াছে এবং উহা পথ্য কি অপথ্য তাহার নির্ণয়ের চেষ্টা করা যাউক।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় একাদশীতত্বে হবিষ্যোক্ত দ্রব্যনির্দেশ প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,

"অত্রাস্থিরমিত্যুপাদানাদন্যত্র স্থিরধান্যে ন দোষঃ।" ইহার অর্থ, এই স্থলে (হবিষ্যপ্রকরণে) অস্থির ধান্যের উল্লেখ থাকায় হবিষ্যের ইতর স্থলে সিদ্ধ ধানের চাউল খাওয়া দোষজনক নহে; অর্থাৎ দৈনন্দিন ভোজনে সিদ্ধ ধানের চাউল খাওয়াতে কোন দোষ নাই। তিনি নিজের মত সমর্থনের জন্য হারীতের বচন এবং কল্পতরু নামক প্রাচীন-নিবন্ধকারের ব্যাখ্যা প্রভৃতি উদ্ধৃত করিয়াছেন। যথা—

"অতএব হারীতঃ। অথ সূনাঃ ব্যাখ্যাস্যামঃ। জঙ্গম-স্থাবরাদীন্ প্রাণিনঃ সূদয়ন্তীতি সূনাঃ। তাশ্চ পঞ্চবিধা ভবন্তীতি উপক্রম্য চতুর্থী পর্য্যন্তমভিধায়, আদীপন-তাপন-স্বেদন-ভর্জন-পচনাদিভিঃ পঞ্চমী তদেবং পঞ্চতা। নিরয়যোনী রহরহঃ প্রজাঃ কুর্ব্বন্তি। পঞ্চভি-র্যজ্ঞৈ গৃহস্থ-বানপ্রস্থং পাবয়ন্তীতি।"

হারীত বলিয়াছেন,—অনন্তর আমরা সূনার ব্যাখ্যা করিব। জঙ্গম এবং স্থাবর এই দুই প্রকার প্রাণীর বিনাশ করে বলিয়া ইহাদের নাম "সূনা"; সেই সূনা পাঁচ প্রকার। এই উপক্রম করিয়া, চতুর্থী সূনা পর্য্যন্ত নির্দ্দেশের পর বলা হইয়াছে যে, আদীপন তাপন স্বেদন ভর্জ্জন ও পচন প্রভৃতি ব্যাপারে পঞ্চমী সূনা সম্পন্ন হয়। অতএব সূনার সংখ্যা পাঁচ। উক্ত পঞ্চ সূনা প্রতিদিন মানবদিগকে নরকপ্রাপ্তির যোগ্য করে।

অনন্তর কল্পতরু রচয়িতার ব্যাখ্যা উদ্ধৃত হইয়াছে। "এষামর্থঃ কল্পতরুকৃতা কৃতঃ। সূদয়ন্তি প্রাণৈর্বিয়োজয়ন্তি। আদীপনং কাষ্ঠাদিনাং। তাপনং তোয়াদেঃ। স্বেদনং ধান্যাদেঃ। ভর্জ্জনং যবাদেঃ। পচনং তণ্ডুলাদেঃ।

পঞ্চ সূনাঃ পঞ্চযজ্ঞৈঃ সূনাদোষাৎ পাবয়ন্তীত্যর্থঃ।"

প্রাণ বিয়োগ করানর নাম সূদন। "আদীপন" কাষ্ঠাদি জ্বালান। জল প্রভৃতি উষ্ণ করা "তাপন"। ধান্য প্রভৃতি সিদ্ধ করা "স্বেদন"। যব প্রভৃতি ভাজা "ভর্জ্জন"। তণ্ডুল প্রভৃতি জলে সিদ্ধ করিয়া অন্নাদিরূপে পরিণত করা "পচন"। উক্ত পঞ্চ সূনাজনিত পাপ পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা গৃহস্থকে ও বানপ্রস্থকে সূনাদোষ হইতে রক্ষা করে (স্বাস্থ্যবিনাশের দ্বারা)।

অনন্তর রঘুনন্দন অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে,

"এতেন ধান্যস্বেদনং গৃহস্থবানপ্রস্থয়োঃ কর্ত্তব্যমিতি প্রতীয়তে। কিন্তু তত্র ধান্যস্যাঙ্কুরজননযোগ্যতানাশা-দেব পাপং ভবতি। তচ্ছান্তিরপি পঞ্চযজ্ঞৈর্ব্বা। অতএব মনুনাপি* পঞ্চসূনাবিবরণে চুল্লীত্যুক্তম্।

ইহা দ্বারা বুঝা যাইতেছে যে গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের ধান্যস্বেদন অর্থাৎ ধান সিদ্ধ করা কর্ত্তব্য। কিন্তু স্বেদন-ব্যাপার নিবন্ধন ধান্যের অঙ্কুরজনন-যোগ্যতার বিনাশ করা হয় বলিয়াই পাপ হয়। সেই পাপের শান্তিও পঞ্চযজ্ঞের দ্বারা সম্পন্ন হয়, এরূপ বুঝিতে হইবে। এই হেতুই মনু পঞ্চসূনাপ্রকরণে চুল্লীর উল্লেখ করিয়াছেন। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, চুল্লীতে ধান্যাদি সিদ্ধ করা হয়, সুতরাং চুল্লী প্রাণিহিংসার একটি স্থান।

"ধান্যাদৌ স্বেদন-বিধানাৎ (কৃতা)-কৃত এব পাক-শুদ্ধিবিবেচনং, বিঃস্বিন্নাদি দোষশ্চ নাকৃতে।

অতঃপর রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, ধান্যাদির স্বেদন বিহিত হইয়াছে; অতএব পাকশুদ্ধিবিবেচনা অর্থাৎ কাহার পাক শুদ্ধ কাহার পাক অশুদ্ধ ইত্যাকার বিচার ও বিঃস্বিন্নাদি দোষ কৃত পদার্থেই বুঝিতে হইবে, অকৃত প্রকৃত পদার্থে এই সকল বিবেচনা নাই।

তদ্বিবৃতং কাত্যায়নেন,

"কৃত-মোদনশক্ত্বাদি তণ্ডুলাদি কৃতাকৃতম্।
ব্রীহ্যাদি চাকৃতং প্রোক্তং ইতি হব্যং বিধানতঃ॥

মহর্ষি কাত্যায়ন এই বিষয়টি বিবৃত করিয়াছেন। যথা—অন্ন ছাতু প্রভৃতি কৃত। তণ্ডুল ডাইল প্রভৃতি কৃতাকৃত এবং ব্রীহি যব প্রভৃতি অকৃত নামে পরি-ভাষিত। অতএব হব্য অর্থাৎ হোমীয় পদার্থ শাস্ত্রানু-সারে তিন প্রকার।

"অতএব লাজ-মোদকাদি যথাতথা পক্বমপি শ্রাদ্ধাদৌ দীয়তে।" অতএব লাজ মোদক (খৈ-লাড়ু) প্রভৃতি যে কোন প্রকারে পক্ব হইলেও অর্থাৎ শূদ্রাদি কর্ত্তৃক পক্ব হইলেও শ্রাদ্ধাদি কার্য্যে প্রদত্ত হইয়া থাকে।

প্রদর্শিত গ্রন্থের তাৎপর্য্য হইতে বুঝা যায় যে, কৃতান্নে অর্থাৎ ভাত প্রভৃতি পদার্থেই পাকশুদ্ধির বিচার, ধান্যাদি যে কোন ব্যক্তি সিদ্ধ করুক না কেন তাহাতে কোন বিচার নাই। কারণ স্বেদন ও পচন এক পদার্থ নহে। লোকব্যবহারে দেখা যায়, ধান সিদ্ধ করিতেছে, ভাত পাক করিতেছে, এইরূপ প্রয়োগ হইয়া থাকে। ধান পাক করিতেছে, এমত প্রয়োগ কখনও হয় না। তণ্ডুলকে সিদ্ধ করিলেই যে তাহার অন্ন সংজ্ঞা হয়

---

* মনু—পঞ্চ সূনা গৃহস্থস্য চুল্লীপেষণ্যুপস্করঃ।
কণ্ডনী চোদকুম্ভশ্চ বধ্যতে যাস্তু বাহয়ন্॥

এতদ্বিষয়ের প্রমাণ প্রাচ্ছতত্ত্বে উদ্ধৃত হইয়াছে। মহর্ষি বশিষ্ঠ বলিয়াছেন—

"শস্যং ক্ষেত্রগতং প্রাহুঃ সতুষং ধান্যমুচ্যতে।
আমং বিতুষমিত্যুক্তং স্বিন্নমন্ন-মুদাহৃতম্॥

অর্থ—ধান্য যব প্রভৃতি যে পর্য্যন্ত ক্ষেত্রে অবস্থিত হয়, তখন সেইগুলিকে শস্য বলা হয়। অনন্তর সতুষ অবস্থায় অবস্থিত হইলে ধান্য নামে অভিহিত হয়। বিতুষ অর্থাৎ তুষরহিত তণ্ডুলের নাম আম, অর্থাৎ আমান্ন। উক্ত আমান্নই স্বিন্ন অর্থাৎ সিদ্ধ হইলে অন্ন নামে কথিত হয়।

শূলপাণি মহামহোপাধ্যায়ের মতে অন্নশব্দের মুখ্যার্থ শুকধান্যের তণ্ডুলবিকার-বিশেষ, যাহার অপর নাম ওদন অর্থাৎ ভাত। তাঁহার উক্তি এইরূপ "অন্নপায়-শব্দঃ শূকধান্যতণ্ডুলবিকারবিশেষ ওদনএব প্রসিদ্ধঃ" (প্রায়শ্চিত্ত-বিবেক, সুরাপানপ্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণ)। রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্যের মতও ইহারই অনুরূপ। কিন্তু ভবদেব ভট্টের মতে ব্রীহিধান্যের বিকার ওদন এবং পিষ্টক প্রভৃতি অন্ন। যথা—"অন্নশব্দশ্চ ব্রীহিবিকারএব ওদন-পিষ্টকাদৌ প্রসিদ্ধঃ।" (প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ—মুদ্রিত পুস্তক ৪৫পৃঃ)।

মুনিবচনের অর্থ হইতে এবং স্মৃতিনিবন্ধরচয়িতাদিগের ব্যাখ্যা হইতে সুস্পষ্ট প্রতীয়মান হয় যে, চাউল সিদ্ধ করিলেই অন্ন হয়, এবং ধান সিদ্ধ করিলে তাহা স্বিন্ন ধান্য নামে কথিত হয়। ইহাও প্রতীয়মান হয় যে, ধান্য সিদ্ধ করার প্রণালী ঋষিযুগে অর্থাৎ মানবসভ্যতার প্রারম্ভেই উদ্ভাবিত হইয়াছিল। ইহাও বুঝা যায় যে, স্বেদন-ব্যাপারে ধান্যের অঙ্কুরজনন শক্তির বিলোপ নিবন্ধন পাপ সত্ত্বেও উহা গৃহস্থ ও বানপ্রস্থের কর্ত্তব্য বলিয়া অবধারিত হইয়াছিল। সুতরাং সমাজসংস্থাপয়িতা ঋষিগণ স্বিন্নধান্য তণ্ডুলের যে গুণ বিশেষ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, তাহাতে আর কোন সন্দেহ নাই।

হবিষ্যে স্বিন্নধান্য নিষিদ্ধ। হবিষ্যভক্ষণ ব্রহ্মচর্য্যের একটি নিয়ম। ইহা হইতে মনে হয় যে, নিরামিষভোজনকারী ব্রহ্মচারীর পক্ষে স্বিন্নধান্যের তণ্ডুল-ব্যবহার অনুকূল নহে। পক্ষান্তরে আমিষভোজী গৃহস্থ ও বানপ্রস্থ এতদুভয়ের পক্ষে স্বিন্নধান্য তণ্ডুল উপযোগী।

গৃহস্থ দারমেধী, কতক বানপ্রস্থও দারমেধী। কারণ অনেকে স্ত্রী সঙ্গে লইয়াই বনে গমন করিতেন। মৎস্য-ভোজী বাঙ্গালী স্বিন্নধান্য তণ্ডুলের উপকারিতা বুঝিতে পারিয়াই স্মরণাতীত কাল হইতে ইহার ব্যবহার করিয়া আসিতেছেন। স্বিন্নতণ্ডুলভোজী বাঙ্গালীগণ দুর্ব্বল বা অকর্ম্মঠ নহে। বাঙ্গালীর বুদ্ধিবৃত্তিও অন্যের তুলনায় হীন নহে। সুতরাং বঙ্গদেশবাসী বাঙ্গালীর পক্ষে সিদ্ধ চাউল "সাত্ম্য" সুতরাং ইহাই বাঙ্গালীর পথ্য। চাউলের গুণাগুণ বুঝিতে বাঙ্গালী সমর্থ। কারণ তাহারা চিরদিনই ভাত খাইয়া জীবনধারণ করিতেছে।

বিশ্লেষণ ক্রিয়ার দ্বারা সাত্ম্য নির্দ্ধারণ হইয়া উঠে না। দধি ঘোল মধু প্রভৃতি পদার্থের গুণ আয়ুর্ব্বেদাদি গ্রন্থে যেরূপ বর্ণিত হইয়াছে, ভারতবাসী চিরদিন ব্যবহারের দ্বারা উক্ত পদার্থের গুণ যেরূপ বুঝিয়াছে, পাশ্চাত্য দেশবাসীর পক্ষে সেরূপ বুঝা অদ্যাপি সম্ভবপর নহে। কারণ তাঁহারা অত্যল্পদিন যাবৎ এই সকল পদার্থের সহিত পরিচিত হইয়াছেন। বিশেষতঃ স্থানভেদে এক-একটি পদার্থের বিভিন্ন গুণ পরিলক্ষিত হয়। মাদ্রাজদেশে 'চারুপানী' না খাইয়া মানুষ বাঁচিতে পারে না। বাঙ্গালী অথবা হিন্দুস্থানীও সেখানে গেলে চারুপানী খাইতে বাধ্য হন। তেঁতুল এবং লঙ্কামরিচ একত্র করিয়া জলের সহিত দীর্ঘকাল জ্বাল দিলে যে কাথ প্রস্তুত হয়, উহারই নাম চারুপানী। ভোজনের সময় ইহা মাঝে মাঝে পান করিতে হয়।

বাঙ্গালীর মধ্যে এমন লোক আছেন, যাঁহারা আতপান্ন সহ্য করিতে অসমর্থ। পণ্ডিতপ্রবর বামনদাস বিদ্যারত্ন মহাশয় বলিয়াছেন, তাঁহার পিতা স্বনামধন্য পণ্ডিত ৺দুর্গাচরণ তর্করত্ন মহাশয় আতপ চাউল সহ্য করিতে পারিতেন না। আমার পরিচিতও অনেক লোক আছেন, যাঁহারা আতপান্ন খাইতে একেবারেই অসমর্থ। রাঢ়দেশে এবং দক্ষিণ-বঙ্গে অনেক বিধবাও আতপ চাউল সহ্য করিতে পারেন না। উত্তরবঙ্গবাসী ও পূর্ব্ববঙ্গবাসিগণ বিধবার এই অনাচারদর্শনে বিরুদ্ধ সমালোচনা করিতে অভ্যস্ত। এই বিষয়টি লইয়া বহুদিন পূর্ব্বে তর্ককেশরী পণ্ডিতকুলপতি স্বর্গীয় ভবশঙ্কর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের টোলে পূর্ব্ববঙ্গবাসী ও দক্ষিণবঙ্গবাসী ছাত্রদিগের মধ্যে এক শাস্ত্রীয় বিবাদ উপস্থিত হইয়াছিল। পূর্ব্ববঙ্গবাসী ছাত্রগণ দক্ষিণবঙ্গবাসীদিগকে উপহাস করিতেন যে, তোমাদের দেশে বিধবাগণ সিদ্ধ চাউল খায়। এই সূত্রে বিবাদ উপস্থিত হইলে অধ্যাপক বিদ্যারত্ন মহাশয় যুক্তিকৌশলে বিরুদ্ধ সমালোচক পূর্ব্ববঙ্গবাসীকে নিরস্ত করিয়াছিলেন। তিনি বিরুদ্ধ সমালোচকদিগকে জিজ্ঞাসা করিলেন, তোমরা বিধবার সিদ্ধ চাউল খাওয়া পাপজনক মনে কর কেন?

উঃ—হবিষ্যোক্ত দ্রব্যের মধ্যে উহা অগ্রাহ্য বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

প্রঃ—হবিষ্যে কোন্ কোন্ বস্তু উক্ত? উত্তরপ্রসঙ্গে বচনাবলীর উপন্যাস।

"হৈমন্তিকং সিতাস্বিন্নং ধান্যং মুদ্গাস্তিলা যবাঃ।
কলায়-কঙ্গু-নীবারা বাস্তূকং হিলমোচিকা॥

ষষ্টিকা কালশাকঞ্চ মূলকং কেমুকেতরৎ।
লবণে সৈন্ধবসামুদ্রে গব্যে চ দধিসর্পিষী ॥
পয়োঽনুদ্ধৃতসারঞ্চ পনসাম্র-হরীতকী।
তিন্তিড়ী জীরকঞ্চৈব নাগরঙ্গঞ্চ পিপ্পলী ॥
কদলীলবলীধাত্রী ফলান্যগুড়মৈক্ষবম্।
অতৈলপক্কং মুনয়ো হবিষ্যান্নং প্রচক্ষতে ॥

অগস্ত্যসংহিতায়াং—

দধিক্ষীরং ঘৃতং গব্যং ঐক্ষবং গুড়বর্জ্জিতম্।
নারিকেলফলঞ্চৈব কদলীং লবলীন্তথা ॥
আম্র-মামলকঞ্চৈব পনসঞ্চ হরীতকীম্।
ব্রতান্তরপ্রশস্তঞ্চ হবিষ্যং মন্যতে বুধৈঃ ॥

অনন্তর বিদ্যারত্ন মহাশয়ের প্রশ্ন—তোমাদের দেশে বিধবারা লাউ কুমড়ো বেগুণ ঝিঙ্গা পটল প্রভৃতি তরকারী, বুট অরহর প্রভৃতি ডাইল খায় কি না?

উঃ—হাঁ খায়।

প্রঃ—এই সকল দ্রব্য হবিষ্যে উক্ত আছে কি? উত্তরপক্ষ উত্তরদানে নিরস্ত হইলে অধ্যাপকমহাশয় স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া বলিলেন যে, তোমাদের দেশেও বিধবাগণ হবিষ্যান্ন ভোজন করেন না, নিরামিষ খাইয়া থাকেন; দক্ষিণবঙ্গেও বিধবাগণ নিরামিষ খান। সিদ্ধ চাউল আমিষ বলিয়া কোথাও উক্ত হয় নাই।

অধ্যাপক মহাশয়ের অভিমত শ্রবণে ছাত্রগণ বলিলেন, বিধবার পক্ষে সিদ্ধ চাউল ভক্ষণ বৃহদ্ধর্ম্মপুরাণের বচনে নিষিদ্ধ আছে।

যথা—"স্বিন্নমন্নং পৃথুকং শুদ্ধং দেশবিশেষকে।
নাত্যন্তশস্তং বিপ্রাণাং ভোজনে চ নিবেদনে।
অভক্ষ্যং বিধবানাঞ্চ যতীনাঞ্চৈব সর্ব্বশঃ ॥"

অধ্যাপক মহাশয় বচন শুনিয়া হাস্যপূর্ব্বক বলিলেন, এই বচন কোন নিবন্ধকারকর্ত্তৃক গৃহীত হয় নাই; সুতরাং উহার মূল আছে কিনা সন্দেহ। সমূল হইলেও উক্ত বচন হইতে সিদ্ধ চাউলের শুদ্ধাশুদ্ধতা বুঝা যায় না। কারণ স্বিন্ন শব্দের অর্থ কি, তাহা রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য শ্রাদ্ধতত্ত্ব প্রভৃতি গ্রন্থে বিশেষ করিয়া বলিয়া গিয়াছেন। বিষ্ণুবচনে শ্রাদ্ধে বর্জ্জনীয় বস্তুর নির্দ্দেশ আছে। যথা—

"কুষ্মাণ্ডালাবুবার্ত্তাকী-গ্রাম্যমাহিষদুগ্ধকম্।
পালঙ্কীং রাজিকাং শ্রাদ্ধে স্বিন্নঞ্চ বিবর্জ্জয়েৎ ॥"

কুষ্মাণ্ড লাউ বার্ত্তাকী গ্রাম্য মাহিষদুগ্ধ পালঙশাক রাই এবং স্বিন্ন দ্রব্য শ্রাদ্ধে বর্জ্জন করিবে। স্বিন্ন শব্দে কি বুঝিতে হইবে, তাহাও রঘুনন্দন খুলিয়া বলিয়া গিয়াছেন।

"স্বিন্নঞ্চ তদেব যৎ সূপকার-শাস্ত্রোক্তাপেক্ষিত-পাকনিষ্পত্ত্যনন্তরং শৈত্যাদিনিবৃত্তয়ে পুনঃ পাকান্তরযুক্তং। নত্বর্দ্ধপাকানন্তরং তচ্ছাস্ত্রোক্ত-সম্ভারণরূপপাকাসুরসিদ্ধং ব্যঞ্জনাদি। অতীতার্থে ক্ত-নির্দ্দেশাৎ। অতএব তিলাদি ভৃষ্টানন্তরং গুড়াদি-পক্কং মোদকাদি শিষ্টৈর্দীয়তে ভুজ্যতে চ।"

পাকশাস্ত্রোক্ত পাকনিষ্পত্তির অনন্তর পক্ক বস্তু শীতল হইয়া গেলে, তাহাকে আবার উষ্ণ করিবার জন্য যে পাকান্তর বলা হইয়াছে, তাহাই স্বিন্ন। অর্দ্ধপাকের পর পুনরায় নামাইয়া পাকশাস্ত্রানুসারে যাহাতে সম্ভার দেওয়া হয়, সেই ব্যঞ্জন প্রভৃতি স্বিন্ন নহে। কারণ স্বিদ্ ধাতুর পর কর্ম্মবাচ্যে অতীতার্থে বিহিত ক্ত-প্রত্যয়যোগে "স্বিন্ন" এই পদটি নিষ্পন্ন হইয়াছে। ইহার তাৎপর্য্য এই যে, যে দ্রব্যের পাকক্রিয়া অতীত হইয়াছে, তাহাতেই স্বিন্ন পদ প্রযুক্ত হইতে পারে। অর্দ্ধপক্ক অবস্থায় স্বিন্ন পদ ব্যবহৃত হইতেপারে না। এই জন্যই তিল প্রভৃতি ভাজিয়া পরে গুড় প্রভৃতির সহিত পক্ক মোদক প্রভৃতি শিষ্টগণ দৈবপিত্র্য-কার্য্যে দিয়া থাকেন এবং ভোজন করিয়া থাকেন।

উপাধ্যায় মহাশয়ের উপদেশশ্রবণে ছাত্রদিগের সংস্কার মার্জ্জিত হইল। অধ্যাপক-পরম্পরাক্রমে আমরা এই বৃত্তান্তটি অবগত আছি।

দশহরা।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

মানব কর্ত্তৃক যে সমস্ত পাপ অনুষ্ঠিত হয়, শাস্ত্রকারগণ তাহাদিগকে তিন ভাগে বিভক্ত করিয়াছেন; যথা—কায়িক, বাচিক ও মানসিক। সংহিতাকার মনু বলিয়াছেন "শুভাশুভফলং কর্ম্ম মনোবাগ্দেহসম্ভবং" মানসিক বাচনিক ও শারীরিক এই তিন প্রকার কর্ম্মেই শুভ বা অশুভ ফল জন্মে। তাই উক্ত সংহিতাকার নিজ সংহিতার দ্বাদশ অধ্যায়ে বলিয়াছেন—

পরদ্রব্যেষভিধ্যানং মনসানিষ্টচিন্তনম্।
বিতথাভিনিবেশশ্চ ত্রিবিধং কর্ম্ম মানসম্ ॥

পরদ্রব্য লাভের আলোচনা, লোকের অনিষ্টচিন্তন, ঈশ্বরে ও পরলোকে অবিশ্বাস, এই তিন প্রকার মানসিক কুকর্ম্ম।

পারুষ্যমনৃতঞ্চৈব পৈশুন্যঞ্চাপি সর্ব্বশঃ।
অসম্বদ্ধপ্রলাপশ্চ বাঙ্ময়ং স্যাৎ চতুর্ব্বিধম্ ॥

নিষ্ঠুর বাক্য, মিথ্যা কথা, পরোক্ষে পরনিন্দা এবং অসম্বদ্ধ প্রলাপ বাক্য এই চারি প্রকার বাচনিক কুকর্ম্ম।

অদত্তানামুপাদানং হিংসা চৈবাবিধানতঃ।
পরদারোপসেবা চ শারীরং ত্রিবিধং স্মৃতম্ ॥

অদত্ত ধন গ্রহণ, অবিহিত হিংসা ও পরদারসেবা, এই তিন প্রকার শারীরিক কুকর্ম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে ব্রাহ্মধর্ম-গ্রন্থ সংকলন করেন তাহার দ্বিতীয় খণ্ডে পঞ্চদশ অধ্যায়ে এই তিনটি শ্লোক স্থান পাইয়াছে। উপরে যে শ্লোক উদ্ধার করা হইল তাহা হইতে বুঝা যায় যে মানসিক পাপ তিনটি, বাচিক বা বাচনিক পাপ চারিটি এবং শারীরিক কুকর্ম বা পাপ তিনটি। তাহা হইলে পাপের মোটামুটি সমষ্টি দশটি এবং মানুষ নিজের শরীর, মন ও বাক্য দ্বারা তাহার অনুষ্ঠান করিয়া থাকে।

ত্রিদণ্ডং এতন্নিক্ষিপ্য সর্ব্বভূতেষু মানবঃ।
কামক্রোধৌ তু সংযম্য ততঃ সিদ্ধিং নিযচ্ছতি॥

সকল প্রাণীর হিতার্থে আপনার মন, বাক্য ও শরীর এই তিনকে দমন করিয়া এবং কাম ও ক্রোধকে সংযত করিয়া মানব সিদ্ধি প্রাপ্ত হয়।

উপরে যে দশবিধ পাপের উল্লেখ হইল, তাহার সদর্থ বাহির করিবার জন্য শাস্ত্রকারগণ যুক্তিসহ গভীর ভাবে আলোচনা করিয়াছেন। কিন্তু আমরা সহজবুদ্ধিতে উহার অর্থ এই বুঝি যে, ধর্মমার্গে যাঁহারা উন্নতিকামী, তাঁহাদের পক্ষে প্রতিদিন আলোচনা করিতে হইবে এবং আত্মপরীক্ষা করিয়া দেখিতে হইবে যে, উপরি-উক্ত কোন পাপে তিনি লিপ্ত হইলেন কি না। বিশেষ সাবধানতার সহিত পদবিক্ষেপ করিতে না পারিলে এই দশবিধ পাপ হইতে মানুষ আত্মরক্ষা করিতে পারে না। অন্তরে দৃঢ়তা চাই, সমনস্ক হওয়া চাই, তবেই আমাদের অব্যাহতি, অন্যথা জীবনের পবিত্রতা রক্ষা বড়ই সুকঠিন।

মানুষ সামাজিক জীব। দশ জনের কল্যাণ-অকল্যাণের সহিত তাহার জীবন বিজড়িত। কেবলমাত্র নিজে নিষ্পাপ হইলে চলিবে না, যাহাদের দ্বারা আমি পরিবেষ্টিত সেই দশ জনকে ঠেলিয়া তুলিতে হইবে উন্নতির দিকে, নিষ্পাপ অবস্থার দিকে। আমরা নিজের কল্যাণ দেখিব, প্রতিবাসী ও স্বজাতির কল্যাণ দেখিব, আমরা প্রত্যেকেই এই বিধির অধীন। আমরা প্রতিদিন না পারি, অন্ততঃ বৎসরের মধ্যে একদিন সকলকে বিশেষভাবে স্মরণ করাইয়া দিব যে, উপরি-উক্ত দশবিধ পাপ মানবের ঘোর শত্রু। সমবেত ও সমষ্টিগত ভাবে এ কথাটি বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন নিজ নিজ জীবনে স্মরণ করিতে ও উহা ঘোষণা করিতে হইবে। পবিত্র, পরিশুদ্ধ ও প্রতিদিন উন্নত হইবার উপদেশ শাস্ত্রের ভিতরে যথেষ্ট পরিমাণে আছে, কিন্তু সমাজের সকল লোক যাহাতে মিলিতভাবে ঐসব সত্য বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিনও নিজ নিজ জীবনে বরণ করিয়া লয়, এই গূঢ় উদ্দেশ্যে শাস্ত্রকারগণ এদেশে এক-একটি বাহ্য অনুষ্ঠানের ব্যবস্থা করিয়া গিয়াছেন। দশহরা উৎসব বা পর্ব্ব উহার মধ্যে অন্যতম।

অন্য দিক দিয়া আমরা যদি স্থিরভাবে চিন্তা করি তাহা হইলে সুস্পষ্ট বুঝিতে পারিব যে, এদেশে বহুধা বিভিন্ন মানবমণ্ডলীর ভিতরেও যে ভাবে, চিন্তায় ও আচরণে বহুদিন হইতে ঐক্য ও মিলনের ভাব বিদ্যমান রহিয়াছে তাহা ঈদৃশ অনুষ্ঠান প্রবর্ত্তনের কৌশলে ও উহার ফলে। যে দেশ স্বাধীন তাহাদের মধ্যে একমনা হইবার নানাবিধ সুবিধা ও সুযোগ রহিয়াছে ; স্বদেশের কল্যাণকামনাই তাহাদের মধ্যে ঐক্য ও মিলন আনিয়া দেয়। কিন্তু ভারতবর্ষের মত বহুকাল হইতে পরাধীন দেশের পক্ষে পরস্পরের মধ্যে মিলনের স্থান তাহার ধর্ম ও বাহ্য আচার-অনুষ্ঠানই প্রধান। প্রকৃতপক্ষে এইগুলিই বিশাল হিন্দুসমাজকে একসূত্রে গাঁথিয়া তুলিতে পারিয়াছিল। এইগুলি এতই দৃঢ়ভাবে প্রত্যেক হিন্দুসন্তানকে বাঁধিয়াছিল এবং প্রতি হিন্দুসন্তান এতই সুদৃঢ় নিষ্ঠার সহিত উহা পালন করিয়া আসিয়াছেন যে, নানাবিধ প্রতিকূল অবস্থা ও ভাঙ্গনের ভিতরে পড়িয়াও হিন্দুজাতির অস্তিত্বের বিলোপ সাধিত হয় নাই। প্রত্যেক জাতি ও প্রত্যেক দেশের সমষ্টিজীবনে নানা উপায়ে যতই ঐক্যের ভাব ফুটাইয়া তুলিতে পারিবে, ততই তাহার ভবিষ্যৎ সমুজ্জ্বল হইয়া উঠিবে। রাজনৈতিক ক্ষেত্রেই বল আর সমাজ ও ধর্ম-সংস্কার-বিষয়েই বল, যাহাতে সমাজগত ঐক্যের বন্ধন বিশেষভাবে গড়িয়া উঠে তাহার উপর প্রখর দৃষ্টি রাখিতে হইবে। নচেৎ একেবারে বিচ্ছিন্ন হইয়া পড়িলে নানাবিধ অসুবিধা গুরুতার ভিতর দিয়া জীবন কাটাইতে হইবে। দেশের দুর্ভাগ্যবশতঃ জাতীয় পরিচ্ছদ, আহার-বিহার ও অন্যান্য অনেক বিষয়ে বাঙ্গালীসমাজে অমিলন ও অনৈক্যের ভাব দিন দিন জাগিয়া উঠিতেছে।

যাহা হউক, দশহরা বিষয়ে শাস্ত্রের বিধান এই—

জ্যৈষ্ঠস্য শুক্লদশমী সংবৎসরমুখী স্মৃতা।
তস্যাং স্নানং প্রকুর্ব্বীত দানং চৈব বিশেষতঃ॥
যাং কাঞ্চিৎ সরিতং প্রাপ্য দদ্যাৎ দর্ভৈস্তিলোদকং।
মুচ্যতে দশভিঃ পাপৈঃ সুমহাপাতকোপমৈঃ॥

(ব্রহ্মবৈবর্ত্ত-পুরাণ)

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লদশমীকে সংবৎসরমুখী বলা হইয়াছে। নদীর জলোচ্ছ্বাসের দিক দিয়া অর্থাৎ নদীজল বৃদ্ধির দিক দিয়া এই তিথিতে নূতন বর্ষের সূচনা-কল্পনা অসঙ্গত মনে হয় না। ঐ তিথিতে যে কোন নদীতে স্নান করা বিধেয়। জলে কুশ সহ তিল নিক্ষেপ করা চাই। তাহা হইলে পূর্ব্বকথিত দশবিধ পাপ হইতে

নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে। "কাঞ্চিৎ সরিতং" ইহার অর্থ "যে কোন নদী" হইলেও শাস্ত্রকারগণ বুঝাইতে চান যে, সরিৎ শব্দে গঙ্গাকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে। সরিৎ শব্দে জাহ্নবী অর্থ না ধরিলে "অন্যথা নানা বিধিঃ স্যাৎ" নানা বিধি স্বীকার করিতে হয়। "অন্যথা কুল্যাস্নানেঽপি দশবিধপাপক্ষয়ঃ স্যাৎ" অন্যথা যে কোন প্রবাহে স্নান করিলে পাপক্ষয় হইতে পারে এইরূপ দাঁড়ায়। কিন্তু তাহা সঙ্গত হইতে পারে না। সুতরাং সরিৎ শব্দে গঙ্গা এবং গঙ্গার যে কোন স্থান—হরিদ্বার, প্রয়াগ, ত্রিবেণী অর্থাৎ গঙ্গাপ্রবাহের যে কোন স্থান, ইহাই শাস্ত্রকারগণের মীমাংসা।

ভবিষ্য-পুরাণে আছে—

জ্যৈষ্ঠ-শুক্ল-দশম্যাং তু হস্তাযোগেন জাহ্নবী।
হরতে দশ পাপানি তস্মাৎ দশহরোচ্যতে॥

জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্লপক্ষীয় দশমীর হস্তানক্ষত্রের সহিত যোগ থাকা চাই। এবৎসরের পঞ্জিকাতে দেখা যায়, ১৪ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রিতে হস্তা নক্ষত্র পড়িয়াছে এবং পরদিনে ১৫ই জ্যৈষ্ঠ দশহরা হইয়াছে; সুতরাং হস্তা নক্ষত্রের যোগেই দশহরা হইতেছে। জাহ্নবী দশবিধ পাপ হরণ করেন, এই কারণে দশহরা নামের উৎপত্তি।

পূর্ব্বকথিত দশবিধ পাপের মন্ত্র উচ্চারণ করিয়া প্রার্থনা করিতে হয়—

এতানি দশ পাপানি প্রশময় মাতু জাহ্নবি।

হে জাহ্নবি! আমার এই দশবিধ পাপ বিনষ্ট হউক।

তৎপরে আছে—

অমৃতেনাম্বুনা দেবি ভাগীরথি পুনীহি মাম্॥

হে ভাগীরথি, তোমার অমৃত জলে আমাকে পবিত্র কর।

এখানে আমাদিগকে স্থিরভাবে বুঝিতে হইবে যে, দশবিধ পাপের অনুস্মরণপূর্ব্বক উহা হইতে নিষ্কৃতিলাভ-সংকল্পের মূল্য অধিক, না গঙ্গাস্নানের মূল্য অধিক। এইখানে আর একটি শ্লোক পাঠকবর্গকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই—

অদ্ভির্গাত্রাণি শুধ্যন্তি, মনঃ সত্যেন শুধ্যতি।
বিদ্যাতপোভ্যাং ভূতাত্মা, বুদ্ধির্জ্ঞানেন শুধ্যতি॥

জল দ্বারা গাত্রশুদ্ধি হয়, সত্য দ্বারা মন শুদ্ধি হয়, বিদ্যা ও তপস্যা দ্বারা আত্মার শুদ্ধি হয় এবং জ্ঞানের দ্বারা বুদ্ধি শুদ্ধি হয়। তবে এখানে ইহাও স্বীকার্য্য যে, ভারতের অতীত গৌরবের কাহিনী সুপ্রাচীনা গঙ্গার তরঙ্গবিক্ষুব্ধ বিপুল বিস্তার ও উহার সুশীতল নির্ম্মল বারি অন্তরের মধ্যে যথেষ্ট প্রভাব বিস্তার করে।

"দশ পাপানীতি দশজন্মকৃতানীতি বিশেষণীয়ম্ আহ, পরাশর-ভাষ্যে যমঃ" পরাশর-সংহিতার ভাষ্যে যম এই কথা বলিয়াছেন—দশবিধ পাপের সঙ্গে দশজন্মকৃত পাপ বুঝিতে হইবে। আজকাল লোকে দশ জন্মের পাপ ক্ষয় হইল মনে করিয়া সাধারণতঃ দশহরাতে গঙ্গাস্নান করে, শাস্ত্রোক্ত দশবিধ পাপ প্রায়ই স্মরণ করে না। এই কারণে শাস্ত্রকারগণের প্রকৃত লক্ষ্য সংসিদ্ধির অন্তরায় ঘটিয়াছে। যদি এই দশহরা মঙ্গলবারে ঘটে তবে আর পুণ্যের অবধি থাকে না। আমাদের দেশে শনিবার ও মঙ্গলবারের প্রাধান্য অনেক অনুষ্ঠানে স্বীকৃত হইয়া আসিতেছে।

দশহরাতে দশটি যোগের সূচনা হয়। যথা স্কন্দে (স্কন্দ-পুরাণে)—

জ্যৈষ্ঠে মাসি সিতে পক্ষে দশম্যাং বুধহস্তয়োঃ।
ব্যতীপাতে গরানন্দে কন্যাচন্দ্রে বৃষে রবৌ।
দশযোগে নরঃ স্নাত্বা সর্ব্বপাপৈঃ প্রমুচ্যতে॥

এই দশটি যোগ সংঘটিত হয় বলিয়া জ্যৈষ্ঠ মাসের শুক্ল দশমীতে দশবিধ পাপ হইতে মুক্ত হইবার জন্য স্নান প্রশস্ত। এই দশবিধ পাপের উল্লেখ ও তাহা হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনা "মজ্জনস্য আদৌ পাঠ্যানি" গঙ্গায় ডুব দিবার পূর্ব্বে পাঠ করিতে হইবে, আপস্তম্ব এই কথা বলিয়াছেন। প্রথমে এই দশবিধ পাপের অনুভব এবং তাহা হইতে মুক্ত হইবার প্রার্থনার উপরেই দশহরার আবশ্যকতা শাস্ত্রে স্বীকৃত হইল এবং পরে উহার সহিত গঙ্গাপূজার মিলন সাধিত হইল। তাহা হইলে দাঁড়াইতেছে মন্ত্র-উচ্চারণই মুখ্য এবং স্নান গৌণ। কিন্তু ক্রমে গঙ্গার মহিমা মুখ্য বলিয়া কীর্ত্তিত হইতেছে।

ততো গঙ্গাতটে রম্যে হেম্না রূপ্যেণ বা তথা।
গঙ্গায়াঃ প্রতিমাং কৃত্বা বক্ষ্যমাণ-স্বরূপিণীং॥
সংস্থাপ্য পূজয়েৎ দেবীং তদভাবে মৃদাদপি।
অথ তত্রাপ্যশক্তশ্চেৎ লিখেৎ পিষ্টেন বৈ ভুবৌ॥
বক্ষ্যমাণেন মন্ত্রেণ কুর্য্যাৎ পূজাং বিশেষতঃ।
নারায়ণং মহেশঞ্চ ব্রহ্মাণং ভাস্করং তথা॥
ভগীরথং চ নৃপতিং হিমবন্তং নগেশ্বরং।
গন্ধপুষ্পাদিভিঃ সম্যক্ যথাশক্তি প্রপূজয়েৎ॥

অর্থাৎ গঙ্গাতটে গঙ্গার স্বর্ণ বা রৌপ্যময় প্রতিমা প্রস্তুত করিতে হইবে; তাহার অভাবে মৃন্ময় মূর্ত্তি, তাহাতেও অশক্ত হইলে ভূমিতে মূর্ত্তি আঁকিয়া পূজা করিতে হইবে; এবং নারায়ণ, মহেশ, ব্রহ্মা, ভাস্কর, ভগীরথ ও হিমালয়ের পূজা করিতে হইবে। কিন্তু ইহাতে রামচন্দ্রের কথা বাদ গেল দেখিয়া কোন কোন পুরাণে আছে—

"অস্যাং সেতুবন্ধরামেশ্বরস্য প্রতিষ্ঠাদিনত্বাৎ বিশেষেণ পূজা কার্য্যা।" এই দিন সেতুবন্ধ রামেশ্বরের প্রতিষ্ঠা-দিন বলিয়া বিশেষ পূজা কর্ত্তব্য।

দশযোগে সেতুবন্ধে লিঙ্গ-রূপ-ধরং হরং।
রামং বা স্থাপয়ামাস শিবলিঙ্গম্ অনুত্তমং॥

বাসুদেবও বাদ যাইবার নহেন, এই কারণে দেখিতে পাই—

সংপূজ্য বাসুদেবস্থ হোমং কৃত্বা ততো দ্বিজঃ।

বাসুদেবের মূর্ত্তিস্থাপন ও প্রাণপ্রতিষ্ঠার উল্লেখ আছে। এইরূপে সকল সম্প্রদায়কে তুষ্ট করিবার ব্যবস্থা আছে। কিন্তু এ সমস্ত ব্যবস্থার মধ্যে পূর্ব্বোক্ত দশবিধ পাপক্ষয়ের ও দশবিধ পাপের অনুভূতির যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে, গঙ্গাপূজা-কার্য্যের মধ্যে সে ভাবটি ম্লান হইয়া পড়িয়াছে এবং গঙ্গারই বিশেষ প্রাধান্য দেওয়া হইয়াছে।

এক্ষণে তর্ক উপস্থিত হইতে পারে বৎসরের মধ্যে কেবলমাত্র দশহরার দিন দশবিধ পাপ অনুভূতির ব্যবস্থার কারণ কি; ঐ অনুভূতি যে আমাদের নিত্য চাই। তৎসম্বন্ধে আমাদের উত্তর এই যে, ঐ দশবিধ পাপ অনুভূতি প্রতি মনুষ্যের প্রতিদিনের কর্ত্তব্য বটে, আবার সর্ব্বসাধারণ ও সমস্ত জাতি লইয়া সমষ্টিগতভাবে উহার অনুভব বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন নির্দ্দিষ্ট থাকা চাই। ভ্রাতৃদ্বিতীয়া, জামাইষষ্ঠী প্রভৃতি অনুষ্ঠানগুলিও বৎসরের মধ্যে একদিন মাত্র ঘটে। ভ্রাতার প্রতি ভগিনীর স্নেহ স্বাভাবিক, জামাতা আদরের পাত্র সকল সময়েই। প্রতিদিন তাহাদিগকে স্নেহ দেখাইবার সুযোগ না হইতে পারে, কিন্তু বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন সমগ্র জাতি মিলিয়া সকলকে নিজ নিজ ভ্রাতা বা জামাতার প্রতি স্নেহ ও সমাদর দেখাইতে হইবে, ইহাই শাস্ত্রকারগণের মর্ম্মকথা। এইরূপ নৈমিত্তিক ব্যবস্থা যে কেবল এই দেশে আছে তাহা নহে, পৃথিবীর অন্যান্য দেশেও ইহা অল্পাধিক দৃষ্ট হয়। এইরূপ ব্যবস্থা থাকাতেই একই জাতির ভিতরে মিলনের ভাব, একতার ভাব, আমরা যে একই জাতির অন্তর্ভুক্ত এই সুমিষ্ট অনুভবের আস্বাদ ও একাত্মবোধের ভাব দিন দিন জাগিয়া উঠে।

আজকাল তর্ক ও যুক্তির যুগ। আমাদের দেশে শাস্ত্রের ভিতরে যে কেবল গতানুগতিকতাই আছে তাহা নহে, সেখানে যুক্তির প্রাধান্যও যথেষ্ট পরিমাণে স্বীকৃত হইয়াছে। স্মার্ত্ত শ্রীমৎ রঘুনন্দনের গ্রন্থ যাঁহারা পাঠ করিয়াছেন, তাঁহারা দেখিবেন কি অসামান্য পাণ্ডিত্য ন্যায় ও যুক্তি তাঁহার নিবন্ধে স্থান পাইয়াছে। আমাদের শাস্ত্রে আছে—

কেবলং শাস্ত্রমাশ্রিত্য ন কর্ত্তব্যো বিনির্ণয়ঃ।
যুক্তিহীন-বিচারে তু ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে।

কেবল শাস্ত্র অবলম্বন পূর্ব্বক কর্ত্তব্য নিরাকরণ করিলে চলিবে না, যুক্তি চাই কেননা, যুক্তিহীন বিচারে ধর্ম্মগ্লানি ঘটে।

মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় এই শ্লোকের আশ্রয় লইয়া তাঁহার সংস্কার আরম্ভ করিয়াছিলেন। আমাদের দেশে প্রচলিত অনুষ্ঠানের মর্ম্মকথা জানিবার বিশেষ আবশ্যকতা আসিয়া পড়িয়াছে। তাহা না হইলে জ্ঞান ও ধর্ম্মের সামঞ্জস্য রক্ষা পায় না, অবিশ্বাস ও ঔদাস্যের ভাব সমাজকে গ্রাস করিয়া ফেলে। *

সাহিত্যিকের উড়ো যাত্রা।

[একটী খেয়াল]

(জনৈক সাহিত্যিক)

প্রবন্ধের নামের অর্থ।

পূজা আসিতেছে। বর্ষাপগমে শরতের আকাশ কনকতাম্র অরুণ কিরণে রাঙ্গাইয়া উঠিতে আরম্ভ করিয়াছে। আকাশের রাঙ্গা রাঙ্গা খণ্ড খণ্ড মেঘগুলি এক-একটি বীণাযন্ত্র লইয়া যোগিয়া রাগিণী আলাপ করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছে। সেই আলাপের আলাপনে সমস্ত পূর্ব্বগগন ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। আমার মনটাও আর ঘরের বাঁধন মানিতে চাহিল না। বাহিরের যেখানে হোক কোথাও ছুটিয়া যাইবার জন্য পাগল হইয়া উঠিল। আমি সাহিত্য চর্চ্চা করি এবং সাহিত্যের অনুরাগী এই অর্থে সাহিত্য শব্দের উপর ষ্ণিক্ বা কি একটা প্রত্যয়-ব্যত্যয় লাগাইয়া সাহিত্যিক করিলাম; আর মনটা উড়ো-উড়ো হইয়া আমাকে ঘরের বাহির করিল, তাই প্রবন্ধের নাম দিয়াছি—সাহিত্যিকের উড়ো যাত্রা। নামটা ভীষণ ও দীর্ঘ, কিন্তু নিরুপায়।

কোথায় যাই?

মন বলিল—যাও তো যাও—দূরদূরান্তরে, কাছাকাছি কোথাও যেও না। আমিও ভাবিলাম—কাছাকাছি চন্দননগর শ্রীরামপুর গিয়া লাভ কি? তাহাতে মনের শান্তি আসিবে না। অন্ততঃ রেলগাড়ীতে একটা রাত কাটে, এমন একটা স্থানে যাইতে হইবে। বহুদিন যাবৎ বম্বে সহরটা দেখিবার ইচ্ছা পোষণ করিতাম।

---

* লেখক বলিয়াছেন, বৎসরের মধ্যে অন্ততঃ একদিন সমস্ত হিন্দুজাতির অন্তরে পাপের অনুভূতি আনয়নের জন্য দশহরার অনুষ্ঠান। বিশেষভাবে দশহরার দিনই ইহার জন্য নির্দ্দিষ্ট হইল কেন, লেখক তাহা দেখাইতে সক্ষম হইয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। ঐ যে তিনি একটা প্রমাণ দিয়াছেন যে, সেতুবন্ধ রামেশ্বরের প্রতিষ্ঠা এই দিনে হইয়াছিল বলিয়া বিশেষভাবে পূজা কর্ত্তব্য—ইহা হইতে আমাদের অনুমান হয় যে, এই অনুষ্ঠানের ভিতর কোন ঐতিহাসিক তথ্য লুক্কায়িত আছে। তদ্ব্যতীত ঐ দিন হিমালয়ে সম্ভবত বর্ষা আরম্ভ হইয়া গঙ্গায় জলস্ফীতি আরম্ভ হয় বলিয়া বিশেষ ভাবে গঙ্গা-পূজা অনুষ্ঠিত হয়। ভাঃ সং

তারপর শুনিতাম, বম্বেতে পার্শি ভাটিয়া প্রভৃতিরই আধিপত্য; সেখানে ইংরাজেরা নাকি বড় বেশী দন্তস্ফুট করিতে পারেন না। শুনিয়া বড়ই আশ্চর্য্য হইতাম—ভারতবর্ষের মধ্যে এমন স্থান তবে আছে, যেখানে ইংরাজের প্রভাব কম; বিশেষতঃ যে বম্বে ভারতপ্রবাসী ইংরাজদিগের নামিবার সর্ব্বপ্রথম সোপান, সেই বম্বেতে ইংরাজ ভয়ত্রস্ত—বম্বে দেখিবার জন্যই বড়ই আগ্রহ জন্মিল।

শুভদিন দেখা।

একটা শুভদিন দেখিলাম। বম্বে যাওয়ার ইচ্ছা হইবার কিছু পূর্ব্বেই ট্রেণগাড়ী উল্টাইয়া পড়িবার কথা সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছিল এবং রেলকর্ম্মচারীদিগের ধর্ম্মঘট করিবার খুবই গুজব চলিয়াছিল। কাজেই শুভদিন দেখিয়া যাত্রার প্রলোভন সম্বরণ করিতে পারিলাম না। আমার বৈজ্ঞানিক অগ্রজপ্রতিম ডাক্তার * * * * * শুভদিন দেখিয়া যাত্রা করার কথা শুনিলেই কুসংস্কারের প্রশ্রয় দিতেছি বলিয়া নাসিকাকুঞ্চিত করিবেন এবং যথেষ্ট ভর্ৎসনা পূর্ব্বক উহা পরিত্যাগ করিবার উপদেশ প্রদানে প্রবৃত্ত হইবেন, তাহা বেশ জানি। কিন্তু উপায় কি? বাল্যকাল কেন, শৈশবকাল অবধিই দাসী চাকর সরকার—আর নাম করিব কত—যাঁহাদের হাতে মানুষ হইয়াছি, তাহাদের সকলেরই কাছে এই প্রকার কুসংস্কারেরই ভিতর লালিত-পালিত হইয়াছি। কাজেই ইহা এখন আমার মজ্জাগত রক্তগত অস্থিগত হইয়া গিয়াছে। এখন এই ষাট বছরের বৃদ্ধ বয়সে কি সেই কুসংস্কার ছাড়া যায়? ছাড়িবার পূর্ব্বে বোধ হয় এই দেহযষ্টি নিমতলার ঘাটে রাখিয়া আসা আবশ্যক হইবে। শুভদিন দেখিয়া কাজকর্ম্ম করিলে যে কুসংস্কার হয়, পিতৃদেবের নিকট সে শিক্ষা একদিনের জন্যও পাই নাই। বরঞ্চ হিন্দুসন্তান হইয়া হিন্দুর ঘরে লালিত-পালিত হইয়া দেখিতাম যে, উপনয়ন বল, দীক্ষা বল, বিবাহ বল, জন্মগ্রহণ অবধি শ্রাদ্ধ পর্য্যন্ত সকল কর্ম্মই ভাল বা উপযুক্ত অর্থাৎ পঞ্জিকামতে উপযুক্ত বলিয়া ধৃত দিনেই করা হইত।

ভূতের ভয়।

এই রকম আর একটী কুসংস্কার—যথার্থ কুসংস্কার—বাল্যকালে এক সময় আমার মনপ্রাণ বে-দখল করিবার মতলব করিয়াছিল। সেটী ভূতের ভয়—কখন্ কোথায় অন্ধকার হইতে বাহির হইয়া কোন্ একটা অজানা ভূত ঘাড়ে নামিয়া সকলের অজ্ঞাতে টুপ করিয়া ঘাড়টী মটকাইয়া রাখিয়া চলিয়া যাইবে, এই ভয়। বাল্যকালে ঘরে প্রদীপ জলিত এবং তাহার প্রতিবিম্ব সার্সিতে পড়িত—চাকর-দাসীরা আমাদের ক্রন্দন শুনিলেই ঐ প্রতিবিম্বে ভূতের ঘর দেখা যাইতেছে বলিয়া নানাবিধ ভূতের উপদ্রবের গল্প বলিয়া কান্না থামাইত। সেকালে কথায় কথায় ভূতের কাহিনী শোনা যাইত—দেবদারু গাছে ভূতের বাসা, বেলগাছে ব্রহ্মদৈত্য, ভূতের উল্টাদিকে পায়ের আঙ্গুল, অন্ধকার সিঁড়িতে ভূত চলাফেরা করে, এই প্রকার শতবিধ কাহিনী সমস্ত মনটীকে দাসমনোভাবে ও ভয়ে জর্জ্জরিত করিয়া রাখিত। নর্ম্যালস্কুলে পড়িতাম, সেখানেও সহপাঠীরা ভূতের গল্প ও বিবরণে মন বিমূঢ় করিয়া দিত। পিতৃদেব চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য গৃহে একটী কঙ্কাল টাঙ্গাইয়া রাখিয়াছিলেন—চাকর-দাসীরা নিত্যই সে ঘরে ভূতের উপদ্রব দেখিত। আমরা ভূতের উপদ্রবের কথা শুনিয়া ভয়ে কণ্টকিতদেহ হইতাম বটে, কিন্তু সাহসে নির্ভর করিয়া সেই ঘরে গিয়া কোন দিন কোনও উপদ্রব প্রত্যক্ষ করি নাই। পিতৃদেব যথাসময়ে ভূতের ভয়ের মতলবটী বুঝিয়া তাহার বিরুদ্ধে যুদ্ধ—যুদ্ধই বটে—ঘোষণা করিলেন, দণ্ডের ভয় দেখাইয়া এবং উপদেশাদি দ্বারা ও অন্যান্য নানা উপায়ে তিনি আমাদিগকে বুঝাইয়া দিলেন যে ঐ প্রকার ভূতের ভয় একটী মহা ভুল ও বিরাট কুসংস্কার। আমার যখন বার বৎসর মাত্র বয়স, তখন আমার পিতৃবিয়োগ হয়। সৌভাগ্যক্রমে তাহার পূর্ব্বেই তিনি আমার মন হইতে এই কুসংস্কারটী উন্মূলিত করিতে সক্ষম হইয়াছিলেন। একবার পিতৃদেবের সঙ্গে নৌকায় বিদেশ-যাত্রা করিয়াছিলাম। সন্ধ্যার সময় একস্থানে নৌকা বাঁধিল। ডাঙ্গায় উঠিয়া দেখি, এধারে ওধারে মড়ার মাথার খুলি পড়িয়া আছে; দেখিয়া বুঝিলাম যে, স্থানটী শ্মশান। মনটা অস্থির জীবনের কথা ভাবিয়া উদাসভাব ধারণ করিল বটে, কিন্তু ভূতের ভয় আসিল না। পিতৃদেব একজন বিজ্ঞানভক্ত ছিলেন। তিনি মেডিকেল কলেজে অতিরিক্ত ছাত্রস্বরূপে চিকিৎসা-শাস্ত্র অধ্যয়নে নিরত ছিলেন।

দিনক্ষণ দেখা পরিত্যাগ।

এক সময় আমি দিনক্ষণ দেখা ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আমি সংস্কৃত কলেজে আবাল্য অধ্যয়ন করিবার ফলে, বলা বাহুল্য, চলিত বৈদান্তিক মত বা অদ্বৈতবাদের হাওয়ায় পরিবর্দ্ধিত হইয়াছিলাম। পিতৃবিয়োগের পর যখন উচ্চশ্রেণীতে পড়িতে লাগিলাম, তখন বাল্যকালে মুদ্রিত সেই অদ্বৈতবাদ মনে আরও খুদিয়া বসিয়া গেল। ক্রমে আমার এ প্রকার মানসিক ভাব দাঁড়াইয়াছিল যে, আমি সত্যই নিজেকে ব্রহ্ম বলিয়া মনে করিতাম। আমার সকল বিষয়ে একটা সীমা যে সত্যসত্যই গায়ে-গায়ে লাগিয়া আছে, সে বিষয় মনেই আসিত না। তার পর, মনের তেজে, যখন আমার পক্ষে অসম্ভব বলিয়া

যাহা মনে হইয়াছিল এমন দুই-একটা সত্তবের মধ্যে আনিয়া ফেলিলাম, তখন তো কথাই নাই—অঘটন-ঘটন-পটীয়সী শক্তি যাঁহার, সেই ব্রহ্মের সঙ্গে নিজেকে এক ও অভিন্ন বলিয়া ভাবিতে লাগিলাম। ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থে একটী স্তোত্র সন্নিবদ্ধ হইয়াছে। শুনিয়াছিলাম যে, সেটী মহানির্ব্বাণ-তন্ত্র হইতে গৃহীত। সেই তন্ত্র পড়িবার ইচ্ছা করিলাম। বঙ্গানুবাদ সহ উহার বিবিধ সংস্করণ প্রকাশিত হইবার ফলে তন্ত্রখানি পাঠ করিতে বেশী বিলম্ব বা কষ্ট হইল না। পড়িতে পড়িতে দেখিলাম যে ঐ তন্ত্রের মতে ব্রহ্মোপাসকের পক্ষে দিক দেশ বা কাল প্রভৃতির বিচার নাই। আমার হৃদয়ের সঙ্গে ঐ কথার সায় পাইয়া দিনক্ষণের বিচার ভীরুর উপযুক্ত বলিয়া পরিত্যাগ করিলাম। কেবল তাহাই নয়, ঐ প্রকার মানসিক ভাবকে ক্রমাগত জাগাইয়া রাখিবার ফলে ঘৃণা লজ্জা, ভয় প্রভৃতিকে অনেকটা অতিক্রম করিতে পারিয়াছিলাম।

পুনর্ম্মূষিকো ভব।

কিন্তু অনেকগুলি কার্য্যের ফলাফল দেখিয়া দিনক্ষণ বিচারের প্রতি আমার দৃষ্টি পুনরাকৃষ্ট হইল। দেখিতে লাগিলাম যে, একবিধ কার্য্যে দেখিয়া শুনিয়া বৃহস্পতি-বারের বারবেলায় বাহির হইয়া সফল হইয়াছি; অন্যবিধ কার্য্যে শুক্রবারের প্রাতে বাহির হইয়া সফল হইয়াছি। এই সকল বিষয় আমার দৃষ্টিগোচর হইলেও আমি বহুকাল যাবৎ দিনক্ষণের বিশেষ বিচার করিতাম না। পরে বয়সবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে যৌবনের তেজ যখন কমিয়া আসিল, পঞ্চাশ পার হইলাম, তখন বাড়ীর অন্যান্য লোকদিগের দেখাদেখি আমিও পাঁজি দেখিয়া চলাফেরা করিতে লাগিলাম। নানাবিধ ঘাতপ্রতিঘাতের আঘাতে আমি খুবই স্পষ্ট বুঝিলাম যে, আমার শরীর, মন ও আত্মার অসীমের দিকে অগ্রসর হইবার শক্তি থাকিলেও একটা সীমা বরাবর থাকিয়া যায়, এবং আমি ও ব্রহ্ম এক ও অভিন্ন নই। তখন দিনক্ষণের পরীক্ষাও করিতে লাগিলাম—দেখিলাম পাঁজিতে শুভ বলিয়া লেখা থাকিলেও একবিধ শুভক্ষণে কাজ করিয়া আমার বড় সুবিধা হইল না, বরঞ্চ বিশেষ অসুবিধাই ভোগ করিতে হইল; কিন্তু অপরবিধ শুভক্ষণে কাজ করিয়া প্রতিবারই আশাতিরিক্ত সফলতালাভ করিয়াছি। বুঝিলাম—একটী "সহিল না", অপরটী "সহিল"।

দিনক্ষণ দেখা কি অবৈজ্ঞানিক?

একটা কুসংস্কার সম্বন্ধে এত সুদীর্ঘ বক্তৃতা অনেকের নিকট "ধান ভানিতে শিবের গীত" মনে হইতে পারে। কিন্তু ষাট বৎসরের পলিতকেশ এবং নাতির বৃদ্ধ মাতামহের পক্ষে এই বক্তৃতাবাগীশতা মার্জ্জনীয়। দ্বিতীয়ত, আমার আন্তরিক ইচ্ছা এই যে, বিজ্ঞানভক্ত মহাত্মারা এই প্রকার ঘটনাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া উহাদের অন্তর্নিহিত সত্য তত্ত্ব আবিষ্কারে মনোনিবেশ করিবেন। কুসংস্কারকে অযথা সমর্থন করিবার জন্য দীর্ঘ বক্তৃতা করি নাই। আমার ক্ষুদ্রবুদ্ধিতে দিনক্ষণ দেখিয়া কাজ করিবার ভিতর অবৈজ্ঞানিক কিছুই দেখি না। প্রাতে ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে ভগবদুপাসনাই সুসম্পন্ন হয়, সে সময়ে দপ্তরজন সরকার লইয়া বিষয়কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইতে পারে না; আবার দ্বিপ্রহরে বিষয়কর্ম্ম যেমন হয়, ভগবদারাধনা তেমন প্রগাঢ়তা লাভ করে না। সেই প্রকার অনেক পর্য্যবেক্ষণের ফলে যে সকল দিন ও ক্ষণ যাহার পক্ষে যে বিষয়ে শুভ বা অশুভ বলিয়া পঞ্জিকায় উল্লিখিত দেখা যায়, সাধারণত তাহা অসম্ভব বা অবৈজ্ঞানিক মনে করিবার বিশেষ কোন কারণ দেখি না।*

যাত্রারম্ভ।

যাক, শুভ দিন ও ক্ষণ দেখিয়া তো বাহির হইলাম। ইতিপূর্ব্বেই দিন পনেরোর মত জিনিসপত্র গুছাইয়া রাখা হইয়াছিল। বোম্বাই ডাকগাড়ি ছাড়িবে সাড়ে তিনটায়। ভাত খাওয়া হইল ১১৷৷টায়। আমার টিকিট পূর্ব্ব হইতেই কেনা ছিল এবং গাড়ীর একটা বেঞ্চি বা berth reserved করা বা আটকানো হইয়াছিল। তাড়াতাড়ি করিবার বিশেষ কোন কারণ ছিল না। হাবড়ার পুল মেরামত হইতেছিল বলিয়া রেল কোম্পানী যাত্রীদিগকে সময় একটু হাতে রাখিয়া যাত্রা করিবার উপদেশ দিয়া বিজ্ঞাপন জারি করিয়াছিলেন। আর এই বৃদ্ধবয়সে ছুটাছুটি করা পোষায় না, বরঞ্চ একটু পূর্ব্ব হইতে ষ্টেশনে যাওয়া আমি ভাল মনে করি। ২ টার সময় ঘোড়ার গাড়ীতে উঠিলাম। সঙ্গে উঠিলেন এক কন্যা, পুত্র এবং আমার পাঁচ বৎসরের কর্ম্মসচিব নাতিবাবু। নাতিবাবু আমাকে খুব আশ্বাস দিলেন যে, তিনি সঙ্গে থাকিলে আমার সব ঠিক হইয়া যাইবে—আমার ভয়ের কোন কারণ থাকিবে না। বাস্তবিকই আমি তাহাকে মনে করি আমার বন্ধু। বন্ধুটি আমার কাছে থাকিলে সত্যই সমস্ত অমঙ্গল-আশঙ্কা দূর হইয়া যায়। গাড়ীতে উঠিয়া মনে মনে ভগবানের চরণ বক্ষে ধরিয়া প্রার্থনা করিলাম, সকলের মঙ্গল বিধান কর, আমার যাত্রা নিরুপদ্রব কর। আমার ওজন করাইবার মত সঙ্গে মালপত্র কিছুই ছিল না, কাজেই যথাসময়ে ষ্টেশনে পৌঁছিয়া নির্দ্দিষ্ট কামরায় উঠিয়া বসিলাম। একটী পশ্চিমা খানসামাকে সঙ্গে লইয়াছিলাম। লোকটী সুচতুর; রাস্তার নাম, বাড়ীর নম্বর প্রভৃতি চিনিবার উপযুক্ত এক-আধটু ইংরাজীও

* এই প্রবন্ধোক্ত মতামতের জন্য লেখক দায়ী। ভঃ সং

জানে। সে আমার বিছানা পাড়িয়া দিয়া চাকরের গাড়ীতে গিয়া বসিল। যথাসময়ে বাঁশী বাজিল। ছেলে মেয়েরা প্রণাম করিয়া পদধূলি গ্রহণ করিল। নাতিবাবুও সে বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইলেন না। ট্রেণ ছাড়িল। পশ্চিমা খানসামাদিগের একটী গুণ দেখিয়াছি এই যে, বাঙ্গালী, বিশেষত উড়িয়া চাকরদিগের অপেক্ষা তাহারা বেশী বুদ্ধিজীবী। তাহাদিগকে খানসামাগিরির যে কার্য্যে লাগাইবে, সেই কার্য্যই যেন তাহাদিগের স্বভাবসিদ্ধ।

সহযাত্রী।

আমার সহযাত্রী ছিলেন একটী মহিলা দুইটী কচি বাচ্চা লইয়া। তাঁহাকে দেখিতে খাসিয়া রমণীর মত। ট্রেণ ছাড়িবার পূর্ব্বেই আমার কন্যা আমাকে বলিলেন যে, সহযাত্রী খাসিয়া রমণীই বটে, তাঁহার সহপাঠী ছিলেন ডায়োসিজান কলেজে; এক খৃষ্টান বাঙ্গালীকে বিবাহ করিয়াছেন। খাসিয়া রমণীও আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়া যখন স্থিরনিশ্চয় হইলেন যে ঐটী আমার কন্যা, তখন উভয়ের মধ্যস্থিত "বরফ গলিয়া" গেল (ice break হইল) এবং উভয়ের মধ্যে ক্ষণেকের জন্য আলাপ পরিচয় চলিল। গাড়ীতে নব্যবঙ্গের একটী যুবক স্থান না পাইয়া এককোণে দাঁড়াইয়াছিলেন, খড়্গপুরে নামিয়া যাইবেন। খাসিয়া রমণী অনেকদিন কলিকাতা-প্রবাসের পর নাগপুর অঞ্চলে স্বামীগৃহে ফিরিতেছেন বলিয়া সঙ্গে অনেক আসবাব ছিল, এবং তিনি সেই সমস্ত আসবাবপত্র লইয়া একটু ব্যতিব্যস্তও হইয়া উঠিয়াছিলেন। নব্য যুবকটী তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—তাঁহার জিনিষগুলি কি উপরকার বেঞ্চিতে তুলিয়া দিবেন? মহিলাটী আহ্লাদের সহিত তাঁহার সাহায্য গ্রহণ করিলেন। দশ বিশ বৎসর পূর্ব্বে মহিলাদের প্রতি এরূপ সম্মানপ্রদর্শনের ভাব দেখা যাইত না। আমার তো দেখিয়া বড় আনন্দ হইল, উত্তর-বংশীয় ভারতীয়দের সম্বন্ধে প্রাণে একটু আশার সঞ্চার হইল। আমার মেয়ের কাছে শুনিয়াছিলাম যে মহিলাটী খাসিয়া এবং বড় ভাল ও সচ্চরিত্র। তাঁহার স্বামী ডাক বিভাগে বড় কর্ম্মচারী—পথে নাগপুরে আসিয়া তাঁহাকে নামাইয়া লইবেন।

পার্শি মহিলা বা বঙ্গমহিলা।

হাবড়া ষ্টেশনে তিনটী সুন্দরী মহিলা ট্রেণের পার্শ্বে বইয়ের আড্ডায় (stallএ) দাঁড়াইয়া বই দেখিতেছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে একটী, পার্শি মহিলারই বেশ পরিধান করিয়াছিলেন। বয়স্কা পার্শি মহিলার বিশিষ্ট চিহ্ন হইল সকল পোষাকের উপর আদ্দির একটী ঝোলা কামিজ। সুতরাং তাঁহাকে পার্শিমহিলা বলিয়া চিনিতে কিছুমাত্র বিলম্ব হইল না। দ্বিতীয় মহিলাটী আদ্দির কামিজ-পরিহিত না হইলেও আমরা সকলেই প্রায় একমত হইলাম যে, তিনি পার্শিমহিলা বটে। কিন্তু তৃতীয় মহিলা সম্বন্ধে আমরা বড়ই ধাঁধার মধ্যে পড়িয়া গেলাম—অনেক আলোচনার পর অধিকাংশের মতে স্থির হইল যে, তিনি পার্শিমহিলা নন, বঙ্গরমণী; সম্ভবত ঐ দুইজন পার্শিমহিলার বন্ধু ও সহপাঠী এবং উহাঁদিগকে হয়তো ট্রেণে তুলিয়া দিতে আসিয়াছেন। মহিলাটী একটু খর্ব্বাকৃতি; জ্যাকেট শাড়ী প্রভৃতি তো আজ-কালকার ইঙ্গবঙ্গ সমাজের মহিলাদিগের ন্যায়—তাঁহারা যেদিকে সাড়ীর ফেরতা দেন, মনে হইতেছে তাঁহারও সাড়ীর ফেরতা সেই দিকেই ছিল। তাঁহার গায়ে আদ্দির কামিজ ছিল না। মাথার চুলে তেল ছিল না—ইহা তো আজকাল শিক্ষিত মহিলাদের মধ্যে চলিত প্রথার মধ্যে দাঁড়াইয়া গিয়াছে। সর্ব্বোপরি, হিন্দু মহিলাগণের অনেকে যেমন কালীঘাটে যাইবার সময় বা তথা হইতে ফিরিবার সময় কপালে মস্ত একটা সিন্দুরের টিপ দেন, ইনিও সেইপ্রকার কপালে কুলের বিচির মত একটী সিন্দুরের টিপ দিয়াছেন এবং সিঁথি যদিও এক-দিকে একটু হেলাইয়া কাটা ছিল সেই সিঁথিতে একটী সিন্দুরের রেখাও দেওয়া ছিল। হইতে পারে, সিঁদুর পরিলে বেশ সুন্দর দেখায় বলিয়া পরিয়াছেন, অথবা সহ-পাঠী বঙ্গমহিলাদের অনুকরণের ইচ্ছুক হইয়া পরিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে আমরা কোনও পার্শিমহিলাকে সিঁদুর পরিতে দেখি নাই—এই প্রথম। কাজেই ইহাঁকে বঙ্গমহিলা মনে করা আশ্চর্য্য নয়। কিন্তু ইঁহারা যখন খড়্গপুরে নামিলেন, তখন দেখি তিনটী পার্শি ভদ্রলোক তিনজনকে সঙ্গে করিয়া লইয়া চলিলেন—বুঝিলাম, তিনটী মহিলা সম্ভবত তিনজন পার্শি ভদ্রলোকের সহধর্ম্মিণী।

প্রার্থনা।

হাবড়া হইতে ট্রেণ যেমন ছাড়িয়া দিল, আমিও জুতা ও কোটপ্যাণ্ট খুলিয়া কামিজ ও পায়জামা অবলম্বনে বিছানায় পা-দুখানি ছড়াইয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া পড়িয়া রহিলাম। ঘুমাইবার জন্য নয়। ট্রেণে আমার ঘুম হয় না বলিলেই চলে—এক-আধবার পা মোড়া দিই মাত্র, কিন্তু প্রায়ই চক্ষু বুজিয়া পড়িয়া থাকি। চক্ষু বুজিলে অন্তরে প্রাণসখাকে নির্জ্জনে ডাকিবার বড়ই সুবিধা হয়। প্রাণ ভরিয়া প্রার্থনা করিলাম—হে প্রভো! হে ভগবান্, হে বন্ধু! তোমার চরণে আমার সকলই নিবেদন করিয়া দিতেছি; আমার যাহা মঙ্গল তাহাই তুমি বিধান কর, আমি তোমার নিকট ছোট বড় আমার যাহা কিছু দরকার সকলই প্রার্থনা করিব; তুমি আমার পিতা, তুমি আমার মাতা; তুমিও আমার

একমাত্র পরম বন্ধু; তোমার কাছে আমি কোনও বিষয়ে প্রার্থনা করিতে কিছুমাত্র সঙ্কোচ করিব না; তাহার মধ্যে তুমি যাহা ভাল বুঝিবে তাহাই আমাকে দিবে আমি তাহা মাথায় তুলিয়া লইব; যাহা আমার অমঙ্গল বুঝিয়া দিবে না, তাহা সত্যই আমি চাহি না। আমার পথ নিরুপদ্রব কর; যে কার্য্যের জন্য যাইতেছি, আমার তাহাতে মঙ্গল হয়তো সুসিদ্ধ কর, নচেৎ তাহাতে সিদ্ধি দিও না। আমার পরিবারকে ধর্ম্মের পথে, মঙ্গলের পথে সর্ব্বদা রক্ষা কর এবং তোমাতে শ্রদ্ধাবান করিও। তোমার চরণখানি আমার বক্ষে সর্ব্বদা রক্ষা করিবার ইচ্ছা ও শক্তিসামর্থ্য প্রদান কর"।

ভগবানের কাছে আমার মতে আমাদের ছোট বড় যাহা কিছু দরকার সকল বিষয়েই প্রার্থনা করা দরকার, যদি সত্যই তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া মনে করি, বিশ্বাস করি। তাহার পর, তিনি যাহা আমার পক্ষে মঙ্গল বুঝিবেন তাহাই তিনি বিধান করিবেন জানিয়া তাঁহার প্রতি একান্ত নির্ভর করিয়া থাকিব। ভগবানের কাছে প্রার্থনার পর, পিতৃদেব ও মাতৃদেবীর উদ্দেশ্যেও প্রার্থনা করিলাম। যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমি না ঘুমাইব, ততক্ষণ এই প্রকার প্রার্থনাই ঘুরিয়া ফিরিয়া আসিবে। বহুদিন যাবৎ পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি, আমার পুত্রবিয়োগের পর "মা" বলিয়া ডাকিলে হৃদয়ে যে প্রকার শান্তি লাভ করিতাম, আজ কয়েক বৎসর ভগবানকে "ভগবান" বা "বন্ধু" বলিয়া ডাকিলে হৃদয় মন খুলিয়া যায়। বিপদের ঘাতপ্রতিঘাত হইতেই এই ইষ্ট মন্ত্রের উৎপত্তি হইয়াছে।

নূতন সহযাত্রী।

খড়্গপুরে ট্রেণ থামিলেই হাবড়ায় যে কয়জন সহযাত্রী উঠিয়াছিলেন, ঐ খাসিয়া মহিলা ছাড়া সকলেই নামিয়া গেলেন; আবার কয়েকজন নূতন লোক সহযাত্রী হইলেন, তন্মধ্যে একটী ছিলেন সাহেব—তিনি প্রসঙ্গক্রমে জানাইয়া দিলেন যে তিনি রেল কোম্পানির ভূতপূর্ব্ব উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী ছিলেন; ইনি জাতিতে আইরিশ, অল্পদিন হইল কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। আর একটী বাঙ্গালী ছিলেন; তিনি এখনও রেলের কর্ম্মচারী আছেন। তৃতীয় সহযাত্রী হইলেন হাবড়ার অধিবাসী। ইহারা সকলেই বলিলেন—বেশী দূর যাইবেন না, দুই তিন ষ্টেশন পরেই নামিয়া যাইবেন।

খড়্গপুরের ধর্ম্মঘট ও সংবাদ পত্র;

আমি যে সময়ে উড়ো যাত্রায় বাহির হই, তাহার কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বাবধি খড়্গপুরের রেলকারখানার মজুরেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছিল এবং কয়েক দিন পরেই ভারতব্যাপী রেলকারিগরদিগের ধর্ম্মঘট করিবার প্রস্তাব চলিতেছিল—কেবল বড়লাট মধ্যস্থতা করিয়া গোলযোগ মিটাইয়া দিবেন বলিয়া এক প্রস্তাব উঠিয়াছিল, সকলে তাহার শেষ সিদ্ধান্ত জানিবার জন্য অপেক্ষা করিতেছিল। এই রকম ব্যাপার চলিতেছে, ইতিমধ্যে শোনা গেল যে, খড়্গপুরের নিকটে কে বা কাহারা রেল লাইনের মৎস্যপত্র বা fish plate বা এইরকম কোন্ জিনিষ সরাইয়া ফেলিয়াছিল। ফলে যাত্রীসহ একটী ট্রেন—পপাত ধরণীতলে। কিন্তু, যতদূর মনে পড়ে, সংবাদপত্রে প্রকাশ পাইল যে, গাড়ী চুরমার হইয়া থাকে তো হোক, তাহাতে বিশেষ দুঃখ নাই, কারণ একটী যাত্রীও মৃত্যুমুখে পতিত হয় নাই—যাত্রীরা যেমন দাঁড়াইয়াছিল, তেমনই খাড়া ছিল। সংবাদপত্রের কথা—বিশেষত ইংরাজী সংবাদপত্রে বাহির হইয়াছে, কাজেই উহা অবিশ্বাস করিবার ইচ্ছা প্রবল হইলেও অবিশ্বাস করিবার অধিকার আমাদের ছিল না। কিন্তু সংযাত্রীগণ এমন দুষ্প্রবৃত্তি যে, তাঁহারা সংবাদপত্রের কথা নিছক মিথ্যা কথা বলিয়া উপহাস করিতে লাগিলেন!

উল্টানো গাড়ী দেখিয়া চিন্তাধারা।

আমার যাত্রায় বাহির হইবার দিন দুই তিন পূর্ব্বেই এই ঘটনাটী ঘটে। পূর্ব্বোক্ত রেলকর্ম্মচারী সাহেব ও বাঙ্গালী অন্য যাত্রীদিগকে বলিতে লাগিলেন যে, আজ পর্য্যন্ত একখানি গাড়ী উল্টানো অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমি নীরব দর্শক ও শ্রোতা থাকিলেও গাড়ীখানি কিভাবে আছে দেখিবার একটু কৌতূহল হইল। খড়্গপুর ছাড়িয়া ট্রেণ কিছুদূর যাইতে না যাইতে দেখি, পার্শ্ববর্ত্তী লাইনে একটা প্রকাণ্ড গাড়ী হেলানো অবস্থায় পড়িয়া আছে। আমরা সকলেই তাহা উৎসুকনেত্রে দেখিলাম। তখন ভাবিতে লাগিলাম—ভারতীয়দের উপর ইংরেজদিগের অসদ্ব্যবহার কেবল অন্যায় নয়, কিন্তু নিছক অবিবেচনার কাজ। ইংরাজদিগের সমস্ত কাজ, সৈন্যদের যাতায়াত, আহারাদি সংগ্রহ, বিমানপোতের চলাচল প্রভৃতি যে কোন কর্ম্মের দ্বারা ইংরাজেরা নিজেদের ভরণ পোষণ নির্ব্বাহ করিবে অথবা ভরাতীয়দিগকে শাসনে রাখিবে, সেই সমস্ত কর্ম্মের অন্তত পনেরো আনা নির্ভর করে রেলগাড়ী, টেলিগ্রাম প্রভৃতি ঠিক রাখার উপর। কিন্তু যদি তাহাদের অসদ্ব্যবহার বা অন্যায় বিচার প্রভৃতির কারণে সমস্ত ভারতবাসী সাধারণত উত্ত্যক্ত হইয়া উঠে এবং তাহার ফলে রেল লাইন উপড়াইয়া দেওয়া প্রভৃতি অন্যায় কর্ম্মে প্রবৃত্ত হয়, তখন ভারতবাসীদিগকে শাসনে রাখা কতদূর দুরূহ হইবে, তাহা ইংরাজদিগের একটু ভাবিয়া দেখা কর্ত্তব্য।

সাহেব—বাঙ্গালীর কথোপকথন।

একদিকে আমার অন্তরে ঐ প্রকার চিন্তার ধারা

চলিয়াছে; অপরদিকে ঐ রেলকর্ম্মচারী বাঙ্গালী ও সাহেবের মধ্যে খুব স্বচ্ছন্দ আলোচনা চলিতে লাগিল। অবশিষ্ট যাত্রী কয়জন আমার মত নীরব কিন্তু উৎকর্ণ শ্রোতা ছিলেন। সাহেব বলিলেন—সংবাদপত্রের আবার কথা! তাহা মোটেই বিশ্বাসযোগ্য নয়—তাহারা সকলেই টাকার গোলাম; আমাকে টাকা দাও, তুমি যে ঘটনার বিষয় যে ভাবে লিখাইতে বলিবে, আমি তাহা সেই ভাবেই লিখাইতে পারিব। সাহেব উপহাসের সহিত নিতান্ত অবিশ্বাস দেখাইয়া বলিলেন—হাঃ—হাঃ—যাদুকরের যষ্টির মন্ত্রস্পর্শে (by the touch of the magic wand) গাড়ীগুলি চূর্ণ হইতে পারে, কিন্তু একটীও যাত্রী তো মরিবেই না, কাহারও গায়ে একটা আঁচড়ও লাগিবে কিনা সন্দেহ—আমি জানি—আমি জানি—যাদুকরের এই যষ্টি কি।"

তখন বাঙ্গালী রেলকর্ম্মচারীটি বলিলেন যে, হাবড়ায় টিকিয়াপাড়ায় দিনের বেলায় ১০ টার সময় একবার যাত্রীট্রেণ বে-লাইন হয়; তখন তিনি নাকি হাবড়ায় কাজ করিতেন। তিনি জানেন যে, সে অঞ্চলে অন্যদের কথা তো দূরে থাক, যাত্রীদের আত্মীয়স্বজন বন্ধুবান্ধবদিগকে সেই অকুস্থলের নিকটে যাইতে দেওয়া হয় নাই। সেখানে এক সাহেব চাবুক হস্তে দাঁড়াইয়া দুঃসাহসিক ব্যক্তিদিগকে উত্তম মধ্যম প্রহার দিয়া মুহূর্ত্তের মধ্যে তাঁহাদের দুঃসাহসিকতা উড়াইয়া দিত। সেই উল্টানো গাড়ীর পাশের লাইন দিয়া অন্যান্য যে সকল যাত্রী গাড়ী চলাচল করিয়াছিল, সে সমস্তের জানালা বন্ধ করিবার আদেশ দেওয়া হইয়াছিল; দৈবাৎ যদি কেহ জানালা খুলিয়া দুঃসাহস সহকারে মুখ বাড়াইয়া অকুস্থল দেখিবার চেষ্টা করিত, কোথা হইতে যে ইটপাটকেল উড়িয়া আসিয়া যাত্রীদের ব্যতিব্যস্ত করিত, তাহা কেহই বলিতে পারিত না। তিনি তো খুব জোরের সঙ্গে বলিতে লাগিলেন যে, তিনি জানেন যে, সেই দুর্ঘটনায় বিস্তর লোক মরিয়াছিল; বিস্তর গাড়ী বোঝাই করিয়া শবদেহ লইয়া যাওয়া হইয়াছিল এবং কোথায় যেন ভাসাইয়া দেওয়া হইয়াছিল—সংবাদপত্রে মৃত্যুর সঠিক সংবাদ বাহির হয় নাই।

সাহেব—বাঙ্গালীর কথোপকথন শেষ হইলে একজন সহযাত্রী বলিলেন—'বলেন কি মহাশয়—ইহাও কি বিশ্বাসযোগ্য? তাহাতে সাহেব বলিলেন—হাঁ হাঁ বিশ্বাস কর—ইনি ঠিক বলিতেছেন'। আমি কিন্তু হতভম্ব হইয়া রহিলাম—ভাবিলাম, রেল কোম্পানি কি এতই অবিশ্বাসজনক, এতই মিথ্যা বিবরণ প্রচার করিবে? আর সত্য বিবরণ কি গবর্ণমেণ্টেরও কর্ণগোচর হয় না? যদি তাহা হয়, তবে গবর্ণমেণ্টও কি তাহা প্রকাশ করিতেন না? এই প্রকার কথোপকথন শুনিতে শুনিতে চিন্তাধারার মধ্যে বিশ্বাস-অবিশ্বাসের দোলায় দোল খাইতে খাইতে খড়্গপুরের নিকটবর্ত্তী সেই অকুস্থলকে সুদূর পশ্চাতে রাখিয়া চলিলাম।

মুলতান রাগিণীর ঝঙ্কার।

আমি আবার চক্ষু মুদ্রিত করিলাম। কখনও বা চক্ষু খুলিতেছি, কখনও বা বন্ধ করিতেছি। আর ভগবানকে ডাকিতেছি—কারণ তাঁহাকে ডাকা ছাড়া তাতে আর কোনও কাজই যে ছিল না। দেখিতে দেখিতে পরবর্ত্তী ষ্টেশনে যখন ট্রেণ থামিল, তখন বৈকাল বেলা ঘনাইয়া আসিতেছে। অস্তমিত সূর্য্যের রাঙ্গা রঙ্গে সুদূর পশ্চিম প্রান্তের মেঘগুলি রাঙ্গাইয়া উঠিয়াছে। কাক বক প্রভৃতি বিহগেরা দলে দলে ঝাঁকে ঝাঁকে নিজেদের বাসায় ফিরিয়া আসিতেছে। উহাদের মধ্যে দুই একটা পথভ্রষ্ট পক্ষী যেখানে সুবিধা বুঝিল সেইখানেই নামিয়া পড়িল। কচিৎ কদাচিৎ দুই একটা বকের ক-ক-ধ্বনি কানে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে, আর এই ক্ষুদ্র মানুষটার আত্মাকে অনন্তের সীমাহীন পারে ডাক দিয়া চলিতেছে। সম্মুখে চাঁদ নীরব নিঃশব্দ পদক্ষেপে আকাশের দূর সীমা হইতে উঠিবার চেষ্টা করিতেছে। মুলতান রাগিণী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া অন্তরে ঝঙ্কার দিয়া উঠিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে ট্রেণ ছাড়িয়া দিল—হু হু স্বরে চলিতে লাগিল। দেখিতে দেখিতে বিশাল শালবন আরম্ভ হইল। হনুমানগণ দলে দলে শাবক কোলে করিয়া ট্রেণের ভয়ে এ গাছ হইতে ও গাছে ছুটিয়া লাফাইয়া খেলা করিতে করিতে চলিয়াছে। এই সমস্ত দেখিতে দেখিতে অসীমে সসীমে অপূর্ব্ব মেশামেশি, অপূর্ব্ব লুকোচুরি খেলা দেখিয়া আত্মহারা হইয়া গেলাম এবং এই ক্ষুদ্র আত্মার অভ্যন্তরে যে পূর্ণ পুরুষ স্বীয় উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে জাগ্রত আছেন, মুদিত নেত্রে তাঁহাকেই দেখিতে লাগিলাম, আর বারবার নমস্কার করিলাম।

বৈকালে "হিন্দু" চা-পান।

বিকেল বেলায় চায়ের জন্য ইংরাজদিগের অনুকরণে দেশীয় রেলযাত্রীদিগেরও হুড়াহুড়ি ছুটাছুটি করা একটা প্রথা বা ফ্যাসন হইয়া দাঁড়াইয়াছে। হাত ধোয়া নাই, কিছু নাই—ঐ নোংরা হাতে রুটী মাখন এবং পাঁচ শত ঘণ্টা ধরিয়া সিদ্ধ ও সাহেব মেমদের প্রসাদী চা খাইয়া কি যে আত্মতৃপ্তি হয় তাহা তো বুঝিতে পারি না। আমার সঙ্গে পাঁউরুটী, লুচি ও মিষ্ট কিছু ছিল। কিন্তু কত প্রকার যাত্রী দরজায় যে হাতল ধরিয়া উঠিতেছে নামিতেছে এবং যে হাতল প্রভৃতি মেথরেরা সাংজমের ধূলিপূর্ণ পাটের তাড়া দ্বারা মধ্যে মধ্যে মুছিয়া যাইতেছে, সেই হাতল প্রভৃতি আমিও ধরিয়াছি। সেই হাত শুধু গাড়ীর ট্যাঙ্কে ধরা জলে নয়, কিন্তু বাড়ীতে

ধরা ভাল জলে সাবান দিয়া হাত না ধুইয়া ঐ লুচি প্রভৃতি খাইতে রুচিই হইল না। আর সন্ন্যাসগ্রহণেচ্ছু ব্যক্তি যেমন বাড়ীর বাহিরে পা দিয়াই মুক্তির আনন্দ অনুভব করে, আমিও সেইরূপ ক্ষুধা থাক বা নাই থাক, নিয়মিত সময়ে চর্ব্ব্য চোষ্য লেহ্য পেয় উদরস্থ করিবার বন্ধন হইতে বাহির হইয়া নিজের ইচ্ছামত উপবাস দিবার নির্বাধ অধিকার লাভে মুক্তির মহা আনন্দ অনুভব করিতে লাগিলাম। ষ্টেশনে যখন সহযাত্রীগণ চায়ের জন্য ছুটা-ছুটি করিতেছেন, আমি তো তখন চুপ করিয়া তাঁহাদের রঙ্গ দেখিতেছিলাম। একজন তকমাধারী খানসামা প্রথম শ্রেণীর এক সাহেবের জন্য কাঠের থালে চা রুটী মাখন লইয়া যাইতেছে দেখিয়া একটী বাঙ্গালী সহযাত্রী কাতরকণ্ঠে ডাকিলেন—খানসামা! সে উত্তরই দিল না। এই ভাবে আরও দুই একটা খানসামা পাশ কাটাইয়া চলিয়া গেল। তখন তিনি কি করেন, অগত্যা দেশীয়-দিগের জন্য "হিন্দু" চাবিক্রেতাকেই ডাকিলেন এবং একভাঁড় চা পান করিয়া পেটটাকে ঠাণ্ডা না গরম কি করিলেন তাহা বলিতে পারি না। সে দাম চাহিল, তখন চা-পায়ী তাহাকে দাম, বোধ হয় ৵০ দুই আনা মাত্র, দিলেন, কিন্তু শুনাইয়া দিলেন যে, তাহার চা অতি বিশ্রী! সেও উত্তরে বলিল যে, "আপনিই একা বদনাম দিতেছেন, দুনিয়াভোর লোকদিগের মুখে আমার চায়ের প্রশংসা ধরে না।" ট্রেণ যখন ছাড়িল, তখন আমি সঙ্গে খাবার জল লইয়া গিয়াছিলাম, সেই জল লইয়া হাত একটু ভাল করিয়া ধুইলাম এবং একটা কমলা লেবু বাহির করিয়া তাহার খোসার সাহায্যে ও খোসার রসে হাতটা আর একটু সাফাই করিয়া একটা কমলালেবু খাইয়া পরম তৃপ্তি লাভ করিলাম।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

পূরবী—ধামার।

বীণা বাজাইয়া মন হরিলে হে।
মধুর মধুর ধ্বনি, গগন ছাইল রে।
অনাহত তানে প্রাণ ভরি' মন হরিলে হে।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

```
  •          ৩                   ১´            •        ২             •
| ঋঋা ন্‌া সা | গা -া পা ক্ষা I  পা -া ক্ষা | (ধক্ষা -া | পক্ষা পক্ষা | গা মা গা |
  বী •  •      • • ণা বা     জা • •       ই •      • •  • •      • • য়া

  ৩                  ১´            •        ২       •            ৩
| : ক্ষা: ধা পা: ক্ষা : I গা ঋা গা | ঋা -া | সা -া | ঋঋা ন্‌া সা | গা -া পা -া I
  • •  ম  ন   •      হ • রি   লে •   হে •   বী• • •      • • ণা •

  ১´                 •            ২          •               ৩
{I পক্ষা ধা পা | (গর্সা -া |  র্সা র্সা |  র্সা না র্সঋা | ঋা -া র্সনর্সা র্সা I
   ম •  ধু •      র •       ম  ধু      র • • •        ধ্ব • • •  নি

  ১´          •          ২            •              ০                    ১´
      [ঋা´]            [ঋা´]                            [-া]               [ঋা]
I না র্সা -া | র্গা -া | র্সা_র্পা | র্গা ঋা -া | র্সা: ঋর্সা: না র্সা I} র্রা না: ধ: |
  গ গ •      ন •     ছা •      ই ল •      রে • • • •            অ না •

  •        ২             •              ৩              ১´             •
| না -া | ধপপা -া | পা -া -া | ক্ষা পা না ধা I পা -া ক্ষা | ধপক্ষা -া |
  হ •     ত• • •    তা • •     • • নে প্রা    ণ • •      ভ• • •

  ২              •             ৩                 ১´            •        ২
| পক্ষা পক্ষা | গা মা গা | ক্ষা ধা পা ক্ষা I গা মা গা | ঋা -া | সা -া IIII
  • • • •      • • রি      • ম ন •       হ • রি     লে •    হে •
```

১ম

১´ • ২ • ৩

I পাঃ ক্ষাঃ পা। না ধপপা। -া পক্ষা। গা মা গা। ঃক্ষাঃ ক্ষধা পা। ক্ষা I

বী • ণা বা জা•• •ই• য়া • • •• ম ন •

১´ • ২

I গমা ঋগা পা। গঋা -া। সা -া।

হ• •• • রি • লে •

২য়

১´ • ২ • ৩

I র্সাঃ নঃ র্সা। র্ঋা না। -া ধনা। ধপপা -া -া। ক্ষা ধা পা ক্ষা I

বী • ণা বা জা • ই য়া•• • • • ম ন •

১´ • ২

I গা মা গা। ঋা -া। সা -া।

হ • রি লে • হে •

৩য়

১´ • ২ • ৩

I পক্ষা ধা পা। পর্সা -া। র্সা র্সা। র্সা না র্সঋা। র্ঋা -া র্সর্সা র্সা I

ম • ধু • র • ম ধু র • •• ধ্ব • •• নি

১´ • ২ • ৩

I -া -া -া। না র্সা। র্গা -া। -া র্ঋা -া। -া র্সনর্সা -া -া I

• • • • • • • • • • • ••• • •

১´ • ২ • ৩

I পক্ষা ধা পা। র্সা র্সা। র্সনা র্ঋা। র্ঋা র্সা -া। না র্সা র্গা র্ঋর্পা I

ম • ধু র ম ধু র• • ধ্ব নি • গ গ ন ছা•

১´ • ২ • ৩

I র্গা র্ঋা র্সা। র্রা নাধ। ধনা ধপা। ধপা ক্ষা গা। গা গা পক্ষা ধা I

ই ল রে অ না হ ত• তা • নে প্রা ণ • • •

১´ • ২ • ৩

I না র্সা ধনা। -া ধপপা। -া ক্ষপক্ষা। গা মা ঋগা। ঃক্ষাঃ ধা পাঃ ক্ষাঃ I

• • • • ভ•• • •• রি • • •• ম ন •

১´ • ২

I গা মা গা। ঋা -া। সা -া।

হ • রি লে • হে •

৪র্থ

১´ • ২ • ৩

I র্সা -া নর্সা। র্ঋা না। -া ধনা। ক্ষা ধা না। র্সা না -া ধনা I

বী • ণা বা জা • ই বী • না বা জা • ই

•

১´ • ২ • ৩
I ধপপা -া ক্ষপগা। পক্ষা ধা। র্সনা র্সা। ঋা -া র্সা। র্সর্সা র্গা ঋা র্সনা I
য়া • • • • • • ম • ন হ • রি লে • হে বী • • ণা বা •

১´ • ২ • ৩
I র্সা -া নর্সা। পপা র্সা। ধা পক্ষা। গা মা গা। ন্না সা গা ক্ষা I
জা • ই বী • • ণা বা • জা • ই বী • • ণা বা

১´ • ২ • ৩
I পা -া ক্ষা। পক্ষা -া। পক্ষা পক্ষা। গা মা গা। ঃক্ষাঃ ধা পাঃ ক্ষাঃ I
জা • • ই • • • • • • • য়া • • ম ন •

১´ • ২ • ৩
I গা মা গা। গঋা -া। সা -া। ঋঋা ন্া সা। গা -া পা -া I
হ • রি লে • হে • বী • • • • • • ণা •

এমিয়েলের জার্নাল।

(শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ রায়)

(গুডফ্রাইডেতে গিরিডি খৃষ্টীয় ধর্ম্মমণ্ডলীর কাছে পঠিত)

দুঃখ-কষ্টকে অমঙ্গল জ্ঞানে অভিসম্পাত করা সহজ কর্ম্ম—তাহার মধ্যে বীরত্ব নাই। যখন আমরা তাহা করি, তখন আমরা যে নিতান্তই পৃথিবীর মানুষ, তখন যে আমরা নিতান্তই রক্তমাংস-জড়পিণ্ডের মানুষ, তখন যে আমরা নিতান্তই ভোগ-বিলাসের প্রাকৃত মানুষ। কিন্তু আমাদের মহত্ত্ব, আমাদের বীরত্ব দুঃখ-কষ্টকে মহা মঙ্গল জ্ঞানে বরণ করিবার মধ্যেই।

মৃত্যু! তোমার মর্ম্মভেদী দারুণ শেল-যন্ত্রণা কোথায়? সমাধিস্থল! তোমার বিজয়-দুন্দুভি কোথায়? দুঃখ-ক্লেশের মধ্যে চিত্তের প্রশান্ত ভাব, সেই প্রশান্ত ভাবের মধ্যে স্বর্গরাজ্যের অনুপম শোভা-সুষমা। ইহারই ভিতর মনুষ্যসমাজ তন্ময় হইয়া মগ্ন রহিল—চিন্তা করিতে লাগিল ইহা কি ব্যাপার! মনুষ্যসমাজ বুঝিল, এক অভিনব ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছে। উহা বলিতেছে—নূতন আলোকে জীবনকে ব্যাখ্যা করিতে হইবে। দুঃখের যথার্থ তাৎপর্য্য রহিয়াছে। এমন দিন ছিল যখন মানব দুঃখকে আপদ জ্ঞানে পরিহার করিত, উহা হইতে মুক্তি পাইবার চেষ্টা করিত। কিন্তু অধুনা মানব শিক্ষা করিয়াছে দুঃখ আত্মাকে পরিশুদ্ধ করে, ইহা অনন্ত প্রেমময়ের মঙ্গল পরীক্ষা, আমাদিগকে বিশুদ্ধ এবং উন্নত করিবার জন্য ইহা তাঁহারই এক স্বর্গীয় বিধান, ইহা বিশ্বাসকে দৃঢ় করিবার পক্ষে সহায়তা করে, ইহা বিমল আনন্দের দীক্ষাস্বরূপ।

বিশ্বাসের কি অদ্ভুত শক্তি! ইহা পার্থিব বস্তুতে কি এক আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সংঘটিত করে—যাহা প্রত্যক্ষ, যাহা স্পষ্ট, যাহা ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহার অস্থায়িত্ব তাহার ক্ষণভঙ্গুরতা নিঃসন্দিগ্ধরূপে প্রতীয়মান করিয়া দেয়। বিশ্বাস সমস্ত বস্তুর রহস্যকে ভেদ করে। দৃশ্যমান প্রকৃতির অন্তরালে অদৃশ্য বিধাতাপুরুষের বিদ্যমানতা প্রতিপন্ন করে। অশ্রুজলে বিশ্বাসে আনন্দ উদ্ভাসিত হয়, বিশ্বাসে বেদনা আনন্দের সূচনা করে। দুঃখ-কষ্টকে যাঁহারা এই চক্ষে দেখিতে পারিয়াছেন, তাঁহাদিগের নিকট এই জন্য সমাধিস্থল স্বর্গ হইয়াছে, এই জন্য জীবনের শ্মশানাগ্নির উপর তাঁহারা অমরত্বের বিজয়সঙ্গীত কীর্ত্তন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। তাঁহাদের পবিত্র প্রজ্বলিত উৎসাহানল জগতের শ্রীকে নব শোভায় প্রদীপ্ত করে। অনুপ্রেরণায় যখন তাঁহারা নিজ নিজ অন্তর্নিহিত ভাবকে প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হন, তখন তাঁহাদের অতিস্ফূর্তিপূর্ণ মহোল্লাস জগতবাসিগণের নিকট অনধিগম্য হইয়া উঠে। তাঁহারা শত সহস্র অলৌকিক রসনাযুক্ত স্বর্গীয় জীব—তাঁহাদের বাণী অফুরন্ত।

আত্মবলিদানের প্রচণ্ড মাদকতা, মৃত্যুভয়াতীত হইয়া মৃত্যুকে তাচ্ছিল্য করা, অনন্তের জন্য নিদারুণ তৃষ্ণা, প্রেমোন্মত্ততার প্রলাপ বচন—এই সমুদয়ই খ্রীষ্ট তাঁহার হৃদগত অপরিবর্ত্তনীয় করুণার দ্বারা প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। হত্যাকারীদিগকে ক্ষমা করিতে পারায়, ঈশ্বরের সঙ্গে অচ্ছেদ্য যোগের অন্তর্নিহিত নিঃসংশয় বিশ্বাস থাকায়, খ্রীষ্ট ক্রুশের উপর ভীষণ অমরাগ্নি প্রজ্বলিত

করিয়া ধর্মরাজ্যে মহা বিপ্লবের সৃষ্টি করিয়াছেন। করুণাময়ের অনন্ত করুণার উপর অনন্ত বিশ্বাস স্থাপন করা এবং অনুতপ্তচিত্তদিগকে ক্ষমা করাই মুক্তিলাভের উপায় —ইহা জীবনে উপলব্ধি করিয়া জগৎবাসীগণের নিকট মুক্তির পথ যে বিশ্বাসে এবং ক্ষমায় তাহাই ঘোষণা করেন। অনুতাপের প্রয়োজন নাই এইরূপ শত শত ধার্ম্মিকপ্রবর অপেক্ষা একটিমাত্র অনুতপ্ত পাপী স্বর্গরাজ্যে বহুল পরিমাণে অধিক আনন্দ আনয়ন করে—এমন কথা বলার দ্বারাই দীনতাই যে স্বর্গরাজ্যের প্রবেশদ্বার তাহাই নির্দ্দেশ করিলেন।

বিদ্রোহী আত্মাকে নিহত কর, পরিপূর্ণরূপে আপনাকে নিপীড়ন কর, ঈশ্বরকে সমুদায় সমর্পণ কর, তবেই স্বর্গের শাশ্বত শান্তি তোমার মধ্যে অবতীর্ণ হইবে। সে শান্তি ইহজগতের শান্তি নহে। অষ্টাদশ শতাব্দী পর্য্যন্ত ইহা অপেক্ষা কোন মহত্তর বাণী বিঘোষিত হয় নাই।

ন্যায়বিচারের প্রকৃষ্টতম পন্থা মানব অনন্তকাল ধরিয়া অন্বেষণ করিয়া বেড়াইলেও, সে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে অনুভব করিতেছে যে ন্যায়বিচারের বহু উর্দ্ধে এক পদার্থ আছে তাহার নাম ক্ষমা। কারণ ক্ষমাই পবিত্রতার স্বরূপটিকে সংরক্ষণ করে ও অক্ষুণ্ণ রাখে। এবং প্রেমের ক্ষেত্রকে পূর্ণভাবে সম্প্রসারিত করে। জীবনোৎসর্গ-লব্ধ ধর্ম্ম বিনষ্ট হইতে জানে না এবং তজ্জন্যই ক্রুশের নির্য্যাতনই খ্রীষ্টধর্ম্মের সুমহান আদর্শ।

জিনেভা—১৩ই এপ্রিল, ১৮৭০।

কালগণনা।

(৺ঈশানচন্দ্র বসু)

আমাদের দেশে প্রাচীনকালের দুইটী প্রধান রাজার রাজ্যাধিকার হইতে বৎসরগণনা চলিয়া আসিতেছে। বিক্রমাদিত্য রাজার সময় হইতে যে বৎসর গণনা হইতেছে, তাহা সংবৎ নামে পরিচিত; শকনরপতির রাজ্যকাল হইতে যে বর্ষকাল গণনা হইতেছে, তাহাকে শকাব্দ বলা যায়। উত্তর-পশ্চিমপ্রদেশের হিন্দুস্থানীদিগের মধ্যে সংবৎ গণনা অধিক প্রচলিত। বঙ্গদেশে শকাব্দ ধরিয়া পঞ্জিকা গণনা হয়।

সম্প্রতি আর দুইটী বৈদেশিক গণনা এদেশের সর্ব্বত্র চলিতেছে। একটী সন,—উহা মহম্মদের ধর্ম্মপ্রচার সময় হইতে গণিত। মুসলমানদিগের রাজ্যাধিকার অবধি রাজসংসারের কর্ম্মোপলক্ষ্যে এদেশের লোকেরা সাল ও তারিখ গণনা করিতেছেন। সাল অর্থে বৎসর এবং তারিখ অর্থে মাসের দিন বুঝিতে হয়।

এইরূপে বর্ত্তমান কালে ইংরাজদিগের বৎসরগণনা আমাদের রাজকীয় তাবৎ কর্ম্মে লাগিতেছে। উহার নাম খৃষ্টাব্দ। যীশুখৃষ্টের জন্ম হইতে এই খৃষ্টাব্দ চলিয়া আসিতেছে।

মুসলমানদিগের রাজ্যাধিকার কালে এক-এক বাদসাহ বা নবাবের শাসনকাল ধরিয়া বৎসর গণনা হইতেছে। মুসলমানেরা চন্দ্রের গতি অর্থাৎ তিথি ধরিয়া বৎসর গণনা করেন, তাই সৌর বৎসরের সহিত উহা মিলে না। ১৬৮০ শকাব্দে রাজবল্লভ গ্রামে এক শিবমন্দির নির্ম্মিত হয়। তাহাতে সন ১১৬৬ সাল লিখিত আছে।

শকাব্দের দ্বাদশ মাসের গণনা বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয়। সনের বার্ষিক গণনা সর্ব্বত্র বৈশাখ মাস হইতে আরম্ভ হয় না। এক-এক জেলায় বা প্রদেশে বৎসরের উৎপন্ন শস্য ধরিয়া ফসলী সন বা বৎসর গণনা হয়। চান্দ্রমাস অর্থাৎ তিথিগণনায় ভাদ্রমাসের শুক্লদ্বাদশী তিথি হইতে যে নূতন বৎসর ধরা হয়, তাহাকে আমলী সাল বলে। যে বৈশাখে এই প্রবন্ধ লিখিতে আরম্ভ করি, সে মাসে বিক্রমাব্দ ১৯৬৭, খৃষ্টাব্দ ১৯১০, শকাব্দ ১৮৩২, সন ১৩১৭ গণনা হইতেছে।

প্রাচীনকালের মন্দিরে বা স্তম্ভে তাহার নির্ম্মাণের বৎসর অঙ্কিত দেখা যায়। বৎসরের অঙ্ক যে মন্দিরের গাত্রে খোদিত নাই, সেখানে যদি রাজার নাম অথবা তৎপ্রতিষ্ঠাতা কোন মহৎ লোকের নাম দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে সেই রাজার শাসন বা ঐ মহৎ ব্যক্তির জীবনকালের কোন পরিচয় ধরিয়া বিচার করিতে হইবে যে, এইটী কত কালের কীর্ত্তি।

রাজা বিক্রমাদিত্যের সময় হইতে এদেশে বিস্তর গ্রন্থ রচিত হইয়াছে। সেই গ্রন্থের রচনাকাল এবং গ্রন্থকর্ত্তার পরিচয় ঐ গ্রন্থের মধ্যে উল্লিখিত রহিয়াছে। অনেক রাজার দানপত্রাদি দলিলে তাঁহার সময়ের অঙ্কপাত থাকে। কোন কোন দলিলে বা মন্দিরের গাত্রে শকাব্দ অথবা সম্বৎ ও সন দুইটী অঙ্ক থাকে। ইংরাজদিগের প্রদত্ত দলিলে প্রথম প্রথম খৃষ্টাব্দ ও সাল দুই অঙ্কপাত থাকিত।

কালপ্রভাবে মনুষ্যসমাজে এক-এক প্রকারে ধর্ম্মের বা রাজনীতির সংস্কার হয়। এক-এক শত বৎসরে বা তদধিক কালে এইরূপ সংস্কার পরিস্ফুট হইয়া উঠে। এইরূপ সংস্কার দ্বারা বহুশত বৎসরে যে পরিবর্ত্তন ঘটে, তাহাকে যুগপরিবর্ত্তন বলে। যুগে যুগে মনুষ্যমণ্ডলীর নানা প্রকার উন্নতির লক্ষণ হয়। বহু যুগ-যুগান্তরে যাহা সিদ্ধ হয়, তাহাকে এক-এক কল্পের কার্য্য বলা যায়।

একশত বৎসরকে এক শতাব্দী বলে। অস্মদ্দেশের

প্রচলিত বিক্রমাব্দে বা ইউরোপীয় খৃষ্টাব্দে ৫৭ বৎসরের অন্তর। অর্থাৎ এদেশের বিক্রমাব্দের আরম্ভের ৫৭ বৎসর পরে ইউরোপে খৃষ্টের জন্ম হইয়াছিল। এইরূপ খৃষ্টাব্দের ৭৮ বৎসর কালে এদেশে শকাব্দগণনা আরম্ভ হইয়াছে। খৃষ্টাব্দের যখন ৬২২ বৎসর তখন মহম্মদীয় হিজরী সাল আরম্ভ হইয়াছিল। খৃষ্টীয় ৫৭০ অব্দে মহম্মদের জন্ম হয় এবং ৬৩২ অব্দে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছিল। চান্দ্রমাস ধরিয়া হিজরী বৎসর গণনা করা হয়। সৌরমাসের গণনার সহিত মিল করিয়া এদেশে মুসলমানেরা সন গণনা করিতেছেন। এদেশে কোন ঘটনার সংবৎ জানা থাকিলে তাহার সহিত ৫৭ যোগ করিয়া খৃষ্টাব্দ নির্ণয় হইবে। খৃষ্টাব্দ পাইলে তাহার সহিত ৭৮ যোগ করিয়া শকাব্দ ধরিতে পারা যায়। এক্ষণে এদেশে যে সন চলিতেছে, তাহার সহিত খৃষ্টীয় অব্দের ৫৯৩ বৎসর অন্তর। এদেশের চলিত ১২০০ সালে ইংরাজদিগের ১৭৯৩ সাল ছিল। ঐ বৎসর ইংরাজেরা এদেশে নূতন আইন প্রচার করেন। সে আজি ১১৭ বৎসরের কথা এবং একটী স্মরণীয় ঘটনা।

ঘাটে গেলেই নৌকা মিলিবে।

(শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম-এ)

আজ ৩৫ বৎসরের কথা। ইংরাজী শিক্ষাভিমানী এক যুবক দেশভ্রমণে বহির্গত হইয়া হরিদ্বারে আগমন করেন। নগাধিরাজ হিমালয়ের পাদদেশে নিবিড় অরণ্যের মধ্যে একটী কুটীরে জনৈক মহাপুরুষের সহিত সন্ধ্যার পূর্ব্বে তাঁহার সাক্ষাৎ হয়। লৌকিক প্রথানুযায়ী যুবক তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "আপনার নাম কি, আপনার নিবাস কোথায়?" তিনি হাসিয়া বলিলেন, "বাবা, সন্ন্যাসীর নাম ও নিবাসের কথা জিজ্ঞাসা করিতে হয় না।" তাঁহার শরীরের জ্বালা দেখিয়া "আপনার কি কষ্ট হইতেছে" জিজ্ঞাসা করায় বলিলেন "আমার আবার কষ্ট কি? আমি দেহত্যাগ করিব। দেহত্যাগের পূর্ব্বে শরীরের জ্বালা হয়।" যুবক বলিলেন, "কিসে মন স্থির হয়।" মহাত্মা উত্তর করিলেন, "অভ্যাস ও বৈরাগ্যের দ্বারা। আমি নৈষ্ঠিক ব্রহ্মচারী। আজীবন একটী তত্ত্বের অনুসন্ধান করিতেছি এবং ইহাতে যে আনন্দ তাহা লইয়াই দেহত্যাগ করিতেছি। এই অনুভূতি হইলেই মন স্থির হয়।"

যুবক প্রাতঃকালে হঠাৎ একদিন নৌকা দেখিয়া ঐ নৌকায় হরিদ্বারের বিল্ব পর্ব্বতের দিক হইতে গঙ্গার অপর পারে গমন করেন এবং সমস্ত দিবস অপেক্ষা করিয়া নৌকা না আসায় রাত্রিকালে হিংস্র জন্তুর হস্ত হইতে রক্ষার নিমিত্ত নিরাপদ স্থানের অন্বেষণে ইতস্ততঃ অরণ্যের মধ্যে ভ্রমণ করিয়া একটী কুটীরে শায়িত দীর্ঘকায় এই মহাপুরুষের সাক্ষাৎ লাভ করেন। মহাপুরুষ পূর্ব্বোক্ত "আনন্দের অনুভূতি" এই কথার সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, "তোমার নৌকা মিলিবে, ঘাটে যাও।" এই শুনিয়া গৃহে ফিরিবার জন্য ব্যাকুল যুবক তাঁহাকে প্রণাম করিয়া গঙ্গাতীরে আসিয়া নৌকা দেখিতে পাইলেন এবং নৌকাযোগে অপর পারে প্রত্যাগমন করিলেন।

এই ৩৫ বৎসর মধ্যে মধ্যে তাঁহার প্রায়ই মনে হয়, "ঘাটে গেলেই নৌকা মিলিবে।"

গ্রন্থপরিচয়।

বৃহদারণ্যক উপনিষদ্।—শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্ন বি-টি কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও শ্রীযুক্ত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ কর্তৃক সম্পাদিত। ডবল ক্রাউন আকারে ২৷০ (—৩৬)+৪০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। স্বর্ণমণ্ডিত বাঁধাই সুন্দর, ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্য ২৷০ টাকা মাত্র।

ভারতীয় ব্রহ্মজ্ঞানের আদি উৎস সুপ্রসিদ্ধ দ্বাদশ উপনিষদের মধ্যে বৃহদারণ্যক একখানি প্রধানতম ও প্রাচীনতম উপনিষদ। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ ছয়টী অধ্যায় এবং প্রতি অধ্যায়ে অনেকগুলি করিয়া ব্রাহ্মণ (পরিচ্ছেদবিশেষ) আছে। বিষয়ের বাহুল্যে, গুরুত্বে ও প্রাচীনতায় এক ছান্দোগ্য ছাড়া উপনিষদ্ সাহিত্যে ইহার তুলনা নাই। ইতিপূর্ব্বে ছান্দোগ্যখানি এই পণ্ডিতযুগল কর্তৃক ব্যাখ্যাত ও সম্পাদিত হইয়া প্রকাশিত হইয়াছে। তত্ত্বভূষণ মহাশয় বহুপূর্ব্ব হইতে ভূমিকা, ব্যাখ্যা ও অনুবাদসহ ধীরে ধীরে সুপ্রসিদ্ধ উপনিষদ-দশকের অভিনব সংস্করণ প্রকাশ পূর্ব্বক পাঠকসাধারণের শ্রদ্ধাভাজন হইয়াছেন। অধুনা বৃহদারণ্যকের এই অভিনব সংস্করণ প্রকাশ করিয়া ইনি যেমন একদিকে আপনার আরব্ধ ব্রত পরিসমাপ্ত করিলেন, তেমনই অন্যদিকে আমাদিগকে অশেষ কৃতজ্ঞতা-পাশে আবদ্ধ করিলেন। পণ্ডিত তত্ত্বভূষণ এদেশের সুপ্রাচীন ব্রহ্মজ্ঞানের রুদ্ধদ্বার ভেদ করিয়া মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের অনুসৃত পন্থার অনুগমন পূর্ব্বক উপনিষৎ-নিহিত সত্যগুলিকে যে সহজ, সুগম ও সাধারণের সুপাঠ্য করিয়া তুলিতেছেন, ইহার জন্য তাঁহাকে কি বলিয়া ধন্যবাদ দিব জানি না।

বর্ত্তমান সংস্করণে 'পদপাঠ' অর্থাৎ ব্যাখ্যামুখে মূলাংশের প্রত্যেক পদের বন্ধনী মধ্যে স্বতন্ত্র বাঙ্গালা অর্থ, অবিকল বঙ্গানুবাদ এবং 'ব্রাহ্মণ'-শেষে ব্যাখ্যাত অংশের উপর প্রয়োজন অনুসারে ব্যাকরণ ও তাৎপর্য্য ঘটিত সুগহন মন্তব্য প্রভৃতি পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত মহেশচন্দ্র বেদান্তরত্নের

দান। এই মন্তব্যগুলি বাঙ্গলা ভাষায় একান্ত অভিনব ও বিশেষ পাণ্ডিত্যপূর্ণ হইয়াছে। ব্যাকরণ প্রভৃতি বিষয়ে তিনি যে সব সূক্ষ্ম বিচারের অবতারণা করিয়াছেন, উহাতে তাঁহার শাস্ত্রালোচনার গভীরতা ও প্রসারতা বেশ হৃদয়ঙ্গম হয়। ইহা ব্যতীত স্বয়ং সম্পাদকের প্রত্যেক খণ্ডের বিষয়-নির্দেশক শিরোলিপি, সুবিস্তৃত বিষয়ানুক্রমণিকা, মুখবন্ধ ও মহর্ষি যাজ্ঞবল্ক্যের দার্শনিক মতবিষয়ক ভূমিকা প্রভৃতি বর্ত্তমান সংস্করণকে অলঙ্কৃত করিয়াছে। আধুনিক দৃষ্টিতে ঔপনিষদ মতবাদের সমালোচনা মূলক তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের ৩০ পৃষ্ঠা ব্যাপী এই সুদীর্ঘ ভূমিকাটী বাঙ্গলার দর্শন-সাহিত্যে সত্যই একটী অমূল্য সম্পৎ।

"শুক্ল যজুর্ব্বেদের দুই শাখা—(১) কাণ্ব শাখা এবং (২) মাধ্যন্দিন শাখা। প্রত্যেক শাখাতেই 'শতপথ' নামক একখানি ব্রাহ্মণ আছে। এই উভয় 'শতপথ'-ব্রাহ্মণ যে সর্ব্বাংশেই এক, তাহা নহে; কিছু কিছু পার্থক্যও আছে; তবে অধিকাংশ স্থলেই ঐক্য রহিয়াছে। কাণ্ব শাখার 'শতপথ'-ব্রাহ্মণে ১৭টী কাণ্ড; উহার শেষ কাণ্ড অর্থাৎ সপ্তদশ কাণ্ডই 'বৃহদারণ্যকোপনিষৎ' নামে খ্যাত। এই উপনিষদের প্রায় সমগ্র অংশই মাধ্যন্দিন শাখায় পাওয়া যায়, কিন্তু একস্থলে নহে।" বেদান্তরত্ন মহাশয়ের এই 'গ্রন্থ-পরিচয়ে' বেশ তথ্যসংগ্রহের চেষ্টা আছে।

উপনিষৎসাহিত্যের সাধারণ লক্ষণ ব্রহ্মজ্ঞানপ্রতিপাদন। এই 'বৃহদারণ্যকে' সেই ব্রহ্মজ্ঞানের যথেষ্ট সুগভীর আলোচনা আছে। কিন্তু ইহাতে এমন অনেক বিষয় আছে, যাহাকে প্রকৃত ব্রহ্মজ্ঞান বলা যায় না। ইহার প্রধান কারণ এই যে, এই উপনিষৎ একটী বৃহৎ 'ব্রাহ্মণের' অন্তর্গত। উহার ফলে ইহাতে এমন অনেক জিনিস প্রবেশ করিয়াছে, যাহার প্রকৃত স্থান ব্রাহ্মণগ্রন্থে। প্রাচীন পুস্তকে সর্ব্বত্র সুস্পষ্ট বিষয়বিভাগ দুর্ল্লভ। দ্বিতীয় কারণ এই যে, এই গ্রন্থ স্পষ্টতই অনেক ঋষির রচিত। প্রতিভা এবং অন্তর্দৃষ্টি সম্বন্ধে এই ঋষিদের মধ্যে অনেক প্রভেদ দেখা যায়। কেহ কেহ অতি গভীর চিন্তাশীল। তাঁহারা যে সকল বিষয়ে শিক্ষা দিয়া গিয়াছেন, এই বিজ্ঞানালোকিত বিংশ শতাব্দীতেও তাহার বিচার চলিতেছে। পক্ষান্তরে কতক ঋষি কর্ম্মকাণ্ডোক্ত যাগযজ্ঞ প্রভৃতি লইয়া এত ব্যস্ত ছিলেন যে, চিন্তা করিতে যাইয়াও তাঁহাদের চিন্তা যজ্ঞ ও যজ্ঞাঙ্গবিষয়কলাপের সহিত মিশিয়া গিয়াছে। ইহাতে অজাতশত্রু, জনক, যাজ্ঞবল্ক্য, আরুণি, উষস্ত ও প্রবাহণ প্রভৃতি অনেক ঋষি এবং সুপ্রসিদ্ধা ব্রহ্মবাদিনী গার্গী ও মৈত্রেয়ীর উল্লেখ আছে। কিন্তু যাজ্ঞবল্ক্যই এই উপনিষদের প্রধান ঋষি। ইহাতে উপদিষ্ট গভীরতম তত্ত্বগুলি প্রধানতঃ তাঁহারই নামে ব্যাখ্যাত। 'মুখবন্ধে' সম্পাদকের এই জাতীয় উক্তিগুলি দ্বারা সমগ্র উপনিষৎখানির উপর তাঁহার একটী গভীর দৃষ্টির পরিচয় পাইলাম।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-রচিত 'ঔপনিষদ মধুচক্র' ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থের প্রায় ত্রিশটী মন্ত্র এই বৃহদারণ্যক উপনিষৎ হইতে সংগৃহীত হইয়াছে। ইহা দ্বারা এই গ্রন্থের আধ্যাত্মিক উপযোগিতা সূচিত হইতেছে। স্বভাবতঃ ভাবপ্রধান বাঙ্গলার বিভিন্ন ধর্ম্মমণ্ডলীতে অধুনা এই উপনিষৎসাহিত্যের পঠন-পাঠন ও আলোচনা-অনুশীলন সর্ব্বতোভাবে আবশ্যক বলিয়া আমরা মনে করি। ইহার ফলে মণ্ডলীগুলির আধ্যাত্মিক স্বাস্থ্য ও আত্যন্তিক কল্যাণ উভয়ই লাভ হইবে।

শ্রীসু. চ. বে.।

সংবাদ।

রামমোহন হোষ্টেলে সরস্বতীপূজা—

গত মাঘমাসে সিটি কলেজ সংলগ্ন 'রামমোহন'-হোষ্টেলে সরস্বতী পূজা উপলক্ষ্যে কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষের সহিত ছাত্রদিগের যে বিরোধ উপস্থিত হইয়াছে, এ পর্য্যন্ত আমরা সে সম্বন্ধে কোন মতামত প্রকাশ করি নাই। আমরা মনে করিয়াছিলাম, এই 'গুরু-শিষ্যসংবাদে' বাহিরের লোকের কোন কথা না বলাই উচিত। বলিলে, উহা কাহারও অনুকূলেই হউক বা প্রতিকূলেই হউক, মোটের উপর উহাতে বিরোধের অগ্নিতে ইন্ধন যোগানো ছাড়া অপর কোন শুভ ফলের আশা করা যায় না। কিন্তু আমরা না বলিলেও দেশের লোক চুপ করিয়া ছিল না। মাসিকে, সাপ্তাহিকে, দৈনিকে এবং নানা সভা-সমিতিতে গত চারি মাস ধরিয়া এ সম্বন্ধে এত অধিক বাদানুবাদ ও বিচার-আলোচনা হইয়া গিয়াছে যে, সেগুলিকে একত্র করিলে একটী সুবৃহৎ গ্রন্থে পরিণত হয়। বিরোধের যে অগ্নি প্রথমতঃ গুরুশিষ্যের পরস্পর অসন্তোষের ইন্ধনকে কেন্দ্র করিয়া জ্বলিয়া উঠিয়াছিল, আজ তাহা ধীরে ধীরে ব্রাহ্ম ও হিন্দুসম্প্রদায়ের মধ্যে অবাধে ছড়াইয়া পড়িতেছে; এবং দুঃখের বিষয়, হিন্দুসমাজের দুইটী শাখাকে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতার গভীর মধ্যে আবদ্ধ করিতে চলিয়াছে। অবশ্য গুরুশিষ্যের এই একান্ত আত্মগত ব্যাপারটীকে এইরূপে বাহিরে ছড়াইয়া দিবার মূলে সংবাদপত্রগুলিকেই আমরা একমাত্র দোষী মনে করি না; আমাদের মনে হয়, এ বিষয়ে প্রথম ও প্রধান অপরাধী আমাদের বর্ত্তমান শিক্ষাপদ্ধতি। ইউরোপীয় আদর্শে গঠিত এই শিক্ষাপদ্ধতিই অমূল্য

বিদ্যাকে আজ পণ্য বস্তুতে পরিণত করিয়াছে। কেবল বিদ্যা বলিয়া নহে, জাগতিক সকল বস্তুকেই এইরূপে ক্রয়-বিক্রয়ের ছাঁচে ফেলিয়া দেখা বণিকবৃত্তি ইউরোপীয় চিত্তেরই লক্ষণ। ইহা ভারতীয় প্রকৃতিতে আদৌ খাপ খায় না। এজন্য ভারতীয় পদ্ধতিতে পূর্ব্বে যেখানে গুরুশিষ্যের মধ্যে এক অনাবিল প্রেমের স্নিগ্ধ ধারা নীরবে বহিয়া যাইত, আজ সেখানে পরস্পর যুধ্যমান ক্রেতা ও বিক্রেতার স্বার্থ-কোলাহল মুখর হইয়া উঠিয়াছে। ফলে 'আচার্য্য' ও 'গুরু' 'ছাত্র' ও 'শিষ্য' প্রভৃতি ভক্তি ও প্রীতির দ্যোতক পবিত্র শব্দগুলি আজ আপন আপন গূঢ় অর্থ পরিত্যাগ করিয়া পারিভাষিক সংজ্ঞা মাত্রে পরিণত হইয়াছে। তাই, আজ আর আচার্য্য তাঁহাকে বলি না, যিনি শিষ্যের অধীত বিদ্যাকে আপন আচরণের দ্বারা তাহার সম্মুখে মূর্ত্ত করিয়া তুলিয়া ধরিতেন; অথবা শিষ্যও তাহাকে বলি না, যে ভক্তির আতিশয্যে গুরুর দোষকেও অন্যের দৃষ্টি হইতে আচ্ছাদন করিয়া রাখিত। ইহারই ফলে অধুনা গুরুশিষ্যের সম্পর্কটি হইয়াছে শাসক-শাসিতসম্প্রদায়ের সম্পর্ক—ঠিক যেমন পুলিসের সহিত জনসাধারণের সম্পর্ক। একদল Order and desciplinc (শাসন ও শৃঙ্খলা) রক্ষার জন্য সর্ব্বদা উদ্যতশস্ত্র, অপর দল উহা ভঙ্গ করিবার আনন্দে উন্মত্ত। অবশ্য ইহাতে যেন কেহ মনে না করেন যে, আমরা শাসন ও শৃঙ্খলাকে অনাবশ্যক বলিতেছি। আমরা জানি, মানবসমাজে উহার বিশেষ আবশ্যকতা আছে। উহা না থাকিলে পদে পদে তথায় বিশৃঙ্খলা ঘটিবার সম্ভাবনা। কিন্তু মনে রাখিতে হইবে, উহা প্রেম-সম্পর্কশূন্য হইলেই অনর্থ ঘটে। ইহাই আজ বর্ত্তমান সভ্য জগতের একমাত্র সমস্যা। জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্রে—রাষ্ট্রে, সমাজে, সঙ্ঘে—ইহাই আজ নব নব মূর্ত্তিতে বিভিন্ন সমস্যার সৃষ্টি করিতেছে। পরস্পরের প্রতি প্রীতির যথাযথ আদানপ্রদানই এই সমস্যার একমাত্র সমাধান। সিটি কলেজের এই গুরু-শিষ্যসংঘর্ষ ঘটিত ব্যাপারটাও আপাততঃ সরস্বতীপূজাকে উপলক্ষ্য করিয়া সংঘটিত হইলেও ইহা আদৌ সাম্প্রদায়িক বা ধর্ম্ম-ঘটিত ব্যাপার নহে। ইহারও মূলে ঐ সমস্যা। উহার প্রকৃত সমাধান না হইলে উহাই আবার অন্যত্র বা অন্যান্য অপর উপলক্ষ্যকে কেন্দ্র করিয়া আত্মপ্রকাশ করিতে পারে। তাই আজ স্বাধীনতা বা আত্মসম্মান ভ্রমে কেহই যেন মিথ্যা 'জেদের' বশবর্ত্তী না হন—উহাতে উন্মাদনার আনন্দ থাকিলেও কল্যাণ নাই। পরস্পরের প্রতি ধূমায়মান সর্ব্ববিধ সংশয় ও সন্দেহের মিথ্যা আবরণ উন্মোচন পূর্ব্বক প্রকৃত নিষ্ঠার সহিত যথাযোগ্য শ্রদ্ধা-ভক্তি ও স্নেহ-প্রীতির আদানপ্রদানে পবিত্র বিদ্যাপীঠের এই অস্বাস্থ্যকর গ্লানি বিধৌত হউক। সিটিকলেজের কর্ত্তৃপক্ষ অথবা ছাত্রসম্প্রদায়, কাহারও দোষাদোষ বিচার করিবার সময় এখনও আসে নাই। অগ্নি নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইলে বিচার করিবার সময় আসিবে যে, কাহার দোষে আগুন জ্বলিল। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি যে, কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রগণের মধ্যে শীঘ্রই সম্প্রীতি সংস্থাপিত হোক।

আদিব্রাহ্মসমাজ-অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ।

(২৭শে চৈত্র, ১৩৩৪ সাল—৯৮ ব্রাহ্মসম্বৎ, সোমবার)

গত ২৩শে চৈত্রের আহ্বান-পত্র অনুসারে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের গৃহে (২নং চক্রবেড়ে লেন, ভবানীপুর) ২৭শে চৈত্র (৯ই এপ্রেল) প্রাতে ৯ ঘটিকার সময় অধ্যক্ষসভার এক বিশেষ অধিবেশন হইয়াছিল, নিম্নলিখিত সভ্যগণ উপস্থিত ছিলেন।

(১) শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক; (২) ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস-সি; (৩) শ্রীযুক্ত হরিপদ ত্রিবেদী; (৪) শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল; (৫) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর; (৬) শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ।

যে দেবতা পুনঃ পুনঃ আমাদের বুদ্ধিবৃত্তি ও প্রীতি-প্রবৃত্তিকে উদ্বোধিত করিয়া আমাদের সকল কর্ম্মকে মহীয়ান করিতেছেন, সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চরণতলে সমবেত সভ্যবৃন্দের প্রার্থনা ও প্রণতি জ্ঞাপন পূর্ব্বক যথারীতি সভার কার্য্য আরম্ভ হইল।

১। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে শ্রীযুক্ত শিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করিলেন।

২। গত ১৫ই মাঘের অধ্যক্ষসভার কার্য্যবিবরণ পঠিত ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হইল।

৩। শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থিরীকৃত হইল যে, ভবিষ্যতে অধ্যক্ষসভার বিবরণ পরবর্ত্তী অধিবেশনে গৃহীত হওয়ার পর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইবে।

৪। বর্ত্তমানে শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় কালনা-ব্রাহ্মসমাজের ট্রাষ্টী আছেন। কালনা-ব্রাহ্মসমাজের অবস্থা অধুনা অত্যন্ত শোচনীয়। কালনা-রাজবাটীর সহকারী কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয় ১২।১১।৩৪ তারিখের পত্রে সমাজবাটীর দুরবস্থা ও উহার বিক্রয়ের প্রস্তাব সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছেন তাহা পঠিত ও আলোচিত হইয়া স্থির হইল যে, সমাজবাটীর হাল ও বকেয়া খাজনা ২১/৭ যাহা প্রাপ্য হইয়াছে তাহা মণিঅর্ডার যোগে পাঠান হউক; এবং যথাসত্বর ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত সুরেশ চন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর—ইঁহাদের মধ্যে যে কেহ কালনা-সমাজবাটীর বর্ত্তমান অবস্থা প্রত্যক্ষ করিয়া কর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

৫। আসন্ন বর্ষশেষ ও নববর্ষের কার্য্যনির্দ্ধারণ সম্বন্ধে আলোচনা হইল এবং স্থির হইল যে, ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের বর্ষশেষ উপাসনা শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ নির্ব্বাহ করিবেন। সতীশ বাবুকে ইতিপূর্ব্বে এবিষয়ে অনুরোধ করা হইয়াছে ও তিনি স্বীকার করিয়াছেন। বেহালা ব্রাহ্মসমাজের বর্ষশেষ ও নববর্ষের উপাসনা শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় নির্ব্বাহ করিবার ব্যবস্থা করিবেন; এবং আদি ব্রাহ্মসমাজের উক্ত দুই দিবসের কার্য্য শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর নির্ব্বাহ করিবেন।

৬। বোম্বে প্রার্থনা সমাজ হইতে গত ২৭শে মার্চ্চ তারিখে শ্রীযুক্ত জি, ডি, বৈদ্য তাঁহার একখানি চিঠিতে জানাইতেছেন যে, শ্রীযুক্ত কর্ত্তৃক ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে

'নবযুগধর্ম্ম'-নামক যে পুস্তক রচনা করিয়াছেন, তাহাতে ব্রাহ্মসমাজ ও তাহার প্রতিষ্ঠাতাদিগের প্রতি কয়েকটি মিথ্যা দোষারোপ আছে। শ্রীযুক্ত বৈদ্য ইহার প্রতিবাদ করিয়া যে পুস্তক প্রকাশ করিয়াছেন, তাহার ব্যয়ভার নির্ব্বাহের জন্য সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাকে ৫০৲ টাকা সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের নিকটেও সাহায্যপ্রার্থী হইয়াছেন। আদিব্রাহ্মসমাজ এবিষয়ে তাঁহাকে কিছু সাহায্য করিতে পারেন কি না আলোচিত হইল। স্থির হইল, শ্রীযুক্ত বৈদ্যকে একখানি চিঠি লিখিয়া জানা হউক, প্রার্থনাসমাজ ও পুনাসমাজ হইতে এ বিষয়ে তিনি কত সাহায্য পাইয়াছেন; এবং শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয় কলিকাতাপ্রবাসী ডাক্তার ভাণ্ডারকরের নিকট গমন পূর্ব্বক ফড্‌কির মারাঠী ভাষায় লিখিত ইতিহাস-গ্রন্থখানির মধ্যে ব্রাহ্মসমাজের বিরুদ্ধে সত্যই কিরূপ দোষারোপ আছে তাহার অনুসন্ধান করুন; এবং শ্রীযুক্ত টি. এন. বৈদ্য, শ্রীযুক্ত সিন্ধে ও শ্রীযুক্ত গিরিজাশঙ্কর ত্রিবেদী মহাশয়ত্রয়কে চিঠি লিখিয়া ব্রাহ্মসমাজকে কেন্দ্র করিয়া সমুত্থিত এই "বাদপ্রতিবাদের" সত্য তথ্য নির্দ্ধারণে সচেষ্ট হউন।

৭। গত ১৬ই মার্চ্চ তারিখের এক চিঠিতে বর্দ্ধমান ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত অবিনাশ চন্দ্র মিত্র মহাশয় উক্ত সমাজের বর্ত্তমান ও ভবিষ্যৎ অবস্থা আলোচনা ও সাম্বৎসরিক উপাসনার কার্য্যনির্ব্বাহের জন্য যে আহ্বান জানাইয়াছেন তাহার আলোচনা হইল। স্থির হইল যে ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরী, শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সত্বর একবার তথায় গমনপূর্ব্বক যথাকর্ত্তব্য নির্দ্ধারণ করুন।

৮। ডাক্তার শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী মহাশয়ের প্রস্তাবে ও সর্ব্বসম্মতিক্রমে স্থির হইল যে, মাদ্রাজে গত ডিসেম্বর মাসে "থিষ্টিক কন্‌ফারেন্সের" যে অধিবেশন হইয়া গিয়াছে, তাহার একটি সংক্ষিপ্ত বিবরণ তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত হউক।

অবশেষে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ পূর্ব্বক সভাভঙ্গ হইল।

(স্বা) শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর	(স্বা) শ্রীশিতিকণ্ঠ মল্লিক
সম্পাদক।	সভাপতি।
২৭শে চৈত্র, ১৮৪৯ শক।	২৭শে চৈত্র, ১৮৪৯ শক।

প্রাপ্তিস্বীকার।

২৭ নং রামতনু বসু লেননিবাসী স্বর্গীয় কেদারনাথ মণ্ডল মহাশয়ের ষ্টেটের একজিকিউটার শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী চালদার প্রভৃতি মহাশয়গণের নিকট হইতে গত ২৬শে কার্ত্তিক ৩।৵৪ পাই এককালীন দানস্বরূপ পাইয়া ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তি স্বীকার করিতেছি।

৯।১ নং কুমারটুলীনিবাসী সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ শ্রীযুক্ত গিরিজাপ্রসন্ন সেন কবিকণ্ঠ মহাশয়ের নিকট হইতে গত ১৩ই জ্যৈষ্ঠ রবিবার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যস্বরূপ ১০৲ টাকা এককালীন পাইয়া ধন্যবাদের সহিত প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ও সমাজের হিতৈষী বন্ধুগণের ইঁহাদের সুদৃষ্টান্ত অনুকরণীয়।

সিবিল ম্যারেজ আইনের সংশোধক বিলের পাণ্ডুলিপি।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সার হরি সিং গৌর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায়, ১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনের দ্বারা রেজেষ্ট্রী সরকারে যে সিবিল বিবাহের ব্যবস্থা আছে, সেই আইনের কতক অংশ পরিবর্ত্তিত করিবার সংকল্প করিয়া তাহার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহের এক পাণ্ডুলিপি উপস্থিত করিয়াছেন। সেই সকল পরিবর্ত্তনের মধ্যে দুইটী বিষয় বিশেষ ভাবে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। একটী এই—পূর্ব্ব আইনে বিবাহার্থী বর ও কন্যাকে ভারতের প্রচলিত কয়েকটী প্রধান ধর্ম্মকে (যথা; হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টীয় প্রভৃতি) স্বীকার করি না বলিতে হইত। সার হরি সিং গৌর এই অংশটুকু বাদ দিতে চান এবং ভারতের অধিবাসীর পক্ষে বিবাহকে সম্পূর্ণরূপে ধর্ম্মনিরপেক্ষ করিয়া তুলিতে চান। উক্ত আইনের "উদ্দেশ্য ও কারণের" মধ্যে তিনি উহার স্বপক্ষে কয়েকটী যুক্তি দেখাইয়াছেন। দ্বিতীয় দৃষ্টিযোগ্য বিষয় এই যে, উহা "ভারতের গৃহীত অধিবাসী" বা Domiciled Indianদের সম্বন্ধেই প্রয়োগ করা হইবে।

এই পাণ্ডুলিপিখানি আদিব্রাহ্মসমাজের মতামতের জন্য বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত হইয়াছিল। পরলোকগত সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে অধ্যক্ষসভা কর্ত্তৃক "আদিব্রাহ্মসমাজের মণ্ডলীগঠন"-বিষয়ক যে প্রস্তাবনা গৃহীত হইয়াছিল, তদনুযায়ী মণ্ডলীর অন্তর্ভুক্ত সভ্যগণের মধ্যে যথাসম্ভব উক্ত পাণ্ডুলিপি এবং তাহার কারণ ও উদ্দেশ্যের এক-একখণ্ড প্রেরিত হইয়াছিল। সেই সঙ্গে সিবিল বিবাহ সম্বন্ধে আদিব্রাহ্মসমাজের সংরক্ষিত পূর্ব্বাপর ধারা কি, তাহা নিরপেক্ষভাবে বুঝাইয়া সম্পাদক মহাশয় একখানি পত্রও প্রেরণ করিয়া সকলের মতামত চাহিয়াছিলেন। সে পত্রখানিও যথাস্থানে প্রকাশিত হইল। তাঁহার অভিপ্রায় এই ছিল যে, মণ্ডলীর যাহা কিছু মতামত সংগৃহীত হইবে তাহা অধ্যক্ষসভায় উপস্থিত করিবেন এবং অধ্যক্ষসভায় অধিকাংশের মত যাহা হইবে, তাহাই বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের দ্বারা ভারতীয় গবর্ণমেণ্টকে জানানো হইবে। যে সকল মতামত পাওয়া গিয়াছে, তাহার অধিকাংশই গৌর-মহোদয়ের বিলের বিরুদ্ধে এবং অধ্যক্ষসভাতেও অধিকাংশের মত উহার বিরোধী হইয়াছিল। সুতরাং আমরা বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টকে জানাইয়াছি যে আদিব্রাহ্মসমাজ সার হরি সিং গৌরের বিলের বিরোধী। বলা বাহুল্য যে, উক্ত বিলের স্বপক্ষে যে সকল মত হস্তগত হইয়াছে, তাহার মধ্যেও অনেক সারগর্ভ যুক্তি আছে এবং সেগুলি বর্ত্তমান যুগের অবস্থাবিবেচনায় বিচারের যোগ্য। আমরা ভারতীয় সমাজে সিবিল বিবাহ প্রয়োগের উপযোগিতা অনুপযোগিতা সম্বন্ধে যথাসম্ভব নিরপেক্ষ আলোচনা করিবার ইচ্ছা করিতেছি। তাহার পূর্ব্বে উহার পক্ষে বা বিপক্ষে যে সকল মত হস্তগত হইয়াছে, তাহা ক্রমশ প্রকাশ করিতে ইচ্ছা করি। কারণ তাহা হইলে আলোচনা করা সহজ হইবে।

Government of Bengal.

Education Department.

REGISTRATION.

Nos. 211-238 T.—REGN.

FROM J. H. LINDAY, ESQ., M.A., I.C.S.,

Secretary to the Government of Bengal.

TO THE—

ecretary, ADI BRAHMO SAMAJ.

Dated Darjeeling, the 24th April 1928.

THE HON'BLE NAWAB MUSHARRUF HOSSAIN, KHAN BAHADUR,

Minister in charge.

SIR,

I am directed to forward herewith a Bill further to amend the Special Marriage Act, 1872 (III of 1872), introduced in the Legislative Assembly by Sir Hari Singh Gour, a non-official member of that Chamber, together with statement of Objects and Reasons and an extract from the Legislative Assembly Debates on the Bill, and to request that your Samaj will be so good as to favour Government with an expression of their opinion on the provisions of the Bill by the 31st May 1928.

I have the honour to be,

SIR,

Your most obedient servant,

(Sd.) J. H. LINDSAY.

Secretary to the Government of Bengal.

As introduced in the Legislative Assembly.]

A
BILL

Further to amend the Special Marriage Act, 1872.

WHEREAS it is expedient further to amend the Special Marriage Act, 1872 ; It is hereby enacted as follows :— III of 1872

1. This Act may be called the Special Marriage (Amendment) Act, 192.

Short title.

2. In the preamble to the Special Marriage Act, 1872 (hereinafter referred to as the said Act),— III of 1872

Amendment of preamble to Act III of 1872.

(*i*) after the words "a form of" the word "civil" shall be inserted ;

(*ii*) after the words "for persons" the words "domiciled in British India" shall be inserted ; and

(*iii*) the words "who do not profess the Christian. Jewish, Hindu, Muhammadan, Parsi, Buddhist, Sikh or Jaina religion" ; shall be omitted.

3. In section 2 of the said Act,—

Amendment of section 2, Act III of 1872.

(*i*) the words "neither of whom professes the Christian or the Jewish, or the Hindu or the Muhammadan, or the Parsi or the Buddhist, or the Sikh or the Jaina religion" shall be omitted ; and

(*ii*) after the words "between persons" the words "domiciled in British India" shall be inserted.

4. In the Second Schedule to the said Act, for clause 2 in the Declarations to be made by the bridegroom and the bride, respectively, the following shall be substituted, namely :—"I am domiciled in British India."

Amendment of clause 2, Second Schedule to Act III of 1872.

STATEMENT OF OBJECTS AND REASONS.

The laws of all civilised countries provide for the contract of civile marriage by persons who may so desire. The disability to contract such marriages in India is merely territorial and there is no reason why a similar law should not be enacted for this country. The enactment, if passed, would be merely optional and leaves intact the existing personal laws which control the performance of marriages.

The reasons which have induced us draft this Bill are as follows :—

Sir Henry Maine as Law Member of the Governor General's Council had introduced a Civil Marriage Bill ; but as the Government were then immediately concerned with an enactment to prescribe a civil form of marriage applicable only to Brahmos by whom they were moved for the enactment of a secular law to enable them to contract marriages, its provisions were so limited in the Bill which became Act III of 1872.

In 1909, the late Mr. Bhupendra Nath Basu and later on one of us had also introduced a similar Bill, but its provisions were eventually transformed into those of Act XXX of 1923.

The Baroda State have recently introduced a Civil Marriage Bill ; while the Laws of other Indian States are understood to provide for the performance of such marriages. The advantages of the measure, if enacted, are obvious. The Bill would enable persons subject to polygamous marriage laws to contract monogamous marriages and remove the inequality in the matter of divorce. It would elevate the status of women. These benefits have already been assured to the Hindus, Buddhists, Sikhs and Jains by Act XXX of 1923, and there is no reason why the benefit that that Act confers upon the communities named should not be extended to other communities who might as regards succession be equally brought under the law enacted in the Indian Succession Act. A provision to this effect has not been inserted in the Bill, but it can be added at a later stage if public opinion favours it. The absence of a civil marriage law lends itself to perjury and artificial conversions which it is the policy of the State to provent. It was so observed by Sir Henry Maine who advocated the establishment of a non-sectarian marriage law in order to prevent the abuse resulting from such conversions (Proceedings Imperial Council, dated 27th November, 1868, pp. 498, 499).

To sum up then the advantages of such marriages are as follows :—

1. Such marriages are recognised and provided for by the laws of all civilized countries, and it is possible to contract such marriages outside the territorial limits of India. The disability is, therefore, purely territorial, and patriotic Indians are naturally anxious to remove all such disabilities from their way.

2. The Bill is monogamous in its policy and would result in introducing monogamy where polygamous marriages alone are at present possible.

3. It would prevent artificial conversions resulting from the exigency of marriages.

4. It would give a wider field for selection and thus ensure a happier domestic life.

5. It would introduce a greater sincerity in marriages by dispensing with the subscription of a declaration which many desiring to marry under the existing Act have to subscribe to not without considerable mental reserve.

6. It would tend to the unification of the Indian races without at the same time interfering with their personal religion.

7. It would give the wife a more assured position and entitle her to exercise her right of divorce which may not be possible if married under her personal law.

8. And being merely optional it trenches upon no one's rights, but merely prescribes a form to those who, while desiring to escape from the thraldom of their religious ritual, do not wish to renounce it.

It is believed that, with the growing strength of the national sentiment, such a Bill has become a public desideratum, and it has therefore been decided to re-introduce it in the Central Legislature.

H. S. GOUR.
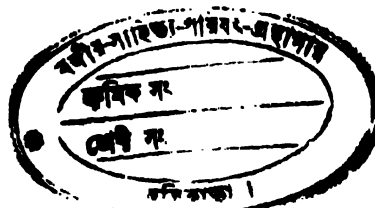
GOVERNMENT OF INDIA.
LEGILATIVE DEPARTMENT.

A

BILL

Further to amend the Special Marriage Act, 1872 ; and Annexure.

The Governor General has been pleased to accord the sanction required by clause (*b*) of section 67 (2) of the Government of India Act.

L. GRAHAM,
Secretary of the Legislative Assembly.

(*Sir Hari Singh Gour, M.L.A.*)

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
যোড়াসাঁকো, কলিকাতা
তাং ২রা জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫।

মান্যবর শ্রীযুক্ত

মহাশয় সমীপেষু

সবিনয় নিবেদন,

মহাশয়, আপনি মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত আদিব্রাহ্মসমাজের একজন পরম হিতৈষী। আপনি অবগত আছেন যে, আদিব্রাহ্মসমাজ রাজা রামমোহন রায়ের সময় অবধি এ পর্য্যন্ত অনুষ্ঠানসমূহে মূর্ত্তিপূজা প্রভৃতির স্থলে ব্রহ্মোপাসনা সহকারে হিন্দু ধারা বজায় রাখিয়াছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর-প্রবর্ত্তিত আদিব্রাহ্মসমাজ কর্ত্তৃক গৃহীত একেশ্বরবাদসম্মত বিবাহপদ্ধতিতে পিতৃপুরুষদিগের নামোল্লেখ করিয়া সম্প্রদান, পাণিগ্রহণ এবং সপ্তপদী-গমন, হিন্দুবিবাহের এই তিনটী মূল অঙ্গ যথারীতি রক্ষিত হইয়াছে।

১৮৭২ খৃষ্টাব্দের ৩ আইনে রেজেষ্ট্রী সহকারে যে সিবিল বিবাহপদ্ধতি পরিবর্ত্তিত হইয়াছে, আদিব্রাহ্মসমাজ আবহমানকাল তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিয়া আসিয়াছেন। এই প্রতিবাদের চারিটী প্রধান কারণ আমাদের দৃষ্টিতে পড়ে :—

(১) এই আইন অনুসারে বিবাহ করিতে গেলে বর ও কন্যাকে কয়েকটী প্রধান ধর্ম্ম (হিন্দু, মুসলমান, খৃষ্টান প্রভৃতি) অস্বীকার করিতে হয়—বলিতে হয় যে, "আমি ঐ সকল ধর্ম্ম মানি না"।

(২) এই আইনের বিবাহ চুক্তিমূলক (contractual) এবং হিন্দুবিবাহ ধর্ম্মানুগত (sacramental); আদিসমাজ মনে করেন, বিবাহকে চুক্তিমূলক দাঁড় করাইলে হিন্দুসমাজের মেরুদণ্ড ভাঙ্গিয়া যাইবে।

(৩) এই আইনের অধীনে আশ্রয় গ্রহণ করিলে ব্রাহ্মসমাজ বিরাট হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া একটী সঙ্কীর্ণ গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ হইবে, যাহা আদিব্রাহ্মসমাজের অভিপ্রেত নহে।

(৪) সতীদাহ প্রভৃতির ন্যায় যে সকল আচার-ব্যবহারে মানুষের প্রাণে আঘাত পড়িতে পারে, তদ্ব্যতীত কোন সামাজিক আচার-ব্যবহার সংশোধনে বৈদেশিক গবর্ণমেণ্টের শরণাগত হওয়া আদিব্রাহ্মসমাজের মত নয়।

সম্প্রতি শ্রীযুক্ত সার হরি সিং গৌর ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় পূর্ব্বোক্ত ৩ আইনের মধ্যে কিছু কিছু পরিবর্ত্তন করিবার ইচ্ছা করিয়া তাঁহার প্রস্তাবিত পরিবর্ত্তনসমূহের এক পাণ্ডুলিপি ভারতীয় ব্যবস্থাপকসভায় উপস্থিত করিয়াছেন। সেই প্রস্তাবসমূহের মধ্যে একটী দেখা যায় যে, পূর্ব্ব আইনে প্রধান প্রধান ধর্ম্ম অস্বীকার করিবার যে ধারা ছিল, সেই ধারার মধ্যে ঐ অস্বীকার করিবার অংশটুকু সার হরিসিং তাঁহার প্রস্তাবিত আইনে বাদ দিতে চান এবং ঐ ধারাকে বিস্তৃততম প্রয়োগ দিতে চান—অর্থাৎ হিন্দু, মুসলমান প্রভৃতি যে কেহ যে-কোন মতাবলম্বী হউন না কেন, তাঁহারা পরস্পরে এই প্রস্তাবিত আইনের আশ্রয়ে বিবাহ করিলে তাহা বৈধ ও সিদ্ধ হইবে।

ইহার ফলে সমগ্র ভারতের অধিবাসীগণের এক নবতর মহাজাতিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা থাকিতে পারে; কিন্তু বলা বাহুল্য যে, ইহার ফলে হিন্দু-মুসলমান প্রভৃতি বিভিন্ন ধর্ম্মসমাজের অস্তিত্ব বিলুপ্ত হইবারও একটা সম্ভাবনা আসিতে পারে।

এই প্রস্তাবিত আইনের বলে বিবাহিত ব্যক্তির সন্তানাদির উত্তরাধিকার সম্বন্ধেও বিশেষ গোলযোগ উপস্থিত হইতে পারে এবং তাহার ফলে অসংখ্য মকদ্দমা-মামলারও সৃষ্টি হওয়া স্বাভাবিক।

উক্ত প্রস্তাবিত আইনের পাণ্ডুলিপির একটী নকল আদিব্রাহ্মসমাজের মত জানিবার জন্য প্রেরিত হইয়াছে। তাহার একখণ্ড আপনার নিকট প্রেরিত হইল। আগামী ৩১শে মে তারিখের মধ্যে উক্ত মত বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের নিকট পাঠাইতে হইবে। ইহার প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আপনি এবিষয়ে আপনার মতামত অনুগ্রহপূর্ব্বক অতি সত্বর আমার নিকট প্রেরণ করিলে বাধিত হইব। উত্তর প্রদানের জন্য একটী ষ্ট্যাম্পযুক্ত লেফাফা এই সঙ্গে প্রেরিত হইল।

প্রস্তাবটীর গুরুত্ব বিবেচনায় আশা করি মতামত প্রদানে কুণ্ঠা বোধ করিবেন না। ইতি

বিনীত

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সম্পাদক।

ADI BRAHMO SAMAJ
55. Upper Chitpur Road,
Jorasanko, Calcutta.
Dated the 29th May, 1928.

From

Babu Kshitindra Nath Tagore, B.A.,
Secretary, Adi Brahmo Samaj.

To

The Secretary to the Government of Bengal,
Education Department,
Darjeeling.

Sir,

In reply to your letter Nos. 211-238T in the Education Department, Registration Branch, dated the 24th ultimo, enclosing a copy of a Bill further to amend the Special Marriage Act. 1872 (III of 1872) as introduced in the Legislative Assembly by Sir Hari Singh Gour, a non-official member of that Chamber, together with a copy of the statment of Objects and Reasons and an extract from the Legislative Assembly Debates on the said Bill and asking for an expression of the opinion of Adi Brahmo Samaj on the provisions of the Bill, I have the honour to inform you that the Bill had been circulated to the members of the Samaj for an expression of their opinion on the same.

The opinions received up to the 27th instant were placed before the Executive Committee of the Samaj at their meeting on the 28th instant—and I am directed by the Committee to inform you that the Adi Brahmo Samaj is against Sir Hari Singh Gour's said Amending Bill being passed into law.

I have the honour to be,
Sir,
Your most obedient servant,
Kshitindra Nath Tagore.
Secretary, Adi Brahmo Samaj.

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 41

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—দ্বিতীয় ভাগ
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

১০১৯ সংখ্যা ১৮৫০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরবীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৫। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯। আষাঢ়।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১৭ই ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—দ্বিতীয় ভাগ
আষাঢ়, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

১০১৯ সংখ্যা

১৮[illegible] শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫।

উদ্বোধন।

বন্ধুগণ! প্রাণের ভিতর আজ এই উৎসবের মধ্যে একটী কর্ত্তব্যবোধ জাগাইয়া তুলিতে হইবে। আমরা প্রতিদিন নিজেদের সুখশান্তির উপায় অন্বেষণে সর্ব্বদাই সচেষ্ট থাকি। কিন্তু আমাদের প্রতিবেশী, আমাদের সমাজ, আমাদের দেশ কোথায় কোন্ অশুভ মুহূর্ত্তে দুর্নীতির পঙ্কিল কূপে অবগাহন করিতে গিয়া মৃত্যুকে ডাকিয়া আনিতেছে, সে কথা আমরা ভাবিবার অবসরই পাই না। এই পরস্পর-সাহচর্য্যের যুগে আমাদের শুধু নির্জ্জন সাধনে নিমগ্ন থাকিলে চলিবে না—সজন উপাসনায় যোগদান করিয়া পরস্পরকে তুলিয়া ধরিতে হইবে; দ্বেষ-হিংসা পরিত্যাগ করিয়া দ্বন্দ্ববিবাদ ভুলিয়া গিয়া পরস্পরকে জ্ঞানে প্রীতিতে ও শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে বড় হইবার পক্ষে সাহায্য করিতে হইবে।

আমাদের বুঝিতে হইবে, আমরা ভারতবাসী। মনে হয়, ভগবান আমাদিগকে একটী বিশেষ কর্ত্তব্য দিয়া এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে প্রেরণ করিয়াছেন। সেই কর্ত্তব্যটী হইতেছে—সকল দুর্নীতি ছিন্ন করিবার ব্রহ্মাস্ত্র, সকল মঙ্গলের একমাত্র নিদান ব্রহ্মোপাসনার পথে জগতবাসীকে পরিচালিত করা। আমাদের নিজেদের কার্য্য আলোচনা করিলে দেখিব যে, এই কার্য্যে আমরা খুব অল্পই মনপ্রাণ নিয়োগ করিয়াছি। মনপ্রাণ যতটা নিয়োগ করা উচিত, ততটা করিতেছি না বলিয়াই চক্ষের সম্মুখে আমাদের সমাজ আমাদের দেশ আজ দুর্নীতির তাণ্ডব নৃত্য আমোদ উপভোগ করিতেছে। আমরাও যে ডুবিবার পথে চলিয়াছি, তাহা ভালরূপ উপলব্ধি করিতে পারিতেছি না; কিন্তু কি এক অমঙ্গলের আশঙ্কায় প্রাণ কাঁপিয়া উঠিতেছে।

এই অমঙ্গলের আশঙ্কার মধ্যেও ভগবানের অভয় বাণীর সুমঙ্গল শঙ্খ বাজিয়া উঠিয়া আমাদিগকে অভয় প্রদান করিতেছে। সেই অভয় বাণী শ্রবণ কর, আর তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া নিজেরাও সমস্ত হৃদয়ের সহিত তাঁহাকে প্রীতি করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিয়া তাঁহার উপাসনায় একনিষ্ঠ হৃদয়ে নিরত হও।

এই পবিত্র সন্ধ্যাকালে যখন ভানুদেব স্বীয় অস্তমিত মহিমার ধ্যানে নিমগ্ন হন, যখন প্রকৃতির সমস্ত কোলাহল-কলরব নিবৃত্ত হইয়া শান্তিদেবী মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া আবির্ভূত হন, তখন মনপ্রাণ কি সেই শান্তিসমুদ্র ভগবানকে না দেখিয়া স্থির থাকিতে পারে? তাঁহাকে দেখিবার জন্য প্রাণ যে বড়ই ব্যাকুল হইয়া উঠে। সংসারের ক্ষুদ্র কাণাকাণি, ক্ষুদ্র দ্বন্দ্ববিবাদ কি তুচ্ছ বলিয়া মনে হয়! তখন অন্তরের মধ্যে ভগবানের বংশী শান্তিপ্রদ সান্ধ্য রাগিণীতে বাজিয়া উঠে। মনপ্রাণ স্বতই তাঁহার সিংহাসনতলে উপস্থিত হয় এবং নিজের যাহা কিছু, সমস্তই তাঁহার চরণে নিবেদন করিয়া দেয়।

এই সুন্দর শান্ত সন্ধ্যাবেলাকে আমরা যেন অবহেলায় না হারাই। জ্যোতিষ্কমণ্ডলের ছন্দে ছন্দে উদয়ের মধ্যে, নববর্ষার আগমনে মেঘের গর্জ্জনের মধ্যে, বারিধারার বর্ষণের মধ্যে তাঁহারই মঙ্গল ভাব উপলব্ধি কর। ভক্তদিগের শ্রদ্ধাভক্তিতে সমুজ্জ্বল প্রসন্নবদনে তাঁহারই প্রেম প্রত্যক্ষ কর। তোমাদেরও মস্তক তাঁহার চরণে শ্রদ্ধাভক্তিসহকারে অবনত কর। আমাদের প্রাণের দেবতা মূর্ত্ত হইয়া এই সভাক্ষেত্রে আবির্ভূত হউন। আমাদের হৃদয়ে নবনব ভাব, নূতন নূতন জ্ঞান পরিস্ফুট হইয়া উঠুক। আমাদের দেহমন ভগবানের চরণস্পর্শে নবযৌবনে অভিষিক্ত হইয়া উঠুক। নিরাশা নিরানন্দ নিজের ব্যথায় নিজেই মৃত্যুমুখে পতিত হউক। বৃদ্ধ নারী কিম্বা যুবা, যেখানে দুর্ব্বল-সবল যে কেহ আছ, সকলের হৃদয় হইতে দুঃখদৈন্য বিদূরিত কর—শোকবিষাদ দূর করিয়া দাও। চিরানন্দের অমৃতসাগরে অবগাহন করিয়া সবল হইয়া ওঠ, সর্ব্বপ্রকার দুর্ব্বলতা পরিহার কর। সকলে মিলিত কণ্ঠে তাঁহার নামে জয়ধ্বনি করিয়া বল—জয় সত্য সনাতন—জয় সত্যং শিবং সুন্দরং। আমাদের এই জয়ধ্বনি আকাশের স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া সমস্ত বিশ্বভুবন জুড়িয়া প্রতিধ্বনিত হইতে থাকুক।

সান্ধ্য আরতি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

প্রত্যক্ষ কর, অন্তরে অনুভব কর, এই পবিত্র সন্ধ্যা কি প্রকারে নিঃশব্দ পদক্ষেপে সমস্ত আকাশ জুড়িয়া নামিয়া আসিয়াছে। সহরের কোলাহলের মধ্যে অনেক সময়েই আমরা অস্তমিতরবি সন্ধ্যার সুমধুর শান্ত পবিত্র ভাব উপলব্ধি করিতে পারি না। পট্টদুকূলপরিহিতা হিন্দু বিধবা যে শান্তিমাখা মধুর পবিত্র মূর্ত্তিতে পবিত্র ভাব লইয়া সন্ধ্যাদীপ-হস্তে দেবপূজা সমাধা করিবার জন্য মন্দিরের অভিমুখে ধীর পদক্ষেপে অগ্রসর হন, সন্ধ্যা আমার হৃদয়ে সেই পবিত্র মধুর ভাব আনয়ন করিতেছে। পল্লীর অন্তরে প্রবেশ করিলে নীরব সন্ধ্যার পবিত্র শান্তভাব খুবই সহজে অন্তরে প্রকাশ পায়। সেই শান্তভাব এই সহরের ভিতরেও অন্তরে জাগাইয়া তুলিয়া সেই শান্তি-সমুদ্র ভগবানের আরতিতে আমাদিগকে এখনই প্রবৃত্ত হইতে হইবে।

সেই শান্তিসমুদ্র ভগবানই আমাদের অন্তরে সন্ধ্যাদীপ জ্বালাইয়া রাখিয়াছেন। এই সন্ধ্যাকালে যাঁহার তেজে সুনীল গগনমধ্যস্থিত অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল জ্যোতির্ম্ময় হইয়া উঠিয়াছে, তিনিই জ্যোতির জ্যোতিরূপে আমাদের অন্তরেও সন্ধ্যাদীপ প্রজ্জ্বলিত করিয়াছেন। বাহিরের অন্ধকারে ভীত হইও না। অন্তরের আলোকে সেই জ্যোতির্ম্ময় পরমপুরুষকে প্রত্যক্ষ করিয়া নির্ভয় হও। এই সন্ধ্যাকালে সেই পরম পুরুষের শান্তভাব, তাঁহার প্রাণারাম ভাব আমাদের হৃদয়কে কি সম্পূর্ণ অধিকার করিয়া বসিবে না? আমার প্রাণের ভিতর তিনি এতই অধিকার করিয়া বসিয়াছেন যে, বাক্যের দ্বারা তাঁহার মহিমা, তাঁহার করুণা ব্যক্ত করিতে গেলে একমাত্র অশ্রুপাত ব্যতীত আর তো কোন উপায় দেখি না। তাঁহাকে ধারণা করিতে গিয়া, মনন করিতে গিয়া আত্মা স্তম্ভিত হইয়া যায়, মন প্রতিনিবৃত্ত হইয়া আসে।

সেই পূর্ণ পুরুষ পরমেশ্বরকে সম্পূর্ণরূপে ধারণা করা আমাদের মত অপূর্ণ পুরুষের পক্ষে কোন মতেই সম্ভব নয়। এই যে অনন্ত আকাশ—ইহাই তো আমরা মনে ধারণা করিতে পারি না; তখন এই আকাশ যাঁহার ছায়া এবং এই আকাশের অতীত যিনি, তাঁহাকে কি প্রকারে ধারণা করিব? এই মহাকাল—ইহাই কি আমরা মনে ধারণা করিতে পারি? কত যে অতীত কাল চলিয়া গিয়াছে কে তাহার ইয়ত্তা করিবে? কত যে ভবিষ্যৎ কাল চলিবে, তাহাই বা কে ধারণা করিতে পারে? এই কালকেও সেই পূর্ণ পুরুষ ব্যাপ্ত করিয়া আছেন; আবার কালেরও অতীত তিনি। তিনিই স্থান ও কাল সমস্তই ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছেন। এই বিশ্বজগত যে তাঁহা কর্ত্তৃক ওতপ্রোতভাবে ব্যাপ্ত হইয়া থাকিবে, ইহা তো স্বতঃসিদ্ধ সত্য।

তিনি পূর্ণ পুরুষ বলিয়াই তাঁহার কোনও বিষয়েরই অন্ত নাই—তিনি সকল বিষয়েই পরিপূর্ণ, সকল বিষয়েই তিনি অনন্ত। তাঁহার জ্ঞান, তাঁহার শক্তি, সকলই যেমন স্বাভাবিক, তেমনই তাঁহার সকলই অনন্ত। তাঁহার মঙ্গলভাব, তাঁহার করুণা, এ সকলই অনন্ত—এ সকলেরই অন্ত খুঁজিতে গিয়া মন আত্মা আত্মহারা হইয়া যায়; "অন্ত কোথা তাঁর অন্ত কোথা তাঁর এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে"।—ঐ জিজ্ঞাসা পর্য্যন্তই আমাদের ক্ষমতা; আমরা যতই কেন ঊর্দ্ধে উঠি না, শেষে মন, বাক্য সকলই তাঁহার অন্ত না পাইয়া প্রতিনিবৃত্ত হয়। ব্রহ্মোপাসক মাত্রেরই ভগবানের এই অনন্ত-ভাবটী অন্তরে বিশেষভাবে উপলব্ধি করিতে হইবে। কথায় কথায় ব্রহ্মের রূপকল্পনার দোহাই দিয়া আপনাকে, পরের নিকট ছাড়িয়া দিলেও, নিজেরও নিকটে, দুর্ব্বল অক্ষম প্রতিপন্ন করিলে চলিবে না। এই প্রকার আপনাকে দুর্ব্বল অক্ষম বুঝিবার ও বুঝাইবার কারণে, এক কথায় নিজের দাসমনোবৃত্তিকে পরিপুষ্ট করিয়া তুলিবার কারণে, আমরা যে প্রকৃতই কত নামিয়া পড়িয়াছি, তাহা সকলেরই প্রত্যক্ষ হইতেছে।

এই সন্ধ্যাকাল অতি পবিত্র কাল। ইহার পবিত্র মাহাত্ম্য উপলব্ধি করিয়া ঋষিরা ভগবদারাধনার জন্য

প্রাতঃসন্ধ্যা বা ব্রহ্মমুহূর্ত্তের ন্যায় এই সময়টীকেও বিশেষভাবে নির্দ্দিষ্ট করিয়া দিয়াছেন। শুধু ভারতের ঋষি-মুনি কেন, দেখা যায় যে, সকল দেশের সকল ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ের নেতা ও প্রবর্ত্তকগণ এই পবিত্র সন্ধ্যাকালের মহিমা উপলব্ধি করিয়া এই সময়কেই উপাসনার প্রশস্ত সময় বলিয়াছেন। আমাদের কেবল আজিকার মত উৎসবের দিনেই সন্ধ্যাকালে সজন উপাসনায় যোগ দিলে চলিবে না। আমরা প্রত্যেকে যদি গৃহে নির্জ্জনে প্রতিদিন সন্ধ্যাকালে বহির্বিষয় হইতে মনকে প্রত্যাবৃত্ত করিয়া অন্তরের গভীরতম প্রদেশে প্রতিষ্ঠিত করি, মনঃসমাধান করি, তবেই এই সান্ধ্য উৎসবের পবিত্র মাহাত্ম্য হৃদগত করিতে পারিব।

দূর-দুরান্তরে পল্লীর মধ্যে প্রবেশ করিয়া সান্ধ্য তপনের অস্তমিত মহিমার মধ্যে আপনাকে ডুবাইয়া দাও; সন্ধ্যার সেই গাম্ভীর্য্যের মধ্যে, সন্ধ্যার সেই স্থির শান্ত-ভাবের মধ্যে, তুমি শান্তিসমুদ্রকে সহজেই প্রত্যক্ষ করিবে। শান্ত সন্ধ্যা যখন নীরব নিঃশব্দ পদক্ষেপে নামিয়া আসিয়া তোমার মস্তকে শান্তিজলের ধারা ঢালিয়া দেয়, তখন যে শান্ত পুরুষের মঙ্গল আবির্ভাব অন্তরে প্রকাশ পায়, আজ বিশেষভাবে তাঁহারই পূজার জন্য আমরা এখানে সবান্ধবে সম্মিলিত হইয়াছি। আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে আমাদের হৃদয় হইতে সমস্ত চাঞ্চল্য, সমস্ত বিষয়চিন্তা উৎপাটিত করিয়া দূরে নিক্ষেপ করিতে হইবে। একমাত্র তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ কর, তোমার সকল দুঃখ, সকল শোক, সকল বিপদ সহজে অন্তর্হিত হইবে। অর্থ একরাশ পাইলেই যে সুখ-শান্তি পাইবে, মান ও গৌরবের অধিকারী হইলেই যে অবিচলিত শান্তিরও অধিকারী হইবে এমন মনে করিও না। ধন-মানের পশ্চাতে একনিষ্ঠ হৃদয়ে ধাবিত হইলে ধনমান লাভ করা কঠিন নাও হইতে পারে; কিন্তু ধনমান লাভের ফলে প্রকৃত সুখ, হৃদয়ের বিমল শান্তিলাভ না-ও হইতে পারে। প্রকৃত সুখশান্তির একমাত্র উৎস জানিবে ঐ ভগবানের চরণ, ঐ ভগবানের নিকট কৃপাভিক্ষা।

তিনিই একমাত্র শিবস্বরূপ, সকল মঙ্গলের একমাত্র কারণ। তুমি তাঁহাকে ছাড়িয়া সংসারকে দেখ—দেখিবে, সংসারের চারিদিকে অসংখ্য বিঘ্ন-বিপত্তি, অগণ্য দুঃখ-শোক, অমঙ্গলের রাশি যেন তোমাকে গ্রাস করিবার জন্য সর্ব্বদাই উন্মুখ হইয়া আছে। কিন্তু তাঁহার চরণে আশ্রয় গ্রহণ করিয়া সংসারে বিচরণ কর, সমস্ত বিঘ্নবিপত্তি, সমস্ত দুঃখশোক শুধু অন্তর্হিত হইয়া যাইবে না; কিন্তু তুমি যাহাকে মহা অমঙ্গল ভাবিয়া বড়ই হাহুতাশ করিতেছিলে, তাহারই ভিতর হইতে মঙ্গলচক্র সমুত্থিত হইতে দেখিয়া তোমার হৃদয়-মন আনন্দে ভরিয়া উঠিবে। তখন তুমি সেই পূর্ণমঙ্গল জগৎপ্রসবিতা পরমদেবতার চরণ আর মুহূর্ত্তের জন্য পরিত্যাগ করিতে চাহিবে না, সর্ব্বদাই আঁকড়াইয়া ধরিয়া থাকিতে চাহিবে।

ভগবানকে এইভাবে উপলব্ধি করিলে মৃত্যুও তোমাকে আর বিভীষিকা দেখাইতে পারিবে না। তুমি দিব্যদৃষ্টিতে দেখিবে যে, এই বিশ্বজগতই তাঁহার রাজ্য। তুমি ইহলোকেই থাক, আর পরলোকেই থাক, তাঁহার রাজ্য ছাড়িয়া তুমি কোথাও যাইতে পারিবে না। তখন তুমি স্পষ্ট দেখিতে পাইবে যে, অমৃতপুরুষের রাজ্যে মৃত্যুর কোনই অধিকার নাই—মৃত্যু একটা ভ্রমাত্মক কথা মাত্র। যিনি এই জগতে প্রাণের প্রাণরূপে নিত্য বিরাজিত, যাঁহা হইতে জগতের প্রাণ নিশ্বসিত হইয়াছে, তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু বলিয়া কোন কিছুই থাকিতে পারে না—তাঁহার রাজ্যে একমাত্র অনন্ত জীবনেরই পূর্ণ অধিকার।

যে দিব্যদৃষ্টি লাভ করিলে তুমি মৃত্যুর বিভীষিকা অতিক্রম করিতে পারিবে, সেই দিব্যদৃষ্টি লাভ করিতে চাহিলে এই প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা পরম পুরুষের সঙ্গে একযোগে যুক্ত হইতে হইবে; তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টির সঙ্গে নিজের দৃষ্টি মিলাইয়া দিতে হইবে; তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি সমর্পণ করিতে হইবে এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করিতে হইবে। যদি আপনাকে তাঁহার চরণে সমর্পণ কর, এবং হৃদয়ে তিনি নীরব ভাষায় যে উপদেশ দিবেন, তাহাই শুনিয়া যদি কার্য্য করিয়া চলিয়া যাও, তবে উপদেষ্টার উপদেশ শুনিবার জন্য তোমার অপেক্ষা করিতে হইবে না। যাঁহার নীরব উপদেশের মাত্র দুই-চারিটী কথা শুনিয়া অসংখ্য সাধু পুরুষ তাহাই ধ্বনিত-প্রতিধ্বনিত করিয়া শত সহস্র লক্ষ কোটী মানবের জীবনে আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তন সাধন করিয়া দিয়াছেন ও দিতেছেন, তখন তাঁহারই উপদেশ যে তোমার অন্তরে অনাহত ধ্বনিতে নিরন্তর ধ্বনিত হইতে থাকিবে। অরুণোদয়ের সঙ্গে সঙ্গে যেমন রজনীর অন্ধকার সমূলে বিদূরিত হয়, তেমনই অন্তরে ভগবানের আবির্ভাব হইলে সঙ্গে সঙ্গেই আমাদের সকল সংশয়, সকল দ্বন্দ্ব তিরোহিত হয় এবং আমাদের চিত্তকমল দিব্য জ্ঞানের বিমল আলোকে উদ্‌ভাসিত হইয়া উঠে। তখন আমরা এক মহা আনন্দ-সাগরে অবগাহন করিয়া আমিত্বহারা হইয়া যাই—অনন্ত সমুদ্রের বক্ষে যেমন বুদ্‌বুদসকল আনন্দে আত্ম-বিসর্জ্জন করে, আমরাও সেইরূপ মাতৃবক্ষে অবস্থিত ক্ষুদ্র শিশুর ন্যায় সেই মহা অনন্তের দৃষ্টিতে আমাদের ক্ষুদ্র দৃষ্টি সংলগ্ন করিয়া আত্মবিহ্বল হইয়া পড়ি। যখন নীরব নিশীথে সমস্ত দ্যুলোক, সমস্ত অন্তরীক্ষ আমাদের

নয়নপথে নিপতিত হয়, যখন অন্তরের অন্তরে সেই দ্যুলোকের অগণ্য সূর্য্যমণ্ডল, অসংখ্য জ্যোতিষ্কমণ্ডল দেখিতে পাই, তখন আমরা কোথায়—আমরা কোথায়? তখন ভক্ত কবির সঙ্গে একহৃদয়ে বলিয়া উঠি—"কি আমি বলিব তোমারে? ক্ষুদ্র কীট আমি, তুমি পুরাণ অনাদি, অবিনাশী সারাৎসার। আকাশের উচ্চ তুমি, দেখ তবু কৃপা-চোখে মলিন মানবে—বন্ধুরূপে তুমি ভয়-বিপদ মাঝে, ভবজলধি-সেতু তুমি—থেকো না থেকো না হে দূর"।

আমরা ক্ষুদ্র হইলেও আমাদের আত্মাতে যখন তিনি সমধিষ্ঠিত, তখন আমাদের আপনাদিগকে ক্ষুদ্র মনে করিবার অবসর নাই। তিনি আমাদের প্রত্যেককে আপনাপন কর্ম্মক্ষেত্রে বড় করিয়াই গড়িয়াছেন। মহানের স্পর্শে আমরাও যে মহান হইয়া গিয়াছি। ধূলিকণাও যে নিজের ক্ষেত্রে অতি মহান। ধূলিকণার অভাবে তুমি-আমি শত চেষ্টাতেও কাহারও দৃষ্টিশক্তি দিতে পারি না। নদীর যাহা কার্য্য, সমুদ্র শত চেষ্টাতেও সে কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে না। তোমার কর্ম্মক্ষেত্রে যে কার্য্য নির্দ্দিষ্ট আছে, আমি তাহা করিতে গেলে অথবা আমার বিশেষরূপে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য তুমি করিতে গেলে কোন কার্য্যই সুশৃঙ্খলার সহিত নিষ্পন্ন হইবে না, কেবল বৈপ্লবিক কোলাহল-কলরবই সার হইবে।

আমাদের প্রত্যেকের পৃথক পৃথক কর্ম্মক্ষেত্র নির্দ্দিষ্ট থাকিলেও সকল কর্ম্মের একমাত্র প্রবর্ত্তক ভগবানের সঙ্গে আমাদের প্রত্যেকের যোগ অবিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে। অবিচ্ছিন্ন রাখিতে হইবে বলি কেন?—অবিচ্ছিন্ন থাকিবেই। কোন সাধকের কথায় আমি বলি—'নদী কি প্রস্রবণ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া থাকিতে পারে? বৃক্ষ কি তাহার মূল হইতে পৃথক হইয়া থাকিতে পারে?' তিনি তো আমাদিগকে ছাড়িবেন না, কিন্তু আমরা যদি তাঁহাকে ছাড়ি—তবে ছাড়িয়া দাঁড়াইব কোথায়? তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের জ্ঞান, কর্ম্ম ও প্রীতির সার্থকতা কোথায়? সমস্তই তো তাহা হইলে মূলহীন ভাসা ভাসা ভাবে দাঁড়াইবে বলিতে হয়। কিন্তু প্রকৃতি হইতে দেখি যে, প্রকৃতির অন্তর্ভুক্ত কোন কিছু, সুতরাং আমাদের জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ম্ম—কোন কিছুই পরস্পরের সহিত সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্নভাবে, মূলহীন স্বতন্ত্র হইয়া দাঁড়াইতে পারে না। সকল জ্ঞানের মূল, সকল প্রীতির অদ্বিতীয় উৎস, সকল কর্ম্মের একমাত্র প্রবর্ত্তক ভগবানেই আমাদের জ্ঞান প্রীতি ও কর্ম্মের একমাত্র পরিসমাপ্তি। বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে দেখিব যে, তাঁহাকে ছাড়িয়া আমাদের জ্ঞান প্রীতি ও কর্ম্ম কোন কিছুই প্রকৃত সার্থকতা, প্রকৃত তৃপ্তিলাভ করিতে পারে না। এইজন্য প্রার্থনা করা হয় যে, "তোমার যে প্রসন্ন মুখ, তাহা দ্বারা আমাকে সর্ব্বদা রক্ষা কর"। বলিতে কি, "ঈশ্বরের প্রসন্ন বদনই সাধকের একমাত্র ধন।" এই ধন সাধকের অন্তরের ধন; এই ধন সাধকের চিরন্তন ধন।

তিনি শুদ্ধমপাপবিদ্ধং। তাঁহাকে প্রীতি করিতে গেলে তাঁহার আদর্শকে অনুসরণ করিতে হইবে। সেই আদর্শ হইল তাঁহার শুদ্ধমপাপবিদ্ধস্বরূপ; সেই আদর্শ হইল তাঁহার মঙ্গলবিধাতাস্বরূপ; সেই আদর্শ হইল তাঁহার জ্ঞানস্বরূপ, তাঁহার অনন্তস্বরূপ। তাঁহার আদর্শকে অনুসরণ করিতে গেলে আমাদিগকে নিষ্পাপ হইতে হইবে। যখন প্রেয় শতবিধ প্রলোভনের মধ্যে পাপের পিচ্ছিল পথে আমাদিগকে আহ্বান করে, তখন শ্রেয় আমাদের অন্তরে নিহিত কর্ত্তব্যবোধের মূর্ত্তিতে তাহার প্রতিকূলে দাঁড়ায়। ভগবানের আদর্শ অনুসরণ করিতে চাও তো, কর্ত্তব্যবোধের আদেশ গ্রহণ করিয়া সর্ব্ববিধ পাপের, সকল প্রকার দুর্নীতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হও—আপনাকেও পবিত্রতার পথে পরিচালিত কর: আর নিজের প্রতিবাসী, নিজের দেশ, সমাজ প্রভৃতি পরিপার্শ্বস্থ সকলকেও পবিত্রতার পথে পরিচালিত কর। তাঁহার আদর্শ অনুসরণ করিতে চাও তো, সকলের মঙ্গলবিধানে অগ্রসর হও। নিজের লাভের জন্য, নিজের সুখের জন্য পরের অনিষ্ট করিবার ইচ্ছা, পরের অমঙ্গলসাধনে আত্মতৃপ্তি লাভ করিবার ইচ্ছাকে পায়ের তলায় দলিত কর। কোনও সূত্রে অপরের অনিষ্ট-অমঙ্গল করিবার ইচ্ছা হৃদয়ে পোষণ করিবে না। এই প্রকারে অপরের মঙ্গলসাধনে সিদ্ধি লাভ কর—দেখিবে কত সহজে ও কত শীঘ্র ভগবানের চরণাভিমুখে অগ্রসর হইবে। কাহারও মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিও না—কাহারও নিন্দার ভয়ে ভগবানের আদেশপালনে পরাঙ্মুখ হইও না; কাহারও প্রশংসা লাভে আত্মহারা হইও না। ভূমিকম্প প্রভৃতি প্রাকৃতিক ঘটনার উপর মানুষের হাত দেখা যায় না; সে সমস্তই ভগবানের প্রবর্ত্তিত প্রাকৃতিক বিধানের বলেই সংঘটিত হইতেছে। কিন্তু আপনাকে নিষ্পাপ করিয়া ভগবানের পথে পরিচালিত করা—যতই আমরা অদৃষ্টের উপর নির্ভর করি না কেন, আমরা স্পষ্ট বুঝিতে পারি যে, এবিষয়ে ভগবান আমাদের অন্তরে কর্ত্তব্যমূলক যে স্বাধীনতা দিয়াছেন সেই স্বাধীনতারই বলে আমরা স্বাধীন ভাবে চলিতে পারি এবং চলি। তাই না, মানবসমাজ অসভ্য অবস্থা হইতে আজ এই উন্নতির পথে সমারূঢ়? এই স্বাধীনতা না থাকিলে মানবসমাজের উন্নতির পথে চলিবার ইচ্ছাই হইত কি না সন্দেহ।

আজ এই উৎসবে আসিয়াছ—নিজেদের দীনতা মলিনতা সমস্ত সেই পবিত্রতার উৎস ভগবানের আনন্দ-

সাগরে বিসর্জ্জন করিয়া দিতে হইবে। ধর্ম্মকে সহায় করিয়া সংসারক্ষেত্রে বিচরণ করিতে হইবে। জ্ঞানে বড় হও, শ্রদ্ধাভক্তিতে আত্মাকে সমুজ্জ্বল কর, এবং শুভ-কর্ম্মের অনুষ্ঠানে আপনাকে সকলের অগ্রণী কর। জ্ঞান, প্রীতি, কর্ম্ম, মঙ্গলভাব, সকল বিষয়ে নিজেদের ক্ষুদ্রতা, নিজেদের সাম্প্রদায়িক সঙ্কীর্ণতা পরিত্যাগ কর। ভগবানের অনন্তভাব সম্মুখে ধারণ করিয়া নিজেকে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে, সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গলের পথে সম্প্রসারিত কর। সাড়ে তিন হস্ত পরিমিত মানুষের উপর অতিমাত্র নির্ভর না করিয়া বিশ্বপতি পরম পিতামাতা পরমেশ্বরের দক্ষিণ হস্ত ধারণ করিয়া, তাঁহাকে সহায় করিয়া, সকল বিঘ্ন-বিপত্তি উত্তীর্ণ হও। নিজেকে স্পষ্ট মনে করিতে হইবে যে আমি অমৃতের সন্তান, আমি রাজাধিরাজের সন্তান—আমি দীনহীন মলিন ভিখারী নই; তাঁহার রাজ্যে সকলের সঙ্গে আমারও বিশেষ অধিকার আছে। আমার যাহা কিছু প্রয়োজন হইবে, তাহা আমার পিতামাতার ভাণ্ডার হইতে স্নেহের বলে প্রেমের বলে সংগ্রহ করিব। তিনিই যখন আমাদের আশ্রয়, তখন নির্ভয় হও—নির্ভীক হৃদয়ে সত্যধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়া বিচরণ কর এবং ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত কর।

ন্যায়বিচারে বয়স বা জাতির স্থান নাই।

(জনৈক শিক্ষক)

দোকানদারের পক্ষে ভেজাল জিনিস দেওয়াও অন্যায়, আবার খরিদদারের পক্ষে মেকি টাকা চালাইবার চেষ্টা করাও অন্যায়। পিতামাতার পক্ষে সন্তানগণকে পোষাক-পরিচ্ছদ ও আহারাদি প্রদান করিয়া মানুষ করিয়া তুলিবার চেষ্টা করা যেমন ন্যায়সঙ্গত, সেইরূপ সন্তানের পক্ষে পিতামাতার আজ্ঞাবহ থাকিয়া তাঁহাদের প্রতি সম্মানপ্রদর্শনও ন্যায়সঙ্গত। অন্যায় অনুগ্রহ প্রদর্শন করিতে গেলেই ন্যায়বিচারে বাধা পড়ে। কাহারও সহিত মতভেদ হইলেই বিরোধীর নামে অযথা নিন্দাবাদ ন্যায়সঙ্গত নহে। মন হইতে শত্রুতা বিদূরিত করিয়া মতভেদ ব্যক্ত করাই কর্ত্তব্য। ন্যায়বিচারকালে উহাতে আমাদের নিজ নিজ মতামত প্রবেশ করিতে দেওয়া অন্যায়। অনেক সময়ে আমরা নিজেদের বিরক্তির কারণে উদোর বোঝা বুধোর ঘাড়ে ফেলি—তাহা খুবই অন্যায়। বিদেশী বা অভ্যাগত কাহারও বিষয় কিছু না জানিয়া অন্ধভাবে মতামত স্থির করা অন্যায়।

মোটামুটি এই যে অন্যায় কার্য্যের কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিলাম, এইগুলি বয়স্ক যুবক বা বৃদ্ধদিগের ন্যায় কোমলমতি শিশু বা কিশোরবয়স্কদিগেরও মনে রাখা আবশ্যক। আবার শিশুদিগকে বৃথা উত্যক্ত করাও উচিত নয়। তাহাদের প্রশ্নসমূহের যথাযথ উত্তর দেওয়া উচিত। তাহাদের সম্মুখে সাধু দৃষ্টান্ত রাখা কর্ত্তব্য। শিশু ও বালকদিগকে তাহাদের বয়স জিজ্ঞাসা করিলেই দেখা যাইবে, সকলের বয়স একসমান নহে—একআধটু তারতম্য আছে। একটু চেষ্টা করিলেই ছেলেদিগকে বোঝানো কঠিন হইবে না যে, বয়সের সামান্য তারতম্যের জন্য পরস্পরের প্রতি ন্যায়বিচার করিবার পক্ষে তারতম্য করিবার কোনই আবশ্যকতা নাই—বলিতে কি, এগারো বৎসরের বালকও যেমন আশা করে যে তাহার প্রতি ন্যায়বিচার করা হোক, দশ বৎসরের বালকও তাহার ন্যায় সমানই আশা করে যে তাহার প্রতি যেন অন্যায় বিচার করা না হয়। কি বৃদ্ধ, কি যুবক, কি পুরুষ, কি স্ত্রীলোক, সকলেরই অন্তরে ন্যায়বিচারের জন্য একটা অন্তর্নিহিত আশা ও আকাঙ্ক্ষা জাগ্রত আছে। সকলেরই অন্তরে অন্যায়ের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদের ভাব সর্ব্বদাই জাগিয়া আছে, তাই আমরা আমাদের নিজেদেরও উপরে অন্যায় হইতে দেখিলে ক্রুদ্ধ ও বিরক্ত হই, আবার অন্যের উপরেও অন্যায় হইতে দেখিলে আমাদের অন্তরে তাহার বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ ও বিদ্রোহ জাগিয়া উঠে।

এই ন্যায়বিচার করিতে গেলে প্রত্যেকেরই বিশেষত শিশু বালক প্রভৃতির ভুলভ্রান্তির জন্য কতকটা ক্ষমা ঘৃণা করিতে হয়। অনেক সময়ে অনেক বিষয়ে আমাদের বুঝিবার ভুল হয়; হয় তো সেই বুঝিবার ভুলের জন্য অন্যকে বিরক্ত করিয়াছি বা অন্যের মনে কষ্ট দিয়াছি; বুঝিতে পারি নাই বলিয়া হয়তো অন্যের ভাল প্রশ্নেও বিরক্ত হইয়া উঠিয়াছি। আমাদের বোঝা উচিত আমরাও ছেলেবেলায় অনেককে শত শত প্রশ্নের জ্বালায় উত্যক্ত করিয়া মারিয়াছিলাম এবং এই প্রকার উত্যক্ত করিবার ফলেই অনেক বিষয়ে উপযুক্ত জ্ঞান অর্জ্জন করিয়াছিলাম। এই সকল মনে রাখিয়া অপরের অজ্ঞের ন্যায় প্রশ্নের কারণে বিরক্ত হইবার পরিবর্ত্তে যথাযথ উত্তর দিতে থাকিবে, যাহাতে তাহারা তোমার উত্তরে ও সাধু দৃষ্টান্ত দেখিয়া শিক্ষা লাভ করে। ইহা ভুলিও না যে, শিশু ও বালকেরা আমাদিগকে নানা বিষয়ে জিজ্ঞাসা করিয়া যতটুকু শিক্ষা করে, জ্ঞানলাভ করে, তদপেক্ষা অনেক বেশী আমাদের কাজ দেখিয়া এবং আমাদের অনুকরণ করিয়া জ্ঞানলাভ করে। কাজেই বলা বাহুল্য যে, আমাদের চরিত্রে,আমাদের কাজে দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহাদিগকে আমরা সত্যের পথে পরিচালিত করি। সকল বিষয়েই আমরা প্রত্যাশা করি যে, আমাদের শিক্ষকেরা আমাদিগকে যাহা সত্য তাহাই শিক্ষা দিবেন—ভুল শিক্ষা দিবেন না। ছোট-

খাটো বিষয়েই দেখ—আমাদের শিক্ষক যদি গণিত ভূগোল প্রভৃতি বিষয়ে ভুল শিক্ষা দেন এবং সেই শিক্ষা লইয়া যদি আমরা বিদ্যালয় হইতে কর্ম্মক্ষেত্রে বহির্গত হই, তাহা হইলে সেই ভুল শিক্ষা হইতে কত না গুরুতর অনিষ্ট হইতে পারে—কলিকাতায় যাইব মনে করিয়া কাশী চলিয়া গেলাম, দশ পয়সা দিবার স্থলে দশ আনাই দিয়া ফেলিলাম। আমাদের শিক্ষকের কাছে আমরা যেমন নির্ভুল সত্য শিক্ষা লাভের প্রত্যাশা রাখি, সেইরূপ আমাদের মনে রাখা উচিত যে, আমাদের অপেক্ষা ছোট যাহারা, তাহাদিগকে আমাদেরও সুশিক্ষা দান করিতে হইবে। যে রাস্তায় গাড়ী ঘোড়ার খুব চলাচল, সেই রাস্তার মাঝখানে অন্ধ ব্যক্তিকে লইয়া গিয়া ছাড়িয়া আসা অত্যন্ত অসঙ্গত—ছেলেদের সম্মুখে এপ্রকার দৃষ্টান্ত ধরা উচিত নয়। ছোট ছোট ছেলেরাও চলিতে গেলে এই অন্ধেরই মত—আমাদের দৃষ্টান্তের দ্বারা তাহাদিগকে বিপদের মধ্যে টানিয়া আনা কর্ত্তব্য নয়।

ছোট ছেলেপিলেদের সম্বন্ধে ন্যায়বিচার করিতে গেলে যেমন তাহাদের অনেক ভুলভ্রান্তি ক্ষমাঘৃণা করিয়া লইতে হয়, সেইরূপ বৃদ্ধদিগের প্রতি ন্যায়বিচার করিতে গেলে তাহাদের দুর্ব্বলতা ও অতীতে সৎকার্য্যসমূহের প্রতি দৃষ্টি রাখিতে হয়। বৃদ্ধদিগকে সুখশান্তি দেওয়াও তাহাদের প্রতি সুবিচারের একটী অঙ্গ। আমাদের অপেক্ষা যাহাদের বয়স অনেক অধিক, তাহাদের বিষয় একবার ভাবিয়া দেখ; তাহাদের প্রতি সুবিচার করিতে চাহিলে, তাহাদের দুর্ব্বলতা, দৃষ্টিহীনতা, অতীতের বিষয় পুনরুক্তি করিবার অতিরিক্ত ইচ্ছা প্রভৃতি ভুলিলে চলিবে না। সুবিচার দাবী রাখে যে, বৃদ্ধদের দুর্ব্বলতার প্রতি আমরা শ্রদ্ধা প্রদর্শন করিব—মনে রাখিব যে, আমাদেরই মত বালক ও যুবকদিগের জন্য কাজ করিতে করিতেই তাঁহারা জরাজীর্ণ হইয়াছেন। অতিরিক্ত কোলাহল-কলরব করিয়া তাঁহাদের শান্তিভঙ্গ করা আমাদের কর্ত্তব্য নয়; তাঁহারা কি চাহেন, কি বলেন, তদ্বিষয়ে আমাদের সর্ব্বদা মনোযোগ রাখা উচিত; তাঁহাদের সুদীর্ঘ অভিজ্ঞতায় আমাদের অপেক্ষা অনেক বিষয়ে জ্ঞানলাভ করিয়াছেন, সুতরাং তাঁহাদের পরামর্শ অবহেলার বিষয় তো নয়ই, বরঞ্চ তাহা কান পাতিয়া শোনা উচিত এবং মন দিয়া বিচার করা উচিত। সকল দেশেই ন্যায়বিচারের প্রতিমূর্ত্তির হস্তে দাঁড়িপাল্লা বা নিক্তি আছে দেখানো হয়। আমাদেরও কর্ত্তব্য, যথাসম্ভব নিক্তির ওজনে ন্যায়বিচার বিতরণ করা। বৃদ্ধগণ বহু বৎসর ধরিয়া যে প্রকার শুভ কাজকর্ম্ম করেন, তদনুপাতে বৃদ্ধবয়সে তাঁহাদিগকে বিশ্রাম ও শান্তি প্রদান করা আমাদের কর্ত্তব্য। অনেক অসভ্য জাতির মধ্যেও বার্দ্ধক্যের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মানপ্রদর্শন জাগ্রত দেখা যায়। অষ্ট্রেলিয়ার অনেক স্থানে বৃদ্ধদিগকে শিকারে যাইতে দেওয়া হয় না এবং শিকারনিহত পশুপক্ষীর সর্ব্বাপেক্ষা উৎকৃষ্ট অংশ তাহাদের জন্য রাখিয়া দেওয়া হয়। সম্ভবত এই প্রকার বার্দ্ধক্যের প্রতি শ্রদ্ধাপ্রদর্শনই অধিকাংশ প্রাচ্য দেশেই প্রচলিত মুষ্টিভিক্ষারীতি প্রচলিত হইবার মূল কারণ। পাশ্চাত্যভূখণ্ডের অনেক দেশেই এই মুষ্টিভিক্ষা দিবার রীতি প্রচলিত নাই। সেই কারণে পাশ্চাত্য দেশে অধিকাংশ দরিদ্র বৃদ্ধকেই হয় অনশনকে বরণ করিয়া অথবা "কর্ম্মগৃহে" (Workhouse) জীবনের শেষ দিন পর্য্যন্ত হাড়ভাঙ্গা পরিশ্রম করিয়া মরিতে হয়। একজন সুপ্রসিদ্ধ নীতিগ্রন্থরচয়িতা এই অবস্থা ও ব্যবস্থাকে বড়ই নিন্দা করিয়াছেন।

আবৃত্তির জন্য কবিতা।

ঐ দেখ বৃদ্ধা নারী বলহীন দেহ—
সুপলিত কেশ তার; শীতের আঘাতে
নত তার দেহখানি। কুয়াসায় ঢাকা
সহরের জনপথ। বৃদ্ধা পারে নাকো
অবশ চরণ লয়ে দৃষ্টিহীন চোখে
চৌমাথা হইতে পার—রয়েছে দাঁড়ায়ে—
একাকী অবজ্ঞদৃষ্ট পথিকের হাটে।
রাস্তা দিয়া ছুটে আসে হরষ উল্লাসে—
বিদ্যালয়ে ছুটী হোল—স্বাধীনতা পেয়ে
আনন্দহৃদয়ে যত পালে পালে ছেলে
ঘন মেঘের আকার কুয়াশা কাটায়ে।
ছেলেরা চলিল সবে দৃষ্টি নাহি দিয়া
পার্শ্বে বুড়ীটীর দিকে। এগোল না কেহ
আপন সহায়হস্ত করিতে বিস্তার
বুড়ীটীর দিকে হায়। নড়িতে চাহে না
ভয়ে, দুরবল আহা দুখিনী রমণী।
অবশেষে ঘুরে আসে আনন্দে আকুল
ছেলেদের মাঝে এক প্রফুল্লতম যে।
দাঁড়ায়ে বুড়ীর পার্শ্বে কহে মৃদুস্বরে—
"চৌমাথা পার হয়ে যদি চাও যেতে
তোমায় সহায় হয়ে নিয়ে যাব ধীরে"।
ইহা বলি' ধীরে ধীরে কম্পিতচরণ
বুড়ীটীরে লয়ে চলে, করি' নিরন্তর
নিজের যুগল পদে সুদৃঢ় সবল।
এইরূপে পার করি' বৃদ্ধা রমণীরে
ফিরে গেল বন্ধুসনে, সরল কোমল
আপন হৃদয়ে লভি' পরম সন্তোষ।
বন্ধুগণে কহে তবে—"শোন ভাই সবে,

বুড়ীটী জননী কারো—বার্দ্ধক্য এখন
ঘিরেছে বেচারী তারে, চলেনা চরণ।
আমারও জননী যদি বার্দ্ধক্যে পড়িয়া
হয়েন দরিদ্র কভু, পুত্র আমি যদি
সুদূরে রহি গো পড়ি', আশা আছে মোর
তখন কেহ না কেহ প্রসারিবে সুখে
জননীরে নিজ হস্ত সুপ্রসন্ন মুখে॥

প্রাচ্য জগতের মধ্যে চীনবাসীগণ বিশেষভাবে বৃদ্ধ বয়সের প্রতি বড়ই শ্রদ্ধা প্রদর্শন করে। চীনদেশে যে যত বৃদ্ধ হয়, সে ততই সম্মানের পাত্র বলিয়া বিবেচিত হয়। একজন ফরাশি পর্য্যটক, শ্রীমান সাইন' একজন চীনদেশস্থ পল্লীবাসীর কথা বলেন। কতক্ষণ ধরিয়া কথাবার্ত্তা হইবার পর সেই পল্লীবাসী সাইম'কে জিজ্ঞাসা করিলেন "আমি কি আপনার সুখকর বয়স কত জিজ্ঞাসা করিতে পারি?" ফরাসি ভদ্রলোকটী উত্তরে বলিলেন "আমার বয়স ৩৬ বৎসর।" চীনবাসী বলিলেন "আমার মনে হইয়াছিল আপনার অন্তত উহার দ্বিগুণ বয়স"। এইটী তিনি ফরাসি ভদ্রলোকের প্রতি সম্মান দিবার উদ্দেশ্যে বলিয়াছিলেন। সকলেই জানে যে, চীনবাসীগণ একটী অতি প্রাচীন জাতি; তাহাদের শিক্ষাদীক্ষার প্রতি আমাদের সম্মান প্রদর্শন কর্ত্তব্য।

ন্যায়ধর্ম্ম জাতিনিরপেক্ষ—কে পুরুষ আর কে স্ত্রীলোক, তাহার অপেক্ষা রাখে না। পিতা মাতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা মাতা পিতা অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ভাই ভগ্নী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ অথবা ভগ্নী ভাই অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? ইহা বড়ই কঠিন প্রশ্ন। গণিতশাস্ত্রে যেমন এক-একটী ধাঁধা দেওয়া হয়, এই প্রশ্নও সেইরূপ একটী ধাঁধা বলিলেও চলে। ধাঁধারই হিসাবে স্তরে স্তরে ধরিয়া ইহার মীমাংসার চেষ্টা করা যাক।

(ক) বালিকা অপেক্ষা বালক যে যে কাজ ভাল করিতে পারে;

১। পাথর ছোড়া; ২। দৌড়াইবার প্রতিযোগিতা;
৩। ক্রিকেট খেলা; ৪। মুখ ভেংচানো;
৫। ভার বহন; ৬। মারামারি।

(খ) বালক অপেক্ষা বালিকা যে যে কাজ ভাল করিতে পারে;

১। শিশুকে লালন-পালন করা; ২। শয্যাপ্রস্তুত;
৩। চায়ের টেবিল সাজান;
৪। দড়ির উপর দিয়া লাফান;
৫। পোষাক-পরিচ্ছদ পরিষ্কার রাখা;
৬। চুপচাপ বসা;

এই তালিকা দেখিয়া মাথা ঘুরিয়া যাইবার কথা—কাহাকে শ্রেষ্ঠ বলি, বালক অথবা বালিকাকে? আমরা তো অনেক সময়ে প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, কোন কোন বালক কোন কোন বালিকা অপেক্ষা শিশুকে বেশী ভালরূপ লালনপালন করিতে পারে। তার পর, মুখ ভেংচাইবার তো কোনও প্রয়োজনই দেখা যায় না—যদিই বা স্বীকার করি যে বালিকা অপেক্ষা বালক এই কার্য্যটী ভাল করিয়া করিতে পারে। এখন তৃতীয় স্তরে যাওয়া যাক।

(গ) বালক ও বালিকা উভয়েই যে-সকল ভালরূপ করিতে পারে;

১। পরস্পরের প্রতি সদয়ভাবে কথা বলা।
২। পরস্পরের বিষয়ে প্রীতির সহিত কথা বলা।
৩। পরস্পরকে আমোদ প্রদান।
৪। পরস্পরকে বিপদে সাহায্য করা
৫। পরস্পরকে সত্যপথে চলিবার, ন্যায়বিচার করিবার সাহায্য করা
৬। পিতা ও মাতাকে সাহায্য করা।

দেখা যাইতেছে যে, একটী বালক যে সকল ভাল কাজ করিতে পারে, তাহার প্রত্যেকটীর প্রতিযোগে একটী বালিকাও এক-একটী ভাল কাজ করিতে পারে। এমন কাজ যদি থাকে, যেগুলিতে বালকদের হাত ভাল খেলে না, তবে এমন অনেক কাজ দেখা যায়, যেগুলি বালিকারা ভালরূপ সম্পন্ন করিতে পারে না। এই সমস্ত বিচার-বিবেচনা করিয়া আমরা এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইতেছি এবং পূর্ব্বোক্ত সমস্যার এই প্রকারে মীমাংসা করিতেছি—

বালিকার মত বালক ভাল; বালকের মত বালিকা ভাল; পিতার ন্যায় মাতা ভাল; মাতার ন্যায় পিতা ভাল; ভ্রাতার ন্যায় ভগ্নী ভাল; ভগ্নীর ন্যায় ভ্রাতা ভাল।

কাজেই দেখা যাইতেছে যে, শিশু-বৃদ্ধনির্ব্বিশেষে, বালক-বালিকানির্ব্বিশেষে, নরনারীনির্ব্বিশেষে সকল লোকেরই প্রতি ন্যায়বিচার সমানভাবে প্রয়োগ করাই আমাদের ধর্ম্ম।

সাহিত্যিকের উড়ো যাত্রা।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(জনৈক সাহিত্যিক)

চৌরকাহিনী।

ক্রমে রাত্রি ঘনাইয়া আসিল। মাঝের এক ষ্টেশনে একটী তেলেগু ব্রাহ্মণ তাঁহার এক বুড়ী মাকে লইয়া উঠিলেন। তাঁহার সঙ্গে আরও কয়েকটী স্ত্রীলোক আসিয়া আমাদের ঠিক পার্শ্ববর্ত্তী গাড়ীতে উঠিলেন।

বুড়ী মাকে কেন যে আমাদের কামরায় উঠাইলেন তাহা তখন বুঝি নাই, কিন্তু কিছু পরেই উদ্দেশ্যটা প্রকাশ হইয়া পড়িল। তিনি চাহিয়াছিলেন, আমি আমার বেঞ্চি ছাড়িয়া উপরের বেঞ্চি অধিকার করি, আর তাঁহার মা আমার বেঞ্চি অধিকার করুন। আর সময়ে সময়ে আমার যে সমস্ত ছোটখাটো জিনিস আছে, তাহা তিনি এক একটী করিয়া উঠাইয়া পার্শ্বের গাড়ীতে হাত বাড়াইয়া নিজের সঙ্গী মেয়েদের নিকট চালাইতে থাকুন। আমি তাঁহার প্রার্থনার উত্তরে কোনও উচ্চবাচ্য করিলাম না। তখন তাঁহার মা দরজার সামনে একটা কম্বল পাতিয়া শুইয়া পড়িলেন। কিন্তু তাহাতে সে ব্রাহ্মণের প্রকৃত উদ্দেশ্য সফল হইল না। লোকটীর অতিরিক্ত চঞ্চলতা ও মাথানাড়া আমার ভাল লাগে নাই। কাজেই আমি জাগিয়াছিলাম। একবার একটুখানি চক্ষু বোধ হয় মিনিট দুয়েকের জন্য বুজিয়াছি, ইতিমধ্যে সর্ব্বাঙ্গে চন্দনচর্চ্চিতদেহ ব্রাহ্মণবর "নিয়ো কিঞ্চিৎ না কর বঞ্চিত" নিজের পক্ষে প্রয়োগ করিতে গিয়া আমার বালতিতে বসানো একসঙ্গে বাঁধা একজোড়া লণ্ঠন উঠাইয়া পার্শ্বের গাড়ীতে দিবার জন্য হাত বাড়াইয়াছেন, এমন সময়ে ভগবানের কৃপায় আমি চক্ষু খুলিয়া ঐ ব্যাপার দেখিয়াই ইংরাজীতে এক ধমক—What are you doing there? অমনি তাড়াতাড়ি সে লণ্ঠন দুইটী যথাস্থানে রাখিয়া শতবার আমার পায়ে মাথা খুঁড়িতে লাগিল এবং হাত জোড় করিয়া ক্ষমা চাহিয়া বলিতে লাগিল, সে ভাবিয়াছে লণ্ঠন দুইটী তাহার! যাক, আমি আর কিছুই বলিলাম না। পরবর্ত্তী ষ্টেশনে তিনি তাঁহার মাকে লইয়া নামিয়া গেলেন। অন্যান্য যাত্রীগণ তাঁহাকে যথোচিত দণ্ডপ্রদানে উদ্যত। আমি ছাড়িয়া দিবার জন্য অনুরোধ করিলাম। যাত্রীগণ সকলে, যিনি যে খাদ্য আনিয়াছিলেন, তাহা খাইয়া নিদ্রাদেবীর আশ্রয় গ্রহণ করিলেন। আমি পূর্ব্বের ন্যায় দুইটী কমলা লেবুর উপরেই রাত্রিটা কাটাইয়া দিলাম।

প্রভাতবর্ণনা।

রাত্রি প্রভাত হইল। ট্রেণও একটা বড় ষ্টেশনে থামিল। প্রাতঃকৃত্য সমাধার জন্য যাত্রীগণ ছুটাছুটি লাগাইয়াছে। নিম্নশ্রেণীর যাত্রীগণ একটা করিয়া পয়সা ফেলিতেছে, আর মুখহাত ধুইবার জন্য এক লোটা জল ভরিয়া লইতেছে। দ্বিতীয় শ্রেণীর যাত্রীগণ সিগারেট সেবনে নিযুক্ত রহিলেন। প্রাতঃকৃত্য সমাপনান্তেই এক পেয়ালা চা পান না করিলে তাঁহাদের জীবন দুর্ব্বিষহ হইয়া উঠিতেছিল। তাঁহারা যে গাড়ী হইতে দুই পা চলিয়া গিয়া চায়ের ঘরে গিয়া চা দিতে আদেশ করিবেন, তাঁহাদের সে সাহস বা সুবিধা ছিল না। ঐ জানালা হইতে মুখ বাড়াইয়া খানসামার উদ্দেশ্যে ডাকাডাকি হাঁকাহাকি দ্বারা যতটুকু কার্য্যসিদ্ধ হয়। খানসামারা এক তো তাঁহাদের কথা গ্রাহ্যই করে না। তাহারা যেখানে দু-পয়সা বকশিষ পাইবে সেইখানেই তো দৌড়াইবে—প্রথম শ্রেণীর এবং দ্বিতীয় শ্রেণীর সাহেববিবিদিগেরই মন যোগাইতে ব্যস্ত, কারণ প্রতি পেয়ালা চা ও রুটী মাখমের দামের উপর দুই আনা চার আনা করিয়া বকশিষ পায়। দেশী লোকদিগের তো পুঁটিমাছের প্রাণ। এক পয়সায় চা পাইলে দুই পয়সা দিব না—বকশিষ তো দূরের কথা। দেশীয় যে যাত্রী খানসামার অনুগ্রহ পাইলেন, তিনি বারো আনা দাম দিয়া আপনাকে কৃতার্থ বোধ করিলেন। কিন্তু জানিলেন না যে, কত যাত্রীর প্রসাদী উচ্ছিষ্ট মাখম ও চা তিনি গলাধঃকরণ করিলেন। কিরূপ উচ্ছিষ্ট যে খানসামারা খাওয়ায়, আমার তাহা দুই একবার প্রত্যক্ষ হইয়াছে। আর, যে যাত্রী খানসামার অনুগ্রহলাভে বঞ্চিত হইলেন, তাঁহার বিষাদপূর্ণ মুখে হতাশার কি গভীর ছায়া! তাহা দেখিবার জিনিষ বটে। তখন অগত্যা তিনি "হিন্দু" চা-বিক্রেতার শরণ লইলেন। অনেক ক্ষণ ধরিয়া সে এদিক ওদিক 'চাই হিন্দু চা' করিয়া ঘুরিতেছিল, তখন তাহার দিকে সেই যাত্রীর করুণ দৃষ্টি নিপতিত হয় নাই। কিন্তু "সজনে শাক বলে আমি সকল শাকের হেলা, আমায় মনে পড়ে কেবল টানাটানির বেলা।" যাক, হিন্দু চা পান করিয়াও তাঁহার প্রাণে একটু স্ফূর্ত্তি আসিল। দুই আনা দিয়া রেলষ্টেশনের চা পানের স্বর্গীয় সুখ পাইলেন তো এবং আত্মীয় স্বজনের নিকট তাহার মধুরিমা বর্ণনা করিবার অধিকার পাইলেন তো, তাহা হইলেই যথেষ্ট। কিন্তু তিনি যদি জানিতেন, কি বিষ পান করিলেন, তাহা হইলে হয়তো ঐ নরকের চা স্পর্শ করিতে চাহিতেন না। আমার স্বচক্ষে দেখা যে, অপর একজন চা পান করিয়া অতি অখাদ্য বলিয়া পেয়ালায় অর্দ্ধেক ফেলিয়া রাখিলেন, দ্বিতীয় ব্যক্তির নিকট আসিবার পূর্ব্বেই পরম পবিত্র হিন্দু চাওয়ালা তাহার চায়ের অক্ষয় ভাণ্ডারে সেই চাটুকু ফেলিয়া নষ্ট করিবার পরিবর্ত্তে সঞ্চিত রাখিল! খানসামারাও অনেক সময়ে হাই দিয়া প্লেট প্রভৃতি পরিষ্কার করে, তাহাও আমার নজরে আসিয়াছে। আর এসমস্ত কথা তো আজকাল সর্ব্ববিদিত গুপ্ত খবর (open sceret); কাজেই মনে হয়, যে সকল যাত্রী ষ্টেশনের চা প্রভৃতি গ্রহণ করেন, তাঁহারা সম্ভবত ঐ সকল কথা জানিয়াও জানিতে চাহেন না অথবা মনটাকে কোন প্রকারে স্তোকবাক্যে বুঝাইয়া ও ভুলাইয়া ঐ বিষয়ে বেশী ঘাঁটাঘাঁটি করিতে নিরস্ত থাকেন। আমি কিন্তু দুইএকটী লেবুর উপরেই সকালটাই কাটাইলাম—আমার বিছানা ছাড়িয়া একপদও নড়িবার

প্রয়োজন হয় নাই। আমার নিকট দশ বারোটী কমলা লেবু ছিল। সেই কয়েকটী লেবুর উপরেই দিনরাত কাটাইয়া দিলাম। যাত্রীরা ষ্টেশন হইতে যিনি যাহা পারিলেন লুচি তরকারি মিষ্ট কিনিয়া উদরপূর্ত্তি করিলেন।

ইলেক্‌ট্রিক্‌ ট্রেণ।

অবশেষে পরদিন ভোরে ট্রেণ বম্বে সহরে উপস্থিত। বম্বে পৌছিবার পূর্ব্বেই আমার কামরায় একজন ঐ দেশীয় যাত্রী উঠিয়াছিলেন। সম্মুখ দিয়া একটা ট্রেণ গেল, কিন্তু তাহাতে ধোঁয়া-কলের গাড়ীটা দেখিলাম না। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, উহা ইলেক্‌ট্রিক ট্রেণ বা তড়িৎ-চালিত ট্রেণ। শুনিতে পাই, এখানেও কয়েকটী লোকাল বা নিকটগামী ট্রেণ তড়িৎ-চালিত হইবে। সমস্ত ট্রেণগুলিই তড়িৎচালিত হইলে বাঁচা যায়—চোখে কয়লার গুঁড়া পড়িবার উৎপাত হইতে রক্ষা পাওয়া যায়।

বম্বেবাসীর ব্যবসায়বুদ্ধির পরিচয়।

ঐ সহযাত্রীর নিকট বম্বেবাসীর ব্যবসায়বুদ্ধির সামান্য একটু পরিচয় পাইলাম। তিনি বম্বে সহরের গিরগাঁও অঞ্চলের সুপ্রসিদ্ধ "Honesty & Co." নামক কোম্পানির অন্যতর অংশীদার। তিনি বলিলেন, খুব সামান্য হইতে এখন ইহা এক মস্ত কারবারে দাঁড়াইয়াছে। ইহাদের কারবার পরিচালনে ইংরাজদের কোনই হাত নাই—সমস্তই বম্বেবাসী-চালিত। এটী প্রধানত কাগজ ও ষ্টেশনরি অর্থাৎ লেফাফা প্রভৃতির কারবার—সমস্তই ইহাদের কারখানায় প্রস্তুত হয়। এইটী হইল মার্কিনদিগের কর্ম্মমন্ত্র, আমি তাঁহাদের একটী ব্যবসায়সম্বন্ধীয় গ্রন্থে পড়িয়াছিলাম। তাঁহারা বলেন, আমার একটী যন্ত্রালয় আছে; তাহার জন্য অক্ষর চাই—ভাল অক্ষর প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা কর; অক্ষরের জন্য সীসা চাই, গ্রাফাইট চাই—সেই সকল বস্তু মধ্যবর্ত্তীর হাত দিয়া না লইয়া মূল ব্যবসায়ীর নিকটে পাইবার ব্যবস্থা কর। যন্ত্রালয়ের জন্য ছাপিবার কালী চাই—কালী প্রস্তুত করিবার ব্যবস্থা কর। যে কাজটা করিবে, যতদূর সম্ভব সেটাকে selfcontained বা আত্মনিবদ্ধ বা সর্ব্বাংশে স্বায়ত্ত করিবার চেষ্টা করিবে; যতদূর সম্ভব চেষ্টা করিবে, যাহাতে পরের হাতে পদে পদে না যাইতে হয়। জানত বা অজানত মার্কিনদিগের এই ব্যবসায়-মন্ত্র অবলম্বনে কার্য্য করিয়া ইঁহারা ইহাদের কারবারকে খুব ফাঁপাইয়া তুলিয়াছেন। ইহারা প্রথমে কাগজের কল খুলিয়াছিলেন। কিন্তু ব্যবসায় চালাইতে গিয়া দেখিলেন যে, চিঠির কাগজ, লেফাফা প্রভৃতি দরকার, অমনি কল আনাইয়া সে সমুদয় প্রস্তুত করিবারও কারখানা খুলিয়া বসিলেন। বাঙ্গালীদিগের মধ্যে দেখিয়াছি, ফৌজদারি বালাখানার সুপ্রসিদ্ধ কবিরাজ ৺বিনোদলাল সেন মহাশয়ের মাথায় স্বভাবতই এই প্রকার বুদ্ধি আসিয়াছিল। তাই তিনি কবিরাজী ঔষধাদি প্রস্তুত করিবার জন্য যে সমস্ত গাছগাছড়া দরকার, তাহার জন্য পরের উপর, বেদিয়া ও বেনেদের উপর নির্ভর করিতে অনিচ্ছুক হইয়া লিলুয়াতে একখণ্ড জমি ক্রয় করিয়া ঐসমস্ত গাছগাছড়া আজ্ঞাইবার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ব্যবসায়ে কৃতকার্য্য হইবার মন্ত্রটী ধরিয়াছিলেন ঠিক, কিন্তু দুঃখের বিষয়, অকালে তাঁহার মৃত্যু হওয়াতে তিনি ঐ মন্ত্রের সফলতা দেখাইতে পারিলেন না।

ষ্টেশনে।

ষ্টেশন সম্বন্ধে হাবড়া ষ্টেশনই হইল আমাদের আদর্শ। সেই আদর্শ হৃদয়ে ধরিয়া বম্বে গিয়াছিলাম। ভাবিয়াছিলাম, হাবড়া অপেক্ষা সেখানে লোকের ভিড় দেখিব—হয়তো লোকের ভিড়ের মধ্যে আমি আপনাকেই হারাইয়া ফেলিব। ট্রেণ হইতে নামিয়া দেখি, লোকসমাগম হাবড়ার সিকিও নয়। অনেকের নিকট শুনিয়াছিলাম এবং সেই শোনা কথার উপর মনে মনে ঠিক করিয়া রাখিয়াছিলাম—ষ্টেশনে এ-হোটেল ও-হোটেল কত হোটেলেরই প্রদর্শক বা guideএর দল ঘুরিবে ফিরিবে, এবং তীর্থের পাণ্ডারা যেমন তীর্থযাত্রীকে ধরিয়া টানাটানি ছেঁড়াছেঁড়ি করে, এখানেও বুঝি আমার অদৃষ্টে সেই প্রকার একটা কিছু ঘটিবে। সে প্রকার একটা কিছু ঘটিলে তো সুবিধা হইত—যাহাকে হোক একজন কাহাকেও ধরিয়া একটা কোন হোটেলে উঠিয়া পড়িতাম। প্রাণের ভিতর যে এতটুকু ভয় হয় নাই যে, প্রদর্শক বলিয়া কাহার হাতে নিজেকে সমর্পণ করিয়া প্রাণটা হারাইব তাহাও বলিতে পারি না। তবে ঠিক করিয়াছিলাম, অজানা বিভূঁইয়ে যাইতেছি, তকমাধারী বা কোন প্রকার নিদর্শনধারী প্রদর্শক পাইলে তাহারই সাহায্যে একটা ভাল হোটেলের সন্ধান করিয়া লইব। কিন্তু কা কস্য পরিবেদনা—কোথায় বা কে—একটী প্রদর্শকেরও তো শুভদর্শন লাভের সুযোগ ঘটিল না। অবশেষে এদিকে ওদিকে দেখিতে দেখিতে এক প্রদর্শক আসিয়া হাতে এক সিন্ধি বা সিন্ধুদেশবাসী পরিচালিত হোটেলের বিজ্ঞাপন দিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিল যে ঐ হোটেলে যাইব কি না—হোটেলটী নাকি বড় ভাল। আমি যাইতে স্বীকার করিলাম।

হোটেলের সন্ধানে।

একটা ট্যাক্সি ভাড়া করা গেল। ট্যাক্সিতে মালপত্র উঠানো গেল। আমি ও খানসামা এবং প্রদর্শক, আমরা তিনজনে উঠিলাম। হোটেলটী ষ্টেশন হইতে বেশী দূর

নয়। মিনিট দশ-পনেরোর মধ্যে হোটেলে পৌঁছানো গেল। ট্যাক্সির নম্বর দেখিয়া রাখিলাম। মালপত্র তাহাতে রাখিয়া আমরা তিনজনে উপরে উঠিয়া দেখিতে গেলাম। আরে রাম! দেখিয়াই বোঝা গেল, ইহা নিতান্তই "দেশী" হোটেল—উঠিবার মুখেই সিঁড়ির পাশের দেওয়াল তো পানের পিকে চিত্রিত-বিচিত্রিত। আর চারিধার হইতে একটা জলীয় ভেপ্‌সা গন্ধ বাহির হইতেছে। যাই হোক, সেই গন্ধ ভেদ করিয়া উপরে উঠিলাম। সম্মুখেই দেখি, সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘর অর্থাৎ আলো ও বাতাসের ঘর দুইটী বাঙ্গালী দখল করিতেছেন। আর একটী ভাল ঘর অপর একজন দখল করিয়াছেন। বাকী ঘরগুলি কেমন একপ্রকার ঘুপসি অন্ধকারে ঢাকা। আর অধিক দেখিবার ইচ্ছাও হইল না, এবং ইহার বিষয়ে আর অধিক বর্ণনা করিবারও ইচ্ছা নাই। এই হোটেলের সকলের ব্যবহারের জন্য একটীমাত্র পায়খানা ও একটীমাত্র স্নানের ঘর। আমার অবশ্য কয়েকদিনের জন্য বম্বে গিয়া কোন প্রকার বম্বেটিয়া রোগ আনয়নের ইচ্ছা ছিল না। তাই হোটেলের মালিক সমস্ত সুবিধা করিয়া দিতে স্বীকার করিলেও এবং আমাকে বারম্বার থাকিতে অনুরোধ করিলেও আমি বাহিরে আসিয়া হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। ইহার ভাড়া অবশ্য খুবই কম ছিল—মাত্র পাঁচ টাকা দৈনিক।

বাহিরে আসিয়া ভাল হোটেলের কথা প্রদর্শককে জিজ্ঞাসা করাতে সে তাজমহল প্রভৃতি কয়েকটা বড় বড় হোটেলের নাম করিয়া গেল এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের দৈনিক ভাড়া, কাহারও বা ২৫৲, কাহারও বা ১৫৲ বলিয়া গেল। আমি এত ভাড়ার কথা জানিতাম না, সুতরাং তাহার উপযুক্ত টাকাকড়িও সঙ্গে লইয়া যাই নাই। আমি প্রদর্শককে বলিলাম, অত লাট-বেলাটের হোটেলে যাইতে আমি প্রস্তুত নই—আন্দাজ দৈনিক ১০৲ টাকা পর্য্যন্ত আমি ভাড়া দিতে পারি। তখন প্রদর্শক আমাকে এক ফিরিঙ্গীর হোটেলে লইয়া গেল। এখানকার দৈনিক ভাড়া ৭৲ টাকা বটে, কিন্তু সিদ্ধি হোটেলেও অসুবিধা যাহা ছিল, এখানে তাহার কোনটীরই অভাব ছিল না। তবে উহারই মধ্যে সিদ্ধি হোটেল অপেক্ষা এখানে উপরের চাকচিক্য ও পরিপাটী ভাব ছিল। ঢুকিবার সিঁড়িটা মারবেল পাথরের এবং সম্মুখের এক টুকরা খোলা জায়গা টবের গাছ দিয়া একটু সাজানো। আমি দেখিয়া শুনিয়া নামিয়া আসিলে ট্যাক্সিচালক আমাকে এক মুসলমানচালিত হোটেলের সন্ধান দিল। কলিকাতার দৃষ্টান্তে আমি ভাবিলাম, সেখানে বুঝি অনেক ঝোল্লা পোষাকধারী মুসলমান ও কাবলীওয়ালা থাকে এবং কোপ্তা কোর্ম্মার শ্রাদ্ধ করে। ইহা ভাবিয়া আমি সেখানে যাইতে অস্বীকার করিলাম। তখন ট্যাক্সিচালক এক পার্শি হোটেলের সন্ধান দিল। আমি সেইখানেই লইয়া যাইতে বলিলাম। প্রদর্শকটী এইখানেই আমাদের নিকট বিদায় গ্রহণ করিল। ট্যাক্সি চলিল—থামিতেই চাহে না। মাইলের পর মাইল চলিয়া তবে সেই হোটেলে পৌঁছানো গেল। অন্যান্য দুই এক স্থানের পার্শি হোটেলে থাকিয়া দেখিয়াছি যে তাহাদের ব্যবস্থা সুন্দর। বাহির হইতে দেখিয়া শুনিয়া এই হোটেলটীও ভালই মনে হইল—তদুপরি ইহার ভাড়াও শুনিলাম দৈনিক ৭৲ টাকা। ষ্টেশন হইতে অনেক দূর বলিয়া মনে একটু কিন্তু হইতে লাগিল। যাই হোক, একটু আশা হইল, ভাল হোটেল পাইলাম, এবং অনেক পার্শির সহিত আলাপপরিচয় হইবে। অনেকগুলি রুমালে খোঁপা-ঢাকা ও আদ্দির কামিজপরা পার্শি মহিলা বাহিরে ছিলেন—আমাকে একদৃষ্টে চাহিয়া দেখিতে লাগিলেন। হোটেলের ম্যানেজার আসিলেন, তাঁহাকে বলিলাম যে আমি বিদেশী ও বঙ্গদেশ হইতে আসিয়াছি। তিনি দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিলেন যে, এই হোটেলের নিয়ম অনুসারে এখানে কোন পুরুষ বা কোন স্ত্রীলোক একক থাকিতে পারিবেন না—এখানে যাত্রীগণ সপরিবারে থাকিতে পারেন। এই নিয়মটী আমার মন্দ লাগিল না। ইহার ফলে হোটেলে বকামি বা বদমায়েসি প্রভৃতির সম্ভাবনা সহজে আসিতে পারে না। তখন জিজ্ঞাসা করাতে সেই ম্যানেজার আমাকে ঐ মুসলমানের হোটেলের সন্ধান দিল এবং বলিল হোটেলটী ভাল, সেখানে সাহেবসুবা ও ভদ্রলোক থাকে। ট্যাক্সি-চালক তখন আমাকে আবার মাইলের পর মাইল ফিরাইয়া আনিয়া সেই মুসলমানের হোটেলে উপস্থিত করিল। ও মা—এ যে সেই সিদ্ধি হোটেল হইতে দুই পা মাত্র। ভিতরে গিয়া দেখি, সব ঘরগুলিতেই আলো ও বাতাস যথেষ্ট পরিমাণে প্রবেশ করিতেছে। আমার বেশ পছন্দ হইল। হোটেলের ম্যানেজার আমাকে রাস্তার উপরেই দোতলায় একটী ঘর দিলেন। সেই ঘরে দুইটী খাট ছিল; কিন্তু আমি যে কয়দিন সেখানে ছিলাম, আমার ঘরে ভাগীদার আর কেহই আসে নাই—I was the monarch of all I surveyed। ভাড়া দৈনিক ৭৲ টাকা। বম্বের সুপ্রসিদ্ধ ক্রফোর্ড মার্কেট নামক বাজারের সম্মুখে—বেশ খোলা জায়গার উপর অবস্থিত। মালপত্র উপরে উঠাইয়া ঘরে রাখিয়া কিছু-দিনের জন্য এখন নিশ্চিন্ত হওয়া গেল। হোটেলের সন্ধানে ট্যাক্সি ভাড়াতেই আমার সাড়ে চার টাকা লাগিয়া গেল।

হোটেলে।

দুই বেলা চা-রুটী, তন্মধ্যে প্রাতে অতিরিক্ত একটী

ডিম; বেলা ১।।১২টায় উপবাস-ভঞ্জন এবং রাত্রি ৮।৯ টায় রাত্রি-ভোজন, এই চারিবার খাবার দেওয়া এই হোটেলের ব্যবস্থা। দুই বেলার চা-রুটী তোমার কামরায় লোক দিয়া যাইবে—তাহার জন্য অতিরিক্ত কিছুই লাগিবে না। কিন্তু অপর দুইটী পাকা খাওয়ার বন্দোবস্ত তোমার নিজের কামরায় করিতে গেলে তাহার জন্য প্রতিবার অতিরিক্ত এক টাকা করিয়া দিতে হয়। কাজেই প্রতিদিন অতিরিক্ত দুই টাকা দিতে অনিচ্ছুক হইয়া সুখের সঙ্গে নির্জ্জনে আহারের সুখটুকু পরিত্যাগ করিলাম। উপবাসভঞ্জন এবং রাত্রি-ভোজন আমাকে একতলায় নামিয়া আসিয়া সাধারণ ভোজনগৃহেই নিষ্পন্ন করিতে হইত। এখানে খাবার যেটুকু দিত, সেটুকু কিছু খারাপ দিত না; কিন্তু খাবার খুবই অল্প দিত। তাহাতে আমার মত স্বল্পাহারীর উদরপূর্ত্তির কিছুই অভাব হইত না, কিন্তু বম্বেপ্রবাসী ভোজনপটু বিদেশীর পক্ষে তাহা যথেষ্ট হইত কিনা সন্দেহ। বেঙ্গলনাগপুর লাইনের উপর ষ্টেশনহোটেলে যে প্রকার খাবার দেয়, এখানেও সেই প্রকার খাবার দেওয়া হয়—অন্তত তাহার বেশী দেওয়া হয় না। প্রথম দিন চায়ের জন্য খানসামাকে চার আনা পয়সা দিলাম। সে নীচে গিয়া চাকরদের সঙ্গে চা খাইয়া আসিল। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম, কি রকম খাওয়া দিল? সে বলিল, পয়সাই বেশী লয়, খাবার কিছুই দেয় না। ইতিমধ্যে সে বাজার ঘুরিয়া আসিয়া বলিল, বাজারে বেশ ভাল খাবার দেয়। তদবধি আমি তাহাকে পয়সা দিতাম, সে বাজার হইতে চা-রুটী, কোপ্তা কোর্ম্মা ও ভাত খাইয়া নিরবধি আনন্দে নিমগ্ন ছিল। আমার উপবাসভঞ্জন হইত, সুপ, আলুর চপ, দুই টুকরা মটন চপ এবং পুডিং খাইয়া। পাছে কাহারও প্রসাদী খাদ্য কিছু দেয়, এই কারণে ভোজনগৃহে আহার প্রস্তুত হইবার সন্ধান লইয়া সর্ব্বপ্রথম উপস্থিত হইতাম। আহারের প্রধান অংশের পর পাঁউরুটী ও ফলের মধ্যে কদলী ও মাখন দেওয়া হইত। আমি এইগুলিরই সাহায্যে পেট একপ্রকার ভরাইয়া লইতাম।

সহরের বহিরাকৃতি।

আমরা বাল্যকালে একটা শ্লোকের চরণ শুনিতাম,—বড় বড় থাম, ভিতরে কিন্তু কুছ নেই কাম। বম্বে সহর সম্বন্ধে কতকটা যেন সেই রকম ধারণা সঙ্গে আনিয়াছি। কলিকাতায় বসিয়া লোকমুখে শুনিতাম, কাগজে পড়িতাম—ক্রফোর্ড মার্কেট, ক্রফোর্ড মার্কেট। আমাদের কলিকাতায় যেমন হগসাহেবের বাজার বা নিউ মার্কেটের নাম, বম্বেতে সেই প্রকার ক্রফোর্ড মার্কেটের নাম। কিন্তু নিউ মার্কেটের ভিড়ের সঙ্গে ক্রফোর্ড মার্কেটের ভিড়ের তুলনাই হয় না। বাহির হইতে কিন্তু নিউমার্কেট অপেক্ষা ক্রফোর্ড মার্কেট দেখিতে বড়—বড় বড় পাথরের দেওয়াল। আমি একবার খানসামাকে ক্রফোর্ড মার্কেট হইতে কমলা লেবু আনিতে বলিলাম; সে ঘুরিয়া আসিয়া বলিল—পাওয়া গেল না। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম, মার্কেট কি রকম? সে বলিল তেমন কিছুই পাওয়া যায় না, হগসাহেবের বাজারের সঙ্গে উহার তুলনাই হয় না। রাস্তাগুলি খুব দীর্ঘ চলিয়াছে—ট্রাম বা মোটরে চলিতে বেশ আরাম আছে। রাস্তায় দেশীয় বা বিলাতী কুকুর এবং ভিক্ষুকের একান্ত অভাব দেখিলাম।

মাঝে মাঝে ট্যাক্সি করিয়া কয়েকজন বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ করিতে গেলাম। দেখি, সহরের অধিকাংশ বাড়ীই বাগান-বাড়ীর মত—এলাহাবাদে যেরূপ দেখিয়াছিলাম, বম্বেতে অনেকটা সেইরূপ দেখিলাম। বড় বড় পাথরের নির্ম্মিত বাড়ী, আর তাহার চারিপার্শ্বে বাগান। বন্ধুবান্ধবের ছেলেমেয়েদের মধ্যে দেখি, বিলাতী-ভাব ও ঢং কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রবেশ করিয়াছে।

ট্রামগাড়ী।

এখানে একটা লক্ষ্য করিলাম—রাস্তায় চলাচল নিয়মিত করিবার জন্য হাতবাড়ানো পুলিসের তেমন জুলুম নাই—গাড়োয়ান, ট্রামচালক, ট্যাক্সিচালক, সকলেই আপনাপন গন্তব্যপথ ঠিক করিয়া লইতেছে। জুলুম না থাকিবার কারণ বোধ হয়, এখানে কলিকাতার ন্যায় পথিক বা গাড়ী-ঘোড়ার তেমন ভিড় নাই। কলিকাতায় অনেক সময়ে ট্রামগাড়ীর কল্যাণে ভিড় বাধিয়া যায়—অনেক সময়ে ট্রামচালকেরা বেপরোয়া ভাবে চালায়, অযথাস্থানে গাড়ী থামায়, আর গাড়ী-ঘোড়ার ভিড় জমিয়া যায়। কলিকাতার ট্রামচালকেরা জানে যে, তাহারা মস্ত এক সাহেব কোম্পানীর চাকর, তাহাদের দোষ সাত খুন মাপ ইত্যাদি! কিন্তু বম্বেতে শুনিলাম, ট্রাম সমস্তই মিউনিসিপ্যালিটির; কাজেই ট্রাম-চালকেরা জানে যে, তাহারা সাধারণত বম্বেবাসীর অধীন। পূর্ব্বে যে সমস্ত ট্রামগাড়ী ছিল, সেগুলি সাদা রং দেওয়া, যেন অশৌচের পোষাক পরা বা জরাজীর্ণ রক্তহীন বৃদ্ধ কেহ চলিয়াছে। ১৯২৭ হইতে যে সমস্ত গাড়ী নির্ম্মিত হইতেছে, সেগুলিতে লাল রং দেওয়া হইতেছে—দেখিয়া তবু মনে হয়, যেন কোন নবযুবক রক্তবস্ত্র পরিহিত হইয়া ছুটিয়া চলিয়াছে।

পাহারাওয়ালা।

বম্বের পুলিসের পোষাক দেখিলে বলিহারি দিতে ইচ্ছা হয়। দেখিলে মনে হয়—যেন যাত্রার সং। মাথায় পেয়াদা বা বরকন্দাজী ধরণের কালো পাগড়ী, গায়ে একটা কালো কোট এবং একটা কালো আধা প্যাণ্ট, পায়ে একটা ছিন্ন জুতা (হিন্দুস্থানী ধরণের)। হয়তো এই

বর্ণনা হইতে পুলিসের সং-চেহারা বিশেষ কিছু বোঝা যাইবে না। উহার সংস্থ বুঝিতে গেলে চক্ষে দেখিতে হইবে। আমি তো প্রথম দেখিয়া বুঝিতেই পারি নাই যে, এই সকল মহাত্মারা পুলিসের কনষ্টেবল মহাপ্রভু। কলিকাতা, বঙ্গদেশ, বিহার, উড়িষ্যা ও উত্তরপশ্চিমাঞ্চল অনেক স্থানের কনষ্টেবল দেখিয়াছি—তাহাদের পোষাকে চালচলনে, ভাবভঙ্গিতে অন্য যাহাই হৌক না কেন, একটা বীরত্বব্যঞ্জক ও গাম্ভীর্য্যব্যঞ্জক ভাব দেখা যায়। কিন্তু বম্বে পুলিসের মধ্যে তাহার সম্পূর্ণ অভাব দেখিলাম।

ইংরাজ ও মাড়োয়াড়ি।

কলিকাতাবাসী বম্বে গেলে একটা বিষয় তাঁহার দৃষ্টিতে না পড়িয়া থাকিতে পারে না। এখানে ইংরাজের দবদবানি এবং মাড়োয়াড়িদিগের টাকার গরমে বুক ফুলাইয়া চলা দেখা যায় না। শুনিলাম, কোথায় একটু দূরে মাড়োয়াড়িদের একটা আড্ডা আছে। আমি যে কয়দিন ছিলাম, তাহার মধ্যে একটীও মাড়োয়াড়িকে রাস্তায় চলাফেরা করিতে দেখি নাই। কলিকাতায় দেখি, হোয়াইটওয়ে লেডল কি একটা মস্ত রাজপ্রাসাদই না চৌরঙ্গীর বুকের উপর বসাইয়াছে। বম্বেতে যাও—দেখিবে, ঐ কোম্পানির একটা ছোট্ট দোতলা বাড়ী; নীচের তলায় দোকান, উপরের তলা দেখিয়া মনে হইল, সাহেব-বিবিদিগকে ভাড়া দেওয়া হয়। বম্বেতে ইংরাজ ও মাড়োয়াড়ির গর্ব্ব খর্ব্ব দেখিয়া প্রাণটা যেন কিছু শান্তি পায়। সম্ভবত সেখানে জমির দাম ও ভাড়া বড় বেশী বলিয়া উহাঁরা বড় বড় দোকান ফাঁদিবার তেমন সুবিধা করিতে পারেন না। আমার একটী বন্ধু বলিলেন—এখানে আর কোন কথা নাই—টাকা, টাকা, টাকা; এখানে কেল কড়ি মাখ তেল। আমিও অনেক পূর্ব্বে শুনিয়াছিলাম যে, বম্বেতে কাঠা হিসাবে জমির মূল্য স্থির না হইয়া ইঞ্চি হিসাবে দাম ধরা হয়! অবশ্য এখন, জমির মূল্য লইয়া ব্যোমফট (landboom) খেলা হইবার পর অবধি কলিকাতা সম্বন্ধেও ঐ কথা বলা যাইতে পারে।

Veiled lady

হোটেলে দেখি, একটী ভদ্রমহিলা, খুব লম্বা চৌড়া, মুসলমানী ধরণের ঘাঘরা ও জ্যাকেটের উপর ওড়না পরিয়া ক্রমাগত যাওয়া-আসা করিতেছেন। তাঁহার মুখ একটা রেশমী অবগুণ্ঠনে ঢাকা। তাঁহার সমস্ত কাপড় ঘোর চকলেট রংয়ে রাঙ্গানো, কাজেই সেই অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়া তাঁহার মুখ দেখিবার বড় একটা সুবিধা হয় নাই। অনুসন্ধানে জানিলাম, বোম্বাই লাটের নিকট কি একটা প্রাপ্য টাকার সম্বন্ধে দরখাস্ত করিবার জন্য দুই একজন সাঙ্গোপাঙ্গ লইয়া নিজামী হায়দরাবাদ হইতে তিনি আসিয়াছেন। তাঁহার থাকিবার ঘর তিনি কার্পেট পাতাইয়া ও কোচ প্রভৃতি দ্বারা সাজাইয়া লইয়াছেন। তেমন তেমন যদি কোন উপন্যাসলেখক এখানে থাকিতেন, তবে তিনি কল্পনাবলে ইঁহাকে অবলম্বন করিয়া অবগুণ্ঠিতা বা veiled lady নাম দিয়া সুন্দর একখানি উপন্যাস রচনা করিয়া ফেলিতেন নিঃসন্দেহ।

বম্বেমহিলা।

বম্বেতে সাধারণত সকল স্ত্রীলোকই অবাধে রাস্তা দিয়া চলাফেরা করেন। স্ত্রীলোকদিগের ভিতর পার্শি-রমণী এবং মহারাষ্ট্রীয় বা ভাটিয়া রমণীদিগেরই সংখ্যাবাহুল্য দেখা যায়। বঙ্গমহিলাও ছিটেফোঁটা দেখা যায়। ইংরাজপুরুষদিগের ন্যায় ইংরাজরমণীও অনুপাতে খুবই কম দেখিলাম। পার্শি রমণীদিগের পোষাক সাড়ী বাদে আর সমস্তই মেমদিগের নিকটে ধার করা—ঐ কাঁধ পর্য্যন্ত হাতকাটা জ্যাকেট, কারণ উহা মেমদিগের ফ্যাশন হইয়াছে; ঐ রুক্ষ কেশ—তাঁহারা জোর করিয়া যেন আপনাদিগকে শুকং কাষ্ঠং করিয়া দাঁড় করাইবার চেষ্টায় আছেন। তাঁহারা যদি মনে করেন, ইহার ফলে তাঁহাদিগের সৌন্দর্য্য বাড়িয়া উঠিবে, সেটা তাঁহাদের ভুল—অন্তত আমাদের মত বাঙ্গালীর চক্ষে তো তাহা সৌন্দর্য্য বলিয়া লাগিবে না। মহারাষ্ট্রীয় প্রভৃতি ঐ দেশীয় স্ত্রীলোকদিগের বিশেষত্ব এই যে, তাঁহারা সাড়ী কাছা দিয়া পরেন। বম্বে অঞ্চলে একটা প্রবাদ আছে শোনা যায় যে, বম্বেবাসীদের মধ্যে একটা সাধারণ বিশ্বাস আছে এই যে, বয়স্থ ও বিবাহিত রমণীগণ কাছা দিয়া কাপড় না পরিয়া পানীয় জল প্রদান করিলে তাহা অশুদ্ধ বলিয়া অব্যবহার্য্য। সম্ভবত, মহারাষ্ট্রীয়দের সঙ্গে যখন মুসলমানদিগের লড়াই প্রবল আকার ধারণ করিয়াছিল, তখন নিজেদের মান ইজ্জৎ বজায় রাখিবার জন্য ঐ অঞ্চলের হিন্দুরমণীদিগকে লড়াইয়ে স্বামীসঙ্গে যাইবার জন্য অথবা মুহূর্ত্তের বিজ্ঞাপনে বা নোটিসে এক স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিবার জন্য সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকিতে হইত; সময়ে প্রয়োজনমত অশ্বারোহণেও চলাফেরা করিতে হইত। এই প্রকার কার্য্যের জন্য ঘাঘরার অনুরূপে পরিহিত সাড়ী বা ঘাঘরা পরা অপেক্ষা কাছা দিয়া সাড়ী পরা বিশেষ উপযোগী। উহা হইতেই সম্ভবত বম্বেমহিলাদের কাছা-দেওয়া সাড়ী পরিবার রীতি প্রচলিত হইয়াছে। আমার চক্ষে তো উহা বিশেষ মন্দ লাগিল না। কিন্তু আমার খানসামা সাহেবের চক্ষে উহা বড়ই বিসদৃশ লাগিয়াছিল।

বন্ধগাড়ীর অভাব।

এখানে স্ত্রীলোকেরাও যখন স্বাধীনভাবে অবাধে চলাফেরা করেন, তখন বলা বাহুল্য, এখানে আফিসগাড়ীর মত বন্ধগাড়ীর প্রয়োজনই অনুভূত হয় না। তাই বোধ

হয় কলিকাতার মত বন্ধগাড়ী এখানে একখানিও দেখিতে পাইলাম না। ঠিকাগাড়ী-পর্য্যন্ত সমস্তই ফীটন-গাড়ী। দুই একটা ল্যাণ্ডো বা মোটরগাড়ীতে দেখি, জানালাগুলি চীনে পরদা দিয়া ঢাকা দেওয়া—সম্ভবত তাহার ভিতরে কোন মুসলমান সম্ভ্রান্ত ঘরের মহিলা ছিলেন। ভাবিলাম—হায়! এখনও তোমরা তুরস্কের দৃষ্টান্ত হৃদ্গত করিতে পার নাই।

আপলো বন্দর।

একদিন অ্যাপলো বন্দর দেখিতে গেলাম। সেই বন্দরের উপরেই আমার এক বন্ধু ছিলেন, তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমাকে বন্দরটা দেখাইলেন। অ্যাপলো বন্দর—অ্যাপলো বন্দর! এই তোমার অ্যাপলো বন্দর! সমুদ্রের একরত্তি ঢেউ নেই—যেন একটা প্রকাণ্ড ঝিল। উহা অপেক্ষা আমাদের খিদিরপুরের ডক অনেক ভাল—সে ডকে যেন তবু একটা জীবন আছে; আর এই বন্দরে জীবনের বিশেষ কোনই চিহ্ন দেখিলাম না। সম্মুখে অবশ্য অজন্তা গুহার পর্ব্বত-মালা। বন্ধুবর জিজ্ঞাসা করিলেন, কেমন দৃশ্য? আমি দৃশ্য হিসাবে বন্ধুর মতে সায় দিয়া অবশ্য বলিলাম যে সুন্দর দৃশ্য। কিন্তু মনে মনে বলিলাম, বন্দরটীকে দেখিয়া খুব যে একটা তৃপ্তি পাইবার আশা করিয়াছিলাম, তাহা হইল না।

বাড়ীমুখে।

এই প্রকারে কয়েকদিন বম্বেতে কাটাইয়া বাড়ীমুখো হইবার ব্যবস্থা করিলাম। দিন পনেরো সেখানে থাকিয়া বম্বের যাহা কিছু দেখিবার আছে, সমস্ত দেখিয়া আমার বাড়ী ফিরিবার ইচ্ছা ছিল। কিন্তু সে সাধে বাদ পড়িল—অজন্তাগুহা প্রভৃতি আর এযাত্রায় দেখা হইল না। ঐ যে খাসিয়া মহিলাটী আমার সহযাত্রী ছিলেন, তাঁহার স্বামী যখন নাগপুরে তাঁহাকে নামাইয়া লইতে-ছিলেন, তখন তাঁহাকে নিখিলভারত রেল-কর্ম্মচারী-দিগের ধর্ম্মঘট কবে হইতে পারে জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, কয়েকদিনের ভিতরেই হওয়া বা না হওয়া স্থির হইবে। আমি ভাবিলাম, তিনি যখন ডাকবিভাগের একজন উচ্চপদস্থ কর্ম্মচারী, তখন এবিষয়ে সমস্ত ঠিক সম্বাদ রাখেন। কাজেই আমি আর বম্বেতে বেশীদিন থাকিতে সাহস করিলাম না—সেখানে আটকাইয়া গেলে আমার কলিকাতার কাজকর্ম্ম সমস্তই নষ্ট হইয়া যাইবে—একবার ধর্ম্মঘট হইলে কে জানে তাহা কতদিন চলিবে। এই সকল ভাবিয়া উপবাসভঙ্গের প্রাতরাশ আহার করিয়া রেলগাড়ীতে উঠিলাম। গাড়ীতে বসিয়া আছি, এক হকার বম্বেতে প্রস্তুত বিস্কুট বিক্রয়ার্থ আনিল। স্বদেশী ভাবে উদ্বুদ্ধপ্রাণে বড়ই আনন্দিত হইয়া এক প্যাকেট বিস্কুট কিনিলাম। একখানির একটুকরো মুখে দিয়া বাকী অংশ আর মুখে দেওয়া দরকার বোধ হইল না—সম্মুখে একটা ক্ষুধিত কুকুর আমার দিকে চাহিয়া প্রসাদ ভিক্ষা করিতেছিল, আমি তাহাকে বাকীটুকু দিলাম। যদি কোন বিস্কুটকে কুক্কুরবিস্কুট বা dogbiscuit বলিতে হয়, তবে ইহাকেই বলা উচিত। বিস্কুটকারক সঙ্গতি রক্ষার জন্য বোধ হয় ইহার নাম দিয়াছেন "nice" বা সুন্দর। গাড়ীতে আরও দুএকটী সহযাত্রী উঠিলেন—অল্প দূর পর্য্যন্ত সঙ্গ গ্রহণ করিবেন। একটী উকীল। ইংরাজীতে কথা কহিলেন, কিন্তু উচ্চারণ একটু বিসদৃশ—orderকে অর্ডার না বলিয়া একটু আড়ভাবে আর্ডার বলিবেন। সাধারণত পশ্চিম-বাঙ্গালী যে প্রকার ইংরাজী বিশুদ্ধ উচ্চারণ করিতে পারেন, ভারতের অন্যান্য অংশের অধিকাংশ অধিবাসী বোধহয় সেরূপ পারে না। নাগপুরে যখন আসিলাম, তখন ছয়টী কমলালেবু কিনিলাম এবং তাহার উপরেই নির্ভর করিয়া একেবারে একটানায় হাবড়া ষ্টেশনে উপস্থিত এবং হাবড়া হইতে একেবারে গৃহে—সকলেই অবাক—আমি কাহাকেও খবর দিই নাই। আমার বন্ধু নাতিবাবু তো দেখিয়াই লম্ফঝম্ফ। ভগবানকে নমস্কার করিয়া—তাঁহাকে শতকোটি নমস্কার করিয়া এই উড়ো-যাত্রা সমাপ্ত করিলাম।

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

গান্ধারী—তেতালা।

মোর প্রাণ মন ভরি' পূজিব তোমায়—
এস সজ্জিত সুন্দর মনমন্দিরে হে।
পূজি প্রেম ফুলে হে লও তাহে তুলে,
শোক দুঃখ জ্বালা যাব আনন্দে ভুলে—
সদানন্দ পিয়া রহিব ভোর
প্রাণ মন ভরি' পূজিব।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

° ১ ২´ ৩
{মা মা। মা পমা পা র্সা। গা দা পা -া I মা পা মজ্ঞজ্ঞা -া। ঋসরা -া}
মো র প্রা ০০ ণ ম ন ভ রি ০ পূ জি ব ০০ ০ ০০০

। -া রমপদা। (-া -া)। ণা -া পদা মপা। মজ্ঞা -া জ্ঞা জ্ঞা I
• ত্তো••• • • • • •• • মা য়্ এ স

I জ্ঞা -া রা সা। র্রা ন্া সা নসা। -া রমা মা মা। পা পা মপা দদা।
স • জ্জি ত সু • ন্দ র • ম • ন ম ন্দি রে হে• ••

I পদা ণণা দণা র্সর্সা। ণদা পমা জ্ঞা মপা। দা মা পা র্সা। ণা দা পা দমা I
•• •• •• •• •• •• • মোর প্রা • ণ ম ন ভ রি •

I মা পা মজ্ঞা -া। রসরা -া II
পূ জি ব • ••• •

[র্সর্রা র্সনা]
মা মা পা পা। মা পা পদা -া। দণা র্সা র্সা র্সা। র্সর্রা র্সনা র্সা -া।
পূ জি প্রে ম ফু লে হে • ল• ও তা হে ভু• •• লে •

। ণদা দা ণা র্সা। র্জ্ঞা র্রা র্সা র্সা I ণা র্সা ণর্সঋা র্সা। ণা দা পা -া।
শো ক দু খ জ্বা লা যা ব আ ন •• ন্দে ভু • লে •

। পা র্জ্ঞা -া র্জ্ঞা। র্রা র্সর্রা র্সনা র্সা I -া মা পা দা। র্সা -া -া -া।
স দা • ন • ন্দ• পি• য়া • র হি ব ভো • • র্

। মা পমা পা র্সা। ণা দা পা দা I মা পা মজ্ঞজ্ঞা -া। মসরা -া মা মা IIII
প্রা •• ণ ম ন ভ রি • পূ জি ব•• • •• • মো র

অন্তরার তান।

র্সদা -া দণা র্সর্রা। র্জ্ঞা -া র্রা -র্জ্ঞা I র্সা -া র্রর্সা র্রণা। -া দা পদা দমা।
লও তাহে ভুলে • • • •• •• • • • • • •• •• • • • • ••

। মা মা পা পা।
পূ জি প্রে ম ইত্যাদি

I মপা দণা র্সর্রা ণা। র্সা ণা দা মা।
ফুলে হে •• •• •• • • • • • পূজি প্রেম ফুলে হে ইত্যাদি

I ণসা রমা পদা মপা। দা মপা দণা র্সা। র্রা ণা র্সা র্সা। ণা দা দা পা I
মোর প্রাণ মন ভরি মো• •• •• র• •প্রা• •• • • • • ণ ম ন ভ রি

পূজিব তোমায় ইত্যাদি।

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রাণ মন সঁপিনু তোমার পদে অন্তর্যামী
তোমা নাথ যেই চাহে তাহে দাও অচল শরণ।
তব প্রথম তেজ দেব অসংখ্য ভুবন সৃজিল ;
সকল পাপ অজ্ঞান দূরিল প্রীতি তব দেব সুঘন।
গাহিছে গুণ অশেষ সুর মানব, দেবেশ! তব
অন্ত কেহ নাহি পায়।
চিত্তে দাও ভক্তি অচল ; দাও হে কৃপা আনন্দ—
নাহি কিছু যাচি আর ; তুমি মোর হে দারিদ্র্যহরণ।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীবাণীদেবী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
I দা -া। -া পমা। পা -া। মা -া। জ্ঞা মজ্ঞজ্ঞা। -া : ঋঃ I সা ঋা।
প্রা ০ ০ ণ ম ন ০ সঁ ০ পি নু ০ ০ ০ তো মা ০

০ ২ ০ ৩ ৪ ॥ ১´ ০
। মা দা। -া পা। পমা জ্ঞা। জ্ঞরা মজ্ঞা। ঋা সা I সা -া। দা -া।
র প ০ দে অ ০ ন্ত ০ র্যা ০ মী তো ০ মা ০

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। দা পা। মা পদা। পদা র্সা। -াণ র্সা I ণাঃ দঃ। পা ণা। দা পা।
না থ যে ই ০ চা ০ হে তা ০ হে দা ০ ও

০ ৩ ৪
। পা দা। মা পা। মজ্ঞা মা I
অ চ ল শ র ণ

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I দা -া। পদা ণা। র্সা র্সা। র্ঋা -া। র্ঋণা র্সা। -া র্সা I
ত ০ ব প্র থ ম তে ০ জ ০ দে ০ ব

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I র্জ্ঞা -া। র্জ্ঞর্রা র্মর্জ্ঞা। -াঃ র্মঃ। র্জ্ঞা -া। র্ঋা র্ঋণা। র্সা র্সা I
অ ০ সং ০ খ্য ০ ভু ব ০ ন সৃ ০ জি ল

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I দা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা র্জ্ঞা। র্জ্ঞা র্জ্ঞর্রা। র্মর্জ্ঞর্জ্ঞা -া। র্ঋা র্ঋর্সা। র্সা র্সা I
স ক ল পা প অ ০ জ্ঞা ০ ০ ০ ন দূ ০ রি ল

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
I ণা -া। দা পা। দা র্সা। ণপা পদা। মা পা। মজ্ঞা মা II
প্রী ০ তি ত ০ ব দে ০ ০ ব সু ঘ ন

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
[সা -া]
{I ণ্া সা। জ্ঞা মা। পা পা। দা দা। মা পা। -া পা I মা -া।
গা ০ হি ছে গু ণ অ শে ষ সু ০ র মা ০

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
। পা দা । -াঃ মঃ । পা জ্ঞা । জ্ঞরা মজ্ঞা । ঋা সা I ণ্া -া ।
ন ব ০ দে বে ০ শ ০ ত ০ ব অ ০

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। দ্া ণ্া । সা ণসা । ণ্া -া । দ্া ণদ্া । -া প্া I } I দা -া । দা ণা ।
স্ত কে ০ হ না ০ হি পা ০ য় চি ০ ত্তে দা

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
। -র্সা র্সা । র্ঋা -া । র্ঋা ণা । র্সা র্সা I র্সজ্ঞা -া । র্জ্ঞরা র্মর্জ্ঞর্জ্ঞা ।
০ ও ভ ০ ক্তি অ চ ল দা ০ ০ ও ০ হে ০ ০

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
। -াঃ র্মঃ । র্জ্ঞা র্ঋা । র্ঋা র্জ্ঞর্ঋা । -া র্সা I দা র্জ্ঞা । র্জ্ঞরা র্জ্ঞা । -া র্জ্ঞর্মা ।
০ কৃ পা ০ আ ন ০ ন্দ না ০ হি ০ কি ০ ছু

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। র্মর্জ্ঞা -া । র্ঋা র্ঋা । র্সা -া I ণা ণা । দা পা । ণা -া । পা দা ।
যা ০ চি আ র ০ তু মি মো র হে ০ দা রি

৩ ৪
। মা পা । জ্ঞা মা IIII
দ্র্য হ র ণ

খৃষ্টধর্ম্মে প্রাচ্য ভাব।

(শ্রীরমানাথ পালিত।)

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের লীলাকানন এসিয়া মহাভূমিতেই একদিন ধর্ম্মের অভ্যুদয় হইয়াছিল। এই প্রাচ্য দেশেই ধর্ম্মের দুন্দুভি বাজিয়াছিল, এবং উহার জীমূতমন্দ্রে সমগ্র প্রাচ্য জগৎ মুখরিত হইয়াছিল। খৃষ্টধর্ম্ম ও উহার প্রাচ্য-ভাব-প্রসিদ্ধ-তত্ত্বকথা একদিন বালারুণের ন্যায় মানবের প্রবৃত্তিচালিত প্রাণে সঞ্জীবনী সুধা ঢালিয়া দিয়াছিল। তাই খৃষ্টধর্ম্ম আপন মহিমময়ী প্রভায় পাশ্চাত্য জগতকেও একদিন বিভাসিত করিয়া তুলিয়াছিল। এই প্রাচ্যভাব খৃষ্টধর্ম্মে আজ যেন নিভিয়া গিয়াছে। ইহার কারণ কি? বিদেশীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকগণ আমাদের দেশে ধর্ম্মপ্রচার কার্য্যে আসিয়া আমাদের দেশের ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি ও দার্শনিক তত্ত্ব উপলব্ধি করিতে না পারিয়া ইহাদিগকে অযথা নিন্দায় বিশেষণে বিশেষিত করিতে আরম্ভ করেন। তাঁহাদের দেশের বিপ্রতিপন্ন ধর্ম্মভাব, ধর্ম্মনীতি, সামাজিক প্রথা প্রাচ্যের খৃষ্টধর্ম্মের সহিত মিলন সাধন করিবার প্রয়াস পান এবং তাঁহাদের সেই প্রয়াস কিয়দংশে কার্য্যেও পরিণত হইয়াছিল। তাই এই সকল বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতবাসীদিগের অধ্যাত্মপ্রবণভাব ও জাতীয় অনুরাগ আকর্ষণ করিতে সমর্থ হন নাই। এই অধ্যাত্মভাব ও জাতীয় অনুরাগের জন্যই ভারতবাসী চিরপ্রসিদ্ধ। খৃষ্টধর্ম্ম যদি কোন দিন সমগ্র ভারতবাসীর বিশ্বাস আকর্ষণ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে খৃষ্টধর্ম্মরূপ বিটপীর চতুষ্পার্শ্বে যে সমস্ত বিদেশীয় আবর্জ্জনা স্তূপীকৃত হইয়াছে, সেগুলিকে প্রথমে উপেক্ষার জলন্ত চুল্লীতে ফেলিয়া দিতে হইবে; তাহা না হইলে খৃষ্টধর্ম্মের ধর্ম্মসঙ্ঘ সংগঠন করে আমরা কিছুতেই সমর্থ হইব না। খৃষ্টের জ্যোতির্ম্ময়ী মূর্ত্তি প্রাচ্যের ভক্তিকুঙ্কুমে যখন আরও মাধুরীবিমণ্ডিতা হয়, তখন আমার হৃদয়তন্ত্রী যেন শত মূর্চ্ছনায় বাজিয়া উঠে। আমি ভক্তিভরে অমনি তাঁহার রক্তোৎপল-বিনিন্দিত চরণে লুটাইয়া পড়ি। জাতীয়ভাবই জাতীয় সাধনাকে সিদ্ধির পথে উদ্বোধিত করিয়া তুলে। হিন্দুদিগের ধর্ম্মেই জাতীয় ভাব প্রবুদ্ধ হইয়া উঠে। এই জাতীয়ভাব বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচার দ্বারা কখন অক্ষুণ্ণ থাকিতে পারে না।

বিদেশীয় ধর্ম্মপ্রচারকগণ ভারতবাসীদিগের ধর্ম্ম-স্রোতের ধারা নিরূপণ করিতে না পারিয়া ভারতবর্ষের

ধর্মভাব বুঝিয়া উঠিতে পারেন নাই। ধর্মের ভাবাত্মক চিন্তারাশিই মানবের ধর্মজীবনকে উদ্বোধিত করিয়া রাখে। খৃষ্টধর্মে প্রাচ্যভাব আজ যেন ম্রিয়মাণ হইয়া পড়িয়াছে। তাই ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম আপন মহিমা বিস্তার করিতে অসমর্থ। ভারতবর্ষ চিরদিনই ভাবের ভিখারী ও দার্শনিক চিন্তার কেন্দ্রভূমি। তাই ছিন্ন-কন্থা-সম্বল, কৌপীনধারী, পর্ণকুটীরবাসী, বর্ণ-জ্ঞান-বিবর্জ্জিত দীনাদপি দীন কৃষকও ভাবমার্গের পথিক। যে দেশের মনীষা-সম্পন্ন ব্রাহ্মণসম্প্রদায় বহুযুগ ধরিয়া ভারতবর্ষের মহিমময় জ্ঞানের অত্যুচ্চ শিখরে অধিরোহণ করিয়া এই দেশকে নিবৃত্তির পথে লইয়া গিয়াছেন, সে দেশ এই নবযুগের নব-মন্ত্রের দিনে স্বাধীন চিন্তার দ্বারাই চালিত হইবে।

খৃষ্ট এই এসিয়ার মাটিতেই জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। এই মহাদেশের রজোরাশি তাঁহার বিমলাঙ্গে বিভূতির ন্যায় বিভাসিত হইয়াছিল। তাঁহার শিষ্যগণও এই মহাদেশের বিমানতলে বসিয়া একদিন নিবৃত্তির মোহন সঙ্গীতে মানবজীবনকে ধর্মপথে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিয়াছিলেন, যে ভারতবর্ষের মূলমন্ত্র "নেতি নেতি", যে ভারতবর্ষ ভোগসুখ-লালসা পরিহার করিয়া চিরদিন অধ্যাত্মতত্ত্বান্বেষণকে জীবনের গরিষ্ঠ সাধনা বলিয়া মনে করিত, সে ভারতবর্ষে বিদেশীয় ভাবের দ্বারা ধর্মপ্রচার করিতে যাওয়া বাতুলতা মাত্র। খৃষ্টধর্ম এই এসিয়া মহাদেশেই সংবৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। যখন আমার মনে হয়, খৃষ্ট এই প্রাচ্য দেশেই সমুদ্ভূত তখন তাঁহার প্রতি আমার প্রেম-ধারা শতধা উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। আমাদের প্রাচ্য চিন্তা ও প্রাচ্যভাবের সহিত খৃষ্টের তত্ত্বকথার সমধিক সামঞ্জস্য দেখিতে পাই। খৃষ্ট যে সকল উপদেশমূলক অমৃতময়ী বাণী উচ্চারিত করিয়াছিলেন, সেগুলি কি প্রাচ্যভাবে পরিপুষ্ট নহে? বিহগ-কাকলী-মুখরিতা, তমাল-পিয়াল-অরণ্যানী-সুশোভিতা হাস্যময়ী প্রকৃতি চিরদিনই ভারতের কাছে ভাবের কথা কহিয়াছে, তাই ভারতবাসী আজ ভাবের ভিখারী।

খৃষ্ট যে সকল প্রাকৃতিক দৃশ্যের বর্ণনা করিয়াছেন, যে সকল সামাজিক আচার ব্যবহারের কথা বলিয়াছেন, সেগুলি কি আমরা বিদেশীয় ধর্মপ্রচারকদিগের অপেক্ষা অধিকতর উত্তমরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে পারি না? আমি যখনই খৃষ্টের কথা ভাবি, তখনই আমার মনে হয়, তিনি যে শুধু আপনার মনুষ্যত্বের মহত্বে গরীয়ান তাহা নহে, তিনি এসিয়ার স্বভাবসিদ্ধ চরিত্র-মাধুর্য্যেও মহীয়ান্। স্বার্থান্ধ! অন্ধবিশ্বাসী! খৃষ্টের ত্যাগের মহিমাময় গৈরিক দীপ্তিতে আজ ভারতের কল্যাণপথ উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছে,—প্রবৃত্তির চাপল্য-বিভ্রান্ত হইয়া আর অসার ভোগবাদের প্রলাপ বকিও না; ভারতে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে প্রয়াসী হইলে তোমাকে এই ত্যাগের মন্ত্রে দীক্ষিত হইয়া দারিদ্র্যের ঝুলি বহন করিতে হইবে। ঐশ্বর্য্যের রাজসিক ঝলকে ধর্ম প্রচার হয় না। ভারতের ধর্মভাব চিরদিনই ত্যাগ ও দারিদ্র্যের আদর্শে গরীয়ান। ভারতবর্ষে খৃষ্টধর্ম প্রচার করিতে হইলে এই প্রাচ্যভাবের ভিতর দিয়া লোকশিক্ষা দিতে হইবে। প্রাচ্যের ভাবোদ্দীপক চিন্তাই খৃষ্টধর্মের মূলমন্ত্র। এসিয়া মহাভূমির ভাববাদীগণ ভাবসমাহিত অবস্থায় প্রকৃতির আবরণ ভেদ করিয়া দেখিতেন, সমগ্র জগৎ ব্রহ্মসত্তায় পরিপূর্ণ। এসিয়ার চিরমাধুর্য্যময়ী প্রকৃতি মানবের ভৌতিক দেহের উপর আপন আধিপত্য বিস্তার করিতে না পারিয়া তাহার আত্মাকে পরমাত্মার সহিত যেন মিশাইয়া রাখিত। জোরস্তর অত্যুচ্চ মহীধরশিখরে বসিয়া ভগবানের অনন্তরূপ চিন্তা করিতেন, আর্য্যাবর্ত্তের আর্য্যঋষিগণ বিমল নদী-সৈকতে বসিয়া দেখিতেন, ভগবানের রূপ স্রোতস্বিনীর উচ্ছ্বসিত তরঙ্গের সহিত ভাসিয়া যাইতেছে। ঋগ্বেদের ভাবরসাত্মক বিমোহন সঙ্গীত, উপনিষদের তত্ত্বকথা, ডেভিডের মর্মস্পর্শিনী গাথা, কি প্রাচ্যের ভাবতত্ত্বের অধিগত নহে? ভারতকে তাহার উপযুক্ত আধ্যাত্মিক অধিকারে প্রতিষ্ঠিত করিবার সুমহান প্রয়াস বাঙ্গলা দেশের বক্ষেই প্রথমে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল; এবং সেই অসমাপ্ত কার্য্য পুনরায় নবোদ্যমে আরম্ভ করিবার জন্য আমাদিগকে আজ খৃষ্ট পুনঃ পুনঃ আহ্বান করিতেছেন। অতএব, যে শ্রদ্ধায়, যে নিষ্ঠায়, যে আত্মবিসর্জ্জনে সেই মহান্ ব্রত উদ্‌যাপিত হইবে, তাহাতে যেন আজ উদ্যত ও প্রস্তুত হইয়া থাকি।

খৃষ্ট জন্মিবার পূর্ব্বে ও পরে যে সকল মহাপুরুষের আবির্ভাব হইয়াছিল, তাঁহারা সকলেই ভাববাদী ছিলেন। তিনিও এই ভাববাদের দেশে জন্মগ্রহণ করিয়া ভক্তি ও প্রেমের পরাকাষ্ঠা দেখাইয়া গিয়াছেন। তাঁহার কোন শিষ্য তুরীয়ানন্দের কথা বলিয়াছিলেন—খৃষ্ট সেই ভূমানন্দের স্থান আপনার অন্তরাত্মার প্রতি নির্দ্দেশ করিয়া ভূমানন্দের রাজ্য দেখাইয়াছিলেন। ইহাই ত শুদ্ধ-সত্ত্ব-ভাববাদ। তিনি ভৌতিক দেহ ধারণ করিয়া থাকিতেন সত্য, কিন্তু তাঁহার অন্তরাত্মা ভগবানের ভূমানন্দে বিভোর থাকিত। তিনি এই ভৌতিক জগতে প্রেম ও আধ্যাত্মিকতার অনন্ত লীলা দেখিতেন। চিত্তবৃত্তিকে নিরোধ করিবার জন্য তাঁহার অনশন ব্রতাবলম্বন, মাঙ্গলিক কার্য্যানুষ্ঠানের পূর্ব্বে তীর্থে অবগাহন, এগুলি কি প্রাচ্যের অনুষ্ঠান নহে? ভারতবর্ষই ভাবজগতের সম্রাট। আধ্যাত্ম-তত্ত্বের চিন্তাই ভারতের কর্ম্মাধিকার। ভোগ-সুখ-রত পাশ্চাত্য মনীষিগণ প্রাচ্যের অধ্যাত্মভাব কোন দিনই বুঝিতে সমর্থ হইবেন না, কারণ তাঁহারা

ভৌতিক দেহের অভ্যন্তরে যে জীবাত্মা বর্ত্তমান, একথা উপলব্ধি করিতে পারেন না। তাঁহারা কোন দিনই ভারতে খৃষ্টের প্রাচ্যভাব প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইবেন না।

এখন দেখা যাক্, কি উপায়ে ভারতের ভিন্ন ভিন্ন জাতিকে একসূত্রে গাঁথিয়া এক মহান জাতি গঠন করিয়া তুলিতে পারি। ভারতে এই জাতিগঠন সম্পর্কে ভারতের রাজনৈতিক অধিনায়কগণ কতই যে জল্পনা কল্পনা করিতেছেন, তাহার ইয়ত্তা নাই। এই জাতিগঠন বিষয় উল্লেখ করিয়া অধ্যাপক রুদ্র মহাশয় বলেন—

"A great Indian Church based on the idealism of the East is needed to form a great Indian nation. The acceptance of the Living Person of Christ does not mean the acceptance of the foreign ideals and jurisdiction of the West. It is the Eastern Christ whom India needs—Christ the fountain-head of idealism; and India would go direct to the Fountain-head, not further down the stream where human controversies have disturbed the clear waters. India will form her own Church and express Christ in her own terms. We claim our Christian independence—the same Christian liberty which St. John acknowledged. The Indian Church of the future must embrace not only every race in India, but also the higher religious instincts of the people. The great heritage of the Indian past must also be conserved."

প্রাচ্যের ভাববাদরূপ ভিত্তির উপর ভারতের মণ্ডলী গড়িয়া তুলিতে হইবে; কারণ ইহাই জাতীয় সমাহার সম্বন্ধে সহায়তা করিবে। খৃষ্টের প্রাণময় সত্তাকে গ্রহণ করা অর্থে কখন বুঝায় না যে আমাদিগকে বিদেশীয় আদর্শ ও পাশ্চাত্য শাসনকর্তৃত্ব মানিয়া লইতে হইবে। ভারতবর্ষ প্রাচ্য ভাববাদের খৃষ্টকে গ্রহণাভিলাষী। ভারত খৃষ্টের ভাব-তত্ত্বের সহিত আজ মিশিয়া যাইতে চাহে। ভারত আজ ভাবগঙ্গার বহু দূরে গিয়া যেখানে স্বচ্ছতোয়া ভাগীরথী মানবের বিবিধ তর্করূপ পঙ্কের সহিত মিশিয়া আবিলতা প্রাপ্ত হইয়াছে, সেখানে মিশিয়া যাইতে চাহে না। ভারত আপনার স্বতন্ত্র মণ্ডলী-গঠনপ্রয়াসী এবং খৃষ্টকে আপনার ভাবকথায় পরিব্যক্ত করিতে চাহে। যে স্বাধীনতা সেণ্ট জন স্বীকার করিয়াছিলেন, আমরা আজ সেই খৃষ্টীয় স্বাধীনতার দাবী করিতেছি। ভারতের ভবিষ্য মণ্ডলী শুধু যে ভারতের বিভিন্ন জাতিকে ধর্ম্মের একতায় বাঁধিয়া রাখিবে তাহা নহে; কিন্তু তাহাদের উচ্চতম ধর্ম্মবৃত্তিগুলিকে খৃষ্টধর্ম্মের সহিত একেবারে মিশাইয়া দিতে হইবে, আর ভারতবর্ষের বিগত গৌরবের মহত্ত্ব সজীব রাখিতে হইবে।

এখন একটু বিচার করিয়া দেখিতে হইবে, খ্রীষ্ট-ধর্ম্মের মধ্য হইতে প্রাচ্য চিন্তা কি প্রকারে বিলুপ্ত হইয়াছে। দ্বিতীয় শতাব্দীর শেষাংশে আমাদের আদিম মণ্ডলীর জ্ঞানপন্থী লোকদিগের সহিত জ্ঞানবিরোধী লোকদিগের ধর্ম্মসংক্রান্ত বিষয়দ্বন্দ্ব উপস্থিত হয়। আলেকজেন্দ্রিয়া এই দ্বন্দ্বের কেন্দ্রস্থল। একদল Gnostics আর একদল the mass of Christians। যাঁহারা ধর্ম্মের তত্ত্বকথা ব্যাখ্যা করিতেন তাঁহারাই Gnostic বলিয়া অভিহিত ছিলেন। আর তৎকালীন খ্রীষ্টান্ সমাজের নিম্নশ্রেণীর লোকদিগকে mass of Christians বলা হইত। তত্ত্বজ্ঞানী অধ্যাপকসম্প্রদায় মণ্ডলীর মধ্যে প্রাচ্যের তত্ত্বকথা বুঝাইবার জন্য যত্নশীল হইতেন। তাঁহারা বেশ বুঝিতেন, মণ্ডলীর মধ্যে প্রাচ্য চিন্তার ভাব উদ্বুদ্ধ করিয়া না রাখিলে মণ্ডলী সজীব থাকিতে পারিবে না। ভেলন্‌টিনাস্ বলিয়া একজন ধর্ম্মপ্রাণ ধীমান্ Pistis Sophia নাম দিয়া তত্ত্বজ্ঞান-সম্পন্ন একটী পুস্তক রচনা করেন। এই পুস্তকখানি খ্রীষ্টীয় ভাববাদের কথায় পরিপূর্ণ। মিড্ সাহেব এই পুস্তক ইংরাজিতে অনুবাদ করিয়াছেন। তিনি এই পুস্তকের উপক্রমণিকায় বলেন, প্রায় ১৫০শ শতাব্দীর শেষাংশে খৃষ্টসম্বন্ধীয় মৌলিক (original) উপদেশ বা তাঁহার কার্য্য-কলাপ লিপিবদ্ধ না থাকায় লোপপ্রাপ্ত হয়। ইহার কিছুকাল পরে, কিম্বদন্তীর উপর নির্ভর করিয়া তাঁহার উপদেশ ও বিধি-বিধানগুলি একত্র করিয়া সুসমাচার আখ্যায় আখ্যায়িত করা হয়। এই নূতন ধর্ম্মের তরঙ্গ জুসদিগের কিম্বদন্তীরূপ সাগর হইতে উত্থিত হইয়া খৃষ্টধর্ম্মের সার্ব্বজনীন ভাবকে বিনষ্ট করিয়া ফেলে। নবধর্ম্মের এইরূপ গতি দেখিয়া মণ্ডলীর তত্ত্বজ্ঞানী-সম্প্রদায় ইহাতে খৃষ্টধর্ম্মের অনিষ্ট সাধন হইতে পারে ভাবিয়া ভীত হইলেন। তখন তাঁহারা নব ধর্ম্মের এই বিপরীত স্রোতের ধারাকে ব্যাহত করিবার প্রয়াস পাইলেন। দুঃখের বিষয়, তাঁহাদের উদ্যম কার্য্যে পরিণত হয় নাই। তত্ত্বজ্ঞানী ও নিম্নশ্রেণীর খৃষ্টানদিগের সহিত কিয়ৎকাল ধরিয়া এই প্রকার ধর্ম্ম-দ্বন্দ্ব চলিতে থাকে; অবশেষে তত্ত্বজ্ঞানীর তত্ত্বকথাকে ভ্রান্তশিক্ষা বলিয়া মণ্ডলীর মধ্য হইতে নিরাকরণ করিয়া দেওয়া হয়। তখন হইতে মণ্ডলীর মধ্যে প্রাচ্য ভাব একেবারে বিলুপ্ত হইয়া পড়ে। আদিম মণ্ডলীর ঋষিতুল্য ধর্ম্মের

অধিনায়কগণ (Fathers of the early Church), যাঁহারা আবহমানকাল মণ্ডলীর মধ্যে যজন-যাজনা করিতেন, তাঁহাদের ধর্ম্মোপদেশ খৃষ্টান সম্প্রদায় ক্রমশঃ বিস্মৃত হইতে লাগিলেন। এই সকল ধর্ম্মপ্রাণ তত্ত্বজ্ঞানী মণ্ডলী ত্যাগ করিয়া সন্ন্যাস-আশ্রমে আশ্রমগুরু হইয়া প্রাচ্যের তত্ত্বকথা ও প্রাচ্যের চিন্তানুশীলন করিয়া জীবন যাপন করিতে আরম্ভ করেন ; তাই কখন কখন রোমান কাথলিকদিগের মধ্যে দার্শনিক পণ্ডিতের আবির্ভাব দেখিতে পাই।

ইয়োরোপে এই তমোগুণের যুগে প্রাচ্য মণ্ডলীর ধর্ম্ম-শিক্ষাগুলি বিদেশীয় ভাবের পেষণীতে নিষ্পেষিত করিয়া বিবেক ও জ্ঞানের বিরুদ্ধে সেইগুলি মণ্ডলীর লৌকিক শিক্ষা বলিয়া ব্যাখ্যাত হইত! এই সময় হইতে খৃষ্টধর্ম্মের অধঃপতন আরম্ভ হয়। ভগবানের কৃপায় আবার আজ এই নবযুগের দিনে খৃষ্টমণ্ডলীর মধ্যে ভোগ-লালসা-বিরত একদল নিষ্ঠাবান তত্ত্বজ্ঞানীর আবির্ভাব হইয়াছে, তাঁহারা আবার আমাদের মণ্ডলীকে বিদেশীয় পিশুনের কবল হইতে উদ্ধার করিয়া চিরশোভাময় ফুলসাজে সাজাইয়া রাখিতে প্রয়াসী। প্রাচ্যভাবকে মণ্ডলীর মধ্যে উদ্বুদ্ধ রাখিবার জন্য এখন দুইটী বিষয়ের আবশ্যকতা দেখিতে পাই। প্রথমটি খৃষ্টান্ ও বিধর্ম্মীর একত্র পঠনপাঠনা। দ্বিতীয়টি মণ্ডলীর মধ্যে স্বজাতীয় লোকের নেতৃত্ব। প্রাচীনকালে মণ্ডলী কখনও খৃষ্টানদিগের জন্যই বিদ্যালয় স্থাপনা করিত না। রোমসাম্রাজ্যের বিদ্যালয়সমূহে খৃষ্টান ও বিধর্ম্মী একত্র পঠনপাঠনা করিত। যতদিন খৃষ্টান ভারতবর্ষে শিক্ষাপ্রণালীর এইরূপ সমীকরণ বর্ত্তমান থাকিবে, ততদিন মণ্ডলীর সমূহ মঙ্গল। শিক্ষায় খৃষ্টান ও বিধর্ম্মীর সমযোগ মণ্ডলীর জীবনকে সজীব করিয়া রাখিবে। প্রাচ্যভাব খৃষ্টধর্ম্মে অক্ষুণ্ণ রাখিতে হইলে খৃষ্টান্ বিদ্যালয়সমূহে খৃষ্টান ও বিধর্ম্মীর একত্র পঠনপাঠনা অত্যাবশ্যক। দ্বিতীয়তঃ, যাহাতে বিদেশীয় সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মপ্রচারকগণ আমাদের প্রাচ্যমণ্ডলীর উপর প্রভুত্ব করিতে না পারেন, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হইবে। তাঁহাদের সঙ্কীর্ণ চিত্তের বিদেশীয় শিক্ষা মণ্ডলীর হন্ত্রী। মণ্ডলীর মধ্যে স্বজাতীয় লোকের নেতৃত্ব অত্যাবশ্যক। সেণ্ট পল যখন ভিন্ন ভিন্ন দেশে মণ্ডলী স্থাপনা করিয়াছিলেন, তখন মণ্ডলীর কর্ত্তৃত্ব-ভার স্বজাতীয় লোকের হস্তেই ন্যস্ত করিয়াছিলেন। আজ আমাদের মণ্ডলীর মধ্যে বিদেশীয় ভাব প্রবেশ করিয়াছে; যদি কোন শিক্ষিত ব্রাহ্মণসন্তান খৃষ্টধর্ম্মে দীক্ষিত হন, তাহা হইলে তাঁহার জীবনে আমরা সে আধ্যাত্মিকতার পরিস্ফুরণ দেখিতে পাই না, যাহা আমরা একদিন পলের জীবনে দেখিয়াছিলাম। ভারতীয় খৃষ্টধর্ম্ম ভবিষ্যতে কি আকার ধারণ করিবে, মণ্ডলীর মধ্যে ভারতের যুগযুগান্তরের সভ্যতা কি প্রকারে মিশিয়া থাকিবে, তাহা আমরা এখন বলিতে পারি না। তবে আমার মনে হয়, প্রাচ্যের ভক্তি ও ভাববাদের সংমিশ্রণে যে খৃষ্টধর্ম্মের অভ্যুদয় হইবে, তাহা এক নূতন খৃষ্টান্ জাতি গঠন করিয়া তুলিবে। সেই জাতি খৃষ্টকে প্রাচ্যের তত্ত্বকথায় জগতের কাছে ঘোষণা করিবে ও দেশ দেশান্তর হইতে মনীষিগণ আমাদের কাছে খৃষ্টের মহিমময় জ্ঞানের কথা শুনিতে আসিবেন। *

সাত্ম্য ও পথ্য।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

প্রাচীন মূলগ্রন্থে এবং নিবন্ধাদিতে শিষ্টতণ্ডুল ভক্ষণের নিন্দাবাদ দৃষ্ট হয় না। দেশবিশেষের অনাচার নানা গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। উদ্বাহচন্দ্রালোকে দেশবিশেষের অনাচারবোধক কয়েকটি বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। যথা,—বৃহস্পতি :—

"উদ্বহ্যতে দাক্ষিণাত্যৈ র্মাতুলস্য সুতা দ্বিজৈঃ।
মৎস্যাদাশ্চ নরাঃ পূর্ব্বে ব্যভিচাররতাঃ স্ত্রিয়ঃ॥
উত্তরে মদ্যপাশ্চৈব স্পৃশ্যা নৃণাং রজস্বলা।
সজাতাশ্চাপি গৃহ্ণন্তি ভ্রাতৃভার্য্যামভর্ত্তৃকাম্॥
সর্ব্বদেশেষনাচারো রথ্যাতাম্বূলচর্ব্বণম্।
অনেন কর্ম্মণানৈতে প্রায়শ্চিত্তদমাবহাঃ॥

অর্থ—দাক্ষিণাত্য দ্বিজগণ মাতুলের কন্যা বিবাহ করে। পূর্ব্বদেশবাসী মানবগণ (ব্রহ্মদেশবাসিগণ) মৎস্যভোজনশীল, এবং তদ্দেশবাসী নারীগণ ব্যভিচাররত। উত্তরদেশবাসি-(হিমালয়প্রান্তবাসী) গণ মদ্যপানশীল এবং তাহারা রজস্বলাকে স্পর্শ করিয়া থাকে। সে দেশে সহোদর ভ্রাতারাও বিধবা ভ্রাতৃবধূকে গ্রহণ করে। রাস্তায় গমন সময়ে তাম্বূলচর্ব্বণ সমস্ত দেশেরই অনাচার। এই সকল কর্ম্মের দ্বারা ইহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ এবং রাজদণ্ডদায়ী হয় না। অনিরুদ্ধ ভট্ট হারলতার শেষভাগে অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে, এই জন্যই প্রাচ্য দাক্ষিণাত্য উদীচ্যদিগের পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত অনাচারবিশেষগুলির উল্লেখ করিয়া বৃহস্পতি বলিয়াছেন যে, এই সকল কর্ম্মের দ্বারা ইহারা প্রায়শ্চিত্তার্হ বা রাজদণ্ডার্হ হয় না। কিন্তু

---

* এই প্রবন্ধটী একটী চিন্তাশীল খৃষ্টানের লিখিত। ইহাতে প্রকাশ পাইতেছে যে, বর্ত্তমানে বঙ্গদেশে খৃষ্টানদিগেরও মধ্যে কি প্রকার অসাম্প্রদায়িকতার দিকে অগ্রসর হইবার ভাব প্রকাশ পাইতেছে; ইহা দেখাইবার জন্যই অল্পবিস্তর খৃষ্টপ্রীতি প্রকাশ পাইলেও প্রবন্ধটী গ্রহণ করিলাম। ভাঃ সং

ইহারা বিহিতের অকরণ এবং নিষিদ্ধের আচরণ করে; তন্নিবন্ধন, রাজা ইহাদিগকে গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত অর্থ প্রদান করিয়া অবশিষ্ট সমস্ত সম্পত্তি গ্রহণ করিবেন। কারণ চিরপ্রচলিত আচরণের বাধা দিবার চেষ্টা কর্ত্তব্য নহে। সেইরূপ চেষ্টা করিলে প্রজাবর্গের সংক্ষোভ উপস্থিত হইতে পারে। *

দেশবিশেষের অনাচারসম্বন্ধে এইরূপ অনেক কথা নানাশাস্ত্রে আলোচিত হইয়াছে। কিন্তু সিদ্ধান্নের ব্যবহাররূপ অনাচার উদ্‌ঘাটিত হয় নাই, প্রত্যুত সমর্থিতই হইয়াছে।

এমন কি, হিন্দুর পূজা প্রভৃতি কার্য্যের অঙ্গ অধিবাস-কার্য্যেও অনেক বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের বাড়ীতে সিদ্ধান্ন ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহাকে অনাচার বলিবার উপায় নাই। কারণ স্মরণাতীত কাল হইতে এই প্রথা চলিয়া আসিতেছে। কর্ম্মকাণ্ডোপযোগী বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যাকর্ত্তা গৌড়ীয় ব্রাহ্মণ রামকৃষ্ণ অধিবাসনমন্ত্র ব্যাখ্যাপ্রসঙ্গে মন্ত্র-কৌমুদীগ্রন্থে সিদ্ধান্নকে অধিবাসনের অন্যতম উপকরণ বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। যথা—

"মহী গন্ধঃ শিলা ধান্যং দূর্ব্বা পুষ্পং ফলং দধি।
ঘৃতং স্বস্তিক-সিন্দূরং শঙ্খঃ কজ্জল-রোচনে॥
সিদ্ধান্নং কাঞ্চনং রূপ্যং তাম্র-সিদ্ধার্থ-দর্পণম্।
দীপো বাস্তং † সমস্তঞ্চ দ্রব্যমেৎ সমালভেৎ॥
অধিবাসেষু সর্ব্বেষু বিধিরেষ প্রকীর্ত্তিতঃ॥"

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য প্রভৃতি সম্মত পাঠ—

"সিদ্ধার্থঃ কাঞ্চনং রূপ্যং তাম্র-চামর-দর্পণং।"

তাঁহাদের মতে সিদ্ধান্নের পরিবর্ত্তে চামরের ব্যবহার। বাঙ্গলায় দুই মতেরই আদর দেখা যায়। গৌড়ীয় আচার এবং গৌড়ীয় গ্রন্থকারের মত উপেক্ষিত হইবার যোগ্য নহে। সভ্যপদবী-সমারূঢ় মানবদিগের মনে রাখা উচিত যে, গৌড়-সম্রাটের ধর্ম্মাধ্যক্ষ হলায়ুধই প্রথম কর্ম্মোচিত বেদমন্ত্রের ব্যাখ্যা করিয়াছিলেন। এই ঘটনা সায়ন-মাধব জন্মের বহু পূর্ব্বে হইয়াছিল। দেশান্তরীয় গ্রন্থ-কারগণও অনুকূলে প্রতিকূলে গৌড়ীয় মতের উল্লেখ করিয়াছেন।

অদ্বৈতসিদ্ধির টীকাকার ব্রহ্মানন্দ আত্মনামে গৌড়ীয় বিশেষণ যুক্ত করিয়া গৌরবানুভব করিয়াছেন। সুতরাং অধুনা হৃতসর্ব্বস্ব হৃতগৌরব গৌড়ের সহিত সর্ব্বসমৃদ্ধ গৌড়ের তুলনা হইতে পারে না। সে যুগের আচার এবং শাস্ত্রমতও উপেক্ষণীয় নহে।

কৌমুদীকার সামবেদীয় অন্নপ্রাশনের মন্ত্রটি অধিবাসনে সিদ্ধান্নের মন্ত্ররূপে গ্রহণ করিয়াছেন। যথা—

অন্নপতে অন্নস্য নো দেহ্যনমীবস্য শুষ্মিনঃ।
প্রদাতারং তারিষউর্জ্জং নো ধেহি দ্বিপদে শং চতুষ্পদে॥

এই মন্ত্রের রামকৃষ্ণাভিমত অর্থ—হে অন্নপতে! হে প্রজাপতে! তুমি আমাদের দোষরহিত বলকর রসাদিযুক্ত অন্নদাতাকে ভালরূপে পোষণ কর। এই প্রার্থনার অভিপ্রায়—যদি অন্নদাতা সুখে অবস্থান করে, তবেই অন্নদান করিয়া থাকে। অপিচ তুমি আমাদিগকে তারণ কর। আমাদের দ্বিপদে (মনুষ্যে) এবং চতুষ্পদে (গবাদি পশুতে) শুভ বল অর্পণ কর।

এখানে প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য এই যে প্রদর্শিত মন্ত্রটির যথেষ্ট পাঠভেদ এবং তদনুসারে ব্যাখ্যাভেদ আছে। উবটাদির ব্যাখ্যা এবং অভিমত পাঠ অপেক্ষা রামকৃষ্ণের ব্যাখ্যা সমীচীন।

এখানে একটি বিশেষ সমস্যা আছে।

সিদ্ধান্নের ব্যবহার-সমর্থক প্রমাণাবলী সত্ত্বেও বাঙ্গালার বাহিরে এবং অভ্যন্তরেও নানাস্থানে ইহার প্রতি নর-নারীর যথেষ্ট অমেধ্যতা বোধ রহিয়াছে। আমাদের দেশে বিধবাগণ স্নানের পর সিদ্ধান্ন স্পর্শ করিলে পুনরায় স্নান করিয়া থাকেন। বিশিষ্ট ব্রাহ্মণের মধ্যে পূর্ব্বে অনেকেই উপনয়নের পর সিদ্ধান্ন ব্যবহার করিতেন না। কোন সামাজিক ভোজে অথবা সিধাপত্রে সিদ্ধান্ন ব্যবহার অদ্যাপি হয় না। কিন্তু ক্রমে রুচির পরিবর্ত্তন হইতেছে। বর্ত্তমান সময়ে দেখা যায়, অনেকেই আতপান্ন সহ্য করিতে পারেন না। কিন্তু স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে স্মরণাতীত কাল হইতেই সিদ্ধান্ন ভোজন প্রচলিত আছে। শাস্ত্রানুসারে সিদ্ধান্ন দুষ্ট না হইলেও অতি প্রাচীন কাল হইতেই যে কতক লোক ইহাকে অশুদ্ধ মনে করিত, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় প্রভৃতির সমর্থন হইতেই তাহা বুঝিতে পারা যায়। কারণ যদি উহা নির্ব্বিবাদে সমাজে চলিত থাকিত, তবে আর সমর্থনের জন্য প্রয়াস পাইতে হইত না। রঘুনন্দনের পরবর্ত্তী গ্রন্থকারও উহার সমর্থক নূতন প্রমাণ প্রদর্শন করিয়াছেন। শম্ভুনাথ মিত্র নামক নিবন্ধকার বর্ষভাস্কর গ্রন্থে লিখিয়াছেন,—"হবিষ্যেঽস্বিন্ন-ধান্যোপাদানাদন্যদা স্বিন্নধান্যতণ্ডুলাদিভোজনেন দোষঃ। অতএব স্মৃতিঃ—

---

* অতএব প্রাচ্য-দাক্ষিণাত্যোদীচ্যদেশ-ব্যবস্থিতানাচার-বিশেষানুবাহৃত্য বৃহস্পতিনোক্তং :—

"অনেন কর্ম্মণা নৈতে প্রায়শ্চিত্ত-দমাবহাঃ।
বিহিতাচরণাৎ কিন্তু প্রতিষিদ্ধনিষেবনাৎ।
ভক্তাচ্ছাদং প্রদায়ৈষাং শেষং গৃহ্নীত পার্থিবঃ॥"

ইতি মহ: নিষিদ্ধক্রিয়া-নিবৃত্তি হেতু প্রায়শ্চিত্তদণ্ডৌ তৎ পরম্পরাপ্রাপ্তানাচার-করণেন কার্য্যৌ, তাদৃশানাচারস্য নিবর্ত্তনে প্রজানাং ক্ষোভপ্রসঙ্গাৎ। অতস্তাদৃশমনাচারমনুপাল্য স্বকুটুম্বভক্তাচ্ছাদনাদধিকং সর্ব্বস্বং নৃপতিনাগ্রাহ্যমিত্যুক্তম্।

ম। পু। ২১২। পৃ।

† দীপঃ প্রশস্তিপাত্রঞ্চ। পাঠান্তর।

"হরিদ্রা গোরসং ধান্যং পুনঃ পাকেন শুধ্যতি। পুনঃপাকঃ সূর্য্যাতপাদিনা তাদবস্থ্যম্।"

ইহার অর্থ—হবিষ্যে অস্বিন্নধান্যের উপদেশ আছে; অতএব অন্যত্র স্বিন্নধান্যতণ্ডুলাদি-ভোজনে দোষ নাই। এই হেতুই স্মৃতি বলিয়াছেন হরিদ্রা, গোরস (দুগ্ধ), এবং ধান্য পুনঃপাকের দ্বারা শুদ্ধ হইয়া থাকে। একবার সিদ্ধ হইলে পুনরায় সূর্য্য কিরণ প্রভৃতির দ্বারা পূর্ব্বাবস্থা প্রাপ্ত হওয়ার নামই পুনঃপাক।

এমন অনেক ব্যবহার দেখা যায়, যাহার মূলে শাস্ত্রীয় কোন অনুশাসন নাই। লাউর গলা ভাঙ্গিয়া গেলে অনেক দেশেই বাজারে উহা হিন্দুর নিকট অবিক্রেয় হয়। কারণ খণ্ডফল প্রভৃতি নিম্ন জাতির স্পর্শে অপবিত্র হয় এই সংস্কার অনেকেরই আছে। কিন্তু শাস্ত্রার্থের প্রতি লক্ষ্য করিলে এই ব্যবস্থার প্রমাণমূলকতা অনুভূত হয় না।

শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় প্রায়শ্চিত্তবিবেকে চাণ্ডালাদি স্পৃষ্ট জল প্রভৃতি পানের প্রায়শ্চিত্ত লিখিয়াছেন। তাঁহার লিপি এইরূপ—"অথ চাণ্ডালস্পৃষ্টজলক্ষীরাদি-পান-প্রায়শ্চিত্তম্"। অনন্তর চাণ্ডালস্পৃষ্টজলক্ষীরাদি-পানের প্রায়শ্চিত্ত কথিত হইতেছে।

তত্র অঙ্গিরাঃ—তদ্বিষয়ে ঋষি অঙ্গিরা বলিয়াছেন,—

"যস্তু চাণ্ডালসংস্পৃষ্টং পিবেৎ কিঞ্চিদকামতঃ।
স তু সান্তপনং কৃচ্ছ্রং চরেৎ শুদ্ধ্যর্থমাত্মনঃ॥

যে ব্যক্তি অজ্ঞান বশতঃ চাণ্ডাল-সংস্পৃষ্ট কিঞ্চিৎ (তরল পদার্থ) পান করে, সে নিজের শুদ্ধির জন্য সান্তপনরূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে।

"কিঞ্চিদিতি ক্ষীর-জলাদিকং। সান্তপনং দ্ব্যহসাধ্যং। তদশক্তৌ পুরাণমেকং দেয়ম্।" কিঞ্চিৎ শব্দে জল ক্ষীর প্রভৃতি পানযোগ্য তরল পদার্থ অভিপ্রেত হইয়াছে। এই সান্তপন-প্রায়শ্চিত্ত দিনদ্বয়-নিষ্পাদ্য। উক্ত প্রায়শ্চিত্তাচরণে অসমর্থ হইলে এক কাহন কপর্দ্দক দান কর্ত্তব্য।

জ্ঞানে ত্বাপস্তম্বঃ—জ্ঞানপূর্ব্বক চাণ্ডালাদির স্পৃষ্ট ক্ষীর জল প্রভৃতি পান করিলে কি প্রায়শ্চিত্ত করিতে হইবে, তাহা আপস্তম্ব ঋষি বলিয়াছেন।

"চাণ্ডালেন তু সংস্পৃষ্টা আপো যঃ পিবতি দ্বিজঃ।
ত্রিরাত্রোপোষিতো ভূত্বা পঞ্চগব্যেন শুধ্যতি॥"

যে দ্বিজ জ্ঞানপূর্ব্বক চাণ্ডালস্পৃষ্ট জল পান করে, সে ত্রিরাত্র উপবাসের অনন্তর পঞ্চগব্য পান করিয়া শুদ্ধ হইবে।

অতঃপর শূলপাণি অভিপ্রায় প্রকাশ করিয়াছেন যে,—"অত্রাপবাদমাহ যমঃ"—এই বিষয়ে যম বিশেষ বিধান বলিতেছেন—অর্থাৎ তরল পদার্থ এবং আর্দ্র পদার্থ অন্ত্যজাদির স্পর্শে দুষ্ট হয়। স্পর্শ ও তদীয় ভাণ্ডে অবস্থান সমান দোষজনক। অতএব অন্ত্যজের ভাণ্ডস্থিত মাংস ও ঘৃত প্রভৃতিও দুষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু সেইগুলি ভাণ্ড হইতে বাহির করিয়া লইলেই শুচি বলিয়া বিবেচিত হয়।

"আমং মাংসং ঘৃতং ক্ষৌদ্রং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
ম্লেচ্ছভাণ্ডস্থিতা দুষ্টা নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ।"

ইহার অর্থ—কাঁচামাংস ঘৃত মধু ও ফলসম্ভূত স্নেহ অর্থাৎ আম্র প্রভৃতি ফলের রস ম্লেচ্ছের ভাণ্ডে অবস্থান সময়ে দুষ্ট বলিয়া বিবেচিত হয়। কিন্তু তদীয় ভাণ্ড হইতে পাত্রান্তরে স্থাপন করিলেই শুদ্ধ হয়।

এই স্থলে প্রায়শ্চিত্তবিবেকের টীকাকার গোবিন্দানন্দ বলিয়াছেন যে, "ফলসম্ভবাঃ স্নেহাঃ তৈলাদয়ঃ" ফলসম্ভব স্নেহ তৈল প্রভৃতি। কিন্তু তাঁহার এই ব্যাখ্যাটি ভ্রান্তিমূলক। কারণ, বাল-বলভী ভুজঙ্গ ভবদেব ভট্টের প্রায়শ্চিত্ত-প্রকরণে ষট্‌ত্রিংশখণ্ড গ্রন্থের বচনে ফলসম্ভব স্নেহ এবং তৈল এই উভয়ের স্বতন্ত্রই উল্লেখ দেখা যায়।

যথা—"আমমাংসং ঘৃতং তৈলং স্নেহাশ্চ ফলসম্ভবাঃ।
অন্ত্যভাণ্ডস্থিতা হ্যেতে নিষ্ক্রান্তাঃ শুচয়ঃ স্মৃতাঃ॥"

অর্থ—কাঁচামাংস ঘৃত তৈল মধু ও ফলসম্ভব স্নেহ অর্থাৎ ফলরস এই সকল বস্তু ম্লেচ্ছভাণ্ড হইতে পৃথক্ করিলেই শুদ্ধ বলিয়া বিবেচিত হয়।

প্রদর্শিত বচনাবলীর অর্থ হইতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, আম কাঁঠাল প্রভৃতি ফলের রস পাত্রান্তরিত হইলে আর অন্ত্যজের স্পর্শজনিত দোষে দুষ্ট হয় হয় না। সুতরাং লাউ কুমড়া প্রভৃতির খণ্ডও স্পর্শদোষে দুষ্ট হইতে পারে না। স্থানে স্থানে দুষ্ট বলিয়া যে বিবেচিত হয়, উহার মূলে শাস্ত্রের কোনও অনুশাসন নাই। অতএব স্বিন্নধান্য তণ্ডুলের প্রতি অপবিত্রতা-বোধও মনঃকল্পিত। শাস্ত্রতঃ ইহাতে দোষের প্রসক্তি নাই। স্মরণাতীত কাল হইতেই বঙ্গদেশে সিদ্ধান্নের ব্যবহার আছে। সুপ্রসিদ্ধ স্মার্ত্ত পণ্ডিতগণও উহার সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। পূর্ব্বে আমরা উল্লেখ করিয়াছি যে, রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় সিদ্ধান্নের ভক্ষ্যতা সমর্থন করিয়াছেন এবং কল্পতরু নামক নিবন্ধকারের গ্রন্থ হইতে মূল মুনিবচন ও কল্পতরুর ব্যাখ্যা উদ্ধৃত করিয়াছেন। উক্ত কল্পতরু-গ্রন্থ অতি প্রাচীন এবং শূলপাণি মহামহোপাধ্যায় প্রভৃতির উপজীব্য।

ঐতিহাসিকদিগের মতে ভবদেব ভট্ট আটশত বৎসর পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছিলেন। তাঁহার দত্তকতিলক গ্রন্থে কল্পতরুর মত প্রমাণস্বরূপ উপন্যস্ত হইয়াছে; যথা—

"রত্নাকর-কল্পতরুপ্রভৃতিভিরুক্তং যুক্তম্"।

সুতরাং সিদ্ধান্নের প্রতি অপবিত্রতা-বোধ বাঙ্গালীর নিজস্ব নহে। খুব সম্ভব, বঙ্গের আদিম অধিবাসীদিগের মধ্যে

উঁহার প্রতি অমেধ্যতা-বোধ ছিল না। পরে কান্যকুব্জাদিদেশ-সমাগত ব্রাহ্মণগণ বাঙ্গলায় সমাগত হইলে তাঁহাদের আচারদর্শনে সাধারণের মনে সিদ্ধান্নের অমেধ্যতা-বোধ জাগরিত হয়। ক্রমে কনোজীয়গণ বাঙ্গালীর সমাজে প্রবিষ্ট হইয়া গিয়াছেন; সুতরাং তাঁহাদের চিরন্তন দেশাচারপ্রভাব একেবারে বিদূরিত হয় নাই। বাঙ্গলার রাঢ় প্রভৃতি দেশে আতপতণ্ডুলের অন্ন সহ্য হয় না; অতএব সেই সকল দেশে সিদ্ধান্ন অপ্রতিহতভাবে সমাজে চলিয়াছে; পক্ষান্তরে উত্তরবঙ্গে ও পূর্ব্ববঙ্গে নির্ব্বিবাদে প্রচলিত হয় নাই। স্থানে স্থানে কান্যকুব্জপ্রভাব তুষানলের ন্যায় কাজ করিতেছে।

শাস্ত্রার্থকে উপেক্ষা করিয়াও যে মানবের মনঃকল্পিত শুদ্ধাশুদ্ধভাব সমাজে আত্মপ্রতিষ্ঠা লাভ করে, তদ্বিষয়ে দৃষ্টান্তের অভাব নাই। বর্ত্তমান যুগে আমিষের তামসতা এবং নিরামিষের সাত্ত্বিকতা এবিষয়ে বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। কারণ শাস্ত্রে ঈদৃশ সাত্ত্বিকতামসভাব দৃষ্ট হয় না। আজকাল ভগবদ্গীতা-সেবকের অভাব নাই। কিন্তু সর্ব্বজনসমাদৃত গীতায় আহারের যে ত্রিবিধত্ব কথিত হইয়াছে, তাহাতে আমিষ-নিরামিষের কোন উল্লেখই নাই।

হিমালয়পরিভ্রমণ।

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

ক্রমে আমরা বিষ্ণুগঙ্গার পথে অগ্রসর হইলাম। এদিকে প্রবল শীত। প্রাতে যথারীতি শয্যা হইতে উঠিয়া গমনোপযোগী বস্ত্রাদি পরিলাম; সে অদ্ভুত বেশের কথা মনে হইলে এখন হাসি পায়। প্রথমে একটা ট্রাউজার পরিয়া তাহার উপর একখানা কাপড় পরিলাম এবং গায়ে একটা মোটা ফ্লানেলের বডী পরিয়া তাহার উপর একটা সোয়েটার চাপাইয়াও সে ভীষণ শীত নিবারণ হইল না। পায়ে দুটী ফুল মোজা পরিয়া তাহার উপর পট্টি বাঁধিয়া জুতা পরিলাম। মাথায় একটা কানঢাকা টুপি থাকিল। তথাপি হিমালয়ের সেই নিদারুণ শীতে বুকের মধ্যে গুরগুর করিতে লাগিল। একে একে চারিজোড়া জুতা বরফে নষ্ট হইয়া গেল। হরিদ্বার হইতে একজোড়া মাত্র রবারের জুতা লইয়া গিয়াছিলাম, সেইটী এখন কাযে লাগিল।

খানিক পথ আপন মনে প্রভাতী ভজন গাহিতে গাহিতে চলিলাম। দেখিলাম, কি সুন্দর দৃশ্য! ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে সারা জগতটা যেন হাসিয়া উঠিয়াছে। কাহার পুলক স্পর্শে আবার এই সুষুপ্ত ধরণী নূতন সাজে জাগিয়া উঠিল। পূর্ব্বদিকে উষাসতীর রঙ্গিন ওড়নাখানি গায়ে কেমন ধীরে ধীরে নামিয়া আসিয়াছে! বালার্ক সিন্দূরবিন্দু ললাটে পরিয়া তিনি কি সুন্দর সাজে সাজিয়াছেন! বিকসিত বন কুসুম-সকল বিভুর চরণে অঞ্জলি দিতেছে। বিহগের মধুর কল-কাকলীতে বনভূমি মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। কে তুমি যাদুকর, তোমার করস্পর্শে আবার সারা বিশ্ব নবীন শোভাসম্পদে হাসিয়া উঠিল? ভগবানের এই অপূর্ব্ব ভাবের ছবি দেখিয়া নয়ন আর্দ্র হইল ও ভক্তি-অবনতচিত্তে তাঁহাকে প্রণাম করিলাম।

খানিক পথ গিয়া দেখি একস্থানে লতানে গোলাপ গুচ্ছে গুচ্ছে ফুটিয়া বনপথ আলোকিত করিয়াছে। তাহার সৌরভে দিগন্ত আমোদিত হইয়াছে। গোলাপের অপূর্ব্ব সুবাসে মন মুগ্ধ হইল। ভাবিলাম, বিশ্বস্রষ্টার কি অপূর্ব্ব কৌশল! তিনি এই ক্ষুদ্র গোলাপের মধ্যে এত রূপ, এত সৌন্দর্য্য, এত সুষমা ও এত সুবাস দিয়াছেন। জগতের বুকে গোলাপে যিনি এই বিশ্ববিমোহন সৌরভ দিয়াছেন, না জানি তিনি কতই সুন্দর! যিনি প্রতিনিয়তই এই জগতকে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে ফুটাইয়া তুলিতেছেন, না জানি তিনি কি মহান্! তিনি ত চির-সুন্দর চির-নবীন—কোন দিনই তাঁহার নূতনত্ব গেল না। এই কথাগুলি ভাবিতে ভাবিতে বিপুল আনন্দে হৃদয় ভরিয়া উঠিল। ধীরে ধীরে একটী পর্ব্বত-পার্শ্বে বসিলাম। তখন তরুণ অরুণ-চ্ছটায় দশদিক্ উদ্ভাসিত হইয়াছে। নির্ঝরের কলতান শোনা যাইতেছে।

ক্লান্ত দেহে কাণ্ডিতে উঠিলাম। বেলা দশটার সময় একটা চটীতে আসিলাম। গোলাপ সিং মোট-গাটরি নামাইয়া ঝরণার জল আনিল। আমি ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া স্নানাদি করিলাম। গোলাপ সিং কাষ্ঠাদি আনিয়া উনান জালিয়া রাঁধিবার জোগাড় করিয়া দিলে আমি স্নানাদি করিয়া সন্ধ্যা-বন্দনাপূর্ব্বক অন্ন পাক করিয়া আহারাদি করিলাম। আমরা ক্রমেই বিষ্ণুপ্রয়াগের নিকটবর্ত্তী হইতেছি। কিছুক্ষণ আমরা যাত্রীদল সকলেই বিশ্রাম করিয়া আবার বাহির হইলাম। দুই ঘণ্টা চলিতে চলিতে আবার অপরাহ্ন হইয়া আসিল।

সন্ধ্যা সমাগত। মনে হইল, সমস্ত সংসারটাও বুঝি এইরূপ আলোছায়ার খেলা। আলোছায়ার মধুর মিলনে পথের দৃশ্যগুলি যেন আরও সুন্দর হইয়া উঠিয়াছে। অদূরবর্ত্তী বিষ্ণুগঙ্গার গভীর কল্লোলের মধ্যে মর্ম্মস্পর্শী মধুর কলকল ঝঙ্কার উঠিতেছে। শুক্লপক্ষের জ্যোৎস্না একটু একটু করিয়া ছড়াইয়া পড়িতেছে। সেই কৌমুদীকিরণে বিজন নীরব পর্ব্বতপ্রদেশকে যেন কোমল শুভ্রবেশে সুসজ্জিত করিয়াছে। হিমালয়ের গরিমাময়

গম্ভীর মূর্ত্তিটি বড়ই সুন্দর! আমরা সেদিন ঐ বিষ্ণুগঙ্গার নিকটেই আশ্রয় লইলাম। রাত্রে ঝড় বৃষ্টি অন্ধকার—বিষ্ণুগঙ্গার ভীষণ কল্লোলে কান ফাটিয়া যাইতেছে। একটু মিষ্টান্ন ও জল খাইয়া শয়ন করা গেল। সেদিন রাত্রে কাহারও সুনিদ্রা হইল না। প্রাতে মুখহাত ধুইয়া দেখিলাম উষার তরুণ-অরুণচ্ছটায় দশদিক হাসিতেছে। তখন তাড়াতাড়ি কাপড় পরিয়া পথে বাহির হওয়া গেল।

এপথ অত্যন্ত চড়াই-উতরাই। আমরা দুই মাইল উতরাই নামিয়া ক্রমে অভ্রভেদী নরনারায়ণ পাহাড়ের শীর্ষদেশ নয়নগোচর করিলাম। মনে হইল, এই সেই সত্যকালের নর-নারায়ণ ঋষিদ্বয় যেন ধ্যাননিমীলিত নয়নে কি মহা সমাধিতে মগ্ন হইয়া আছেন। কি গম্ভীর, কি মহান্ দৃশ্য! অনেক পথ কাণ্ডিতে গিয়া দেখিলাম একটী বাঙ্গালী বৃদ্ধা স্ত্রীলোকের মৃত্যু হইয়াছে। তাঁহাকে একটী পর্ব্বত-পাদমূলে নামাইয়া রাখিয়াছে। তিনিও বদরীনাথ প্রভুর দর্শনে যাইতেছিলেন। তাঁহার আত্মীয়-স্বজনগণ তাঁহার নিউমোনিয়া হইয়াছে দেখিয়া একটী চটীতে রাখিয়াছিলেন। গত রাত্রে তাঁহার অবিনশ্বর আত্মা স্বর্গগামী হইয়াছে। বৃদ্ধার হৃদয় ভগবদ্দর্শনে লোলুপ ছিল, এজন্য নিশ্চয়ই তিনি ভগবচ্চরণে আশ্রয় পাইয়াছেন। এখানে কেবল তাঁহার পঞ্চভূতময় দেহটা পড়িয়া আছে। সংসারে জীবন-মরণের এই খেলা অবিরতই চলিতেছে। প্রতি মুহূর্ত্তে কত কোটী কোটী জীব মহাকালের বদনে প্রবিষ্ট হইতেছে। জন্ম-মৃত্যুর লীলা-অভিনয়ের দুর্জ্জের রহস্যজাল ভেদ করা জীবের সাধ্যাতীত। ভাবিলাম একি প্রহেলিকা! সংসারে পুত্র, মিত্র, স্বামী, পিতা, মাতা—এ সকল কি সবই মিথ্যা? এ মায়া-প্রপঞ্চময় জগতে কেহই কি আমার নয়? তবে কেন এ আমিত্ব? একা আসিয়াছি একাই যাইব। কেহ ত আমার শেষ-যাত্রার সহগামী হইবে না। মহাজ্ঞানী শঙ্করাচার্য্য বলিয়াছেন—

কস্তং কোঽহং কুত আয়াতঃ
কা মে জননী কো মে তাতঃ?

তবে এ স্নেহের বন্ধনে বাঁধিলে কেন হরি? তবে এ মায়ার পাশে জীব বদ্ধ হইয়া কেনই বা অহং-মমতা বুদ্ধি লইয়া আমার আমার করিয়া ছুটিয়া বেড়ায় এবং বিশ্বের মধ্যে আত্মপর-ভেদাভেদ দ্বন্দ্ব-দ্বেষ লইয়া, ছোট-বড় উচ্চ-নীচ ভাবিয়া থাকে?

সংবাদ।

আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতিসভা।—গত ২৩শে জ্যৈষ্ঠ বুধবার সন্ধ্যায় 'বঙ্গীয় সাহিত্যপরিষৎ-মন্দিরে' পরিষদের সহকারী সভাপতি ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়ের সভাপতিত্বে আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দরের বাৎসরিক স্মৃতিসভা অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। কয়েকটী প্রবন্ধে ও মৌখিক আলোচনায় তাঁহার অসাধারণ ব্যক্তিত্ব, চরিত্র ও সাধনা প্রভৃতি অতি সুন্দররূপে বর্ণিত ও আলোচিত হইয়াছিল। বঙ্গভাষা ও সাহিত্যের প্রতি তাঁহার সুগভীর প্রেম ও নিষ্ঠাপূর্ণ সেবার তুলনা মিলে না। রামেন্দ্রসুন্দর একজন প্রকৃত জ্ঞানান্বেষী পুরুষ ছিলেন। তিনি যেখানেই জ্ঞানের জ্যোতি বিচ্ছুরিত হইতে দেখিয়াছেন, নির্ব্বিরোধে সেখানেই অগ্রসর হইয়াছেন। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য, দর্শন ও বিজ্ঞান প্রভৃতি জ্ঞানের রাজ্যে পণ্ডিতেরা যে-সব ভেদের গণ্ডি সৃষ্টি করিয়াছেন, রামেন্দ্রসুন্দরের দৃষ্টিতে তাহা কোনও দিন বড় হইয়া দেখা দেয় নাই। তাই তাঁহার মত একজন বৈজ্ঞানিকের লেখনী হইতে বৈদিক সাহিত্যের এরূপ শ্রদ্ধাপূর্ণ আলোচনা সম্ভব হইয়াছে, এবং তাঁহার প্রত্যেকটী 'জিজ্ঞাসা' দর্শন ও বিজ্ঞানের মধ্যে ওতপ্রোত হইয়া আছে। তাঁহার ন্যায় নির্ভীক বিজ্ঞানভিক্ষু পাশ্চাত্য জগতেও বিরল। যখন প্লেগের টীকা দিবার কথা প্রথম উত্থাপিত হইল, তখন উক্ত টীকা দিবার ফলাফল কেবল পরীক্ষা করিবার জন্য তিনি অকুতোভয়ে স্বীয় দেহে প্লেগের টীকা গ্রহণ করিয়াছিলেন। কে জানে, তাহার ফলেই তাঁহার অকাল-মৃত্যু হয় নাই? এই সব আদর্শ-পুরুষের জীবন-কথা ও চরিত্রগাথা যত অধিক আলোচিত হয় দেশের ততই সমূহ কল্যাণ।

চিত্তরঞ্জন-স্মৃতিসভা।—গত ২রা আষাঢ় শনিবার কলিকাতা সহরে ও বাঙ্গলার বিভিন্ন স্থানে দেশ-মাতৃকার কৃতী সন্তান দেশবন্ধু চিত্তরঞ্জন দাশ মহাশয়ের বার্ষিক স্মৃতিসভার অনুষ্ঠান হইয়া গিয়াছে। চিত্তরঞ্জনের দেশপ্রেম ত্যাগের গরিমায় ভাস্বর। বাঙ্গালী তথা ভারতবাসী দূরের কথা, সুবৃহৎ মনুষ্যসমাজও এতবড় ত্যাগ অনেক দিন দেখে নাই। উপনিষদে আছে,—"ত্যাগেনৈকে অমৃতত্বমানশুঃ" কেহ কেহ ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভ করিয়াছিলেন। আমাদের মনে হয়, চিত্তরঞ্জনের যদি আর কোন গুণ নাও থাকিত, তথাপি তিনি কেবলমাত্র এক ত্যাগের দ্বারাই মৃত্যুকে অতিক্রম করিতে পারিতেন। দেশের শত-সহস্র অজ্ঞাত অখ্যাত লোক আজ বাঁচিয়া থাকিয়াও মরিয়া রহিয়াছে, কিন্তু চিত্তরঞ্জন মরিয়াও দেশবাসীর প্রীতি ও স্মৃতির মালায় বাঁধা পড়িয়া শাশ্বত জীবন লাভ করিয়াছেন। তাঁহার অসাধারণ দেশপ্রেম ও অসামান্য ত্যাগ যুগে যুগে বাঙ্গলার গৃহে গৃহে কীর্ত্তিত হইবে এবং বাঙ্গলার নর-নারীকে উন্নত ও আদর্শনিষ্ঠ হইবার সাহায্য করিবে।

হরিমোহন দাতব্যচিকিৎসালয়প্রতিষ্ঠা।—মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের জন্মভূমি, হুগলি জেলার আরামবাগ মহকুমার অন্তর্গত খানাকুলে তদীয় পৌত্রবধূ শ্রীমতী গোলাপসুন্দরী দেবী তাঁহার পরলোকগত স্বামী ৺হরিমোহন রায়ের নামে সম্প্রতি "হরিমোহন দাতব্য-চিকিৎসালয়ের" প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন। গত ২০শে জ্যৈষ্ঠ, রবিবার শ্রীযুক্ত হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয় উহার দ্বারোদ্ঘাটন-উৎসব সুসম্পন্ন করিয়া আসিয়াছেন। প্রায় পঁচিশ হাজার টাকা খরচ করিয়া এই চিকিৎসালয়টী নির্ম্মিত হইয়াছে এবং ইহার পরবর্ত্তী ব্যয় নির্ব্বাহের জন্য পঁচাত্তর হাজার টাকা পৃথক করিয়া রাখা হইয়াছে। বাঙ্গলার পল্লীতে দরিদ্র পল্লীবাসীগণের হিতকল্পে এরূপ সুবৃহৎ দাতব্য প্রতিষ্ঠান ইতিপূর্ব্বে কোথাও হইয়াছে বলিয়া শুনি নাই। রোগপীড়িত নিঃস্ব পল্লীবাসীগণের সাহায্যার্থ গোলাপসুন্দরীর এই বদান্যতা রাজা রামমোহন রায়ের বংশের উপযুক্তই হইয়াছে। ভগবান্ তাঁহার এই শুভ প্রচেষ্টাকে সর্ব্বপ্রকারে সুসম্পাদন পূর্ব্বক জয়যুক্ত করুন।

শিবাজী-প্রতিমূর্ত্তির প্রাবরণোন্মোচন।—গত ২রা আষাঢ় শনিবার পুণা নগরীতে 'নিখিল ভারত শিবাজী স্মৃতিসভার' উদ্যোগে বিশেষ আড়ম্বর ও উৎসবের সহিত ভারতগৌরব মারাঠাবীর শিবাজীর একখানি ব্রোঞ্জনির্ম্মিত প্রতিমূর্ত্তির প্রাবরণোন্মোচন অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বোম্বাইয়ের মাননীয় গভর্ণর ও তদীয় পত্নী এবং কোল্হাপুরের মহারাজা প্রভৃতি বিশিষ্ট ব্যক্তিগণ এই উৎসবে যোগদান করিয়াছিলেন। সুখের বিষয়, প্রতিমূর্ত্তিখানি বিদেশ হইতে আনীত না হইয়া এখানে শ্রীযুক্ত ভি. পি. কর্ম্মকার নামক একজন ভারতীয় ভাস্কর কর্ত্তৃক খোদিত হইয়াছে। ১০ টন ওজনের ১৬ ফুট দীর্ঘ এরূপ সুবৃহৎ ব্রোঞ্জ প্রতিমূর্ত্তি ইতিপূর্ব্বে ভারতে আর দৃষ্ট হয় নাই। এই বীরশ্রেষ্ঠ দেশপ্রেমিক মহাপুরুষের স্মৃতিকথা ও বীরকাহিনী আরও অধিকতররূপে সর্ব্বত্র আলোচিত হইয়া আমাদের ভারতীয় চরিত্রকে দৃঢ় ও সাহসী করিয়া তুলুক।

পুণ্যাহ।—গত ২১শে আষাঢ় বৃহস্পতিবার কৃষ্ণা দ্বিতীয়া তিথিতে 'কালীগ্রাম'-পরগণার শুভ 'পুণ্যাহ'-কর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। তদুপলক্ষ্যে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয় আহূত হইয়া তথায় গমন করিয়াছিলেন। উক্ত দিবস পূর্ব্বাহ্ন ১১শ ঘটিকায় প্রচুর বাদ্যোদ্যম ও ঘন ঘন বন্দুকের শব্দ দ্বারা পুণ্যাহের শুভসূচনা চতুর্দ্দিকে বিঘোষিত হয়। অতঃপর পত্রপুষ্প ও প্রতিকৃতি দ্বারা সুসজ্জিত সভাগৃহ ধীরে ধীরে আমলা-কর্ম্মচারী ও প্রজাপুঞ্জে পূর্ণ হইলে বেলা সার্দ্ধ একাদশ ঘটিকায় ষ্টেটের কর্ম্মাধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ রায় চৌধুরী মহাশয় বেদান্ততীর্থ মহাশয়কে অগ্রণী করিয়া সভাস্থলে প্রবেশ করেন। সভাগৃহের ঠিক মধ্যস্থলে একটী উচ্চ মঞ্চে পূজ্যপাদ মহর্ষিদেব ও তাঁহার পূজনীয় পুত্রগণের প্রতিকৃতিগুলি পত্রপুষ্পে ভূষিত হইয়া শোভা পাইতেছিল। এই মঞ্চের বামপার্শ্বে আচার্য্যের বেদী নির্দ্দিষ্ট হইয়াছিল। বেদান্ততীর্থ মহাশয় বেদীগ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি ব্রহ্মোপাসনান্তে সমবেত প্রজাগণকে উদ্দেশ করিয়া পুণ্যাহ সম্বন্ধে একটী নাতিদীর্ঘ সুন্দর উপদেশ প্রদান করেন। অতঃপর কর্ম্মাধ্যক্ষ মহাশয়ের নেতৃত্বে পুণ্যাহের যথারীতি প্রচলিত অনুষ্ঠান আরম্ভ হয়। পূর্ব্ব পূর্ব্ব বৎসরের ন্যায় এবারেও সমবেত প্রজাপুঞ্জ ও অতিথি-অভ্যাগতের জন্য অপরাহ্ণে দধি-চিপিটকের সুবৃহৎ ভোজের আয়োজন হইয়াছিল।

ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সাম্বৎসরিক উৎসব।—ভবানীপুর-ব্রাহ্মসমাজের ষট্সপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব গত ৭ই আষাঢ় হইতে ৯ই আষাঢ় শনিবার পর্য্যন্ত দিবসত্রয় ব্যাপিয়া সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শেষ দিবস শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের বেদীগ্রহণের কথা ছিল। কিন্তু কার্য্যবশতঃ তিনি যথাসময়ে এখানে উপস্থিত না থাকায় শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন। চিন্তামণি বাবু যথারীতি উদ্বোধনান্তে স্বাধ্যায় পাঠ করিলে বেদান্ততীর্থ ক্ষিতীন্দ্রনাথের পুস্তিকায় গ্রথিত উপদেশ "সান্ধ্য আরতি" পাঠ করেন। পুস্তিকাগুলি সভায় সমবেত উপাসকবর্গকে বিতরিত হয়। তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যায় উহা স্থানান্তরে প্রকাশিত হইল।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।—পত্রিকাখানি গত বৈশাখে ৮৬ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। বাঙ্গলা ভাষা দূরের কথা, অপর কোন ভারতীয় ভাষায়ও এরূপ প্রাচীন পত্রিকা আর একখানিও নাই। ভারতের নবযুগের একটী নব ধর্ম্ম ও সাহিত্য তত্ত্ববোধিনীর এই সুদীর্ঘ জীবন-ধারার সহিত ধীরে ধীরে অভিব্যক্ত হইয়া উঠিয়াছে। এদিক দিয়া তত্ত্ববোধিনীর যে একটী ঐতিহাসিক বৈশিষ্ট্য গড়িয়া উঠিয়াছে, ধীরে ধীরে দেশের জ্ঞানী ও গুণীগণের সেদিকে লক্ষ্য হইতেছে। তত্ত্ববোধিনী সত্য-ধর্ম্মের পতাকা বহন করিয়া সম্প্রদায়-নির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণ পাঠকেরই যে মনোরঞ্জন ও প্রীতি উৎপাদনে সমর্থ হইতেছে, ইহাই তাহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ গৌরব। নানা সাময়িক পত্রে ও চিঠি-পত্রে আমরা ইহার নিদর্শন পাইতেছি। তত্ত্ববোধিনীকে যাঁহারা শ্রদ্ধা ও প্রীতির চক্ষে দেখিয়া থাকেন, আশা করি এই সকল সংবাদে তাঁহারা সুখীই হইবেন। গত ১৮ই জুন তারিখের একখানি

পত্রে 'ডেরাডুন' হইতে একটী বিশিষ্ট ভদ্রলোক গত বৈশাখসংখ্যায় প্রকাশিত 'ভগবানে একান্ত নির্ভর কর ও নির্ভয় হও' পাঠ করিয়া জানাইয়াছেন,—"নববর্ষের উপদেশ পাঠ করিয়া পরম আনন্দ লাভ করিলাম। আমার বর্ত্তমান মানসিক অবস্থায় ইহাকে Godsend বলিয়া মনে করি।" এইরূপ বহু পত্র ও পত্রিকায় প্রশংসনীয় মন্তব্য আমাদের হস্তগত হইয়াছে ও হইতেছে।

শোকসংবাদ।

৺ মন্মথনাথ চৌধুরী।—পরলোকগত স্বনামধন্য স্যর আশুতোষ চৌধুরী মহাশয়ের পঞ্চম ভ্রাতা মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়, যিনি লেপ্টেন্যান্ট কর্ণেল মিঃ এম. এন. চৌধুরী আই এম্ এস্ (মান্দ্রাজ) নামে প্রসিদ্ধ, গত ৬ই আষাঢ় শনিবার মুসৌরী পাহাড়ে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। ইনি পাশ্চাত্য চিকিৎসাশাস্ত্র অধ্যয়নপূর্ব্বক মান্দ্রাজের মেডিক্যাল কলেজে অধ্যাপকতা করিতেন। ঐ প্রদেশে ইঁহার যথেষ্ট খ্যাতি ও প্রতিপত্তি হইয়াছিল; এবং সর্ব্বত্র তিনি সকলের শ্রদ্ধার ও ভালবাসার পাত্র ছিলেন। ইঁহার এই আকস্মিক মৃত্যুতে শোকসন্তপ্ত পুত্রপরিজন ও আত্মীয়বন্ধুগণকে আমরা আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহাদের শোকবাধা বিদূরিত করিয়া পরলোকগত আত্মার কল্যাণ বিধান করুন।

৺ দেবনাম হালদার।—পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দৌহিত্রীপতি রাঁচিপ্রবাসী শ্রীযুক্ত সুকুমার হালদার মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান দেবনাম হালদার গত ১২ই বৈশাখ বুধবার সাঙ্ঘাতিক ম্যালেরিয়ার ভীষণ আক্রমণে মাত্র ৮ দিন ভুগিয়া অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ২০ বৎসর হইয়াছিল। এই সুস্থ সবল যুবক সর্ব্বদা কাছে কাছে থাকিয়া ইঁহার বৃদ্ধ পিতার একমাত্র অবলম্বন হইয়া উঠিয়াছিলেন। আজ সেই স্নেহাসক্ত শোকার্ত্ত পিতাকে যে আমরা কি বলিয়া সান্ত্বনা দিব, ভাবিয়া পাইতেছি না। এই আকস্মিক দুঃসংবাদে আমাদেরও হৃদয় শোকাবেগে অবসন্ন হইয়া পড়িয়াছে। ভগবান সকলের শোক প্রশমন পূর্ব্বক লোকান্তরিত আত্মার শান্তিবিধান এবং শোকসন্তপ্ত পরিবারকে সান্ত্বনা প্রদান করুন।

গার্হস্থ্য-সংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ।—গত ২৬শে আষাঢ় মঙ্গলবার পূর্ব্বাহ্ন ৮।০ ঘটিকার সময় ৺ মন্মথনাথ চৌধুরী মহাশয়ের আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্র শ্রীমান নিখিলরঞ্জন চৌধুরী ২০ নং মে-ফেয়ার বালিগঞ্জ, স্বীয় পিতৃব্য-ভবনে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। উক্ত দিবস যথাসময়ে 'কমলালয়ের' দ্বিতল বারান্দায় শ্রাদ্ধের যথাযথ আয়োজন সমাহৃত হইয়াছিল। বিবিধ পুষ্পসম্ভার ও গন্ধধূপাদির পবিত্র সৌরভে শ্রাদ্ধ-প্রাঙ্গণ পূর্ণ হইলে সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ-সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে 'শয্যাদান'-প্রভৃতি ষোড়শ দানসামগ্রী উৎসর্গীকৃত হয়। অতঃপর শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত মোহিনীমোহন চট্টোপাধ্যায় মহাশয় বেদী গ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি ব্রহ্মোপাসনা ও শ্রাদ্ধকর্ম্ম সুসম্পন্ন করেন। শ্রীমতী ইন্দিরা দেবী কয়েকটী ব্রহ্মসঙ্গীত গান করিয়া সভাস্থলের পবিত্রতা ও গাম্ভীর্য্যকে বর্দ্ধিত করিয়াছিলেন। শ্রাদ্ধসভায় স্থানীয় আত্মীয়-স্বজন ও বন্ধুবান্ধবের সমাগম হইয়াছিল। সর্ব্বশেষে জলযোগের আয়োজন ছিল।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

১৮৪৯ শক। সম্বৎ ৯৮।

আয়	৮৩৫৩/১
গত বৎসরের স্থিত	১১৪।৩
সমষ্টি	৮৪৬৭।৶৪
ব্যয়	৮৩৬৬।৶৪
স্থিত	১০১।০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিক দান	৬০০৲
আনুষ্ঠানিক	২৬৲
এককালীন	৩৯৸৴৪
উৎসবের দান	১১৲
বিশেষ কার্য্যের দান	১৩৲
হাওলাত জমা	১০৲
হাওলাত আদায়	১৫২॥০
ঋণগ্রহণ	১৪০৫৲
বিবিধ	৩৵০
সস্পেন্স	৩৪৪০।৴০
বণ্ডেড অয়ার হাউস	১২০৲
সেভিংস্ ব্যাঙ্ক	২৯৲
দানাধারে প্রাপ্ত	৪৸৶০
সমষ্টি	৫৮৪৮৸৪

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৩২৯৸৵০
হাল	১১৬৷৵০
অগ্রিম	৩৲
নগদ	৩৲
বিজ্ঞাপন	১৬৬৲
মাশুল	২৯৸৵০
সমষ্টি	৬৪৮৷০

পুস্তকালয়।

ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক	৪৫৴০
গচ্ছিত	২৩৶৬
কমিশন	৶৬
মাশুল	৩৸০
গীতারহস্যের মূল্য	৪২৩৲
মাশুল	১৫৲
গীতার গচ্ছিত আদায়	১৮৩৸০
সমষ্টি	৬৯৪৲

যন্ত্রালয়।

তত্ত্ববোধিনী-মুদ্রণ	৫৪০৲
সমাজের বক্তৃতা ও গান মুদ্রণ	৬৭৲
অপরের পুস্তক মুদ্রণ	৩১৪৷৷০
কাগজের মূল্য	১৬৬৴৯
দপ্তরী	৩৪৵০
অক্ষর বিক্রয়	৪০৲
বিবিধ	৷৷৵০
সমষ্টি	১১৬২৷৵৯
সর্ব্বসমষ্টি	৮৩৫৩৷৶১

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্য	১৯০৲
গায়ক	৪২০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৬২৷৷০
হিসাবরক্ষক	১৪০৲
বেহারা	১৪৪৲
মেথর	২৪৲
সরঞ্জামী	১২৶৯
মাশুল	৩৯৷৵০
Electric	৪৯৸৴৩
কেরোসিন	৮৸৩
ঋণশোধ	২৮৭৩৸৶১০
হাওলাতপ্রদান	১৪০৲
বারবরদারী	৩৯৴৩
বিবিধ	৪৮৴৬
পাথাকুলি	২৲
ড্রেণ পরিষ্কার	৬৷৷০
পূর্ত্তকার্য্য	৮০৷৬
আলো মেরামত	১৸৬
টেক্স	২৭০৷৷৵০
চৈত্রসংক্রান্তি	১০৷৶৬
গান ও বক্তৃতা ছাপা	৬৭৲
খাজনা	২৷৷০
বিশেষ কার্য্যের দান	১৬৷০
হাওলাত শোধ	১০৲
মাঘোৎসব	৭২৴৯
পার্ব্বণী	২৷০
সেভিংস ব্যাঙ্ক	২০৲
চাঁদা আদায়ের কমিশন	৷৷০
সমষ্টি	৪৭৫৪৷৴১

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজ	২২০৷৶৬
বাঁধাই	২৪৵০
প্রবন্ধ	২৫৴০
মাশুল	৫৮৷৷৬
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৮৸০
হিসাবরক্ষক	১২৫৲
মুদ্রাঙ্কণ	৫৪০৲
বিজ্ঞাপনের কমিশন	৫৯৸৵০
মূল্য আদায়ের কমিশন	৪৭৲
মূল্য ফেরত	২৶০
অন্যান্য	১/০
সমষ্টি	১১৪২৲

পুস্তকালয়।

গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য	৭৶০
সমাজের পুস্তকের কমিশন	৩৸০
পুস্তক ক্রয়	৸৵০
দপ্তরী	৩৲
অন্যান্য	১৸৴৬
মাশুল	৫৸৴৬
গীতার বিজ্ঞাপন	২৬৲
গীতার মূল্য বাবত্ত	১৪১৲
মাশুল	১৩৶০

কমিশন	৯৲
বিবিধ	২॥০
দপ্তরী	১২০৸০
পাঠান খরচ	১০৭৲
সমষ্টি	৫২৯৸৵০

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	২০৭৷৵৬
কম্পোজিটর	৬০৮॥৴৬
প্রেসম্যান	২৪০৲
ইঙ্কম্যান	১৪১৷৵০
কাগজতোলা	৪৪॥৴০
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৮৸০
হিসাবরক্ষক	১২৫৲
জলপানী	২৵৬
প্রুফকাগজ	৭৸৬
ছাপার কাগজ	২১৩৷০
কালি	১৩৸৵০
শিরীষ	৫৴৬
তৈল	৬৷০
সাজিমাটী	২॥৬
দড়ি	॥৵০
ফুলঢালা	৩৷৴৩
দপ্তরী	৫১৷৵০
অক্ষর ক্রয়	১৩০৸৴৩
মাশুল	১৵০
তামাক	৪॥৯
বাতি	॥০
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	২৫॥৴০
সেই জন্য ময়দা	১॥০
বিবিধ	৩০৵০
ব্রাস	১॥০
লাইসেন্স	১২৲
সমষ্টি	১৯৪০৷৩
সর্ব্বসমষ্টি	৮৩৬৬৷৴৪

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়
অডিটর।

তত্ত্ববোধিনীতে বিজ্ঞাপনপ্রকাশের নিয়মাবলী।

১। বিজ্ঞাপনদাতাগণ মনে রাখিবেন যে এই পত্রিকা ৮৬ বৎসর চলিতেছে, অথচ ইহার বিজ্ঞাপনের হার সর্ব্বাপেক্ষা সুলভ; এবং এই পত্রিকার এক পৃষ্ঠা অন্য পত্রিকার দুই পৃষ্ঠার সমান।

সাধারণ	১ পৃষ্ঠা	....	৮৲	প্রতিমাসে।
"	½ "	....	৫৲	"
"	¼ "	....	৩৲	"

মলাটের পৃষ্ঠার বিজ্ঞাপনের হার স্বতন্ত্র। বিজ্ঞাপনসংগ্রহকারিগণকে উপযুক্ত কমিসন দেওয়া হয়।

২। বিজ্ঞাপনের মূল্য অগ্রিম দেয়। যে মাসে মূল্য না পাওয়া যাইবে সে মাসে বিজ্ঞাপন বন্ধ করিয়া দেওয়া হইবে।

৩। এককালে এক বৎসরের বন্দোবস্ত করিয়া ৬ মাসের মূল্য অগ্রিম দিলে শতকরা ২৫৲ টাকা, ৬ মাসের বন্দোবস্ত করিয়া ৪ মাসের মূল্য দিলে শতকরা ১২৲ টাকা এবং ৩ মাসের বন্দোবস্তে ২ মাসের অগ্রিম দিলে শতকরা ৬৲ টাকা কমিশন দেওয়া হয়।

৪। এজেন্ট হইতে চাহিলে সাক্ষাতে বা পত্র লিখিয়া বন্দোবস্ত করা যাইতে পারে।

৫। মূল্যাদি কার্য্যাধ্যক্ষের নামে নিম্নলিখিত ঠিকানায় পাঠাইতে হইবে।

আদিব্রাহ্মসমাজ
৫৫, আপার চিৎপুর রোড
কলিকাতা।

কার্য্যাধ্যক্ষ—
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

Extract from the Legislative Assembly Debates, Vol. I, No. 34.

The Assembly met in the Assembly Chamber of the Council House, New Delhi, on Thursday, the 22nd March, 1928.

* * * * * * * *

THE SPECIAL MARRIAGE (AMENDMENT) BILL.

Sir Hari Singh Gour (Central Provinces Hindi Divisions: Non-Muhammadan): Sir, I beg to move that the Bill further to amend the Special Marriage Act, 1872, be referred to a Select Committee.

In moving my motion, Sir, I wish very briefly to recapitulate the facts which have induced me to make this motion. As far back as 1868, that great lawyer and distinguished jurist, Sir Henry Maine, pointed out to the late Imperial Legislative Council that it was the duty of every state to provide a secular law for the marriage of its subjects, and the religious neutrality which the Government of India and indeed all Governments profess is only consistent with providing a secular law or marriage for all subjects residing within that state. That Bill, Sir, was circulated, but afterwards Sir Henry Maine relinquished charge of his high office and his successor thought that the time was not ripe for a general legislation of that kind. And consequently its terms were restricted and it became the Act of 1872, the Special Marriage Act. After that, Sir, various attempts have been made in which you yourself, Sir, took a distinguished part in providing this country with a wider marriage law. In 1921, I was the author of an exactly identical Bill providing for a general civil marriage law for this country. That Bill, Sir, was circulated, and opinions were collected from all parts of the country; and I hold in my hand a compilation from which it will be seen how strongly the country was in favour of my Bill. Not only that, but in the Madras Legislative Council a motion was tabled and eventually carried by 54 votes to 23 cordially supporting my Civil Marriage Bill. The language of the motion supported and passed by the Madras Legislative Council is as follows:

> "That this Council recommends to the Government to convey to the Government of India its approval and hearty support of the Civil Marriage Bill brought in by Dr. H. S. Gour in the Legislative Assembly."

Honourable Members will find from this paper book that the other Government were equally in favour of my Bill, and when I moved a motion for reference of that Bill to Select Committee it was acceded to by this House. But in the Select Committee I found that there was a difference of opinion and rather than take the chance of wrecking my Bill I restricted its scope to Hindus, Buddhists, Sikhs and Jains, making it however clear that I should lose no time in enlarging its scope so as to reduce the Bill to a pure Civil Marriage Bill. That Bill was passed into law and, as Honourable Members are aware, it is Act XXX of 1923. And from all accounts that Act has been well received and a very large number of marriages have been contracted under its provisions But since then the opinion in the country has been clamouring for the establishment of a pure civil marriage law in this country and I therefore, Sir, once more ask this House to refer to a Select Committee the Bill which was referred to a Select Committee as far back as 1922.

I may very briefly explain the object of my Bill. As the law at present stands inter-marriages between Hindus, Buddhists, Sikhs and Jains are possible subject to the provisions of Act XXX of 1923 The Indian Christian Marriage Act further provides that one party to the marriage must be a Christian. Therefore inter-marriages between Christians and non-Christians are equally possible in this country, but there is no machinery of law for the purpose of solemnizing and registering such marriages apart from the Church and the priesty institutions. Indeed all civilised countries of the world—and when I say so, I have the support of the opinion of a Royal Commission that incidentally went into this question—all civilised countries of the world have their civil marriage law. In England you have a civil marriage law. In all parts of Europe you have a civil marriage law. I understand, Sir, that in Asiatic countries like Japan and Angora you have a civil marriage law. An Indian is entitled to marry under the civil marriage law but only outside the territorial waters of this country. Let me give you an illustration. Supposing a Hindu wishes to marry a Muhammadan. He cannot marry within

British India. But if he were to take a boat and go three miles outside the territorial waters of India, three miles out of the harbour of Bombay or Calcutta, he will immediately become subject to the British law because under the international law a British ship is regarded as a floating island and being thus subject to the British law, he can contract such a marriage. He can contract such a marriage outside the territorial waters of India, in any part of Europe, in England or in America. The disability, therefore, is a purely territorial disability. The marriage contracted outside the territorial waters of India is a good marriage, good for all purposes, at all times and everywhere. As Mr. Ameer Ali in his well known work on Muhammadan Law points out :

"A marriage between a Moslem and non-Moslem celebrated in a foreign country is valid under the Mahommedan Law, if it is performed in accordance with the requirements of the *lex loci contractus* or the rites of the communion to which the wife belongs."

Maulvi Mahammad Yaqub : Page ?

Sir Hari Singh Gour : Page 187. Vol. II. So that the position is this. Indians are entitled to-day to contract a civil marriage outside India. The disability from which they suffer is a purely territorial disability. A Hindu can marry a Muhammadan and a Muhammadan can validly marry a Hindu. Let me quote to you, Sir, the same high authority on the subject. At page 187 Mr. Ameer Ali says:

"But it is a mistake to suppose that under the Mussalman Law, a Moslem may marry a woman belonging to the revealed faith *only*, by which are meant Islam. Christianity and Judaism. Marriages are allowed between Moslems and the *Ahl-ul-Hawa* (free-thinkers), the Sabaeans Zoroastrians, as well as the Jews and the Christians. A Moslem may, therefore, lawfully intermarry with a woman belonging to the Brahmo sect. Nor does there seem to be any reason why a marriage with a Hindu woman whose idolatry is merely nominal and who realy believes in God should be unlawful . . . ."

(At this stage Mr. President vacated the Chair which was taken by Mr. Deputy President.)

"The Mogul Emperors of India frequently intermarried with Rajput (Hindu) ladies and the issue of such unions were regarded as legitimate and often succeeded to the imperial throne. What the Muhammedan Law requires is that any such union should not lead to the introduction of idolatry in a Mahommedan household."

That is, I submit, the highest authority on Muhammadan Law and it lays down that inter-marriages between Hindus and Muhammadans are legal and may be contracted. But whatever may be the Muhammadan Law on the subject the fact remains that marriage being an international institution, a Hindu or a Muhammadan is entitled to contract a civil marriages, a non denominational marriage, with any person, of course out-side the ordinary limits of consanguinity, under the civil law, and if my Bill is passed, all that my Bill will do is to enable the Indian to contract such marriages within the limits of British India which he is to-day entitled to do outside the territorial waters of India. That is all that my Bill is intended to do.

Now I wish to point out to the House that it is the primary duty of the State to provide for the marriages of all religionists, and the religious neutrality to which the Government stands committed is only consistent with providing for a non-religious marriage law. As I have said, such a law exists in all parts of the civilised world. India is the only country which has not such a law and it is a disability from which every British subject. whether European or Indian, suffers in this country. Let me give you, Sir, an illustration. An Englishman in England, if he is a free-thinker or for the matter of that if he is a Roman Catholic or belongs to one of these persuasions which would not admit of a Church marriage, is entitled to contract a civil marriage, and when he goes before the Civil Marriage Registrar the only rule which applies restricting his marriage is the natural law of consanguinity. But suppose he comes out to this country and joins one of the public services, the Civil Service or the Medical Service, and suppose he wishes to contract a marriage in this country, there is no machinery of the law under which he can contract a civil marriage. He has either to go to the Church or if he does not go to the Church, he has to go three miles outside the territorial limits of British India so that he may be once more subject to the English law of marriages and thus contract the civil marriage. This disability affects all classes and communities in this country and I therefore submit that upon the general ground it is the duty of the State—and when I say so, Sir, I have the high authority of Sir Henry Maine—it is the duty of the State to provide a secular marriage law for all its subjects. That is my first reason for coming back to this House with a Bill which I introduced as far back as 1921.

Nawab Sir Sahibzada Abdul Qaiyum (North-West Frontier Province : Nominated Non-Official) : What about the religious sanctity of such marriages ?

Sir Hari Singh Gour : I am coming to that. We pass on to the second reason. Honourable Members will see that with the enact-ment of Act XXX of 1923, all the difficulties with which the sponsors of that Bill had to combat, namely, difficulties about caste and religious sanction, have been done away with, and inter-caste marriages and inter-communal marriages have been legalised by Act XXX of 1923, so that we have covered the ground already. But I submit it is necessary for the national unity of this country and for establishing the statutory equality of all His Majesty's subjects in this country that, so far as the law is concerned, they should be free to contract a civil marriage with any person whom they like subject alone, as I have pointed out, to the natural law against consanguinity. That, I submit, is an invulnerable argument in favour of my Bill.

Now, I turn to some practical difficulties. If my Bill becomes law, inter-marriages between persons who are at the present moment excluded from the provisions of the Special Marriage Act would be permitted. Let me in this connection point out that, so far as the present law is concerned, it is perfectly legal even within British India for a person to marry any body provided he signs a declaration before the Marriage Registrar that he does not profess any of the religions, namely, Christianity, Jewish or Muhammadan religion, and Mr. Justice Greaves of the Calcutta High Court in a reported case pointed out that a declaration under the Special Marriage Act does not take away the personal right of that person to belong to that religion, in other words, that declaration is merely a formal declaration for the purpose of the Special Marriage Act. I beg to submit that it is possible to take two opinions on that subject. If I wish to marry and I am a Muhammadan or a Hindu, I go before the Registrar and say that I declare I do not profess the Hindu or Muhammadan religion. I make that declaration subject to a mental reservation and I submit that it should be the policy of the law not to encourage what would be a technical perjury, or a false declaration. I therefore submit that the law should provide a much more straightforward course and say, "If you wish to marry we will not compel you to subscribe to what may conceivably be construed to be a false declaration." As I have said, the Calcutta High Court have pointed out that this declaration is only a formal declaration required for a particular purpose. But I submit that even a formal declaration of that character should not be required of persons who wish to contract a civil marriage. I ask every Englishman and every Hindu and Muhammadan in this House, what right is it of a third person to ask me and my intended wife as to what religion we profess. The question what religion I profess or my intended wife professes is a question between me and my God, and he has no right to ask me that question, and in a secular Government. a Government pledged to religious neutrality, it is the less defensible. That Government can only ask what particular religion I belong to if it is the defender of any particular faith, but a Government which is purely secular and pledged to religious neutrality has got no right to ask me to confess, or my intended wife to confess to our religious faith. I, therefore, submit, that in the first place I follow the practice of all civilised nations in asking this House to support my Bill. In the second place, I appeal to those friends of mine who are for the nationalisation of this country, who desire that India should be united and communalism shall go. The good feeling that will be created between the different communities in this country with a possibility of inter-marriages between them would be a political asset the value of which can never be under-rated. Thirdly, I am asking this House to do in a straightforward manner what it is possible to do under the present statutory law of this country—only it requires a declaration which a scrupulous man may hesitate to sign, and if he dose not, he has to take a trip out of the territorial waters of India to contract the marriage. Therefore, I am only removing a disability which is purely artificial......

Mr. Deputy Prsident : The Honourable Member has repeated this argument three times.

Sir Hari Singh Gour : I suppose it has gained in emphasis and momentum by the repetition I have made. . . . .

Mr. Deputy President : It does not require any momentum if the country is so eager as the Honourable Member thinks it is.

Sir Hari Singh Gour : I am very glad to hear it, and that you are well aware of it.

Now, Sir, I pass on to the next question. I have purposely given notice of this motion for reference of my Bill to Select Committee, the reason being that this Bill was referred to a Select Committee before and there may be some differences of detail which may be required to be examined by the Select Committee. This Special Marriage Act of 1872 is becoming a patchwork. In 1872 it was intended to deal with a very narrow class of people. In 1923 its provisions have been further enlarged and we are now trying still further to extend the provisions of that Act. The Select Committee will examine the Special Marriage Act and I should be quite prepared in the Select Committee to accede to any suggestion that may be made consistent with the desire I have in view, of so wording the law as to serve the purpose I have in view, namely, of establishing a civil marriage law in this country. Sir, in making this motion I feel fortified by the fact mentioned on the last occasion, that I am only a co-author of this Bill which was countersigned by the Leader of the Swaraj Party, my Honourable friend, Mr. Srinivasa Iyengar and their Chief Whip, Mr. Goswami, and I have bespoken the support. . . . . .

Mr. Deputy President : But they are not in the House now to support you.

Sir Hari Singh Gour : That is because on the days we are building a nation when there is a nation-building measure in this House, the nation-builders are not here. Well, Sir, I venture to submit that I have the support of my Honourable friend, Lala Lajpat Rai and my······

Mr. Deputy President : He is also not in the House.

Sir Hari Singh Gour : And my Honourable friend, Mr. Jayakar, and a few leaders of Muhammadan opinion. I therefore feel that I stand on solid ground. I need not labour that point, and I, therefore, move that the Bill be referred to a Select Committee.

Mr. Anwar-ul-Azim (Chittagong Division : Muhammadan Rural) : I do not think it will be right for me just to keep quiet on a subject like this (*An Honourable Member* : "Louder please.") I may be called a reactionary from Sir Hari Singh Gour's point of view. I had the unique fortune of being trained in a liberal and calmer atmosphere. (*Mr. M. R. Jayakar :* "Louder please.") As a Cambridge man my views on this point and kindred subjects are very liberal. In spite of that I do not feel that I can support our distinguished legal colleague, Sir Hari Singh Gour, in his eager wish to bring about some sort of fusion amongst the various races and creeds that inhabit this land. He has quoted a great Muhammadan jurist in support of his Bill. On a little analysis it will be apparent that Mr. Ameer Ali never advocated anything which is not based on the Quran or the Shariat. You know, Sir, that the whole of the Muhammadan law and the traditions based thereon are the works of Muhammadan jurists who followed the Prophet from generation to generation. The Muhammadan viewpoint has been gathered, sifted and analysed and has been embodied in works of Muhammadan law. Here in 1928 I find that it has fallen to the lot of a Hindu gentleman in an indirect way to temper with our religious faith. I do not know what advantage there would be if this Bill is either referred to the country for their opinion or for that matter even to a Select committee. I am certain it will not get any support from any Mussulman of any consequence in any part of India. The law as it stands now absolutely meets the requirements of the non-Musum people who live in this country and they should be grateful to Dr. Gour for his enactment of 1923, known as Act XXX of that year. It is easy now for a Buddhist, Sikh, Jain or a Hindu to remove their caste difficulties and contract any kind of marriage they like amongst themselves. Dr. Gour will be very wise to let us all alone, because, if this Assembly passed this Bill, it will be giving some impetus to things which will be irreligious from our standpoint. Dr. Gour mentioned the precedents of the Moghul Emperors. I am certain I am not bound by precedents especially in this matter. The law as it stands is absolutely simple. A Muslim can not marry any body else who is not the follower of a revealed book, and the Moslem woman has no option, even if the non-Muslim man was the follower of a revealed book. My suggestion to Dr. Gour is that it would be absolutely wise on his part not to allow this Bill to proceed any further for we are very conservative in this religious matters.

Mr. Muhammad Yamin Khan (United Provinces : Nominated Non-official) : I congratulate my friend Dr. Gour on his persistent effort for a very long times in introducing this measure. I was in the first Assembly when he tried to bring in this measure, and I supported him even at that time. I think that the only possible way of creating a nation in India is by means of removing the difficulties in the way of marriges between different communities and people following different religions. The only hindrance in this country is the caste system which had been introduced before the Mussulmans came in and the caste people have been following their system with great rigidity in this direction. People belonging to castes are not willing to have any liberal ideas on account of their conservatism. India can never progress until this evil is removed altogather. The only way to remove this evil is to allow people to get married wherever they like. My friend Mr. Anwar-ul-Azim has tauched on points about Muhammadan law. I am equally anxious with him that nothing done in this Assembly should go against the religion of Islam. This Assembly has not right to sanction anything which the Mussalman religion does not allow ; but there are some difficulties which have to be considered. This is only a permissive law. This law only allows people who profess different religions, if they love each other, to get married. In such cases religion should not be allowed to stand in the way. If a man and a woman love each other their religion should not be allowed to stand in the way of their becoming husband and wife. This is sanctioning great immorality, if people love each other and are not allowed to get married, though they are husband and wife in the eye of God, and not in the eye of man. No religion which has got any liberalism in it will prevent such alliance. As far as Muhammadan law is concerned Islam allows every Mussulman man to get married to a lady who professes a religion in which she believes in the unity of God. This is according to the Mussulman association in the past with the Jews and the Christians. The real idea of this was that Muslims were persecuted in Arabia by idolators and therefore God did not sanction any Mussalman woman to get married to an idolator man because of the fear that she will be persecuted by the man to revert to that idolatory. A Mussulman man was not allowed to marry a woman who was an idolator, because they could not live happily together. The very essential ingredients of husband and wife living jointly are that they should live a happy home life, and if a man is a believer in the unity of God and the woman is an idolator, they cannot and could not possible be happy in their home life. If a woman is not an idolator, but she believes in the unity of God, I don't see any reason why a Mussulman man cannot be happy with her, whether she believes in Jainism, Hinduism or the Parsee religion, that is, the Zoroastrain faith, or any other religion. That is merely a notion and a wrong interpretation of the law which has been a hindrance in the way of so many lovers getting mated. I think, Sir, if India goes on towards becoming a nation we must be liberal, and unless a nation becomes liberal in its views, in the treatment of social and home life, it cannot be liberal in other matters.

There is one difficulty about which I am myeslf not sure, Sir, and it is a belief amongst the Mussulmans which has been engendered in their minds for a long long time, that a Mussulman woman cannot get married to any man who is not a Mussulman. That is the interpretation which has been put by different Mussulman doctors of law, that a Mussulman woman cannot get married to anybody else who does not profess the religion of Muhammad. That is the only possible difficulty, but for a man there is nothing.

I will deal first with the case of the Mussulman woman, because that is the only difficult problem. If a Mussulman woman happens to love a man who is not a Mussulman and she lives with him as his wife what is the law that can stop her from doing that ? The only thing is that the children who are born Mussulman will be considered to be illegitimate. If the man with whom she is living is a Hindu, their caste people would not regcognise them, so the children become illegitimate simply because a woman loves a man who does not profess the same religion. That is the main difficulty. The only thing which a non-Mussulman has to do is to provide these children by giving a kind of gift or by making a will. If there is no will or no gift made, then they do not inherit at all. That is the main difficulty in the way. I think you cannot in these days and in the twentieth century stop people from living together if they choose to do so. Recognition of them is what this measure aims at. It is this that in the case of these children born.

in this way of living if the parties go before a Registrar or a man who contracts the marriage, these children will be recognised as legitimate children, has having been born in wedlock. I think it a great hardship nowadays for these children and women, and one which should be removed by some measure of this kind which will give them some kind of status so as to be able to inherit the property of their parents, and the only thing possible is that this measure should be accepted.

Another case is about a Mussulman marrying a Christian or Jewish girl. If she remains a Christian or a Jew, that marriage is quite valid. The Mussulman professes his own religion and the lady professes her own religion, and all the children are legitimate.

(At this stage Mr. Deputy President vacated the Chair which was resumed by Mr. President.)

If a Mussulman marries a Hindu girl or a Jain or a Parsee girl, why should that illegitimatise his children. The marriage is not considered valid. There is no reason why the law should stand in the way of a man who wants to get married, who has got some lady from amongst the Hindus or Jains or Parsees whom he loves, and that lady wishes to retain her own religion. There is no reason why she should not be allowed to get married if she loves him and the man is not willing to sacrifice his religion. This law is very hard on the people who sincerely and devotedly belong to each other and only you are stopping them from getting their marriage sanctioned in the eyes of the world. Personally, Sir, I believe that if a woman professes a religion which believes in the unity of God, she should be allowed to marry any one and the law should sanction such marriage. There are very few amongst the Hindus now-a-days who are idolators. The majority of them absolutely believe in the unity of God. Of course there may be some who do not believe in any kind of deity. Some even do not believe in God. They may be atheists. Of course marriage with an atheist is doubtful and that cannot be valid, but in that case if she comes under the influence of a Mussalman and goes on living with him, she will certainly begin to believe in the same way.

Mr. K. Ahmed : What do the Arayans believe.

Mr. Muhammad Yamin Khan : They believe in the unity of God. This measure gives permission to these kind of people to set an example which may ultimately make India one nation, which would be accepted by anybody.

My friend Mr. Anwar-ul-Azim says he is not bound by the examples set by the Moghul Emperors. At the time of Akbar, whom I consider the first nation builder, the first man who was a real nationalist, he saw the consequence of the caste system prevailing in India, and he knew that India could never be united unless he as King set this example so that other people may follow his example. Unfortunately his example was not followed after a few generations, but it was he who laid down this principle and he started by being himself an example, and in those days whatever a King used to do was followed by everybody. Nobody had the right to question what the King did excepting the people who were doctors of law. At that time, even in the time of Jehangir and in the time of Shah Jehan: the Mussalman doctors of law did not question the validity of these marriages with Hindu ladies. Those laws were accepted and the children were considered legitimate—not only legitimate but they even became Emperors of India. In those days no illegitimate child would be welcomed by the people at large ; but these children were held to be all right and they were respected by all. Their example was followed in many quarters. So now, after three centuries, I think it is not right to go and question that. Whatever example towards progress has been set by them should be followed by this House which is a progressive House, which is a cosmopolitan kind of House in which we have got all kinds of people and we have all got the same interest at heart, namely, the benefit of India and the advancement of India, for making India a nation. All our efforts must be directed towards that end. As I have said I am not sure whether my views may be worth anything. I know there may be some differences of openion among the Mussalmans in India, and for this purpose I am not for sending this Bill to the Select Committee but I think this Bill should be sent to the Select Committee after it has been circulated for public opinion. But that our hands will be strengthened by knowing whether there are in India people who are ready to support this measure or whether they are still so conservating that they have no regard for bulding up the nation but would

stick to the caste system which has been the real cause of the distruction of the whole of Indian progress and which is still standing in the way of the achievement of the goal which most of us have in view,

Khan Bahadur Sarfaraz Hussain Khan (Patna and Chota Nagpur cum Orissa : Muhammadan) : Sir, I entirely agree with the views expressed by my Honourable friend Mr. Yamin Khan. I rise not only to support but to give my wholehearted support to him. What appeals to me most is that this Bill will tend to the advancement of the Indian nation. Howsoever much you may try to remove communal differences, you may have as many meetings as you like for the same purpose, but the result will not be satisfactory. Intermarriages surely will go a long way to advance the cause of the nation. That is the chief ground why I give my wholehearted support to the measure.

Now, Sir, from the Muhammadan point of view I can say that so far as I find in the holy Koran, marriage between person of different religions is not prohibited. The only thing that is objected to is marriages between Mominins and Mushrikins. Now Mominins are believers in and worshippers of one God while Mushrikins worship all shorts of material object except God ; so marriages between persons who worship one God and one God alone are permitted ; but marriages with persons who worship material objects—we may call them idolators—are discouraged. This Bill is purely permissive. There is no compulsion. The Bill if passed is bound to raise the standard of marriages. Besides, it will tend to monogamous marriages as well.

Now regarding the question of marriage, there is no doubt that in our religion permission is given to marry four wives, but then the permission is on condition that the man or men who marry more than one wife should do equal justice to all the wives and should provide equally for there maintenance. Is it very easy for a man to do equal justice to all his wives ? So that permission also tends to monogamy. The prophet has given, I mean the holy Koran has no doubt given permission to marry up to four wives. This Bill tends to monogamy which is according to the injunction of the holy Koran, I mean taking the rationalistic view of it. Monogamy raises the standard of our women and also creates good feelings, domastic felicity, and peace in the family. So, Sir I say that, as this Bill tends to monogamous marriages, as this Bill tends to the elevation of woman and as this Bill is not against the Muhammadan law or the injunction of the holy Koran, I wholeheartedly support the motion that the Bill be referred to a Select Committee. I would not however object to a motion to circulate the Bill for eliciting opinions thereon, but in that case my fear is that the matter will be shelved. This Bill has been before the House for a long lime and there is no need to send it out for eliciting opinions. When the Bill goes to Select Committee Muhammadans will be there. Hindus will be there, both orthodox and advanced—in fact every school of thought will be there and they can change anything they do dot like in the Bill. So there should be no real objection to the motion to refer the Bill to Select Committee unless there is some lurking desire in the minds of some not to go on with it. Of course one cannot say so openly, but unless there is some such desire, there is no reason whatsoever for sending the Bill out to elicit openions. The question is very simple, and having said so much from the Muhammadan point of view as well as from the rationalistic point of view, I support this motion and resume my seat.

The Honourable Mr. J. Crerar (Home Member) : Sir, I move that the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinions thereon.

I think that this motion will commend itself to the House because even during the course of the present debate, there has already been revealed a very remarkable degree of diversity and even of confusion of thought on the subject matter of the Bill. I do not however desire my motion to be in any way misconceived. So far as the objects which the Honourable the Mover propounds to himself are concerned he will I am sure receive a great deal of sympathy and support in this House. I am however myself in dealing with the particular motion which the Honourable and learned gentleman has moved, confronted by a preliminary difficulty of a somewhat formidable character. I am very doubtful indeed whether in point of fact the Bill which the Honobrable Member has moved to be refered to Select Committee would attain the objects which he has in view. If I were not reluctant to ascribe to the Honourable and learned gentlemen a failure to appreciate exactly the precise state of the law in the matter, I should almost surmise that the

amending Bill which he proposes was framed with regard to the law as it stood in the Act of 1872 and without regard to the amendment which were introduced by Act XXX of 1923. I must point out to the House that, though at this stage it would be entirely inopportune and doubtless not in order for me to go into any question of detail I must point out in regard to the main operative provision of the Bill that most serious difficulties must undoubtedly arise : and I call attention to them not because I think that the objects propounded by the Honourable Member cannot in some form be attained (?) my object is simply to point out that the Bill as it stands is a Bill which could hardly be dealt with by a Select Committee in order to produce the result which are desired. The Special Marriage Act if it were amended in the sense proposed by Sir Hari Singh Gour, would in so far as one of its main operative provisions is concerned read as follows :

"Marriages may be celebrated under this Act between persons domiciled in India or between persons, each of whom professes one or other of the following religions, that is to say, the Hindu, Budishist, Sikh or Jaina religion."

Now, Sir, I confess that I have very grave doubts in my own mind as to what that means. I have very grave doubts, which I think will be shared by others more learned in the technicalities that myself, as to what the effect of such a provision would be. The Act as amended in 1923 did a thing which was perfectly specific. It created two categories of persons quite distinct and quite definable namely, those who do not profess the Christian or Jewish or Hindu or the Muhammadan or the Parsee or the Buddhist or the Sikh or the Jaina religion ; and another category of persons each of whom professes the Hindu, Buddhist, Sikh or Jaina religion. Now Sir, it is important to remember the very important consequences flowing from the question as to which of these categories a person falling within the provisions of this Act belongs. If he or she belonged to the category of those who profess the Hindu, Buddhist, Sikh or Jaina religion, certain very important consequences relating to severance from families right of adoption and succession to property result—all very important provisions which were deliberately inserted by the select Committee of 1923. Now, if for one of those perfectly definite categories you substitute the comprehensive category of persons domiciled in India, what precisely the consequence of legislation of that kind would be appear to me extremely doubtful. It is not e.g., by any means clear that a Hindu marrying a person of any of the other religions would or would not be treated as being within the first category, that is to say, as a person domiciled in India : and it might become a matter for very serious consideration whether the provisions which the Select committee of 1923 considered necessary would in point of fact be applicable.

However that may be, I do not, wish to press that point because I think there will be a general sense in this House—at least I hope there will be—in favour of circulating this Bill. Sir Hari Singh Gour pointed out that when the Bill which he first devised was circulated for opinion a considerable measure of support was obtained. I am not concerned to dispute that or to underestimate it. What I do desire to point out is that when the Bill ultimately came before the Select Committee the grave difference of opinion that arose in the Select Committee was precisely upon the point which Sir Hari Singh Gour now wishes to enact by his present Bill. The Select Committee of 1923, after prolonged discussions—and obviously discussions in which great diversity of opinion emerged—came by a large majority to the conclusion that the scope of the Bill at that time should be limited to the Hindu, Buddhist, Sikh and Jaina communities, in addition to the persons to whom the Act already applied. In short, Sir, the Christian, Muhammadan, Jewish and Parsee communities were expressly excluded from the scope of the Bill. Now, my point is this : I do not wish to express myself or Government as in any decree hostile to the objects which the Honourable Member has in mind. But I do venture to emphasise and to accentuate the great desirability, before this House commits itself to the principal of the Bill by referring it to a Select Committee, of giving these communities who are principally concerned by the Bill or at any rate by the intention of the Bill, an opportunity of expressing their views precisely upon the issue as it now stands. As I see a large degree of diversity of opinion has already manifested itself in this House ; and I do not think the Honourable and learned gentleman would really be wise in taking a course of action which would be calculated to give an impression that he desires to rush this legislation through. At any rate I desire to make my own position and the position of Government perfectly clear. I desire to

express no hostility whatever to the enlightened views expressed by the Honourable Member and intended to be promoted by this Bill. I express, however the gravest doubts as to whether the Bill would effect these objects. I express the gravest doubts as to whether a Select Committee could so amend this Bill without entirely changing its character as to effect those objects : and finally I urge once more that in view of the diversity of opinion which has already manifested itself in this House—a diversity of opinion which is also likely to be felt outside this House—that we should have a more extended consultation of public opinion particularly in the communities expressly concerned before we commit ourselves any further.

Maulvi Muhammad Yakub (Rohilkund and Kumaon Divisions . Muhammadan Rural) : Sir, call me a conservative : call me a man who comes in the way of the progress of the country : but as long as I profess Islam, as long as I am a Mussalman, I am bound to oppose the provisions of this Bill so far as they relate to Mussalmans.

Mr. N. M. Joshi (Nominated Labour Interests) : On a point of order, Sir, May I ask whether it is right to go on with the discussion of the merits of the Bill when a motion has been made that the Bill be circulated ? What I want to say is that there are other Bills to be moved....

Mr. President : The original motion is that the Bill be referred to a Select Committee, to which an amendment has been moved that the Bill be circulated for eliciting public opinion.

Mr. N. M. Joshi : My point of order was that when a motion is made that the Bill be circulated, that motion should first be got rid of.

Mr. President : Both the motions are before the House.

Maulvi Muhammad Yakub : As regards the provisions of this Bill being in conflict directly, not only with the Muhammadan law, that is the *Fiqah*, but with the express words of the Koran, I will only refer this House to the very book on Muhammadan Law which my friend the Mover of the motion, in charge of the Bill, has referred you to namely, Muhammadan Law by the Right Honourable Ameer Ali. On page 327 of his book, Mr. Ameer Ali clearly says :

> "The fifth relative prohibition springs from *shirk* or polytheism ; the observant student of the law of the two principal sects which divide the world of Islam cannot fail to notice the distinctive peculiarity existing between them in respect of their attitude to outside people. (The nations who adopted the Shiah doctrines do not seem to have come into contact to any marked extent with the Christian races of the West, while their relations with the Mazo-Zoroastrians of the East were both intimate and lasting. The Sunnis, on the other hand, seem always to have been more or less influenced by the western nations. In consequence of the different positions which the followers of the two sects occupied towards non-Moslems, a wide divergence exists between the Shiah and Sunni schools of law regarding intermarriages between Moslems and Non-Moslems.
>
> It has already been pointed out that the Koran, for political reasons, forbade all unions between mussalmans and idolators. It said in explicit terms 'Marry not a woman of the polytheists (*mushrikin*) until she embraces Islam'. But it also declared that 'such woman as are muhsinas (of chaste reputation) belonging to the Scriptural texts' or believing in a revealed or moral religion, 'are lawful to Moslems'."

Therefore, Sir, it is quite clear that, according to the Muhammadan law, a Muhammadan man or woman cannot marry a man or woman who is not a Unitarian. Now, I do not contend that Mussalmans can marry only Christians or Jews, but under the Muhammadan law a marriage between a musalman and a non-Musalman whose religion is Unitarian is permissible, and therefore, so far as these marriages go, you do not require to invoke the provisions of the special Act to make it valid. To make myself clear, I may say that under the existing Muhammadan law a marriage between a Musalman and a member of the Brahmo Samaj is quite valid and therefore you do not......

Mr. M. R. Jayakar (Bombay City : Non-Muhammadan Urban) ? Is there any instance on record of such a marriage being held valid ?

Maulvi Muhammad Yakub : If a marriage of that character had taken place, and if the matter had come before a judicial tribunal, then it would have been held that such a marriage was valid.

Sir Hari Singh Gour : What is the machinery for it ?

Maulvi Muhammad Yakub : The machinery would be Ijab and Kabul, which is necessary according to Muhammadan law. It is a civil contract. The only two fundamental conditions for a marriage according to Muhammadan law are a proposal and acceptance. No other formalities are necessary, though certain formalities are observed as a

matter of custom, but the two fundamental conditions necessary for a valid marriage according to Muhammadan law are a proposal and acceptance.

Khan Bahadur Sarfaraz Hussain Khan : Are not Muhammadan marriages registered in some of the provinces of India before the Registrar ?

Maulvi Muhammad Yakub : But the marriage must be performed according to Muhammadan law and between parties who observe the Muhammadan law. For instance, we have got our Kazi who performs the marriage and after that ceremony is over, the marriage is regitered in the Kazi's register. What I mean is, marriages between those who are Muhammadans and those who are Unitarians are permissible and you do not require any special law for them. So far as marriages between Musalmans and those who are not Unitarians are concerned, they are invalid, and no special law which may be enacted in this House can make such marriages valid in the eye of the Muslim law. Sir, you will be creating many difficulties if you enact such a measure. For instance, you come in direct conflict with the provisions of the Muslim law when you allow the marriage of a Muslim with a man or woman who is not a Unitarian. On the other hand, for the sake of succession and inheritance, you would be administering the Muhammadan law to the children born of such unions. That is to say, you would derive all the benefits of the Muhammadan law so far as succession and inheritance go, while you came in conflict with the provisions of the law when you allow the marriage between a Muslim and one who is not a Unitarian. No special marriage law is enacted by the Legislature for Muhammadans, because they only adhere to the *Shariat* and to their scriptures. They have shown no special desire to modify the divine law through the interference of human agency, and it would be absurd on the part of my friend Sir Hari Singh Gour to thrust a law upon a community which does not want it. Honourable Members will remember that whenever this question was brought up before the Legislature, there was considerable opposition to it from the entire Muslim community. The House will also remember that when the late Sir Bhupendra Nath Basu tried to introduce this Bill in the old Imperial Legislative Council, Maulana Mohammed Ali wrote a series of articles in his paper called the *Comrade* against the measure being applied to Muhammadans. I would therefore warn Government that if they try to interfere in the matter of the religion of Mussalmans in this country, which is very dear to them, they will be confronted with consequences which it will be very difficult for them to foresee just at present. As the present motion is that the Bill be circulated for eliciting public opinion which, I hope, will be carried by the House, I do not think I need detain the House by opposing the motion, because if the Bill again comes before the House, I shall have the opportunity of speaking in greater detail against this measure. With these few observations, Sir, I entirely oppose the provisions of this Bill so far as they relate to the Mussalmans.

Rai Sahib Harbilas Sarda (Ajmer-Merwara : General) : Sir, *I rise to support the motion of my Honourable friend Sir Hari Singh Gour.* The object of the Bill is to extend the benefits of the Special Marriage Act of 1872 in their entirety to Indians generally. At present these benefits are not applicable in their entirety to those who profess the Hindu, the Muslim, the Jaina or the Sikh faiths, and I think, the time has now come when legislative action should be taken in the matter with which the Bill deals. The marriage law of the Hindus as *at present administered by the courts in British India is neither what is* laid down in the ancient Hindu texts nor is it in accordance with that practised in ancient times in this country. The present law, even as modified by the Act of 1923, is based partly on recent texts only a few hundred years old but chiefly on custom, and came into existence when Hindu society was in a peculiar state of evolution and was surrounded by peculiar circumstances. The conditions of life have during the last *half century greatly changed and are changing so fast that the law* has become very irksome in many cases. Owing to the altered circumstances *of life in India and the acceptance of new ideals of life and conduct,* the marriage law of the Hindus, in its present form and with its present limitations, has begun to operate against the well being and solidarity of the Hindu community. Such a thing occurs at sometime or other in the case of all growing communities. The remedy adopted in other countries was not to take in hand the reform of the institution but to provide legal facilities for escape from its galling conditions. Such, I believe, is the origin of the Civil Marriage Acts in various countries, and such Acts are as a rule permissive in character and not mandatory.

The spread of education, the enormous facilities for travel, the ever increasing intercourse between members of different Hindu caste and constant contact with non-Hindus of education and culture, coupled with the great difficulty, and sometimes impossibility, of finding suitable matches within a limited circle, have made the question of marriage a problem of great importance for the Hindus. The emancipation of the intellect and the will from the fetters imposed by prejudice, due to education and contact with the more advanced peoples of the world, and the pressure of conditions of life now obtaining in the country which is no longer an exclusive, self-sufficing and isolated part of the world, make it a matter of increasing difficulty for Hindus to conform to all the prevailing social customs which mostly originated under political, economic and social conditions which have disappeared or are fast disappearing. The Hindu social fabric of the present day has uddergone such a change during the course of its evolution from the time of Manu and Yagnyavalka that it is sheer mockery to accept or reject an important social measure solely on the ground that it does or does not conform to the old Hindu texts.

Leaving aside the law laid down in the old texts, and coming to consider the actual practice of marriage amongst the Hindus in ancient times, we find that great freedom was enjoyed by the people in the matter. I will give three or four historical instances to show what freedom was allowed in ancient India in the matter of marriage. Leaving aside the well known historical instance of the marriage of the Hindu Emperor Chandra Gupta with the daughter of the Greek King Seleucus, so graphically described by Dr. Vincent Smith as having taken place about 303 B. C., the Junagarh inscription of the year 72 Saka era (A. D. 150) quoted in the Epigraphia Indica, Vol. 8, describes the marriage of Rudradaman, a Shak, with the daughters of the Hindu King at Swayamvars. The Kanheri cave inscription records the marriage, performed about 155 A. D., of Raja Vashishti's son, Satkarni of the Andhra family, with the daughter of the Kshtrapa Rudra, a non-Hindu King.

Mr. M. S. Aney (Bearer Representative) : Was he a non-Hindu ?

Rai Sahib Harbilas Sarda : Well, it is given there in the inscription. The girl perhaps later on became a Hindu.

Mr. M. S. Aney : Is it written there that the girl later on became a Hindu ? I would like you to quote the passage.

Rai Sahib Harbilas Sarda : The 6th century A. D. inscription of the cave of Culvada near Ajanta mentions also a similar instance of intermarriage. The celebrated Atpur inscription of Shaktikumar of 977 A. D. mentions the marriage of Shaktikumar's ancestor Allata with Hariyadevi, a Hun princess. It is mentioned that the princess belonged to the Hun race. History records that the mother of Bappa, the great King of Chitor, was of Mauriya family. The 12th century inscription of the Kalachuri King Yashkarandeva mentions that Yashkarandeva's father Karandeva had married Avaladevi, a Hun princess. Many other instances of marriages between Hindus and non-Hindus in ancient times can be cited. I would cite an instance of a very recent date. On the 17th of March this year, Miss Miller was married to the Maharaja Holkar according to the orthodox Hindu rite , which fact goes to show that marriages between Hindus and non-Hindus are in accordance with the tenets of Hinduism.

Sir Walter Willson : But she is a Hindu now.

Rai Sahib Harbilas Sarda : I think in the interests of the Indians generally and the solidarity of the Hindu community this matter should be taken into consideration by the House and the principle of the Bill accepted.

Mr. N. M. Joshi : I move, Sir, that the question be now put.

The motion was adopted.

Sir Hari Singh Gour : Sir, I propose to detain this House for a very few minutes. So far as the Honourable the Home Member's remarks are concerned, I thank him at any rate for small mercies. He says that the attitude of the Government is not hostile to this measure. I wish he had permitted himself to say that it was one of benevolent neutrality, and that, I submit, would have been more in consonance with the declared policy of the Government of India. But I will assume, Sir, that is what he implied. Now his motion is dilatory motion for circulation of the Bill. As I pointed out, Sir, this Bill in various forms has

been under circulation from 1868 down to 1921 and within the last 60 years it has held the ground so far as this country is concerned. In 1921 this precise measure which I have the honour to sponsor to-day was sent out for circulation to the provinces and I have already referred, Sir, in my opening speech to the opinions then elicited. I venture to submit that the opinions of the country have since strengthened in favour of my measure and the Muhammadans and Parsis and Jews and Christians and others who would be directly or indirectly affected by this Bill are now more in favour of my measure than they were at any time past. It is for this reason that I have ventured to ask this House to commit this Bill to a Select Committee. The Honourable Mr. Crerar has criticised some of the provisions of it. It does not become me, Sir, to reply in detail to the criticisms of the specific clauses of the Bill because, as I understand the Standing Orders, if my motion is accepted, this House would only stand committed to the broad principle of the Bill and leave the Select Committee to put it into proper and legal shape, and it is for this reason, Sir, that I do not wish to go into the details of the various clauses of this Bill. I may, however, make one suggestion to the Honourable the Home Member if he wishes that this Bill be circulated for the purpose of eliciting public opinion thereon. He may be at any rate good enough to expedite the circulation of the Bill so that it may come on during the Simla Session. I know, Sir, the delay consequent upon such motions. The last time in 1921 when I had made a similar motion, it took about 2½ years before opinions could be collected and it was only towards the end of 1923 that we were able to place a much attenuated measure on the Statute-book. I hope, therefore, Sir, that the Honourable the Home Member will be good enough to expedite the collection of opinions which he can by fixing a certain time by which opinions should be received. I have another suggestion for the favourable consideration of the Honourable the Home Member You will remember, Sir, that, when I moved for the consideration of my Children's Protection Bill, the Honourable the Home Member suggested the formation of a committee that should collect opinions and draw up a report. I wish to ask whether the provisions of this Bill may not be more conveniently entrusted to this Committee. Both these measures are measures of social reform and, while they will be touring in the country, they will be collecting opinions on the Age of Consent Bill, and they might also collect opinions on the provisions of the present Bill. All I am anxious about, Sir, is that the term of office of the Members of this Assembly may not expire before the opinions from the provinces are returned. With these remarks, Sir, I feel that I should be not fair to myself and to the Bill if I acceded to the motion of the Honourable the Home Member unless he is prepared to give me an assurance that the opinions will be so expedited that the Bill would be likely to come up during the autumn Session of the Legislative Assembly, and I further ask, and ask in all earnestness, the Honourable the Home Member to consider the desirability of entrusting the inquiry to a committee, the committee which he has promised to form on my Children's Protection Bill.

Mr. President : The original question was :

"That the Bill further to amend the Special Marriage Act, 1872, be referred to a Select Committee."

Since which the following amendment has been moved :

"That the Bill be circulated for the purpose of eliciting opinions thereon."

The question is that that amendment be made.

The motion was adopted.

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C 462

১০২০ সংখ্যা

১৮৫০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৫। শক ১৮৫০। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯। শ্রাবণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—দ্বিতীয় ভাগ
শ্রাবণ, ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

১০২০ সংখ্যা　　　　　　　　　　　　１৮৫০ শক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে　　　　　　　　　　　　চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

সহঃ সম্পাদক—শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি, এস-সি।

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫।

অঞ্জলি।

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১৯। অঞ্জলি—হোতা ও গুরু দেবতা।

১। হে দেবদেব! তোমাকে আমার কিছুই অদেয় নাই। আমার যাহা কিছু ছিল সকলই তোমাকে দিয়াছি। আমার মত ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী তোমার মহিমা কি-ই বা কীর্ত্তন করিব? তোমার যে শক্তি দ্বারা ব্রহ্মচক্র পরিচালিত হইতেছে, সেই শক্তির অন্ত সন্ধান করিতে গিয়া মন ও বাক্য প্রতিনিবৃত্ত হয়। আমাদের সমস্ত বুদ্ধিবৃত্তি মিলিত হইয়াও তোমাকে ধারণা করিতে সক্ষম হয় না।

২। হে অন্তরতম পরমেশ্বর! তুমি আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হও। তুমি আমাদের এই সভাকে সাধুভাবে পরিপূর্ণ কর এবং তুমি আমাদের এই সভায় সর্ব্বাগ্রে উপবেশন কর, যাহাতে আমাদের উপর কোন শত্রু দ্বেষহিংসার আঘাত দিতে না পারে। দ্যুলোক, ভূলোক ও অন্তরীক্ষ আমাদের সকলকে রক্ষা করুক। আমাদিগকে তোমার প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত রাখ এবং তুমি আমার প্রতি প্রসন্ন হও।

৩। হে বিঘ্নবিনাশন! তুমি আমাদের শত্রুগণকে বিনষ্ট করিয়া দাও এবং আমাদের কর্ম্মপথে তাহাদের স্থাপিত সমস্ত বিঘ্ন দগ্ধ করিয়া দাও। আমরা তোমারই শরণাগত। তুমি আমাদের এই সভাস্থ সিংহাসনে উপবেশন কর। আমরা আমাদের অশ্রুজলে তোমার চরণ ধৌত করিয়া দিই।

৪। তোমার একটী মঙ্গলনিশ্বাসে আমাদের সমস্ত জীবনের পাপরাশি ধৌত হইয়া যায়। তোমাকে আমরা সপরিবারে ভজনা করি। তোমাকে আমরা নমস্কার করি। হে প্রাণের দেবতা! তুমি আমাদের সকলের প্রাণে শুভ বুদ্ধি ও শুভ ভাবসকল নিত্য প্রেরণ কর। তুমিই আমাদের সকল কর্ম্মযজ্ঞের একমাত্র হোতা। তুমি আমাদের কর্ম্মযজ্ঞের নির্বিঘ্নে নিত্য উদ্‌যাপন করিবার ক্ষমতা ও অধিকার প্রদান কর। সমস্ত ধন ও ঐশ্বর্য্যের তুমিই একমাত্র প্রেরয়িতা। প্রচুর ও বিচিত্র ধনৈশ্বর্য্যে আমাদের গৃহ পরিপূর্ণ করিয়া তুমি আমাদিগকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত পরোপকার-ব্রত গ্রহণ করাও।

৫। তুমি আমাদের গুরু। তুমি সকল গুরুর পরম গুরু। আমাদের পূর্ব্বতন যাঁহারা যত কর্ম্মযজ্ঞের আরম্ভ করিয়া সুখে শেষ পর্য্যন্ত

সম্পাদন করিয়া গিয়াছেন, তাঁহারা সকলেই তোমা হইতে সেই সকল অনুষ্ঠান সুসম্পন্ন করিবার উপযুক্ত শুভ বুদ্ধি ও ক্ষমতা লাভ করিয়াছিলেন। আমরাও যে সকল কর্ম্মযজ্ঞ আরম্ভ করিয়াছি, সেই সকল সুসম্পন্ন করিবার ক্ষমতা ও অধিকার তুমি আমাদিগকেও প্রদান কর। আমরা সকলে মিলিতকণ্ঠে তোমার বিজয় ঘোষণা করি ও তোমার নামে উলুধ্বনি দিই।

১০০। অঞ্জলি—ধর্ম্ম ও কর্ম্ম প্রবর্ত্তক দেবতা।

১। তুমি অবিনশ্বর, জরাশূন্য ও মৃত্যুরহিত। তুমি সত্যস্বরূপ। তুমি মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা। তুমিই কর্ম্ম ও ধর্ম্মের একমাত্র প্রবর্ত্তক। তুমিই প্রতি মানবের অন্তরে থাকিয়া তাহাকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছ। আমরা যেন স্বইচ্ছায় সেই মঙ্গলের পথে চলিতে থাকি। তোমার মহিমা কীর্ত্তন করিয়া শেষ করিতে পারি না, এবং সেই কারণে আমাদের মনপ্রাণ অতৃপ্ত থাকে।

২। তুমি যে সুখকর কল্যাণকর, সুখ ও কল্যাণের আকর, তোমাকে নমস্কার করি। সূর্য্য যেমন তাহার কিরণ সকলের উপর সমভাবে বর্ষণ করে, তোমারও মঙ্গলদৃষ্টি সেইরূপ আমাদের সকলের প্রতি সমানরূপে নিপতিত আছে। তোমার স্নেহপূর্ণ আহ্বানেই আমরা তোমার চরণতলে সমবেত হইয়াছি। তোমার সঙ্গে আমাদের নিগূঢ় ও নিবিড় সম্বন্ধ। আমরা তোমাকে আমাদের সমস্ত হৃদয়ের শ্রদ্ধাভক্তি নিবেদন করিতেছি, তুমি তাহা তোমার স্নেহ-হস্তে গ্রহণ কর।

৩। তুমি এই জগতের সৃষ্টিস্থিতিপ্রলয়-কর্ত্তা। তুমি এই জগতে জীবজন্তু জন্মিবার বহু পূর্ব্ব হইতেই তাহাদের প্রয়োজনসিদ্ধির উপায়-সকল বিধান করিয়া রাখিয়াছ। তুমি সকল সৌন্দর্য্যের আকর। তুমি সুন্দর হইতে সুন্দর-তর। তোমার চরণরেণু মস্তকে গ্রহণ করিবার জন্য আমরা আসিয়াছি। তুমি আমাদের মস্তকে বিশ্বজয়ী হইবার আশীর্ব্বাদ প্রদান কর।

৪। তুমি আমাদের অগ্রণী, তুমিই আমাদের একমাত্র নেতা। তুমি আমাদের শত্রুগণের নিকট হইতে আমাদের অনিষ্ট করিবার শক্তি ও ক্ষমতা হরণ করিয়া লও। তুমি আমাদিগকে জগতের মঙ্গলসাধনের শক্তি ও ক্ষমতা প্রভূত পরিমাণে প্রদান কর। তুমি আমাদের অন্তরে তোমার মহনীয় কীর্ত্তি ঘোষণা করিবার ইচ্ছা ও শক্তি প্রেরণ কর। তোমার নামে আমরা যে সকল বন্দনাগীত রচনা করিতেছি, তুমি সেই সকল শ্রবণ করিয়া আনন্দিত হও।

৫। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। তুমি আমাদের সকলই জানিতেছ। তুমি আমাদের প্রত্যেকের প্রতি চিন্তা প্রতি ভাব জানিতেছ। পূর্ব্বতন আচার্য্যেরা আমাদিগকে এইরূপই কহিয়াছেন। তুমিই আমাদের অন্নদাতা। তোমারই প্রসাদ প্রাপ্ত হইয়া আমাদের দেহ মন ও আত্মা বলে বীর্য্যে, জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে পুষ্টিলাভ করিয়াছে।

উদ্বোধন।

সকল দুঃখবিষাদের মধ্যে, সকল বিপদ আপদের মধ্যে যে মঙ্গলবিধাতার অনিমেষ মঙ্গলদৃষ্টি নিয়ত জাগ্রত আছে, এস, সেই মঙ্গলবিধাতার মঙ্গলদৃষ্টিতে আমাদেরও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখিয়া তাঁহার চরণপূজায় প্রবৃত্ত হই এবং জগতের হিতসাধনে আপনাদিগকে নিযুক্ত রাখি। তাঁহারই মঙ্গলবিধানে আজ আমরা এই ব্রাহ্মসমাজের উপাসনার ভিতর দিয়া তাঁহার চরণপূজার অবসর পাইয়াছি। এমন অবসরকে যেন হেলায় না হারাইয়া ফেলি। এই সময় সমস্ত দৃষ্টিকে অন্তরের গভীরতম প্রদেশে নিবিষ্ট কর—এসময় বিভবসম্পদের কথা, দুঃখবিপদের কথা সমস্তই অন্তরের বাহিরে রাখিয়া দিয়া, কূর্ম্ম যেমন ভয় পাইলে নিজের অঙ্গসকল নিজের ভিতর অন্তর্হরণ করে, আমাদেরও সেইরূপ সমস্ত মনোবৃত্তিকে অন্তরে আকর্ষণ করিয়া লইতে হইবে। আতস কাচ যেমন বিক্ষিপ্ত রৌদ্রকে সংহত করিয়া তাহার শক্তিকে উদ্দীপ্ত করিয়া তোলে, সেইরূপ আমাদেরও ঐ অন্তর্নিহিত মনোবৃত্তি আমাদের সমস্ত শক্তিকে সংহত করিয়া শক্তি-ময় করিয়া তুলিবে। সেই উদ্দীপ্ত সংহত শক্তির সহায়তা গ্রহণ করিয়া ব্রহ্মনাম প্রচারে অগ্রসর হও। প্রতিজনের হৃদয়ে ব্রহ্মনাম ধ্বনিত হইয়া উঠুক—সর্ব্ববিধ পরাধী-নতার কঠিন নিগড় ঝনৎকারের সহিত খসিয়া পড়িবে। মুখে শুধু ব্রহ্মনাম আওড়াইলে চলিবে না। অন্তরে বুঝিতে হইবে, উপলব্ধি করিতে হইবে যে তিনি সকল মঙ্গলের নিদান, সর্ব্ববিধ স্বাধীনতার উৎস। নিদ্রা, আলস্য ও জড়তাকে পদতলে দলিত করিয়া ফেল। শুভকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়া জগতের বন্ধ

হইতে মহামারী, মৃত্যুর বিভীষিকা প্রভৃতি বিদূরিত করিবার পক্ষে সহায়তা কর। দুঃখবিষাদ রোগশোক আসিবার অবসর দিও না। জ্ঞানে, শুভকর্ম্মে ও ভক্তিশ্রদ্ধাতে দেশের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠুক। সন্তানগণের যত্ন ও চেষ্টার ফলে দেশমাতা জগতের মহাসভায় সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করুন। দেশের যে প্রকার অবস্থা, তাহাতে একটী মুহূর্ত্তও ব্যর্থ করিলে পাপতাপের আঘাত আমাদিগকে আকুল করিয়া তুলিবে। ব্রহ্মচর্য্য অবলম্বন করিয়া দেহ-মনকে সবল করিয়া তোল; তুমি সহজেই ভগবানের চরণস্পর্শলাভে অগ্রগামী হইয়া পড়িবে; তখন তোমার উন্নতির সকল দ্বার উন্মুক্ত হইয়া যাইবে; তোমার শরীর মন ও আত্মা হর্ষে ও আনন্দে রোমাঞ্চিত হইয়া উঠিবে। বিবাদ-বিসম্বাদের কথা ভুলিয়া যাও। ভগবানের অমৃতসাগরে ডুবিয়া গিয়া মৈত্রীকে জীবনের নিয়ামক কর। দেশে অচিরেই শান্তি বিরাজ করিবে।

আশা ও নিরাশা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অতীতের দিকে যখন আমাদের দৃষ্টি নিপতিত হয়, তখন আমরা দেখিতে পাই যে কোন্ বিষয়েই বা আমরা সাফল্য লাভ করিয়াছি, আর কোন্ বিষয়েই বা আমরা কৃতকার্য্য হইতে পারি নাই। এই বিষয়ে চিন্তা করিতে করিতে মনে হয় যে, আমরা আপনাদিগকে এই বলিয়া বুঝাইতে চাই যে, কৃতকার্য্য যাহা কিছু হইয়াছি, সে সমস্তই নিজের গুণে, আর অকৃতকার্য্য যাহা কিছু হইয়াছি তাহা অপরের দোষে। অধিকাংশ স্থলেই আমরা মনে করিতে চাই যে, যে যে বিষয়ে আমরা অকৃতকার্য্য হইয়াছি, তাহাতে আমাদের নিজের কোনই দোষ ছিল না; একটুখানি যদি কাহারও সহায়তা লাভ করিতাম, একটুখানি যদি কেহ আমার দিকে তাঁহার দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিতেন, তাহা হইলেই আমি নিশ্চই কৃতকার্য্য হইতাম। অমুক ব্যক্তি সময়ে সাহায্য পাইয়াছিলেন, তাঁহাকে অমুক ব্যক্তি পৃষ্ঠপোষকতা করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি কৃতকার্য্য হইলেন। এই প্রকারে জীবনক্ষেত্রে নিরাশার বিষবীজ ছড়াইয়া সমস্ত জীবনটাকে অকর্ম্মণ্য করিয়া তুলিবার উদ্যোগ করি। যে সকল তরুণ যুবক নানা কারণে জীবনসংগ্রামে অকৃতকার্য্য হইয়াছেন, বৃদ্ধদিগের অপেক্ষা তাঁহাদিগেরই মধ্যে এই ভাবটী বড়ই প্রবল হইয়া উঠে; তাঁহাদের পরস্পরের মধ্যে তর্ক-বিতর্কে ও আলোচনা-সভায় এই প্রকার উক্তিই বড় বেশী শোনা যায়।

এই ভাবটাই তো কৃতকার্য্য লাভের পথে সুবৃহৎ অর্গলরূপে দাঁড়াইয়া থাকে। ইহার ফলে নিরাশা মানবের মনে তাহার অজ্ঞানত যে অধিকার স্থাপন করে, তাহাই তো মানবকে উন্নতিলাভের জন্য অগ্রসর হইবার পথে প্রতিপদে বাধা প্রদান করে। ইহা সত্য বটে যে, আমরা অনেক সময়ে দেখি যে, কেহ পৃষ্ঠপোষকরূপে দক্ষিণ হস্ত প্রসারিত করিয়া দিলে অনেক সময়ে সংসার-সংগ্রামে জয়ী হওয়া যায়। কিন্তু অনেক সময়ে অতিরিক্ত সাহায্য লাভের ফলে বিপরীত ফলও ফলিতে দেখা গিয়াছে। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, অনেক ধনী পিতা নিজেদের সন্তানগণকে বিদেশে লেখাপড়া শিখিবার জন্য যেটুকু আবশ্যক, তদপেক্ষা অনেক বেশী টাকা তাহাদের হস্তে দিয়া তাহাদের সর্ব্বনাশসাধনের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমার মনে পড়ে, সংবাদপত্রে পড়িয়াছিলাম যে, আমেরিকার এক ক্রোরপতি তাঁহার পুত্রের হাতে ঠিক সুখে সচ্ছন্দে চলিবার উপযুক্ত অর্থ দিতেন; পাছে ছেলে মন্দ পথে পদ নিক্ষেপ করে, সেই আশঙ্কায় অতিরিক্ত টাকাকড়ি তাহার হাতে দিতেন না; এমন কি, মৃত্যুকালেও তিনি সেই মর্ম্মে উইল (ইষ্টপত্র) করিয়া গিয়াছিলেন। অতিরিক্ত পৃষ্ঠপোষকতার ফলে অনেক ছেলের জীবন নষ্ট হইয়া গিয়াছে, তাই অনেকে ইহার নাম দিয়াছেন "দুর্নীতির দাদন" বা Premium to inmorality। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, পৃষ্ঠপোষকতার অভাব হইলেও নিরাশার কোনই কারণ নাই।

মানুষের সফলতা লাভ করিবার পথে বাহিরের সহায়তা অপেক্ষা অন্তরের সহায়তাই অধিকতর সুফলপ্রদ। বাহিরের কেহ উৎসাহ দিয়া দুইএকটী কথা বলিলেন, অথবা কোন বন্ধু দুইএকটী আশার কথা কাণে শুনাইলেন, তাহার ফলে হৃদয়ে সাময়িক উৎসাহ ও উত্তেজনা উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিতে পারে, কিন্তু তাহার ফল দীর্ঘকাল স্থায়ী হয় বলিয়া বিশ্বাস নাই। কিন্তু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ও স্থায়ী ফল তখনই লাভ করা যায়, যখন নিজের অন্তর হইতে উৎসাহবাণী জাগিয়া উঠে; যখন নিজের চিত্তবীণায় আপনা হইতেই আশাধ্বনি বাজিয়া উঠে। অন্তর হইতে সমুত্থিত সেই উৎসাহবাণীকে, সেই আশাধ্বনিকে অন্তরেই স্থিরতররূপে জাগাইয়া রাখিতে হইবে, এবং তাহাকেই অন্তরে সহায়রূপে ধারণ করিয়া রাখিতে হইবে। তবেই আমাদের জীবন সার্থকতা লাভ করিবে। ভিতর হইতে সমুত্থিত উৎসাহ ও আশার বাণী ধরিয়া রাখিবার অক্ষমতার ফলে অনেকের জীবন নিস্ফল ও ব্যর্থ হইয়া যায়। যাহাদের নিজেদের প্রাণের ভিতর হইতে উৎসাহ ও আশা ফুটিয়া বাহির না হয়; যাহারা পরের মুখ হইতে আশার বাণী শুনিবার জন্য অতিমাত্র উন্মুখ হইয়া থাকে, সংসারের

কঠোর সংগ্রামক্ষেত্রে তাহাদের নেতৃত্ব লাভের আশা খুবই অল্প বলিলে অন্যায় হইবে না।

কিন্তু এই কারণে নিরাশার সাগরে মুহ্যমান হৃদয়ে ডুবিয়া থাকিলে চলিবে না। ঐ সুবিস্তৃত আকাশ হইতে মঙ্গলস্বরূপ ভগবান বজ্রনির্ঘোষে আমাদের অন্তরে নিরন্তর এই আশ্বাসবাণী শুনাইতেছেন—মাভৈঃ মাভৈঃ—ভয় নাই—ভয় নাই। হে অমৃতের সন্তানগণ! তোমরা আশান্বিত হও—অভয়বাণী নিকট হইতে নিকটতর হইতেছে—ভয় নাই—ভয় নাই।

নিরাশা-নিরানন্দে তুমি মুহ্যমান হইতেছ কেন? হয়তো তুমি জীবনে কোন ভুলভ্রান্তি করিয়াছ, সেই কারণে হাহুতাশ করিতেছ। আমাদের ভুলভ্রান্তিই হইল নিরাশানিরানন্দের উৎপত্তির কারণ, শতবিধ বিভীষিকার উৎস। অনেক সময়ে মনে করি, ভুলভ্রান্তি হইতে দূরে থাকিব; দূরে থাকিতে প্রাণপণ চেষ্টাও করি, কিন্তু তবু কিজানি কিপ্রকারে ভুলভ্রান্তি করিয়া ফেলি এবং করিয়া ফেলিয়া হাহুতাশ করিতে থাকি। ভাবিয়া দেখিলে ভুলভ্রান্তির জন্য হাহুতাশ করিবার কোনই কারণ নাই, নিরাশানিরানন্দে মুহ্যমান হইয়া থাকিবার কোনও অবসরই নাই। আমরা মানুষ—আমরা পূর্ণ পুরুষ শুদ্ধ অপাপবিদ্ধ ভগবান নহি—এই সত্যটুকু উপলব্ধি করিতে পারিলেই নিরাশার উত্তপ্ত মরণবায়ু আমাদিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না। ভুলভ্রান্তির কারণ সন্ধান করিতে গেলেই আমরা দেখিব যে আমাদের অপূর্ণতাই উহার কারণ; আমাদের নিজের অথবা আমাদের পিতৃপুরুষ হইতে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত কোন না কোন অপূর্ণতা, কোন-না-কোন দোষই ঐ ভুলভ্রান্তির কারণ। অপূর্ণ হইয়াই যখন সৃষ্ট হইয়াছি, তখন সেই অপূর্ণতাজনিত ভুলভ্রান্তির জন্য হাহুতাশ করিবার কোনই কারণ নাই। ঐ সকল ভুলভ্রান্তি আমাদিগকে সত্যের পথই দেখাইয়া দেয়। আমাদের কর্ত্তব্য, ভুলভ্রান্তির পথ পরিত্যাগ করিয়া আশান্বিতচিত্তে সত্যের পথ অবলম্বন করা।

ভুলভ্রান্তির কারণে আধিব্যাধিই যদিবা তোমাকে আক্রমণ করে. এবং সেই কারণে যদি তোমার জীবন ভয়াবহ বলিয়াই মনে হয়; চারিদিকে প্রকৃতির লীলাক্ষেত্রে এত যে সৌন্দর্য্য ছড়াইয়া রহিয়াছে, এত যে মঙ্গলভাব আমাদিগকে নিয়তই মঙ্গলের পথে উদ্বুদ্ধ করিতেছে, এ সমস্তই যদি তোমার নিকটে তিক্ত ও পরিত্যাজ্য বলিয়া মনে হয়, তথাপি ইহা মনে করিও না যে, এমন কোন সোনার কাঠি আছে, যাহা তোমার আধিব্যাধির উপর স্পর্শ করাইবামাত্রই তোমার জীবনের সমস্ত অন্ধকার দূর হইবে, তোমার আত্মা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিবে। তোমাকে চেষ্টা করিয়া সেই ভুলভ্রান্তির ফলগুলি কাটাইতে হইবে। তোমার ভুলভ্রান্তির জন্য শতবিধ শাস্তি পাইতে হয় হৌক, শতবিধ অপমান ভোগ করিতে হয় হোক, তাহাতেও অটল থাকিয়া নব নব শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা পূর্ব্ব ভুলভ্রান্তির কুফল ক্ষয় করিবার চেষ্টাতেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইবে। ইহার জন্য ইচ্ছার বল চাই, প্রতিজ্ঞার বল চাই। প্রতিজ্ঞা করিতে হইবে যে, ভুলভ্রান্তি আর করিব না. তাহার মূল কারণও উৎপাটিত করিয়া ফেলিব। অসৎসঙ্গে পড়িয়া চুরি করিলাম এবং তাহার জন্য যথেষ্ট অপমান পাইলাম। ইহার জন্য আত্মহত্যার চেষ্টা করিলে মনুষ্যের উপযুক্ত কার্য্য হইবে না; কিন্তু চুরির মূল কারণ অসৎসঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সাধুভাবে নিজের জীবনকে গড়িয়া তুলিলেই প্রকৃত মনুষ্যত্ব প্রকাশ পাইবে। আমাদের সকলেরই তো ইচ্ছা যে, ধর্ম্মে কর্ম্মে, জ্ঞানে অর্থে, সকল বিষয়েই, এখন আমরা যাহা আছি, তাহা অপেক্ষা বড় হইতে চাই, উন্নত হইতে চাই; কিন্তু তাহার জন্য যে ইচ্ছা, যে প্রতিজ্ঞা, যে তেজ, যে একনিষ্ঠতা আবশ্যক, সাধারণত আমরা সেটুকু প্রয়োগ করিবার জন্য প্রস্তুত থাকি না। কিন্তু আমাদের খুব ভাল করিয়া এই সত্যটুকু জানিতে হইবে যে, নিজের উন্নতি সাধন, নিজেকে প্রকৃত নেতার আসনে প্রতিষ্ঠিত করা সহজ নয়—তাহার জন্য হাসিমুখে আশান্বিতচিত্তে পলে পলে আপনাকে বলিদান করিতে হইবে; শুভকর্ম্ম শুভচিন্তা প্রভৃতির মঙ্গলাগ্নিতে নিজের যাহা কিছু মন্দ সমস্তই তিলে তিলে পলে পলে দগ্ধ করিতে হইবে। নিজের ভুলভ্রান্তির জন্য নিরাশা ও নিরানন্দের তপ্ত বালুরাশির উপরে মুহ্যমানহৃদয়ে শয়ন করিয়া হাহুতাশ করিবার অবসর নাই। হৃদয়ে আশার দীপ্তদীপ ধারণ করিয়া অগ্রসর হইতে হইবে, নবজীবন লাভ করিতে হইবে।

পৃথিবীতে যাঁহারাই বড়লোক হইয়াছেন, দেখি যে, তাঁহারা সকলেই নিজেদের উন্নতির পথ নিজেরাই আবিস্কার করিয়াছেন; তাঁহারা অপরের কথা দ্বারা চালিত হন নাই—সকলের কথাই শোনেন, নিজের চারিদিকেই দৃষ্টি রাখেন এবং নিজের শান্ত সমাহিত চিত্তে ভাবিয়া চিন্তিয়া উন্নতির পথ আবিষ্কার করেন এবং অবলম্বন করেন। তাঁহারা উন্নতির পথে উত্তীর্ণ হইবার জন্য যেমন বৃহৎ কাষ্ঠখণ্ডকেও অবলম্বন করেন, তেমনি ক্ষুদ্র তৃণগাছিকেও অবহেলা করেন না। নেপোলিয়ান যখন যুদ্ধে অবতীর্ণ হইতেন, তখন তিনি তাঁহার প্রকাণ্ড বাহিনীর গতিবিধিরও প্রতি যেমন লক্ষ্য রাখিতেন, সেইরূপ সেই বাহিনীর প্রত্যেক সৈনিকের ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র

কি অভাব হইতে পারে, তাহাও দূর করিবার ব্যবস্থা করিতে ভুলিতেন না। তাঁহার নেতৃত্বলাভের ইহাই অন্যতর গূঢ় রহস্য। প্রকৃত বড় লোকেরা কখনও দুঃখ-শোকে আত্মহারা হইয়া যান না; অন্তরে আশার প্রদীপকে সর্ব্বদাই প্রজ্জ্বলিত রাখেন; তাঁহারা ছোট বড় কোন কিছুকেই অবজ্ঞার দৃষ্টিতে দেখেন না—প্রত্যেক বস্তুকেই নিজ নিজ ক্ষেত্রে বড় বলিয়াই দেখেন। তাই অপরে উন্নতির যে পথ দেখিতে পায় না, তাঁহারা তাহা সহজেই দেখিতে পান। শুধু দেখিয়া ছাড়িয়া দেন না, কিন্তু যখনই সেই পথ দেখেন, তখনই সেই পথে অগ্রসর হইতে থাকেন—দেখিবার সঙ্গে সঙ্গেই উন্নতির পথে চলেন।

ইহার ভূরি ভূরি দৃষ্টান্ত দেখা যায়। বিলাতের (Hull) সহরের একটী লোকের কয়েকটা মাত্র পয়সা সম্বল ছিল, তাঁহার কোন চাকরী ছিল না। তিনি একদিন সাগরতীরে গিয়া দেখেন যে, ভারতবর্ষ হইতে একটা জাহাজ মাল আনিয়া তাহা খালাস করিতেছে। সেই সমস্ত যে সকল চটের থলেতে ভরিয়া আনা হইয়াছিল, সেগুলি বৃথা ভার হইবে মনে করিয়া জাহাজের কর্ম্মচারী থলেগুলিকে ফেলিয়া দিতেছিল। এখন ঐ ব্যক্তির মনে হইল যে থলেগুলি কিনিয়া যাহার আবশ্যক হইবে তাহাকে বেশ উচ্চ মূল্যে বিক্রয় করিলে বিশেষ লাভ হইবে। ইহা ভাবিয়া তিনি উক্ত কর্ম্মচারীকে জিজ্ঞাসা করাতে সে যৎসামান্য মূল্যে তাঁহাকে বিক্রয় করিতে স্বীকার করিল। তিনি সেগুলি ক্রয় করিয়া যথাস্থানে উচ্চমূল্যে বিক্রয় করিয়া লাভবান হইলেন। এইরূপে ক্রয়-বিক্রয়ের দ্বারা তিনি এখন উক্ত সহরের অন্যতর প্রধান ধনী ব্যবসায়ী হইয়া উঠিয়াছেন। তিনি যদি সেই কর্ম্মচারীর মুখের দিকে তাকাইয়া আপনা হইতে থলেগুলি কিনিবার অবসর খুঁজিয়া না বাহির করিতেন, তাহা হইলে তাঁহার সমস্ত জীবনে সে অবসর আসিত কি না সন্দেহ। ঠিক এইভাবে কটকের এক ব্যক্তি গুড়ের কারবারের অবসর ধরিয়া অনেক টাকার অধিকারী হইয়াছেন। মোটকথা এই যে, অন্যের মুখের দিকে হাঁ করিয়া তাকাইয়া থাকিলে উন্নতির পথ উন্মুক্ত হয় না—উপযুক্ত অবসরে নিজের পথ আবিষ্কার করিয়া অতীতকালের ভুলভ্রান্তির দিকে বিমূঢ় দৃষ্টি নিক্ষেপ না করিয়া আশার সহিত, বিশ্বাসের সহিত অগ্রসর হইতে হয়।

এইখানে একটা কথা বলিয়া রাখি। আমাদের দেশে মনে হয়, অন্তত পনের আনা লোক অদৃষ্টবাদী—তাঁহারা ভাবেন অদৃষ্টে ইহা ভবিতব্য ছিল তাই ঘটিয়াছে, এবং ভবিষ্যতে অদৃষ্টে যাহা আছে তাহা ঘটিবে। এই ভাব লইয়া এদেশবাসী অনেকেই কথায় কথায় গণৎকারের নিকট নিজের অদৃষ্ট ভবিষ্যৎ জানিবার জন্য ছুটিয়া যান। নিজের উন্নতির পথ যদি খুলিতে চাও, তবে হে তরুণ যুবক বন্ধু! ঐ কাজটী করিও না; কথায় কথায় গণৎকারের নিকট অদৃষ্ট গোণাইতে ছুটিও না। ভগবান আছেন, এই বিশ্বাস যদি তোমার থাকে —এবং এই বিশ্বাস না রাখিলে জ্ঞানবিজ্ঞানের ভিত্তিই তো থাকে না—তবে নিজের ভিতরে ডুবিয়া অনুসন্ধান কর যে, তিনি অন্তরে কি বলিতেছেন। কর্ত্তব্যবুদ্ধি প্রদান করিয়াই তো তিনি স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিতেছেন যে আমাদের স্বাধীনতা আছে। আবার অপূর্ণতার মধ্যেও যে বাস করিতেছি, তাহাও স্পষ্ট জানিতেছি। সুতরাং উভয়ের সামঞ্জস্য করিয়া আমরা বুঝিতেছি যে, সীমার মধ্যেই আমরা স্বাধীনভাবে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারি, কেবল তাহাই নহে, আমরা ইহাও বুঝিতেছি যে, ঐ সীমারও পরিসর আমরা ক্রমশই সম্প্রসারিত করিতে পারি। ভগবানের ছায়ায় নিজেকে নিজের অদৃষ্টের কর্ত্তা বলিয়া জানিও। সরল পথে বলের সহিত নিজেকে পূর্ণতার দিকে চালিত কর, দেখিবে, সকল তেজ, সকল আলোক, সকল প্রভাব, এক কথায় তোমার অদৃষ্ট তোমার মুঠার ভিতরে। তখন দেখিবে, সকল ঘটনাই তোমার সুবিধা করিয়া দিবার জন্য যথাকালে যথাস্থানে আপনাআপনিই বসিয়া যাইবে। অন্তরে এই বিশ্বাস রাখিও যে, আমাদের নিজ নিজ কার্য্যগুণে আমরা দেবতাও হইতে পারি, আবার নিজ নিজ কর্ম্মদোষে দানবত্বও লাভ করিতে পারি।

অদৃষ্ট মন্দ বলিয়া হাহুতাশ করিও না। জীবনটাকে শুষ্ক হইতে দিও না। সর্ব্বদাই আপনাকে আনন্দের মধ্যে ডুবাইয়া রাখিবে। আমোদপ্রমোদের হল্লা এবং আনন্দের শান্তি, উভয়ের মধ্যে আকাশ-পাতাল প্রভেদ। জীবনকে সরস করিতে চাহিলে কেবল আমোদের কোলাহলে গা ভাসাইলে চলিবে না। আনন্দের মূল ভাব হইল, জ্ঞান, প্রীতি ও কর্ম্মের ভিতর দিয়া প্রকৃতির সহিত প্রগাঢ় সহানুভূতি ও সামঞ্জস্য স্থাপন করা। এই আনন্দের পরিমাণের উপরই মানুষের মনুষ্যত্বের বিকাশ নির্ভর করে। আনন্দের কেন্দ্রে যিনি দাঁড়ান, তিনি সুখে দুঃখে অটল থাকেন এবং সেই অটল থাকাতেই তাঁহার মহত্ত্ব প্রকাশ পায়।

এই আনন্দ তোমার আমার নিজস্ব নহে। ইহা ভগবানের দান। একই সূর্য্য যেমন ক্ষুদ্র-বৃহৎনির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর মঙ্গল-কিরণ সমভাবে বিতরণ করে, সেইরূপ ভগবান সাধু-অসাধু, ক্ষুদ্র-বৃহৎনির্ব্বিশেষে সকলকেই এই আনন্দ লাভের অধিকার দিয়াছেন। কিন্তু

সেই অধিকার ব্যবহারে আনিবার পক্ষে যে সকল অন্তরায় আছে, সেগুলি আমাদের নিজের চেষ্টায় অপসারিত করিতে হইবে। এই সকল অন্তরায়ের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান অন্তরায় হইতেছে স্বার্থপরতা। অথচ এই স্বার্থপরতাকেই জনসাধারণ জীবনের মন্ত্ররূপে আঁকড়াইয়া থাকে। সেই কারণে অধিকাংশ লোকই প্রকৃত সুখ বা আনন্দেরও সন্ধান পায় না। আনন্দের সন্ধান পাইয়া কেহ যে জীবনের প্রতি বিরক্ত হইয়া আত্মহত্যা বা আত্মবিনাশের সংকল্প করিয়াছে, এরূপ সংবাদ আমাদের কাণে আসিয়া পৌঁছে নাই। কিন্তু স্বার্থপরতার পরিণামে, আমাদের যে পার্থিব সুখের আকাঙ্ক্ষা পরিতৃপ্ত করিতে চাই, সেই আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ না হইলে, অনেক সময়ে চরিতার্থ হইলেও, অনেক লোক যে আত্মহত্যা পর্য্যন্ত করিতে উদ্যত হয়, তাহার দৃষ্টান্ত জগতে বিরল নহে। প্রকৃত সুখ বা আনন্দ পাওয়া যায় আত্মহত্যায় নহে, কিন্তু আপনাকে বলিদানে। স্বার্থপরতাকে সংযত করিয়া নিঃস্বার্থপরতার নিকট ধীরে ধীরে যতই আপনাকে বলি দিতে পারিবে; পরের সেবায়, পরের মঙ্গলসাধনে আপনাকে যতই নিয়োগ করিতে পারিবে, ততই তুমি শান্তিলাভ করিবে আনন্দলাভ করিবে। ভগবানের এমনই বিধান যে, অপরের মঙ্গলসাধনের সঙ্গে তোমারও মঙ্গল বিশেষভাবে বিজড়িত। তুমি তোমার গৃহে তোমার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনের মঙ্গলে বড়ই আনন্দ উপভোগ কর। কিন্তু তাহার কারণ একবার কি ভাবিয়া দেখিয়াছ? তাহাদের মঙ্গলসাধনের জন্য তোমার ক্ষণিক সুখ প্রভৃতি যে পরিমাণে বিসর্জ্জন দিয়াছ, সেই পরিমাণেই, তাহাদের মঙ্গল দেখ বলিয়াই, তুমি গৃহে সুখশান্তি আনন্দ লাভ কর। যে গৃহে গৃহকর্ত্রী পরিবারের সুখশান্তির দিকে তিলমাত্র দৃষ্টি দেয় না, সে গৃহের অধিবাসী মুখে আনিতে সাহস করে না যে, গৃহে সে সুখশান্তি লাভ করে। পরের সেবাতেই প্রকৃত আনন্দের উৎস লুক্কায়িতথাকে। বলিতে কি, পরসেবায় আত্মোৎসর্গের পরিমাণই মানুষের প্রকৃত আনন্দের মাপকাঠি। কবি গেটে ঠিকই বলিয়াছেন—"অপরের জন্য যে কিছু না করে, সে নিজের জন্যও কিছু করে না"।

সত্যধর্ম্মের দুইটী অঙ্গ—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করা। তাঁহাকে প্রীতি করিবার মাপকাঠি হইবে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন। তাঁহাকে প্রীতি করিবার সঙ্গে তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনের অপরিচ্ছেদ্য সম্বন্ধ। তাঁহাকে প্রীতি করিবে, অথচ তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন করিবে না, ইহা সোনার পাথরবাটীর মত চিন্তার অতীত, কল্পনারও অতীত। প্রকৃতির ভিতর ডুবিয়া আমরা উপলব্ধি করি যে, পরোপকার, অপরের মঙ্গলসাধন প্রভৃতি ভগবানের মঙ্গলবিধান, সুতরাং ভগবানের প্রিয়কার্য্য। সংসারে একাকী তোমার দ্বারা তোমার নিজের সকল প্রয়োজন সিদ্ধ হইতে পারে না—তোমার নিজের প্রয়োজন সিদ্ধির জন্যও বাহিরের পাঁচজনের সাহচর্য্য ও সাহায্য আবশ্যক; কাজেই সেই বাহিরের পাঁচজন যাহাতে ভাল থাকে, সুখে সচ্ছন্দে থাকিতে পারে, সে বিষয়ে তোমারও দৃষ্টি রাখিতে হইবে—দৃষ্টি রাখিলে কেবল তাহাদেরই ভাল হইবে না, তোমার নিজেরও পক্ষে মঙ্গল। সাধারণ লোক এবিষয়ে তলাইয়া না বুঝিয়া হাতে হাতে সদ্য সদ্য লাভের আশায় খুব নীচু স্বার্থপরতার দিকে ঝুঁকিয়া থাকে। সদ্য সদ্য লাভের আশা পরিত্যাগ করিয়া যে নিঃস্বার্থভাবে কার্য্য করিতে অগ্রসর হয়, লোকে না বুঝিয়া তাহাকে বুদ্ধিহীন মূর্খ বলে। কিন্তু জগতে এরূপ দৃষ্টান্ত বিরল নহে যে, দরিদ্র নির্ধন হইলেও নিঃস্বার্থপর ব্যক্তিগণের গৃহে চিরশান্তি ও চিরআনন্দ সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে।

হৃদয়ে যদি শান্তি ধরিয়া রাখিতে চাও, চিত্তকমলে যদি সুগন্ধ ভরিয়া রাখিতে চাও, তবে বিনা চেষ্টায় তাহা হইবে না। জানিও যে, মানুষ যন্ত্রমাত্র নহে; ভগবান তাহাকে সীমার মধ্যে হইলেও স্বাধীন পুরুষ করিয়া জগতে ছাড়িয়া দিয়াছেন। সকল বিষয়েই তাহাকে চেষ্টাপূর্ব্বক অগ্রসর হইতে হইবে। ভগবান আমাদিগকে আনন্দলাভের অধিকার দিয়াছেন সত্য; কিন্তু সেই অধিকারের উপর আমাদের দাবী প্রতিষ্ঠিত করিতে গেলে সত্যধর্ম্মকে প্রাণের সহিত অবলম্বন করিতে হইবে। উহা ব্যতীত ঐ দাবী প্রতিষ্ঠিত করিবার দ্বিতীয় উপায় নাই। সত্যধর্ম্মের ঐ বীজমন্ত্রকে আমাদের প্রত্যেকের জপমন্ত্র করিতে হইবে। ঐ মন্ত্রকে হৃদয়ে ধারণ করিয়া কার্য্য করিলে আমরা প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিব যে, বিশ্বপতি, প্রকৃতির অধিষ্ঠাত্রী দেবতা ভগবান আমাদিগকে পদে পদে সকল বিপদ হইতে রক্ষা করিতেছেন; প্রত্যক্ষ করিব যে, সকল বিঘ্নবাধা তিনি কেমন সহজে আমাদের মঙ্গললাভের পথ হইতে বিদূরিত করিতেছেন। সত্যধর্ম্মের প্রকৃত তত্ত্ব বুঝিয়া, সত্যধর্ম্মকে অন্তরে ধরিয়া থাকিলে, ইহা স্বতঃসিদ্ধ যে, নিরাশা তোমার হৃদয়কে কখনই স্পর্শ করিতে পারিবে না, আশার সাগরে তুমি নিরন্তরই সন্তরণ করিতে থাকিবে, কারণ সকল মৃত্যুর অতীত অমৃতপুরুষ সকল মঙ্গলের একমাত্র উৎস মঙ্গলবিধাতা পরম পুরুষকে তখন তুমি প্রাণের বন্ধুরূপে বুঝিতে পারিবে, অন্তরের মধ্যে ধরিয়া রাখিতে পারিবে।

ন্যায়বিচার ধর্ম্মমতনিরপেক্ষ।

(জনৈক শিক্ষক)

জগতে ধর্ম্মবিষয়ক নানা মত ও বিশ্বাস প্রচলিত দেখা যায়। তাহাদের মধ্যে কোন্ মত কি বলে; বিভিন্ন মতের মধ্যে প্রভেদ কোথায়; কোন্ ধর্ম্মমত অপেক্ষাকৃত ভাল বা মন্দ, এসকল বিষয়ের আলোচনায় আমাদের কোনই প্রয়োজন নাই। লোকের ধর্ম্মমত যাহাই হোক না কেন, তাহার মধ্যে ভাল যেটুকু দেখিব, সেইটুকুই খুঁজিয়া বাহির করা এবং বাহির করিয়া সেই-টুকু উপভোগ করাই হইল আমাদের কর্ত্তব্য। আর ছোট ছোট ছেলেদের মধ্যে এই ভাবটুকু খুঁদিয়া বসাইয়া দেওয়াও আমাদের কাজ।

ন্যায়বিচারকে নিক্তির তৌলের সঙ্গে কতকটা বিচার করা যায়, তাহা পূর্ব্বে বলিয়া আসিয়াছি। ঐ তৌলের একদিকে "সাধুভাব"এর ওজন রাখ। এখন অপরদিকে ব্যক্তিবিশেষের কার্য্যাবলীকে রাখিতে হইবে—ছেলেরা দেখিয়া বাহির করিবে যে, ঐ কার্য্যাবলীর মধ্যে কোন্‌গুলি "সাধুভাবের" সঙ্গে পরিমাপ হইতে পারিবে। তখন ছেলেদের নিকট, বিভিন্নধর্ম্মমতাবলম্বী হইলেও যে সকল নরনারী নিজ নিজ মহৎ কার্য্যের জন্য খ্যাতি অর্জ্জন করিয়াছেন, সম্মানিত হইয়াছেন, তাঁহাদের কার্য্যাবলী ভালরূপ বর্ণনা করা উচিত। যাঁহাদের কার্য্যাবলী বর্ণিত হইবে, তাঁহাদের মধ্যে কে কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অন্তর্ভুক্ত, তাহাও ছাত্রদিগকে বলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। ছেলেদিগকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত যে, ধর্ম্মমত বিভিন্ন হইলেও তৌলযন্ত্রে কোনও বিভিন্নতা দেখা যায় না। নিম্নে কয়েকটা দৃষ্টান্ত উল্লেখ করিব।

এলিজাবেথ ফ্রাই প্রটেষ্টাণ্ট কোয়েকার সম্প্রদায়ের এক মহীয়সী রমণী ছিলেন। কয়েদীদিগের মঙ্গলসাধনের জন্য তাঁহার উদ্যম ও চেষ্টা সর্ব্বজনবিদিত। শতাধিক বৎসর অতীত হইল, ইংলণ্ডের কারাগারসকলের অবস্থা অতীব শোচনীয় ও ভয়াবহ ছিল। ঘরগুলিতে বাতাস চলাচলের উপায় থাকিত না। সেই সমস্ত ঘরে কয়েদী-দিগকে মেষছাগলের মত একত্র রাখা হইত—না তাহা-দিগকে উপযুক্ত খাদ্য দেওয়া হইত, না উপযুক্ত পরিধেয় বস্ত্র দেওয়া হইত। পরিচ্ছন্নতার প্রতি চক্ষু তুলিয়া দেখাই হইত না। এক কথায়, ভীষণ জানোয়ারদিগের ন্যায় তাহাদের প্রতি ব্যবহার করা হইত। ইহার ফলে, তাহারা এমন অবনতির মধ্যে ডুবিয়া পড়িত যে, তাহাদের উঠিবার আর আশা থাকিত না। "প্রথম অপরাধী"গণকে "অভ্যস্ত" অপরাধীদিগের সঙ্গে গাদার ভিতরে রাখা হইত। দৈবাৎ কেহ বিপথে গিয়াছে বলিয়া যে তাহার প্রতি সহানুভূতি করা দরকার, তাহা কাহারও মনেই আসিত না। তখনকার আইনকানুনও এমন কড়া ছিল যে. ছোট-খাটো নানাবিধ অপরাধের জন্য একেবারে ফাঁসির হুকুম দেওয়া হইত। এলিজাবেথ ফ্রাই বিশেষ ভদ্রগৃহের এক সুরুচিসম্পন্ন মহিলা ছিলেন। তিনি গৃহস্থালী কার্য্য শেষ করিয়া মধ্যে মধ্যে দরিদ্র ও পীড়িতদিগকে দেখিয়া তাহাদের দুঃখলাঘবের চেষ্টা করিতেন। ১৮১৩ খৃষ্টাব্দের প্রথমভাগে একদিন তাঁহার বন্ধুগণ তাঁহাকে নিউগেট নামক জেলখানার স্ত্রীলোকদিগের সেই দারুণ শীতে ভয়াবহ অবস্থা দেখিতে অনুরোধ করিলেন। যে দৃশ্য তিনি দেখিলেন, তাহা তাঁহার প্রাণস্পর্শ করিল এবং সেই অবধি তিনি তাঁহার সাধ্যমত সেই সকল স্ত্রীলোকের মঙ্গল-সাধনে নিরত রহিলেন। তিনি তাহাদিগকে নিজের ভগ্নীর ন্যায় ব্যবহার করিতে লাগিলেন। সেই সকল দুর্ভাগ্য জীবগণও বুঝিতে লাগিল যে, তাহাদিগেরও পশ্চাতে ভালবাসিবার একটী লোক আসিয়াছে, এবং তাহারাও সময়ে ভাল হইয়া সংসারে বিচরণ করিতে পারিবে। ফ্রাই তাহাদিগকে কাপড় দিবার জন্য অর্থ সংগ্রহ করিতেন; তিনি তাহাদের নিকটে গিয়া ভাল ভাল গ্রন্থ পাঠ করিতেন; তাহাদিগকে রোগের সময় সেবা করিতেন। সর্ব্বোপরি, তিনি জেল-কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিয়া উহা-দিগকে জানোয়ারের পরিবর্ত্তে মানুষের উপযুক্ত ব্যবহার করিবার মত করাইতে পারিয়াছিলেন। এইরূপে কারা-গারের ব্যবস্থাই ক্রমে সংশোধিত হইয়া গেল। বলা বাহুল্য, এই কার্য্য হস্তে গ্রহণ করিবার আরম্ভে কি প্রকার কষ্টসাধ্য ছিল। কয়েদী স্ত্রীলোকেরা মদ্যপায়ী ও কলহপ্রিয়, এবং অনেক স্থলেই ভাল বিষয়ে মনোযোগ দিতে অনিচ্ছুক ও বে-পরোয়া গোছের ছিল। কিন্তু ফ্রাইয়ের সাধুতা ও একনিষ্ঠা পরিণামে জয়লাভ করিল। ফ্রাই যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁহাকে "সাধু" আখ্যা দিতে কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না।

আর একটী সাধু মহাত্মার কথা বলিতেছি। তিনি রোমান ক্যাথলিক সম্প্রদায়ের খৃষ্টান—ফাদার ডামিয়েন। কুষ্ঠরোগীদিগের জন্য তাঁহার আত্মবিসর্জ্জন জগতকে চমৎকৃত করিয়া দিয়াছিল। হাওয়াই দ্বীপপুঞ্জ উত্তর প্রশান্ত মহাসাগরে অবস্থিত। এই দ্বীপপুঞ্জের অধিবাসী-দের মধ্যে কুষ্ঠরোগ অত্যন্ত বিস্তৃত আকার ধারণ করিয়া-ছিল। অবশেষে তথাকার গভর্ণমেণ্ট আইন করিতে বাধ্য হইলেন যে, ঐ দ্বীপপুঞ্জের মলকই নামক অন্যতম দ্বীপে অন্যান্য অধিবাসীদিগের হইতে দূরে সকল কুষ্ঠ-রোগী একত্র বাস করিবে। এই সময়, একজন রোমান ক্যাথলিক যুবক প্রচারক ঐ দ্বীপপুঞ্জের জন্য নিযুক্ত হইয়া আসিলেন। তিনি যখন দেখিলেন যে এই সকল

বেচারী মানুষগুলো মলকই দ্বীপে একা-একা বাস করিতেছে—তাহাদিগকে দুইটা আশার বাণী শোনাইবার কেহ নাই, শিক্ষা দিবার কেহ নাই, সেবা করিবার কেহ নাই, তখন তাঁহার প্রাণে বড়ই আঘাত লাগিল। তিনি তখন নিজেই ঐ দ্বীপে গিয়া তাহাদের সহিত বাস করিবার ইচ্ছা জানাইলেন। তিনি জানিতেন যে, কি ভয়ানক বিপদ বরণ করিয়া লইতেছেন; সম্ভবত শীঘ্র না বিলম্বে এই ভীষণ রোগের কবলে তিনি পড়িবেন; অন্তত তাঁহার চক্ষের সম্মুখে তিনি দেখিতে বাধ্য হইবেন যে, এই সকল কুষ্ঠরোগীগণ পলে পলে তিলে তিলে মৃত্যুমুখে পড়িতে থাকিবে এবং দিবানিশি তাহাদের দুঃখকষ্ট তাঁহার দৃষ্টিপথে পড়িবে। এই সকল বেচারী কুষ্ঠরোগীদের সঙ্গে তিনি বারোটী বৎসর কাটাইয়া, পরে নিজেও এই ভীষণ রোগের কবলে পড়িলেন। চারটী বৎসর এই রোগে ভুগিয়া তিনি মৃত্যুমুখে নিপতিত হইলেন। এইভাবে যিনি আত্মবলি দিলেন, তিনি যে ধর্ম্মাবলম্বীই হউন না কেন, তাঁহাকে "সাধু" বলিব না তো আর কাহাকে বলিব?

মার্কস অরিলিয়স নামক রোমের এক সম্রাট মূর্ত্তিপূজক ছিলেন। তিনি খৃষ্টীয়ধর্ম্ম হইতে কিছুমাত্র শিক্ষাপ্রাপ্ত হন নাই। তাঁহার উপদেশসকল অতি উচ্চভাবের ছিল। তিনি সুবিস্তৃত রোমসাম্রাজ্যের সম্রাট ও অধিনায়ক ছিলেন। সেই সময়ে ইংলণ্ড পর্য্যন্ত রোমসাম্রাজ্যের অন্তর্ভুক্ত ছিল। তিনি ইংলণ্ডে আসিয়াছিলেন বলিয়া শোনা যায় না। সাম্রাজ্যের আগাগোড়া তাঁহার পক্ষে দেখা অসম্ভব ছিল। এপ্রকার সুবৃহৎ সাম্রাজ্যের সম্রাট দাম্ভিক, অহঙ্কারী হওয়া সম্ভব এবং সর্ব্বদাই তোষামোদী পরিবৃত হইয়া গর্ব্ব ও আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে বাস করিবেন, ইহাই আমাদের মনে আসা স্বাভাবিক। কিন্তু তাঁহার উপদেশাবলী পড়িয়া বেশ বোঝা যায় যে, তিনি সে প্রকার লোক ছিলেন না। তাঁহার দুই চারিটী উপদেশ নিম্নে উদ্ধৃত করিলাম।

"তুমি স্বয়ং নিয়ম পালন করিতে না শিখিলে অপরের জন্য লেখায় বা পড়ায় কোনও নিয়ম নির্দ্দেশ করিতে পার না। জীবনযাত্রায় এই কথা আরও বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

"কোনও বিষয়কে লাভজনক ভাবিবে না, যাহার ফলে তোমাকে প্রতিশ্রুতি ভাঙ্গিতে হয়, তোমার আত্মসম্মান বিসর্জ্জন দিতে হয়, কোন মানুষকে ঘৃণা করিতে হয়, সন্দেহ করিতে হয় বা অভিশাপ দিতে হয়, বা ভণ্ডামি করিতে হয়; অথবা পর্দ্দার আড়ালে কোন কাজ করিতে হয়।

"এই পৃথিবীতে একটা বিষয় বহুমূল্য—সত্য ও ন্যায়ের উপর তোমার জীবন অতিবাহিত করা, এবং মিথ্যাবাদী অধার্ম্মিক ব্যক্তিদিগেরও উপর সদয় ব্যবহার করা।

"যাহা সমস্ত দলের পক্ষে মঙ্গলজনক নহে, তাহা একটী মধুমক্ষিকার পক্ষেও মঙ্গলজনক নহে।"

যে ব্যক্তি এই সকল উচ্চভাবের বিষয় চিন্তা করিয়াছেন এবং তদনুসারে জীবন অতিবাহিত করিয়াছেন, তাঁহাকে আমরা নিশ্চয়ই "সাধু" বলিব।

রাজা অশোক বৌদ্ধ ছিলেন, ইহা তোমরা সকলেই ইতিহাসে পড়িয়াছ। তিনি দুঃখপীড়িত মনুষ্য ও জীবগণের প্রতি কিরূপ সদয় ব্যবহার করিতেন, তাহাও তোমরা জান। মার্কস অরিলিয়সেরও প্রায় চারশত বৎসর পূর্ব্বে ভারতবর্ষে অশোক রাজার আবির্ভাব হইয়াছিল। তিনি আইন করিয়াছিলেন যে, মনুষ্য এবং জীবজন্তুর জন্য হাসপাতাল খোলা হইবে, সেখানে বিনা পয়সায় তাহাদের চিকিৎসা ও সেবা শুশ্রূষা হইবে। এই আইন তাঁহার রাজ্যের বিভিন্ন স্থানে প্রস্তরে উৎকীর্ণ করাইয়া দিয়াছিলেন, যাহাতে প্রজারা ও রাজকর্ম্মচারীরা এই আইন ভুলিয়া না যায়। এই প্রকার একটী হাসপাতাল দুই হাজার বৎসর পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। ১৮০০ খৃষ্টাব্দের কাছাকাছি একজন ভারতপর্য্যটক ইহা দেখিয়াছিলেন। তিনি লিখিয়া গিয়াছেন যে, এই হাসপাতালে ৭৫ বিঘা ধরিয়া রুগ্ন জীবজন্তুর জন্য আশ্রয়স্থান নির্ম্মিত ছিল। এই হাসপাতালে তিনি দেখিয়াছিলেন যে, দুইটী জীব এতই দুর্ব্বল অবস্থায় ছিল যে, তাহারা তৃণ পর্য্যন্ত চিবাইতে পারিতেছিল না—এই দুইটী জীবকে হাসপাতালের চিকিৎসকগণ রুটী ও দুগ্ধ খাওয়াইয়া সেবা করিতেছেন। যে রাজার হৃদয় মানুষ অবধি জীবজন্তু পর্য্যন্ত সকলের জন্য এপ্রকার কাঁদিত, তাঁহাকে যে শতকণ্ঠে "সাধু" বলিব তাহাতে আর সন্দেহ কি?

প্রকৃতির উপর রাগ-রাগিণীর প্রভাব।

(শ্রীবাণী দেবী)

আমাদের দেশে সঙ্গীতজ্ঞগণের মধ্যে সাধারণত একটী কথা প্রচলিত আছে যে, বিভিন্ন রাগিণী বিভিন্ন গুণবিশিষ্ট, অর্থাৎ এক-একটী রাগিণী যথারীতি গান করিলে বিশেষ বিশেষ ফল পাওয়া যায়। ইহা সম্ভব কি না, তাহাই আমাদের আলোচ্য। আমাদের মনে হয় যে, ইহা নিতান্ত অসম্ভব নয়।

ইহা আজকাল অনেকেরই জানা আছে যে, আমা-

দের এক-একটী চিন্তা ব্যোমরাজ্যে এক-একবিধ স্পন্দন-তরঙ্গ উৎপাদন করে। চিন্তা অনুযায়ী এই তরঙ্গ বিভিন্ন আকার ধারণ করে। পরীক্ষিত হইয়া স্থির হইয়াছে যে, সাধু চিন্তার স্পন্দন-তরঙ্গের আকার একবিধ এবং অসাধু চিন্তার স্পন্দন-তরঙ্গের আকার অন্যবিধ। এই সকল তরঙ্গ উত্থিত হইয়া কোথায় যে শেষ হইবে, এবং শেষ হইবে কি না, তাহা এখনও নির্ণীত হয় নাই। অনেকের মতে ইহার শেষ নাই। চিন্তার দ্বারাই যদি স্পন্দন-তরঙ্গ উত্তেজিত করা যায়, তখন সেই চিন্তা বাক্যে প্রকাশ করিলেও যে স্পন্দন-তরঙ্গ উঠিবে, তাহা কি প্রকারে অস্বীকার করা যায়? আবার সেই বাক্য যখন সুর ও লয়ের সহিত বিশুদ্ধভাবে গীত হইবে, তখন তাহা হইতেও যে অনুরূপ তরঙ্গ সমুত্থিত হইবে, তাহাও তো স্বতঃসিদ্ধ।

ঈশ্বর মানবাত্মাতে যে শক্তি নিহিত করিয়া দিয়াছেন, তাহারই ক্রিয়াফলে যখন এই সকল স্পন্দন-তরঙ্গ উত্তেজিত ও প্রকাশিত হয়, তখন ইহা বলা কিছুতেই সঙ্গত নয় যে, এ প্রকার তরঙ্গ হইতে কোনই ফল হইবে না। এই যে যিশু-খৃষ্ট miracles বা সাধারণ মানবের অসাধ্য কার্য্যসকল সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিয়া প্রসিদ্ধি আছে, ইহা কি সর্ব্বৈব মিথ্যা? সেগুলি যদি সর্ব্বৈব মিথ্যা না হয়, যদি সেই কার্য্যসমূহের মধ্যে একটীও সত্যই সংঘটিত হইয়া থাকে, তবে নিশ্চয়ই তিনি তাঁহার প্রবুদ্ধ অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারাই তাহা সম্পন্ন করিয়াছিলেন বলিতে হয়। আমাদের বিশ্বাস, তিনি তাঁহার অন্তর্নিহিত শক্তি দ্বারা ব্যোমরাজ্যে যে তরঙ্গরাজি সমুত্থিত করিয়াছিলেন, তাহারই সাহায্যে সেই সকল অতিমানব ঘটনা সংঘটিত করিতে পারিয়াছিলেন। আমাদের দেশে এবিষয়ে যে অবিশ্বাস ও সংশয় আসে, ইহাই আশ্চর্য্য। এ দেশে আজ পর্য্যন্ত কত যোগী-মুনিকে কেবল অন্তর্নিহিত শক্তিবলেই কত অলৌকিক অতিমানব ঘটনা সম্পাদন করিতে দেখা গিয়াছে।

যে শক্তিবলে এই প্রকার অলৌকিক ঘটনা সম্পাদনের ক্ষমতা জন্মে এবং যাহার কারণে অলৌকিক ক্ষমতাবিশিষ্ট লোকেরা জনসাধারণের নিকট ঈশ্বরের অবতার বলিয়া পূজিত হন, সে শক্তির অন্ত কোথায়? সত্য বটে, মানবের ক্ষমতা অসীম নয়—তাহার সীমা আছে; কিন্তু মানুষ অনন্তশক্তি ঈশ্বর হইতে শক্তির যে কণাটুকু পাইয়াছে, তাহারও অন্ত নিরূপণ করা মানবের সাধ্যাতীত।

'অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর,
এই সদা সবে জিজ্ঞাসে হে।'

ইহার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া এদেশের সঙ্গীতজ্ঞদিগের এই প্রবল ধারণা আমরা ফুৎকারে উড়াইয়া দিতে পারি না যে, মল্লার-রাগিণী যথারীতি গীত হইলে বৃষ্টি আনা যায়, অথবা দীপক রাগ যথারীতি গীত হইলে পরিপার্শ্বকে জ্বালাইয়া দেওয়া যায়। এই ধারণা যে কি প্রকারে আবহমান কাল চলিয়া আসিয়াছে, তাহা নিশ্চিতরূপে বলা যায় না। তবে অনুমান হয় যে, আকবর বাদসাহের আদেশে গায়কশ্রেষ্ঠ তানসেন দীপক গাহিয়া তৎসমুত্থিত উত্তাপে আপনাকে বলিদান করিয়াছিলেন বলিয়া যে প্রবাদ আছে, সেই প্রবাদ হইতেই ঐ প্রকার ধারণা চলিয়া আসিয়াছে।

এই ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন বলিয়াও আমাদের মনে হয় না। অনেক বিষয়, যাহা পূর্ব্বে সম্পূর্ণ মিথ্যা বা অসম্ভব মনে করিতাম, আজ প্রাকৃতিক বিজ্ঞান ও রসায়ন বিজ্ঞানের উন্নতিসাধনের ফলে সেই সকল বিষয় সম্পূর্ণ সত্য বলিয়া প্রমাণিত হইতে চলিয়াছে। রামায়ণে ও মহাভারতে যখন বিমানযানের কথা পড়িতাম, তখন সেগুলি অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া ধারণা করিতে অভ্যস্ত হইয়াছিলাম। কিন্তু আজ বিমান-যানের কথা কেহ অসম্ভব ও মিথ্যা বলিয়া মনে তিলমাত্র স্থান দেন না। সেইরূপ মল্লার-রাগিণীর সাহায্যে বৃষ্টি নামাইবার অথবা দীপক রাগের সাহায্যে উত্তাপ উৎপাদনের সম্ভাবনা বিজ্ঞানাভিমানী ব্যক্তিগণ আজ বিশ্বাসের অযোগ্য বলিয়া বিবেচনা করিলেও দু'দিন বাদে যে সম্ভব বলিয়া বিবেচিত হইবে, সে বিষয়ে আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আছে। আপাতত আমরা বলিতে পারি যে, বিজ্ঞান এই সকল বিষয়ে সম্যক প্রবেশ লাভ করিতে পারে নাই। গীতবাদ্যের স্পন্দন-তরঙ্গের সঙ্গে আমাদের দৈহিক পীড়া ও তাহার শান্তির যে ঘনিষ্ঠ যোগ আছে, সে বিষয়ে যথেষ্ট অনুসন্ধান ও আলোচনা হইয়াছে ও হইতেছে। সেই অনুসন্ধানের ফলে দেখা গিয়াছে যে, বিশেষ এক রাগিণীর সাহায্যে বিশেষ এক রোগ ভাল হয়; আবার অপর কোন রাগিণীর সাহায্যে অপর এক রোগ ভাল হয়; কোন রাগিণীর বা স্বর-স্পন্দনের ফলে অপর এক রোগের উৎপত্তি হয়। সংবাদপত্রে দেখা যায় যে, ফ্রান্স প্রভৃতি অনেক পাশ্চাত্য দেশের হাসপাতালে রোগ সারাইবার জন্য বিভিন্ন সুরের গীতবাদ্যের সাহায্য লওয়া হইতেছে। এইরূপে যখন অন্তঃপ্রকৃতির সঙ্গে বহিঃপ্রকৃতির ঘনিষ্ঠ যোগ দৃষ্ট হইতেছে, বহিঃপ্রকৃতির কার্য্যফলে সমুত্থিত তরঙ্গস্পন্দনের আঘাতে অন্তঃপ্রকৃতির পরিবর্ত্তন সাধনেরও সক্ষমতা দৃষ্ট হইতেছে, তখন মল্লার রাগিণী অথবা দীপকের ন্যায় তীব্রতেজ রাগ গীত হইবার ফলে বৃষ্ট হওয়া বা উত্তাপ বর্দ্ধিত হওয়া আমরা নিতান্ত অসম্ভব মনে করি না।

কয়েকটী দৃষ্টান্ত দিতেছি। এই দৃষ্টান্তগুলি জন-

সাধারণের নিকট আলোচনার অযোগ্য বিবেচিত হইবার আশঙ্কা থাকিলেও, আশা করি প্রকৃত বৈজ্ঞানিক ও তত্ত্বানুসন্ধিৎসু ব্যক্তির নিকট দৃষ্টান্তলিখিত বিষয়গুলি উপেক্ষার বস্তু হইবার পরিবর্ত্তে আলোচনার বিষয় হইবে। পরলোকগত আত্মার অস্তিত্ব-বিষয়ক আলোচনার আদিম অবস্থায় যাঁহারা দৃঢ়তার সহিত উহা সমর্থন করিয়াছিলেন, পরলোকগত আত্মার সহিত ইহলোকস্থ আত্মার কথোপকথন প্রভৃতির সম্ভবপরতা যাঁহারা ঘোষণা করিয়াছিলেন, সেই সকল মনীষী প্রথম প্রথম উপহাস ও উপেক্ষার উপযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিলেন। কিন্তু যখন তাঁহারা ঐসকল বিষয়ে প্রত্যক্ষ প্রমাণ একটীর পর একটী দিতে লাগিলেন, তখন বিজ্ঞানবিৎ প্রখ্যাত পণ্ডিতগণ সেগুলির যাথার্থ্য স্বীকার না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। সেই প্রকার প্রকৃতির উপর রাগরাগিণীর প্রভাব সম্বন্ধে যে সকল দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষগোচর হইয়াছে, সেগুলি আপাতত অসম্ভব বিবেচিত হইলেও, যখন তদনুরূপ আরও অনেক প্রত্যক্ষ প্রমাণ বিভিন্ন ও বহুলোকের নিকট হইতে সংগৃহীত হইবে, তখন আমাদের আলোচ্য বিষয় অসম্ভব বিবেচিত হইবার পরিবর্ত্তে বিজ্ঞান-সম্মত অনুসন্ধান ও গবেষণার উপযুক্ত বিষয়রূপে গৃহীত হইবে নিঃসন্দেহ।

একবার পশ্চিমাঞ্চলস্থিত কোন আত্মীয়ের গৃহে আমরা কয়েকজন অতিথি হইয়াছিলাম। একদিন প্রচণ্ড গ্রীষ্ম পড়িয়াছে—বৃষ্টির অপেক্ষায় সমস্ত প্রকৃতি যেন টাঁ—টাঁ করিতেছে। তখন সহসা একটা তর্ক উঠিল যে, মল্লাররাগিণী যথারীতি গীত হইলে বৃষ্টি হয় কি না। সেই সময়ে মেঘের কোনই লক্ষণ দেখা যায় নাই। আমাদেরই মধ্যে একজন খেলায় "বাজি" রাখিয়া বলিলেন—বিশুদ্ধ রীতিতে মল্লার গাহিলে নিশ্চয়ই বৃষ্টি হইবে। সকলেই গম্ভীর হইয়া বসিলেন। তখন উক্ত বাজিরক্ষক একটী মল্লার কিছুক্ষণ ধরিয়া গাহিলেন। সকলেই অবাক্—দেখিতে দেখিতে কোথা হইতে কয়েকখণ্ড মেঘ আসিয়া আসিয়া দুইচারি ফোঁটা বৃষ্টি দিয়া চলিয়া গেল। মেঘের দেবতা যেন মল্লাররাগিণী শুনিবার জন্য দেখা দিয়া চলিয়া গেলেন। আমরা সকলেই আশ্চর্য্য হইয়া গেলাম—বাজিরক্ষকের জয় হইল।

একবার আমরা পুরীতে আষাঢ় মাসে ছিলাম। তখনও সেখানে কিছুমাত্র বৃষ্টি নাই—অত্যন্ত গুমঠ। আমরা স্থির করিলাম, মল্লার গাহিয়া বৃষ্টি নামাইয়া আনিতে হইবে। আমরা সকলে ভক্তিভরে একটী গৌড়-মল্লার গাহিয়া ভগবানের নিকট প্রাণের সঙ্গে জলের জন্য প্রার্থনা করিতে লাগিলাম। কি আশ্চর্য্য—দেখিতে দেখিতে কালো মেঘে আকাশ ভরিয়া গেল এবং মুষলধারে বৃষ্টি নামিয়া আসিল।

একবার আমরা বৈশাখ মাসে কটকে ছিলাম। বাতাসের নামে আগুনের হল্কা বহিতেছিল। প্রাণ যখন অত্যন্ত অতিষ্ঠ হইল, তখন হৃদয় ভেদ করিয়া মল্লার-রাগিণী বাহির হইল। সকলে অবাক্—হঠাৎ কোথা হইতে মেঘ আসিয়া গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি দান করিয়া সেই আগুনের হল্কা নিভাইয়া দিল। কটকে আরও একবার মল্লার গাহিয়া আমরা নিতান্ত অসম্ভব অবস্থাতেও বড় বড় দুইচার ফোঁটা বৃষ্টি লাভ করিয়াছিলাম।

একবার কটক অঞ্চলে অনাবৃষ্টি হয় এবং তাহার ফলে সেখানে ভীষণ দুর্ভিক্ষের সম্ভাবনা দেখা দিয়াছিল। পিতৃদেব সেই সময়ে তাঁহার জমিদারীতে অবস্থিতি করিতেছিলেন। গ্রীষ্মের উত্তাপে তাঁহার চক্ষের সম্মুখে বীজ ধানের চারাগুলি জ্বলিয়া যাইতে দেখিয়া তাঁহার হৃদয় দুঃখে উদ্বেলিত হইয়া উঠিল। তিনি ভগবানের নিকট জলের জন্য একটী প্রার্থনা রচনা করিয়া তাহাই মল্লার-রাগিণীতে বসাইয়া কাতর প্রাণে গান করিতে লাগিলেন। আশ্চর্য্য সঙ্গীতের মহিমা—এক ঘণ্টা পূর্ব্বে যেখানে এক টুকরা মেঘ দেখা যায় নাই, এক ঘণ্টার মধ্যে সেখানে ঘন ঘোর কালো মেঘ আসিয়া বৃষ্টিতে দেশ ভাসাইয়া দিল এবং দুর্ভিক্ষের প্রবল ভীষণতা খুবই কমিয়া গেল।

মল্লার-রাগিণী গাহিয়া যেমন বৃষ্টি নামাইবার প্রমাণের উল্লেখ করিলাম, সেইরূপ সারং-রাগ গাহিয়া জল বন্ধ হইবারও দৃষ্টান্ত আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। দীপক রাগ গাহিলে কি-এক অজানা অনিষ্ট ঘটে, সেই আশঙ্কায় দীপক রাগ গাহিয়া কোন পরীক্ষা করি নাই। কিন্তু সারং গাহিয়া পরীক্ষা করিয়াছি। একবার পুরীতে গিয়াছি—তখন সেখানে অবিরল ধারে বর্ষা নামিয়াছে—জল—জল—জল। পুরীপ্রবাসীগণ সকলেই জানেন যে, সমুদ্রের বাতাস বন্ধ হইয়া অবিশ্রামে জলধারা নামিলে কি অসহ্য কষ্ট হয়। সেবার যখন দুই তিন দিন ধরিয়া বাতাস বন্ধ হইয়া বারিধারা ঝরিতে লাগিল, তখন আমরা প্রাণের সহিত একটী গৌড়-সারং গাহিয়া পরীক্ষা করিলাম। তাহার ফলে আমরা নিজেরাই অবাক হইয়া গেলাম যে, সমস্ত মেঘ কাটিয়া গিয়া আকাশ নির্ম্মল হইয়া গেল, সমুদ্রের বাতাস বহিতে লাগিল—যেন কোন যাদুকর তাঁহার যাদুহস্ত মেঘের উপর বুলাইয়া দিলেন। ভগবানের কোন্ নিয়মে এরূপ ঘটনা ঘটিতে পারে, তাহার আলোচনা এস্থলে নিষ্প্রয়োজন।

প্রকৃতির উপর রাগ-রাগিণীর প্রভাব বিস্তৃত করিতে ইচ্ছা করিলে কেবলমাত্র পিয়ানো প্রভৃতি বাদ্যযন্ত্রের সাহায্যে অসময়ে অস্থানে রাগ-রাগিণী বাজাইলে চলিবে না। বিশুদ্ধ রীতিতে যথাসময়ে উপযুক্ত স্থানে রাগ-রাগিণীগুলি গান করিলে তবে তাহাদের প্রকৃতির উপর

প্রভাব প্রকটিত হইবে। আর, মনে হয়, মাত্র বাদ্যযন্ত্রের ভিতর দিয়া সমস্ত হৃদয়-মন প্রকৃতির উপর প্রসারিত হইতে পারে না। বাদ্যযন্ত্র যেন প্রকৃতি ও মানবাত্মার মাঝে একটা অন্তরালরূপে দাঁড়াইয়া থাকে মনে হয়। প্রকৃতিকে নিজের ইচ্ছামত পরিচালিত করিতে গেলে তাহার উপর আত্মার সমুদায় শক্তি সংহত আকারে প্রসারিত করিতে হইবে। মনে হয়, তাহা একমাত্র কণ্ঠ-সঙ্গীতেরই সাহায্যে সম্ভব। কোন সভাস্থলে যদি কোন সুবক্তার বক্তৃতা গ্রামোফোনের সাহায্যে শোনানো হয়, তবে তাহা শ্রুতিমধুর হইতে পারে; কিন্তু বক্তার নিজ মুখ হইতে সেই বক্তৃতা শুনিলে প্রাণের ভিতর যে প্রকার ভাব-তরঙ্গ খেলিতে থাকিবে, গ্রামোফোনের বক্তৃতার ফলে সে প্রকার ভাবতরঙ্গ মনের ভিতর কিছুতেই খেলিতে থাকিবে না। মোট কথা এই যে, প্রকৃতির উপর প্রভাব বিস্তার করিতে চাহিলে, আত্মার অন্তর্নিগূঢ় শক্তিকে প্রবর্দ্ধিত করিতে হইবে এবং প্রয়োজন পড়িলে সেই প্রবর্দ্ধিত শক্তিকে সম্পূর্ণভাবে নিয়োগ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে।

এই শক্তিকে প্রবর্দ্ধিত করিবার উপায় কি? সর্ব্ব-প্রধান উপায়—মনের একাগ্রতাসাধন। যে কোন প্রণালী এই একাগ্রতাসাধনে সহায় হইবে, তাহাই এই শক্তিকে জাগ্রত করিবারও সহায়তা করিবে। মল্লারের সাহায্যে বৃষ্টি নামাইবার কথাই আলোচনা করিয়া দেখা যাক। যে শক্তি দ্বারা এই বৃষ্টি আনা সম্ভব হয়, সে শক্তিকে জাগ্রত করিতে চাহিলে, সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য মনের একাগ্রতা-সাধন। বিশুদ্ধ ও পবিত্র হৃদয়ে এক মনে মল্লার-রাগিণী গাহিতে হইবে। বৃষ্টি নামাইবার জন্য সমস্ত হৃদয় দিয়া ভগবানের নিকট প্রার্থনা করিতে হইবে। এই রাগিণীর সাহায্যে যে গানটী গাওয়া হইবে, দেখিতে হইবে, তাহার প্রত্যেক চরণ, প্রত্যেক পদ, যেন যথাসম্ভব বারি-বর্ষণের কোন-না-কোন ভাবের ব্যঞ্জক হয়।

"রিম ঝিম বারিধারা বরষে"

পদটীর প্রত্যেক শব্দটী কেমন সহজভাবে বর্ষার প্রাণ ব্যক্ত করিতেছে।

"ঝর ঝর বারিধারা গুরু গুরু গরজন এ বরষা দিনে"

এই পদটাও কেমন সহজে বর্ষার ভাব প্রাণে জাগাইয়া তুলে। এই প্রকার পদগুলি আওড়াইলেই মল্লার-রাগিণীতে গান করিবার চেষ্টা যেন প্রাণে স্বতই উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে।

বৃষ্টি নামাইতে গেলে, এই সকল গান করিবার সঙ্গে সঙ্গে বর্ষা-প্রকৃতিকে একমনে ধ্যান করিতে হইবে। এই ধ্যান সম্বন্ধে যিনি যত উচ্চ সোপানে উঠিবেন, তাঁহার পক্ষে বৃষ্টি নামানো ততই সহজ হইবে। হয় তো মুখে গাহিয়া চলিয়াছি মল্লার-রাগিণী, কিন্তু কোনও কারণে হয় তো অন্তরে কাঠফাটা রৌদ্রের ছবি জাগিয়া উঠিতেছে। তাহা হইলে মল্লারের সাহায্যে বৃষ্টি নামাইবার আশা বৃথা। এইস্থলে চৈতন্যদেবের সেই গল্পটী মনে পড়ে। চৈতন্য-দেব একদিন ভক্ত শিষ্যগণ লইয়া কীর্ত্তনে বসিয়াছেন। অন্য দিনের মত সেদিন কীর্ত্তন কিছুতেই জমাট বাঁধিতে-ছিল না। তখন চৈতন্যদেব প্রকাশ করিলেন যে, উপ-স্থিত ব্যক্তিদিগের মধ্যে কাহারও না কাহারও প্রাণ হইতে অবিশ্বাসের নিঃশ্বাস বাহির হইতেছে। চারিদিকে খোঁজ খোঁজ পড়িয়া গেল—দেখা গেল যে, ঘরের এক কোণে একটী বুড়ীর প্রাণ হইতে ঐ প্রকার অবিশ্বাসের নিঃশ্বাস বাহির হইতেছে!

মল্লারের সাহায্যে বৃষ্টি নামাইতে গেলে যথাসময়ে মল্লার গাহিবার কথা বলিয়া আসিয়াছি। শীতের পর বসন্তের আগমনে দক্ষিণে বাতাসের স্পর্শ পাইয়া যখন নরনারীর প্রাণ হাওয়ায় উড়িতে চায়, তখন মল্লার-রাগিণী গাহিয়া বৃষ্টি নামাইবার চেষ্টা বৃথা। তখন অন্তরে মল্লারের প্রাণ কিছুতেই জাগিতে পারে না। সমস্ত প্রকৃতিই তখন উহার বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইবে। সেই প্রকার, যখন প্রকৃতি নিদাঘে সবেমাত্র পদার্পণ করিয়াছে, তখনও মল্লা-রের সাহায্যে বৃষ্টি আনার চেষ্টা বৃথা। যখন গ্রীষ্মের তাপে মানুষের প্রাণ জর-জর হইয়া উঠিয়াছে, এক বিন্দু জলের জন্য যখন মানুষ আকুল প্রাণে ছুটাছুটি করিতে থাকে, তখনই মল্লার গাহিবার উপযুক্ত অবসর। তখনই মল্লারের সাহায্যে "ঝর ঝর বারিধারা" নামাইবার উপযুক্ত সময়। তখনই প্রাণের ভিতর মল্লার রাগিণী স্বতই শতবিধ আকারে ব্যক্ত হইয়া উঠিতে চায়।

সর্ব্বোপরি, একটী বিশেষ কথা এই যে, রাগ-রাগিণীর সাহায্যে প্রকৃতির দ্বারা কার্য্য করাইতে গেলে নিজের উপর বিশ্বাস রাখা চাই। বিশ্বাস রাখা চাই যে, আমি এই গান করিতেছি, ইহার ফলে বৃষ্টি আসিবেই—না আসিয়া থাকিতে পারে না; আমি এই গান করিতেছি, ইহার ফলে সূর্য্যের উত্তাপ বৃদ্ধি হইবেই এবং মেঘরাশি কাটিয়া গিয়া আকাশ নির্ম্মল হইবেই। এই যে বাজিকর আমাদের চক্ষে ধাঁধা লাগাইতে পারে—ধাঁধা লাগাইতে পারিবে বলিয়া তাহার নিজের উপর বিশ্বাস আছে বলিয়াই সে ধাঁধা লাগাইতে সমর্থ হয়। সামান্য একজন বাজিকর যখন সামান্য একটু শক্তির বলে মানুষকে মন্ত্রমুগ্ধ করিতে পারে এবং নিজের ইচ্ছামত তাহাকে পরিচালিত করিতে পারে, তখন যে মানব একাগ্র সাধনের দ্বারা ভগবন্নিহিত শক্তিকে বিশেষভাবে জাগ্রত করিয়াছেন, তাঁহার পক্ষে প্রকৃতির কোন একটী

ভাবকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া পরিচালিত করা বড় বেশী আশ্চর্য্যের বিষয় বলিয়া আমাদের মনে হয় না।

ঋষিরা ধ্যানস্থ হইয়া নিমীলিত-নেত্রে এই সত্য দৃষ্টি করিয়া ব্যক্ত করিয়াছেন যে, ভগবান ধ্যানে বসিয়াই ধ্যানস্থ অবস্থাতেই এই বিশ্বজগৎ সৃষ্টি করিলেন—

"স তপোঽতপ্যত স তপস্তপ্ত্বা বিশ্বমসৃজত যদিদং কিঞ্চ"। অন্য ভাষায় বলা যাইতে পারে যে, এই বিশ্ব-ব্রহ্মাণ্ডের সৃষ্টি ভগবানের চিন্তারই স্পন্দন-তরঙ্গের রূপান্তর মাত্র। আমরাও যখন ভগবানেরই অগ্নি-স্ফুলিঙ্গ হইতে জন্মগ্রহণ করিয়াছি এবং তাঁহারই শক্তিতে শক্তিমান হইয়াছি, তখন, প্রকৃতির অতীত হইয়া নহে, কিন্তু প্রকৃতির ভিতরে থাকিয়াই তড়িৎ, চৌম্বক, উত্তাপ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করিবার ন্যায় চিন্তা-শক্তি প্রয়োগের দ্বারা বৃষ্টি নামাইবার বা দাহিকা-শক্তি বাড়াইবার শক্তিকেই বা আয়ত্ত করিতে পারিব না কেন? জগতের চারি দিকে যে সকল লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে আমার বিশ্বাস, এই সকল শক্তি শীঘ্রই মানুষ আয়ত্ত করিবে এবং করিয়া জগতের মঙ্গল-সাধনে প্রয়োগ করিবে।

ভারতীয় সঙ্গীত আলোচনা করিলে আমরা দেখি যে, ভারতের ঋষিরা মানবের অন্তরে গানের দ্বারা হর্ষ, বিষাদ প্রভৃতি পশুসাধারণ ভাবগুলি উদ্রেক করিবার চেষ্টা করিয়া এবং উদ্রেক করিতে সমর্থ হইয়াই ক্ষান্ত হন নাই। গানের সাহায্যে প্রকৃতিকেও আয়ত্ত করিয়া, বিভিন্ন প্রাকৃতিক ঘটনা উৎপাদন করিবার ইচ্ছাও তাঁহাদের মনে জাগিয়া উঠিয়াছিল দেখা যায়। সেই ইচ্ছাকে যথাযথ জাগ্রত করিবার ফলেই মল্লারের সাহায্যে বৃষ্টি নামাইতে, অন্তত শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তাহাদের প্রাণে বারি-বর্ষণের ভাব প্রত্যক্ষ করাইতে, অথবা প্রকৃতির দাহিকা-শক্তির সঙ্গে একযোগে যুক্ত হইয়া দীপক রাগের সাহায্যে অগ্নি প্রজ্বলিত করিতে, অন্তত শ্রোতৃবর্গের মনে আগুনের দাহক ভাব প্রত্যক্ষ করাইতে ঋষিরা সমর্থ হইয়াছিলেন। এই প্রকার গানের সাহায্যে প্রকৃতির উপর আধিপত্য বিস্তার করিবার ভাব পাশ্চাত্য সঙ্গীতে সম্যক বিকশিত হইবার অবসর লাভ করে নাই। পাশ্চাত্য সঙ্গীতে রচয়িতার বেশ একটী ব্যক্তিগত ছাপ পড়ে দেখা যায়। এই কারণে, পাশ্চাত্য সঙ্গীত যাঁহারা একটু গভীরভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাঁহারা Chopin, Beethoven প্রভৃতির রচনায় তাঁহাদের ব্যক্তিগত ছাপ বা বিশেষত্ব উপলব্ধি করিয়া সহজেই উপলব্ধি করিতে পারেন যে, কোন্‌টী কাহার রচনা। কিন্তু ভারতীয় সঙ্গীতে ঠিক ব্যক্তিগত ছাপ বলিতে যাহা বুঝায় তাহা খুব অল্প পরিমাণেই দৃষ্ট হয়। দীপক-রাগ বা মল্লার-রাগিণীতে ব্যক্তিগত বিশেষত্ব প্রকাশের অবসর কোথায়? ভারতীয় সঙ্গীতের রাগ-রাগিণীতে সঙ্গীতেরই অন্তঃপ্রকৃতি অথবা বহিঃপ্রকৃতির সঙ্গে অন্তঃপ্রকৃতির একটী যোগের ভাবই বিকশিত হইতে চায়। এই কারণেই পাশ্চাত্য সঙ্গীতে তান-লয়ের ভঙ্গিমা এত কম এবং ভারতীয় সঙ্গীতে এত বেশী। ভারতীয় সঙ্গীতের তান-লয় প্রকৃতির শতবিধ ছন্দোবন্ধের সঙ্গে নাচিতে নাচিতে চলিতে থাকে। বর্ত্তমান যুগে পাশ্চাত্য বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতগণ যেমন বিজ্ঞানের সাহায্যে তাপ তাড়িৎ প্রভৃতি বিভিন্ন প্রাকৃতিক শক্তিকে আয়ত্ত করিয়া তাহা দ্বারা রেলগাড়ী পরিচালনা, দূরে বার্ত্তা প্রেরণ প্রভৃতি কার্য্য সাধনে আনন্দ উপভোগ করেন, ভারতের পূর্ব্বতন সঙ্গীত-ঋষিগণ সেইরূপ যোগ অবলম্বনে অন্তরের শক্তিসমূহকে আয়ত্ত করিয়া তাহা দ্বারা প্রয়োজন-মত প্রকৃতির সাহায্যে বৃষ্টি, উত্তাপ প্রভৃতি উৎপাদন করিয়া জগতবাসীকে স্তম্ভিত করিয়াছিলেন। আমরাও আজ তাঁহাদের আশ্চর্য্য প্রভাব স্মরণ করিয়া তাঁহাদের উদ্দেশে শত শত নমস্কার করিতেছি। আমরাও তাঁহাদের পদাঙ্ক অনুসরণে জীবনকে পরিচালিত করিবার চেষ্টা করিয়া ধন্য হইতেছি। *

সাত্ম্য ও পথ্য।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ),

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

গীতায় ভগবান্ শ্রীকৃষ্ণ অর্জ্জুনকে বলিয়াছেন, হে অর্জ্জুন! সাত্ত্বিকাদি প্রকৃতিভেদে মানবের পক্ষে তিন প্রকার আহার (আহার্য্য) প্রিয় হইয়া থাকে। তন্মধ্যে আয়ু চিত্তস্থিরতা বল আরোগ্য সুখ (অন্তরাহ্লাদ) প্রীতি (পরের সম্পদ্ দেখিয়া সুখানুভব) এই সকলের বর্দ্ধক, রসোপেত, স্নেহপদার্থযুক্ত, দেহে চিরকাল স্থায়ী, এবং হৃদয়ের প্রিয় যে আহার, তাহা সাত্ত্বিক পুরুষের প্রিয়।

অতি কটু, অতি অম্ল, অতি লবণ, অতি উষ্ণ, অতি তীক্ষ্ণ (ঝাল), অতি রুক্ষ (তৈলাদি স্নেহপদার্থশূন্য), অতি বিদাহী অর্থাৎ প্রদাহজনক, এবং যে সকল বস্তু দুঃখ শোক ও পীড়া উৎপাদন করে, সেই সকল আহার রাজসপ্রকৃতি মানবদিগের প্রিয়।

আর যাতযাম (মন্দপক), গতরস (নিষ্পীড়িতসার), পূতি (দুর্গন্ধ), পর্য্যুষিত (বাসী), উচ্ছিষ্ট, (ভুক্তাবশিষ্ট), ও অমেধ্য অর্থাৎ অভক্ষ্য বলিয়া যাহা কথিত হইয়াছে; যেমন কপণ্ড পেঁয়াজ রসুন প্রভৃতি আহার তামসপ্রকৃতি মানবের প্রিয়। †

---

* ভারতবর্ষ, শ্রাবণ—১৩৩৭।

† আয়ুঃসত্ত্ববলারোগ্য-সুখ-প্রীতিবিবর্দ্ধনাঃ। রস্যাঃ স্নিগ্ধাঃ স্থিরা হৃদ্যা আহারাঃ সাত্ত্বিক-প্রিয়াঃ॥ গীতা ১৭।৮

নিরামিষভোজী মানবের সাত্ত্বিকতা বা সংযম, এবং আমিষভোজীর অসংযম বা কামপ্রবৃত্তির আধিক্য প্রমাণসিদ্ধ নহে। ইহার ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত জগতে সুবিদিত। এমন কি, নিরামিষ-ভোজী ও আমিষ-ভোজী ইতর প্রাণীর মধ্যেও কামপ্রবৃত্তির বিপর্যায় দেখিতে পাওয়া যায়। সিংহ-ব্যাঘ্র মাংসভোজী পশু, কিন্তু ইহারা ইন্দ্রিয়পরায়ণ নহে। পক্ষান্তরে তৃণভুক্ পাঠা ও ষাঁড় কামুকের আদর্শস্থান। পাখীর মধ্যে কাক সর্ব্বভুক্। কিন্তু জীবনে তাহার একবারমাত্র কামোপভোগ হইয়া থাকে। তন্নিবন্ধন কাকসম্ভোগ অদ্ভুত প্রকরণে গণিত হইয়াছে। পক্ষান্তরে শস্য-কণ-ভোজী চটক ও পারাবত নিরতিশয় কামুক। সুতরাং নিরামিষের সংযম-জনকতা এবং আমিষের উত্তেজকতা মনঃকল্পিত।

এই শ্রেণীর আধ্যাত্মিকতা হিন্দু-সভ্যতার পরিচায়ক প্রাচীন গ্রন্থে দেখা যায় না। প্রত্যুত বিপরীত প্রমাণই পরিলক্ষিত হয়। এই দেখুন আশ্বলায়ন-গৃহ্যে অন্নপ্রাশন প্রকরণে ঋষি উপদেশ করিয়াছেন, "ষষ্ঠে মাস্যন্নপ্রাশনম্। (১ অ। ১৬ কণ্ডিকা। ১ সূত্র।) জন্মদিন হইতে গণনা করিয়া ষষ্ঠমাস বয়সের সময় বালকের অন্নপ্রাশন করিবে।

"আজমন্নাদ্যকামঃ" (১।১৬।২) যদি সংস্কর্ত্তা ইচ্ছা করেন যে, এই বালক প্রভূত অন্নভুক্ হউক, তবে অজ-মাংসের সহিত তাহার মুখে অন্নপ্রাশনের অন্ন দিতে হইবে। সূত্রে "আজম্" এই পদটি আছে। "অজস্য ইদং" এই অর্থে অজশব্দের পর তদ্ধিত অণ্ প্রত্যয় যোগে "আজ" এই রূপটি সিদ্ধ হইয়াছে। সুতরাং 'আজ' বলিলে অজের দুগ্ধ দধি অথবা ঘৃতও বুঝাইতে পারে। এই আশঙ্কায় বৃত্তিকার নারায়ণ বলিয়াছেন "তৈত্তিরসাহচর্য্যা-ন্মাংসস্যাত্র গ্রহণং ন ক্ষীরদধিঘৃতানাম্।" তৈত্তিরের সাহ-চর্য্যবশতঃ এখানে আজপদে অজের মাংসই বুঝিতে হইবে। ক্ষীর দধি বা ঘৃত বুঝা যাইবে না।

পরসূত্রে বলা হইয়াছে যে, "তৈত্তিরং ব্রহ্মবর্চ্চ-সকামঃ" (১।১৬।২) ইহার অর্থ—বালকের ব্রহ্মবর্চ্চস অর্থাৎ বেদাধ্যয়নজনিত তেজোবিশেষ কামনা করিলে তাহার অন্নপ্রাশনে "তৈত্তির" অর্থাৎ তিত্তিরি পাখীর মাংস দিতে হইবে। এখানে "তৈত্তির" পদে মাংস ব্যতীত তিত্তিরির আর কোন অংশ সম্ভবপর হয় না, সুতরাং এই দৃষ্টান্তে পূর্ব্বসূত্রেও "আজ" পদে অজের মাংসই গ্রহণীয়। ইহাতেই সুস্পষ্ট প্রমাণিত হইতেছে যে, আমিষ পদার্থ তামস বা কুপ্রবৃত্তিজনক বলিয়া ঋষিগণ মনে করেন নাই। যদি তাহাই হইত, তবে "ব্রহ্মবর্চ্চস" সম্পাদনের জন্য বালকের মুখে মাংস দিবার ব্যবস্থা হইত না।

আমিষ বাঙ্গালীর বিশেষ সাত্ম্য; তন্নিবন্ধন বাঙ্গালার প্রাচীন নিবন্ধকারগণ বিভিন্নপ্রকার আমিষের ভক্ষ্যতা সমর্থন করিয়া গিয়াছেন। আটশত বৎসরের পূর্ব্ববর্ত্তী স্মৃতিনিবন্ধকার ভট্ট ভবদেব প্রায়শ্চিত্তপ্রকরণ-গ্রন্থে (মুদ্রিত পুস্তক ৭১ পৃঃ) বিস্তৃত বিচার করিয়া সিদ্ধান্ত করিয়াছেন যে, "অনিষিদ্ধ-মৎস্য-মাংস-ভক্ষণে তু দোষা-ভাবাৎ প্রায়শ্চিত্তাভাবঃ" ইহার অর্থ এই যে, যে মৎস্য-মাংস ভক্ষণে কোনরূপ নিষেধ নাই, তাহার ভক্ষণে দোষ না থাকায় প্রায়শ্চিত্তও নাই। ইহার পর তিনি মৎস্য-মাংসভক্ষণের নিষেধক কতিপয় বচন উদ্ধৃত করিয়া তাহাদের তাৎপর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন; যথা—

"যত্তু

বৃথা মাংসং ন ভোক্তব্যং ভোক্তব্যং শ্রাদ্ধকর্ম্মণি।

অন্যথা ভক্ষয়ন্ বিপ্রঃ প্রাজাপত্যং সমাচরেৎ॥"

ইতি ছাগলেয়েনোক্তং,

যত্তু "মৎস্যাংশ্চ কামতো জগ্ধ্বা সোপবাসস্ত্র্যহং ভবেৎ॥

ইতি যাজ্ঞবল্ক্যেনোক্তম্ (১।১৭৫)

যদপি—

নাদ্যাদবিধিনা মাংসং বিধিজ্ঞোঽনাপদি দ্বিজঃ।

জগ্ধ্বা হ্যবিধিনা মাংসং প্রেত্য তৈরদ্যতেঽবশঃ॥

ইতি মনুনোক্তম্—(৫।৩৩)

যদপি—

"কুহূপূর্ণেন্দু-সংক্রান্ত্যাং চতুর্দ্দশ্যষ্টমীষু চ।

নরশ্চণ্ডালযোনিঃ স্যাৎ স্ত্রীতৈল-মাংসভক্ষণাৎ॥

শ্রাদ্ধে প্রদত্তং বিধিনা দৈবে বাভ্যর্থিতো দ্বিজৈঃ।

উপাকৃতং মহারোগান্মাংসং ভুঞ্জীত নান্যথা॥

ইতি ব্যাসেনোক্তম্—

তৎসর্ব্বং নিষিদ্ধচতুর্দ্দশ্যাদি-বিষয়ম্—

অর্থ—তবে ছাগলেয় ঋষি যে বলিয়াছেন, বৃথা মাংস ভক্ষণ করিবে না। শ্রাদ্ধকর্ম্মে মাংস ভক্ষণ করিবে। বৃথা মাংস ভক্ষণ করিলে বিপ্র প্রাজাপত্য প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর যাজ্ঞবল্ক্য যে বলিয়াছেন—কামতঃ অর্থাৎ শ্রাদ্ধাদি ব্যতীত মৎস্য ভক্ষণ করিলে তিন দিবস উপবাস-রূপ প্রায়শ্চিত্ত করিবে। আর মনু যে বলিয়াছেন, শাস্ত্রার্থবেত্তা ব্রাহ্মণ অনাপদবস্থায় বিধি লঙ্ঘন করিয়া মাংসভক্ষণ করিবে না। বৃথা মাংস ভক্ষণ করিলে পর-লোকে অবশ অবস্থায় ভুক্তমাংস পশু অর্থাৎ যাহার মাংস খাওয়া হয় সেই পশু কর্ত্তৃক ভক্ষিত হয়। ব্যাস যে বলিয়াছেন, অমাবস্যা পূর্ণিমা সংক্রান্তি চতুর্দ্দশী ও অষ্টমী তিথিতে যে মানব স্ত্রীসংসর্গ তৈল ব্যবহার ও মাংস ভক্ষণ

কট্বম্ল-লবণাত্যুষ্ণ-তীক্ষ্ণ-রূক্ষ-বিদাহিনঃ।
আহারা রাজসস্যেষ্টা দুঃখশোকাময়প্রদাঃ॥ ১৭।৯

যাতযামং গতরসং পূতি-পর্য্যুষিতঞ্চ যৎ।
উচ্ছিষ্টমপি চামেধ্যং ভোজনং তামসপ্রিয়ম্॥ ১৭।১০

করে, সে জন্মান্তরে চণ্ডালযোনিতে উৎপন্ন হয়। কিন্তু যথাবিধি শ্রাদ্ধে প্রদত্ত এবং দৈবকার্য্যে ব্রাহ্মণ কর্ত্তৃক প্রদত্ত মাংস ভক্ষণে এবং গুরুতর রোগে আক্রান্ত হইলে মাংস ভক্ষণে দোষ নাই। এই সমস্ত নিষেধ নিষিদ্ধ চতুর্দ্দশ্যাদি তিথিতে মাংসভক্ষণে বুঝিতে হইবে। যদি সামান্যতই মাংস অভক্ষ্য হয়, তবে তিথিবিশেষে নিষেধ অনর্থক হইয়া পড়ে। আরও দোষ হয় যে, যদি সামান্যতই মৎস্যাদি অভক্ষ্য হয়, তবে মৎস্যাদি পরিত্যাগে ফল কীর্ত্তন সঙ্গত হয় না।

যাজ্ঞবল্ক্য বলিয়াছেন, গৃহে বাস করিয়াও ব্রাহ্মণ যদি মাংস ভক্ষণ পরিত্যাগ করে, তবে সে মুনি বলিয়া গণ্য হয়, এবং অশ্বমেধের ফল প্রাপ্ত হয়।*

ভবদেব আরও বলিয়াছেন যে, অতএব মৎস্য-মাংস ভক্ষণে কোন দোষ নাই। তবে মনু যে মাংস প্রভৃতিকে পিশাচপ্রভৃতির অন্ন বলিয়া ব্রাহ্মণের অভক্ষ্য শ্রেণীতে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, তাহাও আম-(কাঁচা) মাংস বিষয়েই বুঝিতে হইবে। কারণ আমমাংসই নানাশাস্ত্রে রাক্ষসান্ন বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।†

মৎস্যের মধ্যে কোন্‌গুলি ভক্ষ্য ও কোন্‌গুলি অভক্ষ্য, শাস্ত্রে তাহার বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়। বৌধায়ন-স্মৃতিতে (১ম প্রপাঠক) ভক্ষ্যপ্রকরণে বলা হইয়াছে যে, "মৎস্যাঃ সহস্রদংষ্ট্র, শিচিনিচিনো, বর্ম্মি, বৃহচ্ছিরো, মশকরি, রোহিত, রাজীবাঃ"। মৎস্যের মধ্যে সহস্রদংষ্ট্র, যাহার অপর নাম পাঠীন, বঙ্গদেশে যাহা বোয়াল নামে প্রসিদ্ধ। চিনিচিম (চিংড়ি), বর্ম্মি (বাইস) এই মাছ অতি সুপথ্য। যাহার মাথা বড় সেই মাছ, রোহিত ও রাজীব॥

দাক্ষিণাত্য মাধবাচার্য্যও পরাশরভাষ্যে (তৃতীয়াধ্যায় ৭৩৭ মুদ্রিত পুস্তক) অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, এইস্থানে মৎস্যভক্ষণের যে নিষেধ আছে, তাহা রাজীব এবং সিংতুণ্ড ব্যতিরিক্ত বিষয় বুঝিতে হইবে। অতএব তিনিই অর্থাৎ যিনি সামান্যতঃ মৎস্যভক্ষণ নিষেধ করিয়াছেন, সেই মনুই কতকগুলি মৎস্য ভক্ষ্য সুতরাং শ্রাদ্ধে দেয় বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; যেমন রাজীব, সিংহতুণ্ড এবং সশল্ক (আইসযুক্ত) মাছ‡। রাজীব পদ্মবর্ণ মৎস্য, সিংহতুণ্ড যাহার মুখ সিংহের মুখের মত বিস্তৃত, যেমন আইড় গাগল প্রভৃতি। এই সকল মৎস্য শ্রাদ্ধে ও নিত্য ভোজনেও ভক্ষ্য।

—ক্রমশঃ

* সর্ব্বান্ কামানবাপ্নোতি হয়-মেধফলং তথা।
গৃহেঽপি নিবসন্ বিপ্রো মুনির্মাংস-বিবর্জ্জনাৎ॥ (১।১৮)

† যক্ষরক্ষঃপিশাচান্নং মদ্যমাংসং সুরাসবম্।
তদ্‌ব্রাহ্মণেন নাত্তব্যং দেবানামশ্নতা হবিঃ॥
তদপি আমমাংসাভিপ্রায়েনৈব।

‡ অত্র মৎস্যনিষেধো রাজীব-সিংহতুণ্ডাদি-ব্যতিরিক্ত-বিষয়ঃ। অতএব তেনৈবোক্তং
"রাজীবাঃ সিংহতুণ্ডাশ্চ সশল্কাশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥ ইতি
এতে সর্ব্বশঃ শ্রাদ্ধে নিত্যভোজনে চ ভক্ষ্যা ইত্যর্থঃ।

মা-আনন্দময়ি!

(শ্রীগৌরীনাথ চক্রবর্ত্তী শাস্ত্রী)

আজ এই হিমালয়ের অনন্ত সৌন্দর্য্যে আমি তোমাকে দেখিতে পাইতেছি। ঐ পর্ব্বতমালার অপূর্ব্ব দৃশ্যে, ঐ তরুরাজির কমনীয় কান্তিতে, ঐ কন্দরে কন্দরে প্রস্ফুটিত কুসুমরাশিতে, ঐ নির্ঝরের ঝর ঝর ঝঙ্কারে, ঐ গগনস্পর্শী শুভ্র তুষারমালায়, ঐ গাম্ভীর্য্যে ঐ অনুপম সৌন্দর্য্যে তুমি যেন মা! ফুটিয়া বাহির হইতেছ; তোমার সৌন্দর্য্যে যেন চারিদিক আলোকিত হইতেছে, তোমার পবিত্রতায় যেন দশদিক পবিত্র হইয়া যাইতেছে, তোমার আনন্দের স্রোতে যেন স্থাবর-জঙ্গম ভাসিয়া যাইতেছে। মা! আজ আমি তোমাকে আমার প্রাণের ভিতর দেখিতেছি, তোমার পবিত্র স্পর্শে যেন আমার এই কলুষিত প্রাণটি পবিত্র হইয়া যাইতেছে, তোমার অনন্তের সান্নিধ্যে যেন আমার এই ক্ষুদ্র প্রাণটি আজ অনন্তকে বরণ করিতেছে, আমি যেন অনন্তের পথের পথিক হইয়াছি। আমার দেহের কথা ত আর আমি ভাবিতেছি না। আমার ভালবাসা ত আর গণ্ডীমধ্যে আবদ্ধ থাকিতেছে না, যেন অনন্তের দিকে ছড়াইয়া পড়িতেছে। প্রাণে ত আর পিপাসা কিছু দেখিতেছি না, মনে ত আর কোন অভাব অনুভব করিতেছি না। আশা, কামনা, উৎকণ্ঠা, ইচ্ছা প্রভৃতি যেন তোমার ঐ অনন্তে বিলয়প্রাপ্ত হইতেছে। যেন আমিও তোমাতে ডুবিয়া যাইতেছি, যেন ঐ অনন্ত জলধির একটি ঢেউ আমি, সেই অনন্তে মিশিয়া যাইতেছি। মা! তোমার পূর্ণতা, তোমার অসীমতা, তোমার অপার আনন্দ যেন আমাকে কোথায় ভাসাইয়া লইয়া যাইতেছে। আনন্দময়ি! তুমি আনন্দস্বরূপা। তোমার পূর্ণতা তোমার অনন্ত সৌন্দর্য্যই আনন্দ। এই আনন্দ যেন আজ এই নিভৃত গিরি-উপত্যকায়, এই গাম্ভীর্য্যে গড়াইয়া পড়িতেছে। এই সৌন্দর্য্যরাশি তোমারই সৌন্দর্য্য, তোমারই আনন্দ—গিরিবর তোমারই সৌন্দর্য্য ও আনন্দ প্রকাশ করিতেছে। যেখানে আনন্দ, যেখানে গাম্ভীর্য্য, যেখানে পবিত্রতা, সেখানে তুমি। তোমারই পবিত্রতায় জগত পবিত্র, তোমারই অসীমতায় জগত পূর্ণ, তোমারই সৌন্দর্য্যে জগত সুন্দর। যেখানে তোমার মহান্ বিকাশ, সেখানে তোমার পূর্ণ প্রকাশ।

হিমাচলে তোমার আশ্চর্য্য প্রকাশ। তুমি অনাদি

অনন্ত। অনন্ত সৌন্দর্য্যের আকর হিমালয়ে তোমার উজ্জ্বল প্রকট। তাই কবি তোমাকে হিমাচলে প্রত্যক্ষ দেখেন। কোন কবি আবার সাগরের গাম্ভীর্য্যে, সাগরের অসীমতায় তোমার প্রকট প্রত্যক্ষ করেন। তুমি অনন্তস্বরূপিণী। কে তোমার ঐ অনন্ত সৌন্দর্য্যের কণামাত্রের অধিকারী হইয়া তোমার চিরসঙ্গী হইতে পারে? যাঁহার হৃদয়-মন অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেমের অভিমুখে ধাবিত একমাত্র তিনিই পারেন। জ্ঞান, বৈরাগ্য, প্রেম ছাড়া তোমার সেবার অধিকারই পাওয়া যায় না, চিরসঙ্গী হওয়া ত দূরের কথা। যিনি তোমার অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত প্রেমের জন্য পাগল হইয়া যান তিনিই তোমার সঙ্গ লাভের উপযুক্ত। তুমি ছাড়া দ্বিতীয় কোন ব্যক্তি তাঁহার প্রাণ শীতল করিতে পারে না। অনন্ত এক ছাড়া দুই নাই। তোমার প্রতিমা তুমিই। তোমার আনন্দে তুমিই আনন্দিত, তোমার জ্ঞানে তুমিই জ্ঞানী, তোমার সত্তায় তুমিই সত্তাবান্। তুমি আপনাকে আপনিই প্রকাশ কর। তোমার জ্ঞানকে প্রকাশ করে এমন আর কিছু নাই—তুমিই দেবদেব মহাদেব। তুমিই অনন্ত প্রেম। ভূধরে সাগরে তোমারই উজ্জ্বল প্রকাশ। তুমি এক, তুমি অদ্বিতীয়, তুমি ভূমা, তুমি মহান্, তুমি অনন্তজ্ঞান, অনন্তপ্রেম, অনন্ত আনন্দ। তোমার জ্ঞান ও প্রেমের সম্মিলন একমাত্র তোমাতেই—অন্যত্র অসম্ভব।

স্ত্রীশিক্ষা। *

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

'কন্যাপ্যেবং পালনীয়া শিক্ষণীয়াতিযত্নতঃ।'

কন্যাকে পালন করিয়া যত্নসহ শিক্ষাদান করিবে, ইহা শাস্ত্রেও লিখিত আছে। স্ত্রীশিক্ষার যে বিশেষ প্রয়োজনীয়তা আছে তাহা সকলেই মনে রাখিবেন। ভগবান এ সংসারে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলকেই জ্ঞানলাভ করিতে বলিয়াছেন। সংসারে কি স্ত্রী কি পুরুষ সকলেরই বিদ্যাশিক্ষার প্রয়োজন। কিন্তু তাই বলিয়া নারীর শিক্ষা পুরুষের শিক্ষার অবিকল অনুরূপ হওয়া উচিত নহে। করুণাময় পরমেশ্বর নারীকে জগতের জননীরূপে সৃষ্টি করিয়াছেন। নারী জগতের জননী ও জগতের মাতা। মাতৃত্বেই নারীজীবনের পূর্ণ পরিণতি। মানবের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি চিন্তা ও কার্য্য-প্রণালী সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া যাহাতে জ্ঞান বুদ্ধি দয়া ধর্ম্ম স্নেহ মমতা প্রীতি ভক্তি প্রভৃতি সদ্‌গুণের বিকাশ হয়, শিক্ষার তাহাই উদ্দেশ্য। নতুবা শিক্ষা শব্দে তোতা-পাখীর মত কতকগুলি পুস্তক পাঠ করিয়া এম-এ, বি-এ, উপাধি-ধারিণী হইলেই যে বিদ্যার চরম সার্থকতা লাভ হইবে তাহা নহে। বিলাস-আড়ম্বরপূর্ণ পরিচ্ছদ পরিয়া কলেজে অধ্যয়ন না করিলে তাঁহাদের যে শিক্ষার পথ-রোধ হইবে তাহাও নহে।

স্ত্রীশিক্ষার উদ্দেশ্য শুধু ভাষাশিক্ষা বা সাহিত্যচর্চ্চা বা নাটক নভেল পড়া নহে। নারীনীতি বা নারীর কর্ত্তব্য পালন সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদের শিক্ষা করা প্রয়োজন। যে শিক্ষায় তাঁহাদের হৃদয়ে স্নেহ দয়া ভক্তি প্রীতি মমতা প্রভৃতি সদ্‌গুণগুলি বিকশিত হইয়া উঠে, যে শিক্ষায় তাঁহারা কর্ত্তব্যপরায়ণা ও গুরুজনসেবা-নিরতা হইয়া সংসারধর্ম্মে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়া সন্তানপালনে যত্নবতী ও পতিসেবা-পরায়ণা হইয়া সংসারে সুশৃঙ্খলা সাধন করিতে পারেন, সেই শিক্ষাই তাঁহাদের প্রার্থনীয়। শিক্ষিত চরিত্রবান স্বামীমাত্রেই স্ত্রীকে তাঁহার অনুরূপ শিক্ষা দিয়া গঠিত করিতে পারেন। আমাদের দরিদ্র বঙ্গদেশে যে শিক্ষা দ্বারা নারীগণ অভাব-অসচ্ছলতাপূর্ণ বঙ্গগৃহে সুখ-শান্তি পবিত্রতা আনয়ন করিতে পারেন সেই শিক্ষাই বাঞ্ছনীয়। মোটামুটি যাহাতে তাঁহারা নিজের ভাষাটী উত্তমরূপে শিখিয়া সংসারের হিসাব রাখিয়া পুত্রকন্যাদের সৎশিক্ষা দিয়া মনুষ্য করিয়া তুলিতে পারেন তাহাই আবশ্যক। তাহা ছাড়া সন্তানপালন রোগীচর্য্যা প্রসূতিচিকিৎসা গৃহের স্বাস্থ্যরক্ষা প্রভৃতি বিষয়গুলিও নারীদের ভালরূপ শিক্ষা করা কর্ত্তব্য। এক্ষণে বর্ত্তমান সময়ে নারীগণ উচ্চশিক্ষালাভে বিলাসিতার চরম ভক্ত হইয়া উঠিতেছেন, এবং তাঁহারা স্বাধীনা স্বতন্ত্রা হইতে চাহেন। এক্ষণে পূর্ব্বের ন্যায় বঙ্গগৃহে আর একান্নবর্ত্তী পরিবারের মধ্যে সে পরার্থপরতা নাই; সংসারের মধ্যে স্নেহ-প্রীতি-মমতার বন্ধন নাই। এখন শিক্ষিতা হইয়া সকলেই স্ব-স্ব স্বার্থসুখ অন্বেষণ করিয়া থাকেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার ফলে তাঁহাদের স্বার্থের প্রসারতা বাড়িয়াছে। যে শিক্ষায় নারীদের বিলাসিনী করে, চঞ্চল করে, বহির্মুখী করে, সে শিক্ষা কখনই আমাদের উপযোগী নহে। এখন আর পতি-পত্নীর মধ্যে পূর্ব্বের ন্যায় সেব্য-সেবিকা ভাব নাই। ইহার ফলে সংসারে দুঃখ অভিমান অশান্তির আগুনই জ্বলিয়া উঠিতেছে। আজকাল নারীগণ শিক্ষিতা হইয়া নারীনীতিকে পদদলিত করিয়া সকল বিষয়েই স্বাধীন মতাবলম্বিনী হইতে চাহেন। আমাদের হিন্দুসমাজ পূর্ব্বে বাল্যবিবাহের যে একান্ত পক্ষপাতী ছিলেন, তাহার কারণ বাল্যকাল হইতে বালিকা বধূটীকে গৃহে আনিয়া

* লেখিকা সুপ্রসিদ্ধ ৺মদনমোহন তর্কালঙ্কার মহাশয়ের দৌহিত্রী। রক্ষণশীল হিন্দুগৃহে প্রাচীন মহিলাগণের মধ্যেও স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে কিরূপ উদার ভাব প্রসার লাভ করিয়াছে তাহাই দেখাইবার জন্য এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটী প্রকাশ করিলাম, তঃ সঃ

তাহাকে যে-ভাবে গঠিত করিয়া তুলিতেন, সে সেই ভাবে গঠিত হইত এবং শ্বশ্রূ প্রভৃতি গুরুজনের আজ্ঞানুবর্ত্তিনী হইয়া সুখে-শান্তিতে জীবনাতিপাত করিত। কিন্তু এখন বয়স্থা বধূগণ স্বামীগৃহে আসিয়া আর স্বামী বা স্বামীর আত্মীয়স্বজনের সহিত সেরূপভাবে মিশিতে পারেন না, বয়সের সহ তাঁহাদের প্রকৃতি ও অভ্যাস দৃঢ় হইয়া যায়।* আমাদের দেশের শাস্ত্রকার বলিয়া গিয়াছেন যে, স্ত্রীলোকের স্বতন্ত্রতা নাই।

নারীকে শ্বশুরকুলে সাম্রাজ্ঞী হইতে হইবে। সংসারে আসিয়া যদি সাম্রাজ্ঞীর পদ লাভ করিতে হয়, তাহা হইলে আজন্মপরিচিত পিতৃগৃহ ত্যাগ করিয়া তাঁহাকে স্বামীগৃহে আসিয়া লজ্জা বিনয় দয়া-দাক্ষিণ্য মধুরভাষিতা দ্বারা স্বামী ও স্বামীর আত্মীয়স্বজনের চিত্ত আগে জয় করিতে হইবে এবং নারীজনোচিত কোমলতা সুকুমারতা মধুরতা প্রভৃতি সৌন্দর্য্যে তাঁহাকে বিভূষিতা হইতে হইবে। স্ত্রীপুরুষের মিলনই শুধু বিবাহের উদ্দেশ্য নহে। পতিপত্নী বিবাহবন্ধনে ও ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া বিবাহজীবনে উভয়ে একাত্মা একপ্রাণ একমন হইয়া সংসারব্রতে নিজের ভোগসুখ বলি দিয়া স্বার্থসুখ বিসর্জ্জন দিয়া সংসারের মঙ্গলসাধন করিবেন। ইহাই বিবাহের উদ্দেশ্য। বিবাহের পর স্বামীর সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে রোগে শোকে কর্ম্মে ধর্ম্মে স্ত্রী তাঁহার সহধর্ম্মিণী হইয়া পতির সহচারিণী হইবেন। নবদম্পতী দাম্পত্য-জীবন যাহাতে সংযতরূপে পরিচালন পূর্ব্বক সৎপুত্রের জনক-জননী হইয়া সংসার-ধর্ম্ম সাধন করিতে পারেন তাহাই বিবাহের মুখ্য উদ্দেশ্য।

বিবাহের মধ্যে যে একটী মঙ্গল উদ্দেশ্য নিহিত আছে তাহা বোধহয় কেহ অস্বীকার করিতে পারিবেন না। ধর্ম্মবন্ধনে আবদ্ধ হইয়া এবং ঈশ্বরসাক্ষী করিয়া পতিপত্নী সম্মিলিত হয়। আমাদের হিন্দুসমাজের এ বিবাহবন্ধন অচ্ছেদ্য। আমরণ পতিপত্নী একত্র থাকিয়া সংসারধর্ম্ম পালন করিতে হইবে, এজন্য পতিপত্নী উভয়কেই শপথ করান হয় যে তোমার হৃদয় আমার হউক ও আমার হৃদয় তোমার হউক। নববধূ অরুন্ধতী নক্ষত্রকে স্মরণ করিয়া মন্ত্রপাঠ করিয়া বলেন, আমি এই অরুন্ধতীর ন্যায় পতির যেন চিরসহচরী হইয়া তাঁহার সহ চিরমিলিত থাকি। এবং ধ্রুব নক্ষত্রকে প্রদর্শন করিয়া বলেন, হে ধ্রুব! তুমি যেমন অচল ও চিরস্থির আমিও যেন সেইরূপ পতিকুলে স্থির ও অচল হইয়া থাকি। হিন্দু স্ত্রী শুধু স্বামীর ক্রীড়াপুত্তলী বা বিলাস-ভোগের সহচরী নহেন। স্ত্রী স্বামীর অর্দ্ধাঙ্গিনী মহাশক্তি স্বরূপা। এজন্য শিক্ষায় দীক্ষায় জ্ঞানে কর্ত্তব্যে ধর্ম্মে কর্ম্মে তাঁহাকে পতির উপযুক্তা হইতে হইবে।

যাঁহাকে পতিকুলে সাম্রাজ্ঞী হইতে হইবে, তাঁহার সংসাররূপ সাম্রাজ্য পালন করিবার উপযুক্ত হওয়া চাই। কিন্তু অন্যান্য দেশে রূপের মোহে মুগ্ধ হইয়া যে বিবাহ বা মিলন হয়, তাহাতে ধর্ম্মবন্ধনের বড়ই অভাব। সে বিবাহ চিরস্থায়ী ও সুদৃঢ় হয় না। তাহার পর নারী-মাত্রেই মনে রাখিবেন যে, তাঁহারা শুধু রমণী নহেন তাঁহারা জননী। জননীর অশেষ কর্ত্তব্য-ভার তাঁহাকে বহন করিতে হইবে। সুমাতা হইতে সৎপুত্রের উদ্ভব হয়। এজন্য জননীগণের আদর্শ জননী হওয়া প্রয়োজন। যতদিন না আমাদের দেশের জননীগণ আদর্শ জননী হইয়া সন্তানকে আদর্শ মানবে পরিণত করিতে পারেন, ততদিন আমাদের সমাজের উন্নতির আশা সুদূরপরাহত!

প্রতিশব্দ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সংগৃহিত)

Apoplexy = সন্ন্যাস-রোগ।

Anatomy = শারীর-বিদ্যা, শারীর-পরিচয়।

আকন্দ = (হিন্দী) মান্দার, (ইংরাজী) Calotropis

Attitude (কলাশাস্ত্রে) = ভঙ্গিমা।

Air (কলাশাস্ত্রে) = আস্যরেখা (সাহিত্য, বৈশাখ, ১৩২০)

অজ্ঞানবাদ ১৩২৭ সালের বৈশাখের শান্তিনিকেতনে Agnosticismএর প্রতিশব্দরূপে ব্যবহৃত হইয়াছে। কিন্তু তাহা সঙ্গত মনে হয় না। "অজ্ঞেয়বাদ" শব্দই সঙ্গত প্রতিশব্দ।

Board = ফলক।

Black tea = কৃষ্ণ চা (?)

Botany = উদ্ভিদবিদ্যা।

Behaviour = ব্যবহার।

বাসক = (হিন্দি) বাসা, অড়ূসা, বিশোংড়া; (মহারাষ্ট্র) আড়ূবসা; (কর্ণাট) আড়সোগে; (উড়িয়া) বাসা, বাসিকা; (তৈলঙ্গ) আড়াপাকু, আড়সারং; (তামিল) অড়টোতে; (Latin) আধাটোডা ভেসিকা; (ইংরাজী) Malabar nut [স্বা. সং ১৩২৫]।

বিজতাড়ক = (সংস্কৃত) জীর্ণদারু, অজরা, জীর্ণা, বিধরা;

* এ কথা আমরা নির্ভুল বলিয়া স্বীকার করিতে পারি না। অনেক স্থলে দেখা যায় বালাবিবাহিত বধূও কলহপ্রিয়তার কারণে সংসার ছারখার করিয়া দিয়াছেন, এবং যৌবনবিবাহিত শিক্ষিত বধূ শিক্ষাগুণে সংসারকে সুশৃঙ্খলার মধ্যে আনিয়া উজ্জ্বল করিয়া তুলিয়াছেন। পতির মর্য্যাদা ও পতির সেবা না জানা পর্য্যন্ত বিবাহ আমাদের শাস্ত্রমতেও নিষিদ্ধ। তঃ সং

মহারাষ্ট্র) শ্বেতবরধারী ; (গুজরাট) বরধারী ; (কর্ণাট) পরডুমুল ; (তৈলঙ্গ) চঙ্গপুষ্টি ; (Latin) Desh [বাং সং আষাঢ় ১৩২৫]
Conductor = চালক, পরিচালক।
Comparative religion = সমীক্ষিত ধর্ম্ম।
Crotalaria-juncia = শণ।
Cowpea = বরবটী।
Cut and dried = কাটা-ছাঁটা।
Chemistry = কিমিয়া বিদ্যা, বস্তুতত্ত্ববিজ্ঞান (গ. না. সে. ?), বস্তুযোগ (?)
Cassava = সিমুল আলু।
Clan = গোষ্ঠী।
Citizen = নাগরিক।
Cohesion = আশ্লেষণ।
Co-ordination = অঙ্গাঙ্গীকরণ।
Colours (কলাশাস্ত্র) = বর্ণাবলী।
Colouring = বর্ণবিলেপন।
Chiaroscuro = ছায়ালোকসমাবেশ।
Composition = পাত্রসমাবেশ।
Drawing = রেখাঙ্কন।
Dumping ground = ধাপা (?)
Dress = পরিচ্ছদ।
Design = উদ্ভাবনা।
Eruption = বীসর্প (গ. না. সে.)
Eczema = বিচর্চ্চিকা (গ. না. সে.)
Exaggeration = গুণবাদ।
Exception = ব্যতিক্রম, অপবাদ (?)
Expression = ভাব।
Factory = কলঘর, কারখানা।
Fermentation = পচন।
Full = পূর্ণ।
For me = আমার জবানীতে, আমার হইয়া।
Feudalism = ভৌমিকতা।
Foremast = অগ্রমাস্তুল।
Green tea = সবুজ চা।
Grace = কৃপা।
God's grace = ভগবৎকৃপা।
God = ঈশ্বর, ব্রহ্ম, পরব্রহ্ম, পরমাত্মা, পরমেশ্বর।
Hypnotise = আচ্ছন্ন করা; মুগ্ধ করা।
Hypnotism = সম্মোহন।
Harmony (সঙ্গীত) = স্বরসম্বাদ।
Harmony = ক্রমমিল (?)
Heredity = বংশবিজ্ঞান।

Intern = অন্তর্হরণ; অন্তরীণ (?)
করবী = (সংস্কৃত) করবী, শ্বেতপুষ্প, শতকুম্ভক, অশ্বমারক; (হিন্দি) কনের (শ্বেত রক্ত ভেদে); (মহারাষ্ট্র) কনের, কুলনী, শ্বেতফুলাংচি ইত্যাদি; (গুজরাটী) কনের, কুলনী; (কর্ণাট) বাকনা লিঙ্গে, কেচালা লিঙ্গে; (তৈলঙ্গী) কনের, চেল্লু; (ফারসি) খরজেহেরা; (আরবী) সুমন, ডিমার-দফ্‌লি; (ইংরাজী) sweetscented oleander; (Latin) Cerbera Thevetia [বাং সং চৈ ১৩২৫]
Keal = মেরুদণ্ড (জাহাজের)
খসখস = বেণার মূল
Leucorrhea = শ্বেত প্রদর
Library = গ্রন্থকুটীর (?) গ্রন্থালয়, পুস্তকালয় গ্রন্থাগার।
Medicine = কায়চিকিৎসা (গ. না. সে. ?), ঔষধ
Midwifery = প্রসূতিতন্ত্র (গ. না. সে.)
Model = আদর্শ, ছাঁদ, ছাপ (?)
Mainmast = মাঝামাস্তুল
Nationalism = সংঘাত্মিকতা (?) জাতীয়তা
Nation = জাতি, সংঘ (?) (সাহিত্য, পৌষ ১৩২০)
Otorrhea = কানে পুঁজপড়া
Obiter dicta = বাহ্যবিধান (গীতারহস্য)
Ocean = বাহির সমুদ্র
Pruning = ছাঁটা
Plucking = পাতিতোলা
Phascolus Memgo = মাটিকলাই
Poultice = পুলটিশ, প্রলেপ (?)
Periostitis = অস্থিপ্রদাহ
Physiology = শারীর বিজ্ঞান (?) (গ. না. সে.)
Psychology = মনোবিজ্ঞান
Philosophy = দর্শন
Physics = প্রাকৃতিকবিজ্ঞান,
Physiognomy = আননবিজ্ঞান
Perspective = পরিপ্রেক্ষিত বিজ্ঞান (?)
Plan = নক্সা
Rolling = পেষণ
Rude = রূঢ়
Roman = রোমক
Signboard = নিদর্শনফলক
Sunn hemp = শণ
Soybean = গরশিম
Stools = দাস্ত
Seeds = বীজ, বিচি
Sciatica = গৃধ্রসী

Surgery = শল্যতন্ত্র
Step = ধাপ
Shunt = ষণ্টু (কুলীদের ভাষা)
Sacred Books of the East = প্রাচ্যধর্ম্মগ্রন্থমালা
Splint = "বাড়"
Spectroscope = বর্ণবীক্ষণ
Ticket = টিকিট নিদর্শনপত্র
Theatre = থিয়েটার, অভিনয়শালা
Tertiary Eruption = বিষবিসর্প (প. না. সে.)
Tablet = চক্রিকা (প. না. সে.)
Translation = অনুবাদ
Territorial = দেশাত্মবোধ (?) (সাং পৌষ ১৩২০)
Ulcer of Cervix = নাড়ীর ক্ষত
বসিষ্ঠ = (জেন্দাবেস্তায়) উৎকৃষ্টতম, মঙ্গলতম (শান্তি নিকেতন, বৈ, ১৩২১)
Wither = মুষড়িয়া যাওয়া, শুকাইয়া যাওয়া
Wash = ধাবন (প. না. সে.)

ব্রহ্মসঙ্গীত-স্বরলিপি।

বাহার—খাণ্ডারবাণী চৌতাল।

ফুলরাশি চারি দিশি ফুটে, বসন্তেরি
হের বহিছে পবন—মন্দ মন্দ সমীরণ সনে ধায় হে
যত মধুপবৃন্দ ধ্বনিয়া সব কুঞ্জ,
নব নব ফুলকলিকার পরে বসে হয়ে মধুব্রত—
কেতকী গোলাপ আর চম্পা বকুল বেলা
অতি কোমলদল কুসুম সহিত প্রফুল্লিত হয়ে
প্রাণ খুলি' দিতেছে সুবাস ঢালি' মোহিয়া প্রাণ।

বাহার—খাণ্ডারবাণী চৌতাল।

আজি বন ঘন ফুলে ফুলে ছাইল রে,
তব মধুর সুবাস মন্দ মন্দ মলয়জ সনে বয় হে।
যত ভকতবৃন্দ আসিয়া মিলি পুঞ্জে
নব নব ফুলহার গাঁথি দিছে তব পদে শত—
তোমারি আরতি করি' চিত্ত হইল শান্ত ;
সব সন্তাপজাল কাটিল তোমার আশীর্ব্বাদ পেয়ে—
প্রাণ গেল ভরিয়া হরষে আজি প্রাণের প্রাণ।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীবাণীদেবী।

১´ • ২ • ৩ ৪ ১´ • ২
I সা -া। মা -া। মা মা। মা মা। মা -া। পধা মপা I মজ্ঞা -া। জ্ঞা মা। পা -া।
(১) আ • জি • ব ন ঘ ন ফু • • • লে ফু • লে ছা • •
(২) ফু • ল • রা শি চা রি দি • • • শি ফু • টে ব স •

• ৩ ৪ ১´ • ২ • ৩ ৪
। -া র্সা। ণা ধা। ধা না I না র্সা। র্সা র্সনা। র্রা র্সা। ণা ধা। ধা ধা। ণা পা I
(১) ই ল রে • ত ব ম ধু র সু• বা স ম • ন্দ ম • ন্দ
(২) • ন্তে রি • হে র ব হি ছে প• ব ন ম • ন্দ ম • ন্দ

১´ • ২ • ৩ ৪ ১´ • ২
I মা মা। মা মা। মা পমা। পা মা। মজ্ঞা -া। মা পা I মজ্ঞা জ্ঞা। মা রা। -া সা।
(১) ম ল য় জ স নে• ব য়্ হে • য ত ভ ক ত বৃ • ন্দ
(২) স মী র ণ স নে• ধা য়্ হে • য ত ম ধু প বৃ • ন্দ

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
সা সা। মা মা। মা মা I মা পা। সপা মা। জ্ঞা -া। মা ধা। না র্সা। র্সধা না I
(১) আ সি য়া মি লি পু ষ্পে ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০
(২) অ নি য়া স ব কু ঞ্জ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২
I না না। র্সা র্সা। র্সা -া। র্সা র্সা। র্সা র্সা। র্সা র্সা I র্সা না। র্সা র্রা। র্সর্রা র্জ্ঞা।
(১) ন ব ০ ন ব ০ ফু ল হা র গাঁ থি দি ০ ছে ০ ০ ০
(২) ন ব ০ ন ব ০ ক লি কা য় প রে ব ০ সে ০ ০ ০

০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। র্সর্রা র্সা। ণা র্সা। ণা ধা I পা মা। জ্ঞমা -া। জ্ঞা -া। জ্ঞা জ্ঞা। মা রা। রা সা II
(১) ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ত ব প দে শ ত
(২) ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ হ য়ে ম ধু র ত

১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০
[মা]
{ণা ধা। না না। র্সা র্সা। র্রর্সর্সা -া। র্সা নর্সা। -া র্সা I} না র্সা। র্রা র্জ্ঞা।
(১) তো ০ মা রি ০ আ র০০০ ০ তি ক ০ রি চি ০ ত ০
(২) কে ০ ত কী ০ গো লা০০০ ০ প আ ০ র চ ০ ম্পা ০

২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। র্সর্রা র্সা। না র্রা। র্সা নর্সা। ণা ধা I ধা ণা। র্সা র্রা। র্সর্রা র্জ্ঞা। র্রা র্সা।
(১) হ ই ০ ল শা ০ ন্ত ০ স ব স ০ ন্তা প ন্না ন
(২) ব কু ০ ল বে ০ লা ০ অ তি কো ০ ম ল ম ন

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪ ১´
। ণা র্সা। ণা ধা I ণা পা। মা মা। -া ণা। -া ণা। র্সা ণা। ধা না I না র্সা।
(১) কা টি ল তো মা র আ শী ০ র্বা ০ দ পে য়ে ০ ০ প্রা ০
(২) কু সু ম স হি ত প্র সূ ০ নি ০ ত হ য়ে ০ ০ প্রা ০

০ ২ ০ ৩ ৪ ১´ ০ ২ ০
। র্সা র্সা। -া র্সা। র্সা র্সা। র্সা র্সা। র্সা র্সা I র্সা না। র্সা র্রা। র্সর্রা র্জ্ঞা। র্সর্রা র্সা।
(১) ণ পে ০ ল ভ রি য়া হ র ষে আ ০ জি ০ ০ ০ ০ ০
(২) ণ খু ০ লি দি তে ছে সু বা স ঢা ০ লি ০ ০ ০ ০ ০

৩ ৪ ১´ ০ ২ ০ ৩ ৪
। ণা র্সা। ণা ধা I পা মা। জ্ঞমা -া। জ্ঞা -া। মজ্ঞা জ্ঞা। মা রা। -া সা IIII
(১) ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ প্রা ণে র প্রা ০ ণ
(২) ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ ০ মো হি য়া প্রা ০ ণ

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকী।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আমরা গতবর্ষের ভাদ্র মাসের পত্রিকায় "ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা" সম্বন্ধে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ প্রকাশ করি। শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন বার এট-ল, উক্ত প্রস্তাবকে সমর্থন করিয়া তাঁহার "The Centenary of the Brahmo Somaj. An appeal to the Brahmo Public and to all Fellow-Theists" নামক পুস্তিকা রচনা করেন এবং বিবিধ প্রমাণের সাহায্যে দেখাইতে চান যে ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন। তাহার বিরুদ্ধে শ্রীযুক্ত সতীশ চক্রবর্ত্তী ও শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার যে পুস্তিকা প্রচার করেন তাহার উপপাদ্য বিষয় এই যে ১৭৫০।৬ই ভাদ্রই ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি। আমরা বলিয়াছিলাম যে ১৭৩৭ শকে রাজা রামমোহন রায় তাঁহার মাণিকতলার উদ্যানে আত্মীয়-সভা স্থাপন করেন এবং উক্ত সভা নানাস্থানে পরে স্থানান্তরিত হয়। শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উহার নির্ব্বাহক ছিলেন। ১৭৩৯ শকে রাজার বিরুদ্ধে তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্র সুপ্রীম-কোর্টে এক মোকর্দ্দমা আনয়ন করায় এবং রাজা ৩ বৎসর ধরিয়া তাহাতে বিব্রত হইয়া পড়ায় আত্মীয়-সভার অধিবেশন আর হইত না। রাজা ঐ অন্যায় অভিযোগ হইতে মুক্ত হইয়া ১৭৪১ শকে উহা আবার জাগাইয়া তোলেন। অন্যান্য অধিবেশনের মধ্যে উহার এক অধিবেশন বৃন্দাবন মিত্রের গৃহে. আর এক অধিবেশন ভূ-কৈলাসের রাজা কালীশঙ্কর ঘোষালের বাটীতে এবং আর একটি অধিবেশন ১৮৪১ শকের পৌষ মাসে তুলাবাজারের শ্রীবিহারীলাল চোবের বাটীতে হইয়াছিল। উক্ত চোবে মহাশয় ঐ অধিবেশনে শ্রীতারিণী চরণ মিত্র, রাজা রাধাকান্ত দেব, রাজা রামমোহন রায়, রঘুনাথ শিরোমণি, হরনাথ তর্কভূষণ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রী প্রভৃতি অনেক ধনবান ও জ্ঞানবান ব্যক্তিকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। রাজা পৌত্তলিকতার বিরুদ্ধে বহুপূর্ব্ব হইতে গ্রন্থ প্রকাশ করিতে থাকায় তাঁহার বিরুদ্ধে স্থানীয় লোকদিগের শত্রুতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতেছিল। এই কারণে আত্মীয়-সভা ক্রমে বন্ধ হইয়া আইসে।

আত্মীয়-সভা উঠিয়া গেলে ১৭৪৯ শকে রাজা, তাঁহার ভাগিনের পুত্র, তাঁহার সুহৃদ্ কুটুম্ব, তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী, চন্দ্রশেখর দেব, এডাম সাহেবের সভায় ধর্ম্মোপদেশ শ্রবণ করিতে যাইতেন। একদিন ফিরিবার সময় রাজার শিষ্য তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী ও চন্দ্রশেখর দেব রাজাকে বলিলেন, বিদেশীয় লোকের ধর্ম্মালয়ে যাইয়া আমাদের ধর্ম্ম-উপদেশ শুনিতে হয়, ইহা অতি অনুতাপের কারণ। আমাদের কি এমন কোন সাধারণ স্থান নাই, যে তথায় বেদাধ্যয়ন বা অন্যপ্রকার পরমার্থপ্রসঙ্গ হইতে পারে। রাজা উত্তরে বলিলেন যে শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর ও কালিনাথ রায়ের সহিত সাক্ষাৎ হইলে এবিষয় তাঁহাদের গোচর করিয়া ধার্য্য করা যাইবে। শ্রীযুক্ত দ্বারকানাথ ঠাকুর, প্রসন্নকুমার ঠাকুর, কালিনাথ রায়, মথুরানাথ মল্লিক এ বিষয়ে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইলেন। ১৭৫০ ভাদ্রমাসে যোড়াসাঁকোস্থিত কমলবসুর বাটীতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহাতে প্রতি শনিবার সায়ংকালে সমাজ হইত। দুইজন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিতেন, উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন এবং রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যা করিতেন। প্রথম ব্যাখ্যানের তারিখ ৬ই ভাদ্র, বুধবার ১৭৫০ শক দেখিতে পাই। পরে সঙ্গীত হইয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য শেষ হইত। তৎকালে তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী সমাজের নির্ব্বাহক ছিলেন: (১৭৬৯ শকের আশ্বিন সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সারাংশ)।

পূর্ব্ব হইতে জমি সংগ্রহের চেষ্টা হইতেছিল। কমল বসুর বাটীর অদূরে জমি সংগ্রহ ও গৃহ বিনির্ম্মিত হইল, এবং ১৭৫১ শকের ১১ই মাঘ তারিখে নিজ গৃহে ব্রাহ্মসমাজ স্থানান্তরিত ও প্রতিষ্ঠিত হইল ও তাহার ট্রষ্টডিড লিপিবদ্ধ হইল। বিশেষ নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে বুঝিতে পারা যায় যে কমল বসুর বাটীর সমাজই আত্মীয় সভার অনুবৃত্তি মাত্র। পরস্পরের মধ্যে মূলগত বিশেষ পার্থক্য ছিল না। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে কমল বসুর বাটীতে যে উপাসনা আরম্ভ হয়, তাহা ১৭৫১।১১ই মাঘ পর্য্যন্ত যে অবিশ্রান্তভাবে চলিয়াছিল তৎসম্বন্ধেও কেহ কেহ সন্দিহান। চাক্ষুষ প্রমাণ না থাকায় উহার পক্ষে বা বিপক্ষে কোন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। তবে রাজা যেরূপ দৃঢ়চেতা লোকছিলেন, তাহাতে বন্ধ না হওয়া সম্ভবপর।

শ্রদ্ধেয় সতীশ বাবু "The Brahmo Somaj Centinary of 1928" নামে যে পুস্তিকা বাহির করেন, তাহার প্রতিপাদ্য বিষয় এই যে ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন। তিনি আপনার মত সমর্থন করিতে গিয়া তাঁহার প্রবন্ধের ১৩ পৃষ্ঠায় লিখিয়াছেন যে আত্মীয় সভা "Private Meeting ground for Rammohan and his friends"। একথা সমীচীন বলিয়া বোধ হয় না। "আত্মীয়" নাম দেখিয়া তিনি private বলিতে সাহসী হইয়াছেন। উপরে লিখিত সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভাল করিয়া পাঠ করিলে অন্যরূপ বুঝায়। অবশ্য নূতন মত স্থাপন করিতে হইলে অল্প-সংখ্যক সমবিশ্বাসী লোকের মধ্যেই তাহার সূচনা হয়,

ক্রমে দিন দিন তাহার প্রসার বৃদ্ধি হইতে থাকে। বৃন্দাবন মিত্র, রাজা কালিশঙ্কর ঘোষাল, বিহারিলাল চোবের বাটীতে যে আত্মীয় সভার অধিবেশন হয় তাহাকে private বলা যায় না। বিহারিলাল চোবের বাটীতে বহু লোককে আহ্বান করা হইয়াছিল, আমরা পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করিয়াছি। ক্রমে যখন রাজার মত এদেশে বদ্ধমূল হইবার সূচনা হইল, তখন হইতেই লোক বৃদ্ধি হইতে আরম্ভ হইল এবং হওয়াই স্বাভাবিক। Office bearer সম্বন্ধে আমাদের কথা এই যে আত্মীয় সভার নির্ব্বাহক শ্রীবৈকুণ্ঠনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ছিলেন এবং কমলবসুর বাটীর সমাজের নির্ব্বাহক ছিলেন তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তী। তখন সমাজের সভ্যসংখ্যার এত বিস্তৃতি ঘটে নাই, যে অধিক সংখ্যক পরিচালক আবশ্যক হইবে। আত্মীয় সভায় পাঠ করিতেন শিবপ্রসাদ মিশ্র এবং সঙ্গীত করিতেন গোবিন্দমালা। কমলবসুর বাটীর সমাজে প্রথম দিনে চারিজন আচার্য্যের নাম দেখা যায়। অধিকন্তু বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন। উপাসনার জন্য স্থায়ী গৃহ বলিতে গেলে কমলবসুর বাটী নহে, উহা ব্রাহ্মসমাজের বর্ত্তমান গৃহ। ব্যাখ্যানের অভাবেই যে পার্থক্য সূচিত হয় এমন নহে। অধিকন্তু আত্মীয় সভাতেও বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান দিতেন। আত্মীয় সভায় একেশ্বরবাদ প্রচারের জন্য তৎপোষক শাস্ত্রব্যাখ্যা হইত না এরূপ মনে করাও অসঙ্গত। (ঈশানবাবুর প্রণীত ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উপাসনা পদ্ধতি ও ব্যাখ্যান ১১৯ পৃঃ দ্রষ্টব্য)। বেদ পাঠের জন্য পর্দ্দা থাকা না থাকা সাধারণ শ্রোতার সহিষ্ণুতার উপরে নির্ভর করে। উহা মারাত্মক পার্থক্যের সৃষ্টি করে না। বিশেষতঃ কমল বসুর বাটীতে উপাসনা কালে যে পর্দ্দা উঠিয়া গিয়াছিল তাহার সাক্ষাৎ প্রমাণ নাই। ট্রষ্টী নিয়োগ যাহা হইয়াছিল তাহা আদিব্রাহ্মসমাজের নূতন গৃহ সম্বন্ধেই হইয়াছিল।

আমরা ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রকে বহুদিন হইতে উচ্চ স্থান দিয়া থাকি, কিন্তু ১৭৮৭ শকের জ্যৈষ্ঠ সংখ্যায় যে প্রেরিত পত্র বাহির হইয়াছে এবং পরবর্ত্তী তিন সংখ্যায় ঐ পত্রের যে অনুক্রম চলিয়াছে, তাহা পাঠ করিলে আমাদের অন্যরূপ ধারণা হয়। পত্র-প্রেরক তাঁহার নিজের নাম দেন নাই। অথচ প্রথম পত্রে তিনি নিজেকে প্রত্যক্ষদর্শী বলিয়া পরিচয় দিয়াছেন। পত্র প্রেরকের নিজের নাম প্রকাশিত না থাকিলেও আমাদের মনে হয় ইনি চন্দ্রশেখর দেব বা তারাচাঁদ চক্রবর্ত্তীর অন্যতর। তিনি তাঁহার চারিখানি পত্রটির কোনটিতে কমলবসুর বাটীর সমাজের উল্লেখ করেন নাই বা ৬ই ভাদ্র যে ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন তাহার কিছুমাত্র পরিচয় দেন নাই। তিনি সুস্পষ্ট ভাষায় বলিয়াছেন যে ১৭৫১। ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজের জন্মদিন। প্রকৃত পক্ষে যে উদার ভিত্তির উপর ১৭৫১।১১ই মাঘের ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা ও যাহার বিশেষ পরিচয় আদিব্রাহ্মসমাজের অপূর্ব্ব ট্রষ্টডিডে দেখিতে পাই, তাহার অনুরূপ নিদর্শন "আত্মীয় সভা" বা কমলবাবুর বাটীর প্রতিষ্ঠিত সভায় দেখিতে পাওয়া যায় না, বা তদ্রূপ কোন কথা ঘোষিত হয় নাই। রাজা তাঁহার উদার হৃদয়ের নিদর্শন অন্য কোন স্থানে আর কিছু রাখিয়া না গেলেও ঐ ট্রষ্টডিডই তাঁহাকে পূর্ণভাবে চিনাইয়া দেয়। উহা নিবিষ্ট-চিত্তে পাঠ করিলেই রাজার বিরাট হৃদয়ের সম্পূর্ণ পরিচয় সংক্ষেপের মধ্যে দেখিতে পাওয়া যায়। ১৭৫১। ১১ই মাঘে ব্রাহ্মসমাজ নিজের গৃহ পাইলেন, পরিচালনার জন্য ট্রষ্টী পাইলেন, ব্রাহ্মসমাজের উদার মতামত ট্রষ্টডিডে সুস্পষ্টভাবে বিঘোষিত হইল, কার্য্যনির্ব্বাহক স্থিরীকৃত হইল; ভবিষ্যতে আত্মীয় সভার ন্যায় যাহাতে উপাসনা কার্য্য স্থগিত হইয়া না যায়, আবহমানকাল ধরিয়া অব্যাহত ভাবে সুদূর ভবিষ্যতেও চলিতে থাকে তাহার বিধিব্যবস্থা নিরূপিত হইল। এই কারণে ১৭৫১।১১ই মাঘ বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন বলিলেই সঙ্গত হয়। আমরা পাঠকবর্গকে ঐ চারিখানি চিঠি পাঠ করিতে অনুরোধ করি। আমরা ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্রকে যেরূপ বড় করিয়া দেখিতে পাই, পত্রপ্রেরক তাহার কিছুই দেখিতে পান নাই। তিনি সুস্পষ্টভাবে বলিয়াছেন যে ১৭৫১। ১১ই মাঘই ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার দিন। উক্ত পত্রে ১৭৫০।৬ই ভাদ্রের একবারেই উল্লেখ নাই।

বিদ্যাবাগীশ মহাশয় ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র তারিখে যে ব্যাখান দেন তাহার শিরোভাগে "ব্রাহ্মসমাজ" এই কথাটি লেখা আছে। কিন্তু ঈশান বাবু বিদ্যাবাগীশের অপর যে ১৬টি ব্যাখ্যান প্রকাশ করিয়াছেন তাহার কোনটির শিরোভাগে "ব্রাহ্মসমাজ" এই কথাটির উল্লেখ নাই। ব্যাখ্যানগুলি অনেকদিন পরে ক্রমে ক্রমে পুনর্মুদ্রিত হইবার সময় পরবর্ত্তী প্রকাশক দ্বারা "ব্রাহ্মসমাজ" নামটি সংযোজিত হইয়া থাকিবে। ঈশানবাবু ঐ পুনর্মুদ্রিত কপিতে "ব্রাহ্মসমাজ" নাম দেখিয়া থাকিবেন। যাঁহারা পুনর্মুদ্রণ সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করেন, তাঁহাদিগকে ঈশান বাবুর প্রকাশিত পুস্তকের ৯৪ ও ৯৫ পৃষ্ঠার ফুটনোট দেখিতে অনুরোধ করি। পঞ্চদশ ব্যাখ্যানের শেষ পৃষ্ঠার ফুটনোটে লেখা আছে, '১৭৭১ শকের মুদ্রিত পুস্তকের এই লিখন', এবং ষোড়শ ব্যাখ্যানের ফুটনোটে আছে, "১৭৬১ শকের এই ব্যাখ্যানটি "মৃজাপুরস্থ শ্রীব্রজমোহন চক্রবর্ত্তীর প্রজ্ঞাযন্ত্রে মুদ্রাঙ্কিত হইয়াছিল" অথচ ঐ ব্যাখ্যানটি প্রদত্ত হয় ১৭৫০ শকের ১লা মাঘ সোমবার। এখানে আর একটি কথা—কমলবসুর বাটীর সমাজে

প্রতি সপ্তাহে যে বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান দিতেন তাহা জোর করিয়া বলা যায় না। ১৭৫০ শকের ১লা মাঘ যে ব্যাখ্যান দেন তাহা "ষোড়শ ব্যাখ্যান"। ১৭৫০ শকের ৬ই ভাদ্র হইতে প্রতি সপ্তাহে বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান দিতে থাকিলে উহার সংখ্যা ১লা মাঘ পর্য্যন্ত ৫ মাসে ২০।২২টির অধিক হইয়া যায়। সকল ব্যাখ্যানে সন তারিখের উল্লেখ নাই। বিদ্যাবাগীশের ১ম ২য় ও ৩য় ব্যাখ্যানের দিন বুধবার; ৪র্থ, ৫ম, ৬ষ্ঠ, ৭ম, ৮ম, ১২শ ব্যাখ্যানের দিন শনিবার; ৯ম, ১০ম, ১১শ, ১৩শ, ১৪শ, ১৫শ ও ১৭শ ব্যাখ্যানের দিন লেখা নাই; ষোড়শ ব্যাখ্যানের তারিখ ১৭৫০ শক ১লা মাঘ সোমবার। বুধ, শনি, সোমবার এই বারবৈচিত্র্য দেখিলে মনে হয়, সবগুলি কমল বসুর বাটীর সমাজে পঠিত হয় নাই। উহার কোন কোনটি সাধারণের মধ্যে বিলি করিবার জন্য প্রকাশিত হইয়াছিল। মহর্ষি পঞ্চবিংশতি বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তে লিখিয়াছেন যে ব্যাখ্যানগুলি রাজা রামমোহনের রচিত, বিদ্যাবাগীশ পাঠ করিতেন এই মাত্র।

এখানে আরও একটি কথা—আত্মীয় সভায় বেদ-ব্যাখ্যা হইত না ইহার অর্থ অন্যরূপ। উপাসনার অগ্রে স্বস্তিবাচন স্বরূপে বেদ হইতে নেপথ্যে মন্ত্র উচ্চারিত হইত, তাহার অর্থ বুঝাইয়া দেওয়া হইত না এ কথা সত্য। বর্ত্তমান সময়েও উপনয়নে গায়ত্রী দীক্ষার কালে ব্রাহ্মণ ভিন্ন আর কাহাকেও তথায় যাইতে দেওয়া হয় না। মহর্ষির জীবদ্দশায়ও ১১ই মাঘের উৎসবে প্রাতে ঐরূপ একবার হইয়াছিল। কয়েকজন দ্রাবিড়ী পণ্ডিত বেদমন্ত্র, উপাসনার পূর্ব্বে উচ্চারণ করিয়া চলিয়া গেলেন। তাঁহারা উহার অর্থ ব্যাখ্যা করেন নাই আমি তথায় নিজে উপস্থিত ছিলাম।* আজ কালও হিন্দুর কোন কোন উৎসবে দ্রাবিড়ী পণ্ডিত বা বর্ত্তমান কলিকাতা বেদবিদ্যালয়ের ছাত্রগণকে আহ্বান করা হয়, তাঁহারা সর্ব্বাগ্রে মঙ্গলাচরণ স্বরূপ কয়েকটি বেদমন্ত্র সমকণ্ঠে উচ্চারণ করিয়া থাকেন তাহার অর্থ ব্যাখ্যা করেন না। তাহার পরে প্রকৃত কার্য্য আরম্ভ হয়। রাজার আত্মীয় সভাতে তাহাই হইত। বেদমন্ত্র উচ্চারণের পর উপনিষদ ব্যাখ্যা ও বেদান্তদর্শনের ব্যাখ্যা হইত। এখানে বুঝিতে হইবে বেদ ও উপনিষদ এক নহে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ১৭৩৯ শকের ৩রা জ্যৈষ্ঠ তারিখে জন্মগ্রহণ করেন; তাঁহার জন্মের ২ বৎসর পূর্ব্বে ১৭৩৭ শকে আত্মীয় সভার প্রথম প্রতিষ্ঠা। উহার দ্বিতীয় প্রতিষ্ঠা ১৭৪১ শকে। তৃতীয় প্রতিষ্ঠা আমাদের মনে হয় কমল বসুর বাটীতে ১৭৫১ শকে এবং আরও উদার ভাব ও উদার মত লইয়া সমৃদ্ধ আকারে উহার শেষ ও স্থায়ী প্রতিষ্ঠা ১৭৫১।১১ই মাঘ দিবসে। কমল বসুর বাটীতে যখন সভা আরম্ভ হয় তখন মহর্ষির বয়স ১০ বৎসর মাত্র। এবং ব্রাহ্মসমাজ গৃহের প্রতিষ্ঠার সময় মহর্ষির বয়স ১২ বৎসর মাত্র। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ২৫ বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্ত যাহা রচনা করেন তাহার তারিখ ১৭৮৬ শকের ২৭ বৈশাখ—উহা ১৭৮৭ শকের অগ্রহায়ণ মাসের পত্রিকায় বাহির হয়। তিনি ব্রাহ্মসমাজের ২৫ বৎসরের বিবরণ লিখিতে গিয়া তৎপূর্ব্ব সময়ের আত্মীয় সভার বিবরণ বিশেষভাবে আলোচনা মধ্যে আনয়ন করেন নাই বা ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব ইতিহাস সূক্ষ্মভাবে লিপিবদ্ধ করেন নাই। এই কারণে তাঁহার "বৃত্তান্তের" কোন কোন অংশে বিশেষভাবে জোর দেওয়া সঙ্গত নহে।

আর একটি কথা, ৬ই ভাদ্র উপলক্ষে কয়েকবার উৎসব হইয়াছিল। কিন্তু আমাদের মনে রাখিতে হইবে যে, সে সময়কার বাৎসরিক উৎসব ও আজকালকার উৎসব উভয়ের তুলনাই হইতে পারে না। পরে ব্রাহ্মসমাজের উৎসব ১১ই মাঘে দাঁড়ায়। এই যে ১১ই মাঘ তারিখে উৎসবনির্দ্ধারণ, তাহা নিতান্ত খামখেয়ালির উপরে হয় নাই। যাঁহারা ১১ই মাঘের উৎসবের প্রথম প্রবর্ত্তক তাঁহাদের মধ্যে যে চিন্তাশীলতার অভাব ছিল এরূপ মনে করিলে চলিবে না। বিশেষতঃ ১৭৫১।১১ই মাঘ হইতে মহর্ষি যে ব্রাহ্মসম্বৎ গণনা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন তাহাও তাঁহার মত স্থিরধী ও বিশেষ চিন্তাশীল লোকের আলোচনার ফল। তিনি ১৭৫০। ৬ই ভাদ্র হইতে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম গণনা আরম্ভ করিলেন না কেন, তাহাও আমাদের চিন্তা করিয়া দেখিতে হইবে। ১৭৫০। ৬ই ভাদ্র কমল বসুর বাটীতে যে সমাজ হয় তাহা মহর্ষি বিশেষরূপে জানিতেন; তাহা সত্ত্বেও মহর্ষি যে ভাবে গণনা আরম্ভ করেন তাহার প্রতি ব্রাহ্মসাধারণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে চাই। তাই আমরা সাহস করিয়া বলিতে চাই, ব্রাহ্মসমাজ বলিতে যাহা বুঝি, তাহার প্রতিষ্ঠার দিন ১৭৫১।১১ই মাঘ।

এই শতবার্ষিক উৎসব উপলক্ষে ঐতিহাসিকতার ভাবে ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি লইয়া আন্দোলন আরম্ভ হইয়াছে। পূর্ব্বে এভাবে চেষ্টা হয় নাই। যাহা কিছু চেষ্টা করিয়াছিলেন একমাত্র অক্লান্তকর্ম্মা আমাদের ঈশান চন্দ্র বসু। তাঁহার ঐতিহাসিকের দৃষ্টি ছিল ও প্রভূত গবেষণা ছিল। সতীশ বাবু Miss Collet ও খ্যাতনামা আরও কয়েক জনের দোহাই দিয়াছেন এবং শ্রদ্ধেয় গৌরগোবিন্দ রায় উপাধ্যায় মহাশয়ের "কেশব জীবনী"রও সাহায্য লইয়াছেন। গৌরগোবিন্দ বাবু রাজার তথ্য নির্ণয়ে বিশেষ মনোযোগী হইয়াছিলেন কি না জানি না। তবে মাণিকতলার নিকট কমল বসুর বাটীতে যে সমাজ

* কিন্তু এই বেদপাঠ নেপথ্যে না হইয়া সর্ব্বসমক্ষেই হইয়াছিল।

হইয়াছিল তাঁহার এই কথা সম্পূর্ণ ভ্রমাত্মক। কমল বসুর বাটী মাণিকতলায় ছিল না, উহা ছিল যোড়াসাঁকোতে, ইহা উল্লেখ করা বাহুল্য মাত্র। *

ব্রাহ্মসমাজের উৎপত্তি কাল নিরূপণের যে চেষ্টা চলিতেছে, প্রকৃত সিদ্ধান্তে যাহাতে আদিব্রাহ্মসমাজ, সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ ও ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ একমতে হইতে পারেন তাহার সাহায্যকল্পে আমরা যাহা জানি বা সন্ধান পাইয়াছি তাহা উপরে সন্নিবেশিত করিলাম। কোন পক্ষ অবলম্বন করা আমাদের অভিপ্রেত নহে। ব্যক্তিগত ভাবে আমি সমালোচনার বিষয়ীভূত হইতে চাহি না বা এই বৃদ্ধবয়সে আঘাত-বেগ সহ্য করিবার বা প্রতিঘাত দিবার আমার শক্তি বা ইচ্ছা নাই। আমি চাহি প্রকৃত সত্যের আবিষ্কার, কথাকাটাকাটি না করিয়া ধীরভাবে ও স্থিরভাবে সত্যের সন্ধান।

পরিশেষে আমার বক্তব্য শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার তাঁহার ভগ্নদেহে এই শতবার্ষিকী লইয়া যেরূপ পরিশ্রম করিতেছেন, তাহাতে তিনি ব্রাহ্মসাধারণের ধন্যবাদের পাত্র। তিনি ১৮৫০ শকের ভাদ্র হইতে আরম্ভ করিয়া ১৮৫১ মাঘোৎসব পর্য্যন্ত শতবার্ষিকীর অনুষ্ঠান চলাইবার ব্যবস্থা করিয়া সকল পক্ষকে সন্তুষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছেন। আমরা এইটুকু বলিতে চাই, শারদীয় উৎসবে যেমন একমাস পূর্ব্ব হইতে ধনীর গৃহে বোধন ও চণ্ডীপাঠ হইতে আরম্ভ হয় এবং মাঘোৎসব উপলক্ষে যেমন ১লা মাঘ হইতে ব্রাহ্মসমাজের বোধন বসে, সেইরূপ যাঁহারা ১৭৫১। ১১ই মাঘ ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠার দিন মনে করেন, তাঁহারা এই দেড়বৎসরব্যাপী উৎসবকে শতবার্ষিকী উৎসবের বোধন বলিয়া মনে করিলে কাহারও ক্ষোভের কারণ থাকিবে না। রামমোহনের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রচার যতই হয় ততই ভাল। শ্রীযুক্ত সতীশ বাবু, হেমচন্দ্র সরকার ও শ্রীযুক্ত প্রশান্তকুমার সেন প্রভৃতি যাঁহারা সুবিদ্বান ও উৎসাহী, তাঁহারা পরস্পর মিলিতভাবে ব্রাহ্মসমাজের জন্মতিথি আবিষ্কারে ব্রাহ্মসাধারণের কৃতজ্ঞতা অর্জ্জন করুন ইহাই আমার শেষ অনুরোধ ও প্রার্থনা। †

সংগ্রহ।

Future Life—I should be the very last man to dispense with faith in a future life. I have a firm conviction that the soul is an existence of an indestructible nature, whose working is from eternity to eternity, It is like the sun, which seems indeed to set, but really never set, shining on in unchangeable splendour." Goethe.

গৃহ-গৃহ্যসূত্রে—ঋষিগণের মতে খটখটে শুষ্ক এবং porous জমি গৃহনির্ম্মাণের উপযুক্ত নয়, ভিজা আটাল জমিই প্রশস্ত (আশ্বলায়ন ২।৮ দেখ)। যেখানে ঘর তুলিতে হইবে, সেই স্থান উত্তর-পশ্চিম হইতে দক্ষিণপূর্ব্ব দিকে ঢালু হওয়া দরকার। পারস্কর-মতে গৃহের জন্য নির্ব্বাচিত ভূমি এমন হওয়া দরকার যে, চারিদিক হইতে জল আসিয়া মধ্যদেশে জমিয়া বাহির হইয়া যায়; সেখানে ভাণ্ডার আর ভূমির মধ্যস্থলে বৈঠকখানা করা বিধি। ব্রাহ্মণের জন্য সাদা, ক্ষত্রিয়ের জন্য লাল এবং বৈশ্যের জন্য কাল মাটি প্রশস্ত। গোভিল ও খাদির গৃহ্যমতে ভূমি সমতল ও তৃণাবৃত হওয়া আবশ্যক। পারস্কর-মতে কুশ ও বিরণ তৃণ প্রশস্ত। গোভিল ও খাদির মতে দর্ভতৃণ থাকিলে ব্রহ্মবর্চ্চসা, বৃহত্তৃণে বল এবং মৃদুতৃণে পশবা অর্থাৎ পশুবাহুল্য হয়। উত্তরদ্বারী ঘর হইলে পুত্র ও পশু, পূর্ব্বদ্বারী হইলে ধন ও যশ এবং দক্ষিণদ্বারে সর্ব্বকামনাসিদ্ধি হয়। পশ্চাতের দ্বার বা অনুদ্বার, গেহদ্বার বা গৃহের সম্মুখদ্বারের সোজাসুজি হওয়া উচিত নয়। দ্বার এমন হওয়া উচিত নয় যে, বাহির হইতে ভিতরের সব দেখা যায়। প্রত্যেক খুঁটির গর্ত্তে ঘি ও অন্যান্য মন্ত্রপূত বস্তু ঢালিয়া তাহাতে শমী (?) কাষ্ঠ প্রতিষ্ঠিত করিতে হয়। পরে খুঁটিগুলির উপর বংশযোজনায় মন্ত্র উচ্চারণ করিতে হয়। পারস্কর-গৃহ্যে একটী স্বতন্ত্র সভাগৃহ ও ভাণ্ডারের উল্লেখ আছে। ইহা প্রায়ই দ্যূতক্রীড়ার জন্য ব্যবহৃত হইত। (অন্য) কোন স্থানে এই গৃহ স্থাপিত হইলে ইহাতে দ্যূতক্রীড়া হইবে না। ভাণ্ডারে ধনধান্য থাকিত। উলূখল মুষল ও গরুর ঘর স্বতন্ত্র হইত। বিবাহের পর গৃহস্থ স্বতন্ত্র গৃহ প্রতিষ্ঠা করিতেন, পিতা বা সহোদরের সহিত এক গৃহে থাকিতেন না। [খাদির গৃহ্য ৪।২।৬।১৪, ৪।২।৯-১১; গোভিল-গৃহ্য ৪।৭।৫-৭, ৯-১১, ১১-১৭; ১৪।৭।৩; আশ্বলায়ন ২।৮, ৬।৮; পারস্কর ২।৭।৭-১৩ দ্রষ্টব্য।

ডাঃ নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত—প্রতিভা, ফাল্গুন ১৩২৭।

জনসেবা—প্রাচীন ভারতে—ব্যাঙ্কক হইতে শ্যাম দেশের Red Cross Society একটা কাগজ বাহির করে। তাহাতে দেখা যায়—খৃষ্টীয় দ্বাদশ শতাব্দীতে শ্যামদেশে জয় বর্ম্মন নামে এক বৌদ্ধ রাজা ছিলেন। তিনি সাম্রাজ্যের সর্ব্বত্র আরোগ্যশালা স্থাপিত করাইয়াছিলেন। ১১৮৬ খৃষ্টাব্দের এক শিলালিপিতে

---

* The house now belongs to Huronath Mullick G. S. Leonard's Historry of the Brahmo Samaj p. 37, হরনাথ মল্লিকের বাটী আদিব্রাহ্মসমাজের ঠিক সম্মুখে ছিল—সম্প্রতি উহা এক মাড়োয়ারি ক্রয় করিয়াছেন বলিয়া শোনা যায়। তঃ সঃ

† এই সম্বন্ধে বর্ত্তমান সংখ্যায় প্রকাশিত শতবার্ষিকী সম্বন্ধে পত্রব্যবহার পাঠকবর্গকে পাঠ করিতে অনুরোধ করি। তঃ সঃ

আছে—১০২ আরোগ্যশালা ছিল। দরিদ্রদিগকে দিবার জন্য চাউল প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত ৮১৪৬০ লোক নিযুক্ত ছিল। প্রত্যেক আরোগ্যশালায় ৩২ জন কর্ম্মচারী, ৬৬ জন স্বেচ্ছাসেবক, ২ জন চিকিৎসক; প্রত্যেক চিকিৎসকের অধীনে ১ জন সেবক ও ২ জন সেবিকা; ২ জন ভাণ্ডারী, ২ জন পাচক, ২ জন বৃক্ষপূজক ও ১৪ জন শুশ্রূষাকারী থাকিত। ২ জন স্ত্রীলোক সর্ব্বদা জল গরম করিত, ঔষধ প্রস্তুত করিত; ২ জন স্ত্রীলোক ধান ভানিত।

বৃহন্নারদীয় পুরাণে—

যো রক্ষেৎ পৃথিবীপাল একং বা রোগিণং নরং।
তস্য বিষ্ণুঃ প্রসন্নাত্মা সর্ব্বান্ কামান্ প্রযচ্ছতি॥

নন্দিপুরাণে—

ধর্ম্মার্থকামমোক্ষাণাম্ আরোগ্যং সাধনং যতঃ।
অতস্ত্বারোগ্যদানেন নরো ভবতি সর্ব্বদঃ॥
আরোগ্যশালাং কুর্বীত মহৌষধিপরিচ্ছদাং।
বিদগ্ধবৈদ্যসংযুক্তাং ভৃত্যাবসথসংযুতাং॥
বৈদ্যস্তু শাস্ত্রবিৎ প্রাজ্ঞো দৃষ্টৌষধিপরম্পরঃ।
ঔষধিমূলপর্ণজ্ঞঃ সমুচ্চরণকালবিৎ॥
আরোগ্যশালামেবং তু কুর্য্যাৎ যো ধর্ম্মসংশ্রয়ঃ।
স পুমান্ ধার্ম্মিকো লোকে স কৃতার্থঃ স বুদ্ধিমান্॥
সম্যগারোগ্যশালায়ামৌষধৈঃ স্নেহপাচনৈঃ।
ব্যাধিতং নীরুজীকৃত্য অপ্যেকং করুণাবৃতঃ॥
প্রয়াতি ব্রহ্মসদনং কুলসপ্তকসংবৃতঃ॥ অপরার্ক

সম্বর্ত্তে—

ঔষধং পথ্যমাহারং রোগিণাং রোগশান্তয়ে।
যঃ প্রযচ্ছতি রোগিভ্যঃ স ভবেৎ ব্যাধিবর্জ্জিতঃ॥

কূর্ম্মপুরাণ ও সম্বর্ত্তে—

ঔষধং স্নেহমাহারং রোগিণাং রোগশান্তয়ে।
দদ্যাদ্ যো রোগরহিতঃ সুখী দীর্ঘায়ুরেব চ॥

পরাশরে—

রোগার্ত্তস্যৌষধং পথ্যং যো দদাতি নরস্য তু।
অন্যস্যাপি চ কস্যাপি প্রাণদঃ স তু মানবঃ॥
স যাতি পরমং স্থানং যত্র দেবো চতুর্ভুজঃ।
যো দদ্যান্মধুরং বাচং আশ্বাসনকরীমৃতাং।
রোগক্ষুধাদিনার্ত্তস্য স গোমেধ-ফলং লভেৎ॥ অর্চ্চনা, বৈশাখ, ১৩২১

রাজা ও রাজর্ষি

(শ্রীনলিনীনাথ দাশ-গুপ্ত এম-এ)

পরিচ্ছন্ন রাজপথ; অদূরে তাহার
বিরাজে সুরম্য হর্ম্ম্য, তোরণ দুয়ার
দাঁড়ায়ে সম্মুখে শোভে বিচিত্র সজ্জায়,
চিত্রিত বিবিধ চিত্র প্রাচীরের গায়।
পার্শ্বে হাসে শত পুষ্পে উদ্যান সুন্দর,
কেন্দ্র স্থলে উৎস তার অতি মনোহর
স্বচ্ছ সলিলের কণা করিছে সিঞ্চন
চারিদিকে মুকুতার মালার মতন।
রবির কিরণ যবে পড়ে তার গায়
ইন্দ্রধনু শোভে সপ্তবর্ণ মেখলায়।
উড়ন্ত পরীর মূর্ত্তি প্রস্তরে নির্ম্মিত
ফুৎকারিয়া বারিরাশি করে উদ্গীরিত
সতত, কৌমুদী স্নাত পূর্ণিমা নিশায়
স্বপ্নরাজ্য যেন এক খেলা খেলে যায়।
দ্বারে দ্বারবান, রাজপথে দাঁড়াইয়া
রাজা দীন ভদ্রবেশে। সেথায় আসিয়া
বিদেশের রাজা এক জিজ্ঞাসিল তাঁয়
"এ প্রাসাদ কার পার বলিতে আমায়?"
"আমার প্রভুর"; "এই উদ্যান কাহার"?
আগন্তুক রাজা প্রশ্ন করিল আবার।
"এও সে প্রভুর মোর"। "ওই যে প্রাচীর,
অভ্রভেদী চূড়ে শোভে বিশাল মন্দির
তার মাঝে, এও কি সে প্রভুর তোমার?"
"এও তাঁর"; "তিনি রাজা কিম্বা জমিদার?"
"অনন্ত বিস্তৃত রাজ্য প্রভুর আমার"
বিনয়বচনে রাজা করি' নমস্কার
উত্তরিল; আগন্তুক বিদ্রূপের স্বরে
জিজ্ঞাসিল পুনঃ "সেই সম্রাট-শেখরে
দেখাতে পার কি মোরে?" "হেন অধিকার
নাহি মোর, আমি হীন ক্ষুদ্র দাস তাঁর।"
"কোন্ গৃহে বাস তিনি করেন এখন?"
তখন দেখা'য়ে রাজা হৃদয় আপন
উত্তর করিল, "এই গৃহে বাস তাঁর
দিবানিশি, অন্তর্যামী প্রভুর আমার;
আমি শ্রেষ্ঠ কর্ম্মচারী তাঁহার কৃপায়,
এ রাজ্য পালন করি তাঁহারি ইচ্ছায়;
সাধ্যমত করি আমি কর্ত্তব্য সাধন
তাঁহার আশীষ শিরে করিয়া ধারণ।"
শুনি আগন্তুক রহি স্তব্ধ কতক্ষণ
লজ্জাভরে নতশিরে কহিল তখন
"রাজর্ষি! উত্তম শিক্ষা লভিনু জীবনে,
লহ মোরে শিষ্য করি তোমায় চরণে।"
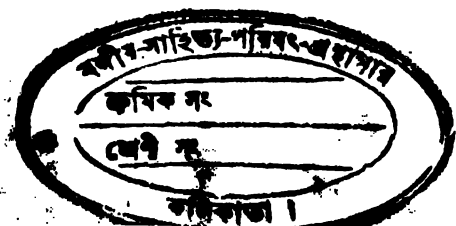
ঈশ্বরপ্রীতি *

ঈশ্বরের শক্তি মানবহৃদয়ে কার্য্য করে, ইহা সাধুগণ অতি প্রাচীন কাল হইতে লক্ষ্য করিয়াছেন। মানুষ তাঁর প্রেরণায় চলে, কাজ করে।

মানুষ যত কাজ করে, তাহার কতটা ঈশ্বরপ্রেরণায় করে, আর কতটা তার নিজের বাসনার প্রেরণায় করে—ইহাও তাঁহারা লক্ষ্য করিয়াছেন।

ঈশ্বরপ্রীতি মানব-হৃদয়কে পরিবর্ত্তিত করিয়া তাহাতে নূতন শক্তি আনয়ন করে; চোখে নূতন আলোক প্রদান করে, হাতে নূতন বল বিধান করে, হৃদয়ে নূতন ভাব সঞ্চারিত করে। সাধুগণ ইহা লক্ষ্য করিয়াছেন।

এই জন্য "নব জীবন" বা "দ্বিজত্ব" শব্দ ধর্ম্মসমাজে উৎপন্ন হইয়াছে।

কেমন করিয়া ঈশ্বরের শক্তি মানবহৃদয়ে কাজ করে, ইহা এক কঠিন প্রশ্ন। ঈশ্বরের শক্তি মানবহৃদয়ে কাজ করে মেনে নিলেও, কি প্রকারে কাজ করে তাহা বর্ণনা করা কাহারও সাধ্যায়ত্ত নয়। ইহাও সাধুগণ অনুভব করিয়াছেন। চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু পারেন নাই।

দুইটি উপমা দ্বারা ইহা বুঝাইতে চেষ্টা করিয়াছেন:—কখনও ( ) বায়ুর সঙ্গে, কখনও (২) অগ্নির সঙ্গে তাঁহার প্রেরণার তুলনা করিয়াছেন।

(১) ঈশ্বরের প্রেরণা বায়ুর ন্যায়। বায়ু সর্ব্বদা চলে, কোথা হইতে আসে, কেন আসে, আপনি স্বাধীন ভাবে আসে, স্বাধীন ভাবে কোনও বাধাবিঘ্ন না মানিয়া বহিয়া যায়; সময়ে সময়ে অত্যন্ত দুর্জ্জয় হইয়া সকলকে অস্থির করিয়া তোলে। তাঁহার প্রেরণাও ঠিক তদ্রূপ।

(২) ঈশ্বরের প্রেরণা আগুনের মত মানুষকে ধরে।

ঈশ্বরের প্রেরণাকে বায়ু এবং আগুনের সহিত তুলনা করার কারণ এই যে—ভৌতিক জগতে বায়ু এবং তাপ গতি উৎপন্ন করে। বায়ু বহিলে সমস্ত জিনিষ, বৃক্ষ লতা পাতা ঘর বাড়ী কাঁপে, নড়ে। তাপ ও গতিকে উৎপন্ন করে,—প্রমাণ, আগ্নেয়গিরির অগ্ন্যুৎপত্তি।

ঈশ্বরের প্রেরণা মানবহৃদয়ে অবতীর্ণ হইয়া গতিকে উৎপন্ন করে, ইহার অর্থ এই যে, মানুষ যেমন ছিল তেমন আর থাকিতে পারে না।

খাঁটি ঈশ্বরপ্রীতি, যে-প্রেমে হৃদয়ে আগুন জ্বলে—"A soul aflame with love of God."—তাহা বড় সাধারণ ব্যাপার নয়।

গড়ের উপর, মুখে আমাদের খুব ঈশ্বরপ্রীতি আছে—আড়ন পাড়ন দিন রাত্রি শুনিতেছি; বিশেষতঃ প্রচারকদের প্রচারগ্রন্থ রত্নবয়নের 'টানা' ও 'পাড়েন'এ খুব ঈশ্বরপ্রীতির কথা আছে—বড় বড় শব্দ আছে; আমাদের গানে আমরা খুব ঈশ্বরপ্রীতি মানি, বলি 'তুমি আমার সব, সব তোমাকে দিতে পারি'; প্রার্থনায় যত কথা বলি, তাহার পাঁচ ভাগের এক ভাগ থাকিলে রক্ষা থাকিত না।

এই ঈশ্বরপ্রীতি পাওয়া বড় সহজ নয়, কিন্তু যদি উহা হৃদয়ে আগুন জ্বালে, তবে সত্য সত্যই ব্রহ্ম হৃদয়ে আসিয়া মানুষকে প্রেরণা দিয়া লইয়া যায়।

এইটি আগে, এই ঈশ্বরপ্রীতি সর্ব্বাগ্রে চাই। যেমন কেও যদি কারবার করিতে চায়, তবে, সে কিসের দোকান করবে, কি ভাবে করবে, এ সমস্তই নির্ভর করে তাহার মূলধনের উপর। ঈশ্বরপ্রীতি সেই মূলধন।

* ১৭ই অক্টোবর, ১৯০৩, বৃহস্পতিবার, সাধনাশ্রমে পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক বিবৃত।

ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক
সম্বন্ধে পত্রব্যবহার।

গত ৪ঠা জুন তারিখের "ইংলিশম্যানে" 'Brahmo Samaj Centenary celebrations in Calcutta' হেডিংএ যে প্রস্তাবটী প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহার প্রথম প্যারাটী উদ্ধৃত হইল।

"Of the three branches of the Brahmo Samaj, two, the Adi and the Sadharan, will celebrate the centenary of the Samaj in Calcutta on August 18 next. The third branch, the Navabidhan, will do so in January, 1930. * * *"

ইহার প্রতিবাদে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের যে চিঠি সংবাদপত্রসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল, নিম্নে তাহা উদ্ধৃত হইল।

"Sir,—I am surprised to read the article "Brahmo Somaj Centenary" in the Englishman of the 4th instant, which seems to have been written on wrong information. I have been neither personally nor in my capacity as the Secretary of the Adi Brahmo Somaj, consulted in the matter of celebrating the Centenary on the 18th August next. If I however remember aright, it was definitely settled by the Centenary Committee that preparatory steps should be taken in

* তত্ত্বকৌমুদী—১লা আষাঢ়, ১৮৫০ শক।

hand in 1928 and the real centenary should be celebrated in January 1930 jointly by all the sections of the Brahmo Samaj. The centenary will perhaps be a misnomer if it is not celebrated with the whole-hearted co-operation of all the sections of the Brahmo Samaj.

Yours etc.
Kshitindra Nath Tagore.
Secretary,
Adi Brahmo Somaj"

গত ৯ই জুলাই সাধারণ ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিক উৎসবকমিটীর সম্পাদক শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয় লিখিয়াছেন :—

"শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত আদিব্রাহ্মসমাজের
সম্পাদক মহাশয় সমীপেষু—

সবিনয় নিবেদন,

আগামী ৬ই ভাদ্র রাজা রামমোহন রায় কর্ত্তৃক সামাজিক ব্রহ্মোপাসনা প্রবর্ত্তনের শততম সাংবৎসরিক। এই উপলক্ষে ব্রাহ্মসমাজের সকল শাখা একত্র হইয়া ঈশ্বরের চরণে কৃতজ্ঞতা অর্পণ করেন ইহা একান্ত বাঞ্ছনীয়। এই জন্য আপনাকে অনুরোধ করি যে এইরূপ একটী মিলিত উৎসব সম্পন্ন করিবার বিষয়ে একত্র পরামর্শ করিবার আয়োজন করুন। সময়ের অভাব বশতঃ যথাসত্বর ইহার ব্যবস্থা করিলে বাধিত হইব। নিবেদন ইতি।

শ্রীহেমচন্দ্র সরকার।
সম্পাদক, শতবার্ষিক উৎসব কমিটি।
(সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ)"

এতদুত্তরে আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর লিখিতেছেন :—

"Adi Brahmo Somaj
55 Upper Chitpur Road
Calcutta 28.7.28.

শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার
সম্পাদক, শতবার্ষিক উৎসব কমিটি
সাধারণ-ব্রাহ্মসমাজ।

সবিনয় নিবেদন,

আপনার ৯ই জুলাইয়ের পত্র আমার হস্তগত হইয়াছে, কিন্তু আমি ইনফ্লুয়েঞ্জা জ্বরে শয্যাগত থাকায় ইতিপূর্ব্বে আপনার পত্রের উত্তর দিতে পারি নাই। আপনার পত্র [illegible] ব্রাহ্মসমাজের তিন শাখার [illegible] [illegible] আলোচনা [illegible] তাঁহাদের সকলেরই [illegible]তে ১৯৩০ খৃষ্টাব্দের ১১ই মাঘের সমসময়ে প্রকৃত শতবার্ষিক উৎসব করা উচিত। তাহার পূর্ব্বে যাহা কিছু হইবে, তাহা উৎসবের আরম্ভরূপে গৃহীত না হইয়া প্রস্তুতিস্বরূপে গ্রহণ করা উচিত। এই ভাবে অগ্রসর হইলে তিন সমাজই বোধ হয় মিলিতভাবে শতবার্ষিক উৎসব সম্পন্ন করিতে অগ্রসর হইতে পারেন এবং বিরোধেরও নিরাকরণ হইতে পারে। এ বিষয়ে আপনাদের মতামত জানাইলে সুখী হইব। ইতি—

বিনীত
শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর
সম্পাদক।"

সংবাদ।

উপাধিলাভ।—গত ২০শে শ্রাবণ রবিবার হাইকোর্টের সুপ্রসিদ্ধ বিচারপতি স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয় নবদ্বীপে তত্রত্য পণ্ডিতমণ্ডলী কর্ত্তৃক সম্বর্দ্ধিত ও অভিনন্দিত হইয়া 'ন্যায়রঞ্জন' উপাধিতে ভূষিত হইয়াছেন। আমরা তাঁহার এই যোগ্য সম্মানপ্রাপ্তিতে আমাদের আন্তরিক আনন্দ জ্ঞাপন করিতেছি।

আর্ট স্কুলের অধ্যক্ষতাপদ লাভ।—শান্তিনিকেতনের ভূতপূর্ব্ব ছাত্র কৃতবিদ্য শ্রীমান্ মুকুলচন্দ্র দে শ্রীযুত পার্সি ব্রাউনের কার্য্যকাল অবসানে সরকারী কলা-বিদ্যালয়ের অধ্যক্ষের পদ লাভ করিয়াছেন। অদ্যাবধি কোন ভারতবাসীর ভাগ্যে উক্ত পদপ্রাপ্তির সম্মানলাভ ঘটে নাই। আমরা মুকুলচন্দ্রের এই যোগ্য সম্মানলাভে আমাদের আন্তরিক শুভাকাঙ্ক্ষা জানাইতেছি।

আমরা অনুরুদ্ধ হইয়া নিম্নলিখিত আবেদন প্রকাশ করিতেছি। তঃ সঃ

বালুরঘাট দুর্ভিক্ষ সাহায্য।

হিন্দু-মিশন।

আবেদন—বালুরঘাট অঞ্চলে ভীষণ দুর্ভিক্ষের তাড়নায় কেহ অনশনে প্রাণত্যাগ করিতেছে—কেহ প্রাণাপেক্ষা প্রিয় সন্তান বিক্রয় করিতেছে—কেহ সন্তানসন্ততিদিগকে ফেলিয়া চলিয়া গিয়াছে—কেহ বা স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়াও ক্ষুন্নিবৃত্তির চেষ্টা করিতেছে—এ সকল কথা আপনি সংবাদপত্র-পাঠে বিশেষরূপে জ্ঞাত আছেন। এই সহস্র সহস্র ক্ষুধার্ত্ত নরনারী ও বালকবালিকার মুখে এক মুঠা অন্ন দিবার আংশিক ভার আপনাকে আজ লইতে হইবে। হিন্দুমিশন সেই উদ্দেশ্যে ভিক্ষাপাত্র লইয়া দুয়ারে উপস্থিত। অন্ন, বস্ত্র, অর্থ—যাহা কিছু সম্ভব দান করিয়া ঐ মরণোন্মুখ হতভাগ্যদিগকে রক্ষা করুন। ইতি—

হিন্দু মিশন। ৭নং বেচুচাটার্জ্জির ষ্ট্রীট। কলিকাতা। Phone—B.B. 2383.	স্বামী সত্যানন্দ। সভাপতি, হিন্দুমিশন।

Tattwabodhini Patrika

Reg. No. C 432

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত
দ্বাবিংশ কল্প—দ্বিতীয় ভাগ
ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

সংখ্যা ১০২১ | ভাদ্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী[illegible]নাথ চট্টোপাধ্যায় [illegible]

সাল ১৩৩৫। শক ১৮৫০। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯। [illegible]

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫।

অঞ্জলি।

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

১০২। অঞ্জলি—পরমাত্মা দেবতা।

১। তুমি প্রজ্ঞানঘন। তুমি সর্ব্বজ্ঞ ও সর্ব্বদর্শী। তুমি আমাদের প্রত্যেক চিন্তা, আমরা যত না জানি, তাহা অপেক্ষাও অধিক জানিতেছ। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ শাণ্ডিল্য ঋষি তোমাকে আত্মার আত্মা বলিয়া প্রকাশ করিয়াছিলেন। আমরাও তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমাদের আত্মাতে তোমাকে আত্মার আত্মা পরমাত্মারূপেই উপলব্ধি করিতে চহিতেছি।

২। আমাদের মনস্বী পূর্ব্বপুরুষগণ দেশের মঙ্গলের জন্য তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনের উদ্দেশ্যেই প্রচুর ধন আহরণের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। আমরা তাঁহারই পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া তোমার প্রিয়কার্য্য ভাবিয়াই দেশের দুঃখ ও দারিদ্র্য দুর করিবার জন্য প্রচুর ধনপ্রাপ্তির নিমিত্ত প্রাণপণ পরিশ্রম করিতেছি এবং তোমার নিকটে বরাভয় প্রার্থনা করিতেছি।

৩। আমাদের পূর্ব্বপুরুষ ঋষিমুনিগণ ঘোষণা করিয়াছেন যে, তোমাকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং তোমার প্রিয়কার্য্য সাধনই তোমার উপাসনা; এবং একমাত্র তোমার উপাসনা দ্বারাই আমাদের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। আমরা যেন সেই মন্ত্র বলের সহিত হৃদয়ে ধারণ করি। আশর্ব্বাদ কর, আমাদের সন্তানগণ বংশপরম্পরায় যেন কদাপি তোমার উপাসনা করিতে বিরত না হই।

৪। তুমি আমাদের একমাত্র নেতা। তুমি আমাদের শত্রুগণকে পরাজয় প্রদান কর। আমাদের মঙ্গলের পথ হইতে সকল বিঘ্নবিপত্তি অপসারিত কর। তারস্বরে তোমার জয়গান করিবার অধিকার ও অবসর আমাদিগকে প্রদান কর।

৫। আমাদের জনক জননীগণ তাঁহাদের পিতৃপুরুষদের আদেশ পালনে সর্ব্বদাই উদ্‌ভ্রান্ত থাকিতেন। তাঁহারা সন্তানগণের রোগমুক্তি ও সর্ব্বাঙ্গীন মঙ্গল সাধনের উদ্দেশ্যে আত্মবলিদানে কুণ্ঠিত হইতেন না। আমাদের জনকজননী তাঁহাদের সমস্ত স্বার্থত্যাগ করিয়া সন্তানগণকে লালনপালন করিয়াছিলেন এবং দেহে মনে ও আত্মাতে দ্রঢিষ্ঠ ও বলিষ্ঠ করিবার উপযুক্ত শিক্ষা প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের তেজ ও বীর্য্য এবং তাঁহাদের নিঃস্বার্থ প্রেম ও ত্যাগের ভাব আমাদের সন্তানগণের হৃদয়ে বংশানুক্রমে সঞ্চারিত রাখ। আমাদের বংশে

তোমার নাম যেন চিরকাল ধ্বনিত হইতে থাকে। তোমার মধুর নামে আমাদের গৃহ যেন চিরকাল মধুময় হয়। আমাদের পরিবার যেন তোমার জ্ঞানে, ধর্ম্মে ও কর্ম্মে চিরকাল উজ্জ্বল থাকে।

১০৩। অগ্নদি—সহস্রাক্ষ দেবতা।

১। হে বিদ্যুৎপুরুষ। তোমার তীব্রগতি তেজের দ্বারা আমাদের অন্তরের মেঘসকল অপসারিত কর এবং আমাদের মস্তকের উপরে শীঘ্র তোমার করুণাধারা বর্ষণ কর। আমাদের জীবনের আরম্ভে তোমার কত যে করুণা লাভ করিয়াছি, তাহার ইয়ত্তা নাই; কিন্তু আমাদিগকে তুমি তাহা জানিতেই দাও নাই। আমরা যে সময় অসহায় ছিলাম, তুমি তোমার কৃপাবারি আমাদের উপর বর্ষণ করিয়াই চলিয়াছিলে।

২। দুঃখদারিদ্র্য, জ্বালাযন্ত্রণা ও পাপতাপের মেঘসকল ঘোর কৃষ্ণবর্ণ আকার ধারণ করিয়া যখন আমাদের জীবনকে অন্ধকারে নিমগ্ন করিতে চায়, তখন তোমার মঙ্গলকিরণ কোথা হইতে নামিয়া আসিয়া সমস্ত অন্ধকারকে বায়ুতাড়িত মেঘের ন্যায় ছিন্নভিন্ন করিয়া দেয়। যখন তোমার মঙ্গলকিরণ মেঘসকলকে বিদূরিত করিতে উদ্যত হয়, তখন তাহারা নিজ গর্জ্জনে আমাদিগকে কম্পিত করিয়া তোলে; কিন্তু তাহারা তোমার মঙ্গল বিধানে কিছুমাত্র ব্যাঘাত আনয়ন করিতে পারে না।

৩। তোমারই কৃপাবৃষ্টি দ্বারা আমাদের পাপতাপ ধৌত হইয়া যায় এবং আমাদের আত্মা পরিপুষ্ট হয়। অনাবৃষ্টির ফলে যখন দিকসকল দগ্ধ হইতে থাকে, তখন তুমিই মেঘ প্রস্তুত করিয়া জলধারা বর্ষণের জন্য মরুৎগণকে আদেশ প্রদান কর। তখন ওষধিসকল প্রচুর শস্য প্রসব করিয়া আমাদের রক্ষাসাধন করে। জ্ঞানের অভাবে যখন আমাদের অন্তর অন্ধকারে পূর্ণ হইয়া যায়, তখন তুমিই জ্ঞানকণা অন্তরে প্রেরণ করিয়া সমস্ত অন্ধকার বিখণ্ডিত করিয়া দাও। আমাদের আত্মা যখন তোমাকে পাইবার পিপাসায় ব্যাকুল হইয়া উঠে, তখন তুমি স্বয়ং আমাদের নিকট প্রকাশিত হও এবং শান্তিবারি প্রদান করিয়া আমাদের সকল অভাবের অবসান কর।

৪। আমাদের যাহা কিছু বল, তুমিই সেই সমস্ত বলের একমাত্র আকর। আমাদের যাহা কিছু ধনৈশ্বর্য্য, তুমিই সেই সমস্ত ধনৈশ্বর্য্যের একমাত্র প্রভু। আমরা তোমারই সন্তান ও সেবক। তুমি আমাদের সকল অবস্থাই জানিতেছ। আমাদের দুঃখদারিদ্র্য বিদূরিত করিয়া তুমি আমাদিগকে প্রভূত ধনৈশ্বর্য্য ও অন্নবস্ত্রের অধিকারী কর।

৫। তুমি দীপ্যমান পরমেশ্বর। তুমিই বাষ্পরাশির ভিতর হইতে তোমার "স্বাভাবিকী জ্ঞানবলক্রিয়া" দ্বারা আশ্চর্য্যরূপে এই শোভনসুন্দর শস্যশ্যামল বসুন্ধরাকে বাহির করিয়া জীবজন্তুর কি সুন্দর আবাসভূমি করিয়া দিয়াছ। তুমি আমাদের পিতা। পিতার ন্যায় আমাদিগকে জ্ঞানশিক্ষা দাও। তোমাকে ছাড়িয়া অপর কোন্ দেবতার নামে আমাদের বন্দনাগীত রচনা করিব? হে সর্ব্বতোমুখ পরমেশ্বর! তুমি আমাদিগকে শত্রুগণের শত্রুতার হস্ত হইতে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা কর এবং আমাদের গৃহ ধনধান্যে পূর্ণ কর। আমাদের হৃদয় অক্ষয় আনন্দে ভরিয়া উঠুক।

৬। তুমি আমাদিগকে জ্ঞানে কর্ম্মে ও ধর্ম্মে উজ্জ্বল করিয়া তোল। আমাদের জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তেই তুমি তোমার অটুট বর্ম্মে আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখ। হে রুদ্র! তোমার রুদ্রমূর্ত্তি আমাদের শত্রুগণের নিকট প্রকাশ কর। তোমার রৌদ্র তেজে তাহাদের শত্রুতা বিদগ্ধ হোক।

৭। আমাদের সকল যজ্ঞে, সকল অনুষ্ঠানে তোমারই আসন সর্ব্বাগ্রে স্থাপিত হয়। আমরা সর্ব্বাগ্রে তোমারই চরণ বন্দনা করিয়া সকল কর্ম্মে প্রবৃত্ত হই। তুমিই আমাদিগকে শক্তি দাও, যাহাতে তোমার নামে আমাদের অন্তর হইতে শত শত গান উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে। তুমি রক্ষকদিগেরও রক্ষক। আমরা নিতান্ত অসহায়। তুমিই একমাত্র আমাদের সহায় ও রক্ষক। তুমি আমাদিগকে সকল বিপদ আপদ ও দুঃখ দৈন্য হইতে রক্ষা কর।

৮। হে দেবদেব! তোমাকে ছাড়িয়া আমরা অপর কাহারও দ্বারে ভিক্ষা প্রার্থনা করিতে দাঁড়াইব না। তোমারই চরণে আমাদের এই প্রার্থনা

জানাইতেছি, তুমি আমাদের দৈন্য দারিদ্র্য দূর করিয়া দাও। সংসারে প্রতি পদক্ষেপে আমাদিগকে যে সংগ্রাম করিতে হইতেছে, সেই সংগ্রামে বিজয় লাভের উপযুক্ত প্রচুর ধন ও ঐশ্বর্য্য, দেহে প্রচুর বল, মনে প্রচুর জ্ঞান এবং আত্মাতে প্রভূত স্বাধীনতা ও শক্তি প্রেরণ কর। আমরা তোমাকে ভজনা করি, আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৯। তুমি আমাদের অন্তরে বিজ্ঞান ও প্রজ্ঞান প্রদান কর, যাহাতে আমরা আমাদের জীবন সুন্দররূপে পরিচালিত করিতে পারি। তুমিই একমাত্র সমস্ত সুখ ও কল্যাণের আকর। তুমি আমাদিগকে সুখ ও কল্যাণ প্রেরণ কর। তুমিই আমাদিগকে প্রচুর ধন প্রদান কর, যাহাতে আমরা পুষ্টিকর আহারাদির সাহায্যে দীর্ঘায়ু লাভ করিয়া তোমার পূজার্চ্চনা করিয়া জীবনকে ধন্য করিতে পারি।

১০। হে মন! ঈশ্বর বরাভয় দিলেও তাহা তোমার কল্যাণের কারণ বলিয়াই আনন্দিতচিত্তে গ্রহণ করিবে। তিনি দুঃখজ্বালা দিলেও তাহা তোমার কল্যাণেরই কারণ বলিয়া অবনতমস্তকে শিরোধার্য্য করিয়া লইবে।

১১। হে শত্রুবিনাশন! তুমি প্রত্যক্ষ দেখিতেছ, শত্রুগণ দূরে ও নিকটে এবং সকল সময়ে আমাদের হানি করিবার চেষ্টা করিতেছে এবং নিত্যই আমাদের বিনাশ কামনা করিতেছে। তুমি তাহাদের সেই সকল চেষ্টা ব্যর্থ করিয়া দাও এবং তাহাদের সেই বিনাশকামনাসকল পরাহত কর।

১২। তুমি সহস্রাক্ষ ও সর্ব্বদর্শী। আমরা যাহা দেখি, তাহা তুমি দেখ; আমরা যাহা না দেখি তাহাও তুমি দেখ। আমরা যাহা জানি, তাহা তুমি জান; আমরা যাহা না জানি, তাহাও তুমি জান। বিপদ আপদ যে কোন্ দিক হইতে উঁকি ঝুঁকি মারে, আমরা তাহা জানিতে পারি না, কিন্তু তুমি তাহা জান এবং তাহা হইতে আমাদিগকে দূরে রক্ষা কর। আমরা যেন নিত্য তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান থাকি এবং নিত্য তোমার পূজা করিয়া আমাদের কল্যাণসাধন করি।

নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ।

(শ্রীপঞ্চানন রায়)

দুর্ব্বল যে মানব, অন্ধকার তাহার চিরসাথী; বন্ধুবান্ধবে পরিবৃত হইলেও সে আপনাকে একাকী, নিতান্ত অসহায় বলিয়া মনে করে। প্রতিপদেই সে শতবিধ বিভীষিকায় ভীত হইয়া উঠে। সে দুর্ব্বল বলিয়াই প্রতিপদে তাহার পদস্খলন হয়, বাধার পর বাধা আসিয়া তাহাকে বিপর্য্যস্ত করিয়া তোলে। তাহার দুর্ব্বলতার কারণেই সে আনন্দময় ভগবানের রাজ্য এই বিশ্বজগতকে এক নিরানন্দের, দুঃখশোকেরই রাজ্য বলিয়া কল্পনা করে। তাহার অন্ধদৃষ্টিই তাহাকে এই বিশ্বজগতের প্রাণের অক্ষয় উৎস পরম পুরুষের মঙ্গলভাবে সন্দিহান করিয়া তোলে। এই প্রকারে সে ধ্বংসের অভিমুখেই ক্রমশ অগ্রসর হইতে থাকে।

কিন্তু বিশ্বের সুসম্বদ্ধ কার্য্যকারণশৃঙ্খলার ভিতর দিয়া যিনি স্বতই স্বপ্রকাশ, তাঁহার অস্তিত্বে সন্দেহ পোষণ করিবার কি কোন অবসর থাকিতে পারে? যিনি জগতের প্রাণের অফুরন্ত উৎস; যাঁহার প্রাণশক্তির কণামাত্র লাভ করিয়া চন্দ্রসূর্য্য গ্রহনক্ষত্রসকল জগতের অন্ধকার দূর করিতেছে, এবং প্রাণীগণের প্রাণ ধারণের উপায় বিধান করিতেছে; যাঁহার আনন্দের কণামাত্র পাখীর মধুর কূজনে, নদীর সুললিত কলতানে এবং ভক্তদিগের মর্ম্মস্পর্শী ভক্তিসঙ্গীতে মুখরিত হইয়া উঠিতেছে, তিনি তো প্রতি মুহূর্ত্তে, প্রতি নিশ্বাসে নিজের স্বপ্রকাশ মূর্ত্তিতে আমাদের প্রত্যেকের অন্তরে দেখা দিতেছেন। তাঁহার অস্তিত্বে আমরা কি মুহূর্ত্তের জন্যও সন্দেহ করিতে পারি? প্রত্যুত আমাদের সন্দেহ হয় যে, জগতে এমন কোন দুর্ভাগ্য মানব কোন কালে জন্মগ্রহণ করিয়াছে কি না, যাহার অন্তরে সকলের অন্তরাত্মা পরমাত্মা অন্তত বারেকের জন্যও দেখা দেন নাই। নদীর প্রবাহ দেখিলেই যেমন জানা যায় যে তাহার পশ্চাতে এমন এক জলভাণ্ডার আছে, যাহা প্রতিনিয়তই তাহার প্রবাহকে বাঁচাইয়া রাখিতেছে, সেইরূপ এই বিরাট বিশাল প্রকৃতিতে শতবিধ শক্তির খেলা, এই প্রাণীরাজ্যে প্রাণের শতবিধ অপূর্ব্ব লীলা, এবং এই কোটী কোটী নরনারীর আত্মাতে জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির আশ্চর্য্য সংমিশ্রণ ও শক্তিমত্তা দেখিলেই উপলব্ধি করা যায় যে, এই প্রকৃতির পশ্চাতে, এই প্রাণরাজ্যের পশ্চাতে, এই নরনারীর আত্মার পশ্চাতে এবং সকলের আশ্রয়রূপে অনন্তজ্ঞান, অনন্তপ্রেম ও অনন্তশক্তি ভগবান দাঁড়াইয়া আছেন। সেই সকলের আশ্রয় বিশ্বপতি ভগবানকে পরম মাতা ও পরম পিতা বলিয়া

উপলব্ধি কর। তোমাদের সর্ব্ববিধ দুর্ব্বলতা বিদূরিত হউক। তোমাদের সর্ব্ববিধ ভয়ভাবনা, সর্ব্বপ্রকার বিভীষিকা অন্তর্হিত হউক। ভগবান যখন আমাদের আশ্রয়, তখন জগতে দুর্ব্বলতার স্থান নাই। তাঁহার জ্যোতিতে হৃদয়কে পূর্ণ কর, তাঁহার মঙ্গলভাবে হৃদয়ের অন্ধকার চূর্ণবিচূর্ণ কর। তিনিই দুর্ব্বলের বল, তিনিই অসহায়ের সহায়। তাঁহার শরণাপন্ন হইয়া আপনাকে সবল কর; সেই অমৃত পুরুষের মুক্ত ভাণ্ডার হইতে অমৃত গ্রহণ করিয়া আপনাকে অমরত্বে অভিষিক্ত কর।

ভগবানের আশ্রয়ে আপনাকে সবল করিয়া তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত প্রীতি কর এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য-সাধনে আপনাকে বিজয়ী কর। আমাদের মঙ্গলসাধনের জন্য তিনি যে সত্যধর্ম্মকে জগৎসংসারে প্রেরণ করিয়াছেন, প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে যাহা খোদিত করিয়া দিয়াছেন, মৃত্যুকেও বরণ করিয়া তাহা ধরিয়া থাক—মৃত্যুর পরিবর্ত্তে জীবন লাভ করিবে। এই মহাসত্য গ্রহণ কর—পদে পদে আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া নিজের উপর ভগবানের অভিশাপ আনয়ন করিও না। সকল বলের অনন্ত অক্ষয় উৎস ভগবানের রাজ্যে, মনে হয়, দুর্ব্বলতার স্থান নাই। ঋষিরা ঠিকই বলিয়াছেন—বলহীন ব্যক্তি ভগবানকে লাভ করিতে পারে না। সন্তান যেমন পিতামাতাকে আশ্রয় করিয়া থাকে, সেইরূপ সরল ও সবল ভাবে তাঁহাকে ধরিয়া থাক, এবং তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মের সাধনে আপনাকে নিযুক্ত কর—দুর্ব্বলতা কোথায় অন্তর্হিত হইবে।

যে ধর্ম্ম সত্যে সম্বদ্ধ হইয়া বিশ্বের সকল ধারাকেই একটী অবিচ্ছিন্ন যোগসূত্রে গাঁথিয়া রাখিয়াছে, তাহাই প্রকৃত ধর্ম্ম, তাহাই সত্যধর্ম্ম। সেই সত্যধর্ম্মে প্রতিষ্ঠিত হইলে স্বভাবতই তোমার অন্তরে বলবিধান হইবে; কিন্তু ধর্ম্মের নামে সঙ্কীর্ণতায় প্রশ্রয় দিলে স্বভাবতই দুর্ব্বলতা তোমাকে ঘিরিয়া ফেলিবে। অখণ্ড পরম পুরুষ স্বয়ং যে সত্যধর্ম্মকে প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন; শত উপধর্ম্মের মেঘজাল যে সত্যধর্ম্মের সূর্য্যকে চিরতরে আচ্ছন্ন রাখিতে পারে না, সেই সত্যধর্ম্ম অবলম্বনে ভগবানের শরণ গ্রহণ কর এবং জীবনকে ধন্য কর। সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ববিবাদের অবসান হোক। মুক্তিদাতা পরম পিতার আশ্রয়ে কুসংস্কার ও সংকীর্ণতা হইতে আপনাকে মুক্ত কর এবং স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হও। তিনিই আমাদের অন্তরতম সখা; সকল বিপদ সকল সঙ্কট হইতে উদ্ধার করিতে পারেন একমাত্র তিনিই। তাঁহার মঙ্গল দৃষ্টিতে নিজের দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া, তাঁহাকে তোমার পরম সহায় জানিয়া নির্ভর হও। ভগবানকে পরম পিতা জানিয়া সন্তানের ন্যায় একনিষ্ঠ ভাবে নির্ভীক হৃদয়ে সত্যধর্ম্ম প্রচারে অগ্রসর হইয়া কর্ত্তব্য সাধন কর। সৃষ্ট কোন বস্তুকে ভগবানের আসনে বসাইয়া তাঁহার প্রাপ্য পূজা অর্পণ করিয়া নিজের অমঙ্গল টানিয়া আনিও না।

বিশ্বসভ্যতার আদি জননী এই ভারতেই একদিন সত্যধর্ম্মের বিজয়বিষাণ বাজিয়া উঠিয়াছিল। সেই সত্যধর্ম্মকে অবহেলা করিবার কারণেই আজ ভারতে এত বিরোধ বিবাদ, এত দ্বেষ-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিয়াছে। যে সত্যধর্ম্মের বলে এক সময়ে ভারতে মহাজাগরণ জাগিয়া উঠিয়াছিল, সর্ব্ববিধ সঙ্কীর্ণতার গণ্ডী, সকল প্রকার সাম্প্রদায়িকতার বাঁধ অতিক্রম করিয়া সেই সত্যধর্ম্ম আবার ভারতের একমাত্র অবলম্বন হউক। সত্যধর্ম্মের আশ্রয়ে ভারতের সকল ভেদাভেদ বিদূরিত হোক, সকল অশান্তি অন্তর্হিত হইয়া শান্তির সুবিমল বায়ু প্রবাহিত হইয়া দেশবাসীকে সজীব করিয়া তুলুক। সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডী, বিভিন্ন মতামত লইয়া বিরোধই অশান্তি ও অমঙ্গলের উৎস। ভগবৎপ্রবর্ত্তিত, নরনারীর আত্মাতে খোদিত সত্যধর্ম্মে সকল গণ্ডী, সকল মতামতের বাদানুবাদ ডুবিয়া যাউক, এবং সকল অশান্তি ও অমঙ্গল নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হউক। সত্যধর্ম্মের বিজয়ভেরীর সুমঙ্গল ধ্বনি আমাদের কানে আসিয়া পৌঁছিতেছে—তাহাকে অন্তরে ধরিয়া রাখিবার জন্য সকলে নির্ভীকহৃদয়ে প্রস্তুত হও। ভগবান যদি সত্য হন, তবে তাঁহার সত্যধর্ম্মের জয় সুনিশ্চিত জানিয়া বিজয়লাভে অগ্রসর হও। এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে কুজ্ঝটিকার অবসানে সত্যধর্ম্মের প্রদীপ্ত তপন আবার সমুদিত হউক।

সত্যধর্ম্ম ও মুক্তি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান আজ শতাব্দীপ্রায় পূর্ব্বে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া যে সত্যধর্ম্মের বীজ নবতরভাবে এই ভারতভূমিতে রোপিত করিয়াছেন, এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র, আচার্য্য শিবনাথ প্রভৃতি মহাত্মাগণ যাহার মূলে প্রেমধারা অবিশ্রামে সিঞ্চন করিয়া যাহাকে ফলপত্রশোভিত প্রকাণ্ড মহীরুহে পরিণত করিয়াছেন; যাহার তলে আশ্রয় লাভ করিয়া দেশবাসী আজ সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার ভাবে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছে, আজ মিলিতকণ্ঠে সেই সত্যধর্ম্মের বিজয়ঘোষণা করিবার জন্য আমরা এই পবিত্র ব্রহ্মমন্দিরে এই শুভ মুহূর্ত্তে সম্মিলিত হইয়াছি। সেই সত্যধর্ম্মের ভিত্তিতে সকল কর্ম্মে অগ্রসর হইয়া, সত্যধর্ম্মকে জীবনের সকল বিভাগেই কেন্দ্র করিয়া আমরা যেন ভগবানকেই জয়যুক্ত করি।

যাঁহার ইঙ্গিতে এই অসীম নভস্তলে কোটী কোটী গ্রহতারকচন্দ্রসূর্য্য স্ব স্ব কক্ষে সুনির্দ্দিষ্ট নিয়মে পরিভ্রমণ করিতেছে; যাঁহার আদেশে এই সুমহান বিশ্বচক্র অন্তরীক্ষে বিধৃত হইয়া স্থিতি করিতেছে—একটী রেণুকণাও স্বীয় নির্দ্দিষ্ট স্থান হইতে বিচ্যুত হইতে পারে না; যাঁহার মঙ্গল ইচ্ছাতে জগতে ধর্ম্মরাজ্য অচলপ্রতিষ্ঠ হইয়া আছে; মানবসমাজের মঙ্গলসাধনের জন্য যিনি সত্যধর্ম্মকে সংসারে প্রেরণ করিয়া প্রত্যেক নরনারীর আত্মাতে অবিনশ্বর অক্ষরে তাহা খোদিত করিয়া রাখিয়াছেন, সেই মঙ্গলময় পরমপুরুষ ভগবানকে ছাড়িয়া মুক্তিলাভের আশায় অন্য কোন্ দেবতার শরণ গ্রহণ করিব—কাহার চরণে হৃদয়ের প্রীতিহবি নিবেদন করিব? অন্তরে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া আপনাকে জিজ্ঞাসা কর—কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম—কোন্ দেবতাকে অন্তরের পূজা নিবেদন করিব?

শোন—তোমার ঐ জিজ্ঞাসার উত্তরে অনন্ত গগনের স্তরের পর স্তর ভেদ করিয়া গম্ভীর উদাত্ত স্বরে এই বাণী আসিয়া পৌঁছিতেছে—অন্যা বাচো বিমুঞ্চথ—অন্য সমস্ত কথা পরিত্যাগ কর—সর্ব্বধর্ম্মান্ পরিত্যজ্য মামেকং শরণং ব্রজ—জগতে উপধর্ম্ম যাহা কিছু আছে, সকলই পরিত্যাগ করিয়া একমাত্র সেই শরণাগতবৎসল ভগবানেরই শরণ গ্রহণ কর; একমাত্র ভগবানেরই চরণে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি নিবেদন কর এবং একনিষ্ঠ হৃদয়ে তাঁহারই প্রিয়কার্য্যসাধনের ব্রত গ্রহণ কর। ইহাই হইল সত্যধর্ম্মের বীজমন্ত্র। এই সত্যধর্ম্মই হইল মানবের মুক্তিলাভের একমাত্র সুপ্রশস্ত রাজপথ। বেদ-উপনিষদের বা জ্ঞানোন্মেষণের সেই আদিম কাল অবধি আজ পর্য্যন্ত সকল সাধু মহাত্মাই একবাক্যে সুস্পষ্ট ভাষায় ঘোষণা করিয়া আসিতেছেন যে, সত্যধর্ম্ম অবলম্বনে ভগবানকে জানিয়া তাঁহাকে সমুদয় হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই হইল তাঁহার প্রকৃত উপাসনা, এবং এই প্রকার উপাসনাই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গলের একমাত্র অক্ষয় উৎস। এই প্রকার উপাসনা ব্যতীত মুক্তিলাভের দ্বিতীয় পথ নাই—নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়।

মুক্তিপিপাসু যদি হও, তবে সত্যধর্ম্মের অনুশাসন গ্রহণ করিয়া, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার একমাত্র উৎস ভগবানের আদর্শ ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে আপনাকে পরিচালিত কর, এবং জ্ঞানে কর্ম্মে ও প্রীতিতে তাঁহার সঙ্গে স্বীয় আত্মার একান্ত যোগ স্থাপন কর। সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার অক্ষয় ও অনন্ত উৎস, বিশ্বভুবনের স্রষ্টা, পাতা ও নির্ব্বাহিতা পরম পুরুষের সহিত মানবের একান্ত যোগ ভিন্ন মুক্তির অপর কি অর্থ হইতে পারে, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারি না। মুক্তির অর্থে, জ্ঞানে প্রেমে অনন্ত ভগবানের সহিত জ্ঞানে প্রেমে পরিমিত মানবের এক ও অভিন্ন হওয়া, কতকগুলি অর্থযুক্ত শব্দের অর্থহীন সমাবেশ মাত্র; কারণ, স্থানে ও কালে, জ্ঞানে ও প্রেমে, সর্ব্বতোভাবে পরিমিত মানবের পক্ষে ঐরূপ এক ও অভিন্ন হওয়া তো দূরের কথা, উহা ধারণা করা, উপলব্ধি করাও নিতান্তই অসম্ভব। সহজ ও সরল সত্যধর্ম্মের অনুশাসন এই যে, মুক্তি যদি চাও, তবে সেই অতুলশক্তি পরমেশ্বরকে জানিয়া তাঁহার সহিত আত্মাকে একান্ত যোগে যুক্ত কর। মুক্তি যদি চাও, তবে ভগবানের আদেশে যে সত্যধর্ম্ম সেতুস্বরূপে অবস্থিত হইয়া এই বিচিত্র সংসারকে ধারণ করিয়া কেবল রক্ষা করিতেছে না, জগতসংসারকে মধুময় করিয়া রাখিয়াছে, সেই সত্যধর্ম্ম অবলম্বনে ভগবানের অনুপম দয়া স্নেহ প্রেম উপলব্ধি কর, এবং পিতার সহিত পুত্রের ন্যায়, স্বামীর সহিত সাধ্বী পত্নীর ন্যায়, সখার সহিত সখার ন্যায় ভগবানের সহিত নিজের আত্মাকে একনিষ্ঠ যোগে যুক্ত কর। যে মঙ্গলস্বরূপ পরম পুরুষের মঙ্গলবিধানে শতসহস্র নদনদী যুগযুগান্তর ধরিয়া উত্তরদক্ষিণে পূর্ব্বপশ্চিমে প্রবাহিত হইয়া শতবিধ ওষধি-বনস্পতির জন্মদান করিতেছে, এবং ধরণীকে শস্যশ্যামল করিয়া লক্ষকোটী জীবের জীবনরক্ষার উপায় বিধান করিতেছে; যাঁহার প্রসাদে আমরা পিতামাতা স্ত্রীপুত্র প্রভৃতির সুকোমল স্নেহপ্রেম নিত্য নূতনভাবে অনুভব করিবার অধিকার লাভ করিতেছি; মুক্তি যদি চাও, তবে সকল মঙ্গলের নিদান সেই মঙ্গলময় ও মঙ্গলবিধাতা ভগবানেরই চরণে শরণ গ্রহণ কর।

সত্যধর্ম্ম স্থান বা কালবিশেষের, ব্যক্তি বা জাতি বা সম্প্রদায়বিশেষের মনঃকল্পিত বস্তু নহে। সত্যধর্ম্ম প্রত্যেকেরই আত্মার নিজস্ব। জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত প্রত্যেক নরনারীরই অন্তরে সত্যধর্ম্ম খোদিত হইয়া আছে, কারণ ইহা মানুষের প্রতি ভগবানের দান। ভগবানের যাহা দান, তাহা ব্যক্তিনির্ব্বিশেষে, জাতিনির্ব্বিশেষে, সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেরই উপর সমভাবে বর্ষিত হয়। ভগবানের দান বলিয়াই সূর্য্যকিরণ নির্ব্বিশেষে জগতবাসীমাত্রেরই মস্তকে সমধারে বর্ষিত হইয়া হিতসাধন করিয়া থাকে। ভগবানের দান বলিয়াই চন্দ্রের সুধাধারা জগতবাসীমাত্রেরই উপর সমধারে বর্ষিত হইয়া শান্তি প্রদান করে। ভগবানেরই প্রবর্ত্তিত বলিয়া সত্যধর্ম্মও ধনী-দরিদ্র, পাপী-অপাপী, সাধু-অসাধু, বৃদ্ধযুবা নির্ব্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে নিহিত থাকিয়া প্রত্যেককেই মঙ্গলের পথে পরিচালিত

করে। সত্যধর্ম্ম নরনারীমাত্রেরই অন্তরের ধন। প্রত্যেক নরনারীরই অন্তরে সত্যধর্ম্মের বীজমন্ত্র নিহিত আছে, কেবল পরিস্ফুট হইয়া প্রকাশ পাইবার জন্য উপযুক্ত অবসর অন্বেষণ করে। সত্যধর্ম্ম আত্মার নিজস্ব বলিয়াই ইহা আধ্যাত্মিক ধর্ম্ম, এবং আধ্যাত্মিক সত্যসমূহই সত্যধর্ম্মের জীবন।

আধ্যাত্মিক সত্যসমূহই সত্যধর্ম্মের জীবন বলিয়াই সত্যধর্ম্মে কল্পিত মূর্ত্তির পূজা, পরিমিত জীবজন্তু বা মনুষ্যের পূজা, যাগযজ্ঞের বৃথা আড়ম্বর প্রভৃতি উপধর্ম্মের বিভিন্ন অঙ্গপ্রত্যঙ্গ স্থান পাইতে পারে না। সত্যধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—পরব্রহ্ম পরিপূর্ণ অতি মহান। সত্যধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা—আত্মার অন্তরাত্মা ভূমা পরমাত্মা। তাঁহার অনন্তস্বরূপ সমগ্রভাবে মানুষ ধারণা করিতে পারে না বলিয়াই নরনারীর অন্তরে এই গম্ভীর ও গভীর প্রশ্ন সমুদিত হয়—অন্ত কোথা তাঁর, অন্ত কোথা তাঁর। তাঁহার অনন্তস্বরূপ সমগ্রভাবে ধারণা করা অসম্ভব বলিয়াই ভারতের মনু যাজ্ঞবল্ক্য প্রভৃতি কত শত ঋষি তাঁহার বিষয় নিঃশেষে বলিতে গিয়া নিরস্ত হইয়াছেন। তাঁহার বিষয় বলিতে গিয়া উপনিষদের ঋষিরাও বারম্বার বলিয়াছেন—মনের সহিত বাক্য যাঁহাকে না পাইয়া যাঁহা হইতে প্রতিনিবৃত্ত হয়—যতো বাচো নিবর্ত্তন্তে অপ্রাপ্য মনসা সহ।

ভগবানের অনন্তস্বরূপ সমগ্রভাবে মানবের ধারণার অতীত হইলেও, তাঁহার সহিত মানবের নিগূঢ় সম্বন্ধ আমাদের উপলব্ধির অতীত নহে। মুক্তির পথে, ভগবানের সহিত একান্ত যোগের পথে অগ্রসর হইতে 'হইবে', একথা বলিলে তাঁহার সহিত আমাদের সেই নিগূঢ় নিত্য সম্বন্ধের যথার্থ পরিচয় দেওয়া হয় বলিয়া মনে হয় না। সত্যধর্ম্ম যে সকল সার্ব্বভৌমিক সত্য আমাদের সম্মুখে ধারণ করে, তন্মধ্যে সকল সত্যের সার সত্য, সকল সত্যের ভিত্তিস্বরূপ মূল সত্য হইতেছে—পরমাত্মা ও জীবাত্মা উভয়ের মধ্যে একটী অব্যবচ্ছিন্ন ও অবিচ্ছেদ্য যোগ চিরবিদ্যমান আছে। প্রকৃত ব্রহ্মোপাসক জানেন যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে পিতাপুত্র অপেক্ষাও একটী ঘনিষ্ঠতর সম্বন্ধ নিত্যবিদ্যমান। ভগবদ্ভক্তমাত্রেই জানেন যে, পরমাত্মা ও জীবাত্মার মধ্যে এতটুকুও ব্যবধান নাই। ভগবান আমাদের প্রেমময় পিতা, স্নেহময়ী মাতা, আমরা তাঁহার সন্তান। তিনি আমাদের এই দেহের প্রত্যেক অণুপরমাণুতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন; তিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে ওতপ্রোত হইয়া আছেন। পরমাত্মা ও জীবাত্মার এই অবিচ্ছিন্ন, অবিচ্ছেদ্য ও ঘনিষ্ঠতম সম্বন্ধের সত্যটী প্রত্যেক ব্রহ্মসাধককে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতে হইবে, অন্তরে বিকশিত করিয়া তুলিতে হইবে।

এই সত্য উপলব্ধি করিলে স্পষ্টই বোঝা যাইবে যে, প্রতীক বলিয়াই হৌক বা অন্য যে কোন সূত্রেই হৌক, ভগবানের আসনে তাঁহার সৃষ্ট কোন বস্তুকে বা মানবের মনঃকল্পিত কোন কিছুকে বসাইয়া ভগবানের প্রাপ্য পূজা তাহাকে অর্পণ করিলে পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার একান্ত যোগের পথে, মুক্তির পথে একটা পর্দ্দা আসিয়া পড়ে, একটা অন্তরাল উপস্থিত করা হয়। এক কথায়, পাষাণাদি বা মানবের মনঃকল্পিত মূর্ত্তি, অথবা জীবজন্তু বা মনুষ্য, সৃষ্ট কোন বস্তুকে পরব্রহ্ম জ্ঞানে আরাধনা করিতে প্রবৃত্ত হইলে, যে ব্রহ্মোপাসনার ফলে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা বা প্রকৃত মুক্তি লাভ হয়, সেই প্রকৃত ব্রহ্মোপাসনা হইতে যে দূরে সরিয়া পড়িতে হয়, তাহাতে সন্দেহমাত্র নাই। ভগবানের প্রকৃতিরাজ্যের কোন একটী বস্তুকে ধরিয়া, তাহার ভিতর দিয়া ভগবানকে দেখা, আর তাঁহার সৃষ্ট-বস্তুতে প্রাণপ্রতিষ্ঠা প্রভৃতি মনভোলানো ব্যবস্থা করিয়া, অথবা পরিমিত কোন জীব বা মনুষ্যকে ভগবানের পূর্ণ অবতার বোধে, তাহাকেই বা মানুষের মনঃকল্পিত কোন ভগবানরূপে দেখা, উভয়ের মধ্যে যে আকাশপাতাল প্রভেদ, যাঁহার আত্মা গতানুগতিকতার দাস ভাবে অনুপ্রাণিত না হইয়া সহজ সত্যের মধ্যে পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে, তিনিই তাহা সহজে বুঝিতে পারিবেন। পাষাণাদি সৃষ্ট পদার্থ বা মানবের মনঃকল্পিত মূর্ত্তি প্রভৃতি পরিমিত পদার্থসকলই বা কোথায়, আর অগণিত গ্রহনক্ষত্রখচিত অনন্ত আকাশের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা অনন্তস্বরূপ পরব্রহ্মই বা কোথায়? পরিমিত শক্তিসম্পন্ন ক্ষুদ্র জীব অথবা পরিমিত মনুষ্যই বা কোথায়, আর যাঁহার জ্ঞান, প্রেম ও শক্তির কণামাত্র সৃষ্টির আদিকাল অবধি অসংখ্য জীবজন্তুর অসংখ্য নরনারীর অন্তরে কত অসংখ্য আকারে প্রকারে লীলায়িত হইয়াছে ও হইতেছে, সেই আত্মার অন্তরাত্মা ভূমা পরমাত্মাই বা কোথায়?

ভগবান যে সত্যধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা আমাদের অন্তরে জাগাইয়া তুলিয়াছেন; যে সত্যধর্ম্মের মহান উদার মুক্তিবাণী আজ আমাদের কানে অহর্নিশি ধ্বনিত হইতেছে; যে সত্যধর্ম্মের কল্যাণে ভারতবাসী আজ সুপ্তোত্থিত সিংহের বিক্রমে নিদ্রা আলস্য ও পরাধীনতার মোহ পদদলিত করিয়া জগতের মহাসভায় নিজের আসন দৃঢ়প্রতিষ্ঠিত করিতে উদ্যুক্ত হইয়াছে; যে সত্যধর্ম্মের প্রসাদে ভারতবাসী আজ সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার উন্মুক্ত রাজপথে বিজয়ভেরীর তালে তালে চলিবার সূত্রপাত করিতেছে; এবং যে সত্যধর্ম্ম এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে সমধিক পরিস্ফুট হইয়া বেদবেদান্তের ভিতর দিয়া নামিয়া আসিয়া সুদূর অতীত কাল হইতে আজ পর্য্যন্ত কত সংসারতাপদগ্ধ নরনারীকে স্বীয় সুশীতল ছায়াতলে

আশ্রয় দিয়াছে ; দুঃখের বিষয়, সেই সত্যধর্ম্মের আদিমতম প্রচারভূমি এই ভারতের অধিবাসী অনেকেই আজ পর্য্যন্ত তাহার সরল ও সবল মহিমা উপলব্ধি করিতে পারেন নাই। আরও দুঃখের বিষয় এই যে, আজ কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবাসী অন্তর্বিরোধ গৃহবিবাদের বশবর্ত্তী হইয়া সত্যধর্ম্ম হইতে দূরে সরিয়া থাকিবার, প্রকৃত স্বাধীনতার পথ হইতে, প্রকৃত মুক্তির পথ হইতে আপনাকে বিচ্যুত রাখিবার উপক্রম করিতেছেন। গৃহ-বিবাদের কারণে আজ ভারতবাসী বিচার বিবেচনা পরিত্যাগ পূর্ব্বক দ্বেষের বশবর্ত্তী হইয়া উপধর্ম্মের বিজয়-ডঙ্কা বাজাইতে উদ্যত হইয়াছেন, এবং তাহার অনিবার্য্য ফলে দাসমনোভাব যে তাঁহার মনপ্রাণ সর্ব্বতোভাবে আচ্ছন্ন করিতে বসিয়াছে, নিজের অজানতই ভারতবাসী যে সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার অভিমুখে অগ্রসর হইয়া চলিতেছেন, সে দিকে তাঁহার কিছুমাত্র লক্ষ্য নাই।

প্রাচীনপন্থীদিগের কথা দূরে থাক, যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া সত্যধর্ম্ম নবতরভাবে প্রচারিত হইতে আরম্ভ হইয়াছে, সেই ব্রাহ্মসমাজেরই মণ্ডলীভুক্ত কয়জন যে সত্যধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম, উহার স্বাধীনতাপ্রদ সবল ভাব হৃদগত করিতে পারিয়াছেন তাহা জানি না। ব্রাহ্ম-সমাজের ঐতিহাসিক তথ্য নির্ণয় প্রভৃতির ন্যায় বহু অবান্তর বিষয়ে আমরা পরস্পর কথাকাটাকাটি করিয়া অনেক সময়, অনেক উৎসাহের অপব্যয় করিতে পারি ; বিবাহ প্রভৃতি কারণে দশ পাঁচ বৎসরে একজন সমাজে নামেমাত্র দীক্ষা গ্রহণ করিলে আমরা আনন্দে উৎফুল্ল হইয়া উঠিতে পারি. কিন্তু আমাদের মধ্যে কয়জন সন্ধান রাখেন যে ব্রাহ্মসমাজের যাঁহারা মণ্ডলী-ভুক্ত, অথবা প্রয়োজনমত ব্রহ্মোপাসকদিগের সন্তান বলিয়া যাঁহারা আপনাদিগের পরিচয় প্রদানে উদ্যত হন, তাঁহাদিগের মধ্যে কত জন সামাজিক সুবিধা প্রভৃতি নানা কারণে, জানি না অন্তরে কি না, অন্তত বাহিরে সত্যধর্ম্ম পরিত্যাগ করিয়া মূর্ত্তিপূজা যাগযজ্ঞ প্রভৃতির আশ্রয় গ্রহণে আপনাদিগকে কৃতার্থ মনে করিতেছেন ; বাহিরের খোসা লইয়া মণ্ডলীর মধ্যে বিরোধবিবাদ দেখিয়া, কত লোক চিত্তের শান্তিপিপাসা নিবারণের জন্য পরাধীনতার অব্যর্থ মূল অযথা গুরুবাদ ও অযথা পৌরো-হিত্যের চরণে মস্তক অবনত করিতেছেন? প্রকৃত উপাসনার অভাবে, সত্যধর্ম্ম অবলম্বনে ভগবানকে সমস্ত প্রাণ দিয়া না ধরিয়া রাখিবার কারণে ব্রাহ্মসমাজ যে ধসিয়া পড়িবার উপক্রম করিতেছে, আমরা কয়জন তাহার সন্ধান রাখি? জীবনে ধর্ম্মসাধনের পরিচয় দিবার অভাবে, ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুকেও বরণ করিবার সাহসের অভাবে ব্রহ্মোপাসকগণ মফঃস্বলে ভীরুতা, কাপুরুষতা প্রদর্শন পূর্ব্বক সাংসারিক অসুবিধা হইবে বলিয়া নিজেদের প্রকৃত পরিচয় প্রদানে যে পশ্চাৎপদ হন, আমরা কয়জন তাহার সন্ধান রাখি? আমরা কয়জন কায়মনোবাক্যে তাঁহাদের অন্তরে বল ও সাহস আনিবার চেষ্টা করি?

শতাব্দীর পর শতাব্দী উপধর্ম্মের সেবা করিবার কারণেই আমাদের হৃদয় মোহান্ধকারে এতই আচ্ছন্ন হইয়া আছে, এতই দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে যে, সত্যধর্ম্মের বিমল জ্যোতি অনুক্ষণ আমাদের নয়নে নিপতিত হইলেও অল্পবিস্তর সুবিধা পাইলেই সেই জ্যোতিতে বিচরণ করিবার পরিবর্ত্তে আমরা গতানু-গতিকের পন্থা অবলম্বন করিয়া উপধর্ম্মের চিরপরিচিত অন্ধকার গৃহেই বাস করিতে ভালবাসি। সত্যধর্ম্মকে অন্তরে ধরিয়া রাখিবার জন্য যে সাধনা আবশ্যক, যে যত্ন ও চেষ্টা আবশ্যক, তাহার ফলে স্বাধীনতা ও মুক্তি হস্তগত হইবার সম্ভাবনা থাকিলেও, তাহার প্রতি যথাযুক্ত মনোযোগ দিতে চাহি না। সত্যধর্ম্মের এই যে সত্যবাণী আমাদের অন্তরে অনুক্ষণ ধ্বনিত হয় যে, স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোগ আমরা নিজেরাই করিব—পুণ্য করি তাহার পুরস্কার নিজেরাই পাইব, পাপ করি, তাহার দণ্ড ভোগও নিজেরাই করিব—স্বাধীনতার পরিপোষক এই সত্য কথা অনেক সময়েই আমাদের ভাল লাগে না। তাহার পরিবর্ত্তে, পরাধীনতার পরিপোষক উপধর্ম্মের এই মিথ্যা আশ্বাস যে, গুরুপুরোহিত শান্তি স্বস্ত্যয়ন প্রভৃতি বিবিধ ক্রিয়াকাণ্ডের দ্বারা আমাদের পুণ্যরাশি বাড়াইয়া দিবেন, এবং আমাদের পাপজনিত দণ্ডভোগ নিরস্ত করিবেন, ইহাই আমাদের প্রিয় হইয়া উঠে। স্বাধীনতার সুখ অপেক্ষা আমাদের নিকটে পরাধীনতার সোয়াস্তি শতগুণে প্রিয়তর বোধ হয়।

ভূমা পরমেশ্বর যেমন মহান, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্য-ধর্ম্মও তেমনি মহান, তেমনি উদার তেমনি অসাম্প্র-দায়িক। পরমেশ্বর যেমন এক, অখণ্ড ও অদ্বিতীয়, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মও তেমনি এক ও অভিন্ন। ভগবানের শক্তিও যেমন অপ্রতিহত, তাঁহার প্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্মও সেইরূপ সবল। এই সত্যধর্ম্ম অবলম্বন কর এবং নির্ভয় হও। বিশ্বপতি ভগবান নিশ্চয়ই তোমার সহায় হইবেন। ইহলোক বা পরলোক, সকলই যে তাঁহারই রাজ্য। যে জ্যোতির্ম্ময় মহান পুরুষের প্রকাশে অযুতকোটী গ্রহতারকা, কোটী কোটী চন্দ্র সূর্য্য, সকলই হীনপ্রভ হইয়া যায়, সেই দেবদেবকে অন্তরে ধারণ কর ; তাঁহার সহিত একান্ত যোগ বা মুক্তির পথে যে কোন বাধাবিঘ্ন উপস্থিত হইবে, ইহা পরীক্ষিত সত্য বলিয়া গ্রহণ কর যে, ভগবান স্বয়ং তাঁহার অপূর্ব্ব প্রণালীতে সেই সমস্ত বাধাবিঘ্ন অপসারিত করিয়া দেন।

আমরা দীনাতিদীন অতি ক্ষুদ্র বটে, কিন্তু সেই মহান পরমেশ্বর আমাদের পরম আশ্রয়।

আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া দুর্ব্বল করিয়া তুলিও না। শুধু মুখস্থ কথায় নয়, কিন্তু অন্তরে ইহা সুনিশ্চিত সত্যরূপে উপলব্ধি কর যে, তুমি অমৃত পুরুষের সন্তান—তোমার মৃত্যু নাই। কোন প্রকার বিভীষিকায় আতঙ্কিত হইয়া তাঁহার নাম প্রচারে বিরত হইও না। ভয় ও বিপদের মাঝে তিনিই আমাদের বর্ম্মদুর্গ। তিনি আমাদের অন্তরে, তিনি আমাদের বাহিরে। তিনি আমাদিগকে পরিবেষ্টন করিয়া, পিতামাতা ও সখারূপে, নিত্যসহায়রূপে চিরবিদ্যমান। তাঁহারই জয়ের পতাকাতলে সমবেত হইয়া, তাঁহারই বলে বলী হইয়া তাঁহার প্রবর্ত্তিত মুক্তির উৎস সত্যধর্ম্ম চারিদিকে নির্ভয়ে প্রচার কর। তাঁহার কৃপালাভ করিলে মূক যে, সেও বাচালতা প্রাপ্ত হয়, এবং পঙ্গু যে, সেও গিরি উল্লঙ্ঘন করিতে পারে। তিনি যখন আমাদের অন্তরে চির-অধিষ্ঠিত, তখন আমাদের হৃদয় হইতে দুঃখ-দৈন্য-ভয় বিদূরিত হউক। সত্যধর্ম্মকে যদি সত্যই প্রিয় বলিয়া, অন্তরের ধন বলিয়া উপলব্ধি কর; যদি সত্যধর্ম্মকে সত্যই মঙ্গলময়ের মঙ্গল আশীর্ব্বাদরূপে উপলব্ধি কর, তবে নিজেরাও সত্যধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদগত কর এবং নির্ভীক হৃদয়ে অতুল সাহসের সহিত তাহা বিশ্ববাসীর নিকট প্রচার করিতে অগ্রসর হও। যে ব্রাহ্মসমাজের ভিতর দিয়া আমরা বর্ত্তমান যুগে সত্যধর্ম্মকে লাভ করিয়াছি, ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছা—জগতে জ্ঞান ও ধর্ম্মের উন্নতি-সাধনে আত্মনিয়োগ করিয়া সত্যধর্ম্মের বিজয়বাণী গৃহে গৃহে বহন কর এবং তাহার প্রচারভূমি ব্রাহ্মসমাজকে জয়যুক্ত কর। জননী জন্মভূমি পুরাকালের ন্যায় ভগবানের পবিত্র নামে মুখরিত হইয়া উঠুক। ভারতের মুখ উজ্জ্বল হইয়া উঠুক, তাহার সকল দুঃখ সকল দৈন্যের অবসান হউক।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্ব-কথা।

(২)

[নবপর্য্যের ভাদ্রের অনুবৃত্তি]

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

১৭৩৭ শকে আত্মীয় সভার যে সূচনা হয় তাহাতে শিবচন্দ্র মিশ্র বেদপাঠ করিতেন, গোবিন্দ মালা ব্রহ্মসঙ্গীত করিতেন। ঈশান বাবুর পুস্তকে দেখিতে পাই যে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ উহাতে ব্যাখ্যান দিতেন। ১৭৫০ শকে ভাদ্রমাসে কমল বসুর বাটীতে যে সমাজ আরম্ভ হয়, তাহাতে দুই জন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণ বেদ উচ্চারণ করিয়াছিলেন। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিতেন। উৎসবানন্দ বিদ্যাবাগীশ উপনিষদের মূল পাঠ করিলে তদনন্তর রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ব্যাখ্যান করিতেন। ঐ দুই জন তৈলঙ্গী ব্রাহ্মণের নামের উল্লেখ নাই। রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ ১৭৬৫ শকের মাঘ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের সেবা করেন। তৎপূর্ব্ব হইতে তিনি আচার্য্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছিলেন। পরে তিনি পক্ষাঘাত রোগে আক্রান্ত হইলে কাশী যাইবার মনস্থ করেন এবং নৌকা পথে যাইতে যাইতে ১৭৬৬ শকের ২০শে ফাল্গুন তারিখে ৫৯ বৎসর ২১ দিন বয়সে মুরশিদাবাদে দেহত্যাগ করেন। দরিদ্র ব্রাহ্মণ হইলেও তিনি ব্রাহ্মসমাজের জন্য ৫০০৲ শত টাকা দান করিয়া যান।

ঐ সময়ে ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন নামে আর এক জন আচার্য্যকে দেখিতে পাই। মহর্ষি তাঁহার ২৫ বৎসরের পরীক্ষিত বৃত্তান্তের এক স্থানে বলিয়াছেন "১৭৬৩ শকে আমি ব্রাহ্মসমাজের সহিত যোগ দিই, তখন তত্ত্ববোধিনী সভা স্থাপিত হইয়াছে; সেই তত্ত্ববোধনী-সভা হইতে ১৭৬৫ শকে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রকাশ হয়। যখন তত্ত্ববোধিনী সভার সহিত ব্রাহ্মসমাজের পরিণয় হইল, তখন তাহার প্রাণ-সঞ্চার হইল।" মহর্ষি তাঁহার আত্মজীবনীর ৩৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন, "ব্রাহ্মসমাজ যখন প্রথম দেখিতে যাই, তখন আমি দেখিলাম যে, একটি নিভৃত গৃহে শূদ্রের অসাক্ষাতে বেদ পাঠ হইত। * * আর এক দিন দেখি যে, ব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশের সহযোগী ঈশ্বরচন্দ্র ন্যায়রত্ন রামচন্দ্রের অবতার হওয়ার বিষয় প্রতিপন্ন করিতেছেন। ইহা আমার অতিশয় অসঙ্গত ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-বিরুদ্ধ বলিয়া মনে হইল। আমি ইহার প্রতিবিধান করিবার জন্য প্রকাশ্যে বেদপাঠের ব্যবস্থা করিয়া দিলাম এবং বেদী হইতে অবতারবাদের বর্ণনা নিবারণ করিলাম এবং ব্রাহ্মধর্ম্মের উপদেশ দিতে পারে এমন সকল সুবিজ্ঞ ছাত্র সংগ্রহ করিবার উদ্যোগ করিলাম। বিজ্ঞাপন দিলাম, যিনি সংস্কৃত ভাষায় নির্দ্দিষ্ট পরীক্ষা দিয়া উত্তীর্ণ হইবেন, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভায় আসিয়া শিক্ষালাভের জন্য ছাত্রবৃত্তি পাইবেন। পরীক্ষার দিনে পাঁচ ছয় জন ছাত্র শ্রীধর ন্যায়রত্নের নিকটে পরীক্ষা দিলেন। তাঁহাদের মধ্য হইতে আনন্দচন্দ্র (পরে বেদান্তবাগীশ) ও তারকনাথ (পরে তত্ত্বরত্ন) মনোনীত হইলেন।"

মহর্ষির আত্মজীবনীর দশম অধ্যায়ে আছে যে তিনি 'সত্যং জ্ঞানম্ অনন্তম্' মন্ত্রটি ও "সপর্য্যগাৎ" মন্ত্রটি এবং পরে "ওঁ নমস্তে সতে তে" মন্ত্রটি উপাসনাতে সংযোজিত করিয়াছেন। শ্রীশ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ মহানির্ব্বাণ তন্ত্রোক্ত শেষ মন্ত্র সন্নিবেশ সম্বন্ধে মহর্ষিকে সাহায্য করিয়া-

ছিলেন।* এই শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ দ্বারকানাথ ঠাকুরের সভাপণ্ডিত বাঁশবেড়িয়া নিবাসী কমলাকান্ত চূড়ামণির পুত্র ছিলেন। তন্ত্রশাস্ত্রে শ্যামাচরণের বেশ ব্যুৎপত্তি ছিল। "হে পরমাত্মন্! মোহকৃত পাপ হইতে" প্রার্থনাটিও মহর্ষি সংযোজিত করিয়াছেন। মহর্ষি আত্ম চরিতের ৪৩ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্ম-সমাজে এই উপাসনাপ্রণালী প্রবর্ত্তিত হয়। কিন্তু তখন স্তোত্র পাঠের সময় তাহার বাঙ্গালা অনুবাদ ব্যবহৃত হইত না। ১৭৭০ শকের পরে স্তোত্রের বাঙ্গালা অনুবাদ পাঠ আরম্ভ হয়। এই উপাসনাপ্রণালী ব্রাহ্মসমাজে প্রবর্ত্তিত হইবার পূর্ব্বে সেখানে কেবল বেদপাঠ, অর্থের সহিত উপনিষদের শ্লোকপাঠ, শ্রীযুক্ত রামচন্দ্র বিদ্যা-বাগীশের বক্তৃতা পাঠ ও ব্রহ্মসঙ্গীত হইত। (মহর্ষির আত্মজীবনী ৪২। ৭৫পৃষ্ঠা)।

১৭৬৭ শকে আনন্দচন্দ্র, তারকনাথ, বাণেশ্বর ও রমা-নাথ এই চারিজনের মধ্যে ৩ জন বেদশিক্ষা করিবার জন্য কাশীতে প্রেরিত হইলেন। উহাঁদের মধ্যে একজন ১৭৬৬ শকে প্রেরিত হইয়াছিলেন। (মহর্ষির আত্মজীবনী ৫৪ পৃষ্ঠা দ্রষ্টব্য)। মহর্ষি ১৭৬৫ শকের ৭ই মাঘে বিদ্যাবাগী-শের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণ করেন। রাজনারায়ণ বসুর পিতা নন্দকিশোর বসু যিনি রাজা রামমোহনের জনৈক প্রিয় শিষ্য ছিলেন, তিনি ১৭৬৬ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। তিনি ইচ্ছা করিতেন "যদি রাজনারায়ণ ব্রাহ্ম হয়, বড় ভাল হয়"। জীবিতাবস্থায় তিনি তাঁহার ইচ্ছার সফলতা দেখিয়া যাইতে পারেন নাই। পিতার মৃত্যু হইলে রাজনারায়ণ সেই অশৌচ অবস্থায় মহর্ষির সহিত সাক্ষাৎ করেন। মহর্ষি বলেন, আমি তাঁহাকে সেই সময় হইতেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিলাম। ইংরাজী শিক্ষিতগণের মধ্যে তাঁহার বেশ প্রতিষ্ঠা ছিল। তখন তিনি এক জন কৃতবিদ্য বলিয়া গণ্য হইয়াছিলেন। রাজনারায়ণ ১৭৬৭ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করিলেন। মহর্ষি বলিতেছেন (১১৫ পৃষ্ঠা) "১৭৭০ শকে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থে আবদ্ধ হইল। ব্রাহ্মসমাজের উপাসনাসময়ে পূর্ব্বে যে বেদপাঠ হইত, এখন তাহার স্থানে এই ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম অধ্যায় পাঠ আরম্ভ হইল এবং যে উপনিষদ পাঠ হইত, তাহার স্থানে ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থ পাঠ হইতে লাগিল। ইহার পর হইতে ব্রাহ্মেরা ব্রহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের "অসতো মা সদগময়" মন্ত্র লইয়া, কেহ বা মূল সংস্কৃতে, কেহ বা ভাষান্তর অনুবাদে ব্রহ্মোপাসনার সময় প্রার্থনা করিতে লাগিলেন। ১৭৬৯ শক হইতে সমাজগৃহের তেতলা নির্ম্মাণ আরম্ভ হইয়াছিল। ১৭৭০ শকের ১১ই মাঘে উনবিংশ সাম্বৎসরিক ব্রাহ্মসমাজে উপাসনা (১৭৫১।১১ই মাঘ হইতে গণনায়) শ্বেত-প্রস্তরের বেদী ও তাহার সম্মুখে সুসজ্জিত গীতমঞ্চ সমম্বিত নূতন তেতলায় উদাত্ত-অনুদাত্ত স্বরযুক্ত স্বাধ্যায় পাঠে ও গায়ক বিষ্ণুর সুকণ্ঠনিঃসৃত সুমধুর সঙ্গীতে সুসম্পন্ন হইল। ১৭৬৯ শকের পূর্ব্ব হইতে অর্থাৎ ১৭৬৭ শক হইতে শ্রীধর ন্যায়রত্নের নাম ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বলিয়া তত্ত্ব-বোধিনী পত্রিকায় দেখিতে পাই। ১৭৬৯ শকের আশ্বিন মাসে মহর্ষি কাশী গিয়াছিলেন। তিনি তথা হইতে ফিরিবার সময় ছাত্রগণের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে সঙ্গে করিয়া আনিলেন। আর আর ছাত্রেরা পরে কলিকাতায় আসিয়া সমাজের কার্য্যে যোগ দিলেন। (সতীশবাবু প্রণীত মহর্ষির আত্মজীবনী ১৩৮।১৩৯ পৃষ্ঠা)। মহর্ষি তাঁহার আত্ম-জীবনীর ৯১ পৃষ্ঠায় বলিয়াছেন যে, ৪ জন ছাত্রের মধ্যে আনন্দচন্দ্রকে শাস্ত্রে ব্যুৎপন্ন শ্রদ্ধাবান ও নিষ্ঠাবান দেখিয়া বেদান্তবাগীশ উপাধি দিয়া ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য পদে নিযুক্ত করিলাম। ১৭৬৯ শকের প্রথম অংশে শ্রীধর শর্ম্মার নাম ব্রাহ্মসমাজের উপাচার্য্য বলিয়া দেখিতে পাই। কিন্তু উক্ত শকের পৌষ মাস হইতে বিজ্ঞাপনে শ্যামা-চরণ তত্ত্ববাগীশের নাম উপাচার্য্য বলিয়া দেখিতে পাই। এই সময়ে শ্রীনৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের নাম তত্ত্ব-বোধিনী সভার সম্পাদকরূপে দেখি। তৎপূর্ব্বে সম্পাদক ছিলেন শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ ঠাকুর; ইনি ছিলেন দ্বারকানাথ ঠাকুরের ভ্রাতুষ্পুত্র। নৃপেন্দ্রনাথের পিতার নাম রাজা রমানাথ ঠাকুর, আর ব্রজেন্দ্রনাথের পিতার নাম রাধা-নাথ। ১৭৭০ শকের পত্রিকার জ্যৈষ্ঠসংখ্যা হইতে আনন্দচন্দ্র বেদান্তবাগীশের নাম উপাচার্য্য বলিয়া ঘোষিত হয়, এবং ভাদ্রসংখ্যায় দেখি, তিনি তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইয়াছেন। এই তত্ত্ব-বোধিনী সভার কোন কোন বার্ষিক অধিবেশন এবং কোন বিশেষ সভা রাজা রমানাথ ঠাকুরের বাটীতে হইত। ইতিপূর্ব্বে দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভার সভাপতি হইয়া-ছিলেন। (১৭৬৮ শকের অগ্রহায়ণ-সংখ্যা—তত্ত্ববোধিনী)

১৭৭০ শকের আষাঢ় মাসের পত্রিকায় দেখি সভার আয়ের অল্পতা হওয়ায় শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশকে অবসর গ্রহণ করিবার জন্য নৃপেন্দ্রনাথ ঠাকুর নোটিশ দিতেছেন। তদুত্তরে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ বলিতেছেন "যেহেতু তত্ত্ব-বোধিনী সভা ১৭৬১ শকের ২০শে আশ্বিন রবিবার

* রাজা রামমোহন ব্রহ্মোপাসনার একটি পদ্ধতি নির্দ্দেশ করিয়া যান এবং উক্ত পদ্ধতিকে তিনি "ব্রহ্মোপাসনার সঙ্কেপক্রম" বলিয়া নির্দ্দেশ করেন। কিন্তু তাঁহার সময়ে এই পদ্ধতি মতে উপাসনা হইত না। তখন কেবল উপনিষদব্যাখ্যান, পাঠ ও সঙ্গীত হইত (রাজার বাঙ্গালা ও সংস্কৃত গ্রন্থাবলীর ৮১০ পৃষ্ঠায় রাজনারায়ণ বসুর মন্তব্য)।

*"ওঁ নমস্তে সতে তে" মন্ত্রটি রাজাই উদ্ধার করিয়াছেন মহর্ষি তখন তাহা জানিতেন না।

(১৭৬৯ জ্যৈষ্ঠ-পত্রিকা দ্রষ্টব্য) প্রথমত দশজন সভ্য দ্বারা স্থাপন হয়। তদবধি সভ্যদিগের কর্ত্তৃক আমি সম্পাদকীয় কার্য্যে নিযুক্ত হইয়া যথাসাধ্য তৎকর্ম্ম নির্ব্বাহ করিয়া আসিতেছিলাম। পরে ১৭৬৫ শকে এই সভার অধীনে পাঠশালা স্থাপিত হইলে অধ্যক্ষদিগের দ্বারা ঐ পাঠশালার প্রথম শিক্ষকতার কর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া যথাশক্তি তাহার কর্ম্ম নিষ্পাদন করি। পরে ১৭৬৮ শকে পাঠশালা রহিত হওয়াতে অধ্যক্ষমহাশয়েরা আমাকে সভায় নিযুক্ত করিয়া সহকারী সম্পাদকের কর্ম্মের ভারার্পণ করাতে এপর্য্যন্ত তৎকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলাম। * * সভার আয়ের ন্যূনতা জন্য আমার নিয়মিত বেতন রহিত হইলেও, মানস, যে আমি সাধ্যমত সভার কর্ম্ম নির্ব্বাহ করিতে প্রবৃত্ত থাকি * * কিন্তু আমার এক্ষণে কলিকাতায় থাকিবার সামর্থ্য না থাকাতে সুতরাং তাহাতে অপারগ হইলাম। প্রার্থনা আমাকে সহকারী সম্পাদকের কর্ম্ম হইতে অবসর প্রদান করিতে অনুমতি হয়। ১৬ই জ্যৈষ্ঠ ১৭৭০ শক"।

সমাজ হইতে চলিয়া যাওয়ার পর তাঁহার বিশেষ পরিচয় পাই বর্দ্ধমানের মহারাজা মহাতাপচাঁদ কর্ত্তৃক প্রকাশিত মহাভারতের প্রথম অংশের অনুবাদকার্য্যে। ১৭৮২ শকে তিনি বর্দ্ধমান বিজয়রাজ-যন্ত্রে "জ্ঞানামৃত" নামে এক পুস্তক বাহির করেন। উহাতে 'পরমার্থসার' নামক সংস্কৃত গ্রন্থের মূল ও অনুবাদ আছে। উক্ত গ্রন্থের এক খণ্ড আমার নিকট আছে।

১৭৬৯ শকের বৈশাখ মাসের পত্রিকায় দেখিতে পাই যে, স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত রামগোপাল ঘোষ যে তিন বৎসরের জন্য তত্ত্ববোধিনী সভার অধ্যক্ষ ছিলেন, সে তিন বৎসর গত হওয়ায় ঐ শূন্য পদে আর একজন অধ্যক্ষ-নিয়োগ জন্য বিজ্ঞাপন আছে। পূর্ব্বে শ্যামাচরণ মুখোপাধ্যায় তত্ত্ববোধিনী সভার সহকারী সম্পাদক ছিলেন। তাঁহার পরিবর্ত্তে শ্যামাচরণ তত্ত্ববাগীশ যে সহকারী সম্পাদক নিযুক্ত হইলেন, তাহার উল্লেখ ১৭৬৯ শকের আষাঢ় মাসের বিজ্ঞাপনে দেখা যায়। উক্ত ১৭৬৯ শকের জ্যৈষ্ঠ মাসের পত্রিকার বিজ্ঞাপনে ইহাও দেখি যে ১৭৬৮ শকের নিয়ম-পত্রের প্রথমসংখ্যক নিয়মের নিম্নোক্তরূপ পরিবর্ত্তন হইয়াছে, "বেদান্ত প্রতিপাদ্য সত্য ধর্ম্ম এই বাক্য আছে, তাহার পরিবর্ত্তে ব্রাহ্মধর্ম্ম এই শব্দ হয়।" ঐ সময়ে ব্রাহ্মসমাজ-গৃহের তেতলা প্রস্তুত না হওয়ায় এবং দোতলায় সমাজ হইতে থাকায় ব্রাহ্মসমাজের নিম্নগৃহে অর্থাৎ একতলায় তত্ত্ববোধিনী সভা হইত।

বেদান্তবাগীশ মহাশয় জীবন ধরিয়া অক্লান্ত পরিশ্রমের সহিত ব্রাহ্মসমাজের অশেষ কল্যাণ সাধন করিয়া গিয়াছেন; এবং বিবিধ শাস্ত্রগ্রন্থ-প্রচারে ব্রাহ্মসমাজের মুখ উজ্জ্বল করিয়া গিয়াছেন। বেদান্তবাগীশ ১৭৯৭ শকের ১লা আশ্বিন তারিখে দেহত্যাগ করেন। মৃত্যুর সময় তাঁহার বয়ঃক্রম ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। বেদান্তবাগীশ ব্রাহ্মসমাজের কার্য্য সম্পন্ন করিতে করিতে আনন্দগিরি শ্রীধরস্বামী ও শঙ্করের টীকা ও নিজ অনুবাদসমন্বিত গীতা, পঞ্চদশী, বেদান্তসার, বৈয়াসিক অধিকরণমালা প্রভৃতি কয়েকখানি মূল্যবান পুস্তক অনুবাদসহ বাহির করেন এবং এসিয়াটিক সোসাইটি হইতে আশ্বলায়ন গৃহ্যসূত্র প্রমুখ কয়েকখানি গ্রন্থ সম্পাদন করেন। এতদ্ভিন্ন আদিব্রাহ্মসমাজসম্মত বিবাহের ধর্ম্মশাস্ত্রানুসারে বৈধতামূলক পুস্তিকায় তাঁহার প্রভূত গবেষণার পরিচয় প্রাপ্ত হওয়া যায়। তাঁহার মত সুপণ্ডিত তৎসময়ে অল্পই ছিল। অথচ বিনয় তাঁহার পাণ্ডিত্যকে অভিমানশূন্য রাখিয়াছিল। গীতায় তাঁহার সংস্করণ বোধ হয় বাঙ্গালা ভাষায় প্রথম সংস্করণ। তাঁহার অনুবাদসহ পঞ্চদশী অন্য স্থান হইতে পুনর্মুদ্রিত হইয়া বাহির হইতেছে এবং তৎকৃত অনুবাদ প্রামাণ্য বলিয়া সকলে স্বীকার করিতেছেন। এতদ্ভিন্ন আদি-ব্রহ্মসমাজের অনুষ্ঠানপদ্ধতি সঙ্কলনে তিনি মহর্ষিকে যে সাহায্যদান করিয়াছিলেন তাহার মূল্য নিতান্ত অল্প নহে। এতদ্ভিন্ন রাজা রামমোহন রায়ের সংস্কৃত ও বাঙ্গালা গ্রন্থাবলী রাজনারায়ণ বসুর সহিত প্রকাশ করিতে আরম্ভ করেন। উক্ত গ্রন্থ সঙ্কলনে ঈশানচন্দ্র বসুর যথেষ্ট সাহায্য ছিল। তাঁহার জন্মভূমি ২৪ পরগণার অন্তর্গত সোনারপুর রেল ষ্টেশনের সন্নিকট কোদালিয়া গ্রামে ছিল। তাঁহার পুত্র জ্ঞানচন্দ্র ভট্টাচার্য্য বি-এল কয়েক বৎসরের জন্য ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যাধ্যক্ষ ছিলেন।

প্রকৃতিরাজ্যে মানবের স্থান ও তাহার জীবনের পরিণাম।

(রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ বি-এল বিদ্যার্ণব)

মানবজীবনের গতির বিষয় নিবিষ্ট চিত্তে চিন্তা করিলে, কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে; যথা—

(১) মানবশিশু যেরূপ অসহায় অবস্থায় ভূমিষ্ট হয়, তদ্রূপ অসহায় আর কোন জীবকে দেখা যায় না। ভূমিষ্ট হওয়ার পর কয়েক বৎসর সমানে এই শিশুর জীবন ধারণ সম্পূর্ণরূপে অন্যের সাহায্যের অপেক্ষা করে। এই অপরের সাহায্যসাপেক্ষতা যতই নিম্নস্তরের দিকে যাওয়া যায় ততই হ্রাস হইতেছে দেখা যায়। কীট পতঙ্গ প্রভৃতি অনেক জীবের পক্ষে জনক-জননীর কোনরূপ সাহায্যই প্রয়োজন হয় না, কোন কোন জীবের পক্ষে জননীর

দর্শনও ঘটে না, দেখা হইলেও জননীকে চিনিবার উপায় থাকে না যেমন কচ্ছপ প্রভৃতি জন্তু। সাধারণত প্রসূত অণ্ড হইতে উৎপন্ন জীবদিগের মধ্যে এক পক্ষিজাতীয় জীব ভিন্ন প্রায় সকল জীব সম্বন্ধেই এই কথা খাটে। ইহারা ডিম্ব হইতে বাহির হইবার সময়ই জীবন ধারণের জন্য যাহা কিছু অঙ্গপ্রত্যঙ্গের প্রয়োজন সমুদয়ই কার্য্যোপযোগী পরিপক্কতা প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই সকল জীবের পক্ষে সন্তান-অর্থসূচক ইংরাজী "offspring" কথার সার্থকতা আছে বটে।

প্রাণী জগতে যতই উপরের দিকে উঠা যায়, ততই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুকে অধিকতর নিঃসহায় অবস্থায় দেখা যায়। বানরশিশু মাতৃগর্ভ হইতে নিঃসৃত হওয়া মাত্রই বৃক্ষশাখাকে দৃঢ় মুষ্টিতে আঁকড়িয়া ধরে; আর মানবশিশু সর্ব্বপ্রকার শক্তিবিহীন একটা মাংসপিণ্ড বই আর কিছুই থাকে না—জন্মের পর অধিকাংশ সময় নিদ্রিতাবস্থায় অতিবাহিত করে। এই নিদ্রাতে তাহার যে সময় কাটিয়া যায়, সেই সময়ের মধ্যে অপরাপর প্রাণী মাত্রই সর্ব্বতোভাবে আত্মরক্ষায় সমর্থ হইয়া যাহার যাহার চিহ্নিত পথে জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিতে থাকে।

(২) দেখা যায়, সকল প্রাণীই আত্মরক্ষার জন্য কোন-না-কোন বিশেষ যন্ত্র-সমন্বিত; একমাত্র মানবই এই বিষয়ে নিতান্ত নিঃসহায়, হস্তের নখ এবং দন্তপাটিই তাহার একমাত্র সম্বল, শারীরিক বলেও তাহার স্থান অনেক নিম্নে।

(৩) অঙ্গপ্রত্যঙ্গের গঠনে মানবের একটু বৈশিষ্ট্য রহিয়াছে। প্রাণীজগতে অপর কোন জীবে তাহা দেখা যায় না। তাহা এই;—মানবের হাতের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ এরূপ ভাবে গঠিত যে, ইহাকে অপর যে কোন অঙ্গুলিরই সম্মুখীন করিতে পারা যায়, অপর কোন জন্তুর পক্ষে তাহা সম্ভবপর নহে।

(৪) মানুষের বাক্‌শক্তি আছে অপর কোন প্রাণীর তাহা নাই।

এই সকল বিশিষ্টতা মানবজাতির জীবনগঠনে কি প্রকার প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা বুঝিতে হইলে মানস চক্ষে আদি মানবের জীবনযাত্রা-নির্ব্বাহ দেখিয়া লইতে হয়। উত্তরসুমেরু-সন্নিহিত তুষারমণ্ডিত দেশেই মানবের আদি নিবাসস্থান ছিল কিনা, তৎসম্বন্ধে মতদ্বৈধ থাকিলেও ইহা যে আমাদের বঙ্গভূমির ন্যায় নাতিশীতোষ্ণ শস্যশ্যামলা সমতল ভূমি ছিল না, সে বিষয়ে কাহারো কোন সন্দেহ নাই। আমাদের দেবতাদের নিবাসস্থানও তুহিনাবৃত হিমাদ্রি-শিখর-সমন্বিত প্রদেশ। ঐরূপ শীতপ্রধান কোন দেশই মানবের আদি নিবাসভূমি। আমরা কল্পনার চক্ষে যেন তেমন দেশে স্থাপিত একটী মানুষকে দেখিতেছি; মনে করিতে পারি, আমরা যখন প্রথম তাঁহাকে দেখিতে পাইলাম তখন চতুর্দ্দিক ঘন তুষারে সমাচ্ছন্ন হইয়া রহিয়াছে, আর তিনি পরম আরামে রৌদ্রের তাপে বসিয়া রহিয়াছেন। সম্মুখে আকাশের পরিধিকে বেষ্টন করিয়া তুষারমণ্ডিত অভ্রভেদী পর্ব্বত-শিখররাজি প্রাচীরের ন্যায় দণ্ডায়মান রহিয়াছে। পাদদেশ ঘন-সন্নিবিষ্ট শ্যামল বৃক্ষরাজি-সমাচ্ছন্ন, মধ্যবর্ত্তী অধিত্যকাপ্রদেশে, শুভ্র মেঘরাশি নিশ্চল নিস্তব্ধভাবে অবস্থান করত সাগরবক্ষের ভ্রম উৎপন্ন করিতেছে. চারিদিকে পরম শান্তিময় নীরব নিস্তব্ধতায় ভরপুর। প্রকৃতির এই রহস্যময় মায়াপুরীর মধ্যস্থানে উপবেশন করতঃ তিনি সৌন্দর্য্যরসে বিভোর হইয়া পড়িয়াছেন, শীতের তাড়না দেহকে আর বিনষ্ট করিতেছে না। তাঁহার কোনরূপ অঙ্গচালনা করিবার প্রবৃত্তি হইতেছে না। প্রকৃতিও দৃষ্টতঃ তাঁহাকে কোন কার্য্য করিতে উত্তেজিত করিতেছে না; কিন্তু প্রকৃত পক্ষে কি তাহাই? বিষয়টী নিবিষ্টচিত্তে ভাবিলে দেখা যাইবে তাঁহার পারিপার্শ্বিক যত কিছু সৃষ্টিবৈচিত্র্য সকলই কোন উদ্দেশ্যসাধন কল্পে তাঁহাকে যন্ত্ররূপে ব্যবহার করিবার জন্য আয়োজনে ব্যস্ত রহিয়াছে। তিনি ত এই শান্তিময় মায়াপুরীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যরস-পানে বিভোর হইয়া কোনরূপ অঙ্গচালনাই ক্লেশকর বিবেচনা করিতেছেন, কিন্তু প্রকৃতি তাঁহাকে স্থির থাকিতে দিতেছে কৈ? তাঁহার ইচ্ছা থাক আর নাই থাক, প্রকৃতি তাঁহাকে অবিশ্রান্ত কর্ম্মের দিকে টানিতেছে ও তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলি দ্বারা এক অপরূপ খেলা খেলিতেছে; উদ্দেশ্য তাঁহার শরীরকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলা। সৃষ্টিরূপ রঙ্গমঞ্চে তাঁহার জন্য অনেক কার্য্য অপেক্ষা করিতেছে, দেহ-মন বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ না হইলে তাহা সম্পন্ন হইতে পারিবে না। পারিপার্শ্বিক ঘটনাবলী তাঁহাকে এজন্য প্রস্তুত করিয়া তুলিতেছে। আমাদের স্থূল দৃষ্টিতে প্রকৃতি নিটল নিশ্চল ভাবে অবস্থান করিতেছে মনে হইলেও প্রকৃত পক্ষে কোন পদার্থ স্থির নহে। গতিই প্রকৃতিরাজ্যের নিয়ম। সূর্য্য পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম দিকে চলিয়াছে। শীত নিবারণ জন্য সূর্য্যতাপ প্রয়োজন। দেহকে রৌদ্রের মধ্যে স্থাপন করিতে হইলে সূর্য্যের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকেও স্থান হইতে স্থানান্তরে চলিতে হইবে। ইহা সহজ ব্যাপার নহে, প্রাণপণ দৌড়াইয়াও সূর্য্যের সঙ্গ রক্ষা করা সম্ভবপর হইবে না, রজনীর অন্ধকার তাঁহাকে আক্রমণ করিবেই। তাহার সঙ্গে সঙ্গে এক দিকে দারুণ শীতের সঙ্গে সংগ্রাম এবং অপর দিকে হিংস্র জন্তুদিগের আক্রমণ হইতে নিস্তারলাভের উপায় অবলম্বনের উপর তাঁহার জীবন নির্ভর করিবে। এই

উদ্দেশ্য সাধনকল্পে বাধ্য হইয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গসকল পরিচালনা করিতে হইবে। আবার মনে করা যাক যেন রৌদ্রে উপবেশন করিবার সময় তাঁহার উদর পূর্ণ ছিল। এই ভোজন-ব্যাপার যতই পরিতোষরূপে সম্পন্ন হউক না কেন, অনতিবিলম্বে উদরস্থ যজ্ঞকুণ্ডে তাহা ভস্মে পরিণত হইয়া জঠরাগ্নি প্রজ্জ্বলিত হইয়া তাঁহাকে ক্ষুৎপিপাসায় কাতর করিয়া তুলিবে এবং আহার্য্য ও পানীয়সংগ্রহের জন্য তাঁহাকে উত্তেজিত করিবে। হিংস্র জন্তুর আক্রমণ ও শীতের আতিশয্য হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য তাঁহাকে যথোপযুক্ত পর্ব্বতগুহা কিম্বা তদ্রূপ অপর কোন নিরাপদ স্থান খুঁজিয়া বাহির করিতে হইবে; আহার্য্য ও পানীয়লাভের উপায়ও করিতে হইবে; এই সকলই পরিশ্রমসাপেক্ষ্য। এই পরিশ্রম সুধু দেহাঙ্গ চালনা দ্বারা পরিসমাপ্ত নহে; ইহার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মস্তিষ্ক এবং মনের পরিচালনাও অবশ্যম্ভাবী হইবে; ফলে এই দাঁড়াইবে যে, যে ব্যক্তি প্রকৃতির এই স্নিগ্ধোজ্জ্বল শান্তভাবময়ী নিস্তব্ধতার মধ্যে আত্মবিসর্জ্জন-পূর্ব্বক তাহাকেই জীবনের চরম সুখ মনে করিয়া নিশ্চলভাবে বসিয়াছিল, এই প্রকৃতির তাড়নাই তাহাকে নানা প্রকার ঘাত-প্রতিঘাতের ভিতর দিয়া কার্য্য হইতে কার্য্যান্তরে প্রেরণ করিতেছে। উদ্দেশ্য, এই ছুটাছুটির মধ্য দিয়া তাহার দেহকে পূর্ণাবয়বসম্পন্ন ও বলিষ্ঠ করিয়া তুলা।

আর এক অবস্থায় তাঁহাকে পরিকল্পিত করা যাক্। তিনি যেন মধ্যাহ্ন-সূর্য্যের তীব্রতাপ-ক্লিষ্ট এবং ক্ষুধায় কাতর ও পিপাসায় কণ্ঠগতপ্রাণ হইয়া কোন বৃক্ষমূলে উপবেশন করিয়া রহিয়াছেন। বৃক্ষ রসাল ও সুমিষ্ট ফলসম্ভার তাহার মাথার উপর বিস্তার করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে, ডালে ডালে পাখীসকল ঐ ফলরস আস্বাদন পূর্ব্বক মনের আনন্দে কণ্ঠনাদে বনভূমিকে মুখরিত করিয়া তুলিতেছে, তিনি কিন্তু নিজের ক্ষুধানিবৃত্তির জন্য একটী ফলও করায়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। অদূরে গিরিনদী কল-কলনাদে তাঁহার পিপাসাকে শতগুণ উদ্দীপিত করিয়া ছুটিয়াছে। তীরভূমি ঘন-সন্নিবিষ্ট কণ্টকসমাচ্ছন্ন এক অলঙ্ঘনীয় প্রাচীরের ন্যায় তাঁহার গতিরোধ করিয়া দণ্ডায়মান রহিয়াছে। তৃষ্ণা ও জঠরানল উভয়ই নিবারণের উপকরণ চক্ষুর সম্মুখে উপস্থিত রহিয়াছে, কিন্তু কোনটাকে করায়ত্ত করিতে পারিতেছেন না। এরূপ অবস্থায় পাখীর সৌভাগ্য-সম্পদের সঙ্গে নিজের ক্লেশময় জীবনের তুলনায় বিষণ্ণ ও ম্রিয়মাণ হওয়াই তো স্বাভাবিক। এই যখন মনের অবস্থা, মনে করা যাক, যেন হঠাৎ এক বিষধর সর্প তাঁহাকে দংশন করিবার উপক্রম করিয়াছে। পালাইয়া আত্মরক্ষা করিবার সময় নাই। পালাইবার কোন চেষ্টাও দেখা গেল না, কিন্তু অকস্মাৎ সম্মুখে সর্পের মৃতদেহ পড়িয়া রহিয়াছে দেখিলেন; আরো দেখিলেন, তাঁহার হস্তের দৃঢ়মুষ্টির মধ্যে বৃক্ষের একটি ছিন্ন শাখা রহিয়াছে। ঐ শাখার আঘাতে সর্পের প্রাণবিয়োগ ঘটিয়াছে। কি করিয়া যে এরূপ ঘটিয়াছে তাহা তিনি নিজেই বুঝিতে পারিলেন না, বুঝিয়া কার্য্য করিবার সময়ও ছিল না। পলক মধ্যে বৃক্ষের শাখা গ্রহণ ও তদ্দ্বারা সর্পের নিধনকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে। তাঁহার মানসিক শক্তি আত্মরক্ষা পরিকল্পে হস্তকে নিয়োজিত করিয়া একার্য্য নিষ্পন্ন করিয়াছে। ঘটনাটি তাঁহার নিকট বড়ই বিস্ময়কর। আমরা দেখিয়াছি, প্রকৃতি কিরূপ ফিকির করিয়া তাঁহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গগুলিকে বলিষ্ঠ করিয়া তুলিয়াছে। শত্রুর সম্মুখীন হইবার জন্য দন্তপাটি নখ ও বদ্ধমুষ্টিই সম্বল বলিয়া এতদিন তাঁহার জানা ছিল; এখন দেখিতে পাইলেন সামান্য একটা বৃক্ষশাখার সাহায্যে এতবড় ভীষণ শত্রু কত সহজে তাঁহার হস্তে নিধনপ্রাপ্ত হইল। এই আকস্মিক ঘটনা হইতে এক অভিনব রাজ্যের দ্বার তাঁহার নিকট উদ্ঘাটিত হইয়া গেল। আত্মশক্তি যাহা এতকাল অঘোর নিদ্রায় অচেতন ছিল, তাহা জাগ্রত হইয়া মানবের অন্তরে নিজের সিংহাসন স্থাপন করিল।

বাহিরের স্থূল দৃষ্টিতে হয়ত ঘটনাটি সামান্য দেখাইতে পারে, কিন্তু ইহার অভ্যন্তরে যে মহাশক্তিসম্পন্ন বিপ্লবের বীজ রহিয়াছে তাহা ধারণার অতীত। এই সামান্য বৃক্ষশাখাটি ক্রমে হস্তের যষ্টিতে পরিণত হইয়া প্রাণীজগতে যে বিপ্লব উপস্থিত করিয়াছে তাহার তুলনায় জগতে আজ পর্য্যন্ত যত সামরিক বিম্বা রাজনৈতিক বিপ্লব ঘটিয়াছে, সকলই অতি তুচ্ছ। হস্ত শিক্ষা করিয়াছে; পারিপার্শ্বিক শক্তি কিরূপে আপনার কার্য্যে নিয়োজিত হইতে পারে। যে অচিন্তনীয় আকস্মিক ঘটনামূলে বৃক্ষশাখা সর্পের বিনাশ সাধনে নিয়োজিত হইয়াছিল, সেই শাখার সাহায্যে বৃক্ষের উচ্চতম শিখরপ্রদেশে অবস্থিত ফলকে আহরণপূর্ব্বক তাঁহার ক্ষুধার নিবৃত্তি হইতেছে; এই শাখারই সাহায্যে কণ্টকসমাকীর্ণ অরণ্যগর্ভে নিজের পথ বাহির করিয়া নদীগর্ভ হইতে জল আহরণ পূর্ব্বক পিপাসার তাড়না হইতে নিজেকে রক্ষা করিতে সমর্থ হইতেছেন। এতকাল জীবনসংগ্রামে শত্রুকে আক্রমণ করিবার, কিম্বা তাহার আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিবার তাঁহার কোন অস্ত্র ছিল না, সুতরাং এই সংগ্রামে তাঁহার স্থান অতিশয় নীচে ছিল; কিন্তু যেদিন প্রাকৃতিক শক্তিকে নিজের কার্য্যে নিয়োগ করিতে শিক্ষা করিয়াছেন, সেই দিন হইতে তাঁহার গতি উন্নতির দিকে দ্রুতবেগে ছুটিয়াছে। বৃক্ষশাখা বা বংশ-

যষ্টিখণ্ডের অগ্রভাগ সুতীক্ষ্ণ আকার ধারণ করিয়াছে এবং তাহার সাহায্যে ভীমদর্শন ভল্লুক প্রভৃতি বিশাল-দেহ জন্তুদিগকে বিনাশ করতঃ একদিকে যেমন আহার্য্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হইতেছেন, তেমনি আবার তাহার দীর্ঘ ও কোমল লোমাচ্ছাদিত চামড়াকে অঙ্গাচ্ছাদনরূপে ব্যবহার করিয়া শীতের আক্রমণ হইতে নিজেকে রক্ষা করিতেছেন। মানবজীবনের উন্নতির পথে এই আবিষ্কার এক বিশেষ বিস্ময়কর ঘটনা। রজনীতে পর্ব্বতগুহায় আশ্রয় ভিন্ন এবং দিবাভাগে সূর্য্যের তাপ ব্যতীত শীত নিবারণের অন্য উপায় ছিল না, সুতরাং অবস্থার তাড়না তাহার জীবনপ্রবাহকে এক ক্ষুদ্র ও ভয়সঙ্কুল অনিশ্চিত সীমার মধ্যে আবদ্ধ রাখিত। শীতজয়ের উপায় আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে ঐ প্রবাহ বেগে চারি দিকেই প্রসারতা লাভ করিয়াছে। যে উপলখণ্ড ও বংশযষ্টি জীবনসংগ্রামের প্রাক্কালে মানবের জীবনরক্ষার প্রধান সহায় ছিল, তাহারাই বর্ত্তমান কালের জাতিদিগের আবিষ্কৃত কামান বন্দুক ইত্যাদিতে ব্যবহৃত গোলা এবং বর্শা শরফলকাদির আদি পুরুষ।

প্রকৃতি নানা প্রকার তাড়না দ্বারা মানবকে কার্য্যে প্রবৃত্ত করিয়া তাহার দেহ ও মনকে বলিষ্ঠ ও কর্ম্মঠ না করিলে জীবনসংগ্রামে তাহার একেবারেই স্থান থাকিত না। নিজের পদে অধিষ্ঠিত থাকিবার জন্য প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রামের প্রয়োজন না হইলে মানবের অবস্থা কিরূপ হইতে পারে তাহার কথঞ্চিত আভাস দক্ষিণ-প্রশান্তমহাসাগরের মধ্যবর্ত্তী টানা, (Tana) সান্টো (Santo) এমব্রাম (Ambrym) অররা (Aurara) প্রভৃতি দ্বীপনিবাসী আদিম অধিবাসীদিগের জীবন হইতে জানা যায়। দেশগুলি নাতিশীতোষ্ণ, সূর্য্যের তাপ কিম্বা শীত উভয়ই তীব্রতাশূন্য, ইহাদিগের আক্রমণ হইতে দেহকে রক্ষা করিবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন আবশ্যক হয় না। কোনরূপ হিংস্র জন্তুর উৎপাত নাই। চারিদিক বিপুল জলরাশি দ্বারা পরিবেষ্টিত থাকায় বাহির হইতেও কোন শত্রুর আক্রমণের আশঙ্কা নাই। ভূমি অতিশয় উর্ব্বর—বৎসরের সব সময়ই কোন-না কোন শস্য অপর্য্যাপ্ত পরিমাণে জন্মিয়া থাকে, অরণ্যভূমি নানা প্রকার ফলবান্ বৃক্ষে পূর্ণ। আহার্য্যসংগ্রহের জন্য অধিবাসীদিগের কোনরূপ চেষ্টার প্রয়োজন হয় না। তাহাদিগের মধ্যে কোনরূপ অধ্যবসায়ের চিহ্ন মাত্রও পরিলক্ষিত হয় না। তাহারা কোনরূপ শস্য বপন করে না। বাস করিবার কোনরূপ গৃহও নির্ম্মাণ করে না। বৃক্ষতলই আশ্রয়। দ্বীপগুলি Lotus Eaters-দের দেশের কথা স্মরণ করাইয়া দেয়। প্রকৃতির বদান্যতা ঐ সকল দেশের অধিবাসীদিগের মধ্যে কি শারীরিক, কি মানসিক কোনরূপ শক্তির বিকাশের সুযোগ প্রদান করে নাই। ইহাদিগের বর্ত্তমান অবস্থা কোনরূপ অধোগতির পরিচায়ক নহে। জীবনধারণের জন্য যাহা কিছু প্রয়োজন সকলই অনায়াসলভ্য হওয়ায় অন্তর্নিহিত শক্তি ও বৃত্তিনিচয় তাহাদিগের মধ্যে উদ্বুদ্ধ হইতে পারে না। বস্তুতই প্রতিকূল অবস্থার সঙ্গে অবিশ্রান্ত সংগ্রাম ব্যতীত মানুষের পক্ষে শক্তিসঞ্চয় সম্ভবপর নহে।

গীতায় এই তত্ত্বটী বড়ই সুন্দররূপে ব্যক্ত হইয়াছে:—

"নহি কশ্চিৎ ক্ষণমপি জাতু তিষ্ঠত্যকর্ম্মকৃৎ।
কার্য্যতে হ্যবশঃ কর্ম্ম সর্ব্বঃ প্রকৃতিজৈর্গুণৈঃ॥"

কেহই কখন কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া ক্ষণমাত্রও অবস্থান করিতে পারে না; ইচ্ছা না করিলেও প্রাকৃতিক গুণসমুদয় সকলকে কর্ম্মে প্রবৃত্ত করে।

শক্তিসঞ্চয়ের জন্য এই যে সকল পরম রহস্যময় উপায়ের উল্লেখ করা গেল তাহা মানুষকে জীবনসংগ্রামে সমর্থ করিবার জন্য। প্রকৃতপক্ষে অপর সব জন্তু হইতে ইহাতে তাহার কোন পার্থক্য নাই। সে মাত্র পশুজগতে সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ পশুর পদে উন্নীত হইয়াছে। নিজের বংশরক্ষার্থে সে প্রাণপাত করে, অসভ্যদের মধ্যে ইহা আমরা দেখি; ইতর জন্তুর মধ্যেও এই গুণের অভাব নাই। মানুষ সংঘবদ্ধ হইয়া জীবন যাপন করে। অসভ্যদের মধ্যে পরস্পরের সংঘর্ষ হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহা বিশেষ প্রয়োজন। ইতর জন্তুর মধ্যেও এরূপ সংঘবদ্ধভাবে জীবনযাপনের দৃষ্টান্ত বিরল নহে। তথাপি মানুষের মধ্যে একটা বিশেষত্ব আছে, যাহা অপর কোন প্রাণীতে লক্ষিত হয় না, তাহা হইতেছে অপরের কল্যাণার্থ নিজের স্বার্থত্যাগ। এই নিজ হইতে অপরে গমনেচ্ছা মানবচরিত্রের বিশেষত্ব; ইহাই নৈতিক জীবনের মূল।

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

[শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর]

আড়ানা—একতালা।

সুন্দর প্রকাশ হে প্রিয় তব
সুন্দর তোমার হাতের লিখন।
দেখি' দেখি' মোর প্রাণ
আর ফিরিতে চাহে না।
জাগিল আমার প্রাণের মাঝার
কত নব গান কত নব তান—
দিনু অর্ঘ্য তোমার চরণেতে,
ফিরায়ো না।

ঝিঁঝিট—চৌতাল।

তোমারে প্রাণ চাহে দিবস রাতে
প্রীতিনয়নে চাহ—কর মোর মোহিত মন।
অরুণ তপনে তোমার কান্তি,
অন্তরে তোমার ভাতি
হেরি' দেব! নত তব পদে হে প্রেমঘন!
না যদি তোমারে হেরি
কত যে দুঃখজ্বালা উঠে পরাণে—
কত আতঙ্ক জাগে হৃদয়ে—বলিব আর কারে।
লোকে অনন্ত তুমি হে বন্ধু!
রাখ হৃদয়ে অভয় চরণ—
সকল যাবে দুখ ধরি' ও চরণতরী॥

খাম্বাজ—যৎ।

সকলি সঁপিনু তোমারি পদে প্রাণের প্রাণ!
আশীষ বরষিয়া
শীতল করি' হিয়া
আমারে বাঁচাও হে—
তোমারে নমি প্রাণের প্রাণ॥

রামপ্রসাদী।

(মন) দেখরে চেয়ে কে জেগে আছে—
গগন ভুবন চিত্তকমল—সকল ঠেঁয়ে সে যে আছে।
ঘুমিয়ে যবে রইবি সুখে
ঘরের ভিতর রইবি ঢুকে
ভুলনা করে জানিস্ রে ঠিক—
মা তোর সদাই গায়ের কাছে।
সুখেরি বাণ আসবে যবে
দুখের আঘাত লাগবে যবে
চোখ খুলে তুই দেখ্‌লে মায়ের
দেখবি রে হাত সবার মাঝে।
মিছা ভয় তুই করিসনেকো
তাঁ হতে দূর ফিরিসনেকো—
শোন্ ওরে তুই প্রাণের মাঝে
ঐ বিজয়ডঙ্কা তাঁরি বাজে॥

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

খাম্বাজ—একতালা।

(১)

আজি প্রাণ আকুলিয়ে বাঁশরী বাজায় কে।
বাঁশরী বাজায় কে, বাঁশরী বাজায় কে।
হয়েছে মম পরাণ ভ'রে সাগর যেন উছসি চলে;
রইতে নারি ঘরের কোণে—
মোহিয়া মন বাজায় কে।

(২)

আজি নাম তব লয়ে পরাণ জাগিল রে।
পরাণ জাগিল রে, পরাণ জাগিল রে।
সব মোর তব চরণে ধরি' রহিব তোমা' শরণ করি';
ভয় ডর রহিবে নাহি—
প্রেম সাগরে ভাসিব হে।

(৩)

আজি কার ডাক শুনি পরাণ মাতিল রে।
পরাণ মাতিল রে, পরাণ মাতিল রে।
হরি' নিল সব আমার বলি' যতেক ছিল মরম ঘিরি';
প্রেমধারে ভাসিয়া চলি—
বাঁধি' আমারে রাখিবে কে।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—শ্রীবাণীদেবী।

	২´			৩			০			১		
	সা	-া	সা।	গা	-া	মগা।	মা	-া	মা।	পা	-া	ধা I
(১)	আ	০	জি	প্রা	০	ণ	আ	০	কু	লি	০	য়ে
(২)	আ	০	জি	না	০	ম	ত	০	ব	ল	০	য়ে
(৩)	আ	০	জি	কা	০	র	ডা	০	ক	শু	০	নি

২´ ৩ ০ ১
[পধা ধর্সা ণা]
I র্সা -া ণা । ধা -া মা । পা ধপা মা । গা -া -া I
(১) বা ০ শ রী ০ বা জা ০০ র্ কে ০ ০
(২) প ০ রা ণ ০ জা গি ০০ ল রে ০ ০
(৩) প ০ রা ণ ০ মা তি ০০ ল রে ০ ০

০ ১
[নর্সা নর্সা না । র্সা পা ধা]
২´ ৩ জা০ ০০ র্ কে ০ ০
I না -া না । না -া না । র্সা -া -া । পা -া ধা I
(১) বা ০ শ রী ০ বা জা ০ ০ ০ র্ কে
(২) প ০ রা ণ ০ জা গি ০ ০ ল ০ রে
(৩) প ০ রা ণ ০ মা তি ০ ০ ল ০ রে

২´ ৩ ০
[ণা র্রা র্সা । ণা ধা পা । গা মগপা মা] ১
I র্সা -া ণা । ধা -া মা । পা ধা মা । গা -া মগরা II
(১) বা ০ শ রী ০ বা জা ০ র্ কে ০ ০০
(২) প ০ রা ণ ০ জা গি ০ ল রে ০ ০০
(৩) প ০ রা ণ ০ মা তি ০ ল রে ০ ০০

২´ ৩ ০ ১
{ মা পা না । না না না । র্সা র্সা র্সা । না র্রর্সর্সা -া I
(১) হ র ষে তে ম ম প রা ণ ভ রে০০ ০
(২) স ব বো র ড ব চ র ণে ধ রি'০০ ০
(৩) হ রি নি দ স ব আ মা র ব লি০০ ০

২´ ৩ ০ ১
I না না না । -া র্সা র্সা । র্সা র্রা ণা । ধা পা -া I }
(১) সা গ র ০ যে ন উ চ্ছ সি চ লে ০
(২) র হি ব ০ তো মা' শ র ণ ক রি' ০
(৩) ম তে র ০ ছি ল ম র ম ধি রি ০

২´ ৩ ০ ১
I ধা -া পা । মা গরা গা । মা -া মা । মা পা ধা I
(১) র ই তে মা ০০ রি' ঘ ০ রে র কো ণে
(২) ভ ০ য় ড ০০ র র ০ হি বে না হি
(৩) প্রে ০ ম ধা ০০ রে ভা ০ সি যা চ লি

২´ ৩ ০ ১
I র্সা র্সা র্সা । ণা ধা । * মা পা ধপা মা গা : র : IIII
(১) মো হি রা ম ন বা জা ০০ র্ কে ০
(২) প্রে ম সা গ রে ভা সি ০০ ব হে ০
(৩) বাঁ ধি আ মা রে রা খি ০০ বে কে ০

* দ্রষ্টব্য—"।" বিশ্রাম-নির্দেশক।

তর্পণ-তত্ত্ব।

(শ্রীঋতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

দক্ষিণদিক।

শৈশব হইতেই হিন্দুরা দক্ষিণদিক সম্বন্ধে একটা ভয় পোষণ করিয়া আসিতেছেন। শৈশব হইতে শুনিয়া আসিতেছি "দক্ষিণে যমের দুয়ার";—হিন্দু জাতির মধ্যে এই বিশ্বাস অনেকটা বদ্ধমূল হইয়া আছে। তাহাদের বিশ্বাস যে ভীষণ যমরাজ বুঝি দক্ষিণদিকে বাস করেন, হয় ত বা মৃত্যুর পরে সেইখানে গিয়া যমযন্ত্রণা ভুগিতে হইবে। কিন্তু এই সকল বিশ্বাস ও প্রবাদের মূল কোথায়? যেমন সমুদ্রগামী নদীর উৎপত্তি সমুচ্চ পর্ব্বতে, এই সকল বিশ্বাসেরও মূল সেইরূপ শাস্ত্রের সমুচ্চ শিখর; কিন্তু শাস্ত্রের উচ্চস্থানে তাহার উৎপত্তি হইলে কি হয়, ক্রমশঃই যেমন নিম্নে নামিয়াছে অমনি অন্ধ বিশ্বাস ও কুসংস্কার আচ্ছন্ন করিয়া স্বচ্ছ জ্ঞানস্রোতকে পঙ্কিল করিয়া তুলিয়াছে;—ইহার অন্তর্নিহিত সত্যের প্রতি কাহারো দৃষ্টি নাই।

যে দক্ষিণদিক মলয় পবনের জন্য সকলের প্রিয় তাহা যমের দুয়ার হইতে গেল কেন? পিতৃলোকের সহিত দক্ষিণদিকের ঘনিষ্ট সম্বন্ধই ইহার কারণ; যমরাজকে পিতৃপতি বলে।

পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ।

"পিতৃদিগের স্থান আকাশ ও দক্ষিণদিক"। এই শাস্ত্রবাক্যে দক্ষিণদিক সম্বন্ধীয় সকল কথাই বীজরূপে নিহিত আছে।

এই পিতৃস্থানের কথা বলিতে গিয়া শাস্ত্রকারেরা যেমন পিতৃলোক অর্থে চন্দ্রলোক ধরিয়াছেন, সেইরূপ অন্যান্য অর্থেও ব্যবহৃত করিয়াছেন। পূর্ব্বে 'চন্দ্র ও পিতৃলোক' প্রবন্ধে* বলিয়া আসিয়াছি যে অন্নপতি ও শ্মশানলোক হিসাবে চন্দ্রলোকের অন্যতম নাম পিতৃলোক, ইহা ব্যতীত জনক বা জন্মদাতাও পিতৃলোক এবং দয়া-দাক্ষিণ্য প্রভৃতি গুণসম্পন্ন লোকেরাও পিতৃলোক; আবার একদিকে বাসভূমি গৃহ যেমন পিতৃগেহ বা পিতৃস্থান, সেইরূপ পিতৃস্থান বলিতে শ্মশানকেও বুঝায়। সকল দিক দিয়াই দেখাইব যে পিতৃলোকের স্থান দক্ষিণে।

পাঠক নিরীক্ষণ করিলে দেখিতে পাইবেন যে চন্দ্র অধিকাংশ সময়ে আকাশের দক্ষিণে অবস্থিতি করে, দক্ষিণে হেলিয়াই যেন ইহা পৃথিবীকে প্রদক্ষিণ করে। চন্দ্রের গতি যেন অনেকটা দক্ষিণপ্রবণ; কিন্তু দক্ষিণদিকের সহিত চন্দ্রের সম্বন্ধ এখানেই শেষ হইল না। শরত ও হেমন্ত প্রভৃতি কালে সূর্য্য যখন দক্ষিণায়নে ফিরিয়া থাকেন তখন শাস্ত্রমতে ওষধিপতি সোমের আধিপত্য বিস্তৃত হয়। মহর্ষি সুশ্রুত বলিতেছেন,—

তয়োর্দক্ষিণং বর্ষাশরদ্ধেমন্তা-
স্তেষু ভগবানাপ্যায়তে সোমঃ॥

"বর্ষা, শরত ও হেমন্ত এই তিন কাল দক্ষিণায়নকাল; এই কালে ভগবান চন্দ্র আপ্যায়িত হয়েন।" বর্ষা শরত ও হেমন্তের প্রাদুর্ভাব কখন হয় তাহাও পরে বলিয়াছেন—"ভাদ্রপদাশ্বযুজৌ বর্ষা, কার্ত্তিকমার্গশীর্ষৌ শরৎ, পৌষমাঘৌ হেমন্তঃ।" ভাদ্র ও আশ্বিন (আমাদিগের শরৎকাল) বর্ষাকাল, কার্ত্তিক ও অগ্রহায়ণ (আমাদিগের হেমন্ত) শরৎ এবং পৌষ ও মাঘ (আমাদিগের শীত) হেমন্ত। তবেই দেখা যাইতেছে, ভাদ্র অবধি মাঘ মাস পর্য্যন্ত প্রায় দক্ষিণায়ন কাল এবং দক্ষিণায়ন কালের কয়মাস হিন্দুমতে চন্দ্রেরই ভোগকাল। দক্ষিণায়ন চন্দ্রলোকের ভোগকাল, এই হিসাবেও চন্দ্রলোকরূপ পিতৃলোকের স্থান দক্ষিণদিক। আমরা এবিষয়ে ভবিষ্যতে সবিশেষ আলোচনা করিব।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি পিতৃস্থান বলিতে যেমন এক অর্থে বাসভূমি গৃহ, সেইরূপ শ্মশানকেও বুঝায়,—

পিতৃণাং স্থানমাকাশং দক্ষিণা দিক্ তথৈব চ।

"আকাশ ও দক্ষিণদিক পিতৃদিগের স্থান অর্থাৎ শ্মশান"। এই শাস্ত্রবাক্যেরই অনুবর্ত্তী হইয়া আমরা বলিতেছি যে বাস্তবিকই দক্ষিণদিক সর্ব্বতোভাবে শ্মশানদিক। ইহা যেমন শাস্ত্রসম্মত বাক্য সেইরূপ জ্ঞানসম্মত বাক্যও বটে। বহুকাল পূর্ব্বে শাস্ত্রকার ঋষিরা যাহা বুঝিয়াছিলেন বর্ত্তমান কালের বিজ্ঞানবিৎ পণ্ডিতদিগেরও কথায় তাহারই প্রতিধ্বনি পাই। পৃথিবীর দক্ষিণদিক কি জানি কেন লোকালয়শূন্য শ্মশান। পৃথিবীর উত্তরদিকে উত্তরমেরুর নিকট পর্য্যন্ত লোকালয়ের আবাসভূমি, কিন্তু দক্ষিণদিকে কেবল অনন্ত জলরাশি ও দক্ষিণ-সমুদ্রপারে জনশূন্য শ্মশানসদৃশ ভূখণ্ড। কেবল পৃথিবীর দক্ষিণাংশ নয় আকাশেরও দক্ষিণাংশ শ্মশানবৎ ভীষণ। বর্ত্তমানকালে দক্ষিণসমুদ্রযাত্রী নাবিকেরা যে খণ্ড খণ্ড অঙ্গার-গহ্বরের ন্যায় কৃষ্ণবর্ণের আকাশে দক্ষিণদিগ্বিভাগ ক্ষতবিক্ষত দেখিয়া ভীতনেত্রে চাহিয়া থাকে, সেগুলি আর কিছু নয়, ইহারা দক্ষিণাকাশের লোকশূন্যতা বা শ্মশানভাবের পরিচায়ক। বর্ত্তমানকালে নাবিকেরা দক্ষিণদিকস্থ কাল কাল খণ্ডাকাশগুলিকে রূপকোক্তিতে কয়লার থলিয়া (Coal sacks) নামে অভিহিত করে। পৃথিবীর দক্ষিণ যেমন লোকশূন্য, আশ্চর্য্য এই যে দক্ষিণাকাশও সেইরূপ লোকশূন্য শ্মশানসদৃশ। আকাশের লোক কাহারা, না গ্রহ-তারকারা। দক্ষিণাকাশ কাল কাল খণ্ডে ক্ষত-বিক্ষত হইবার কারণ আধুনিক জ্যোতি-

* গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার তত্ত্ববোধিনী দ্রষ্টব্য।

যাঁরা বলেন ঐ সকল স্থান অতি দূর দূর পর্য্যন্ত গ্রহ-নক্ষত্র প্রভৃতি লোকশূন্য।* প্রসিদ্ধ পর্য্যটক বৈজ্ঞানিক-শ্রেষ্ঠ মহোদয় হাম্বোল্ড বলেন, They seem to be really holes by means of which our vision pierces into the remotest spaces of the universe অর্থাৎ "এই কাল কাল খণ্ডাকাশগুলা বাস্তবিকই আকাশের গহ্বরস্বরূপ, যাহার মধ্য দিয়া আমাদের দৃষ্টি বিশ্বাকাশের দূর হইতেও সুদূরে যাইয়া থাকে।" অতএব দেখা যাইতেছে যে, যদি গ্রহনক্ষত্র প্রভৃতিকে আকাশের লোক বলিয়া ধরা যায়, এবং বাস্তবিকই উহারা গ্রহলোক ও নক্ষত্রলোক বলিয়া অভিহিত হয়, তাহা হইলে আমরা বলিতে পারি না কি যে দক্ষিণাকাশ অনেকটা লোকালয়শূন্য শ্মশানবৎ? শাস্ত্রকারেরা লোক-শূন্যতাকে এমনি ভীতিচক্ষে দেখিয়াছেন যে বাসভূমি গৃহও সন্তানসন্ততি দ্বারা পরিবৃত না হইলে, প্রজাশূন্য হইলে সেই গৃহকেও শ্মশানের ন্যায় বলিয়া গিয়াছেন।

'যন্ন বালৈঃ পরিবৃতং শ্মশানমিব তদ্‌গৃহং।'

দক্ষিণদিকের খণ্ডাকাশগুলা অন্ধকারকৃষ্ণ হওয়ায় পিতৃ-স্থান বা যমপুরী বলিবার আরও বিশেষ সহায়তা করিয়াছে। যমুনার জল কালো বলিয়াই যমুনা হিন্দুদিগের নিকট যমভগ্নী। রাত্রি কৃষ্ণ অন্ধকারময় বলিয়া যমশব্দ-প্রসূত "ত্রিযামা" ও "যামিনী" রাত্রিরই নাম। ইহা শুদ্ধ আমাদের দেশে নয় প্রায় সর্ব্বদেশে ইহার প্রভাব লক্ষিত হয়। গ্রীসীয় পুরাণেও দেখা যায় যমদেব প্লুটোকে কাল গরু বলি দেওয়া হইত। বর্ত্তমানকালে পাশ্চাত্যেরাও মৃত্যুচিহ্নস্বরূপ কৃষ্ণবসন পরিয়া থাকেন।

উত্তর ও দক্ষিণদিকের মধ্যে যে বিপরীত ভাব বিদ্যমান তাহা চিরকাল মানবের মনকে স্তম্ভিত করিয়াছে। বৈদিক কাল হইতে বর্ত্তমানকাল পর্য্যন্ত মানব এই পার্থক্য অনুভব না করিয়া থাকিতে পারে নাই। "To the dwellers in Australia or New Zealand, or South America, or the Cape Colony, the heaven has an unwonted aspect, as well as the earth a different vegetation." "কি অষ্ট্রেলিয়া, কি নিউ জিল্যাণ্ড কি দক্ষিণ আমেরিকা বা কেপকলনি পৃথিবীর দক্ষিণে সকল স্থানেই আকাশের এক অপরিচিত নূতন দৃশ্য এবং ভূমিতলের এক অভিনব (উত্তর হইতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন) উদ্ভিদরাজ্য দেখা যায়।" পণ্ডিত হাম্বোল্ডও উত্তরবিভাগ হইতে দক্ষিণে যাত্রাকালে এক অভূতপূর্ব্ব আতঙ্ক মনের মধ্যে অনুভব করিয়া উত্তরাকাশ হইতে দক্ষিণাকাশ যে সম্পূর্ণ অভিনব সৃষ্টি তাহা তিনি লিখিয়া গিয়াছেন। দক্ষিণ যাত্রাকালে কোন ইংরাজপর্য্যটকও ঠিক এই ভাবই ব্যক্ত করিয়া বলিয়াছেন যে "আমি পরিষ্কার রাত্রে জাহাজের উপর বেড়াইতেছি, ক্রমশঃ আমার সমক্ষে উত্তরদিকের দ্যুলোক প্রত্যক্ষরূপে পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল এবং আমার মনে এক অভূতপূর্ব্ব শক্তিতে এই ভাব জাগিতে লাগিল যে আমি গৃহ হইতে দূরে—বহু দূরে। যে সকল গ্রহ-তারকা আমি বাল্যকালে ও যৌবনে সানন্দে ও কৌতুকনেত্রে দেখিয়া আসিয়াছি, তৎসমুদয় অদৃশ্য হইয়া গেল এবং দক্ষিণের অপরিচিত নূতন আকাশ আমার মাথার উপরে দেখা দিল।"

ভ্রমণকারী পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা দক্ষিণাকাশের সম্পূর্ণ অপরিচিত দৃশ্য দেখিয়া যেমন ভীত অন্তঃকরণে বর্ণনা করিয়াছেন, আর্য্যমনীষিগণও সেইরূপ দক্ষিণদিকের শ্মশানবৎ ভীষণতা উপলব্ধি করিয়া পিতৃস্থান নাম না দিয়া থাকিতে পারেন নাই।*

মৃত্যু।

(শ্রীহেমেন্দ্রবিজয় সেন বি-এ)

সকল দেশে, সকল কালে, সকল জাতি মৃত্যুভয়ে ভীত। আবার এমন দেশ নাই, এমন জাতি ভূমণ্ডলে বিচরণ করে না, যাহাদের মধ্যে মৃত্যুর পর কোনরূপ সুখময় কল্পনার বিকাশ নাই। কিন্তু সমগ্র বিশ্ব জীবন অপেক্ষাও মৃত্যুকে ভীতিপ্রদরূপে ফুটাইয়া তুলে; এবং মৃত্যুরহস্যের অজ্ঞাততত্ত্ব নির্ণয়ে ব্যস্ত হয়। এই মৃত্যুভয়ে ভীত পাশ্চাত্যের অতুলনীয় মনীষী মহাকবি সেক্সপীয়র লিখিয়াছেন :—

"—That undiscovered country
from whose bourne no traveller returns."

অজ্ঞাত যে দেশ
যার গর্ভ হ'তে কভু ফেরেনি পথিক।

এই মৃত্যুরাজ্যের অজ্ঞাত ভয়েভীত Grey গাহিয়াছেন—

"Who a prey to dumb forgetfulness
This pleasing anxious being ever resigned
Nor cast one longing lingering look behind?"

অনন্ত বিস্মৃতিমগ্ন মানব যখন

---

* According to Astronomers, these patches are due to the sky being at these parts to a great extent without stars. The Universe.

* পুরা।

ছেড়ে যায় চিরতরে সুখময় এই নরদেহ
বিমণ্ডিত সুখসাধ-স্নেহ;
সুদীর্ঘ ঔৎসুক্য ভরে—কে তখন করে না ঈক্ষণ?

এই মৃত্যুভয়ে ভীত মানবের প্রাণে সাহসের সঞ্চার করিবার নিমিত্ত উপনিষদ্ গম্ভীরস্বরে কহিয়াছেন:—

"তমেব বিদিত্বাতিমৃত্যুমেতি
নান্যঃ পন্থাঃ বিদ্যতেঽয়নায়।"

জানলে তাঁরে দূর হয়ে যায় মৃত্যুপথের শঙ্কা-ভয়;
মুক্তিপুরীর এই যে দ্বার—অন্য কোন পন্থা নয়।

ভারতের অদ্বিতীয় দার্শনিক শ্রীমৎশঙ্করাচার্য্য মৃত্যু-ভয়ে ভীত মানবের প্রাণে সাহসের আলোক-দীপ্তি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করিয়াছেন, উদাত্ত স্বরে তিনি গাহিয়াছেন:—

"ন মৃত্যু র্ন শঙ্কা ন মে জাতিভেদঃ"
নাই মম মৃত্যুভয়, নাই জাতিভেদ।

এখন দেখা যাউক মৃত্যু কি—যাহার জন্য বিশ্ব-সংসার ব্যাকুল; যাহার হাত এড়াইতে সকলেই সচেষ্ট। মৃত্যু!—কি ভয়ানক! মৃত্যুর কঠোর স্পর্শে এই সুন্দর পুষ্পালঙ্কারা বিহগকলরব-মুখরা অসীমছায়াপথ-বিমণ্ডিতা সাগরকুন্তলা হাস্যময়ী শ্যামলা ধরণীর অপরূপ সৌন্দর্য্য এ নয়ন দেখিবে না; এ শ্রবণ সুমিষ্ট কণ্ঠের মধুর আলাপ শুনিবে না; রসনা স্বাদ গ্রহণ করিবে না; হস্ত-পদ আমার নিস্পন্দ হইয়া যাইবে। পৃথিবীর শত আকর্ষণ, প্রিয়জনের স্নেহ-ভালবাসার নিবিড় বন্ধন অনন্তকালের জন্য ছিন্ন হইয়া যাইবে। সে কি দুঃখ! কি সে পরিতাপ!

কি সে বস্তু, যাহা মৃত্যুর আলিঙ্গনে দেহচ্যুত হইয়া যায়; অনন্ত জগতের কোন্ শূন্যপথে ধূমরাশির মত বিচরণ করে—পাষাণ প্রাচীরের মধ্যেও যাহাকে ধরিয়া রাখা যায় না!

এই মৃত্যুতত্ত্ব আবিষ্কারের চিন্তা সর্ব্বপ্রথম আর্য্য-ঋষির প্রাণে সমুদিত হইয়াছিল। তাহার চিহ্নস্বরূপ আমরা উপনিষদে দেখিতে পাই, ঋষিকুমার নচিকেতা মৃত্যুপতি যমকে জিজ্ঞাসা করিতেছেন:—

"যেয়ং প্রেতে বিচিকিৎসা মনুষ্যে
অস্তীত্যেকে নায়মস্তীতি চৈকে।
এতদ্ বিদ্যামনুশিষ্টস্ত্বয়াহহং
বরাণাম্ এব বরস্তৃতীয়ঃ॥

সন্দেহ এক আছে ঘিরে অসীমতিমির মৃত্যুপথ—
কেহ বলে আছে তাহা; কেহ বলে তা'র নাইক রথ;
তোমার কাছে শিক্ষা পেয়ে জান্‌ব আমি তত্ত্ব সার;
ওহে শমন শেষের বর এই—আমি কিছুই চাইনা আর।

এই কথা শুনিয়া যম বহুবিধ প্রলোভন দ্বারা নচিকেতাকে ভুলাইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু যখন নচিকেতা অন্য কিছুই প্রার্থনা করিলেন না, বার বার মৃত্যু-রাজ্যের অজ্ঞাত-রহস্য অবগত হইবার জন্য ব্যাকুল আগ্রহ প্রকাশ করিতে লাগিলেন, তখনই যম সেই তিমিরাবৃত রাজ্যের লৌহ কবাট উদ্ঘাটিত করিয়া জ্ঞানের দীপালোকে দেখাইলেন যে, অমৃতের পুত্র অমরণধর্ম্মা জীবের প্রকৃত মৃত্যু বলিয়া কিছুই নাই।

যে ভীষণ মৃত্যুভয় মানবের মনে কোন্ অনাদি কাল হইতে বালকের প্রাণে প্রেতভীতির মত চাপিয়া বসিয়াছিল, উপনিষদের এই সামান্য ইঙ্গিতে তাহা শীতের প্রান্তে অরুণালোকে কুজ্ঝটিকার মত অসীম শূন্যে লীন হইয়া গেল। মৃত্যুর পরে কি হইবে, কোন্ স্বর্গে বা নরকে যাইব; এই যে চিন্তা, এই যে ভীষণ দুর্ভাবনা মানুষকে দুর্ব্বল করিয়া তুলিয়াছিল, তাহার নিরসনার্থ উপনিষদ্ গাহিলেন:—

"হন্তা চেন্মন্যতে হন্তুং হতশ্চেন্মন্যতে হতম্।
উভৌ তৌ ন বিজানীতো নায়ং হন্তি ন হন্যতে॥"

যে ভয় যে আশঙ্কা এই দুঃখবহুল জীবনকে আঁকড়িয়া ধরিয়া এই ধরাবক্ষে বিচরণ করে, তাহা অলীক, তাহা নাই! মরুভূমির অনন্ত ধূসরতার মধ্যে মৃগতৃষ্ণিকার সরোবর-সৃষ্টির মত মৃত্যু বলিয়া কিছু নাই। আত্মার দেহ-পরিবর্ত্তন হয় মাত্র—ধ্বংস বলিয়া কিছু নাই।

মৃত্যু বলিয়া যে ভয় একদিন আমাদিগকে ভীত করিয়াছিল; যাহার জন্য আমাদের জীবন দুঃখের একটা মহা নিদর্শনে পরিণত হইতেছিল; তাহা স্বপ্নের ভীতিপ্রদ দৃশ্যের মত অলীকতায় লীন হইয়া গেল।

সাত্ম্য ও পথ্য।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

প্রসঙ্গক্রমে মৎস্যভক্ষণের কথাটা আরও খোলসাইয়া বলাই সঙ্গত। কারণ বর্ত্তমান যুগে বাঙ্গালী সম্পূর্ণ আত্মহারা পরপ্রণেয়বুদ্ধি; সুতরাং মিছা সাত্ত্বিকতা দেখাইতে যাইয়া সাত্ম্য-পথ্য ছাড়িয়া আত্ম-হত্যার প্রয়াস করে। শাস্ত্রের মর্ম্ম প্রচার করিয়া আত্মঘাতোদ্যতের জীবনরক্ষার প্রয়াস অবশ্যই কর্ত্তব্য। বাঙ্গালীর গৌরব কুল্লুকভট্ট মনুর টীকা করিতে বসিয়া মৎস্যভক্ষণ সম্বন্ধে কি অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা এখন সাধারণের নিকট উপন্যস্ত করা যাউক।

মনুসংহিতার (৫ অ, ১৪-১৫-১৬) তিনটী বচনে মৎস্য-ভক্ষণের সামান্যতঃ নিষেধ এবং মৎস্যবিশেষের ভক্ষণে

মোখাতাব সুস্পষ্ট কথিত হইয়াছে। কল্লূক ভট্ট বচনগুলির বিশেষভাবে তাৎপর্য্য বর্ণন করিয়াছেন। যথা—

"মৎস্যাদাদ্ বিড়্ বরাহাংশ্চ মৎস্যানেব চ সর্ব্বশঃ॥
যো যস্য মাংসমশ্নাতি স তন্মাংসাদ উচ্যতে।
মৎস্যাদঃ সর্ব্বমাংসাদ স্তস্মান্মৎস্যান্ বিবর্জ্জয়েৎ॥
পাঠীন-রোহিতাবাদ্যৌ নিযুক্তৌ হব্যকব্যয়োঃ।
রাজীবান্ সিংহতুণ্ডাংশ্চ সশল্কাংশ্চৈব সর্ব্বশঃ॥"

মৎস্যভোজী প্রাণী, বিষ্ঠাভোজী শূকর এবং সর্ব্বপ্রকার মৎস্য খাইবে না। ১৪ শ্লোকে মৎস্যভোজন নিষিদ্ধ হইয়াছে। পরে কেন খাইবে না, উহা বুঝাইবার জন্য মৎস্য-ভোজনের নিন্দা কথিত হইয়াছে। যে যাহার মাংস খায়, তাহাকে ভক্ষ্য প্রাণীর মাংসভোজী বলা হইয়া থাকে, যেমন বিড়াল মূষিকভুক্। মৎস্য সমস্ত জন্তুর মাংসই খাইয়া থাকে, অতএব মৎস্য-ভক্ষণকারীকে সর্ব্বমাংসভুক্ বলা যায়। অতএব মৎস্য পরিত্যাগ করিবে। ইহার পর কুল্লূক বলিয়াছেন:—ইদানীং ভক্ষ্যমৎস্যানাহ—"পাঠীন-রোহিতাবিতি"; এখন মৎস্যের মধ্যে কোন্‌গুলি ভক্ষ্য তাহা বলা যাইতেছে, পাঠীন ও রোহিত মৎস্য বিশেষ ভক্ষণীয়। রাজীব সিংহতুণ্ড এবং শল্কযুক্ত সমস্ত মৎস্য ভক্ষণ করা যাইতে পারে। কুল্লূক এইরূপে স্বমত প্রকাশ করিয়া মেধাতিথি ও গোবিন্দরাজ এই দুই গ্রন্থকারের মতের উপর দোষারোপ করিয়াছেন। কারণ তাঁহাদের মতে রোহিত ও পাঠীন শ্রাদ্ধে প্রদত্ত হইলে, তাহা কেবল শ্রাদ্ধভোজী ব্রাহ্মণই খাইতে পারেন, শ্রাদ্ধকর্ত্তাও তাহা খাইতে পারেন না; কিন্তু রাজীব ও সিংহতুণ্ড প্রভৃতি হব্য-কব্য ব্যতীতও সকলেই খাইতে পারে না।

এই ব্যাখ্যা প্রমাণ-মূলক নহে। যেহেতু অন্যান্য মুনিরা রোহিত পাঠীন রাজীব প্রভৃতিকে তুল্যরূপেই নির্দ্দেশ করিয়াছেন। মহর্ষি শঙ্খ বলিয়াছেন—

"রাজীবাঃ সিংহতুণ্ডাশ্চ সশল্কাশ্চ তথৈব চ।
পাঠীন-রোহিতৌ বাপি ভক্ষ্যা মৎস্যেষু কীর্ত্তিতাঃ॥"

অর্থ—মৎস্যের মধ্যে রাজীব সিংহতুণ্ড সশল্ক মৎস্য পাঠীন ও রোহিত ভক্ষণীয়।

যাজ্ঞবল্ক্যের মত পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে। হারীত বলিয়াছেন—

"সশল্কান্ মৎস্যান্ ক্ষারোপপন্নান্ ভক্ষয়েৎ।"

ক্ষারোপেত সশল্ক মৎস্য ভক্ষণ করিতে পার। যদি এমতই হইল, তবে—

"ভোক্তৈবাদ্যৌ ন কর্ত্তাপি শ্রাদ্ধে পাঠীন-রোহিতৌ।
রাজীবাদ্যাস্তথা নেতি ব্যাখ্যা ন মুনিসম্মতা॥"

শ্রাদ্ধে ভোক্তাই পাঠীন-রোহিত খাইতে পারেন শ্রাদ্ধকর্ত্তা খাইতে পারেন না, এই ব্যাখ্যা মুনিসম্মত নহে।

বিজ্ঞানেশ্বর যাজ্ঞবল্ক্যসংহিতায় (১অ। ২৫৮) শ্লোকের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন—"মৎস্যো ভক্ষ্যঃ পাঠীনাদিঃ। তন্মাংসং। ইতি মিতাক্ষরা।" মৎস্য পদে ভক্ষ্য পাঠীন প্রভৃতি, তাহার মাংস মাৎস্য।

রঘুনন্দন ভট্টাচার্য্য মহাশয় মৎস্যের ভক্ষণীয়তা বিশেষরূপে নির্দ্দেশ করিয়াছেন, যথা—মৎস্যসূক্তে—

"অনিবেদ্য ন ভোক্তব্যং মৎস্যং মাংসঞ্চ যদ্ভবেৎ।
অন্নং বিষ্ঠা পয়োমূত্রং যদ্বিষ্ণোরনিবেদিতম্॥
অনেন স্বয়ং ভোজ্যমপ্যাদি দেয়মিত্যুক্তম্।"

মৎস্য মাংস প্রভৃতি যাহা কিছু খাদ্য তাহা বিষ্ণুকে নিবেদন না করিয়া খাইবে না; যেহেতু বিষ্ণুর উদ্দেশে অনিবেদিত অন্ন বিষ্ঠার তুল্য এবং জল মূত্রের তুল্য বিবেচনীয়। অতএব নিজের খাদ্য দ্রব্য নিবেদন কর্ত্তব্য।

তবে বিষ্ণুবচনে যে বলা হইয়াছে, অভক্ষ্য বস্তু নৈবেদ্যে দিবে না, ভক্ষ্য বস্তুর মধ্যেও ছাগদুগ্ধ মহিষদুগ্ধ পঞ্চনখ প্রাণীর মাংস মৎস্য ও বরাহমাংস বর্জ্জন করিবে। উহা নিজের ভক্ষ্য বস্তু দানের অতিরিক্ত বলে বুঝিতে হইবে। অতএব কোন বিরোধ নাই।

"নাভক্ষ্যং নৈবেদ্যার্থে ভক্ষ্যেষপি অজামহিষীক্ষীরং বিবর্জ্জয়েৎ পঞ্চনখ-মৎস্য-বরাহমাংসানি চেতি। ইতি বিষ্ণুবচনে তু অন্যেষংবিধং বিনিষিদ্ধমিত্যবিরোধঃ।"

বেদভাষ্যকার মাধবাচার্য্য দাক্ষিণাত্য, বিজ্ঞানেশ্বর পশ্চিমদেশবাসী, ইঁহারা অমৎস্যভোজী হইয়াও মৎস্যের ভক্ষ্যতা স্বীকার করিয়াছেন। ধর্ম্মশাস্ত্রকর্ত্তা মুনিঋষিগণ ত সমস্বরেই শ্রাদ্ধাদি কার্য্যেও মৎস্যের ব্যবহার ঘোষণা করিয়াছেন।

বাঙ্গালী পণ্ডিতগণ বাঙ্গালীর সাত্ম্য মনে করিয়া মৎস্যের ভক্ষ্যতা বিশেষভাবে সপ্রমাণ করিয়া গিয়াছেন; অতএব যে সকল চিকিৎসক মৎস্য মাত্রকেই অভক্ষ্য বলিয়া অভিমত প্রকাশ করেন এবং রোগীর পথ্যে পর্য্যন্ত মৎস্য দিতে পরিপন্থী হন, তাঁহাদের বিদ্যার দৌড় কতটুকু তাহা সুধীগণ বিবেচনা করিবেন।

আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতা ঋষিগণ সর্ব্বাপেক্ষা সাত্ম্যেরই অপ্রতিহত প্রভাব ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। সুশ্রুতে স্পষ্টই বলা হইয়াছে যে, সমস্ত অনুপানের মধ্যে মাহেন্দ্রতোয় অর্থাৎ বৃষ্টির জল উত্তম। কিন্তু যাহার পক্ষে যে জল "সাত্ম্য" তাহার পক্ষে তাহাই হিত অর্থাৎ পথ্য।

"সর্ব্বেষামনুপানানাং মাহেন্দ্র-তোয়-মুত্তমম্।
সাত্ম্যং যস্য তু যত্তোয়ং তত্তস্মৈ হিতমুচ্যতে॥"

(সুশ্রুত, সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায় ১৭)

আরও বলা হইয়াছে যে,—

"গুরুলাঘব-চিন্তেয়ং স্বভাবং নাতিবর্ত্ততে"।

(৪৬—২৫)

অর্থাৎ এই বস্তু লঘু, এই বস্তু গুরু এই বিচার স্বভাবকে (সাত্ম্যকে) অতিক্রম করিতে পারে না। যাহার যাহা সাত্ম্য, তাহাতে গুরু-লঘুবিচারের অবসর নাই।

উল্লিখিত গ্রন্থেই বিরুদ্ধভোজন প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে যে—

"সাত্ম্যতোহল্পতয়া বাপি দীপ্তাগ্নেস্তরুণস্য চ।
স্নিগ্ধব্যায়ামশীলানাং বিরুদ্ধং বিতথং ভবেৎ" ॥১৩॥

ইহার অর্থ:—সংযোগাদিবশতঃ যে সকল দ্রব্য বিরুদ্ধ বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে, সেই সকল বিরুদ্ধ দ্রব্যও যাহার সাত্ম্য, তাহার পক্ষে অনিষ্টকর হয় না। অল্পমাত্রায় খাইলেও বিরুদ্ধ বস্তু অনিষ্টজনক হয় না। যাহার জঠরানল প্রবল তাহার পক্ষে ও তরুণ ব্যক্তির পক্ষে এবং যাহাদের দেহে স্নেহপদার্থের আধিক্য আছে, ও যাহারা ব্যায়ামশীল তাহাদের পক্ষে বিরুদ্ধভোজন অনিষ্ট করিতে পারে না। এই উপদেশের সার্থকতা পদে পদে প্রমাণিত হইতেছে। কারণ সুশ্রুত বলিয়াছেন যে,—আম্রফল জামফল শ্বাবিধ্-মাংস শূকর-মাংস গোধা-মাংস সর্ব্বপ্রকার মৎস্য বিশেষতঃ চিলিচিম-মৎস্য দুগ্ধের সহিত খাইবে না।

কদলী ফল তালফলের সহিত দুগ্ধের সহিত দধির সহিত এবং তক্রের সহিত খাইবে না।

"আম্র-জাম্বব-শ্বাবিচ্ছূকর-গোধাশ্চ সর্ব্বাংশ্চ মৎস্যান্ বিশেষেণ চিলিচিমং পয়সা।"

"কদলীফলং তালফলেন পয়সা দধ্না তক্রেণ বা।"

কিন্তু উক্ত নিষেধ বাঙ্গালীর পক্ষে কেবল পুস্তকগতই হইয়া রহিয়াছে। কারণ দুধের সহিত আম, দুধ দৈ ঘোলের সহিত কলা বাঙ্গালীর নিত্য খাদ্য এবং সাত্ম্য। কলা ও তালের পিঠা বাঙ্গালীর বিশেষ খাদ্য। ভাদ্র মাসে তালের পিঠা না খাইলে শনিগ্রহের কোপে পড়িতে হয়, এই বিশ্বাস অনেক বাঙ্গালীরই জাগরূক আছে।

আমি নিজের শরীরে আত্মপরিবারে এবং অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তির সহিত আলাপেও বেশ বুঝিতে পারিতেছি যে, আমের সহিত দুগ্ধ একটা বিশেষ পথ্য। আমরা দুধ হজম করিতে পারি না; কিন্তু আমের রসের সহিত দুগ্ধ খাইলে বেশ হজম হইয়া যায়। ইহাতে শরীরের বিশেষ পুষ্টিও হইয়া থাকে। সুতরাং কেবল পুস্তকে লিখিত বচন আবৃত্তি করিয়া যাঁহারা পথ্যাপথ্যের ব্যবস্থা করিয়া থাকেন, তাঁহাদের দ্বারা সাধারণের অনিষ্টসাধনই হইয়া থাকে।

আয়ুর্ব্বেদ-প্রণেতৃগণ যে সময়ে এবং যে দেশে বসিয়া গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সে সময় হইতে বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। দেশের অবস্থা ত সাধারণের বিশেষ প্রত্যক্ষই হইতেছে।

কোন্‌দিক হইতে প্রবাহিত বায়ুর কিরূপ গুণ ইহার বর্ণন প্রসঙ্গে সুশ্রুতে কথিত হইয়াছে যে, পশ্চিমদিকের বায়ু তীক্ষ্ণ কফ-মেদের শোষক শরীরীদিগের সদ্য-প্রাণক্ষয়কর এবং শোষক। কিন্তু বৈদ্যনাথ প্রভৃতি স্থানে দেখা যায় পশ্চিমের হাওয়া বহিলেই রোগীর পুনর্জীবন দেখা দেয়।

গ্রন্থপ্রণেতৃদিগের মতবাদের যে প্রভূত পার্থক্য দেখিতে পাওয়া যায়, তাহার নিদর্শনস্বরূপ কিঞ্চিৎ প্রদর্শন করা যাইতেছে। যথা—

(চরকসংহিতা সূত্রস্থান, ২৭ অধ্যায় আনূপমাংস-বর্গ)

"গুরূষ্ণ-মধুরা বল্যা-বৃংহণাঃ পবনাপহাঃ।
মৎস্যাঃ স্নিগ্ধাশ্চ বৃষ্যাশ্চ বহুদোষাঃ প্রকীর্ত্তিতাঃ ॥৭৬॥
শৈবলাহারভোজিত্বাৎ স্বপ্নস্য চ বিবর্জ্জনাৎ।
রোহিতো দীপনীয়শ্চ লঘুপাকো মহাবলঃ ॥ ৭৭ ॥

ইহার অর্থঃ—আনূপমাংসের মধ্যে যে সকল জন্তুর মাংস খাদ্য বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে, তন্মধ্যে মৎস্য গুরুপাক উষ্ণবীর্য্য মধুররস বলকারক শরীরবর্দ্ধক বায়ুনাশক স্নিগ্ধ অর্থাৎ স্নেহপদার্থ যুক্ত বৃষ্য (শুক্রবর্দ্ধক) এবং বহুদোষ বলিয়া কথিত। অত্রত্য বহুদোষশব্দের তাৎপর্য্য নানা প্রকার অনিষ্টকর বলিয়া মনে হয়। চরক অল্প কথায় মৎস্যের মোটামুটি দোষগুণ বর্ণনা করিয়া রোহিত মৎস্যের সম্বন্ধে বলিয়াছেন যে, রোহিত মৎস্য শেওলা মাত্র ভক্ষণ করে, নিদ্রা যায় না, অতএব উহা দীপনীয় অর্থাৎ অগ্নির উদ্দীপক লঘুপাক (সহজে হজম হয়) ও অত্যন্ত বলকারক।

এখানে একটি ভাবিবার বিষয় এই যে, রোহিত মৎস্য শেওলা ব্যতীত অন্য পদার্থ খায় না, এবং নিদ্রা যায় না উহা কি উপায়ে প্রমাণিত হইয়াছে? সম্ভবতঃ গ্রন্থকার জনশ্রুতির উপর আস্থা স্থাপন বশতই এই বিষয়টি গ্রন্থ মধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। মানবসমাজে অনেক আজগুবী প্রবাদ চিরদিনই প্রচলিত আছে। আমরা ছেলে বেলা হইতে শুনিয়া আসিতেছিলাম, এবং বিশ্বাস করিতাম যে কাতল মাছ বড়শিতে খায় না; কারণ উহারা নাকে আধার (আহার) করে। কিন্তু বড়শিতে কাতল মাছ ধরা প্রত্যক্ষ করিয়া, নাকে আধারের কথায় অমূলকতা বুঝিতে পারিয়াছি। রোহিত মৎস্য নানা প্রকার টোপে বড়শিতে ধরিয়াছি; সুতরাং শৈবাল মাত্র ভোজন নিবন্ধন উহাদের আহার সংযমের কথা বিশ্বাস করিতে পারি না। তবে নিদ্রাশূন্যতা বিষয় আমাদের বিচারের যোগ্য নহে; কারণ কোন্ প্রাণী নিদ্রা যায় না যায়, তাহার হিসাব-নিকাশ মানবশক্তির অতীত। ঋষিরা যোগবল-সম্পন্ন, তাঁহারা সেই বলে সমস্ত অতীন্দ্রিয় বিষয়ও

প্রত্যক্ষ করিতে পারেন, এরূপ প্রসিদ্ধি আছে। সুতরাং ঋষির গ্রন্থে অনেক বিষয়ই স্থান পাইতে পারে।

প্রসঙ্গ ক্রমে আর একটী আজগুবী কথার অবতারণা করার প্রলোভন সংবরণ করিতে পারিলাম না, বিষয়টি এই—আমাদের প্রদেশে কূর্ম্মমাংসের ব্যবহার খুব বেশী। নানা প্রকার কূর্ম্মই ভক্ষিত হইয়া থাকে। এক প্রকার কূর্ম্ম আছে, তাহাকে অনেকে ঢোঁড়া বলিয়া থাকে, এবং উহা অনেকে খায় না। কারণ উহার গলা ঠিক ঢোঁড়া সাপের মত। তাহাতেই প্রবাদের সৃষ্টি হইয়াছে যে, ঢোঁড়া সাপ গর্ত্তে থাকিয়া উর্দ্ধদিকে গলা বাহির করিয়া রাখে, সেই অবস্থায় পুষ্যানক্ষত্রযুক্ত অমাবস্যা রাত্রিতে বৃষ্টির জল তাহার মস্তকে পড়িলেই সে কূর্ম্মাকারে পরিণত হয়। উক্ত ঢোঁড়াকে কোথাও বাধি কেটো কোথাও শুদ্ধি কেটো বলিয়া থাকে।

যাহা হউক, প্রসঙ্গ ক্রমে প্রকৃত বিষয় হইতে অনেক দূরে সরিয়া পড়িয়াছি। এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক।

সুশ্রুতসংহিতায় মৎস্যের গুণাগুণ বর্ণনা চরক অপেক্ষা অনেক বেশী। উক্ত গ্রন্থে (সূত্রস্থান, অনুপ-মাংস-বর্গ) প্রথমতঃ মৎস্যজাতিকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করা হইয়াছে। এক শ্রেণী নাদেয় (নদীসম্ভূত), অপর শ্রেণী সামুদ্র (সমুদ্রজাত)।

তন্মধ্যে রোহিত পাঠীন পাটনা রাজীব বর্ম্মি গোমৎস্য কৃষ্ণমৎস্য বাগুঞ্জার মুরল সহস্রদংষ্ট্র প্রভৃতি নাদেয়।

"মৎস্যাস্তু দ্বিবিধা নাদেয়াঃ সামুদ্রাশ্চ। তত্র নাদেয়াঃ রোহিত-পাঠীন-পাটনা-রাজীব--বর্ম্মি--গোমৎস্য--কৃষ্ণমৎস্য-বাগুঞ্জার-মুরল-সহস্রদংষ্ট্রপ্রভৃতয়ো নাদেয়াঃ। ৫৭॥"

"তিমি-তিমিঙ্গিল-কুলিস-পাক-মৎস্য-নিরালক-নন্দি-বারলক--মকর--গর্গরক--চন্দ্রক--মহামীন--রাজীব--প্রভৃতয়ঃ সামুদ্রাঃ। ৬৩॥"

কি নাদেয় কি সামুদ্র উভয়ের পরেই একটা প্রভৃতি শব্দযুক্ত থাকিয়া মৎস্যের অসংখ্যপ্রকারতা সূচনা করিতেছে। প্রকৃত পক্ষেও মৎস্যজাতির ইয়ত্তা করাও অসম্ভব। উল্লিখিত উভয় শ্রেণীতেই রাজীবের সন্নিবেশ দেখা যায়।

—ক্রমশঃ

মহর্ষি ৺দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর।

(শ্রীবসন্তকুমারী বসু)

জীবন-জ্যোতিকে তুমি মেনেছিলে ধ্রুবতারা,
তাই তুমি পথে কভু হওনি গো দিশাহারা,
চিরদিন প্রাণ তব সত্যে ছিল অবস্থিত,
জীবনে হওনি কভু ন্যায়ধর্ম্মে বিচলিত,
ব্রহ্মজ্ঞান, ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রসপান,
ভূমাময় জীবনের লক্ষ্য কিবা সুমহান,
জনক রাজর্ষি মত হয়েও সংসারী ভোগী,
ছিলে তুমি তত্ত্বজ্ঞানী, ধ্যানরত মহাযোগী,
গিরি-পরে ধ্যান ভরে বসে নির্ঝরিণী তীরে,
শুনেছিলে যাঁর বাণী, তাঁর প্রিয় কাজ তরে,
স্বার্থ ফেলে আজীবন ঢেলেছিলে তব প্রাণ,
কভুও সে আকুলতা, হয়নি বিরত ম্লান,
ধ্যান ভরে গিরিপরে, দিন কয়েকের তরে,
ফেলে তাঁর প্রিয় কাজ ছিলে গো অমরপুরে,
শুধু ধ্যান নিয়ে থাকা, নহে ইচ্ছা বিধাতার,
তাই তিনি হৃদে তব আদেশ দিলেন তাঁর,
"সাধিতে আমার কাজ যথা ওই নির্ঝরিণী,
সবেগে চলেছে দেখ, বাধা-বিঘ্ন নাহি মানি,
তুমিও উহার মত নেমে যাও নানা দেশে;
লইয়া জ্ঞানের সুধা লক্ষ প্রাণ আছে বসে",
সে বাণী পশিল আসি অন্তরের অন্তস্তলে
শত আকুলতা নিয়ে ত্বরিতে নামিয়ে এলে,
করিলে যে কাজ নেমে, নহে সাধ্য বলিবার,
জ্ঞানের ধর্ম্মের ক্ষুধা নিবারিলে অনিবার,
ধন, মান খ্যাতি আর বংশের গৌরব ভুলে,
লক্ষ জন ভার, যোগী! মস্তক পাতিয়া নিলে!
নাশিলে আত্মার ক্ষুধা ব্রহ্মজ্ঞান-সুধা দিয়ে,
হরিলে অনেক দুঃখ, পাপ-তাপ বিনাশিয়ে,
পিতৃঋণ শুধিয়াছ, রেখেছ সত্যের মান,
দেখায়েছ দিব্য বিভা কি পবিত্র সুমহান,
চিরদিন সেই জ্যোতি মানবের সাথে সাথে,
আলোক দেখায়ে যাবে, জীবন-আঁধার পথে,
ব্রহ্মজ্ঞান ব্রহ্মধ্যান, ব্রহ্মানন্দ-রস পান,
বিবেক, বৈরাগ্য, স্বার্থ-ত্যাগ সত্যের সন্ধান,
এসব পদাঙ্ক তব যেতে পারে অনুসরি,
গভীর শ্রদ্ধার সহ পৃথিবীর নর-নারী,
সুখে যাবে, গম্য স্থানে হবেনাক দিশাহারা,
দুর্দান্ত রিপুর হাতে পথে যাবেনাক মারা,
লভিবেক তত্ত্বজ্ঞান, অনন্ত ঈশ্বরে পাবে,
মরণের পরপারে পুণ্যময় স্থানে যাবে,
জ্ঞান, ভক্তি, কর্ম্ম ত্রিবেণী ধারায় করি সবে স্নান-পান,
ধারায় পূততা, ঘুচাবে অন্ধতা, হবে সবে পুণ্যবান।
হবে তত্ত্বজ্ঞানী, ভূমা ধনে ধনী, সংসারী বৈরাগী হয়ে,
অনেক জানিবে, কতক চিনিবে, শাশ্বতধন চিন্ময়ে।

সিটিকলেজ সমস্যার সমাধান।

গত জ্যৈষ্ঠ-সংখ্যা পত্রিকায় আমরা "রামমোহন হোষ্টেলে সরস্বতী পূজা" বিষয়ে লিখিয়া সর্ব্বশেষে কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করিয়াছিলাম যে, "কর্ত্তৃপক্ষ ও ছাত্রগণের মধ্যে শীঘ্রই সম্প্রীতি সংস্থাপিত হউক।" সুখের বিষয়, আমাদের প্রার্থনাটী সম্পূর্ণ সফল হইয়াছে। দীর্ঘকালব্যাপী নানাবিধ ঘটনাচক্রে সমস্যাটী ক্রমশঃ জটিল হইয়া যে নূতন অশান্তির সৃষ্টি করিয়াছিল, উহার সর্ব্বজনস্বীকৃত নিষ্পত্তিতে আমরা পরম সুখী হইয়াছি। মোটামুটি তিনটী সর্ত্তে এই সমস্যাটীর সমাধান হইয়াছে। (১) কলেজ-কর্ত্তৃপক্ষ ছাত্রাবাসের সকলেরই ধর্ম্মগত মর্য্যাদা স্বীকার করিয়া লইয়া উক্ত ছাত্রাবাসটীকে সর্ব্বপ্রকার ধর্ম্মগত অনুষ্ঠান হইতে মুক্ত রাখিয়াছেন। (২) অধ্যাপকসঙ্ঘ তথা বিদ্যাপীঠ, ছাত্রাবাসের সন্নিকটস্থ কোনস্থানে আপনাদের ব্যয়ে হিন্দু ছাত্রদের পূজার ব্যবস্থা করিয়া দিতে স্বীকৃত হইয়াছেন। (৩) উভয় পক্ষই এই সূত্রে পরস্পরের মধ্যে সংঘটিত অপ্রীতিকর বিষয়গুলির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিয়াছেন।

যাহা হউক, এই দ্বন্দ্ব-বিবাদঘটিত অশুভ ব্যাপারটীর মধ্যেও আমরা ভগবানের মঙ্গল ইচ্ছার পরিচয় পাইতেছি। বর্ত্তমান সমস্যাটীকে উপলক্ষ্য করিয়া অধুনালব্ধ অভিজ্ঞতার ফলে ব্রাহ্মসমাজ নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থার যে ইঙ্গিত পাইলেন—তাহা উদারতা। যে বৃহত্তর হিন্দু-সমাজের আমরা অন্তর্ভূত, তাহাদের সুখসুবিধাগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখাও আমাদের অবশ্য কর্ত্তব্য। পাশবশক্তির সাহায্যে কাহারও অন্তরকে জয় করা যায় না; মৈত্রীই উহার একমাত্র পন্থা। মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের নামের সহিত বিজড়িত প্রতিষ্ঠানটীর প্রকৃত মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষা পায়, সেদিকে সকলেরই দৃষ্টি রাখা উচিত। আধুনিক যুগে লোকমতের উপর সংবাদপত্রের প্রভাব অপরিমেয়; সুতরাং এক্ষেত্রে সংবাদপত্রচালকগণ নিরপেক্ষভাবে প্রথম অবধি যদি পরামর্শ দিতেন, তাহা হইলে মনে হয় যে, এই ব্যাপারটি বিবাদ-কলহে পর্য্যবসিত হইবার অবসর পাইত না।

সর্ব্বশেষে আমাদের বক্তব্য এই যে, ভগবৎকৃপায় এই চির আকাঙ্ক্ষিত মিলনটী পরস্পরের অন্তরে গভীর ভাবে গ্রথিত হইয়া গেলেই আমরা সুখী হইব।

গ্রন্থপরিচয়।

শ্রীশ্রীচণ্ডী।—শ্রীযুক্ত রাজা শশিশেখরেশ্বর রায় বাহাদুর-কৃত রাজনৈতিক ব্যাখ্যাসমন্বিত; কাশীধাম, ব্রাহ্মণরক্ষা সভা হইতে শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক সম্পাদিত ও প্রকাশিত। সুলভ সংস্করণ প্রতিখণ্ডের মূল্য ৵০ আনা মাত্র।

শ্রীশ্রীচণ্ডীর উপর রাজাবাহাদুরের এই ব্যাখ্যান খণ্ডাকারে প্রকাশিত হইতেছে। উহার প্রথম খণ্ড আমাদের হস্তগত হইয়াছে। সুপার রয়াল ৮ পেজী আকারের ৪০ পৃষ্ঠায় প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়াছে। ইহাতে ব্যাখ্যাকর্ত্তার 'প্রারম্ভিক নিবেদন' সহ মাত্র ১৮টী শ্লোকের ব্যাখ্যা স্থান পাইয়াছে। চণ্ডীগ্রন্থের যতগুলি প্রাচীন ভাষ্য ও টীকা-টিপ্পনী আছে, সেগুলি শাস্ত্রাধ্যাপক পণ্ডিতগণের সাহায্যে বিশেষভাবে পর্য্যবেক্ষিত হইয়া বর্ত্তমান দেশ-কালের উপযোগী ভাব ও ভাষায় রাজাবাহাদুরের লিখিত এই ব্যাখ্যান আমাদের ভাল লাগিল। চণ্ডী কেবল মোক্ষপ্রতিপাদক শাস্ত্র নহে—ইহাতে রাষ্ট্রনীতি ও সমাজনীতিরও বহু উপদেশ আছে বলিয়া এই ব্যাখ্যানের নাম বিশেষভাবে "রাজনৈতিক ব্যাখ্যান" রাখা হইয়াছে। আমরা পরবর্ত্তী খণ্ডগুলির জন্য উৎসুক রহিলাম।

সংবাদ।

শতবার্ষিক উপলক্ষ্যে উৎসব।—ব্রাহ্মসমাজের শতবার্ষিকীর সময় লইয়া শাখাসমাজগুলির পরস্পর মতানৈক্য থাকিলেও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ এবার শতবার্ষিক উপলক্ষ্য করিয়া উৎসব সম্পন্ন করিয়াছেন। গত ২রা ভাদ্র শনিবার সায়ংকাল হইতে গত ১০ই ভাদ্র রবিবার সায়ংকাল পর্য্যন্ত উৎসবের অনুষ্ঠান হইয়াছিল। ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ হইতে বহু গণ্যমান্য সমাজপরিচালকগণ এই উপলক্ষ্যে কলিকাতায় সমবেত হইয়াছিলেন। ৬ই ভাদ্র, বুধবার প্রাতরুপাসনায় পূজাপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন।

ভাদ্রোৎসব।—ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে ভবানীপুর সম্মিলন-সমাজে গত ১০ই ভাদ্র রবিবার সায়ংকালে যে উপাসনার অনুষ্ঠান হইয়াছিল, উহাতে বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। 'সত্যধর্ম্ম ও মুক্তি' বিষয়ে তিনি যে উপদেশ দেন, পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যার স্থানান্তরে উহা প্রকাশিত হইল। শ্রীমতী বাণীদেবী তাঁহার সুকণ্ঠে কয়েকটা গান করিয়া সভাগতদিগকে মুগ্ধ করিয়াছিলেন। গানগুলির মধ্যে যেগুলি নূতন, তাহা এই সংখ্যায় প্রকাশিত হইল।

সার্ব্বজনীন সম্মিলন।—ডাঃ কালিদাস নাগ ও ডাঃ নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায় প্রভৃতি কয়েকজন যুবকের যত্নে ও চেষ্টায় গত ১৬ই ও ১৭ই ভাদ্র শনি ও রবিবার আলবার্ট হলে 'সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবের' যাণ্মাষিক অধিবেশন সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শনিবার সায়ংকালে যে ব্রহ্মোপাসনার আয়োজন হইয়াছিল, উহাতে বেদীগ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস, শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর। এই উপলক্ষ্যে ক্ষিতীন্দ্রনাথ যে উদ্বোধন পাঠ করিয়াছিলেন, উহা যেমন তেজোগর্ভ তেমনই সময়োপযোগী হইয়াছিল। আশ্বিন-সংখ্যা পত্রিকায় আমরা উহা প্রকাশ করিব। ললিতমোহনের উপাসনা ও কামাখ্যানাথের উপদেশও বেশ মনোগ্রাহী হইয়াছিল।

পরদিন রবিবার প্রাতঃকালে ৭টা হইতে ভারতীয় বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের স্বকীয় সংক্ষিপ্ত উপাসনা ও

সঙ্গীতাদি হইয়াছিল। বেদপন্থী আর্য্য, আবেস্তাপন্থী পারসীক, ত্রিপিটকপন্থী বৌদ্ধ, বাইবেলপন্থী খৃষ্টান, কোরাণপন্থী মুসলমান, নানকপন্থী শিখ ও বাহাউল্লাপন্থী বাহাই প্রভৃতি ভারতের বহু-বিচিত্র বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় আপন আপন সাম্প্রদায়িক ভাব বিসর্জ্জন দিয়া একত্র একই ধর্ম্মবেদিকায় উপবিষ্ট হইয়া বিভিন্ন ভাষায় ও বিভিন্ন পদ্ধতিতে নিজ নিজ মতের ব্যাখ্যায় প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। সার্ব্বজনীন সম্মিলনের এই অংশটী সর্ব্বসাধারণের নিকট যেমন অপূর্ব্ব ও উদার তেমনই সুন্দর ও শোভন মনে হইয়াছিল। দুই দিবসই প্রচুর জনসমাগম হইয়াছিল। সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকলেই ইহাতে যোগদান করিয়া আনন্দ পাইয়াছিলেন।

হিন্দুসমাজের অতীত ও ভবিষ্যৎ।—একটা বিশেষ দেশ ও জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ হিন্দুসমাজে হিন্দুর বিকাশ সম্বন্ধে শ্রদ্ধাবান্ সকলেরই একটা অস্পষ্ট ধারণা ছিল; কিন্তু "বৃহত্তর ভারত পরিষদের" দৌলতে যেদিন আমরা প্রাচীনকালে চীন, শ্যাম, জাভা প্রভৃতি দেশের ভারতীয় উপনিবেশগুলির কথা অবগত হইলাম, সেদিন প্রাণ আনন্দে নাচিয়া উঠিয়াছিল। এমনই অনন্দ পাইয়াছিলাম আর একদিন, হিন্দুসভার সভাপতি মহাশয়ের পাণ্ডিত্যপূর্ণ অভিভাষণের নিম্নোক্ত শ্লোকটী পড়িয়া।

"কিরাতহূণান্ধ্র-পুলিন্দ-পুক্কশা
আভীরসুহ্মা যবনঃ খশাদয়ঃ।
যেঽন্যে চ পাপা যদুপাশ্রয়াঃ শ্রয়াঃ
শুদ্ধ্যন্তি তস্মৈ প্রভবিষ্ণবে নমঃ॥"

অতীতের হিন্দু উপনিবেশগুলি যেমন সমুদ্রযাত্রা-নিষেধের বিরুদ্ধে সুদৃঢ় প্রমাণ—তেমনি ইহা ঘোষণা করিতেছে যে হিন্দুধর্ম্ম একটা বিশেষ দেশে সীমাবদ্ধ থাকিবার ধর্ম্ম ছিল না; তেমনই এই শ্লোকটী বলিয়া দিতেছে, এই ধর্ম্ম প্রাচীন কালেও কোন বিশেষ জাতির মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না—এই প্রমাণগুলি হিন্দুসমাজের পক্ষে আশার বাণী। বর্ত্তমানেও দুই একটী ঘটনায় আমরা আশান্বিত হইয়াছি। মার্কিন মহিলা শ্রীমতী মিলারের সহিত ভূতপূর্ব্ব হোলকারের হিন্দুমতে বিবাহ হইয়াছে; তদবধিই শ্রীমতী মিলার ইয়াঙ্কী দেশে হিন্দুধর্ম্ম প্রচারে ব্রতী আছেন। সম্প্রতি সারদা মঠের শঙ্করাচার্য্য এই বিবাহের সমর্থন করিয়াছেন। মাদ্রাজের সার পি. এস. শিবস্বামী আয়ার এই ব্যাপারে শঙ্করাচার্য্যের প্রশংসা করিয়া এদেশীয় শিক্ষিত শ্রেণীর এক দলকে এই বিষয়ে অগ্রণী হইবার পরামর্শ দিয়াছেন। মদ্রদেশীয় সর্ব্বোচ্চ বিচারালয়ও পরধর্ম্মাগত হিন্দুবিবাহার্থিনীদের স্বামীর সম্পত্তিতে দায়াধিকার প্রতিপন্ন করিয়াছেন।* যে ঘটনাসূত্রে মিস মিলারের বিবাহ সংঘটিত হইয়াছে, তাহার সমর্থন না করিলেও আমরা মনে করি যে, শুদ্ধিসমর্থন সংক্রান্ত এই সব ঘটনাগুলি হিন্দুসমাজের পক্ষে বড় আশার কথা। আমরা প্রার্থনা করি এই উপায়ে হিন্দুধর্ম্মের প্রচার-ক্ষেত্র প্রতিদিন প্রশস্ততর হইয়া হিন্দুসমাজকে নবভাবে সঞ্জীবিত করিয়া তুলুক।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

বৈশাখ হইতে শ্রাবণ পর্য্যন্ত

১৮৫০ শক।

আয়	১৩৭০।/০
পূর্ব্ব স্থিত	১০১।০
সমষ্টি	১৪৭১৵০
ব্যয়	১৪৬৯॥/৯
স্থিত	১৸/৩

---

* **HINDU CONVERT.**

Statesman *22. 8. 28.*

IMPORTANT DECISION BY MADRAS JUDGE

(From our Correspondent.)

Madras, Aug. 20.

A question relating to the legal possibility of conversion from Christianity to Hinduism was raised in a petition filed by Mr. Ratansi D. Morarji, a millionaire of Bombay and a Member of the Council of State, for the issue of letters of administration, for the estate of his late wife Sulochana *alias* Mina Randa.

Mr. Justice Venkatasubba Rao decided this morning, that the conversion of a non-Hindu to Hinduism was possible historically, as well as by authority of case law. He was satisfied that the will referred to in the petition was made while Mr. Morarji was resident at Adyar and that her marriage to Mr. Morarji was a valid marriage and in accordance with Hindu law.

The facts of the case, as stated are, as follows:—Mina Randa was a woman of Austrian nationality. She was a Theosophist and a Hindu by conversion. She was a vegetarian and lived practically the life of a Hindu. She lived in India for several years until her death in 1923. At her own request she was converted to Hinduism on May 21, 1922. She adopted the Hindu name of Sulochana and soon after conversion married Mr. Morarji according to Vedic rites. The *kanyadanam* was performed by Mr. Bhatt.

The petitioner propounded the will of his wife, appointing him universal legatee. The will, though dated October 1922, was signed by the testatrix in her maiden Christian name and was not attested. The petitioner claimed the will as valid and as a Hindu will executed outside the limits of the original jurisdiction of the Madras High Court. Alternatively, he claimed that, if there was intestacy he should be entitled to letters of administration as the husband and next of kin of the deceased woman.

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিকদান	৬০০৲
হাওলাত জমা	৬৭৲
হাওলাত আদায়	৫৲
বণ্ডেড অয়্যার হাউস	৬৫৲
সস্‌পেন্স	১০০৲
বিবিধ	৶৹
সমষ্টি	৮৩৭৶৹

তত্ত্ববোধনী।

বকেয়া	১১৮/৹
হাল	২২।৶৹
বিজ্ঞাপন	৭৬॥৹
মাশুল	৮৸৶৹
সাহায্য	১০৲
সমষ্টি	২৩৫৸৶৹

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	১১১৲
কাগজের মূল্য	৮১/৩
ব্লকের মূল্য	২৫৸৵৯
সমষ্টি	২১৮৲

পুস্তকালয়।

ব্রাহ্মসমাজের পুস্তক	৬০॥৶৹
গচ্ছিত	১৫৵৹
কমিশন	২॥৶৹
মাশুল	॥৶৹
সমষ্টি	৭৯৶৹

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	২০৲
গায়ক	৬০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	১৫৲
হিসাবরক্ষক	৩০৲
বেহারা	৪৮৲
মেথর	৮।৹
সরঞ্জামী	৯।/৬
মাশুল	৫।৵৹
পাখাকুলি	২৸৹
Electric	১৫৸৵৹
পাখা মেরামত	১৫৲
কেরোসিন	৩/৬
টেক্স	৬৭॥৵৩
আলো মেরামত	১৲
হাওলাত শোধ	২৭৲
হাওলাত প্রদান	৮৲
বারবরদারী	৯॥৹
বিবিধ	৭৫৴/৩
সমষ্টি	৪২১৶

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজ	১১৮৻৬
দপ্তরী	২১৸৵৹
মাশুল	২৬৸৵৬
মূল্য আদায়ের কমিশন	১৪॥৹
কর্ম্মাধ্যক্ষ	১৫৲
হিসাবরক্ষক	৩০৲
বিজ্ঞাপনের কমিশন	১০॥৹
বিবিধ	।৬
সমষ্টি	২৩৫/৬

পুস্তকালয়।

গচ্ছিত পুস্তকের মূল্য শোধ	১০৸৹
কমিশন	১৩।৶৩
মাশুল	১।/৬
বিবিধ	॥৶৹
গীতারহস্যের মূল্য বাবত	৭৪৶৹
সমষ্টি	১০০।৵৯

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	১১২৲
কম্পোজিটর	১৬৫৸৵৯
প্রেসম্যান	৭৯।/৬
ইঙ্কম্যান	৪৭॥/৬
কাগজতোলা	২২৶৩
কর্ম্মাধ্যক্ষ	১৫৲
হিসাবরক্ষক	৩০৲
ছাপার কাগজ	৯৩।৹
প্রুফকাগজ	৩।৶৹
জলপানী	।৶৬
কালি	৬৵৹
তৈল	২।৹
তামাক	১॥৶৹
সাজিমাটী	১৵৬
রুলঢালা	৸৯
মাশুল	৸৵৹
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৩২।৯
লেই জন্য ময়দা	৸৬
দপ্তরী	১১৲
বিবিধ	৯।৯
ব্লক তৈয়ারী	৫২॥৶৹
শিরীষ	১/৬
ব্রাস	॥৹
দড়ি	।৬
লাইসেন্স	১২৲
সমষ্টি	৭০২৻৯

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

আত্মপ্রসারণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধটীতে শ্রদ্ধাস্পদ লেখক মহাশয়, নৈতিক চরিত্র গঠন করিতে হইলে কি আদর্শে করা উচিত, তাহাই সংক্ষেপে বিবৃত করিয়াছেন। "মনে রাখিতে হইবে—ভগবানের এমনই বিধান যে, স্বার্থ ও পরার্থে মেলামেশা করিয়া লইতে হইবে।...কোটি কোটি মানব, অগণ্য জীবজন্তু তাঁহার বিশ্বরাজ্যের অধিবাসী; কাযেই সকলের স্বার্থে তোমার স্বার্থ, তোমার স্বার্থে সকলের স্বার্থ। সকলকে তোমার জন্য ভাবিতে হইবে, তোমাকে সকলের জন্য ভাবিতে হইবে।...এইটীর নাম আত্মপ্রসারণ।" ইহাই সকল সত্যধর্ম্মের মূল। ইহাকেই সমবেদনা বলে। ভগবানের ভালবাসা পাইতে হইলে, তাঁহার যথার্থ উপাসক হইতে হইলে, আমাদের আত্মপ্রসারণের সাধক হইতে হইবে"।

পরিশেষে আমাদের বক্তব্য, এই আত্মপ্রসারণতত্ত্ব শুধু এদেশের জন্য নহে, সকল দেশে সকল যুগেই এই সত্য প্রচারিত হইয়াছে। ঈশা, বুদ্ধ এই সত্যই বিলাইয়াছেন। উপনিষদে ত্যাগের দ্বারা অমৃতত্ব লাভের কথা আছে; পাশ্চাত্য দার্শনিক-প্রবর হেগেলও বলিয়া গিয়াছেন—Die to live.

মানসী ও মর্ম্মবাণী—জ্যৈষ্ঠ, ১৩৩৫ সাল।

সত্যধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিয়া প্রাণের অন্তস্তল হইতে সমুদ্ভূত সত্যের প্রেরণার উপর ধর্ম্মবিশ্বাস স্থাপন করিয়া সত্য লক্ষ্যে উপনীত হইবার জন্য চেষ্টা করা প্রত্যেক মানবের কর্ত্তব্য।—এই তত্ত্ব এই পুস্তিকায় প্রচারিত। তিনি বলিতেছেন—"প্রত্যেক উপধর্ম্মেই সত্য নিহিত আছে, কিন্তু প্রত্যেক উপধর্ম্মই সত্য নহে।" ভাষা প্রাঞ্জল ও হৃদয়গ্রাহী।

সুবর্ণবণিক সমাচার—বৈশাখ, ১৩৩৫ সাল।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 432

সংখ্যা ১০২২ আশ্বিন

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫। ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৫। শক ১৮৫০। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯। আশ্বিন।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ।৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

২নং চিত্র—খড়িয়া দেউল—খিচিং

৬নং চিত্র—ভগ্নমন্দিরের প্রাচীরের পার্শ্বফলক—খিচিং

৭নং চিত্র—কার্ত্তিকেয়, সিঙ্গরাজ—খিচিং
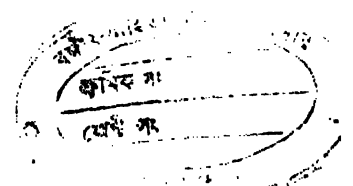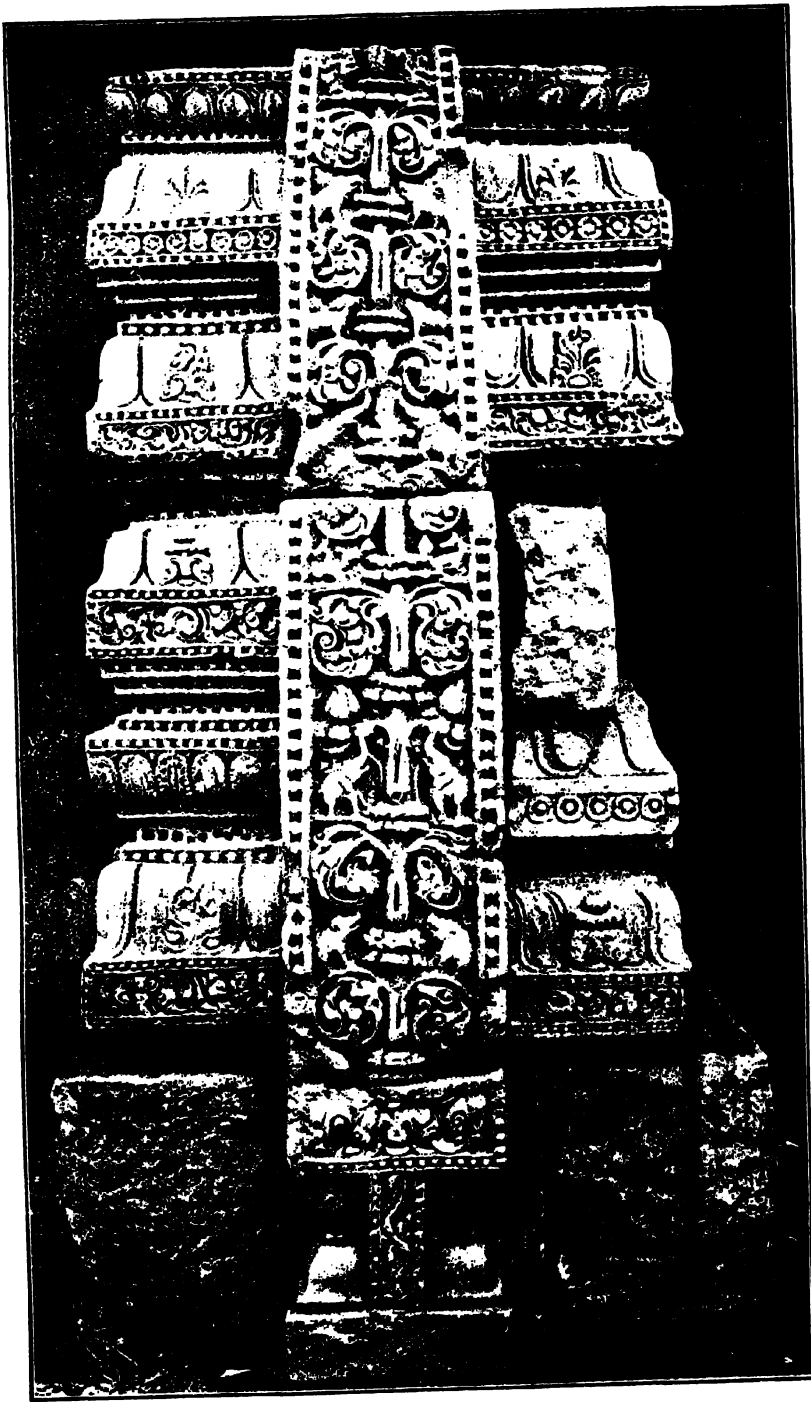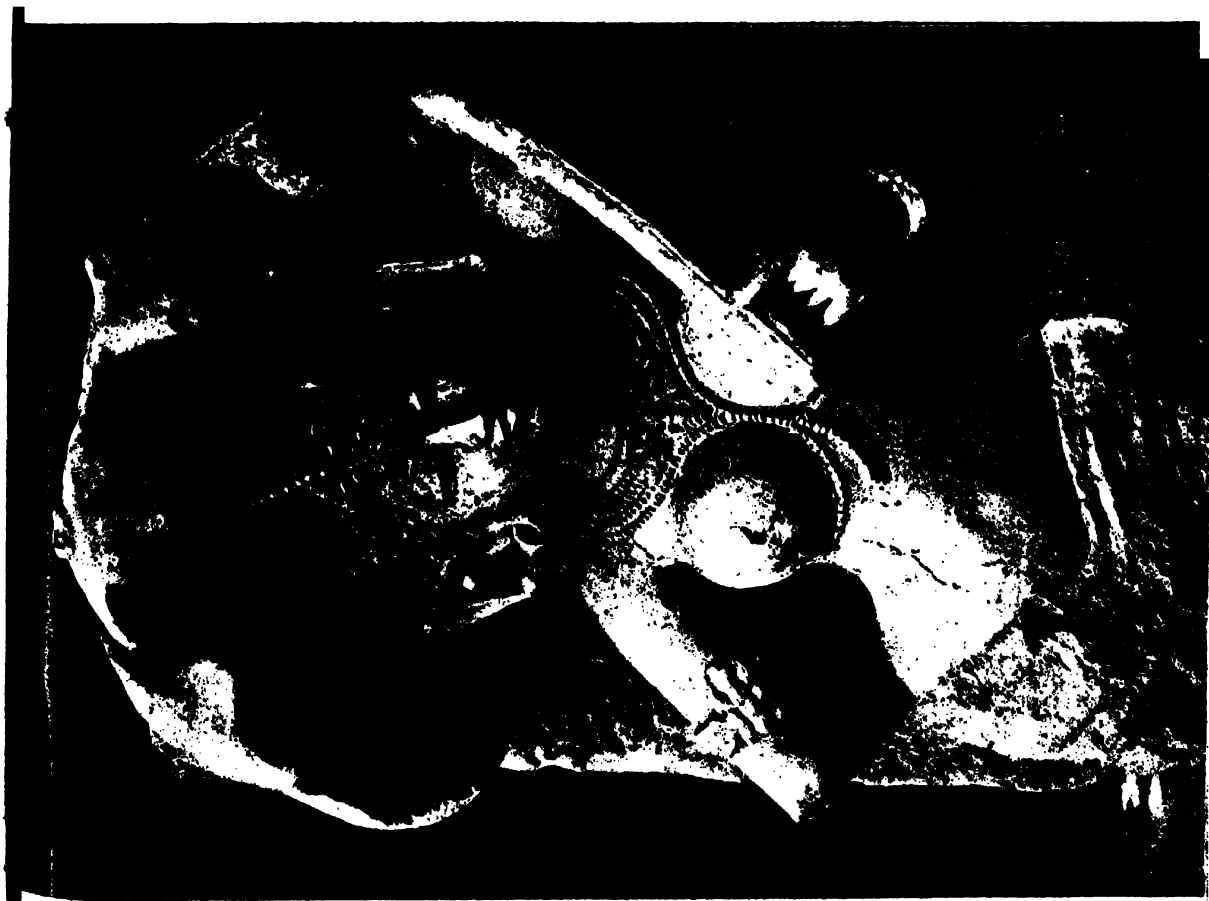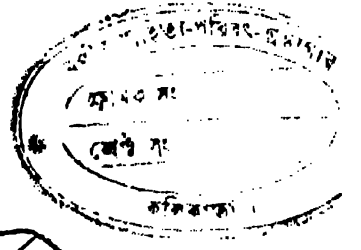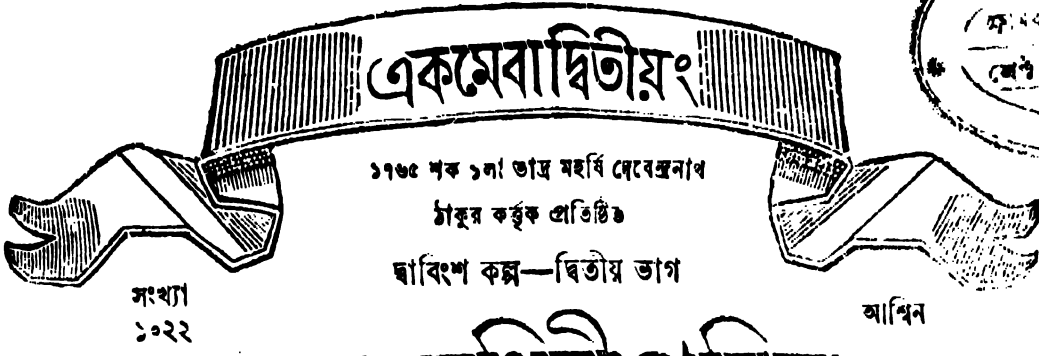
৮নং চিত্র—শিখরের কারুকার্য্য, ভগ্নমন্দির—খিচিং

৯নং চিত্র—নাগিনীদ্বয়—খিচিং

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫। ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০১ অঞ্জলি—অধর্ম্মনাশন দেবতা।

১। তুমি দুর্ব্বলের বল। আমরা আর পারি না—তুমি আমাদের শত্রুগণের শত্রুতা তোমার বজ্রদণ্ডে বিনষ্ট করিয়া দাও। তুমি আমাদিগকে সুনির্ম্মল আনন্দে ডুবাইয়া রাখ। নিয়ত তোমার চরণ বন্দনা করিবার অধিকার আমাদিগকে প্রদান কর। রিপুগণ যখন তীব্র দংশনে আমাদিগকে জর্জ্জরিত করিতেছিল, তখন তুমিই তাহাদিগকে তোমার বজ্রদণ্ডে বিতাড়িত করিয়াছিলে। তখন রিপুগণকেই প্রভু ভাবিয়া তাহাদের আশ্রয় যাহারা গ্রহণ করিয়াছিল, তাহাদের চক্ষু হইতে সে আবরণ খসিয়া গেল।

২। হে ঈশ্বর! তুমিই আমাদিগকে পৃথিবী হইতে শস্য উৎপাদন করিবার কৌশল শিক্ষা দিয়াছ। তোমারই আনন্দকণা লাভ করিয়া জীবসকল আনন্দিত হয়। সকল বিপদ আপদ হইতে তুমি নিয়তই আমাদিগকে রক্ষা করিয়া আসিতেছ। তোমাকেই প্রভু বলিয়া আমরা বরণ করিয়াছি।

৩। তুমি অমাদের মধ্যে সেনাপতিরূপে উপস্থিত হও। আমরা সংগ্রামে অগ্রসর হই। শত্রুগণ পরাভূত হৌক। তুমি অপরাজেয়। তোমার গতি সর্ব্বত্র—যেখানে ব্যোমও যাইতে পারে না, সেখানেও তোমার গতি অবাধ। পাপরিপুগণ আমাদিগকে অত্যন্ত সন্তাপ দিতেছে। তুমি তাহাদিগকে বিনষ্ট কর। আমাদের মস্তকে তোমার শান্তিজল বর্ষণ কর।

৪। তুমি আমাদিগকে অন্তরের রিপুগণ হইতে রক্ষা কর। তুমি আমাদিগকে বাহিরের শত্রুগণ হইতে রক্ষা কর। আমাদের অন্তরের বায়ুসকল সমতা প্রাপ্ত হইয়া তোমার সহিত আমাদের নিত্য যোগসাধনে সহায় হৌক। বাহিরের বায়ু ও জল সুমিষ্ট ও মধুময় হইয়া আমাদের সর্ব্বতোভাবে অনুকূল হৌক।

৫। হে ভগবান! তুমিই আমাদের ইহলোকে ও পরলোকে একমাত্র সহায়। তুমি আমাদের অন্তরের ষড়রিপুকে সংহার কর। তুমি আমাদিগকে বহিঃশত্রুগণের অন্যায় ষড়যন্ত্র হইতে রক্ষা কর। তুমি আমাদিগকে অন্তরে বাহিরে প্রভূত ধনসম্পদের অধিকারী কর, যাহাতে আমরা অক্লান্তভাবে তোমার পতাকা জগতের সর্ব্বত্র বহন করিয়া ঘুরিতে পারি এবং রাজসূয় যজ্ঞের অশ্বের ন্যায় বিজয়ী হইয়া গৃহে ফিরিতে পারি।

৬। তোমার শতধার বজ্রের দ্বারা আমাদের শত্রুগণের সকল কলকৌশল শতধা বিচ্ছিন্ন করিয়া দাও, তাহাদের ষড়যন্ত্রসকল বিফল করিয়া দাও। আমাদের গৃহ জ্ঞানে ধর্ম্মে ও কর্ম্মে সমুন্নত কর। শত্রুগণ তোমার কার্য্য দেখিয়া স্তম্ভিত হইয়া যাক।

৭। আমাদিগকে শত্রুগণ নানা উপায়ে নিষ্পিষ্ট করিবার চেষ্টা করিতেছে। আমরা জানি, সেই নিষ্পেষণের ভিতর হইতেই তোমার প্রসন্ন মূর্ত্তি প্রকাশিত হইবে। তোমার মঙ্গল বিধানে শত্রুগণ স্বরচিত অগ্নিদাহে দগ্ধ হইবে জানি। কিন্তু হে দয়াময়, তাহার পূর্ব্বেই যেন আমাদিগকে শত্রুগণের অথবা তাহাদের বন্ধুগণের নিকট মস্তক অবনত করিতে না হয়।

৮। হে মহাশক্তি ভগবান! তোমার বজ্রের আঘাতে অধর্ম্মের উপর প্রতিষ্ঠিত শতসহস্র রাজ্য সাম্রাজ্য বিধ্বস্ত হইয়া গিয়াছে। ইহা জানিয়াও শত্রুগণ অধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করে ইহাই আশ্চর্য্য। তোমার বলবীর্য্যের অমিত তেজের সম্মুখে দাঁড়ায় কাহার সাধ্য? তুমি তোমার সেই তেজ প্রকাশ করিয়া শত্রুগণের বিনাশ সাধন কর এবং আমাদিগকে রক্ষা কর।

৯। যুগে যুগে কোটী কোটী নরনারী তোমার অর্চ্চনা করিয়া আসিয়াছে। শতসহস্র সংসার-বিরাগী মনুষ্য সংসারের সমস্ত সুখ বিসর্জ্জন দিয়া তোমার অন্বেষণে ফিরিয়া তোমাকে লাভ করিয়া আনন্দে আত্মহারা হইয়া গিয়াছেন। আমাদিগকেও তুমি আমাদের কর্ম্মের পরিসমাপ্তিতে তোমাকে জানিয়া তোমার চরণস্পর্শ করিবার অধিকার ও ক্ষমতা প্রদান কর।

১০। হে ভগবান! চারিদিকে অধর্ম্ম মাথা তুলিয়া দাঁড়াইবার চেষ্টা করিতেছে। অধর্ম্মের উত্তাপটা ক্রমশঃ আমাদের অসহ্য হইয়া উঠিতেছে। হে প্রভু! হে নাথ! তুমি তোমার উচ্চ সিংহাসন হইতে একবার অবতরণ কর এবং তোমার দুর্দ্ধর্ষ তেজে অধর্ম্মকে সংহার কর। তোমার ভক্তগণ সুরক্ষিত হোক।

১১। হে ভগবান! তুমি ভয়ানকের ভয়ানক। যাহারা অধর্ম্মের পথে অগ্রসর হয়, তাহাদের জন্য তোমার মহাভয়ানক বজ্র সর্ব্বদাই উদ্যত থাকে। আমরা তোমার সেবক। আমরা তোমার পতাকা বহন করিব এবং সর্ব্বদা তোমারই বিজয়বার্ত্তা ঘোষণা করিব।

১২। আমাদের শত্রুগণ চারিদিক হইতে আমাদের নিশ্বাস রোধ করিয়া মারিবার চেষ্টায় আছে। হে দয়াল ভগবান! তোমার নিত্যনব অস্ত্রের দ্বারা তাহাদের সেই সকল চেষ্টা বিফল করিয়া দাও। প্রভু! দয়া কর; প্রভু! দয়া কর—আমাদিগকে একটুখানি শান্তিতে বাস করিতে দাও।

১৩। আমাদের শত্রুগণ চারিদিকে বড়ই তর্জ্জন গর্জ্জন করিতেছে। তাহাদের সেই গর্জ্জন শুনিয়া আমাদের প্রাণ সময়ে সময়ে বড়ই ব্যাকুল হইয়া পড়ে। কিন্তু তোমার বিমল জ্যোতি যখন আমাদের মুখের উপর নিপতিত হয়, তখনই আমাদের সেই ভয় ব্যাকুলতা সকলই ত্বরিতবেগে অন্তর্হিত হইয়া যায়।

১৪। অধর্ম্ম যখন সংসারকে বড়ই অভিভূত করে, তখন তোমার উদ্যত বজ্র ঘোর নিনাদ করিয়া নামিয়া আসে। সেই নিনাদে আকাশ ভরিয়া যায় এবং গগন ভুবন বিকম্পিত হইয়া উঠে। তখন সকলে তোমার বল প্রত্যক্ষ করিয়া তোমার চরণে মস্তক অবনত করে।

১৫। সংশয়াত্মা ও অশ্রদ্ধাবান লোকেরা তোমাকে জানিতে পারে না। তোমাকে জানিতে না পারিবার কারণে তাহারা মৃত্যুরই পথে অগ্রসর হইতে থাকে। শ্রদ্ধাবান লোকেরা তোমার বরাভয়প্রদ মধুর মূর্ত্তি দেখিয়া বিমুগ্ধ হইয়া যায়, এবং তোমার চরণে আত্মবিক্রয় করে।

১৬। হে ভগবান! তুমি আমাদের পিতা। তোমার চরণে শত শত বার প্রণাম করি। তুমি আমাদের মাতা, তোমার চরণে শত শত বার প্রণাম করি। তুমি আমাদের বন্ধু ও গুরু, তোমার চরণে শত শত প্রণাম করি।

সার্ব্বজনীন ব্রহ্মোৎসবে উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

[১৬ই ভাদ্র, ৯৯ ব্রাহ্মসংবৎ, ১৮৫০ শক]

ভগবানের নামে আজ আমরা আনন্দিত চিত্তে এখানে সমবেত হইয়াছি। তিনিই আমাদের পূজার একমাত্র পাত্র। এই উৎসবের প্রারম্ভে হৃদয়ের সমুদয় শ্রদ্ধাভক্তি তাঁহারই চরণে নিবেদন করিয়া সর্ব্বাগ্রে তাঁহাকেই প্রণিপাত কর।

ভগবানের মঙ্গল বিধান এই যে, যখনই এবং যেখানেই কৃষ্ণবর্ণ ঘন মেঘের আকারে ধর্ম্মের গ্লানি আসিয়া উপস্থিত হয় এবং অধর্ম্ম সগর্ব্ব পদক্ষেপে বিচরণ করিতে থাকে, তখনই এবং সেখানেই অসাধুতার বিনাশসাধন পূর্ব্বক জগতসংসারে সাধুতাকে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য ভগবৎপ্রবর্ত্তিত সত্যধর্ম্ম স্বীয় উজ্জল মূর্ত্তিতে আত্মপ্রকাশ করে। শতাব্দীপ্রায় পূর্ব্বে অধর্ম্মের ঘন মেঘজাল আমাদের প্রিয় জন্মভূমি এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলিয়াছিল। দ্বেষবিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মসমুত্থিত দ্বন্দ্ববিবাদ সমগ্র ভারতসমাজকে ছিন্নভিন্ন করিয়া মৃত্যুমুখে অগ্রসর করিয়া দিবার কারণে ভারতবাসীর প্রাণ আকুল করিয়া তুলিয়াছিল। যে ভারতভূমির তপোবনসকল ভগবানের স্তুতিগানে অহর্নিশি মুখরিত হইত, সেই ভারতের মুমূর্ষু অবস্থা দেখিয়া ভগবানের সিংহাসন টলিয়া উঠিল। তাঁহার দক্ষিণ করুণানিশ্বাস প্রবাহিত হইয়া এক ফুৎকারে সেই অন্ধকার মেঘজাল কোথায় উড়াইয়া দিল। তাঁহার আদেশে ভারতগগনে জীবনপ্রদ সত্যধর্ম্মের সুবিমল জ্যোতি পুনঃপ্রকাশিত হইয়া ভারতবাসীর হৃদয়ে আনন্দধারার এক আশ্চর্য্য উৎস খুলিয়া দিল। ভগবান তাঁহার সুমঙ্গল বিজয়বিষাণ বাজাইয়া দিলেন। তাঁহার পতাকার নিম্নে কত ভক্ত অনুচর আসিয়া সমবেত হইলেন। সেই সকল ভক্তগণের অগ্রণীস্বরূপে ভগবানের আদেশে রাজা রামমোহন রায় সত্যধর্ম্মের আদিমতম প্রচারভূমি এই ভারতভূমিতে নবতরভাবে সত্যধর্ম্মের বিজয় ঘোষণা করিয়া ভারতের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিলেন। সেই সত্যধর্ম্মের সঞ্জীবনী শক্তির নবতর স্পর্শে আমাদের মনপ্রাণ শক্তিময় হইয়া উঠুক; দেশবাসী নূতনভাবে জাগ্রত হইয়া উঠুক এবং অমৃত পুরুষের সংস্পর্শে অমরত্বে অভিষিক্ত হউক।

ভগবানের আদেশে সেই যে শতাব্দীপ্রায় পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় নির্ভীকহৃদয়ে সত্যধর্ম্মের বিজয়ভেরী নিনাদিত করিয়াছিলেন, বর্ত্তমান যুগে আজ অনেক বৎসর বাদে তাহারই সবল প্রতিধ্বনিতে জগদ্ব্যাপী মহাজাগরণের এক আশ্চর্য্য সাড়া পড়িয়া গিয়াছে। সেই ভেরীনিনাদের প্রতিধ্বনি কেবল যে এদেশেই শোনা গিয়াছে তাহা নহে। যতই দিন যাইতেছে, ততই ইহার প্রতিধ্বনি দিকদিগন্ত ব্যাপ্ত করিয়া দেশে বিদেশে গর্জ্জিয়া উঠিতেছে। তাই কেবলমাত্র ভারতে নহে, কিন্তু জগতের সর্ব্বত্রই এই মহাজাগরণের সাড়া পড়িয়াছে। চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই উপলব্ধি করিবেন যে, সমগ্র মানবসমাজে জাগরণের জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছে। সংসারের ঊষরতা বিদূরিত করিয়া সংসারকে সারবান করিবার জন্য ভগবান যে জাগরণকে জগতে প্রেরণ করিয়াছেন, অর্গলরূপে তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাহাকে প্রতিরুদ্ধ করিবার বৃথা চেষ্টা করিও না, তাহাকে ব্যর্থ করিবার বৃথা প্রয়াস পাইও না। প্রত্যুত, এই জাগরণের সাহায্যে তুমি আপনাকে, তোমার সমাজকে, তোমার দেশকে, শতবিধ জ্ঞানে কর্ম্মে বিভূষিত কর এবং সর্ব্বপ্রকার সাধুভাবে শ্যামল ও সুন্দর করিয়া তোল।

চক্ষুকর্ণ খুলিয়া দেখ—এই জোয়ারের কলকল ধ্বনিতে জাগিয়া উঠিয়া জগতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত দেশবিদেশ হইতে কত অগণিত যাত্রী সত্যধর্ম্মের অমৃত সংগ্রহের উদ্দেশ্যে অনন্যমনে অমৃতধামের পথে নির্ভীকহৃদয়ে ছুটিয়া চলিয়াছে। সত্যধর্ম্মের মূলমন্ত্র—একমাত্র মূলমন্ত্র হইতেছে 'ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের প্রীতিহবি নিবেদন করিয়া তাঁহারই প্রিয়কার্য্যসাধনে নিরত থাকা। ভারতের ঋষিমুনিরাই সর্ব্বপ্রথম সত্যধর্ম্মের এই বীজমন্ত্র প্রত্যক্ষ করিয়া বলের সহিত প্রচার করিবার ফলে এই ভারতভূমি ধন্য হইয়াছে এবং জগতের তীর্থক্ষেত্রে পরিণত হইয়াছে। সত্যধর্ম্মের আদিমতম প্রচারভূমি এই পুণ্যভূমি ভারতের অধিবাসী হইয়া অমৃতসংগ্রহে আমরা যেন সকলের পশ্চাতে পড়িয়া না থাকি, নিদ্রা ও আলস্যকে আঁকড়াইয়া ধরিয়া যেন মৃত্যুকে না ডাকিয়া আনি। জগতে জাগরণের যে জোয়ার আসিয়া পড়িয়াছে, সেই জোয়ারের মুখে আমোদপ্রমোদের মোহমদিরা পান করিয়া, নৃত্যগীতের নেশার ঘোরে আত্মহারা হইয়া থাকিলে মৃত্যু সুনিশ্চিত। মৃত্যুকে অতিক্রম করিয়া যদি জীবনলাভ করিতে চাও, তবে সত্যধর্ম্মের সবল আশ্রয়ে ব্রহ্মনামের কল্যাণ-কবচ অন্তরে সযত্নে ধারণ কর। শতবিধ উপধর্ম্মের কঠিন আবরণ ভেদ করিয়াও সত্যধর্ম্মের বিজয়বার্ত্তা ভারতবাসীর অন্তরে সজোরে ধ্বনিত হইতেছে বলিয়াই আজ পর্য্যন্ত ভারতবাসী মরে নাই—মরিতে মরিতেও সে বাঁচিয়া উঠিতেছে; যুগযুগান্তরের দাসত্বের কঠোরতম নিষ্পেষণও আজ পর্য্যন্ত তাহার জীবনীশক্তিকে নির্ম্মূল করিতে পারে নাই। পিতৃপুরুষদিগের উত্তরাধিকারসূত্রে ভারতবাসী সত্যধর্ম্মকে

লাভ করিয়া, সকল উপধর্ম্মের মূলে সত্যধর্ম্মকে স্থান দিয়াছে বলিয়াই, শতাব্দীপ্রায় পূর্ব্বে রাজা রামমোহন রায় সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতালাভের জন্য সত্যধর্ম্মের পতাকা উড়াইয়া যে সংগ্রাম ঘোষণা করিয়াছিলেন; শতাব্দীপ্রায় পরে বর্ত্তমান যুগে দেশের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতালাভের জন্য সর্ব্ববিধ অযথা বন্ধনের বিরুদ্ধে যে প্রবল সংগ্রাম চলিয়াছে, আজ ভারতবাসী সুপ্তোত্থিত সিংহবিক্রমে সেই সংগ্রামের আহ্বানে কেবল সাড়া দিতেছে না, কিন্তু সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়া বিজয়লাভের পথে চলিয়াছে।

সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতালাভের সংগ্রামে এই আহ্বান তোমার আমার আহ্বান নয়। ইহা সত্যধর্ম্মের আহ্বান এবং সত্যধর্ম্মের ভিতর দিয়া ইহা ভগবানেরই মঙ্গল আহ্বান। সমস্ত প্রকৃতিরাজ্য যাঁহার ইঙ্গিতমাত্রে নিয়মিত হইতেছে এবং মঙ্গলের পথে পরিচালিত হইতেছে; যিনি সর্ব্বদর্শী মনের নিয়ন্তা; যিনি আমাদের প্রত্যেকের আত্মার আত্মা ভূমা পরমাত্মা, এই আহ্বান সেই ভগবানেরই মঙ্গল আহ্বান। সত্যধর্ম্ম গ্রহণের জন্য, সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার সংগ্রামে অবতীর্ণ হইবার জন্য ভগবানের আহ্বান যখন তোমরা অন্তরে শ্রবণ করিয়াছ, তখন এদিকে ওদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ না করিয়া তাঁহার আদেশ গ্রহণ কর—স্বাধীনতার সংগ্রামে নির্ভয়ে অবতীর্ণ হও। আপনাকে দুর্ব্বল ভাবিয়া দুর্ব্বল করিয়া তুলিও না। সর্ব্ববিধ সংশয়, সর্ব্বপ্রকার হৃদয়দৌর্ব্বল্য হইতে নিজেদের মুক্তি ঘোষণা কর—দেখিবে এই মুহূর্ত্তেই অন্তরের ও বাহিরের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্বাধীনতা তোমাদের হস্তগত হইবে।

চারিদিক হইতেই ভগবানের মাভৈ-রবের দুন্দুভি বাজিয়া উঠিতেছে; দেশে বিদেশে সর্ব্বত্র মানবাত্মার স্বাধীনতার বিজয়বার্ত্তা মুক্তকণ্ঠে প্রচারিত হইতেছে। চারিদিকের লক্ষণসকল মনোযোগের সহিত নিরীক্ষণ কর—দেখিবে, ভারতেরও স্বাধীনতাসংগ্রামে বিজয়লাভ অদূরবর্ত্তী। এমন শুভ মুহূর্ত্তে অগ্রসর হইতে পরাংমুখ হইও না। হৃদয় হইতে নিরাশা ও নিরানন্দকে নির্ব্বাসিত করিয়া দাও। ভগবানকে মঙ্গলবিধাতা জানিয়া তাঁহার হস্তে কর্ম্মফল সমর্পণ করিয়া তাঁহার প্রিয় শুভকর্ম্মসমূহের অনুষ্ঠানে একনিষ্ঠ হৃদয়ে নিরত হও এবং নির্ভয় হও।

সত্যধর্ম্ম যেমন সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও স্বাধীনতার অক্ষয় উৎস, সত্যধর্ম্ম তেমনি মিলনেরও সুদৃঢ় ভিত্তিভূমি। পরমাত্মার সঙ্গে মানবাত্মার প্রত্যক্ষ ও একান্ত যোগ যে সত্যধর্ম্মের মূলপ্রাণ; যে সত্যধর্ম্মে সাম্প্রদায়িকতার লেশমাত্রেরও সমাবেশ থাকা অসম্ভব; এবং ভগবান নিজের হাতে যে সত্যধর্ম্ম প্রত্যেক নরনারীর অন্তরে খোদিত করিয়া দিয়াছেন, সেই সত্যধর্ম্ম ব্যতীত আর কি-ই মিলনের দৃঢ়তর ভিত্তি হইতে পারে? সত্যধর্ম্মের দক্ষিণপক্ষ হইতেছে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা; তাহার বামপক্ষ হইতেছে মৈত্রীসাধন। এই তত্ত্ব হৃদগত করিয়াই রাজা রামমোহন রায় গাহিলেন—ভয় করিলে যাঁরে না থাকে অন্যের ভয়, যাঁহারে করিলে প্রীতি জগতের প্রিয় হয়; এই তত্ত্ব হৃদগত করিয়াই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ মৃত্যুশয্যায় শয়নকালে ব্রহ্মোপাসকদিগকে যে উপদেশগুলি দিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই অমূল্য উপদেশ সন্নিবিষ্ট ছিল—মৈত্রীই যেন তোমাদের ব্যবহারের নিয়ামক হয়; এই তত্ত্ব হৃদগত করিয়াই ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র ধর্ম্মসমন্বয়সাধনে উদ্যত হইয়াছিলেন।

আজ আমরাও দেশবাসী সকলকেই সাদরে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—সত্যধর্ম্মের উপর দাঁড়াইয়া সকলে একপ্রাণে মিলিত হও এবং মৈত্রীকে ব্যবহারের নিয়ামক কর। মৈত্রীসাধনের পথে অগ্রসর হইলে অশান্তি ও অসদ্ভাব অচিরেই অন্তর্হিত হইবে। আমাদের পরস্পরের মধ্যে বিরোধবিবাদ পরিত্যাগ না করিলে উন্নতির আশা সুদূরপরাহত। প্রাতঃস্মরণীয় গীতাকার হিন্দুদিগের নিত্যপাঠ্য ভগবদ্গীতায় গৃহবিবাদের বিষময় পরিণাম অতি সুন্দর ও সুস্পষ্ট ভাষায় ব্যক্ত করিলেও, দুঃখের বিষয়, ভারতের অধঃপতনের প্রধান কারণই হইল গৃহবিবাদ। ভারতের পুরাকালীন উন্নত অবস্থার সহিত অন্তর্বিবাদজনিত বর্ত্তমান দারুণ অধঃপতিত অবস্থা তুলনা করিলে অশ্রুসম্বরণ দুরূহ হয়। গৃহবিবাদজনিত বিদ্বেষভাবের ফলে আমাদের মধ্যে একতা দাঁড়াইতেই পারিতেছে না। ইহারই ফলে আমরা এত মলিন, এত দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছি। আমরা প্রত্যক্ষ করিতেছি যে, বর্ত্তমান যুগের জগদ্ব্যাপী কর্ম্মক্ষেত্রে পরস্পরের মধ্যে আন্তরিক মিলন ও সাহচর্য্য অপরিহার্য্য।

আজিকার উৎসবের যজ্ঞক্ষেত্রে দাঁড়াইয়া হৃদয়দুয়ার বন্ধ করিও না। অন্তস্তলে জীবনের স্পর্শ প্রবেশ করিতে দাও; মঙ্গলবায়ুর স্পর্শে আমাদের চিত্তকমল প্রস্ফুটিত হইয়া উঠুক। মতামত লইয়া বিবাদবিসম্বাদ দূর করিয়া দাও। কথাকাটাকাটির উপর মারামারি করিবার, বৃথা তর্কবিতর্কে নিজেদের ধ্বংসসাধনের আর সময় নাই। এখন মৈত্রীভাবকে লক্ষ্য রাখিয়া বিগতবিবাদং ভগবানের প্রিয়কার্য্য সাধনে জীবন সমর্পণ কর। তাঁহারই মঙ্গলদৃষ্টির উপর স্থিরদৃষ্টি রাখিয়া দেশের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হও। স্মরণ হইতেছে যে, দূরদর্শী রাজা রামমোহন রায় একস্থলে বলিয়াছেন যে, তাঁহার প্রচারিত মৈত্রীসাধক সত্যধর্ম্ম তাঁহার সমসাময়িক দেশবাসী উপলব্ধি করিতে না পারিলেও শতবর্ষ পরে দেশবাসীগণ

ইহার গুরুত্ব উপলব্ধি ও স্বীকার করিতে বাধ্য হইবেন। তাঁহার সেই ভবিষ্যদ্বাণী আজ অক্ষরে অক্ষরে সফল হইবার সময় উপস্থিত।

রাজা রামমোহনের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া আমরা ভারতবাসীকে উদ্বুদ্ধ করিয়া বলিতে চাই যে, একেশ্বরবাদকে কেন্দ্রে রাখিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিকে মূল লক্ষ্য রাখিয়া মৈত্রীসাধনের সঙ্গে সঙ্গে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার জন্য যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া সত্যধর্ম্মকে জয়যুক্ত কর। শোন—ভগবানের অন্তরবাণী প্রতিমুহূর্ত্তেই গর্জ্জিয়া উঠিয়া বলিতেছে—নিদ্রালস্য দূর করিয়া জাগ্রত হও এবং বিরোধবিবাদ দূর করিয়া শুভ কর্ম্মসাধনে আপনাকে নিযুক্ত কর। অন্য সমস্ত কথা পরিত্যাগ করিয়া সরল পথে পরমপিতা পরমেশ্বরেরই চরণে উপস্থিত হও।

যদি বাঁচিতে চাও, তবে মৃত্যুর অনুচরগণের সঙ্গে সংগ্রামে প্রবৃত্ত হও। সকল বলের বল পরমেশ্বরের নিকট বল ও শক্তি সঞ্চয় কর। অমৃত পুরুষের সংস্পর্শে অমরণধর্ম্মী হও। কুসংস্কার সকল উন্মূলিত কর। অধর্ম্মের সঙ্গে ধর্ম্মসংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিও না। সংসারের প্রতিদ্বন্দ্বিতাক্ষেত্রে যদি উন্নতির শিখরদেশ অধিকার করিতে চাও, বিজয়ীর গৌরব যদি অনুভব করিতে চাও, তবে অনিষ্টকর বৃথা আমোদপ্রমোদ পরিত্যাগ করিয়া সত্যধর্ম্ম অবলম্বনে অন্তরে জ্ঞানের প্রদীপ প্রজ্জ্বলিত কর; প্রেমে সকলের মধ্যে আপনাকে প্রসারিত করিয়া দাও, এবং শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে সকলের অগ্রণী হও। সুখ ও সোয়াস্তির কামনায় পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না। ধর্ম্মকর্ম্মে অগ্রসর হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে জয়যুক্ত কর এবং ব্রহ্মোৎসবকে সার্থক কর।

—

আগমনে।

(কথক শ্রীহেমচন্দ্র মুখোপাধ্যায় কবিরত্ন)

মহারাজ, এলে যদি দীনের কুটীরে
নাহি হেথা আয়োজন
নাহি পাতা সিংহাসন
এস, তবু এস প্রভু, যেওনাক' ফিরে।

তোমারি এ রাজ্যে আমি তব প্রজা নাথ
—রাখিয়াছ এই ভাবে
যা দিয়েছ তাই পাবে
বুঝি নাই আগমন হবে অকস্মাৎ!

আজি দিব এ দীনের যাহা কিছু আছে
হোক্ সে মলিন, দীন
ভগ্ন, ছিন্ন ধূলিলীন
আমারে কি সাজে লাজ আর তব কাছে?

এই যে ঝরিছে মোর নয়নে আসার—
বোঝ না কি ঝরে কেন?
তুমি তো আমারে চেনো
তুমি তো সকলি জানো হে প্রিয় আমার!

এ দীন করেনি' হেন আশাতীত আশা
আমার ভবনে কভু
তব আগমন প্রভু
হ'তে পারে? দিয়েছি কি এত ভালবাসা?

হাসিব না কাঁদিব, তা বুঝিতে না পারি—
সুখ মৃদু কেঁদে উঠে
দুঃখ আজি হেসে ফুটে
কেবলি যে দু'নয়নে ঝরিতেছে বারি!

—

হিন্দুসংগঠনের প্রয়োজন।

বরিশাল হিন্দুসম্মেলনে সভাপতির অভিভাষণ।

(শ্রীসত্যচরণ শাস্ত্রী)

যে বিরাট পুরুষের অঙ্গ হইতে আমরা সকলে উৎপন্ন হইয়াছি, আমাদের সকলের আদিপুরুষ সেই পরব্রহ্মকে কোটি কোটি প্রণাম। লোকোত্তর শক্তিসম্পন্ন আমাদের পূর্ব্বজগণকেও আমাদের কোটি কোটি প্রণাম।

"জীর্ণা তরী সরিদিয়ং চ গভীরনীরা
নক্রাকুলা বহতি বায়ু রতিপ্রচণ্ডঃ।
ভার্য্যাঃ স্থিরশ্চ শিশবশ্চ তথৈব বৃদ্ধা-
স্তৎকর্ণধারভুজয়োর্বলমাশ্রয়াম॥"

ভগবান শুক্রাচার্য্য বলিয়াছেন, "জগতে কেহই অযোগ্য নহেন, কিন্তু যোজকই সুদুর্লভ।" একটা প্রকাণ্ড এঞ্জিনের একটা ক্ষুদ্র স্ক্রু উপযোগিতা তাহার বড় চাকা হইতে কম নহে। উপযুক্ত স্থানে স্ক্রু সংযুক্ত হইলে সে অদ্ভুত কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। আমরা কেহ হীন নহি, আমরা কেহ ছোট নহি। এই সংযোজনার জন্য কেহ স্ক্রুকে ধন্যবাদ দেয় না, সমস্ত ধন্যবাদের পাত্র কারুকর—সংযোজক। আমার ভালমন্দের দায়ী আপনারা। এই যোজনার জন্য আমি আপনাদের কাছে বিনয়ের সহিত কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করিতেছি।

হিন্দুর ক্ষয়রোগ।

সকল প্রকার রোগের মধ্যে ক্ষয়রোগ দুশ্চিকিৎসা, মারাত্মক ও ক্লেশপ্রদ। আমাদের হিন্দুসমাজে এই দারুণ রোগ প্রবেশ করিয়াছে। ইহার প্রভাবে দিনে দিনে আমরা ক্ষীণ হইতেছি, দুর্ব্বল হইতেছি, মৃত্যুমুখে দ্রুতবেগে ধাবিত হইতেছি। ক্ষয় নানারূপে দেখা

দিয়াছে, ইহা রোধ করিবার জন্য সংস্কারের প্রয়োজন। যথায় সংস্কার নিপুণতার সহিত অনুষ্ঠিত হয়, তথায় জীবনীশক্তি সুপ্রতিষ্ঠিত থাকে। ক্ষয় স্বভাবধর্ম্ম—ক্ষয়রূপ দারুণ আপৎ দূর করিবার জন্য অতি প্রাচীন কাল হইতে ব্রাহ্মণাদি বর্ণচতুষ্টয় মিলিত হইয়া কার্য্য করিয়াছিলেন, তাই আমাদের সমাজ সুদীর্ঘজীবী। আমাদের সম্মুখে জলবুদ্‌বুদের ন্যায় কত জাতির উদ্ভব ও পতন হইল, তাহার ইয়ত্তা নাই।

অতি প্রাচীনকাল হইতে দেশবাসীকে "ব্রাহ্মণ আপদ হইতে উদ্ধার করিয়া আসিতেছে।" ব্রাহ্মণ উপলক্ষ্যমাত্র। বর্ণচতুষ্টয়ের মিলিত কার্য্যের উপর জাতির সমস্ত গৌরব নির্ভর করে। এ মিলনের ভিত্তি সাম্য। যে স্থানে সাম্য, তথায় সুখ শান্তি নিরোগিতা। তাই শ্রীভগবান্ পার্থ সারথি বলিয়াছেন, "যাঁহাদের মন সাম্যে অবস্থিত, তাঁহারা ইহলোকে অবস্থান করিয়া স্বর্গবিজয় করিয়া থাকেন।" আমাদের বর্ত্তমান অবস্থা বৈষম্যের উত্তম উদাহরণ। দুঃখ-দৈন্য, দারিদ্র্য বৈষম্যের ফল। সকল পাপের বড় পাপ পরাধীনতা—এই পরাধীনতা বৈষম্যের নিদারুণ পরিণাম।

দেশবাসীর দুর্গতি দূর করিবার জন্য চরণোদ্ভবই হউন অথবা আননোদ্ভবই হউন, সকলকে মিলিত হইয়া জাতির দারুণ ক্ষয়রোগ দূর করিতে হইবে।

অস্পৃশ্যতা দোষ।

যে জাতি প্রাণিজগতের আর্ত্তি দেখিয়া অভিভূত হইয়াছিলেন, জীবসমূহের দুঃখ দূর করিবার জন্য যাঁহারা অনন্যসাধারণ চেষ্টা করিয়াছিলেন, মনুষ্য ত দূরের কথা, পশু-পক্ষী, এমন কি, উদ্ভিদেরও আরোগ্যের জন্য যথাসাধ্য প্রযত্ন করিয়াছিলেন, তাঁহাদের বংশধরদিগের মধ্যে এখন অস্পৃশ্যতা রোগ উপস্থিত হইয়াছে! যাঁহারা কামনা করিতেন, "আমি রাজ্য চাহি না—স্বর্গ চাহি না মোক্ষেরও কামনা করি না—কিন্তু দুঃখতপ্ত প্রাণীদের আর্ত্তি দূর করাই আমার একমাত্র কামনা"—এরূপ পবিত্র কামনা জগতের আর কেহ করিতে সমর্থ হন নাই; যাঁহাদের পূর্ব্বজদিগের হৃদয় এরূপ উদার ছিল, তাঁহাদের বংশধরদের মধ্যে এরূপ সংকীর্ণতা, ক্ষুদ্রতা, অনুদার ভাব কেন উপস্থিত হইল? স্পর্শাস্পর্শ রুগ্নের জন্য—দুঃস্থের জন্য। দেশকাল-পাত্র অনুসারে সময় সময় মানুষ অস্পৃশ্য হইতে পারে, কিন্তু তাহা সকল সময়ের জন্য নহে। অত্যুৎকট অস্পৃশ্যতা আমাদের জাতীয় অভ্যুদয়ের পরিপন্থী। আমাদের অজ্ঞতা, আমাদের দরিদ্রতা, আমাদের সহানুভূতিশূন্যতা এই "অচ্ছুঁত" রোগকে বাড়াইয়া তুলিয়াছে। যেদিকে দেখি সেই দিকেই দেখিতে পাই, আমরা শ্রীভগবানের পবিত্র আদেশ লঙ্ঘন করিয়াছি, অবহেলা করিয়াছি—আমরা ভগবান-দ্রোহী হইয়াছি। যদি সাম্যে আমাদের আস্থা থাকিত, তাহা হইলে আমরা দারুণ দুরবস্থায় আপতিত হইতাম না। আমাদের বিরাট অজ্ঞতার কথা ভাবিয়া দুঃখে অভিভূত হইয়া পড়ি। যে সময় আমাদের অঙ্গস্বরূপ—আমাদের ভিত্তিস্বরূপ—আমাদের প্রাণস্বরূপ "অচ্ছুঁতেরা" অন্য সম্প্রদায়ভুক্ত হয়, সে সময় তাহারা আমাদের নিকট হইতে সম্মানপ্রাপ্ত হইয়া থাকে।

গত মোপলা-বিদ্রোহের পর হিন্দুদের দুরবস্থা দেখিবার জন্য আমি মালাবার অঞ্চলে গমন করিয়াছিলাম। তথায় যে সকল অমানুষিক অত্যাচার অনুষ্ঠিত হইয়াছিল, আমরা হিন্দুরা অল্পকালের মধ্যে তাহা ভুলিয়া যাই ও ভুলিয়া গিয়াছি। একটী ক্ষুদ্র ঘটনা আমি আপনাদের নিকট উল্লেখ করিব। একজন থিয়া—সে দেশে অস্পৃশ্য (আমাদের দেশের শিউলী) আত্মরক্ষার জন্য যথেষ্ট লড়াই করিয়াছিল। মোপলা কর্ত্তৃক পরাজিত হইয়া সে আত্মরক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছিল বটে, কিন্তু ধর্ম্ম রক্ষা করিতে সমর্থ হয় নাই। সে মুসলমান হইয়া ঘোরতর বিক্রমে হিন্দু ধ্বংস করিতে প্রবৃত্ত হইয়াছিল। আমরা তাহাকে ঘৃণা করিয়া কালাপাহাড় নামে অভিহিত করিয়া থাকি। ভারতের সর্ব্বত্র এইরূপ কালাপাহাড়ের সংখ্যা যথেষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। যাহাতে দেশে কালাপাহাড়ের আবির্ভাব না হয়, তাহার জন্য আমরা কি করিয়াছি? উত্তর শুনিতে পাইব, কিছুই করি নাই, প্রত্যুত যাহাতে কালাপাহাড়ের দল বৃদ্ধি পায়, তাহাই আমরা করিয়া আসিতেছি।

আর একটী ক্ষুদ্র ঘটনা বিবৃত করিব, ইহা সজীব জাতির কথা। মহাভাগ শিবাজী দুর্গম রায়গড় দুর্গ নির্ম্মাণ করিয়া দুর্গের দুর্গমতম প্রদেশে পতাকা উত্তোলনের জন্য বীরবৃন্দকে আদেশ করেন। যিনি ইহা সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইবেন, তিনি টাকার পুঁটুলী আর সর্ব্বজনস্পৃহনীয় শিবাজীর আলিঙ্গন লাভে সমর্থ হইবেন। যখন এই দুরূহ কার্য্য সম্পন্ন করিতে কেহ অগ্রসর হইল না, তখন একজন মহাড় করযোড়ে দূর হইতে কহিল, "প্রভু যদি আজ্ঞা করেন, তাহা হইলে এ সেবক একবার চেষ্টা করে।" গুণদর্শী শিবাজী সাদরে মহাড়ের বাক্য অনুমোদন করেন। মহাড় সকলের সম্মুখে দুর্গের দুর্গমতম প্রদেশ দিয়া উপরে আরোহণ করিয়া পতাকা উড্ডীন করে। উপর হইতে প্রত্যাগমনের পর শিবাজী অস্পৃশ্য মহাড়কে ধন আর সকল ধনের শ্রেষ্ঠ ধন—সকলের আকাঙ্ক্ষিত ধন আলিঙ্গন প্রদান করিয়া ধন্য করিয়াছিলেন। এইরূপে তিনি গো-ব্রাহ্মণ আর বর্ণাশ্রমধর্ম্ম রক্ষা করিয়াছিলেন। শিবাজী জানিতেন, জগতে কেহই

অযোগ্য নহে। তিনি দীর্ঘদৃষ্টিসম্পন্ন যোজক ছিলেন। শিবাজী এই অদ্ভুতদেব সহায়তায় নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে এক বিশাল শক্তিশালী রাজ্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ডচ্, পর্ত্তুগীজ, ইংরাজ প্রভৃতিরও ভীতি ও শান্তিপ্রদ হইয়াছিলেন এবং জলে ও স্থলে সর্ব্বত্র সাম্যের বিজয়বৈজয়ন্তী উড়াইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এরূপ উদার উদাহরণ আমাদের সম্মুখে থাকিতেও যদি জাতির কল্যাণের জন্য আমরা অন্ধের ন্যায় অবস্থান করি তাহা হইলে আমাদের মঙ্গল কোথায়?

শুদ্ধি জীবন-মরণের প্রশ্ন।

শুদ্ধি বর্ত্তমান হিন্দুসমাজের জীবন-মরণের প্রশ্ন। এ প্রশ্ন বহুকাল হইতে আমাদের সমাজে আলোচিত হইয়া আসিতেছে। অতি পুরাকালে সুকেশী আদি রাক্ষসগণ ব্রাহ্মণগণের সদাচার দেখিয়া ব্রাহ্মণভক্ত হইয়াছিলেন।

অনেক গ্রীক ভারতীয় সংসর্গের ফলে ভারতীয় ধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন, তাহা আমরা শিলালেখ পাঠে অবগত হইয়া থাকি।

ভারতের ধনরত্নের লোভে বহু জাতি আমাদের দেশে পদার্পণ করিয়াছেন। তাঁহাদের মধ্যে কুষণরা অনেক দিন প্রবলপ্রতাপের সহিত রাজত্ব করেন। ইহাদিগের মধ্যে শুদ্ধির প্রভাবে হুষ্ক, জুষ্ক, কনিষ্ক প্রভৃতি রাজারা ভারতীয় ধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া বহু বিহার মঠ চৈত্য, নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। এই বংশে বাসুদেবের আবির্ভাব হইয়াছিল। তাঁহার নামই শুদ্ধির মহিমা চিরকাল স্মরণ করাইয়া দিবে।

প্রাচীনকালের গান্ধার দেশের দীর্ঘদর্শী ব্রাহ্মণেরা শুদ্ধিকার্য্যে খুব নিপুণতা দেখাইয়াছিলেন।

পুরাণপাঠে আমরা অবগত হই, "মিশ্রদেশবাসীরা কাশ্যপগোত্রীয়দের অনুশাসনে শাসিত হইতেন।"

বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারকেরা দূরতর প্রদেশে গমন করিয়া বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচার করিয়াছিলেন, তাহা আপনাদের সুবিদিত কথা।

জাপানের প্রাচীন রাজধানী নারাতে একজন বৌদ্ধধর্ম্ম-প্রচারক ব্রাহ্মণ বহুদিন অবস্থান করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করেন। সে সময়ের জাপানাধিপতি মঠস্থাপনের জন্য জায়গীর প্রদান করেন। জাপানবাসীরা এখনও ভক্তির সহিত সে কথা কীর্ত্তন করিয়া থাকেন।

একজন ভরদ্বাজগোত্রীয় মৌনী ব্রাহ্মণের ধর্ম্মপ্রচারের অপূর্ব্ব কাহিনী আপনাদের কাছে উল্লেখ করিবার লোভ সংবরণ করিতে পারিলাম না। প্রায় দেড় হাজার বৎসর পূর্ব্বে তিনি চীনদেশে গমন করেন। তথায় তিনি একটী স্থান নির্ব্বাচন করিয়া সাধনভজনে নিরত থাকিতেন। এই অদ্ভুত পুরুষের অদ্ভুত কথা কালক্রমে সম্রাটের কর্ণগোচর হয়। সম্রাট ভারদ্বাজকে রাজধানীতে লইয়া যাইবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা করেন। বিষয়বিরক্ত ব্রাহ্মণ তাঁহার আশ্রম-পরিত্যাগে অস্বীকৃত হইলে—সম্রাট্ ভিক্ষুক ব্রাহ্মণকে দর্শন করিতে গমন করেন। তিনি বহু সৈন্য ও বিদ্বান-গণসহ সন্ন্যাসী ঠাকুরের কাছে গমন করেন। সম্রাট কুটীরদ্বারে উপস্থিত হইলেও ভারদ্বাজের কোনরূপ নিয়মভঙ্গ হইল না।

কমললোচন ভারদ্বাজ কুটীরদ্বারে যথাসময়ে উপস্থিত হইলে, সম্রাট তাঁহার পূজা করিয়া কিছু উপদেশ প্রদান করিবার জন্য প্রার্থনা করেন। ভিত্তিনিরীক্ষক ভারতীয় পণ্ডিত কমললোচন চীন ও জাপানীগ্রন্থে বর্ণিত লাক্ষণিক নামযুক্ত ভারদ্বাজ এরূপ তন্ময়তা, এরূপ একাগ্রতা, এরূপ ভক্তি ও অসাধারণ শক্তির সহিত তাঁহার আরাধ্য প্রভু প্রদক্ষিণ করেন যে সম্রাট সমস্ত জনগণ সহ ভারদ্বাজের শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। এরূপভাবে ধর্ম্মপ্রচার পৃথিবীর ধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাসে অতুলনীয়।

আপনারা হূণ মিহির কুলের নামের সহিত পরিচিত আছেন। এরূপ ভীমকর্ম্মা রাজা পৃথিবীতে অতি অল্পই উৎপন্ন হইয়াছেন। তাঁহার কথায় ইতিহাস বলেন :—

"দিবারাত্রং হতপ্রাণিসহস্রপরিবারিতঃ।
যোঽভূদ্ভূপালবেতালো বিলাসভবনেষ্বপি॥"

এরূপ ঘোর নৃশংস রাজাও দীর্ঘদর্শী গান্ধারদেশীয় ব্রাহ্মণের প্রভাবে আর্য্যধর্ম্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তখন 'হিন্দু' নাম আমরা প্রাপ্ত হই নাই। তক্ষশিলার বিশ্ববিদ্যালয় এই গান্ধার দেশে; পাণিনি প্রভৃতি মনীষিগণ এই বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র। কাশ্মীরের রাজধানী শ্রীনগরে, মিহিরকুল, মিহিরেশ্বর নামে শিবস্থাপন করিয়াছিলেন।

"হোলাড়ায়াংশ-মিহিতপুরাখ্যং পৃথুপত্তনম্।
অগ্রহারগ্রগৃহিরে গান্ধারা ব্রাহ্মণাস্ততঃ॥"

মিহিরকুল সমৃদ্ধিসম্পন্ন নগর স্থাপন করিয়াছিলেন; আর গান্ধারদেশের ব্রাহ্মণগণ তাঁহার প্রদত্ত অগ্রহার সকল গ্রহণ করিয়াছিলেন। উদার-প্রকৃতি ব্রাহ্মণের প্রভাবে হূন, শক প্রভৃতি আর্য্য আচার গ্রহণ করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মণেরা যদি আগ্রহের সহিত শুদ্ধিকার্য্য চালনা করিতেন, তাহা হইলে আজ পাঞ্জাবের জনসংখ্যা অন্যরূপে দর্শিত হইত।

মহারাষ্ট্রীয়েরা যখন হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন করেন, সে সময়ও তাঁহাদের মধ্যে শুদ্ধি-প্রশ্ন উঠিয়াছিল। দীর্ঘদর্শী অসাধারণ প্রতিভাসম্পন্ন রামশাস্ত্রী, পর্ত্তুগীজ-পীড়িত পরধর্ম্মাবলম্বী হিন্দুগণকে প্রায়শ্চিত্ত করাইয়া স্বজাতির মধ্যে লইবার ব্যবস্থা দিয়াছিলেন। যে জাতি পুত্র-কন্যাকে রক্ষা করিতে অসমর্থ হইয়া শুদ্ধির পরিবর্ত্তে

তাহাদিগকে পরিত্যাগ করে, সে ক্লীব জাতির কখনও মঙ্গল হইতে পারে না। সংকীর্ণতা ও ক্লীবত্ব পরিত্যাগ করিয়া জাতিকে রক্ষা করিবার জন্য বদ্ধপরিকর হউন।

বিপুল জনসংখ্যা জাতির অস্তিত্ব রক্ষার সহায়তা করিয়া থাকে। অনেক জাতি নানাসদ্‌গুণসম্পন্ন হইয়াও জনসংখ্যার অল্পতার জন্য পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইয়াছে, তাহা ইতিহাস-পাঠে অবগত হই। প্রচারককে অনুদ্বেগকর হইতে হইবে—অলি যেরূপ অনুদ্বেগকর হইয়া পুষ্পকে অধীন করিয়া পুষ্পরস সংগ্রহ করিয়া থাকে—প্রচারককে এই প্রাচীন ভারতীয় প্রথা অবলম্বন করিয়া ধর্ম্মপ্রচার করিতে হইবে। তাহা হইলে তিনি সফলতা লাভ করিবেন।

আমাদের মাতৃজাতি।

আমাদের ভারতীয় সভ্যতার বিস্তারপক্ষে মাতৃজাতির প্রযত্ন কম ছিল না। সময় উপস্থিত হইলে তাঁহারা অকাতরে স্বামী-পুত্রকেও দেশের কল্যাণ-কল্পে উৎসর্গ করিতে পশ্চাদপদ হইতেন না, তাঁহাদের কুসুম-কোমল হৃদয় তখন বজ্র অপেক্ষা কঠোরতা ধারণ করিত। এক সময় অসুর-প্রপীড়িত ভারতীয় সভ্যতা বিস্তারের জন্য প্রযত্নশীল মুনিকে রক্ষা করিতে গিয়া এক রাজকুমার নিহত হইয়াছিলেন। রাজা এই নিদারুণ সংবাদ মহারাণীকে প্রদান করেন। তখন তিনি যাহা বলিয়াছিলেন, তাহা অধঃপতিত আমাদের হৃদয়ে সুবর্ণ অক্ষরে অঙ্কিত থাকা উচিত। মহারাণী বলেন—"হে রাজন! মুনি-পরিত্রাণকালে আমার পুত্র নিহত হইয়াছে শুনিয়া আজ আমি যেরূপ সুখী হইয়াছি, আমি আমার মাতা-ভগ্নী দ্বারা সেরূপ সুখ প্রাপ্ত হই নাই। যাহারা শোচনীয় বান্ধবগণের জন্য ব্যাধিক্লিষ্ট হইয়া অতি দুঃখে নিশ্বাস পরিত্যাগ করিতে করিতে মৃত্যুমুখে পতিত হয়, তাহাদিগের জননী বৃথা পুত্রের জননী। যাহারা গো-দ্বিজ-রক্ষণ-সংগ্রামে নির্ভয়চিত্তে যুদ্ধ করিতে করিতে শস্ত্রক্ষুণ্ণ হইয়া বিপন্ন হয়, তাহারাই পৃথিবীতে মানুষ বলিয়া পরিগণিত হইয়া থাকে। প্রার্থী, মিত্র এবং শত্রুগণ যাহার নিকট পরাঙ্মুখ হয় না, তাহার দ্বারাই পিতা পুত্রবান্ আর মাতা বীরপ্রসবিনী বলিয়া খ্যাতি লাভ করিয়া থাকেন। স্ত্রীলোকের গর্ভক্লেশ তখনই সফলতা লাভ করে, যখন পুত্র সমরবিজয়ী হইয়া গৃহে প্রত্যাগমন করেন অথবা যুদ্ধস্থলে বীরগতি প্রাপ্ত হন।"

ভারতের এক মহীয়সী মহিলা প্রার্থনা করিতেন, ভারতের কোন রমণী যেন ক্রোধহীন, উৎসাহবিহীন, নির্বীর্য্য, অরিনন্দন পুত্র প্রসব না করেন।

"নিরমর্ষং নিরুৎসাহং নির্বীর্য্যম্ অরিনন্দনম্।
মাস্ম সীমন্তিনী কাচিৎ জনয়েৎ পুত্রমীদৃশম্॥"

মাতারা এরূপ ভাবে শিক্ষিতা হইতেন বলিয়া তাঁহাদের পুত্রেরাও জাতির গৌরব বর্দ্ধন করিতে সমর্থ হইতেন। হিন্দু নারীর হৃদয় হইতে এ পবিত্র ধারা এখনও বিলুপ্ত হয় নাই, অল্প চেষ্টাতেই এই প্রসুপ্ত অবস্থা তিরোহিত হইবে।

পারস্য, তুরস্ক, আফগানিস্থান সকলেই জড়তা পরিত্যাগ করিতেছেন বা করিয়াছেন; পৃথিবীর সর্ব্বত্র নবযুগের সাড়া পরিলক্ষিত হইতেছে। সে সকল দেশেও এই জাগরণের পরিপন্থী মোল্লাজাতীয় পুরুষেরা, তাহারা শক্তিহীন হইতেছে—আমাদের সমাজেও আমাদের অন্নে পরিপুষ্ট এরূপ মোল্লা জাতীয় পুরুষের অভাব নাই। দেশের লোক বুঝিয়াছেন, এই সকল কূপমণ্ডুকের প্রভাব দেশে আর নাই।

হিন্দু সংগঠন।

কানু বিনা যেরূপ গান নাই, সেইরূপ সংগঠন ব্যতীত হিন্দুসভাই হইতে পারে না। পতিত জাতির অভ্যুদয়, সংগঠন ব্যতীত হইতে পারে না। সমাজকে শ্রীসম্পন্ন করিতে হইবে—সমাজে যাহা কিছু বিরূপতা, তাহা দূর করিতে হইবে। সমাজের সকলে যেন একতন্ত্রীতে আবদ্ধ থাকে। কন্যাকুমারীতেই হউক বা কোহাটেই হউক, হিন্দু পীড়িত হইলে যাহাতে সমগ্র দেশের সকল হিন্দু পীড়া বোধ করেন, সেই ভাব আনয়ন করিতে হইবে। এ ভাব তখনই আসিবে—যখন হিন্দু হিন্দুকে মমত্ববুদ্ধিতে দেখিবে। যখন আমরা পশু-পক্ষীর প্রতি দৃষ্টিপাত করি, তখন দেখিতে পাই, তাহারা পরস্পর সহানুভূতি সম্পন্ন। একটা কাক যদি শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হয় অথবা তাহার পুত্রকন্যা অপহৃত হয়, সে সময়ের দৃশ্য ত আপনারা প্রতিদিন প্রত্যক্ষ করিয়া থাকেন। কাকের শব্দে সকল কাক সমস্ত কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া একত্র হয়; চঞ্চু ও নখ দিয়া আক্রমণকারীকে বিব্রত ও উত্যক্ত করিয়া থাকে। আক্রমণকারী তখন বাধ্য হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিয়া থাকে। এদৃশ্য আমরা সকল সময় প্রত্যক্ষ করিতেছি। একজন হিন্দু বিপন্ন হইলে যাহাতে সমস্ত হিন্দুসমাজ ব্যথিত হয়, বিক্ষুব্ধ হয়, তাহার সাহায্যের জন্য অগ্রসর হয়, সেইরূপ শিক্ষায় দীক্ষিত হইতে হইবে। এরূপ হইলে বুঝিতে হইবে, হিন্দুসমাজে প্রাণ আসিয়াছে—শক্তি আসিয়াছে।

স্বরাজসাধনা।

অতি প্রাচীনকাল হইতে শাস্ত্র আমাদিগকে শিক্ষা দিয়াছেন, "কখন মানুষের স্তুতি করিও না"। আত্ম-প্রবঞ্চনা না করিয়া বলুন দেখি, আমরা কয় জন সে অনুশাসন পালন করি? শাস্ত্র বলেন, "পরের ভূমিতে পিতৃগণের শ্রাদ্ধক্রিয়া করিও না"। বলুন দেখি, আমরা

কয়জন শাস্ত্রের সে আদেশ পালন করিতে সমর্থ হই? শাস্ত্র বলেন, "ম্লেচ্ছরাজ্যে বাস করিও না।" আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের মতন তথাকথিত হিন্দু ইহার কি উত্তর দিবেন? শাস্ত্র বলেন "পরাধীন ব্যক্তি নিত্য সূতক-গ্রস্ত।" অশুচির দ্বারা কি কোন কার্য্য হইতে পারে? যখন হিন্দু জীবিত ছিল, চাটুকারের জাতিতে পরিণত হয় নাই, তখন ইহার বাক্যের মূল্য ছিল। হিন্দুর দেশ যখন হিন্দুর ছিল, তখন ইহাদের অনুষ্ঠিত ধর্ম্মকার্য্য ফলপ্রদ হইত। নদীর তটে যাহার বাস, পরের ভূমিতে যাহার অবস্থান, সেই নিত্য উদ্বিগ্ন ব্যক্তির শান্তি কোথায়? ব্রাহ্মণ! তোমার সে তপস্যার বল—আর সে ধনুর্ব্বাণ কোথায়, যাহার দ্বারা তুমি জগতে শান্তি-স্থাপন করিতে? ব্রাহ্মণ! তুমি যখন সন্ন্যাস গ্রহণ করিতে, তখন তোমার এক হস্তে দণ্ড ও অপর হস্তে কমণ্ডলু অবস্থান করিত—উভয়ই শান্তির প্রতীক ছিল। আবার আবশ্যক হইলে ঢাল-তরবারি গ্রহণ করিয়া জগতের অশান্তি দূর করিতে। তোমার সে মধুরতাপূর্ণ উগ্র মূর্ত্তি কোথায়? আমার দৃঢ় ধারণা, তোমরা সমদর্শী হইলে, তোমরা নিজেদের শক্তির সহিত পরিচিত হইলে স্বরাজ সংস্থাপনে সমর্থ হইবে। তাই বলি, এই মূর্চ্ছিত জাতির চৈতন্যসম্পাদনের পরিপন্থী হইও না। এখন বর্ণও নাই, আশ্রমও নাই। স্বরাজ্য সিদ্ধির পর বর্ণাশ্রম-ধর্ম্মের ব্যবস্থা করিও।

এই শুভদিনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইবে। বহুদিনের নিপীড়িত হিন্দু তুমি, তোমার আধ্যাত্মিক রাজ্যের ত্যক্ত সিংহাসন অধিকারের জন্য প্রস্তুত হও। শুদ্ধির জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ কর—অস্পৃশ্যতা পরিত্যাগ করিয়া নিজেদের শক্তিকে সুদৃঢ় কর—সংগঠনের দ্বারা অরাতি-গণের অপরাজেয় হও। আর যে সকল ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সংস্কারের প্রয়োজন, তাহা দেশ, কাল, পাত্র বুঝিয়া করিতে হইবে। উপাসনা দ্বারা মানসিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। নিয়মিত ব্যায়াম দ্বারা স্ত্রীপুরুষ উভয়কে শারীরিক শক্তিসম্পন্ন হইতে হইবে। ভোজন-সংযম দ্বারা উভয় শক্তি সুনিয়মিত করিতে হইবে। ভোজনাদি সংযমের ফলে রোমক পারসীকরা পুরাকালে জগতে অজেয় হইয়াছিল। গোপালন করিতে হইবে, ইহার ফলে জাতির নষ্ট স্বাস্থ্য বিদূরিত হইবে।

স্বরাজ বা মুক্তি প্রত্যেক হিন্দুর ঈপ্সিত বিষয়। এজন্য চরিত্রবান হইতে হইবে, নিজের মহিমায় বিরাজিত হইতে হইবে, তবে আমরা স্বরাজের অধিকারী হইব। ভ্রষ্ট চরিত্র ইহা আনয়ন করিতে সমর্থ হয় না। স্বরাজ-আমাদের ধ্যান-ধারণার বিষয় হউক। স্বরাজ আমাদের জাগরণে চিন্তার বিষয় হউক। স্বরাজই আমাদের সকল অভীষ্টপূরণের সহায়ক হইবে। ইহার প্রাপ্তিতে নানা বিঘ্ন আছে। দৃঢ়ব্রত হইতে হইবে।

শেষ কথা বা সর্ব্বপ্রধান কথা। কোন্ শক্তির প্রভাবে এই দারুণ দুর্দ্দশাতেও আমরা নিজেদের অস্তিত্ব রক্ষা করিতে সমর্থ হইয়াছি? তাহার সহিত আমাদের পরিচিত হইতে হইবে। নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থা, নানাপ্রকার লোমহর্ষণ অত্যাচার সহ্য করিয়াও কোন্ শক্তির প্রভাবে মুমূর্ষুসম অবস্থাতেও সন্তুষ্টচিত্তে নিজেদের অদৃষ্টের উপর নির্ভর করিয়া থাকি? এই সহনশীলতার জন্য—এই উদ্যমহীনতার জন্য ইহলোকসর্ব্বস্ব ব্যক্তিদের কাছে অনেক সময় আমরা উপহসিত হইয়া থাকি।

যে জাতি বিষম বিপদেও চিত্তের স্থৈর্য্যবিচ্যুত হয় না—ভগবানে সমস্ত অর্পণ করিয়া অবিকৃত বদনে মৃত্যুকে আলিঙ্গন করে, সে জাতির অস্তিত্ব কখন পৃথিবী হইতে বিলুপ্ত হইতে পারে না।

আমার জাতির ইহাই হইল প্রাণ—ইহাই আমার আত্মা। এই প্রাণের সহিত পরিচিত হইতে হইবে—এই আত্মার সাক্ষাৎকার লাভ করিতে হইবে। ইহাই আমাদের জাতির বিশিষ্টতা। হে ভগবান! যেন আমরা এই বিশিষ্টতা হইতে বঞ্চিত না হই। ভক্তদের জয় হউক—হিন্দুর জয় হউক। *

—

রামমোহন ও দ্বারকানাথ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবানের ইচ্ছায় জগতে তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মই দুই আকার ধারণ করিয়াছে—ধর্ম্ম ও অর্থ। একই সূর্য্যরশ্মির ভিতরে সপ্তরশ্মি বর্ত্তমান। শ্বেতরশ্মিকে বিচ্ছিন্নভাবে দেখিলে সপ্তরশ্মি দেখা যায়, আবার সেই সপ্তরশ্মিকে একত্র করিয়া দেখিলে একই শুভ্র কিরণ দৃষ্টিগোচর হয়। সেই প্রকার একই ঈশ্বর-প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মকে মানবের সসীমতার ভিতর দিয়া, তাঁহারই প্রতিষ্ঠিত সংসারের ভিতর দিয়া দেখিলে তাহার দুই আকার দেখিতে পাওয়া যায়—ধর্ম্ম ও অর্থ। আবার সেই দুই আকারকে সসীমতার বাহিরে, সংসারের বাহিরে দাঁড়াইয়া একত্র করিয়া দেখিলে ভগবৎপ্রতিষ্ঠিত এক অদ্বিতীয় ধর্ম্মের বিমলপ্রভা দৃষ্টিগোচর হয়। আসল কথা এই যে, আমরা যাহাকে ধর্ম্ম বলি, এবং আমরা যাহাকে অর্থ বলি, তাহা প্রকৃত ধর্ম্মের এপিঠ ও ওপিঠ। একটিকে ছাড়িয়া অপরটিকে দাঁড় করাইতে গেলে বালুরাশির উপর মন্দির নির্ম্মাণ করা হয়। কেবল যদি রাশি রাশি বেদব্যাস বা মনুই জন্মগ্রহণ করিতেন, তবে তাঁহা-

* আনন্দবাজার পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত।

দের উপদেশ-অনুশাসন পরিপালন করিতেন কাহারা? অনুশাসনসকল কার্য্য ও অনুষ্ঠানে পরিণত করিবার জন্য পঞ্চপাণ্ডব চাই, জনক রাজা চাই। ধর্ম্মের সূক্ষ্ম তত্ত্বকে সংসারে প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য অর্থ চাই, এবং অর্থের ব্যবহারকে সার্থক করিবার জন্য তাহাকে ধর্ম্মের সহিত সঙ্গত করা কর্ত্তব্য। ধর্ম্ম যেমন মন ও আত্মার অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে, অর্থ সেইরূপ দেহের অন্নসংস্থানের ব্যবস্থা করে। সেই দেহের ভিতরেই যখন মন ও আত্মা সংস্থিত আছে, তখন বলা বাহুল্য উভয়ের একযোগে ব্যবস্থা করাই মানবের ও মানবসমাজের প্রকৃত পথ। ধর্ম্মকে ছাড়িয়া অর্থের ব্যবস্থা করিতে গেলে তাহা দস্যুবৃত্তিতে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আসে; এবং অর্থ ছাড়িয়া কেবল শুষ্ক ধর্ম্মব্যবস্থা করিলে তাহার অস্তিত্বই থাকে কি না সন্দেহ—তখন শতবিধ অধর্ম্মই ধর্ম্মের স্থান অধিকার করে। এই কারণে ধর্ম্ম ও অর্থের কোন একটীকে অপরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে দেখা সঙ্গত নহে; উভয়ের কোন একটীকে অপরের সহিত বিচ্ছিন্নভাবে দেখিয়া বিচার করিলে তাহাকে অঙ্গহীন করিয়া দেখা হয়।

ভগবদ্গীতায় শ্রীকৃষ্ণ লিখিয়াছেন যে, "যুগে যুগে যখনই সংসারে ধর্ম্মের গ্লানি দৃষ্ট হয়, তখনই সেই গ্লানি দূর করিয়া ধর্ম্মের বিশুদ্ধ ভাব বজায় রাখিবার জন্য ভগবান স্বয়ং সংসারে অবতীর্ণ হন"। এই যে ধর্ম্মের গ্লানি উক্ত হইয়াছে, ইহা মাত্র ধর্ম্মতত্ত্বের গ্লানিবিষয়ক নহে—ইহাতে সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের গ্লানির বিষয় বলা হইয়াছে। কথাটা বড়ই নিগূঢ়ার্থ ও খুবই সত্য। সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মের যখনই গ্লানি উপস্থিত হইয়াছে, তখনই দেখা যায় যে, ভগবান স্বীয় তেজের কণিকামাত্রে অবতীর্ণ হইয়া সেই সকল গ্লানি ভস্মীভূত করিয়া দেন এবং দেশ, কাল ও অবস্থার উপযোগিতা অনুসারে সর্ব্বাঙ্গীন ধর্ম্মকে পুনঃ প্রতিষ্ঠিত করেন। ইংলণ্ডে যখন প্রথম চার্ল্সের রাজত্বকালে ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হইল, তখন ভগবান ক্রম্‌ওয়েলের অন্তরে কণিকামাত্র তেজে অবতীর্ণ হইয়া ধর্ম্মকে গ্লানিমুক্ত করিয়া পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। ফরাসিবিপ্লবও ভগবানের এইরূপ করুণার একটী জলন্ত দৃষ্টান্ত। নেপোলিয়নের অন্তরে তেজকণিকায় ভগবান স্বীয় রুদ্রমূর্ত্তিতে আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মেরই রক্ষাসাধনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন।

ভারতের ইতিহাসে ধর্ম্মের গ্লানির অবস্থায় ধর্ম্মের পুনঃসংস্থাপনের জন্য ভগবানের আবির্ভাব বড় বিরল নহে। বুদ্ধদেব, শ্রীকৃষ্ণ, গুরু নানক, চৈতন্যদেব প্রভৃতি মহাত্মাগণ ধর্ম্মসংস্থাপনেরই উদ্দেশ্যে ঐশ্বরিক তেজেই সমুদ্ভূত হইয়াছিলেন। খৃষ্টীয় অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর লক্ষণেও ভারতে ধর্ম্মগ্লানির যথেষ্ট পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল এবং নানা কারণের সমবায়বশত এই বঙ্গদেশেরই এক প্রান্তে তাহা পুঞ্জীভূত আকারে দেখা দিল। তখন ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক ভগবান ধর্ম্মকে পুনঃসংস্থাপিত করিবার জন্য দুই মহাপুরুষকে প্রায় একই সময়ে প্রেরণ করিলেন—রাজা রামমোহন রায় এবং দ্বারকানাথ ঠাকুর। রামমোহন রায় ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপন করিয়া ধর্ম্মের তত্ত্বসকল ব্যাখ্যা করিয়া দেশের আবালবৃদ্ধ-বনিতা আব্রাহ্মণ-চণ্ডাল সকলের সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির উৎস সমগ্র জ্ঞানভাণ্ডারের চাবি ফেলিয়া দিলেন। দ্বারকানাথ স্বীয় বন্ধু রামমোহন রায়ের অবর্ত্তমানেও ব্রাহ্মসমাজকে রক্ষা করিয়া একপ্রকার নিজের অজানতই ভগবানের আদেশে স্বীয় পরিবারের মধ্য দিয়া ভারতে সত্যধর্ম্মকে অব্যাহত রাখিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। এসকলই যে ভগবানের কার্য্য, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই—এ সমস্তরই মূলে ভগবানের মঙ্গল হস্ত। রাজা রামমোহনই বল, আর দ্বারকানাথ ঠাকুরই বল, ইঁহারা ভগবানের ইচ্ছা কার্য্যে পরিণত করিবার নিমিত্তমাত্র—যন্ত্রী ভগবানের হস্তের যন্ত্রমাত্র। রামমোহন রায় ভাবিবার অবসর পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ যে, তাঁহার পরিবারের পরিবর্ত্তে অপর এক পরিবার কর্ত্তৃক তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্মনাম সাদরে গৃহীত ও সবলে প্রচারিত হইবে। আবার দ্বারকানাথ ঠাকুরও ভাবিবার অবসর পাইয়াছিলেন কিনা সন্দেহ যে, তাঁহারই পরিবার গার্হস্থ্য অনুষ্ঠান হইতে মূর্ত্তিপূজা উঠাইয়া দিবার পথপ্রদর্শক হইবেন। কিন্তু যাঁহার অনিমেষ মঙ্গলদৃষ্টি জগতের প্রত্যেক ঘটনাকে মঙ্গলের পথে পরিচালিত করিতেছে এবং যাঁহারই মঙ্গল ইচ্ছায় বিশ্বজগত সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির অভিমুখে সমুন্নীত হইতেছে, তিনিই জানিতেন যে, উত্তর কালে ভারতের মতিগতি কোন্ পথে চলিবে। তাহা জানিয়াই তিনি একদিকে সার্ব্বভৌমিক ধর্ম্ম ও বিশ্বজগতের হিতবাণী ঘোষণা করিবার জন্য যেমন রাজা রামমোহন রায়কে পাঠাইলেন, অপরদিকে সেইরূপ সেই ব্রাহ্মসমাজকে মৃত্যু হইতে রক্ষা করিবার জন্য এবং আলস্য, নিদ্রা ও জড়তার মোহে সমাচ্ছন্ন ভারতবাসীকে নব্যযুগের উপযুক্ত কর্ম্মের নবজাগরণে উদ্বুদ্ধ করিবার জন্য দ্বারকানাথ ঠাকুরকে প্রেরণ করিলেন। আমরা উভয়কেই ভক্তিভরে প্রণাম করি। নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ নমঃ পিতৃপুরুষেভ্যঃ।

বীমাতত্ত্বের গোড়ার কথা।

(শ্রীঅমূল্যচরণ মিত্র বি-কম [লণ্ডন])

শ্রদ্ধেয় সম্পাদক মহাশয় তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার জন্য আমাকে যখন একটী প্রবন্ধ লিখিবার নিমিত্ত অনুরোধ

করিলেন, তখন আমি কি লিখিব ভাবিয়া অকূল পাথারে পড়িলাম। আমি ভাবিলাম যে রাশি রাশি দার্শনিক তত্ত্ব প্রকাশ করাই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার একমাত্র ধারা। আমি সম্পাদক মহাশয়ের সহিত বিশেষ আলোচনা করিয়া বুঝিলাম, উহাই পত্রিকার একমাত্র ধারা নহে এবং হইতেও পারে না। আমরা ব্রাহ্মধর্ম্ম আলোচনা করিয়া যতটুকু বুঝিয়াছি, তাহাতে এইটুকু সুস্পষ্ট বুঝি যে, মানবের ব্রহ্মকেন্দ্রক সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনই ব্রাহ্মধর্ম্মের চরম লক্ষ্য। ইহা যদি সত্য হয়, তবে আমাদের বর্ত্তমান আলোচ্য বিষয়ও ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের অন্যতর মুখপত্র তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশ করা অসঙ্গত হইবে না। ইতিপূর্ব্বে পত্রিকায় এমন অনেক প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে, যাহার ভিতর দার্শনিকতার সংস্পর্শ মাত্র নাই। এইরূপ আলোচনার ফলে, অভিব্যক্তিবাদ বা Theory of Evolution যেমন বর্ত্তমানে পশ্চাত্য বিজ্ঞানজগতের বলিতে গেলে প্রত্যেক বিভাগকে অনুপ্রাণিত করিয়াছে, সেইরূপ বর্ত্তমানে পাশ্চাত্য ঋদ্ধি-জগতের তিনচতুর্থাংশকে যে বিষয় নানাপ্রকারে অনুভাবিত করিয়াছে, সেই বিষয় যথাসাধ্য খুলিয়া লিখিতে স্বীকার করিলাম।

ভগবান মানবকে তিনটী উপকরণে সংগঠিত করিয়াছেন—শরীর, মন ও আত্মা। এই তিনটীরই যথাযুক্ত সামঞ্জস্য সহকারে উন্নতিসাধনই মানবের, সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মেরও লক্ষ্য। ব্রাহ্মধর্ম্ম অর্থে ব্রহ্মকেন্দ্রক ধর্ম্ম বুঝিতে হইবে। ধর্ম্ম অর্থে যাহা জগৎসংসারকে ধারণ করে। সুতরাং বলা বাহুল্য যে, যেমন মানবেরও দেহ, মন ও আত্মা এই তিনটীর কোন একটীকে ছাড়িয়া ধর্ম্মসাধন বা প্রকৃত মনুষ্যত্বকে সার্থক করা সম্ভব নহে, সেইরূপ জগতসংসারেরও দেহ, মন ও আত্মা, এই তিনটীর কোনও একটীকে বাদ দিয়া অপর দুইটীর সাহায্যে প্রকৃত ধর্ম্মসাধনের পথে অগ্রসর হওয়া সম্ভব নহে—ভ্রমাত্মক সংস্কার মাত্র।

জগতসংসারের দেহ কি অথবা দেহের উপকরণ কি? যাহার সাহায্যে মানব দেহের উন্নতিসাধন করিতে পারে, এক কথায়, যাহা কিছু জীবিকানির্ব্বাহে সাহায্য করিতে পারে, তাহাই জগত সংসারের দেহের উপকরণ বা অংশরূপে উক্ত হইতে পারে। এই দেহের উপকরণ বা অংশের উন্নতিসাধনে যাহা কিছু সহায়তা করিবে, তাহাও সুতরাং ব্রাহ্মধর্ম্মে সমাবিষ্ট হইবার পক্ষে কোনই বাধা দেখা যায় না।

জগতে বর্ত্তমান যুগে যে সকল বিষয় সমৃদ্ধির পথে অগ্রসর করিবার, সুতরাং দৈহিক এবং তাহারই সঙ্গে ন্যূনাধিক পরিমাণে মানসিক ও আধ্যাত্মিক উন্নতি সাধনের সহায়তা করিয়াছে, বীমা করিবার নবপ্রবর্ত্তিত প্রথা তাহাদের অন্যতর। কিন্তু এই বিষয়ে ভারতীয়দিগের মনে কি প্রকার ভ্রান্ত ধারণা আছে, তাহার একটা সুন্দর ছবি সুপ্রসিদ্ধ ঔপন্যাসিক শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র মুখোপাধ্যায় তাঁহার "সিন্দুর কৌটায়" অঙ্কিত করিয়াছেন। বাল্যকালে গ্রন্থখানি পড়িয়া যথেষ্ট হাসিয়াছিলাম। কিন্তু বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে একদিকে গ্রন্থোক্ত বিষয়ের যাথার্থ্য উপলব্ধি করিতেছি, অপরদিকে বীমার ব্যাপারকেও ঘৃণার চক্ষে দেখিতে নিরস্ত হইয়াছি।

অনেক বড় বড় পুস্তকে যখন দেখিলাম যে বীমা আধুনিক জগতের অন্যতর শ্রেষ্ঠ আবিষ্কার, তখন কথাটা প্রথমে বিশ্বাস করিতে পারি নাই। মানুষ আদিকাল অবধি সকলের উপর জয়ী হইয়া আসিতেছে, কিন্তু শুধু দৈব বা অদৃষ্টের নিকট নিজেকে পরাশ্রিত বলিয়া স্বীকার করিয়া আসিতেছে। এই প্রকার অদৃষ্টের উপর অতিরিক্ত নির্ভর করিয়া চলিবার কারণে মানুষের জ্ঞানবিজ্ঞান, কলাকাব্য, ক্রয়বিক্রয়, লেনদেন কোনও কিছুই সম্পূর্ণ সবল ও স্বপ্রতিষ্ঠ হইয়া দাঁড়াইতে পারে নাই। দৈবের উপর অতিরিক্ত বিশ্বাস, অদৃষ্টের উপর অতিমাত্র নির্ভর তাহাকে নিজের দুঃখদারিদ্র্যের বিতাড়নে অদম্য তেজে অগ্রসর হইতে দেয় নাই। কিন্তু বীমা করিবার প্রথা নানা দিক হইতে মানুষকে এই কার্য্যে বিশেষ সহায়তা করিয়াছে দেখা যায়।

কয়েকটী দৃষ্টান্ত দ্বারা বিষয়টী বুঝাইবার চেষ্টা করা যাক। আমার অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহ ছিলেন সেকালের জনগণের মধ্যে একজন মহা বুদ্ধিমান। তিনি নিজের মাথা খাটাইয়া বিস্তর অর্থ সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাঁহার স্ত্রীপুত্র প্রভৃতি আত্মীয়স্বজনেরা মহা সুখে ছিলেন; তদ্ব্যতীত বন্ধুবান্ধব অনেকেরও আপদবিপদে নানাপ্রকার সাহায্য করিতেন। কিন্তু অদৃষ্টদোষে দৈবক্রমে সমাজের এতবড় খুঁটি সহসা ভূমিসাৎ হইল—সেই অতিবৃদ্ধপ্রপিতামহের সহসা হৃৎস্পন্দন বন্ধ হইয়া গেল, তিনি প্রাণত্যাগ করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার বাড়ী ঘর প্রভৃতি যাহা কিছু মূল্যবান বস্তু সঞ্চিত ছিল, সকলই নীলামে বিক্রয় হইয়া গেল; একটী সুবৃহৎ পরিবারের লোকগুলি দারিদ্র্যের নিষ্পেষণে প্রকারান্তরে ভিক্ষাবৃত্তি অবলম্বন করিতে বাধ্য হইল। সকলে দুঃখ প্রকাশ করিয়া বলিতে লাগিল, কি দুর্দ্দৈব! কিন্তু আমি যদি আজ নিজের জীবনকে বীমায় আবদ্ধ করিয়া সহসা প্রাণত্যাগ করি, তাহা হইলে আমার মৃত্যু আত্মীয়স্বজনের বুকে ব্যথা প্রদান করিবে বটে, কিন্তু অন্নবস্ত্রের জন্য তাহাদিগকে দ্বারে দ্বারে ভিক্ষা করিয়া বেড়াইতে হইবে না।

মনে কর, একজন খুব বড় ব্যবসাদার এক বৃহৎ কারবার খুলিয়া বসিয়াছেন। কয়েক বৎসর ধরিয়া তাঁহার

সেই ব্যবসায়ে যথেষ্ট লাভ হইল। কিন্তু সহসা তাঁহার ব্যবসায়ে মন্দা পড়িয়া গেল। লোকসানের উপর লোকসান সহ্য করিতে করিতে ব্যবসাদার তাঁহার ব্যবসায় চালাইতে অক্ষম হইয়া পড়িলেন। কিন্তু তিনি যদি তাঁহার ব্যবসায়টীকে বীমায় আবদ্ধ রাখেন, তবে তাঁহার কারবারে তিনি সর্ব্বস্বান্ত হইলেও সম্পূর্ণ নিঃসম্বল হইয়া পড়িবেন না; তাঁহার এই বিপদে বীমা প্রকৃত বন্ধুর কার্য্য করিবে।

আর একটী দৃষ্টান্ত দিই। পাটের একজন বড় দালাল পড়তি বাজারে বিশ পঁচিশ লক্ষ টাকার পাট কিনিয়া কাশীপুরের এক গুদামে গুদামজাত করিলেন। দালাল হঠাৎ প্রচুর ধনের অধিকারী হইয়াছেন বলিয়া তাঁহার অনেক শত্রু জুটিল। তাহাদের অন্তর ঈর্ষ্যায় ভরিয়া উঠিল। তাহারা সর্ব্বদাই সন্ধান করিতে লাগিল, কিসে সেই দালালকে জব্দ করিতে পারে। অবশেষে অবসর বুঝিয়া তাহারা সেই পাটের গুদামে আগুন ধরাইয়া দিল। পাট যতই হু-হু করিয়া জ্বলিতে থাকিল, শত্রুগণ ততই আহ্লাদে আটখানা হইতে লাগিল। তাহারা মনে মনে বলিতে লাগিল—অতিবৃদ্ধি ভাল নয়। কিন্তু এই পাট যদি কোন বহ্নি-বীমা কোম্পানির নিকট বহ্নিবীমায় আবদ্ধ থাকে তবে শত্রুগণের হাসি-উল্লাস সমস্তই নিরর্থক হইবে। কারণ সেই দালাল ঐ দগ্ধ পাটের যথাযুক্ত মূল্য ফেরত পাইবেন—দালাল লোকসানে মৃতপ্রায় হইবেন না।

এই প্রকারে বীমাপ্রতিষ্ঠানের সাহায্যে মানুষ অনেক বিষয়ে অদৃষ্টের উপর জয়লাভ করিয়া চলিয়াছে। বীমাবদ্ধ থাকিলে মূল্যবান্ বস্তুটী নষ্ট হইলেও তাহার মূল্যটা অন্তত উঠিয়া আসে। মোটর গাড়ী কিনিলাম; রাস্তায় একটা দুর্ঘটনার ফলে গাড়ীটী চুরমার হইয়া গেল। ইহা বীমাবদ্ধ থাকিলে গাড়ীর দামটা ফিরিয়া পাইবার আশা থাকে। কোন প্রদর্শনী হইতে একটী মূল্যবান ছবি বা জাপানী বাক্স বা পুরাতন চীনামাটির ফুলদানি কিনিয়া আনিলাম, কিন্তু চোর আসিয়া তাহা চুরি করিয়া লইয়া গেল এবং অর্থলোভে অন্য একটা প্রদর্শনীতে দিয়া আসিল। তখন তুমি কি করিবে? প্রথমেই তো থানায় ছুটাছুটি করিতে উদ্যত হইবার প্রবৃত্তি হইবে। কিন্তু উহা বীমাবদ্ধ থাকিলে তোমার ছুটাছুটি করিবার কোনই প্রয়োজন হইবে না। তোমার পরিবর্ত্তে বীমাকোম্পানিই যাহা কিছু ছুটাছুটি করিবার তাহা করিবে এবং তোমার জিনিস উদ্ধার করিবার জন্য সাধ্যমত চেষ্টা করিবে। উদ্ধার করিতে না পারিলে অন্তত তাহার মূল্য তুমি ফেরত পাইবে। চাঁদ সওদাগর জাহাজ ডুবি হইবার ফলে যে পাগল হইয়া গিয়াছিলেন, সে কাহিনী তো বঙ্গবাসী অনেকেরই শোনা আছে। কিন্তু বর্ত্তমান যুগের চাঁদ সওদাগর অনেকেই তাঁহাদের ব্যবসাবাণিজ্য বীমাবদ্ধ করিয়া রাখেন বলিয়া অনেকটা নির্ভয় থাকেন—লয়েড্‌স্ প্রভৃতি কোন একটী বীমা কোম্পানিকে একটা টেলিফোনের দ্বারা দুর্ঘটনার সংবাদ দিলেই নিশ্চিন্ত হইতে পারেন। তদ্ব্যতীত যে সকল দরিদ্র লোক খাটিয়া খায়, যেমন ছাপাখানার, পাটকলের, কয়লাখনির কুলি, অথবা বীণকার, সেতারী বা তবলচি প্রভৃতি, অথবা তোমার আমার ন্যায় সাধারণ ব্যক্তি—এই সকল দরিদ্র লোকের অসুখবিসুখ আছে, দুর্ঘটনা বা অপঘাতমৃত্যু আছে। যাহাদের খাটিতে না পারিলে উপবাসে দিন কাটিবার সম্ভাবনা আছে, আমাদের এই দরিদ্র দেশে তাহাদের অসুখবিসুখ বা সহসা মৃত্যুর ফলে তাহাদের পরিবার যে কি কষ্টে পড়ে তাহা যাঁহারা প্রত্যক্ষ করেন নাই, তাঁহারা তাহা কল্পনাতেও আনিতে পারেন কি না সন্দেহ। কিন্তু তাহারা যদি অসুখবিসুখের বিরুদ্ধে বা আকস্মিক দুর্ঘটনার বিরুদ্ধে নিজের জীবন বীমা করিয়া রাখে, তাহা হইলে মনে হয়, তাহারা অসুখের সময়ে বা তাহাদের মৃত্যুতে তাহাদের পরিবার উপবাসে অনাহারে মরিবে না।

এই সকল কথা শুনিয়া মনে হইতে পারে যে, আমি বীমা কোম্পানিগুলিকে ঐন্দ্রজালিকরূপে প্রতিপন্ন করিতে চাই। না, তাহা নহে। ইহাদের কার্য্যের মধ্যে কোন প্রকার ইন্দ্রজালক্রিয়া বা গুপ্ত মন্ত্রতন্ত্রের সাধনার ব্যবস্থা নাই। তবে এই সকল কোম্পানি যে প্রকারে সমাজের আর্থিক ক্ষতি পূর্ণ করে, বস্তুর মূল্যের অতি সামান্য অংশ পাইয়া যে ভাবে সমস্ত মূল্য পরিশোধ করে, তাহা আলোচনা করিলে এই সকল বীমা কোম্পানিকে ঐন্দ্রজালিক বলিতে ইচ্ছা হয় বটে। আসল ব্যাপারটী এই যে, দৈবকে মানুষ যতটা উচ্ছৃঙ্খল, অনিয়মিত বা স্বেচ্ছাচারী ভাবিয়া আসিতেছিল, প্রকৃতপক্ষে দৈব ততটা স্বেচ্ছাচারী নয়। সর্ব্বপ্রকার দৈব ঘটনা ও কার্য্যের মধ্যে একটা নিয়ম ও সংযমের প্রণালীর অস্তিত্ব দৃষ্ট হয়। যদি খুব বেশী সময় ও বৃহৎ স্থান লইয়া দেখিবার চেষ্টা করি, তবে দেখিব যে, মৃত্যু, দুর্ঘটনা, অগ্নিদাহ, অপহরণ, জাহাজডুবি প্রভৃতি প্রায় সকল ঘটনারই শতকরা একটা হার আছে। বীমা কোম্পানিরা এই হার অবলম্বনে আন্দাজে ধরিয়া লয় যে, বৎসরে ঐ প্রকার ঘটনা কতগুলি সংঘটিত হওয়া সম্ভব এবং কত টাকার দাবীই বা চুকাইতে হইবে। ইহারই ভিত্তিতে তাহারা শতকরা বা হাজার করা কতটাকা বীমার জন্য লইতে হইবে তাহাও স্থির করে।

বীমার সাহায্যে যখন সমাজের বিশেষ কল্যাণ সাধিত

হইতেছে, তখন ভাবিলে আশ্চর্য্য হইতে হয় যে, পৃথিবীর নরনারী অধিকাংশই বীমার বিষয়ে কিছুমাত্র মনোযোগ দিতে চায় না। অধিকাংশ ব্যক্তিই সকল বিষয়ে নিজেদের অব্যবহিত লাভলোকসান ব্যতীত অন্য কোন কিছুর প্রতি দৃষ্টি দিতে চায় না। বীমার দালাল আসিয়া আমাদিগকে বীমার উপকারিতা বুঝাইয়া এবিষয়ে যখন আমাদের দৃষ্টি ফিরাইয়া আনে, তখন নিজের জীবনকে বীমাবদ্ধ করিয়া সুখী হই।

বীমার দালালের কাজ ক্রমাগত খোঁচা দিয়া মানুষকে তাহার ঐহিক মঙ্গলসাধনের উপায় সম্বন্ধে জাগ্রত করা। অবজ্ঞা লাঞ্ছনা সে গ্রাহ্যই করে না, অনিচ্ছা ও আত্মম্ভরিতাকে সে আমলই দেয় না। তাহার কাজ হইতেছে মানবমনের দুর্ব্বলতা চিকিৎসা করা। মহত্বের বড়াই না করিয়া, নিজের স্বার্থের খাতিরেও বটে, আর তোমার মঙ্গলসাধনের উদ্দেশ্যেও বটে সে আমাদের কাছে আসে, এবং এই অপরিচিত ও অবজ্ঞাত কথাশিল্পী পরিশেষে নিজের বিশ্বাসের বলে ও কথার জোরেই আমাদের সমস্ত বিজ্ঞতা ভাসাইয়া দিয়া বীমার বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া ফেলে।

ময়ূরভঞ্জের প্রাচীন কীর্ত্তি-নিদর্শন

(শ্রীরমাপ্রসাদ চন্দ)

উড়িষ্যায় এবং রাঢ়ের পশ্চিমভাগে যে অনুচ্চ পর্ব্বতমালামণ্ডিত বনভূমি আছে, তাহা এক সময় ঝাড়খণ্ড নামে পরিচিত ছিল। উড়িষ্যাবাসীরা এই ঝাড়খণ্ডের অধিবাসিগণকে দুই শ্রেণীতে বিভক্ত করে; এক শ্রেণীর নাম হাটুয়া, আর এক শ্রেণীর নাম কলাপিঠিয়া। হাটুয়া বলিতে উড়িয়া গৌড়িয়া (বাঙ্গালী) সভ্য লোক বুঝায়। হাটুয়া শব্দের অর্থ বোধ হয়, যাহারা সচরাচর হাটেবাজারে যাতায়াত করে। কলাপিঠিয়া বলিতে কোল, সাঁওতাল, ভুঁইয়া, ভূমিজ, বাথুড়ী প্রভৃতি বনভূমির আদিম অধিবাসীকে বুঝায়। কলাপিঠিয়া শব্দের অর্থ, যাহাদের গায়ের (পিঠের) রং কাল। কলাপিঠিয়াগণের মধ্যে আবার দুই শ্রেণী দেখা যায়। কোল, সাঁওতাল প্রভৃতি যে সকল জাতি এখনও নিজেদের "ঠার" (আদিম ভাষা) ছাড়ে নাই, তাহারা এক শ্রেণীর সামিল এবং ভুঁইয়া, বাথুড়ী প্রভৃতি যে সকল কলাপিঠিয়া জাতি উড়িয়া ভাষা অবলম্বন করিয়াছে, তাহারা অন্য শ্রেণীভুক্ত। এই শেষোক্ত শ্রেণীর মধ্যে ভুঁইয়ারাই প্রধান এবং বাথুড়ী সাঁউতী জাতি তাহাদেরই শাখা। ঝাড়খণ্ডের বা গড়জাতের করদ রাজ্যের মধ্যে ভুঁইয়াদিগের এক সময় যথেষ্ট প্রতিপত্তি ছিল, এমন প্রমাণ পাওয়া যায়। কোন কোন রাজ্যের রাজার অভিষেকের সময় ভুঁইয়া সর্দ্দারই কপালে তিলক দিয়া থাকে। কোন কোন রাজ্যের প্রধান দেব বা দেবীর মন্দিরে ভুঁইয়াই দেহুরী বা পূজারী। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, এত সুযোগ সুবিধা সত্ত্বেও ভুঁইয়ারা কোল সাঁওতালের তুলনায় সভ্যতার পথে অধিক দূর অগ্রসর হইতে পারে নাই। ভুঁইয়ারা যদিও সময় সময় ব্রাহ্মণ-পুরোহিত নিয়োগ করে এবং কতকগুলি ইতর জাতিকে অস্পৃশ্য জ্ঞান করে, তথাপি ইহারা ব্রাহ্মণ্যধর্ম্মের সংযম শিক্ষা করিতে পারে নাই। কোল-সাঁওতালের তুলনায় ভুঁইয়ারা গুণের মধ্যে অর্জ্জন করিয়াছে আলস্য। ঝাড়খণ্ডের বিভিন্ন জাতির অবস্থা বিচার করিলে মনে হয়, বিভিন্ন জাতির মানুষ মূলে যোগ্যতার হিসাবে পরস্পরের সমান, কিন্তু সুযোগের অভাবে বর্ত্তমানে তাহারা অসমান অবস্থায় আছে, এই মতবাদ সত্য নহে।

ঝাড়খণ্ডের ভুঁইয়ার মুলুকের বিভিন্নরাজ্যে ভুঁইয়াগণ এক সময়ে সর্ব্বেসর্ব্বা থাকিলেও যাহাকে তাহারা বিশুদ্ধ ক্ষত্রিয় মনে না করিত, এমন ব্যক্তিকে কখনও রাজপদ অধিকার করিতে দিতে প্রস্তুত ছিল না। ১৮৬১ খৃষ্টাব্দে কেউঞ্ঝরের রাজা গদাধর ভঞ্জের মৃত্যুর পরে কেউঞ্ঝর রাজ্যের ভুঁইয়ারা যাহাকে গদিতে বসাইতে চাহিয়াছিলেন, ইংরাজ সরকার তাঁহাকে মনোনীত না করিয়া অন্য একজন দাবীদারকে গদি প্রদান করায় কেউঞ্ঝরের ভুঁইয়ারা "মেলিয়া" (বিদ্রোহী) হইয়া ইংরাজের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করিয়াছিল। ঝাড়খণ্ডের প্রবাদ এই, রাজ্যনির্ব্বাচনব্যাপারে ভুঁইয়ারা এ যাবৎ স্বজাতির দাবী অগ্রাহ্য করিয়া বাহিরের কোন না কোন ক্ষত্রিয় রাজবংশের বংশধরকে আনিয়া রাজপদে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। এই প্রথার ফলে প্রাচীন কালেই ঝাড়খণ্ডে হিন্দু-সভ্যতা প্রবেশের অবকাশ পাইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে তাহার প্রাচীন কীর্ত্তির যথেষ্ট নিদর্শন রাখিয়া গিয়াছে। ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে এই প্রকার কীর্ত্তির যে নিদর্শন এখনও বিদ্যমান আছে, এই প্রস্তাবে তাহার সংক্ষিপ্ত পরিচয় দিব।

ময়ূরভঞ্জ রাজ্যে যে কিছু প্রাচীন কীর্ত্তিনিদর্শন আছে, তাহা প্রধানতঃ খিচিং নামক স্থানে দেখিতে পাওয়া যায়। বর্ত্তমান ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের পশ্চিম সীমান্তে অবস্থিত একটী ক্ষুদ্র পল্লীর নাম খিচিং। এই পল্লীর উত্তরে খয়েরভণ্ডন নামক নদ এবং দক্ষিণে কণ্টাখয়ের নামক ক্ষুদ্র নদ। খিচিংএর উপকণ্ঠে এই দুইটী নদ মিলিত হইয়া আরও ৩ মাইল দক্ষিণে বৈতরণী নদীতে পতিত হইয়াছে। খিচিংএর ভগ্নাবশেষ খয়েরভণ্ডনের তীর হইতে কণ্টাখয়েরের তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত। এই ভগ্নাবশেষের মধ্যে দুইটী গড়ের চিহ্ন আছে; একটিকে বলে বিরাট-গড়, এবং আর একটিকে বলে কীচক-গড়।

গ্রামের বর্ত্তমান অধিবাসীরা বলেন, এই দুইটী গড় এবং খিচিংএর অন্যান্য কীর্ত্তিকলাপ মহাভারতোক্ত বিরাট রাজার কৃত। বিরাট-গড়ের এবং কীচক-গড়ের ভগ্নস্তূপের ভিতর কি যে লুক্কায়িত আছে, তাহা খনন না করিলে বলা যায় না। খিচিংএর জমীর উপরে এখনও যে সকল কীর্ত্তি-নিদর্শন দেখিতে পাওয়া যায়, তন্মধ্যে গ্রামে প্রবেশের পথে দর্শক প্রথম দেখিতে পাইবেন, কুটাইতুণ্ডী বা সর্ব্বেশ্বর শিবের মন্দির (১নং চিত্র)। এই মন্দির শিখর-যুক্ত বাস্তু-শাস্ত্রোক্ত নাগর রীতিতে নির্ম্মিত। এই রীতির মন্দির দ্রবিড় দেশের মন্দির অপেক্ষা আকারে স্বতন্ত্র। এই এই জন্য ফারগুসান এই রীতির নাম দিয়াছে হিন্দু-আর্য্যরীতি। নাগর-মন্দিরে যে অংশে উপাস্য বস্তু প্রতিষ্ঠিত থাকে, তাহার নাম গর্ভগৃহ। গর্ভগৃহ চতুষ্কোণ। গর্ভগৃহের উপরে শুকপক্ষীর নাসার বা চঞ্চুর আকারের শিখর বা মঞ্জরী অবস্থিত। বাস্তুশাস্ত্র অনুসারে গর্ভগৃহের সম্মুখে মুখমণ্ডপ বা মুখশালা থাকার কথা। কুটাইতুণ্ডীর মুখমণ্ডপ নাই, মন্দিরটী একক দণ্ডায়মান। রৌদ্র-বৃষ্টি ঝড় ঝঞ্ঝা হইতে আশ্রয় লাভ করিবার জন্য উপাসক মুখমণ্ডপ নির্ম্মাণ করেন। মুখমণ্ডপ বিহীন মন্দির দেখিলে মনে হয়, উপাসক নিজের সুবিধার বিষয় একেবারে বিস্মৃত হইয়া উপাস্য দেবতার প্রাসাদ নির্ম্মাণ করিয়াছেন। কুটাইতুণ্ডীর কারুকার্য্য-খচিত অনেক পাথরই খসিয়া পড়িয়াছে এবং শিখরের যতটা অংশ এখন বিদ্যমান আছে, সত্বর মেরামত না করিলে তাহাও ভূমিসাৎ হইবে। এই কারুকার্য্য উচ্চ অঙ্গের না হইলেও এই মন্দিরের শিখরের আয়তন মানানসহি এবং বাঁক বড় সুন্দর। আকারের অনুপাতে ভুবনেশ্বরের মুক্তেশ্বরের শিখর অনুচ্চ এবং লিঙ্গরাজের শিখর অত্যুচ্চ মনে হয়। লিঙ্গরাজের শিখরের বাঁকও সহজে লক্ষিত হয় না। কুটাইতুণ্ডী যখন পূর্ণাঙ্গ ছিল, তখন ইহার অঙ্গসৌষ্ঠব চমৎকার ছিল।

কুটাইতুণ্ডীর প্রায় ৪ শত গজ পশ্চিমদিকে ঠাকুরাণীশালা বা ঠাকুরাণী বাড়ী। এই স্থানে কতকগুলি মন্দিরের ভগ্নাবশেষ এবং একটী ছোট (চন্দ্রশেখরের) মন্দির এখনও দণ্ডায়মান আছে। ১৯২৩ খৃষ্টাব্দে এই স্থানের অধিষ্ঠাত্রী দেবী ঠাকুরাণী বা কিঞ্চকেশ্বরীর মূর্ত্তি একটী ভগ্নস্তূপের উপর ইষ্টকনির্ম্মিত একটী ক্ষুদ্র মন্দিরে প্রতিষ্ঠিত ছিল। একটী ভগ্ন চামুণ্ডা-মূর্ত্তি কিঞ্চকেশ্বরী নামে পরিচিত। কিঞ্চকেশ্বরী চামুণ্ডা ময়ূরভঞ্জের মহারাজের কুলদেবী। ময়ূরভঞ্জের বর্ত্তমান রাজধানী বারিপদার রাজবাড়ীতে এবং বহলদায় কিঞ্চকেশ্বরী চামুণ্ডা প্রতিষ্ঠিত আছেন। ময়ূরভঞ্জের মহারাজগণের খৃষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দে সম্পাদিত সনন্দে দেবী খিচিঙ্গেশ্বরী নামে অভিহিত হইয়াছেন। সুতরাং দেখা যায়, বর্ত্তমান কিঞ্চকেশ্বরী নামটী আদিম খিচিঙ্গেশ্বরী নামের অপভ্রংশ। ১৯২২ খৃষ্টাব্দে আমি যখন খিচিং প্রথম পরিদর্শন করি, তখন কিঞ্চকেশ্বরীর ইষ্টক-মন্দিরের সম্মুখে, ভগ্নস্তূপে কটিদেশ পর্য্যন্ত প্রোথিত খণ্ডিয়া দেউল নামক একটী অসম্পূর্ণ মন্দির বর্ত্তমান ছিল। ২নং চিত্রে এই মন্দিরের সম্মুখভাগমাত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। যেমন সম্মুখের দিকে, তেমনই খণ্ডিয়া দেউলের অন্যান্য দিকেও দেবদেবীর এবং নাগনাগিনীর অনেক ভগ্নমূর্ত্তি পড়িয়াছিল। খণ্ডিয়া দেউলের দ্বারের ঊর্দ্ধ-ফলক এবং পার্শ্ব-ফলকত্রয় আদৌ নিশ্চয়ই কোনও প্রাচীন বৃহত্তর মন্দিরের দ্বারফলক ছিল। এই ফলকত্রয় মনোরম কারুকার্য্যে অলঙ্কৃত। দক্ষিণদিকের পার্শ্বফলকের নিম্নাংশে গঙ্গামূর্ত্তি এবং বামদিকের পার্শ্বফলকের নিম্নাংশে যমুনামূর্ত্তি অঙ্কিত রহিয়াছে। এই দুইখানি প্রতিমার নিকট প্রণিপাত করিয়া যে উপাসক মন্দিরে প্রবেশ করিত, সে বোধ হয় মনে করিত, তাহার দেহ গঙ্গাযমুনাসঙ্গমে স্নানের পবিত্রতা ও ফললাভ করিয়াছে।

১৯২৩ খৃষ্টাব্দে আমি এই ভগ্নস্তূপ খনন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম এবং ১৯২৫ খৃষ্টাব্দে তাহা সমাপ্ত করিয়াছিলাম। এই ভগ্নস্তূপের গর্ভ এবং খণ্ডিয়া দেউলের প্রাচীরের ভিতর হইতে অনেক সুন্দর সুন্দর পাষাণের প্রতিমা এবং কারুকার্য্য-খচিত ফলক উদ্ধৃত হইয়াছে। পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, এই সকল প্রতিমা এবং ফলকের দ্বারা দুইটি পাষাণের মন্দির অলঙ্কৃত হইয়াছিল। এই দুইটি মন্দিরের মধ্যে যেটি আয়তনে বড় ছিল, তাহাকে আমি খিচিংএর বিলুপ্ত বড় দেউল বলিব। বড় দেউলের কোন ফলকে কোন লিপি আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু খিচিংএর অন্য একটি ভগ্নস্তূপে আবিষ্কৃত একটি ভগ্ন অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমার পাদদেশে এই লিপিটি ক্ষোদিত আছে,—

"ওঁ রাজ্ঞঃ শ্রীরায়ভঞ্জস্য লোকেশো ভগবানয়ম্।
শ্রীধরণীবরাহেণ সহ কীর্ত্যা বিনির্ম্মিতঃ॥"

"ভগবান্ লোকেশের এই প্রতিমা রাজা শ্রীরায়ভঞ্জের জন্য কীর্ত্তির সহায়তায় শ্রীধরণীবরাহ কর্ত্তৃক নির্ম্মিত হইয়াছিল।"

এই লিপিতে ব্যবহৃত অক্ষরের ছাঁদ অনুসারে এই লিপি খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল, এইরূপ অনুমান করা যাইতে পারে। এই লিপিযুক্ত প্রতিমা যে ঢঙ্গে নির্ম্মিত এবং যেরূপে অলঙ্কৃত, বড় দেউলের সংলগ্ন প্রতিমা-নিচয়েও সেই ঢঙ্গ এবং সেই রীতি দেখা যায়; সুতরাং অনুমান হয়, বড় দেউল এবং লিপিযুক্ত অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমা একই যুগের সৃষ্টি। ময়ূরভঞ্জ

রাজ্যের অন্তর্গত বামনঘাটীর এলাকায় তিনখানি তাম্র-শাসন পাওয়া গিয়াছে। এই তিনখানির মধ্যে দুইখানির সম্পাদক রাজা রণভঞ্জ এবং একখানির সম্পাদক রণভঞ্জের পুত্র রাজা রাজভঞ্জ। এই সকল তাম্রশাসনের অক্ষরের ছাঁদ অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমার লিপির অক্ষরের ছাঁদের অনুরূপ। সুতরাং এই তাম্রশাসনত্রয়ও খৃষ্টীয় একাদশ শতাব্দে সম্পাদিত হইয়াছিল, মোটের উপর এরূপ সিদ্ধান্ত করা যাইতে পারে।

এই তাম্রশাসনত্রয়ে কথিত হইয়াছে, বীরভদ্র আদি-ভঞ্জ ময়ূরাণ্ড ভেদ করিয়া ভূমিষ্ঠ হইয়াছিলেন এবং বশিষ্ঠ মুনি কর্ত্তৃক প্রতিপালিত হইয়াছিলেন। আদিভঞ্জের বংশে রাজা কোট্টভঞ্জ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। কোট্ট-ভঞ্জের পুত্র রাজা দিগ্‌ভঞ্জ। দিগ্‌ভঞ্জের পুত্র রাজা রণভঞ্জ। রণভঞ্জ খিজ্জিঙ্গকোট্ট (খিচিং) নিবাসী ছিলেন এবং শৈব ছিলেন। রণভঞ্জের পুত্র রাজা রাজভঞ্জ। এই রাজভঞ্জ এবং অবলোকিতেশ্বরের প্রতিমার লিপির রায়ভঞ্জ অভিন্ন ব্যক্তি। খিচিংএর বড় দেউলে শিবমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত ছিল এবং এই বড় দেউল সম্ভবতঃ রাজা রণভঞ্জ কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল।

খিচিংএর মন্দির-প্রতিষ্ঠাতা রণভঞ্জ, রাজভঞ্জ প্রভৃতি প্রাচীন ভঞ্জরাজগণ স্থানীয় কিংবা কোনও বিদেশ হইতে আগত, এই বিষয়ে শিল্পরীতি হইতে কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া যাইতে পারে। খিচিংএর পার্শ্ববর্ত্তী প্রদেশের মধ্যে বেণুসাগর ভিন্ন আর কোথাও প্রাচীন কীর্ত্তিচিহ্ন দেখা যায় না। বেণুসাগরের তীরে যে সকল মূর্ত্তি ও মন্দিরের চিহ্ন আছে, তাহা খিচিংএর মন্দিরাদির মত অতটা প্রাচীন নহে। খিচিংএর শিল্প স্থানীয় প্রাচীন-তর শিল্পের পরিণতির ফল নহে, আগন্তুক বস্তু; সুতরাং আগন্তুকগণের কীর্ত্তি। এই আগন্তুকগণ কোন্ দেশ হইতে আসিয়াছিলেন? ৩ নং চিত্রে খিচিংএর বড় দেউলের পার্শ্বফলকের এবং ৪ নং চিত্রে ঐ দেউলের শিখরের কারুকার্য্যের মধ্যে উড়িষ্যার প্রভাব অত্যন্ত প্রবল দেখা যায়। নমুনাস্বরূপ ভুবনেশ্বরের ব্রহ্মেশ্বরের মন্দিরের কতকাংশ ৫ নং চিত্রে প্রদর্শিত হইল। তুলনা করিলে দেখা যাইবে, উভয় মন্দিরের শিলাবিন্যাসরীতি এবং লতাকর্ম্ম প্রায় এক প্রকার, যেন একই শিল্পশিক্ষালয়ের শিক্ষিত শিল্পীর হাতের কায। সুতরাং অনুমান হয়, যে সকল কারিগর বড় দেউল অলঙ্কৃত করিয়াছিলেন, তাঁহারা উড়িষ্যা হইতে আনীত। খিচিংএর প্রাচীন মন্দিরাদির নিদর্শন দেখিলে সহজে মনে হয়, উড়িষ্যা হইতে কোনও অসমসাহসিক কৃতী ব্যক্তি আসিয়া এই বনভূমিতে এক নবরাজ্য প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন এবং উড়িষ্যা হইতে কারিগর আনাইয়া নব একাম্রকানন (ভুবনেশ্বর) প্রতি-ষ্ঠার উদ্যোগ করিয়াছিলেন। কিন্তু খিচিংএর প্রাচীন মন্দিরের অলঙ্কারপদ্ধতি উড়িষ্যার অনুরূপ হইলেও মূর্ত্তির গড়ন-রীতি অন্য প্রকার। দৃষ্টান্তস্বরূপ ৬ নং চিত্রে খিচিংএর শিবমূর্ত্তির সহিত ৭নং চিত্রে প্রদর্শিত ভুব-নেশ্বরের লিঙ্গরাজ মন্দিরের বাহিরের একটি নিসার (niche) বা প্রকোষ্ঠের কার্ত্তিকেয়মূর্ত্তির তুলনা করা যাইতে পারে। শিবমূর্ত্তির দাঁড়াইবার ভঙ্গী স্বাভাবিক, কার্ত্তিকেয় মূর্ত্তির ভঙ্গী অস্বাভাবিক, যেন ছাঁচে ঢালা। খিচিংএর মূর্ত্তির মুখাকৃতি মানানসই; কার্ত্তিকেয়ের মুখখানি অধিক প্রশস্ত এবং চিবুক কতকটা সঙ্কীর্ণ। খিচিংএর মূর্ত্তির উপরার্দ্ধ যেরূপ যত্নের সহিত গড়া হইয়াছে, নিম্নার্দ্ধে ততটা যত্নের চিহ্ন দেখা যায় না। উভয় মূর্ত্তির চালচিত্রের ভঙ্গী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। ভুবনেশ্বরের মন্দিরনিচয়ে মুগ্‌নি পাথরের যত মূর্ত্তি আছে, তাহা এই কার্ত্তিকেয়ের ঢঙ্গে গঠিত। পার্শ্ববর্ত্তী বঙ্গ, বিহার, উড়িষ্যা এবং অন্যান্য প্রদেশে একাদশ ও দ্বাদশ শতাব্দে গঠিত মূর্ত্তির সহিত খিচিংএর মূর্ত্তির তুলনা করিলে দেখা যায়, অন্যান্য প্রদেশের মূর্ত্তিতে কারখানার ছাঁচের প্রভাব যত প্রবল, খিচিংএর মূর্ত্তিতে ছাঁচের প্রভাব তত প্রবল নহে। খিচিংএ শিল্পী কারখানা-নমুনার দিকে যেমন লক্ষ্য রাখিয়াছিলেন, তেমনই স্বাভাবিক মনুষ্যাকৃতি এবং মনুষ্যদেহের ভঙ্গীর দিকে লক্ষ্য রাখিয়া মূর্ত্তি গড়িয়া-ছিলেন। খিচিংএর শিল্পবিদ্যালয়ের ধরণীবরাহ এবং কীর্ত্তি এই দুই জন ভাস্করের নাম আমরা জানি। ইহারা বা ইহাদের ওস্তাদ বোধ হয় উড়িষ্যা ছাড়া অন্য কোন দেশ হইতে আসিয়াছিলেন এবং মৌলিক প্রতিভার অধি-কারী ছিলেন। রণভঞ্জ বা আর যে কোন প্রাচীন ভঞ্জ-রাজা এই শ্রেণীর ভাস্কর আনয়ন করিয়া প্রতিমা গড়িতে প্রথম নিয়োগ করিয়াছিলেন, তিনিও বোধ হয়, উড়িষ্যা ব্যতীত আর কোন সভ্যদেশ হইতে আসিয়া প্রাচীন ভঞ্জ-রাজ্য এবং খিজ্জিঙ্গকোট্ট (খিচিং) প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। শিল্পরীতির সূত্র ধরিয়া ময়ূরভঞ্জ রাজ্যের উৎপত্তি সম্বন্ধে আর বেশী কিছু বলা সুকঠিন। *

—

* খিচিংএর বিস্তৃত বিবরণ এবং প্রবন্ধে উদ্ধৃত প্রমাণের ঠিকানার জন্য এই সকল গ্রন্থ দ্রষ্টব্য:—

Annual Report of the Archaeological Survey of India 1922-23, pp. 124-128 Ibid, 1923-24, pp. 85-87; Ibid, 1924-25, pp.

এই প্রবন্ধের অনেক কথা Journal of the Bihar and Orissa Research Society, Vol xiii (pp. 131-136) এ প্রকাশিত লেখকের Notes on the Ancient Monuments of Mayurbhanj প্রবন্ধে বিনিবদ্ধ হইয়াছে। —মাসিক বসুমতী।

ন্যায়বিধান সামাজিক মর্য্যাদানিরপেক্ষ।

(জনৈক শিক্ষক)

সমাজে তোমার স্থান কোথায়, আদালতের বিচারস্থলে সে কথা ভাবিতে গেলে চলে না। বর্ত্তমান যুগে রাজা, সামন্তগণ, ধনী, দরিদ্র প্রভৃতির সমাজে বিভিন্ন স্থান আছে, ইহা তো জানা কথা। ধনী ও সম্ভ্রান্তগণ সমাজে অনেক অধিকার প্রাপ্ত হন; দরিদ্রগণ অনেক অধিকার হইতে বঞ্চিত থাকে। এখন, দরিদ্রই বল, আর ধনীই বল, সকলেই ঘোড়া রাখিতে ভাল বাসে। এই ঘোড়া রাখিবার সম্বন্ধে আইন-কানুন ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সকলেরই পক্ষে সমানভাবে প্রযুক্ত হয়—ঘোড়া রাখিতে গেলে ধনী লোকেরও লাইসেন্স লওয়া দরকার, আর দরিদ্রেরও লাইসেন্স লওয়া দরকার। ইহা সত্য যে, লাইসেন্স লইবার "ফী" দেওয়া গরীব লোকের পক্ষে ধনী অপেক্ষা কষ্টকর হয় বটে; কিন্তু আইনের মূলনীতি হইতেছে যে ধনীদরিদ্র সকলেরই পক্ষে আইন একই হওয়া উচিত। লাইসেন্স-ফী বা কর অবস্থাবিশেষে কমবেশী হইলে হয় তো নিক্তির তৌলে ন্যায়বিচার হয়। কিন্তু একবার সেই করের পরিমাণ নির্দ্দিষ্ট হইলে ন্যায়বিচার করিতে হইলে তাহা ধনীদরিদ্র সকলেরই প্রতি সমভাবে প্রয়োগ করা কর্ত্তব্য।

বহুকাল যাবৎ ইংলণ্ডে আইন প্রচলিত আছে যে, সকল লোকের প্রতিই ন্যায়বিচার সমভাবেই প্রয়োগ করিতে হইবে। ইংলণ্ডের রাজা জনের সময় ইংরাজেরা যে "ম্যাগ্নাচার্টা"র বলে যে সকল অধিকার লাভ করিয়াছিল, তাহাদের অন্যতর অধিকার হইতেছে—"ন্যায়বিচার কাহাকেও বিক্রয় করা হইবে না বা কাহারও প্রতি ন্যায়বিচার বিতরণে বিলম্ব করা হইবে না"। ন্যায়বিচার বিতরণে সামাজিক শ্রেষ্ঠতম আসনও যে বাধা দিতে পারে না, তাহার দৃষ্টান্তস্বরূপে পঞ্চম হেনরির যুবরাজ অবস্থায় বিচারক ন্যাসকই কর্ত্তৃক কারাগারে প্রেরণ উল্লেখ করা যাইতে পারে। স্কটল্যাণ্ডের ইতিহাসে উল্লিখিত ইহার অনুরূপ একটী কাহিনী সুপ্রসিদ্ধ বসওয়েলের "হেব্রাইডিস ভ্রমণে" বর্ণিত হইয়াছে। লর্ড স্যানকাহার নামক এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি অসিক্রীড়ায় পারদর্শিতার জন্য খুবই বিখ্যাত হইয়া উঠিয়াছিলেন এবং এক পেশাদার অসিক্রীড়ককে দ্বন্দ্বযুদ্ধে আহ্বান করিলেন। দুর্ভাগ্যবশত তাঁহার একটী চক্ষু পেশাদারের তরবারি লাগিয়া বিনষ্ট হইল। লর্ড স্যানকাহার সেই বেচারী অসিক্রীড়ককে বধ করাইলেন। উক্ত লর্ড ধরা পড়িয়া হত্যাপরাধে বিচারার্থ আদালতে আনীত হইলেন। বিচারকালে বিচারক তাঁহাকে তাঁহার লর্ড উপাধি ব্যবহার করিতে দেন নাই। পরিশেষে তিনি দোষী সাব্যস্ত হইয়া সামান্য ব্যক্তির ন্যায় বধদণ্ডে দণ্ডিত হইলেন। ভারতের ইতিহাসেও এইরূপ অনেক ঘটনার উল্লেখ দেখা যায়। আপাতত একটী ঘটনার কথা স্মরণ হইতেছে। গয়াসুদ্দিন নামে বঙ্গের এক নবাব ছিলেন। কি এক অপরাধে তিনি বিচারার্থ বিচারালয়ে আনীত হইলেন। তাঁহার হস্তে একটী লগুড় ছিল। বিচারের ফলে তিনি শাস্তি পাইলেন এবং অম্লানবদনে সেই শাস্তিগ্রহণে স্বীকার করিয়া বিচারককে বলিলেন যে, "আপনি ন্যায়বিচার করিয়া আমাকে দণ্ডপ্রদান না করিলে আমার এই হস্তস্থিত লগুড় প্রহারে আপনার মাথা ভাঙ্গিয়া দিতাম"। তদুত্তরে বিচারকও নির্ভীকভাবে বলিলেন "আপনি দণ্ড গ্রহণ না করিলে আপনাকে কারাগারে আবদ্ধ রাখিতাম"।

বিচারালয়ে যখন বিচারকগণ সামাজিক মর্য্যাদার খাতিরে বা কালা-ধলা প্রভৃতি বর্ণভেদের কারণে অন্যায় বিচার করেন, তখন বিচারার্থীদের বিশ্বাস দাঁড়াইয়া যায় যে, বিচারালয়ে নিরপেক্ষ বিচার পাওয়া যাইবে না। এই প্রকার এক-একটী বিচারের পরিণামে শাসনের ভিত্তি শিথিল হইয়া যায়, ইহা শাসনকর্ত্তৃপক্ষদিগের হৃদয়ঙ্গম করা কর্ত্তব্য। দুঃখের বিষয়, জানিয়া শুনিয়াও অনেক বিচারক বিচারবিপর্য্যয় করিয়া থাকেন। আমেরিকাতে নিগ্রোদলন, ভারতীয় প্রভৃতি বিদেশীয়দিগকে অধিকার বঞ্চিত করা প্রভৃতি কার্য্যসকল বিচারবিপর্য্যয়ের জাজ্বল্যমান প্রমাণ। ইহার বিষময় পরিণাম, আজ হৌক, দুদিনবাদে হৌক নিশ্চয়ই প্রকাশ পাইবে।

এখন দেখা যাক, সামাজিক অবস্থানিরপেক্ষভাবে ন্যায়বিচারের ভাব কি প্রকারে গড়িয়া উঠিল। এই যে কর ধার্য্য হয়, সকলেই জানে যে, গবর্ণমেণ্ট বা মিউনিসিপালিটি প্রত্যেকের নিকট হইতে অল্প অল্প কর লইয়া রাজ্যশাসন, রাস্তাঘাট-পরিষ্কার প্রভৃতি হিতজনক কার্য্য সাধন করে। ইংলণ্ডের ইতিহাস যাঁহারা পড়িয়াছেন, তাঁহারাই বলিতে পারেন যে কত কঠোর সংগ্রামের ভিতর দিয়া পার্লামেণ্টের 'কমন্স সভা' জাতীয় ধনভাণ্ডারে প্রভুত্ব স্থাপনে সক্ষম হইয়াছিল। ইংলণ্ডীয় ইতিহাসের কোন্ পাঠক না হ্যামডেনের কথা জানেন? তাঁহার মনের কথা এই ছিল যে, প্রজারা যখন টাকা করস্বরূপে দেয়, তখন দেশের শাসনবিষয়েও প্রজাদের হাত থাকা উচিত—ইহাই ন্যায়বিচার। তাঁহার সময় হইতে প্রজাদিগকে দেশের শাসনে বিস্তৃত ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে। এখন বলিতে গেলে প্রত্যেক নরনারীরই একটী করিয়া "ভোট" (vote) আছে, অর্থাৎ শাসকনির্ব্বাচনের অধিকার আছে। ফ্রান্সে রাজা এই ক্ষমতা

দিতে অস্বীকার করার শতাব্দীর অধিক অতীত হইল, ভীষণ গৃহযুদ্ধ হইয়া গিয়াছে। সেই যুদ্ধের নাম ফরাসি-বিপ্লব। সেই বিপ্লবে রাজতন্ত্র ও অভিজাত-তন্ত্র ভূমিসাৎ হইয়া গেল। এই যুদ্ধের নিগূঢ় কারণ এই যে, ফ্রান্সের অভিজাতসম্প্রদায় নিজেদের অধিকার ও স্বার্থ লইয়াই ব্যস্ত হইয়াছিলেন, ন্যায়ের দিকে কিছুমাত্র দৃষ্টি নিক্ষেপ করেন নাই।

এই প্রকার অধিকারের একটী দৃষ্টান্ত দিই। ঐ সকল অভিজাত সম্প্রদায়ের হাতে তাঁহাদের প্রজাদের শিক্ষা-নবিশি বাঁধা ছিল। আজকালকার ছেলেমেয়েদিগকে যদি বলা যায় যে, তাহারা কোন দোকানে শিক্ষানবিশি করিতে গেলে তাহাদের বাপমায়ের কিছু টাকা দিয়া কোন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির নিকট হইতে অনুমতি পত্র আনিতে হইবে, এ প্রকার নিয়ম শুনিলে তাহারা হাসিয়া উঠিবে। কিন্তু ফ্রান্সে এ নিয়ম বহুকাল পর্য্যন্ত প্রচলিত ছিল। ইংলণ্ডেও যে ইহা প্রচলিত না ছিল তাহা নহে—তবে ফ্রান্সের মত দীর্ঘকাল ধরিয়া ছিল না। যেখানে যে জন্মগ্রহণ করিত সেখানে সে থাকিয়া তথাকার সম্ভ্রান্ত সামন্তের বাড়ীতে কাজকর্ম্ম করিতে বাধ্য হইত। তাহার ছেলে সেই সামন্তের অনুমতি ব্যতীত শিক্ষানবিশি করিতে পারিত না, এমন কি মেয়েদের বিবাহও হইতে পারিত না। এই প্রকার অবস্থার নাম দাসপ্রথা। সামন্ত তাহার জমীজমাত বিক্রয় করিলে ঐ সমস্ত দাস প্রজাগণও সঙ্গে সঙ্গেই বিক্রীত হইয়া যাইত। এই প্রকার অবস্থার অধীনে আজকালকার কোনও লোকই বাস করিতে চাহিবে না। তবু এই দাসপ্রথা ক্রীতদাসপ্রথার মত মন্দ ছিল না। যদিও দাসপ্রজার সহসা মনিব পরিবর্ত্তন সম্ভব ছিল, কিন্তু তাহার পরিবার ছিন্নভিন্ন হইত না। ক্রীতদাস প্রথায় ছাগল গরু প্রভৃতি জীবজন্তুর মত ক্রীতদাসের স্ত্রীপুত্র কন্যা মাতা প্রভৃতিকে পৃথক পৃথক ভাবে বিক্রয় করিবার অধিকার ছিল। এমন কি, দাসপ্রভুগণ ইচ্ছা করিলে তাহাদের ক্রীতদাসদিগকে বধ করিতে পারিত। রোমে এই প্রথা প্রচলিত ছিল। অবশেষে রোমের জনসাধারণ একদিন শুনিয়া স্তম্ভিত হইল যে একজন ক্রীতদাসপ্রভু তাহার ক্রীতদাসদিগকে বধ করিয়া তাহাদের শবদেহ তাহার জলাশয়ে মৎস্যদিগের আহারের নিমিত্ত ফেলিয়া দিয়াছে। তখন রোমকগণ এই আইন করিল যে, কেহ ক্রীতদাসকে বধ করিতে পারিবে না। এই প্রকার নানাবিধ ঘটনাচক্রের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে সামাজিক অবস্থা অনুসারে ন্যায়বিধান সম্বন্ধীয় মানুষের ধারণাসকল অনেক উন্নতিলাভ করিয়াছে। এক সময়ে মানুষেরা যাহা ন্যায় ও সঙ্গত বিবেচনা করিত, এখন আমরা তাহা অন্যায় ও অকর্ত্তব্য মনে করি। ইহা সকলেরই জানা উচিত যে, কোনও মানবসমাজই এখনও আদর্শ সামাজিক ব্যবস্থায় উপনীত হইতে পারে নাই। সমাজে অনেক লোক আছে, যাহারা অতি দরিদ্র, যাহারা নিজে কোনও দোষ না করিলেও অন্নাভাবে বস্ত্রাভাবে ও স্থানাভাবে অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছে। ইহা সত্য যে, অনেকে আছে, যাহারা নিজেদের দোষে ও গাফিলতিতে কষ্ট পায়; কিন্তু অনেকে আছে, যাহারা নিজেদের গুণপনা দেখাইবার কোনও অবসরই পায় না। জগতে এখনও দুঃখকষ্ট ও দারিদ্র্যের রাশি রাশি কারণ আছে, সেইগুলি দূর করিবার চেষ্টা করা আমাদের অন্যতর প্রধান কর্ত্তব্য। এই দুঃখদৈন্য দূর করা একটা বিষম সমস্যা। ইহা বিদূরিত করিতে গেলে আমাদের শুধু কষ্ট অনুভব করিলে চলিবে না, কিন্তু উহা দূর করিবার পন্থা উদ্ভাবনের জন্য রীতিমত মাথা ঘামাইয়া চিন্তা করিতে হইবে।

জগতের দুঃখদৈন্য দূর করিবার অন্যতর প্রধান উপায় হইতেছে সমাজের সকল শ্রেণীর মধ্যে শিক্ষাবিস্তার। আমাদের দেখিতে হইবে, শিক্ষা সম্বন্ধে ন্যায়সঙ্গত ভাব জনসাধারণের মধ্যে কতকটা উন্নত হইয়াছে। বহুবৎসর পূর্ব্বে গরীব লোকদের ছেলেরা শিক্ষালাভের কোনও অবসরই পাইত না। কিন্তু আজকাল আমরা মনে করি, প্রত্যেকেরই শিক্ষালাভ করা কর্ত্তব্য, তাহার সামাজিক অবস্থা যাহাই হোক না কেন। সকলের বোঝা উচিত যে, শিক্ষা সম্বন্ধে শেষোক্ত ধারণা কত উন্নত। ইহা বুঝিয়া আমাদের কাহারও শিক্ষাদান সম্বন্ধীয় কোনও অবসর ও সুবিধা পাইলে ছাড়া উচিত নয়। এখন যে শিক্ষা আমরা লাভ করিতেছি, সেই শিক্ষার ফলে আমরা ব্যক্তিগত হিসাবে সংসারযাত্রা সুখে নির্ব্বাহ করিতে সক্ষম হইলেও তাহাতেই সন্তুষ্ট থাকা আমাদের কর্ত্তব্য নহে। বর্ত্তমান অবস্থা অপেক্ষা সমাজের মঙ্গলতর অবস্থা কিসে আসে, সমাজে সুখশান্তি কিসে অধিকতর সুপ্রতিষ্ঠিত হয়, এই প্রকার শিক্ষা প্রবর্ত্তনের জন্য আমাদের বিশেষ চেষ্টা করিতে হইবে।

মানবদেহের বৈশিষ্ট্য ও তাহার কারণ।

(রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ বি-এল বিদ্যার্ণব)

প্রকৃতি অতীব বিস্ময়কর উপায় অবলম্বনে মানবের মস্তকে এই বিশিষ্টতার ছাপ অঙ্কিত করিয়া দিয়াছেন যে, সে অপরের কল্যাণার্থ নিজের স্বার্থত্যাগ করিতে ভাল বাসে। অন্যান্য জীবের সঙ্গে তুলনায় মানবের যে সকল বিশিষ্টতার উল্লেখ হইয়াছে, তন্মধ্যে প্রথম ও প্রধান

লক্ষ্যের বিষয় এই যে, মানবশিশু নিঃসহায় অবস্থায় জন্ম গ্রহণ করে, এবং জীবনরক্ষার জন্য তাহাকে বহুকাল অপরের সেবা ও শুশ্রূষার উপর নির্ভর করিতে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ মানবের সর্ব্বাপেক্ষা নিকটবর্ত্তী জীব একটা বানরশিশুর সঙ্গে মানবশিশুর তুলনায় উল্লেখ করা হইয়াছে। জন্মগ্রহণ করিবার পর কয়েক দিনের মধ্যেই বানরশিশু জননীর সঙ্গ পরিত্যাগ করিয়া সম্পূর্ণরূপ স্বাধীন ও স্বতন্ত্রভাবে নিজের জীবন ধারণ করিতে সমর্থ হয়, মানবশিশুর পক্ষে ব্যবস্থা ইহার অনারূপ। বাঁচিয়া থাকিতে হইলে সুধু মাসের পর মাস নহে, বৎসরের পর বৎসর একাদিক্রমে তাহাকে অন্যের মুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতে হইবে। উভয়ের মধ্যে হস্তপদাদি অঙ্গসকলের বিষয়ে কোনরূপ প্রভেদ নাই, তথাপি মানবশিশু যে সময়টা একটা নিঃসহায় মাংসপিণ্ডবৎ এক স্থানেই পড়িয়া থাকে, ঐ সময়ের মধ্যে বানরশিশু অবলীলাক্রমে পর্ব্বত-শৃঙ্গ ও উচ্চতম বৃক্ষের শিখরপ্রদেশ পর্য্যন্ত আরোহণ করতঃ নিজের আহার্য্য সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়। মানবশিশুর এই যে নিঃসহায় অবস্থা ইহা কোনরূপ আকস্মিক ঘটনা সম্ভব নহে। প্রকৃতি ইহার ভিতর দিয়া স্বকার্য্য-সাধনে তৎপর রহিয়াছেন। বাধ্য করিয়া জননীকে তিনি শিশুর রক্ষণাবেক্ষণ-কার্য্যে নিয়োগ করিতেছেন। দীর্ঘকাল এই পরিচর্য্যা কার্য্যে নিযুক্ত থাকার ফলে তাহার মধ্যে নৈতিক জীবনের উদ্ভব হইতেছে। একটুকু নিবিষ্ট চিত্তে বিবেচনা করিলে বুঝিতে পারা যাইবে যে, সন্তান মানবের শ্রেষ্ঠ শিক্ষক; জননীর নিকট সন্তান যতটা শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, সন্তানের নিকট হইতে জননী তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী শিক্ষা লাভ করেন। প্রকৃত প্রস্তাবে এইস্থানে ইতর প্রাণীর জীবন ও মানবজীবনের মধ্যে এক প্রবল রেখাপাত হইয়াছে এবং ক্রমে তাহা হইতে এক অলঙ্ঘ্য প্রাচীর উত্থিত হইয়া একের জীবনকে অন্যের জীবন হইতে সম্পূর্ণরূপে পৃথক্ করিয়া দিয়াছে। আত্মরক্ষার্থ সংগ্রাম এবং এই সংগ্রামে সামর্থ্যশালীর জয়—বিবর্ত্তনের এই যে মূল তত্ব, এতকাল ইহা সমভাবে সর্ব্বজীবে কার্য্য করিয়া আসিতেছিল; কিন্তু মানবশিশুর পরিচর্য্যায় তাহার মাতাকে এরূপ দীর্ঘকাল নিযুক্ত রাখার ফলে বিবর্ত্তন দুই স্বতন্ত্র ধারায় বিভক্ত হইয়া চলিয়াছে। একধারা যাহা মানবেতর জীবদিগের মধ্যে একই ভাবে কার্য্য করিয়া চলিয়াছে, ইহাকে পৃথিবীর সর্ব্বপ্রধান বেগবতী স্রোতস্বিনীর সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে, অপরটি কিন্তু গঙ্গাযমুনার সঙ্গমসদৃশ শ্বেতধারা ও নীলধারার সম্মিলনের ন্যায় নৈসর্গিক ও নৈতিক রাজ্যে (Physical plane and Ethical plane) নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষা করতঃ স্ক্রুপের প্যাঁচের ন্যায় পরস্পরকে আলিঙ্গন করিয়া মানবজীবনের গতিপথ নির্দ্ধারণ পূর্ব্বক চলিয়াছে। আর একটি বিষয়ের উল্লেখ এখানে আবশ্যক; প্রথম হইতেই সকল জননীই যে তাহার সন্তানের জীবনরক্ষার জন্য এতটা স্বার্থত্যাগ ও কষ্টস্বীকার করিতে রাজি হইয়াছিলেন এরূপ অনুমান করা যাইতে পারে না—পশুজীবনের উপর নৈতিকজীবনের এত সহজে প্রতিষ্ঠালাভ সম্ভব হয় নাই। এক্ষেত্রেও জীবন-সংগ্রামে সমর্থকগণের জয়রূপ যে বিবর্ত্তনের মূলতত্ব তাহা পূর্ণশক্তিতে কার্য্য করিয়া স্বার্থপর দেহাত্মবুদ্ধি-সম্পন্না আত্মসুখপরায়ণা জননীর সন্তানদের উচ্ছেদ সাধন করিয়া তাহাদের সঙ্গে সঙ্গে তাহাদের বংশেরও উচ্ছেদ সাধন পূর্ব্বক সমাজকে উন্নতির দিকে উত্তোলন করিয়াছে।

মানবশিশুকে এরূপ অসহায় অবস্থায় দীর্ঘকাল রাখার ভিতর ইহা অপেক্ষাও বৃহত্তর যে আর একটি উদ্দেশ্য রহিয়াছে তাহাও সন্ধান পাওয়া যায়। পরীক্ষা করিলে দেখা যাইবে যে, মস্তিষ্কের রচনা ও তাহার কোটরের সাজসজ্জায় মানবশিশু ও অপর যে কোন প্রাণীশাবকের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ রহিয়াছে—এই প্রভেদ একটা ড্রেড্‌নটের সঙ্গে একটা জেলে ডিঙ্গির প্রভেদ হইতেও বৃহত্তর। একের প্রয়োজনীয়তা জীবনধারাকে পশুজীবননির্ব্বাহোপযোগী করা, অপরকে সুধু গতানুগতিকের স্রোতের মধ্যে জীবন অতিবাহিত না করিয়া অনেক নব নব কার্য্যদ্বারা জগতকে নানা প্রকার উন্নতির পথে পরিচালিত করিতে হইবে এবং তাহার জীবনে সৃষ্টিরূপ লীলার পরিসমাপ্তি ও সার্থকতা হইবে। একটা কলের কার্য্যের ন্যায় কেবল গতানুগতির প্রবাহের ভিতর দিয়া তাহার জীবন চলিতে পারে না, প্রতিপদক্ষেপে তাহার স্বাতন্ত্র্য রক্ষা প্রয়োজন, উহা দ্বারা অনেক নূতন কার্য্য সম্পন্ন হইবে। তাহার চিন্তাপ্রবাহ নূতন পথ খুঁজিয়া বাহির করিবে। তাহার নিকট প্রকৃতির ভাণ্ডার উন্মুক্ত হইবে এবং তাহাকে প্রকৃতির সহযোগীরূপে বিশ্বনিয়ন্তার এই জগৎরূপী বিচিত্র কারখানা-গৃহে তাঁহার সাহচর্য্যায় নিজের জীবনকে বরণ করিতে হইবে। শারীরতত্বের ভিতর দিয়া দেখিলে ইহা যে কতদূর বিস্ময়কর ব্যাপার তাহার উপলব্ধি হইবে। জীবনের সম্মুখে যে অনন্ত কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত রহিয়াছে, মস্তিষ্ককে তাহার উপযোগী করিয়া গঠন করা হইতেছে।

এই মস্তিষ্কের সাহায্যে মানসিক চিন্তারূপ কার্য্য সম্পন্ন হয়। টেলিগ্রাফের তার কিম্বা তদ্রূপ অপর কোন পদার্থকে অবলম্বন করিয়া বিদ্যুৎপ্রবাহ যেমন বার্ত্তা-বহন কার্য্য সম্পন্ন করে, সেইরূপ মস্তিষ্কের সুসজ্জিত কোটরাভ্যন্তর্গত কোষ হইতে অতিসূক্ষ্ম স্নায়ু অবলম্বনে প্রবা-

হিত হইয়া চিন্তাশক্তি তাহার কার্য্য নিষ্পন্ন করে। চিন্তাগুলি যে সকল স্নায়ু অবলম্বনে প্রবাহিত হয়, তাহাদিগের মধ্যে চিহ্ন রাখিয়া যায়; এই চিহ্ন থাকে বলিয়া অতীত ঘটনা আমাদিগের স্মরণ হয়।

মানবের মস্তিষ্ক অপেক্ষাকৃত আয়তনে বড়, সুতরাং সমধিক স্নায়ুসমষ্টিসম্পন্ন; ইহাদের সাজসজ্জা এবং সন্নিবিষ্টতাও অতি বিস্ময়কর। একটি স্নায়ুকোষের ব্যাস এক ইঞ্চির দশ সহস্র ভাগের এক ভাগ মাত্র। যে সকল সূত্র দ্বারা তাহারা পরস্পরে সংযুক্ত রহিয়াছে, তাহার সূক্ষ্মতা আমাদের ধারণার অতীত।

মস্তিষ্ককে যদি একটী সমতল ক্ষেত্ররূপে কল্পনা করা যায়, আর প্রত্যেক স্নায়ুকে যদি এক-একটী চিন্তাপ্রবাহের প্রণালী বা রাজপথরূপে গণ্য করা যায়, এবং মনে রাখা যায় যে কেন্দ্র হইতে কেন্দ্রান্তরে তাড়িতপ্রবাহের ন্যায় কোষ হইতে কোষান্তরে এই চিন্তাপ্রবাহ সরল বা চক্রগতিতে ধাবিত হইতে পারে, তাহা হইলে কতক বুঝা যাইবে কিরূপ কার্য্যসম্পাদনের উদ্দেশ্যে এই মস্তিষ্করূপ যন্ত্রটি নির্ম্মিত হইতেছে। ইহার কলগুলি অতিশয় জটিল, সুতরাং ইহার নির্ম্মাণকার্য্য বিশেষ ধৈর্য্য ও সময়সাপেক্ষ। জেলেডিঙ্গি তৈয়ার করিতে বেশী সময়ের প্রয়োজন হয় না, ড্রেড্‌নট নির্ম্মাণ এত সহজে চলে না, উভয়ের কার্য্যকারিতাতেও তেমনি প্রভেদ। পশুপক্ষী প্রভৃতি ইতর জন্তুর জীবন ও মানুষের জীবনে তদ্রূপ অনন্ত প্রভেদ রহিয়াছে। কোন সুদক্ষ চিত্রকরের পক্ষে তাহার অঙ্কিত ছবিখানাকে জীবন্তভাবে ফুটাইয়া তুলিতে হইলে যেমন দীর্ঘ সময়ের আবশ্যক এবং তাহার গৃহখানা মনবিক্ষিপ্তকর সর্ব্বপ্রকার কোলাহলবিবর্জ্জিত হওয়া প্রয়োজন, তদ্রূপ জগতের বড় চিত্রকরের পক্ষেও তাঁহার অঙ্কিত সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছবিখানাকে অঙ্কন করিবার সময় যথেষ্ট সময়ের প্রয়োজন হইতে পারে এবং ইহাকে সর্ব্বপ্রকার কোলাহলপরিশূন্য শান্তিময় স্থানে সংস্থাপন করা আবশ্যক, তাহা সহজে অনুমেয়। তাই ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর এত দীর্ঘকাল মানবশিশুকে এরূপ অসহায় ও নিশ্চল অবস্থায় যাপন করিতে হয় এবং তাহার অধিকাংশ সময় নিদ্রাবিষ্ট অবস্থায় কাটিতে থাকে। এই সময় একদিকে জন্মদায়িনীর হৃদয়ে স্বার্থত্যাগের অঙ্কুর উন্মেষিত হইয়া নৈতিক জীবনের ভিত্তি সংস্থাপিত হইতে থাকে, আর এক দিকে ভবিষ্যৎ জীবনে যাহাতে নানারূপ মহৎ কার্য্য সম্পন্ন করিতে পারে শিশুর মস্তিষ্করূপ বিস্ময়কর জটিল যন্ত্রটী তদনুরূপভাবে গড়িয়া উঠে।

একটী ক্ষুদ্র অস্থিখণ্ড ও তৎসংলগ্ন মাংসপেশীর সমাবেশ হইতে বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠ গঠনের এই তারতম্য ঘটিয়াছে। প্রথম দৃষ্টিতে ইহা এত সামান্য মনে হয়, যেন ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আসে না; কিন্তু বিশ্বনিয়ন্তার বিচিত্র সৃষ্টিকৌশলে, একটি অঙ্কুরের মধ্যে ভাবী বিশাল বটবৃক্ষের লুক্কায়িত ভাবে অবস্থিতির ন্যায় এই ক্ষুদ্র মাংসপেশী ও অস্থিখণ্ডের সমাবেশ-চাতুর্য্যের মধ্যে মানবজীবনের সর্ব্বপ্রকার ভাবী সামর্থ্য ও সাফল্যের বীজ লুক্কায়িত ভাবে বর্ত্তমান রহিয়াছে। এই তারতম্য নিবন্ধন মানবের বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠটী অপর কোন অঙ্গুলির সম্মুখীন হইতে পারে, এবং তাহা হইতে পারে বলিয়াই হস্ত এত সব কার্য্য সম্পন্ন করিতে সমর্থ হইয়াছে। কি লিখন-কার্য্য, কি কোনরূপ যন্ত্রনির্ম্মাণ, কিম্বা অস্ত্রচালনা—যে কোন কার্য্যই হউক, এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠকে তর্জ্জনী কিম্বা অপর কোন অঙ্গুষ্ঠের সম্মুখীন করা প্রয়োজন। মানবকে প্রাণীজগতে নিজের প্রাধান্য স্থাপন করিবার জন্য এবং উন্নতিপথে অগ্রসর হইবার জন্য যত উপায় অবলম্বিত হইয়াছে, তাহার প্রায় সকলটাতে এই বৃদ্ধাঙ্গুষ্ঠের প্রচুর প্রভাব দৃষ্ট হয়। এই প্রসঙ্গে একলব্যের গুরুদক্ষিণার কথা মনে পড়ে।

কি সকল বিস্ময়কর উপায় অবলম্বনে মানবের শক্তিকে ফুটাইয়া তুলা হইয়াছে, উপরে বর্ণিত ব্যাপার হইতে আমরা কতক পরিমাণে তাহার আভাষ পাইতেছি; কিন্তু এ সকলই বৃথা হইত, মস্তিষ্কের নির্ম্মাণে যে এত নৈপুণ্যপ্রকাশ তাহারও কোন সার্থকতা থাকিত না যদি মানবের কথা বলিবার শক্তি না থাকিত। প্রাণীজগতে একমাত্র মানবের মধ্যেই এই শক্তি প্রকাশ পাইয়াছে। তাহার ওষ্ঠ, মুখগহ্বর ও জিহ্বার রচনাতে এমন বিশেষ কিছু রহিয়াছে যাহা হইতে মানব এই বিশেষ অধিকার লাভ করিয়াছে এবং যাহার অভাবে অপর কোন জীবেতে এই শক্তির স্ফুরণ নাই।

Prof. macalester ইহার কারণ এইরূপ নির্দ্দেশ করিতেছেন :—

"The acquestion of arteculate speech became posseble to man only when the aveolar arch and palatene area became shortened and wedened, and when his toung by accom-modation to the modified month, became shorter and mere horizantally flattend, and the higher refinments of prouenciation depen for their production upon the more Extenseve modeficatons, in the same derection.

অর্থাৎ মানুষের দাঁতের মাড়ি ও মুখগহ্বরের উপরিভাগ অপরাপর জন্তু অপেক্ষা আয়তনে অনেক ছোট। ঐ উপরিভাগের বক্রতাও অনেক কম; সুতরাং মুখগহ্বর

অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্রাবয়ববিশিষ্ট ও প্রশস্ততর; এই হেতু তাহার মধ্যে আকারে অধিকতর প্রশস্ত অথচ পরিমাণে ছোট জিহ্বার সমান্তরাল ভাবে অবস্থিতির স্থান হইয়াছে এবং জিহ্বাকে সমান্তরালভাবে পরিচালনা করিবার শক্তি জন্মিয়াছে। এই সহজভাবে রসনাকে যদৃচ্ছা পরিচালনার শক্তি হইতে বাক্‌শক্তির উদ্ভব হইয়াছে। বাক্‌শক্তি হইতে ভাষার সৃষ্টি হইয়াছে। ভাষা মানবের উন্নতির দিকে অগ্রসর হইবার পথে যে কত বড় সহায়, তাহার উল্লেখই নিষ্প্রয়োজন।

সার্ব্বজনীন সম্মিলন।

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

বিগত ১৬ই ভাদ্র ও তাহার পরদিন সার্ব্বজনীন উৎসবের আয়োজন কলিকাতা এলবার্টহলে হইয়াছিল। ইহার প্রধান উদ্যোগী ডাক্তার শ্রীযুক্ত নবজীবন বন্দ্যোপাধ্যায়। বলা বাহুল্য ইঁহার চেষ্টা সাফল্যমণ্ডিত হইয়াছিল। ১৬ই ভাদ্র শনিবার অপরাহ্নে মুক্তি-ফৌজদলের (Salvation Army) উপাসনা ও সঙ্গীত হয়। তৎপরে হিন্দুস্থানীদিগের রামচন্দ্রাত্মক সঙ্গীত ঢোল ও করতাল সহ গীত হয়। সন্ধ্যা ৭॥০ টার সময় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উদ্বোধন করেন; পরে শ্রীযুক্ত ললিতমোহন দাস উপাসনা ও শ্রীযুক্ত কামাখ্যানাথ বন্দ্যোপাধ্যায় উপদেশ দেন। পরদিন রবিবারের প্রভাত হইতে বিভিন্ন ধর্ম্মাবলম্বীগণের সম্মিলন হয়। সকলে নিজ নিজ ধর্ম্মের সংক্ষেপ পরিচয় দেন। হিন্দু, মুসলমান, থিওজফীষ্ট, খৃষ্টান, পার্শী নানকপন্থী ও আহম্মদীয় ধর্ম্মাবলম্বীগণের পরস্পরের যুগপৎ মিলন এবং পরস্পরকে প্রেমদান আমাদের চক্ষে বেশ লাগিয়াছিল। প্রকৃতপক্ষে, পরস্পরের মধ্যে মতপার্থক্য থাকিলেও মিলনের ভূমিও যে যথেষ্টপরিমাণে বিরাজমান, এইরূপ সরস চিন্তা মানুষের চিত্তকে সত্য সত্যই উদার ও বিরাট করিয়া তোলে। আমরা বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ে বিভক্ত থাকিলেও নানা জাতিতে খণ্ডিত ও বিখণ্ডিত হইলেও এইরূপ পরস্পরের মিলন ও প্রীতিবিনিময়, মতবিভিন্নতাজনিত অসহিষ্ণুতার ভাবকে ক্রমে খর্ব্ব করিয়া আনিবে; কেবল ধর্ম্মক্ষেত্রে বলি কেন, রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও ভবিষ্যতে অশেষ কল্যাণ বিধান করিবে, ইহাই আমাদের ধারণা।

ব্রাহ্মগণ সমগ্র ভারতের জনসংখ্যার তুলনায় মুষ্টিমেয়। কিন্তু স্পষ্ট করিয়া বলিতে গেলে আমরা পরস্পরের মধ্যে মিলনের স্থানের উপর বেশী জোর না দিয়া পার্থক্যকে বড় করিয়া দেখিতে যাই, তাই আমরা ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হইয়া যাইতেছি, তাহার সঙ্গে সঙ্গে ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের পথও দিন দিন অবরুদ্ধ হইয়া যাইতেছে। আমাদের মনে রাখিতে হইবে, সত্য যাহা তাহা স্বীয় মহিমায় অচিরে জয়যুক্ত হইবে। এই জ্ঞানোন্নত যুগে যাহা কিছু মলিন ও নিষ্প্রভ তাহা আপনা হইতেই জ্ঞানের আলোকে ঝরিয়া পড়িবে। তাহার জন্য আমাদিগকে বিশেষভাবে চিন্তিত হইতে হইবে না। পরনিন্দা বা কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন কোন মতবাদের প্রতি আক্রমণ করিতে গেলেই সত্যের পরিবর্ত্তে পার্থক্যই প্রবলমূর্ত্তি ধারণ করিবে এবং বিবাদই চরম হইয়া দাঁড়াইবে; ফলে পরস্পরের মধ্যে অশান্তির সৃষ্টি হইবে।

আমরা বিগত ভাদ্রোৎসব উপলক্ষ্যে রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী আবার নিবিষ্টচিত্তে পড়িতে আরম্ভ করিয়াছি। বলা বাহুল্য, দেশপ্রচলিত প্রতিমাপূজার স্থানে এক নিরাকার নির্ব্বিকার ঈশ্বরের পূজার প্রবর্ত্তনই রাজার একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল। কিন্তু ধীর ও শান্তভাবে শাস্ত্রের উপর দোহাই দিয়া এবং একমাত্র শাস্ত্রের অবলম্বনে বিরুদ্ধ পক্ষকে নিরুত্তর করিয়া এক অপ্রতিম পরমেশ্বরের উপাসনার প্রাধান্য প্রতিপন্ন করাই তাঁহার জীবনের ব্রত ছিল। কোন বিচ্ছিন্ন সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠা করা তাঁহার অভিপ্রেত ছিল না। তাই তিনি প্রতিমাপূজাকে নির্ম্মমভাবে আক্রমণ করেন নাই। তিনি প্রতিমাপূজা সম্বন্ধে যেরূপ সহৃদয়তা দেখাইয়া গিয়াছেন, তাহা আজকালকার দিনে কেমন কেমন বলিয়া মনে হইতে পারে। ১৭৫০।৬ই ভাদ্র তারিখে শ্রদ্ধেয় রামচন্দ্র বিদ্যাবাগীশ যে ব্যাখ্যান দেন, তাহা কাহারও কাহারও মতে রাজা রামমোহনের লিখিত হইলেও উহা রাজার সম্মুখে কমল বসুর বাটীতে পঠিত হয়। উক্ত ব্যাখ্যানের এক স্থানে আছে :—"যে সকল ব্যক্তিরা পাষাণের কিম্বা বৃক্ষের কিম্বা নদীর কিম্বা মূর্ত্তিবিশেষের উপাসনা করিয়া থাকেন, তাঁহারা ঐ পাষাণকে পাষাণবোধে, বৃক্ষকে বৃক্ষবোধে, নদীকে নদীবোধে ও মূর্ত্তিবিশেষকে কেবল মূর্ত্তিবোধে উপাসনা করেন না, কিন্তু পরমেশ্বরবোধে কিম্বা পরমেশ্বরের আবির্ভাব স্থানবোধে উপাসনা করিয়া থাকেন, অতএব তাঁহাদের প্রতি দ্বেষ ও গ্লানি শাস্ত্রতঃ এবং যুক্তিতঃ সর্ব্বথা অমান্য হয়"। * "তথাচ সাক্ষাৎ পরমেশ্বরের উপাসনা সর্ব্বথা শ্রেষ্ঠ হয়, ইহা বেদে ও মনুসংহিতাতে পুনঃ পুনঃ প্রাপ্ত হইতেছি। আত্মানমেবোপাসীত (শ্রুতি) পরমাত্মারই কেবল উপাসনা করিবে * * সকল ধর্ম্মের মধ্যে পরমাত্মার জ্ঞান শ্রেষ্ঠ হইতেছে। যেহেতু সকল বিদ্যার প্রধান আত্মবিদ্যা, তাহা হইতেই মোক্ষপ্রাপ্তি হয়।" * * "যিনি স্ত্রীরূপবিশিষ্টকে (দেবতাকে) জগতের কারণ ও সর্ব্বপ্রধান বলেন, তাঁহার সহিত যিনি পুরুষাকৃতিবিশিষ্টকে (দেবতাকে) সর্ব্বকারণ

ও সর্ব্বপ্রধান বলিয়া উপাসনা করেন, তাঁহার বিরোধ ও বিবাদ হইতেছে ; * * কিন্তু আত্মোপাসনার কোন নাম-রূপের নির্দ্দেশ নাই, কেবল তটস্থ লক্ষণে অর্থাৎ জগতের যিনি কারণ তাঁহারই এ ধর্ম্মে উপাসনা হইতেছে ; অতএব ইহাদের সহিত অন্য কোন উপাসকের বিরোধের সম্ভাবনা রহিল না। * * অতএব প্রত্যক্ষ সিদ্ধ হইল যে দ্বেষ ও বিরোধ, যাহা ধর্ম্মানুষ্ঠানে অত্যন্ত দূষণীয় হয়, তাহা অন্যের প্রতি আত্মোপাসকের হয় না"। বিদ্যাবাগীশ তাঁহার অন্যান্য ব্যাখ্যানেও অশরীরী পরমেশ্বরের উপাসনারই প্রাধান্য প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন।

রাজা তাঁহার নিজের জীবনীর যে সংক্ষিপ্ত পরিচয় দেন এবং পরে তাঁহার ইংরাজী গ্রন্থাবলীর প্রথম খণ্ডের ৪৭৯ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য (ঈশান বসুর সম্পাদিত) তাহাতে দেখা যায় যে তিনি বলিতেছেন যে পূর্ব্বপুরুষদিগের আচরিত এবং অদ্যাপি সম্মানিত প্রাচীন ধর্ম্মের স্থানে প্রতিমাপূজাত্মক যে বিসদৃশ পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, তাহা তাঁহার তর্কের ও আলোচনার বিষয়ীভূত।

সে যাহা হউক, আদিব্রাহ্মসমাজের ট্রষ্টডীডে তিনি তাঁহার মতামত সংক্ষিপ্ত ভাষায় ও সুনিপুণভাবে যাহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন, তাহাতে তাঁহার উদার হৃদয়ের ও মতামতের সুস্পষ্ট পরিচয় মিলে। আদিব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের পূর্ব্বে অন্য কোথাও তিনি এমন সুনির্দ্দিষ্ট ভাবে ব্রাহ্মসমাজের ভাবী পরিচালন সম্বন্ধে তাঁহার মতামত ব্যক্ত করেন নাই। তিনি বলিতেছেন :—(১) জাতি ও সম্প্রদায়নির্ব্বিশেষে সকল লোক মিলিত হইতে পারিবেন, তাহারা শান্ত ও ধীরভাবে ধর্ম্মভাবে ও শ্রদ্ধার সহিত জগতের স্রষ্টা পাতা সেই সনাতন অপরিবর্ত্তনীয় পুরুষের পূজা ও তাঁহার মহিমা কীর্ত্তন করিতে পারিবেন—কিন্তু কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের দেবতার নামের অবলম্বনে নহে। (২) কোন হস্তরচিত দেবমূর্ত্তি বা প্রস্তর-মূর্ত্তি চিত্র বা ছবি বা কোন দ্রব্যের সাদৃশ্য এই গৃহে বা জমিতে স্থান পাইবে না। কোন নৈবেদ্য বা পূজার উপকরণ বা সামগ্রী এখানে আনীত হইতে পারিবে না। (৩) ধর্ম্মের জন্য কোন পশুবধ এখানে হইতে পারিবে না। এখানে মাংস মদ্য আহার-পান চলিবে না, (অকস্মাৎ বিপদ পাত ব্যতীত)। কোন সাধারণকে আমন্ত্রণ করিয়া তাহাদের পান-ভোজন চলিবে না ; বা কেহ এখানে আসিয়া (rioting) কোলাহলের সৃষ্টি করিতে পারিবে না। (৪) কোন সচেতন বা অচেতন বস্তু যাহার অবলম্বনে বর্ত্তমানে পূজা হইয়া থাকে বা ভবিষ্যতে পূজা হইবার সম্ভাবনা, তাহার নিন্দাবাদ, গ্লানি, উপাসনায় ব্যাখ্যানে বা সঙ্গীতে হইতে পারিবে না বা এই গৃহের কোনও স্থানে হইতে পারিবে না। (৫) এই ভাবে উপাসনা বা সঙ্গীত হইবে যাহাতে জগতের স্রষ্টা ও পাতার প্রতি আমাদের চিন্তার ভাব জাগিয়া উঠে এবং সকল প্রকার ধর্ম্মাবলম্বী ও জাতির ভিতরে বন্ধন ও যোগের ভাব সুদৃঢ় হইয়া আসিতে পারে। (৬) ঈশ্বরের পূজা প্রতিদিন অন্তত সপ্তাহের মধ্যে একদিন চলিবে।

উপরে যাহা লিপিবদ্ধ হইল তাহাতে সুস্পষ্ট প্রতিভাত হয় যে, রাজা অমূর্ত্তের পূজা প্রতিষ্ঠিত করিবার জন্য তাঁহার দেহের ও মনের সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিয়াছিলেন ; এবং তাহার জন্য শাস্ত্রীয় প্রমাণ ও যুক্তির আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিলেন। সকল ধর্ম্মাবলম্বীদিগের মধ্যে যাহাতে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হয় সে দিকেও তাঁহার বিশেষ লক্ষ্য ছিল এবং একেশ্বরবাদ ও অমূর্ত্তের পূজাই যে সকল সম্প্রদায়ের মিলন ভূমি এবং আত্মোপাসনাই যে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ইহাই তিনি প্রতিপন্ন করিয়া গিয়াছেন। অপর অপর ধর্ম্মসম্প্রদায়ের ও রীতির যাহাতে নিন্দাবাদ না হয়, বক্তৃতায় বা সঙ্গীতে অপর ধর্ম্মের গ্লানিকর কোন উক্তি না থাকে, তাহার জন্য যথেষ্ট নিষেধ-বাক্য তাঁহার রচিত ট্রষ্টডিডে দেখিতে পাই। তিনি যে কেবল মাত্র নিষেধবাক্য লিখিয়া গিয়াছেন তাহা নহে, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরে যাহাতে মিলনের ও সদ্ভাবের ভাব জাগিয়া উঠে ও সুদৃঢ় হয় তাহার বিধানও রাখিয়া গিয়াছেন। তিনি চাহিয়াছিলেন সকল ধর্ম্মাবলম্বীর ভিতরে বিদ্বেষের পরিবর্ত্তে শান্তিস্থাপন, প্রকৃত সত্যের ভাবমূর্ত্তি দেখাইয়া। তাঁহার হৃদয়ের এ উদার ভাব ছিল বলিয়া তিনি বাইবেল সঙ্কলন করিয়া "Precepts of Jesus" এবং মুসলমান ধর্ম্ম পাঠ করিয়া "তফতুল মোয়াদিন" গ্রন্থ রচনা করিতে দেখিয়াছেন। একশত বৎসরের পূর্ব্বে রাজার হৃদয়ের বিরাটভাব দেখিয়া আমরা সত্য সত্যই স্তম্ভিত হইয়া যাই।

তাই বিগত ১৭ই ভাদ্র তারিখের সম্মেলন আমাদের অন্তরকে স্পর্শ করিয়াছিল। এক এক ধর্ম্মের বক্তা বক্তৃতার জন্য উঠিতেছেন, আর তিনি অন্য অন্য ধর্ম্মের বক্তার গলে প্রেমভরে মাল্য দান করিতেছেন, দৃশ্য বড়ই মর্ম্মস্পর্শী হইয়াছিল। লোক-সমাগম যথেষ্ট হইয়াছিল, কিন্তু আমরা নিকটে থাকিয়াও সকল বক্তার সব কথা শুনিতে পাই নাই। যাঁহারা দূরে বসিয়াছিলেন, তাঁহারা যে বিশেষ কিছু শুনিতে পাইয়াছিলেন, তাহা মনে হয় না।

আমরা ব্রাহ্মসমাজের লোক। তাহা হইলেও আমাদের পরস্পরের মধ্যে সামান্যই বা অধিক যে মতভেদ রহিয়াছে, তাহা সহ্য করিবার আমাদের সহিষ্ণুতা বড় কম। এক ব্রাহ্মসমাজের লোক অপর ব্রাহ্মসমাজে গিয়া উপাসনাদি শ্রবণ করিতে আমরা কতকটা বিমুখ।

আমরা অপর ধর্ম্মাবলম্বীদিগের সহিত ঈদৃশ অনুষ্ঠানে যখন মিলিত হইতে যাইতেছি তখন আমাদের নিজেরও হৃদয়ের বিশালতা চাই, সহিষ্ণুতা চাই, তাহা না হইলে আমাদের সার্থকতা লাভের আশা নিতান্তই বিরল। রাজা রামমোহন রায়ের ট্রষ্টডিডের নির্দ্দেশ আমাদিগকে বিশেষ ভাবে স্মরণ রাখিতে হইবে। তাঁহার কথা এই যে, সকল ধর্ম্মাবলম্বীর সহিত সদ্ভাব ও বন্ধুত্বের ভাব জাগাইয়া তুলিবে এবং বিদ্বেষের ভাব ও নিন্দাবাদের ভাব পরিহার করিবে। সত্যধর্ম্মের জলন্তমূর্ত্তি আত্মোপাসনার ভাব সকলের সম্মুখে তুলিয়া ধরিতে হইবে।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

ভিক্ষা।

পূরবী—আড়াঠেকা।

হে প্রভু প্রাণে চরণপরশ দাও।
কি আনন্দ চিতে জাগে ভরি' দেহ মন—
চরণপরশ দাও হে।
শোক ম্লান জরা করি' দূর
হরষিত কর মোর হিয়া
হে প্রভু প্রাণে চরণপরশ দাও।

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর

স্বরলিপি—সঙ্গীতাচার্য্য শ্রীসুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়।

১ ২´ ৩ ০
গা II ঋা পা পা -া I ধা -ঋা -পঋা -পঋা। -গমা গা -া -া। -া -া -া মা।
হে • প্র ভু • প্রা • • • • • • গে • • • • • চ

১ ২´ ৩ ০
। গা ঋসা -সা -ন্া I সা ঋা গা -া। -মা গা -া -ঋা। -সা -া -া গা।
র ণ • • • প র শ • • দা • • • • ও কি

১ ২´ ৩ ০
। -ঋা পা -া -া I ধা -ঋা -পঋা -পঋা। -গমা গা -া -া। -া ঋা -া গঋা।
• আ • • ন • • • • • • ন্দ • • • • • চি •

১ ২´ ৩ ০
। পা গা -া ঋা I গা -া -া ঋা। -া -া সা -া। -া -া -া সা।
• তে • • জা • • • • • গে • • • • ভ

১ ২´ ৩ ০
। ন্া -ঋা গা -ঋা I পা -া ধঋা -া। -পঋা -পঋা গমা -গা। -া -া -া মা।
রি • দে হ ম • ন • • • • • • • • • • চ

১ ২´ ৩ ০
। গা ঋসা -া -ন্া I সা ঋা গা -া। মা গা -া -ঋা। -সা -া -া গা II
র ণ • • প র শ • • দা • • • • ও "হে"

১ ২´ ৩ ০
{গা IIগা গম্মা -ধা না I র্সা র্সা -া র্সা। র্সা -না র্ঋা র্ঋা। -া -র্সনা -া} র্সা।
শো ক ম্লা ০ ন জ রা ০ ক রি ০ ০ দূ ০ ০০ র্ হ

১ ২´ ৩ ০
। র্সা র্সনা -র্ঋা র্গা। র্ঋা র্সর্সা -া নর্ঋা। -র্সর্সা ননা -র্ঋা না। ধম্মা -গম্মা -গা ম্মা।
র যি০ ০ ত ক র০ ০মো০ ০০ র০ ০ হি বা ০০ ০ হে

১ ২´ ৩ ০
। -া ধা সা না। ধম্মা -া -পম্মা -পম্মা। গম্মা গা -া -া। -া -া -া ম্মা।
০ ০ প্র ভু প্রা ০ ০০ ০০ ০ গে ০ ০ ০ ০ ০ চ

১ ২´ ৩ ০
। গা ঋসা -সা -ন্। I সা ঋা গা -া। -ম্মা -গা -া ঋা। সা -া -া গা IIII
র ণ ০ ০ ০ প র শ ০ ০ দা ০ ০ ০ ০ ও "হে"

গ্রন্থ পরিচয়।

PROVATI—by Sj. Nolini Mohan Chatterji & published 1/A Haro Kumar Tagore Square.

গ্রন্থখানি ইংরাজীতে লিখিত—ভাবোচ্ছ্বাসের মধুধারা বর্ষণ করিতেছে। ইহা বাংলায় লিখিত হইলে আরও কত যে সুখী হইতাম তাহা বলিতে পারি না।

নারদীয় ভক্তিসূত্র।—শ্রীগৌরীনাথ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক অনূদিত ও ব্যাখ্যাত। ডবল ক্রাউন আকারে—।৵০ (=৭)+৬৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ছাপা ও কাগজ ভাল। মূল্য ॥০ আনা মাত্র।

এই "ভক্তিসূত্র"টী ইহার সর্ব্বশেষ সূত্রে "নারদপ্রোক্তং শিবানুসাসনম্" 'নারদকথিত মহাদেবের উপদেশ' বলিয়া আত্মপরিচয় প্রদান করিয়াছে। ভক্তি সম্বন্ধে যতগুলি প্রাচীন সূত্রগ্রন্থ দেখা যায়, তাহাদের মধ্যে এই ''নারদীয়" অর্থাৎ নারদপ্রোক্ত "ভক্তিসূত্র''খানি ভাল বলিয়া মনে হয়। শাণ্ডিল্য প্রভৃতি অপর ভক্তিসূত্রকারগণ ভক্তির দার্শনিকতা সম্বন্ধে অধিক আলোচনা করিয়াছেন। ভক্তিসাধনা কিরূপে করিতে হয়, সে সম্বন্ধে 'নারদীয় ভক্তিসূত্রে' যেমন আছে, সেগুলিতে তেমন নাই। সুতরাং এই খানির বাঙ্গলা ভাষায় অনুবাদ ও ব্যাখ্যা প্রচার দ্বারা শাস্ত্রী মহাশয় বঙ্গীয় পাঠকসাধারণের ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। গ্রন্থখানি নাতিদীর্ঘ; দশটী অনুবাকে সর্ব্বশুদ্ধ ৮৪টী সূত্র লইয়া ইহা গ্রথিত হইয়াছে। প্রথমতঃ বড় অক্ষরে সংস্কৃত মূল অর্থাৎ সূত্র; অতঃপর অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র অক্ষরে তাহার যথাযথ বাঙ্গানুবাদ; এবং সর্ব্বশেষে উহার সুবিস্তৃত ব্যাখ্যা। এই ব্যাখ্যাটীর জন্য সকলেই ব্যাখ্যাকর্ত্তাকে অন্তরের সহিত ধন্যবাদ না দিয়া থাকিতে পারিবেন না। 'ব্যাখ্যা' বলিতে আমরা সাধারণতঃ যে কতকগুলি অবুদ্ধ বা অর্দ্ধবুদ্ধ শব্দ লইয়া পাণ্ডিত্যের উদ্ধত প্রচার বুঝি, ইহা তাহা নহে; প্রত্যাহিক জীবনে যে সব সত্যের সহিত আমাদের নিত্য সাক্ষাৎকার ঘটে, অথচ যাহাদের সমগ্র পরিচয় আমরা পাই না, লেখক সেই সব সত্যকে আপন অনুভূতির সহজ আলোকে উদ্ভাসিত করিয়া তাহাদেরই সাহায্যে শ্রীসম্পন্ন সংযত ভাষায় "বজ্রাদপি কঠোরাণি কোমলং কুসুমাদপি" ভক্তির এই অপূর্ব্ব স্বরূপের ব্যাখ্যা করিয়াছেন। আমাদের ধারণা এই ব্যাখ্যাটী বাঙ্গলার সৎসাহিত্যে স্থায়ী আসন লাভ করিবে।

শ্রীসু. চ. সা০।

দাসের তীর্থপথের প্রসঙ্গ—"দাস" শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু লিখিত। প্রকাশক শ্রীবিজয়কৃষ্ণ কুণ্ডু ৬।১ এ কানাই মুখার্জ্জি লেন, হরিতকী বাগান কার্ত্তিক প্রেস—২২ নং সুকিয়া ষ্ট্রীট মূল্য ।০।

তীর্থভ্রমণের বৃত্তান্ত মাত্রই আমাদের মনোজ্ঞ হয়। আলোচ্য পুস্তিকাও বেশ সরল ভাষায় লিখিত হইয়াছে। ইহাতে অনেক তীর্থস্থানে কিরূপে যাইতে হয় তাহার ইঙ্গিত পাওয়া যায়।

নবযুগধর্ম্মে দাসের বিশ্বাসধারা—প্রকাশক শ্রীবিপিনবিহারী চক্রবর্ত্তী, ৬নং কালুঘোষের লেন।

গ্রন্থখানিতে দাস শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু ধর্ম্মবিশ্বাসের ধারায় অভিব্যক্তি লিখিত হইয়াছে।

দাসের সাধনসিদ্ধি—দাস শ্রীযোগীন্দ্রনাথ কুণ্ডু লিখিত। প্রকাশক শ্রীনীলাচল মুখোপাধ্যায়, ৩৭নং দুর্গাচরণ মিত্রের ষ্ট্রীট।

ইহাতে ধর্ম্ম ও সমাজ প্রভৃতি সম্বন্ধে লেখকের মতামত লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য—সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু। ৯১৩ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। সডাক বার্ষিক মূল্য ৫৶৹

আমরা এই মাসিকপত্রটির কয়েক সংখ্যা পাঠ করিয়া বিশেষ আনন্দ লাভ করিয়াছি। বর্ত্তমানে বাঙ্গলা মাসিকে মামুলী গল্প ও উপন্যাসের বন্যা প্রবাহিত হইয়া চলিয়াছে। কিন্তু "ব্যবসা ও বাণিজ্যে" একটীও বাজে গল্প না থাকা সত্বেও যে আট বৎসর জীবিত থাকিয়া ইহা বাঙ্গলার সেবা করিতেছে, ইহাতেই এই মাসিকটির প্রয়োজন পরিস্ফুট হইতেছে। ইহার প্রতি পৃষ্ঠাই শিক্ষণীয় বিষয়ে পরিপূর্ণ। আমরা সকলকেই ইহার গ্রাহক হইতে অনুরোধ করি এবং সাহসের সহিত বলিতে পারি যে, ইহাতে এত অর্থনৈতিক ইঙ্গিত আছে যে কাহাকেও কখনই ইহার গ্রাহকশ্রেণীভুক্ত হওয়ার ফলে পশ্চাত্তাপ করিতে হইবে না। আমরা আশা করি ইহা উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধিলাভ পূর্ব্বক বঙ্গভাষার এবং বাঙ্গালীর একটি বিশেষ অভাব মোচন করিবে।

কাজের কথা—সম্পাদক শ্রীপান্নালাল দে। বার্ষিক মূল্য ১॥৹

যে সকল মাসিক বাঙ্গালীকে কর্ম্মপ্রবণ করিবার আপ্রাণ চেষ্টা করিতেছে "কাজের কথা" তাহাদের অন্যতম। এই মাসিকটির ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা (শ্রাবণ ১৩৩৫) সম্প্রতি আমাদের হস্তগত হইয়াছে। এই সংখ্যাতে বাঙ্গালীর অন্নসমস্যার সমাধানের সহায়ক কতকগুলি সারগর্ভ প্রবন্ধ আছে। "কর্ম্মপালি" প্রবন্ধটি আমাদের বিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছে। আমরা "কাজের কথা"র পরবর্ত্তী সংখ্যাগুলিতে আরও অধিক পরিমাণে কাজের কথার সমাবেশ দেখিতে ইচ্ছা করি।

গৃহস্থমঙ্গল—সম্পাদক শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়; ৬৯নং মীর্জাপুরষ্ট্রীট। বার্ষিক মূল্য সডাক ৩॥৹

আজ আমরা পাঠকগণের সম্মুখে যে মাসিকটির পরিচয় লইয়া উপস্থিত, তাহার বিশেষত্বটি উহার নামেতেই সুস্পষ্টরূপে প্রকাশিত হইতেছে। প্রকৃতই প্রতি সংখ্যাতে গৃহস্থের প্রয়োজনীয় এতগুলি কাজের কথার একত্র সমাবেশ আমরা আর কোনও মাসিকে দেখি নাই বলিলেই হয়। প্রকৃত কাজের লোক হইতে গেলে যে সমস্ত বিষয়ে জ্ঞান থাকা দরকার, সেই সকল বিষয়ই ইহাতে আলোচিত হয়। ইহাতে গুরুগম্ভীর দার্শনিক প্রবন্ধ বা অতি আধুনিক গল্প উপন্যাসাদি নাই, কিন্তু আছে নিত্যপ্রয়োজনীয় নিতান্তই ঘরের কথা—সে সকল কথা জানিলে গৃহস্থের অর্থের বৃথা অপব্যয় হয় না অথচ যে সকল কথা আজকালকার দিনে অনেকেই জানেন না। এই সকল কাজের কথার তুলনায় ইহার মূল্য অতীব সুলভ হইয়াছে সন্দেহ নাই। আমরা আশা করি, বাংলার প্রতি ঘরে ইহার প্রচার দেখিব।

শ্রীক্ষে না. ঠা,

নানা কথা।

ইতিহাসে আবিলতা—ইদানীং যে যুগ চলিতেছে, বিশেষতঃ এদেশে, ইহাকে মিশ্রণ যুগ আখ্যা দিলে কোথাও কিছুমাত্র অসঙ্গতি ঘটে বলিয়া মনে হয় না। এদেশে বর্ত্তমানে খাদ্য বস্তু হইতে আরম্ভ করিয়া জীবনের সকল বিভাগে, এমন কি আধ্যাত্মিকতার ক্ষেত্রে পর্য্যন্ত মিশ্রণ বা 'ভেজালের' আধিপত্য সুপরিস্ফুট। ইতিহাস এতদিন এই মিশ্রণের হাত হইতে নিষ্কৃতি পাইয়াছিল। সম্প্রতি একটী মিথ্যা ঘটনাকে ঐতিহাসিক সত্যরূপে প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টায় ইতিহাসক্ষেত্রেও এইরূপ মিশ্রণের সম্ভবপরতা প্রকট হইয়াছে। গত ১৯১৬ খৃষ্টাব্দে 'বিহার উড়িষ্যা রিসার্চ্চ সোসাইটী'র পত্রিকায় শ্রীযুক্ত বিজয়চন্দ্র মজুমদার মহাশয় লিখিত "বোদরাজ কনকভঞ্জের তাম্রফলক" শীর্ষক একটী ঐতিহাসিক প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। উহাতে বোদরাজ কনকভঞ্জের নবাবিষ্কৃত তাম্রলিপি সম্বন্ধে তাঁহার ঐতিহাসিক গবেষণা স্থান পাইয়াছিল। এই ঘটনার সুদীর্ঘ দ্বাদশ বৎসর পরে সম্প্রতি ১৯২৮এ উক্ত পত্রিকায় গত মার্চ্চ সংখ্যায় সুপ্রসিদ্ধ প্রত্নতাত্ত্বিক শ্রীযুক্ত রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় বোদরাজ কনকভঞ্জের 'তাম্রলিপির' খোদিত বিষয়ের সূক্ষ্মানুসন্ধান পূর্ব্বক একটী প্রবন্ধে সপ্রমাণ করিয়াছেন। উহাতে তিনি প্রগাঢ় গবেষণা সহকারে ভঞ্জরাজগণের অনেকগুলি তাম্রলিপির সঙ্গে তুলনা-মূলক সমালোচনায় এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন যে, কাহারও কোন বিশেষ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য সুচতুর লোক দ্বারা বর্ত্তমান সময়ে এই তাম্রলিপি খানি খোদিত হইয়াছে; ইহার সহিত প্রকৃত ইতিহাসের কোনও যোগ নাই। উড়িষ্যা অঞ্চলের ইতিহাসের প্রকৃত মর্ম্মে অজ্ঞ পণ্ডিতদিগের দ্বারা ঐতিহাসিক সত্যের সহিত মিথ্যা চালাইবার চেষ্টার দুই একটা দৃষ্টান্ত আমাদের প্রত্যক্ষ হইয়াছে। দ্বাদশ বৎসর পূর্ব্বে এবিষয়ে বিরুদ্ধ প্রমাণের অভাবে বিজয়বাবু স্বভাবতই ভ্রমে পড়িয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়।

হিতৈষণাগ্রন্থাবলী সম্বন্ধে অভিমত।

আর্ট ও সাহিত্য।—"তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার" সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি এ কর্তৃক বিরচিত। এখানি গ্রন্থকারের বিরচিত হিতৈষণা গ্রন্থাবলীর ২২ সংখ্যক পুস্তক। ১৮২ পৃষ্ঠায় উৎকৃষ্ট কাগজে মুদ্রিত, কাপড়ে বাঁধান মূল্য ১৲ মাত্র।

সাহিত্যে আর্টের অছিলাতে বাঙ্গালার সাহিত্যক্ষেত্রে অতি কুৎসিৎ ভাব ও চিত্র সমন্বিত উপন্যাস ও গল্পের ছড়াছড়ি হইয়াছে; এবং বাঙ্গালার নরনারী সেই সকল কুরুচিপূর্ণ উপন্যাস পাঠ করিয়া যেরূপ স্বভাব ও আচার-ব্যবহার কলুষিত করিতেছেন, তাহাতে জাতীয় অবনতির সূচনা হইতেছে। গ্রন্থকার এই গ্রন্থের মধ্যে একস্থানে দেখাইয়াছেন—"কামপ্রবৃত্তিকে কখনও বড় করিয়া তুলিয়া ধরিতে নাই। যে সকল ভাবকে এই সকল ঔপন্যাসিকেরা তাঁহাদের চিত্রের ভিত্তি করেন, ভগবদ্ বিধানে তো তাহা মনুষ্যের মধ্যে নিম্নস্তরের জীব-জন্তুদের মতই প্রবলভাবে জাগ্রত আছে। সেই কামভাবকে যে-কোন উপায়ে বড় করিয়া ধরিলেই—তাহার সেই মনুষ্যত্বধ্বংসকারী আকারকে সুন্দর মনোমুগ্ধকর মূর্ত্তিতে দাঁড় করাইলেই অবোধ পাঠক-পাঠিকাগণ নিজেদের জীবনে তাহার অভিনয় করিতে গিয়া আপনাদিগকে যে পশুদের সঙ্গে সমস্তরে নামাইয়া ফেলিবার ব্যবস্থা করিবে, তাহা কিছুই আশ্চর্য্য নহে।" কথাটা যে কতদূর সত্য তাহা এখনকার সামাজিক লক্ষণাবলী দেখিলেই বুঝিতে কাহারও বিলম্ব হইবে না যে, এই সকল কুৎসিৎ সাহিত্য পাঠজনিত বিষ সমাজের অস্থিমজ্জায় কিরূপ বিষক্রিয়া আরম্ভ করিয়াছে। সেইজন্য গ্রন্থকার বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যসম্রাট্ রবীন্দ্রনাথ ও বঙ্কিমচন্দ্রের উৎকৃষ্ট উপন্যাস হইতে দেখাইয়াছেন যে, সাহিত্যের কোন্ স্থলে আর্ট আর কোন্ স্থলে আর্টের অভাব। আমাদের এই ক্ষুদ্র "কাজের লোকে" তাঁহার "আর্ট ও সাহিত্য" গ্রন্থের সমালোচনার যোগ্য স্থান নাই, কিন্তু "আর্ট ও সাহিত্যে" তাঁহার নির্ভীক সমালোচনা ও গবেষণা যে প্রকৃত সাহিত্যিক এবং পাঠকগণের তৃপ্তিসাধনে সম্পূর্ণ সক্ষম হইবে, তাহা মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করা যায়। ক্ষিতীন্দ্র বাবু সুপণ্ডিত, তাঁহার ভাষার লালিত্যে ও যুক্তির অবতারণায় আমরা বাস্তবিক একটা পবিত্র আনন্দ উপভোগ করিবার অবসর পাইয়া ধন্য হইয়াছি। এমন পুস্তকের শিক্ষিত সমাজে আদর হইতে দেখিলে আমরা সুখী হইব।—কাজের লোক।

শান্তি—আদিব্রাহ্মসমাজ এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সুযোগ্য সম্পাদক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি বি-এ বিরচিত। মূল্য ।৹ মাত্র। উত্তম ছাপা, উত্তম কাগড়ে বাঁধাই, উত্তম কাগজ। আলোচ্য পুস্তিকাখানি পরমার্থ-বিষয়ক সঙ্গীত-গ্রন্থ। সঙ্গীতগুলি ভাবময়—যাঁহারা পরমার্থের পথে শান্তির প্রয়াসী, এই শান্তির সঙ্গীত তাঁহাদের হৃদয়ে শান্তি দিতে পারিবে সুনিশ্চিত। ৫।১ বি বারাণসী ঘোষের সেকেণ্ড লেন, জোড়াসাঁকো,—এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য।—কাজের লোক।

নূতন পুস্তক! নূতন পুস্তক!

উড়িষ্যার কথা

রায় মহাশয় শ্রীযুক্ত সতীন্দ্রনারায়ণ রায় এম-এ, বি-এল প্রণীত।

গল্পের মত মনোমুগ্ধ ভাষায় উড়িষ্যার সংক্ষিপ্ত ইতিহাস।

উড়িষ্যার সহিত বাঙ্গলার বহুদিনের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক; অথচ এ পর্য্যন্ত বাঙ্গলা ভাষায় উড়িষ্যার একখানিও প্রামাণিক ইতিহাস মুদ্রিত হয় নাই। আনন্দের সংবাদ এতদিনে বাঙ্গলা সাহিত্যের সেই বিশেষ অভাব বিমোচিত হইল।

গ্রন্থকার বহু পুরুষাবধি বালেশ্বরের অধিবাসী এবং কটকের অন্যতর বিশিষ্ট উকিল। তাই ইনি কেবল প্রয়োজনে নহে—আপন প্রীতির প্রেরণায় এই গ্রন্থখানি রচনা করিয়াছেন। দশটী পরিচ্ছেদে উড়িষ্যার প্রাকৃতিক দৃশ্য হইতে আরম্ভ করিয়া বৌদ্ধ প্রভাবের পূর্ব্ব ও পরের ইতিবৃত্ত, ইতিহাসের কুজ্ঝটিকা, কেশরীবংশ, গঙ্গাবংশ, পাঠান ও মোগল-শাসন, মারহাট্টা-শাসন, ইংরাজ-শাসন এবং উড়িষ্যায় বাঙ্গালীর উপনিবেশ প্রভৃতি বিষয়গুলি ঐতিহাসিক বিচক্ষণতার সহিত লিপিবদ্ধ হইয়াছে। দশখানি হাফটোন চিত্র সহ ১৬ পেজী ডবল ক্রাউন আকারে ১৮৭ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ; সুশোভন 'অ্যাণ্টিক' কাগজে মুদ্রিত। মূল্য মাত্র ১৲ টাকা।

"গ্রন্থকার বালেশ্বরের একজন বিশিষ্ট জমিদার। আলস্যে ও বিলাসে জীবন না কাটাইয়া তিনি যে ইতিহাসচর্চ্চার মত উচ্চ সাহিত্যে ব্রতী হইয়াছেন, তাহা প্রশংসার কথা সন্দেহ নাই। তিনি সংক্ষেপে ও সহজ ভাষায় উড়িষ্যার যে ঐতিহাসিক চিত্র কথার আকারে বর্ণনা করিয়াছেন, তাহা গ্রন্থকারের বিশেষ কৃতিত্বের পরিচয়। পুরুষানুক্রমে উড়িষ্যাবাসী হইলেও লেখকের হাতে বাঙ্গলা ভাষার অমর্য্যাদা হয় নাই—ইহাও আনন্দের কথা।"

আনন্দবাজার—২৫শে শ্রাবণ, ১৩৩৫।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 432

সংখ্যা ১০২৩ কার্ত্তিক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৫। শক ১৮৫০। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯। কার্ত্তিক।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ টাকা ডাকমাশুল ।০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

সংখ্যা ১০২৩ কার্ত্তিক

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫। ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০২ অঞ্জলি—বন্ধু দেবতা।

১। হে ভগবান! তোমার শাসনে অধর্ম্ম পরাভূত হইয়াছে এবং ধর্ম্ম বিজয়লাভ করিয়া সংসারে সুপ্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। নরনারী সকলে একস্বরে ধর্ম্মের এবং ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক তোমার জয়গান করিতেছে। আমরাও তোমার আদেশে শতবিধ সংগ্রামে অবতীর্ণ হইয়াছি। তুমি আমাদের সহায় হও।

২। হে মহাশক্তি! তুমি একমাত্র, কিন্তু তুমি সকল অপেক্ষা বলে বীর্য্যে ও শক্তিতে অধিক। সমস্ত ব্রহ্মচক্র তোমার বল ও শক্তি অতিক্রম করিতে পারে না। আমরা এক একটী ক্ষুদ্র কীট; তুমি চিরপুরাতন, সকলের আদি ও অনাদি পুরুষ। তোমার অক্ষয় ধনভাণ্ডার হইতে আমাদিগকে ধনরত্ন প্রদান করিয়া, হে সকল ঐশ্বর্য্যের আকর! তোমার সন্তানের উপযুক্তরূপে সংসারে বিচরণ করিতে দাও।

৩। সংসারসংগ্রামে যখন মানুষ অবতীর্ণ হয়, তখন যে পক্ষে ধর্ম্ম, সেই পক্ষে তুমি থাক এবং সেই পক্ষই জয়লাভ করে। যে তোমার সহায়তা লাভ করে, সেই পক্ষই অনায়াসে শত্রুগণের গর্ব্ব দর্প বিচূর্ণ করিয়া দেয়। এই প্রকারে উত্থান ও পতনের ভিতর দিয়া, জীবন ও মরণের ভিতর দিয়া সমগ্র সংসারই তোমার অভিমুখে অগ্রসর হইতেছে।

৪। কর্ম্মপ্রবর্ত্তনের কারণে তুমি আমাদের নিকট তোমার সুমঙ্গল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছ। অলস, কর্ম্মহীন ও পাপাত্মাদিগের নিকটে তুমি তোমার রুদ্রমূর্ত্তি প্রকাশ কর। তোমার স্নেহ প্রেম পান করাইয়া তুমি নিয়তই আমাদের বলবীর্য্য বৃদ্ধি করিতেছ। তুমি সুন্দর। চন্দ্রসূর্য্যগ্রহতারকা প্রভৃতি অসংখ্য বেগবান অশ্ববাহিত রথে আরোহণ করিয়া তুমি তোমার এই সুমহান ব্রহ্মচক্র নিয়তই পর্য্যবেক্ষণ করিতেছ। তুমি আমাদের পাপাত্মা শত্রুগণের পরাজয় সাধন করিয়া বজ্রদণ্ডে তাহাদের গর্ব্ব বিচূর্ণ করিয়া আমাদিগকে ধনসম্পদে পরিপূর্ণ কর।

৫। তোমার তেজে দ্যুলোক ও ভূলোক পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে। তোমারই জ্যোতির কণামাত্র লইয়া এই অগণিত গ্রহনক্ষত্র উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। হে বন্ধু! তোমা অপেক্ষা মহত্তর কেহ নাই। তুমিই একমাত্র অক্ষয়

সেতুস্বরূপ হইয়া সমগ্র জগৎ ধারণ করিয়া আছ।

৬। হে ভগবান্! তুমি তোমার স্বাভাবিক পালনীশক্তিবলে আমাদিগকে যথাযথরূপ পালন করিতেছ। বন্ধু যেমন বন্ধুকে ধনরত্নাদি প্রদান করিয়া পরিপোষণ করে, তুমিও আমাদিগকে সেইরূপ প্রচুর ধনরত্ন প্রদান করিয়া পরিপুষ্ট কর। হে বন্ধু! তুমি আমাদিগকে কলহবিবাদ হইতে মুক্তি প্রদান করিয়া এবং আমাদের প্রাপ্য ধনধান্য প্রদান করিয়া আমাদিগকে বলশালী কর।

৭। তুমি আমাদের অন্তরের গভীরতম প্রদেশও প্রতিমুহূর্ত্তেই দেখিতেছ। আমাদের অন্তর হইতে তোমার চরণাভিমুখে নিয়তই তোমার নামে জয়ধ্বনি সমুত্থিত হইতেছে। তুমি আমাদের প্রতি প্রসন্ন হও। তুমি রাজরাজেশ্বর। আমরা তোমার সন্তান। তুমি আমাদিগকে তোমার সন্তানের উপযুক্ত ধনসম্পদে বিভূষিত কর। তুমি আমাদের অন্তরে নিয়ত শুভবুদ্ধি প্রদান কর, যাহাতে আমরা নিত্যনিয়ত তোমার পূজার্চ্চনা সর্ব্বতোভাবে সুসম্পন্ন করিতে পারি।

৮। তুমি আমাদিগকে শৌর্য্যবীর্য্য প্রদান কর। তুমি আমাদিগকে অভয় প্রদান কর, যাহাতে আমরা তোমার নাম লইয়া নির্ভয়ে সংসারে বিচরণ করিতে পারি। জগতে যাহা কিছু ঐশ্বর্য্য আছে, সে সমস্ত তোমারই। আমরা বড়ই বিপদে পড়িয়া তোমার চরণতলে আসিয়া দাঁড়াইয়াছি। হে বন্ধু! তুমি আমাদিগকে রক্ষা কর—রক্ষা কর।

৯। আমাদের শত্রুগণ অধর্ম্মের সহায়তা গ্রহণ করিয়া আমাদের উপর জয়লাভের চেষ্টা করিতেছে। আমরা কিন্তু তোমাকে আমাদের বন্ধুরূপে পাইয়া নির্ভয় হইয়া গিয়াছি। শত্রুগণ অন্যায় পূর্ব্বক আমাদিগকে আমাদের প্রাপ্য ধনসম্পদ হইতে বঞ্চিত রাখিয়াছে; তুমি তাহাদের সেই অন্যায়সঞ্চিত ধনসম্পদ হরণ করিয়া আমাদিগকে প্রত্যর্পণ কর। তাহারা ধর্ম্মের অপ্রতিহত মহিমা উপলব্ধি করুক।

১০৩ অঙ্গুলি—রক্ষক দেবতা।

১। হে মহেশ্বর! আমরা মিলিত কণ্ঠে তোমাকে আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের অন্তরে আসিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর। তুমি যেমন আমাদের অন্তরতম বন্ধু ছিলে, চিরকাল তুমি সেইরূপ বন্ধু থেকো। হে প্রিয়! হে সত্যসন্ধ! তুমিই আমাদের যোগক্ষেম বহন করিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছ। তোমার সেই অঙ্গীকার সফল কর। আমরা নিজের ভাবনা আর ভাবিতে পারি না। তুমি বায়ুবেগে আসিয়া আমাদিগকে শত্রুহস্ত হইতে মুক্ত কর।

২। শত্রুগণ বড়ই উদ্ধত হইয়া উঠিয়াছে। মুখে তোমার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্মের প্রভুত্ব স্বীকার করিলেও ধর্ম্মকে প্রতিপদে অবমাননা করিয়া চলিয়াছে। তুমি তোমার রুদ্রতেজে আবির্ভূত হও। শত্রুগণ ভয়ে কম্পমান হইয়া চতুর্দ্দিকে বিক্ষিপ্ত ভাবে পলায়ন করুক। আমরা তোমার চরণে শত কোটী প্রণিপাত করি। তুমি শীঘ্র আসিয়া আমাদিগকে রক্ষা কর।

৩। তুমি আমাদের মস্তকে তোমার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ শতধারে বর্ষণ কর। আমরা যেন বংশপরম্পরায় তোমারই অনুগত হইয়া চলি। তুমি আমাদের বংশকে ধনরত্নে চিরকাল পরিপূর্ণ রেখো, যাহাতে আমাদের গৃহ তোমার জয়গানে নিত্য মুখরিত হয়। তুমিই আমাদের অন্তরে চির-অধিষ্ঠিত থাক এবং আমাদের মঙ্গল কামনাসকল পূর্ণ কর।

৪। আমাদিগকে শত শত গাভী প্রদান কর। সেই সকল গাভী আমাদের গৃহের প্রাঙ্গনে ক্রীড়া করিয়া নিত্য আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করুক। তুমি আমাদের ভাণ্ডারসকল ধনধান্যে পরিপূর্ণ কর। আমরা যেন বংশপরম্পরায় তোমার প্রিয়কার্য্য জানিয়া জগতের হিতসাধনে প্রবৃত্ত থাকি।

৫। হে কর্ম্মপ্রবর্ত্তক! তুমি আমাদের কর্ম্মসভার মধ্যস্থলে সমাসীন হও। আমরা যেন তোমাকে কেন্দ্রে রাখিয়া চতুর্দ্দিকে আমাদের কর্ম্মক্ষেত্র প্রসারিত করিয়া দিই। আমাদের পত্নীগণ আমাদের সহধর্ম্মিণী হইয়া সেই সকল কর্ম্মে নিত্য সহায়তা করুন। সপত্নীক আমাদিগকে তুমি সেই প্রকার আশীর্ব্বাদ দাও।

৬। আমাদের ইন্দ্রিয়সকলকে তোমারই

আদেশের অনুবর্ত্তী কর। ইন্দ্রিয়গণ আমাদিগকে সর্ব্বদাই তোমা হইতে দূরে লইয়া যাইবার জন্য উন্মুখ হইয়া আছে। অশ্ব যেমন বল্গারজ্জু দ্বারা নিয়মিত হইয়া যথাপথে চলিতে থাকে, তুমিও সেইরূপ আমাদের ইন্দ্রিয়সকলকে তোমার ধর্ম্মরজ্জু দ্বারা নিয়মিত করিয়া তোমারই পথে পরিচালিত কর। আমাদের গৃহ কর্ম্ম-কলরবে এবং তোমার জয়গানে নিত্য মুখরিত হউক। আমাদের পত্নীগণ কর্ম্ম ও ধর্ম্মসাধনে সানন্দচিত্তে আমাদের সহায়তা করুন।

অতীন্দ্রিয় রাজ্য।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

কেহ কেহ উপহাস করিয়া বলেন যে তোমরা কল্পনা-প্রভাবে জগতের পশ্চাতে একজন অনন্ত পুরুষকে বসাইয়া তাঁহারই পূজা করিতেছ এবং মনে করিতেছ যে তাঁহার মঙ্গল ইচ্ছায় তোমাদের সকল স্বপ্ন সফল হইবে। তাঁহারা বলেন যে মানুষ স্বীকার করিতে চায় না যে দুঃখযন্ত্রণাতেই জীবনের পরিসমাপ্তি, তাই পরলোক ও অনন্ত জীবনের সৃষ্টি। তাঁহারা বলেন যে কল্পনার বলে মানবসমাজ হইতে পাপ ও অত্যাচার মুছিয়া ফেলিয়া তোমরা তাহারই নাম দিয়াছ স্বর্গরাজ্য, আর রোগশোক-জরামরণহীন চিরযৌবনই তোমাদের কল্পিত অনন্ত জীবন। তাঁহাদের মতে ধর্ম্ম সামগ্রীটা নিতান্তই অলীক। তাঁহাদের উপদেশ এই যে যদি সত্য লাভ করিতে চাও তবে বিনম্র অন্তরে প্রকৃতিদেবীর কার্য্য-প্রণালী লক্ষ্য কর; যাহা চক্ষু কর্ণের বাহিরে তাহার উপরে আস্থা স্থাপন করা উচিত নহে।

কিন্তু চক্ষুকর্ণের বাহিরে এবং জড় রাজ্যের অতীত কি আর কোন সত্য নাই? মানুষ কি এরূপে গঠিত যে যাহা কিছু সত্য তাহা ইন্দ্রিয়ের সাহায্যে কেবল বহির্জ্জগৎ হইতে তাহাকে সংগ্রহ করিতে হইবে? অন্তর্জ্জগৎ হইতে গ্রহণ করিবার কি কিছুই নাই? যদি বহির্জ্জগতে ঈশ্বর, পরকাল ও অনন্ত জীবন সম্বন্ধে কোন প্রমাণ বা ইঙ্গিত নাই থাকে; যদি এই সকল আশা ও বিশ্বাসের মূল মানব-অন্তরের সহজ অনুভূতিই হয়, তবে কি এই সকল আশা ও বিশ্বাসকে অলীক বলিয়া উড়াইয়া দিতে হইবে? ঈশ্বরকে চক্ষে দেখিতে পাই না বলিয়া কি তাঁহাকে অস্বীকার করিব এবং যতদিন না পরলোকে উপস্থিত হইব ততদিন কি পরলোককে স্বপ্ন বলিব? ইহাই কি জ্ঞানবুদ্ধির চরমসিদ্ধান্ত? চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় অনেক ইতরপ্রাণীরও আছে। কোন কোন পশুপক্ষী কীটপতঙ্গের দৃষ্টিশক্তি শ্রবণশক্তি ও ঘ্রাণশক্তি মানুষের অপেক্ষাও বহুগুণে প্রবল। যদি ইন্দ্রিয়ের তীক্ষ্ণতা ধরিয়া বিচার করা যায় তবে মানুষকে চিল ও শকুন, পিপীলিকা ও মৌমাছির নিকটে পরাজয় মানিতে হয়। চক্ষুকর্ণই মানুষের শ্রেষ্ঠ গৌরব নহে। বাস্তবিক মানুষের যত প্রকার শক্তি আছে ইন্দ্রিয়ানুভূতির স্থান তাহাদের সকলের নীচে।

একথা বলাই বাহুল্য যে আমাদের ইন্দ্রিয়সকলের কার্য্যবিভাগ আছে। একের দ্বারা অন্যের কর্ম্ম হয় না। চক্ষু দেখে কিন্তু শুনিতে পায় না, কর্ণ শুনে কিন্তু দেখিতে পায় না। সেইরূপ বহিরিন্দ্রিয়ের ও অন্তরিন্দ্রিয়ের মধ্যেও কার্য্যবিভাগ আছে, তাহাদের বিষয়গুলিও পরস্পর হইতে স্বতন্ত্র। যে ব্যক্তি বাহির লইয়াই থাকে তাহার কাছে যাহা দেখা যায়, শুনা যায়, হস্তের দ্বারা স্পর্শ করা যায়, যাহার দৈর্ঘ্যবিস্তার পরিমাপ করা যায় কেবল তাহাই সত্য; তাহার অতিরিক্ত যাহা কিছু সে সমুদায়ই অলীক। আমরা কি বহিরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকেই মান্য করিব আর অন্তরিন্দ্রিয়ের সাক্ষ্যকে তুচ্ছ করিব? ঈশ্বর পরকাল প্রভৃতি আত্মার অনুভূতির বিষয়, বহিরিন্দ্রিয়ের গোচর নহে। কিন্তু যেমন চক্ষু থাকিতেও চক্ষু বন্ধ করিয়া রাখিলে দেখা যায় না এবং কর্ণ থাকিতেও কর্ণ বন্ধ করিয়া রাখিলে শুনা যায় না, সেইরূপ যদি আমরা আমাদের আত্মাকে ঈশ্বর পরলোক ও অনন্ত জীবনের দিকে উন্মুক্ত না রাখি তবে উহারা থাকিয়াও আমাদের নিকট না থাকার সমান হইতে পারে।

সামান্য আত্মপরীক্ষা করিলেই বুঝা যায় যে প্রত্যেক মানুষের মধ্যে দুটী বিরুদ্ধ প্রকৃতি আছে। এই দুটী প্রকৃতির চিন্তা ও ভাব, মত ও বিশ্বাস পরস্পর হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। একটী প্রকৃতি যাহা বলে দ্বিতীয়টী তাহার প্রতিবাদ করে। একটী প্রকৃতি জড়রাজ্য লইয়া থাকে; যাহা কিছু অতীন্দ্রিয় তাহা এই প্রকৃতির অগ্রাহ্য। ইহার অনেক নীচে অতি গভীর প্রদেশে আর একটী প্রকৃতি আছে যাহার দৃষ্টি অতীন্দ্রিয় অধ্যাত্ম জগতের দিকে, বাহ্য জগতের ঘটনাবলী তাহাকে বিচলিত করিতে পারে না। প্রথম প্রকৃতি হইতে বিজ্ঞানের জন্ম, দ্বিতীয় প্রকৃতি হইতে দর্শনের উদ্ভব। প্রথম প্রকৃতি মানুষকে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহে দক্ষতা দেয়, দ্বিতীয়টী মানুষকে সৌন্দর্য্যদর্শনের চক্ষু দেয় এবং কর্ত্তব্যসাধনে শ্রদ্ধান্বিত করে। প্রথমটী আমাদের ভবিষ্যৎদৃষ্টি খুলিয়া দেয়, দ্বিতীয়টী আমাদের অন্তর্দৃষ্টি উজ্জ্বল করে। প্রথমটী আমাদিগকে ইন্দ্রিয়গ্রামে অবরুদ্ধ করে, দ্বিতীয়টী আমাদিগকে অসীমের দিকে ইঙ্গিত করে ও ঈশ্বরের চরণে লইয়া যায়। যেমন অগাধ জলরাশির তলদেশ

অলক্ষ্য, সেইরূপ আমাদের হৃদয়ের গভীরে কতকগুলি আশা ও বিশ্বাস আছে তাহাদের মূলদেশ অদৃশ্য। যে ব্যক্তি অপরাধকে লঘু মনে করে এবং আপনার পাপ স্মরণ করিয়া যে লজ্জিত ও কম্পিত না হয়; ভক্তের জীবনের সঙ্গে নিজ জীবনের দৈন্য তুলনা করিয়া যাহার প্রাণে আক্ষেপ না জাগে; মানবের জন্ম ও মৃত্যু, সুখ ও দুঃখ, পরসেবা ও আত্মোৎসর্গের মধ্যে যে বিস্ময়ের কোন-কিছু খুঁজিয়া না পায়; আকাশ-পৃথিবীর মহিমাগৌরবে, শিশুর মুখের সরলতায় এবং সাধুর মুখের স্বর্গীয় শান্তিতে যে ব্যক্তি বাক্যের অতীত ও বুদ্ধির অগম্য কোনরূপ রহস্য না দেখে; যে একান্তে সঙ্গোপনে অব্যক্ত বেদনা লইয়া ভগবচ্চরণে কখনও মাথা না রাখে—তাহার হৃদয়ের গভীরতা কোথায়?

যেমন কোন সামগ্রী চক্ষুর অতি নিকটে ধরিলে ভাল দেখা যায় না, কিন্তু চক্ষু হইতে খানিকটা দূরে ধরিলে তবে পরিষ্কার দেখা যায়, সেইরূপ কতকগুলি বিষয় আমাদের অন্তরের এত নিকটে যে, সেগুলিকে আমরা খুব পরিষ্কার বুঝিতে পারি না। সেগুলি তর্কবিতর্কের বিষয় নহে কিন্তু চিন্তার ভিত্তি। শব্দ ব্যতীত যেমন কথা অসম্ভব, বর্ণ ব্যতীত যেমন রূপ অসম্ভব, ঠিক তেমনি কতকগুলি সত্য আছে যেগুলি ব্যতীত চিন্তা অসম্ভব। আর কতকগুলি সত্যের মূলে বিবেকের নিঃশব্দ বাণী, প্রেমের নির্ম্মল প্রেরণা, এবং শোকের শান্তিহীন বেদনা। ইন্দ্রিয়াসক্তি অপেক্ষা যে সংযম ভাল, শঠতা অপেক্ষা যে সরলতা শ্রেষ্ঠ, ক্ষমার সিংহাসন যে প্রতিহিংসার বহু উর্দ্ধে—ইহা ত চক্ষু-কর্ণের বিষয় নহে। বহির্জ্জগতের সত্যগুলিকে আমরা যেমন বিশ্বাস করি অন্তর্জ্জগতের সত্যগুলিকে কি আমরা সেইরূপ নিঃসংশয়ে গ্রহণ করিব না?

জড় বস্তুর গুণ ও ক্রিয়া লইয়াই বিজ্ঞান। ভিন্ন ভিন্ন বস্তুর ভিন্ন ভিন্ন গুণ বা শক্তি আছে, এই সকল গুণ বা শক্তির কখনও ব্যতিক্রম দেখা যায় না। জড় জগৎ অলঙ্ঘ্য নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা। বিজ্ঞান ইহার অতিরিক্ত কিছু জানেও না, মানেও না। জড়ের যে নানা প্রকার শক্তি বা গুণ আছে তাহা কে দিল; জড়জগতের যে অলঙ্ঘ্য নিয়ম তাহা কে সংস্থাপন করিল, বিজ্ঞানের মতে এসকল প্রশ্নের উত্তর মানুষের জানিবার উপায়ও নাই, প্রয়োজনও নাই। জড়রাজ্যের নিয়মগুলি অবধারণ করিয়া সেইগুলি মানিয়া চলিলেই মানুষ সুখে স্বচ্ছন্দে সংসার-যাত্রা নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইবে—ইহাই বিজ্ঞানের শিক্ষা, ইহাই আমাদের প্রথম প্রকৃতির উপদেশ। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতি এই উপদেশে একেবারেই সায় দেয় না। সুখে পান ও ভোজন করিয়া মানব-জীবনের তৃপ্তি কোথায়? জগতের অন্তরালে অন্ধ নিয়তি না জীবন্ত ঈশ্বর? এ প্রশ্নটা উপেক্ষার কথা নহে, জ্ঞানদৃষ্টিতে ইহার অপেক্ষা বড় কথা আর কিছু নাই। আর একটী বিষয় দেখ। কোন্ কাজ ভাল আর কোন্ কাজ মন্দ ইহার উত্তরে আমাদের প্রথম প্রকৃতি বলে, যে কাজের ফল ভাল তাহাই ভাল আর যে কাজের ফল মন্দ তাহাই মন্দ, যে কাজে লোকের ভাল হয় তাহাই উত্তম, আর যে কাজে লোকের ক্ষতি হয় তাহাই গর্হিত। কিন্তু আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতি ফলবাদী নহে, মানুষ কি উদ্দেশ্যে কর্ম্ম করে আমাদের দ্বিতীয় প্রকৃতিটীর দৃষ্টি সেই দিকে। একজন লোক প্রশংসার জন্য বা দুর্নাম ঢাকিবার জন্য সাধারণের উপকার করিতে পারে, বা ভয়ানক পাপ অভিসন্ধি লইয়া আর একজনের উপকার করিতে পারে। আমাদের প্রথম প্রকৃতিটীর নিকটে অভিসন্ধির কোন মূল্য নাই, কিন্তু দ্বিতীয় প্রকৃতিটীর নিকটে অভিসন্ধিটাই খুব বড় কথা। আবার দেখ, পৃথিবীতে কত লোক জন্মগ্রহণ করিতেছে, পৃথিবী হইতে কত লোক চলিয়া যাইতেছে, কে তাহার সংখ্যা করে? একজন লোকের মৃত্যুর কথা আমরা কত ঔদাস্যের সঙ্গে শুনি, কিন্তু তাহার শোকার্ত্ত আত্মীয়গণের মনের অবস্থা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাঁহারা তাঁহাদের প্রিয়জনকে পরলোকে অমরাত্মা সাধুমণ্ডলীর মধ্যে দর্শন করেন। প্রেমই তাঁহাদিগকে এই দিব্য দৃষ্টি দান করে। জননীর ক্রোড় হইতে যখন একটী শিশুসন্তান চলিয়া যায়, জননী ভাবিতে পারেন না যে তাহার জীবন পরিসমাপ্ত হইল। তিনি মনে করেন যে, নূতন রাজ্যে গিয়া তাঁহার সন্তান আরও কত নূতন নূতন জ্ঞান লাভ করিবে, তাহার হৃদয়ের সাধুভাবসকল আরও কত বিকশিত হইবে, তাহার কার্য্যক্ষেত্রও আরও কত প্রসারিত হইবে। একথা কেহ বলিও না যে প্রেম অন্ধ এবং মানুষ যাহাকে ভালবাসে তাহার সম্বন্ধে অনেক ভাল ভাল কথা কল্পনা করে। প্রেম অন্ধ! প্রেম যদি অন্ধ তবে আর চক্ষু আছে কার? একজন মানুষকে ঠিক দেখে কে? যে ব্যক্তি ঘৃণার চক্ষে দেখে সে, না যে ব্যক্তি প্রেমের চক্ষে দেখে সে? সংসারে এমন অনেক লোক আছে যাহারা কাহাকেও ভালবাসে না, লোকের কেবল দোষই খুঁজিয়া বেড়ায়, মানুষের মধ্যে নীচতা ও শঠতা ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পায় না, এবং নিজেদের চালাকির অহঙ্কারেই স্ফীত। তাহাদের কেহ ঠকাইতে পারে না, এই তাহাদের গর্ব্ব। কিন্তু এই শ্রেণীর অতিবুদ্ধি লোকেরা যেরূপ আত্মপ্রতারিত হয় সংসারে এমন আর কেহই নয়। ভাল অভিপ্রায়ে কাজ করিলেও তাহারা দুরভিসন্ধি ধরিয়া

নয়। তাহাদের কথাবার্ত্তায় অপরের প্রতি এত তাচ্ছিল্য এত বিদ্রূপ এত বিদ্বেষ থাকে যে, সহৃদয় লোকেরা তাহাদের সহিত আলাপে আনন্দ পান না, তাঁহাদের মন তাহাদের কাছে খোলে না, এবং তাঁহারা যথাসাধ্য তাহাদের হইতে দূরে থাকেন। কাজেই এই চালাক লোকগুলো অন্য প্রকৃতির লোক বড় দেখিতে পায় না এবং মনে করে দুনিয়া কেবল শঠ ও স্বার্থপর লোকের বাসভূমি। তাহাদের মত অন্ধ কে?

তবে দেখা যাইতেছে যে আমাদের এমন কতকগুলি শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে যেগুলি যাহা মহৎ যাহা উদার এবং যাহা নিত্য তাহারই অন্বেষণ করে কিন্তু জড়রাজ্যে তাহার সন্ধান পায় না। পিঞ্জরের পাখী যেমন ক্ষুদ্র স্থানে রুদ্ধ থাকে কিন্তু তাহার পক্ষদুটী পিঞ্জরের বাহিরে মুক্ত গগনে উড়িবার জন্য অধীর হয়, তেমনি মানুষ ইন্দ্রিয়ের কারাগারে রুদ্ধ বটে কিন্তু তাহার অন্তরে এমন কতকগুলি শক্তি ও প্রবৃত্তি আছে যাহারা উদারতর জীবনের জন্য অধীর। মানুষ যাহা দেখে যাহা শুনে ও যাহা লাভ করে তাহাতে তাহার তৃপ্তি কোথায়? সে যত পথই অতিক্রম করুক না কেন, তাহার সম্মুখে আরও কত দীর্ঘ পথ প্রসারিত! সে যতই উন্নতি করুক না কেন তাহার মধ্যে যে উন্নতির সম্ভাবনা নিহিত আছে সে উন্নতি আরও কত বিশাল! মানুষ চিরদিনই অপূর্ণ থাকিবে কিন্তু তাহার অন্তরে অসীমের অভিমুখে অগ্রসর হইবার জন্য কি গভীর ব্যাকুলতা!

আমাদের বিবেকই যে শুধু এই গূঢ়তত্ত্ব আমাদের নিকটে প্রকাশ করে তাহা নহে কিন্তু ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায় যে আমাদের স্মৃতির মধ্যেও ইহার আভাস আছে। স্মৃতি আমাদের ইন্দ্রিয়জ্ঞানের প্রতিচ্ছায়া মাত্র কিন্তু ইহার একটী আশ্চর্য্য নির্ব্বাচন শক্তি আছে। সম্প্রতি যাহা ঘটিয়াছে বা সম্প্রতি যাহা দেখিয়াছি তাহার স্মৃতি তেমন সুন্দর নয়! কিন্তু বাল্যস্মৃতি কত মধুর, সেই স্নানের ঘাট, সেই খেলিবার মাঠ, সেই পাঠশালা, সেই আঁকাবাঁকা পল্লীপথ, সেই ভাঙ্গাচোরা বেড়া, প্রতি উষায় বাড়ীর প্রাঙ্গণে ঘাসের উপরে সেই হীরামুক্তার ছড়াছড়ি, সন্ধ্যায় বাড়ীর নিকটস্থ গাছের শাখাপত্রের বিচ্ছেদ দিয়া সেই চন্দ্রোদয়—যেন এই সব স্মৃতিগুলি স্বর্গের ছবি। যে আলো ও যে ছায়া দিয়া এই চিত্রগুলি অঙ্কিত সে আলো কত উজ্জ্বল, সে ছায়া কত স্নিগ্ধ! কিন্তু বিশেষ করিয়া যাঁহাদের নিকট হইতে সেই মধুর অতীতে কত স্নেহ ভালবাসা পাইয়াছি কিন্তু যাঁহারা এখন আর পৃথিবীতে নাই, সেই পিতামাতা ভাইভগিনী ও বাল্যবন্ধুদের মুখ মনে পড়িয়া আমাদের হৃদয় গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ হয়। কত উচ্ছৃঙ্খল যুবককে যে তাহার পরলোকস্থ জননীর স্নেহময় মুখের স্মৃতি কুপথ হইতে ফিরাইয়া নব-জীবন দান করিয়াছে তাহা কে বলিতে পারে? যেমন কোন সুনিপুণ চিত্রকর পর্ব্বত ও উপত্যকা নদী ও নির্ঝর প্রান্তর ও কান্তার প্রভৃতির দৃশ্য হইতে যাহা কিছু তুচ্ছ ও কুৎসিত তাহা পরিহার করিয়া শুধু সুন্দর সুন্দর উপাদানগুলি বাছিয়া লইয়া মনোহর চিত্রপট অঙ্কিত করেন, সেইরূপ স্মৃতি অতীত ঘটনার মধ্য হইতে যাহা কিছু তুচ্ছ ও সামান্য সে গুলিকে মুছিয়া ফেলিয়া যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর, যাহা কিছু আমাদের ধর্ম্মজীবনের অনুকূল কেবল সেইগুলিকে সযত্নে রক্ষা করে। প্রত্যেক মানুষের অন্তরে এইরূপ অনেক পুণ্যস্মৃতি সঞ্চিত আছে। এই স্মৃতিগুলি ধর্ম্ম-বিশ্বাসের অনুগামী। যখন আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাস ভাঙ্গিয়া যায়, সঙ্গে সঙ্গে এই স্মৃতিগুলিও ম্লান ও শুষ্ক হইয়া যায়। তর্কের অনুরোধে কেহ কেহ এ কথা অস্বীকার করিতে পারে কিন্তু কথাটা সত্য।

মানুষ বাস্তবিক শুধু বহির্জ্জগৎ লইয়া থাকিতে পারে না। আমাদের ইন্দ্রিয়গণ বহির্জ্জগতের কথা যাহা আমা-দিগকে বলে আমরা তাহাদের অসার অংশ বর্জ্জন করি এবং সারাংশকে নিত্য বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি। কিন্তু যাহাকে আমরা নিত্য বস্তু বলিয়া গ্রহণ করি তাহা যদি মিথ্যা ও কল্পনা হয় তবে বলিতে হইবে যে আমরা বিশ্বরহস্যের গূঢ় মর্ম্ম অবধারণ করিতে একেবারেই অক্ষম। এখন প্রশ্ন এই যে, জ্ঞান বুদ্ধি ও স্মৃতি, বিবেক ও কর্ত্তব্যনিষ্ঠা, স্নেহপ্রীতি ও ভগবদ্ভক্তি প্রভৃতি যাহা কিছু আমাদের শ্রেষ্ঠ সম্পদ, তাহারা কি আমাদিগকে সত্যদর্শনে সমর্থ করে, না মোহের অন্ধকারে ডুবাইয়া দেয়? এই প্রশ্নের উত্তরের উপরে জনসমাজের কল্যাণ ও প্রত্যেক মানুষের জীবনের উন্নতি ও শান্তি নির্ভর করিতেছে। এসম্বন্ধে আমাদের অন্তরের সহজ ধারণাকে যদি আমরা কল্পনা মনে করি তবে গভীর ধর্ম্মবিশ্বাস ও উন্নত ধর্ম্মজীবন লাভ করা অসম্ভব। যদি আমরা ভোগবিলাসকেই পরমার্থ জ্ঞান না করি, যদি জগতের শোকসন্তাপকে নিজের কাঁধে লইতে চাই, যদি নিষ্কলঙ্ক পুণ্যজীবন কামনা করি, তবে আমাদিগকে জড়জগতের আবরণ ভেদ করিয়া অতীন্দ্রিয় রাজ্যে যাইতে হইবে এবং প্রেমময় পবিত্রস্বরূপ ঈশ্বরের চরণে মাথা রাখিতে হইবে।

বৈয়াসিক-ন্যায়মালা।

[প্রথমাধ্যায়ের দ্বিতীয় পাদ]

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

(দ্বিতীয়ে, ঈশ্বরস্যৈবাত্তৃত্বাধিকরণে সূত্রে—)

সূত্র। অত্তা চরাচরগ্রহণাৎ ॥ ৯॥ প্রকরণাচ্চ ॥ ১০॥

দ্বিতীয়াধিকরণমারচয়তি—

শ্লোক—

জীবোঽগ্নিরীশো বাঽত্তা স্যাদোদনে জীব ইষ্যতাম্।
স্বাদ্বত্তীতি শ্রুতের্বহ্নির্বাঽগ্নিরন্নাদ ইত্যতঃ ॥ ৩॥
ব্রহ্মক্ষত্রাদিজগতো ভোজ্যত্বাৎ স্যাদীশ্বরঃ।
ঈশপ্রশ্নোত্তরত্বাচ্চ সংহারস্তস্য চাত্তৃতা ॥ ৪॥

টীকা—কঠবল্লীষু দ্বিতীয়বল্ল্যবসানে পঠ্যতে—

"যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ উভে ভবত ওদনঃ।
মৃত্যুর্যস্যোপসেচনং ক ইত্থা বেদ যত্র সঃ" ॥ ইতি।

অয়মর্থঃ—ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়জাতী যস্যৌদনস্থানীয়ে মৃত্যুশ্চোপসেচনস্থানীয়ঃ স পুরুষো যত্র বর্ত্ততে তৎ স্থানং 'ইদমিত্থং' ইতি কো বেদ। ন কোঽপি জানাতি ইত্যর্থঃ। অত্র ওদনোপসেচনশব্দাভ্যাং কশ্চিৎ ভক্ষকঃ প্রতীয়তে। স জীবঃ, অগ্নিঃ, ঈশো বা ইতি ত্রেধা সংদিহ্যতে। 'জীব' ইতি তাবৎ প্রাপ্তম্। কুতঃ "তয়োরন্যঃ পিপ্পলং স্বাদ্বত্তি" ইতি জীবস্যাত্তৃত্বশ্রবণাৎ। অথবা বহ্নির্ভবেৎ, "অগ্নিরন্নাদঃ" ইত্যত্তৃত্বাবগমাৎ। ইতি প্রাপ্তে—

উচ্যতে—ব্রহ্মক্ষত্রয়োরুপলক্ষণত্বেন কৃৎস্নং জগদিহ ভোজ্যত্বেনাবগম্যতে। নহি তাদৃশস্য ভোজ্যস্যেশ্বরাদন্যোঽত্তা সম্ভবতি। কিঞ্চ—

"অন্যত্র ধর্ম্মাদন্যত্রাধর্ম্মাদন্যত্রাস্মাৎ কৃতাকৃতাৎ।
অন্যত্র ভূতাচ্চ ভব্যাচ্চ যত্তৎপশ্যসি তদ্বদ" ॥

ইতি ধর্ম্মাদ্যস্পৃষ্টকার্য্যকারণকালত্রয়াতীতে পরমেশ্বরে নচিকেতসা পৃষ্টে সতি "যস্য ব্রহ্ম চ"—ইতি বাক্যেন যম উত্তরং দদৌ। তস্মাৎ ঈশ্বরোঽত্র প্রতিপাদ্যঃ—"অনশ্নন্নন্যোঽভিচাকশীতি" ইতীশ্বরে ভোক্তৃত্বং নিষিধ্যতে—ইতি চেৎ। তর্হ্যত্তৃত্বং নাম সংহর্ত্তৃত্বং ভবিষ্যতি। তচ্চেশ্বরস্য সর্ব্বে বেদান্তেষু প্রসিদ্ধম্॥

(দ্বিতীয়ে, ঈশ্বরেরই অত্তৃত্ব অধিকরণে দুইটী সূত্র—)

সূত্রের অনুবাদ। (ব্রহ্ম) ভোক্তা চরাচরগ্রহণ হেতু ॥ ৯॥ এবং প্রকরণ হেতু ॥ ১০॥

(দ্বিতীয় পাদের) দ্বিতীয় অধিকরণ রচিত হইতেছে—

শ্লোকের অনুবাদ। (শ্রুত্যুক্ত) ওদন বিষয়ে জীব, অগ্নি অথবা ঈশ্বর ভোক্তা? জীব ইচ্ছা করা (ধরা) হউক। "স্বাদু ভোগ করেন" এই শ্রুতি হেতু; অথবা "অগ্নি অন্নভোক্তা" এই শ্রুতি হেতু অগ্নি (ভোক্তা হউন)। ৩। ব্রাহ্মণক্ষত্রিয়মূলক জগতের ভোজ্যত্ব হেতু এবং ঈশ্বরবিষয়ক প্রশ্ন ও উত্তর হেতু এস্থলে ঈশ্বর (ভোক্তা হউন)। সংহারই তাঁহার অত্তৃতা।

টীকার অনুবাদ। কঠবল্লীর দ্বিতীয় বল্লীর শেষোক্ত যে শ্রুতি "যস্য ব্রহ্ম চ ক্ষত্রং চ........ বেদ যত্র সঃ" (টীকায় উদ্ধৃত হইয়াছে,) তাহার অর্থ এই—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় জাতি যাঁহার ওদনস্থানীয়, এবং মৃত্যু যাঁহার উপসেচন (আহারের উপকরণ) স্থানীয়, সেই পুরুষ যেখানে থাকেন, সেই স্থানে "ইহা এইরূপ" এই প্রকারে কে জানে? অর্থাৎ কেহই জানে না। এস্থলে ওদন ও উপসেচন, এই দুই শব্দের দ্বারা কোন ভক্ষক সূচিত হইতেছে। সেই (ভক্ষক) জীব, অগ্নি অথবা ঈশ্বর, এই তিন প্রকার সন্দেহ হইতেছে। 'জীব'ই তবে (ভক্ষক) ধরা গেল কারণ "তাহাদের অন্যতর স্বাদু পিপ্পল (কর্ম্মফল) ভোগ করে" এই (শ্রুতিতে) জীবেরই ভোক্তৃত্ব শ্রুত হয়। কিম্বা বহ্নি (ভোক্তা) হউক, কারণ "অগ্নি অন্নভক্ষক" এই (শ্রুতি হইতে অগ্নির) ভোক্তৃত্ব জানা যায়। ইহা প্রাপ্ত হইলে (তদুত্তরে)—

বলা যাইতেছে—ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের দ্বারা উপলক্ষিত হইয়া এস্থলে সমস্ত জগত ভোজ্যরূপে উপলব্ধ হইতেছে। তাদৃশ ভোজ্যের ভোক্তা ঈশ্বর ব্যতীত অপর কাহারও হওয়া সম্ভবপর নহে। অধিক কি—"ধর্ম্ম হইতে পৃথক, অধর্ম্ম হইতে পৃথক, এই কৃত ও অকৃত হইতে পৃথক, ভূত হইতে পৃথক এবং ভবিষ্যৎ হইতে পৃথক, সেই যাঁহাকে দেখিতেছ, তাহার বিষয় বল" এই (শ্রুতিতে) ধর্ম্ম, অধর্ম্ম, কার্য্য, কারণ এবং ত্রিকালের অতীত পরমেশ্বর সম্বন্ধে নচিকেতা প্রশ্ন করিলে যম উত্তর দিলেন "যাঁহার ব্রাহ্মণ এবং" (ইত্যাদি)। অতএব এস্থলে ঈশ্বর প্রতিপাদ্য। যদি বল যে, "অন্য

নিরশন থাকিয়া কেবল দর্শন করেন" এই (শ্রুতি দ্বারা) ঈশ্বরের ভোক্তৃত্বে বাধা পড়ে, তবে এস্থলে অত্তৃত্বের (অর্থ) সংহারকর্তৃত্ব ধরা যাইবে। বেদান্তের সর্ব্বত্র ঈশ্বরের তাহাও (সংহারকর্তৃত্ব) প্রসিদ্ধ আছে।

তাৎপর্য্য। কঠোপনিষদের যমনাচিকেতসংবাদে দেখা যায় যে, নচিকেতার পিতা গোতম সর্ব্বস্ব দক্ষিণাস্বরূপ দান করিয়া বিশ্বজিৎ যজ্ঞানুষ্ঠানে প্রবৃত্ত হইয়াছিলেন। নচিকেতা নিজেকে পিতারই অধিকৃত বস্তুর মধ্যে পরিগণিত করিয়া তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"পিতঃ আমায় কাহাকে দান করিবেন ?" বালকের ন্যায় তাঁহার প্রশ্ন শুনিয়া পিতা বারম্বার বিরক্তি প্রকাশ করিতে থাকিলেও যখন নচিকেতা প্রশ্ন করিতে বিরত হইলেন না, তখন বিরক্ত হইয়া বলিলেন—"তোমায় যমের হস্তে দিব"। নচিকেতা পিতার সেই উক্তি স্বীকার করিয়া যমগৃহে যাইবার ইচ্ছা প্রকাশ করিলে স্নেহবশত পিতা তাঁহাকে তাহা হইতে নিরস্ত করিতে বিস্তর চেষ্টা করিলেন। নানা বাদানুবাদের পর পিতার সম্মতি লইয়া নচিকেতা যমগৃহে গমন করিলেন। সেখানে যাইয়া তিনি যমের নিকট তিনটী বর প্রার্থনা করিলেন। তন্মধ্যে তৃতীয় বা শেষ বরের দ্বারা, মৃত্যুর পরে মানুষ থাকে বা থাকে না, এই তত্ত্বটী তিনি জানিতে চাহিলেন। এই তত্ত্ব শিক্ষা দিতে যম প্রথম প্রথম অস্বীকার করিলেও পরিশেষে নচিকেতার বিশেষ আগ্রহ দেখিয়া তাঁহাকে এবিষয়ে উপদেশ দিতে প্রবৃত্ত হইলেন, সেই প্রসঙ্গে যম নচিকেতাকে পরলোক ও পরমাত্মা বিষয়ক অনেক তত্ত্ব উপদেশ দিলেন। এই সকল উপদেশ যেভাবে যম দিলেন, তাহাতে সকলের অতীত পরব্রহ্ম বিষয়ক ঐ সকল উপদেশের অন্তর্নিগূঢ় তত্ত্ব দুর্ব্বোধ্য হওয়ায় নচিকেতা বলিলেন—"ধর্ম্মের অতীত ও অধর্ম্মের অতীত; কার্য্যের অতীত ও কারণেরও অতীত; অতীত কালের অতীত ও ভবিষ্যৎ কালের অতীত যাঁহাকে তুমি দেখিতেছ, তাঁহার বিষয় আমাকে বল"। এস্থলে ধর্ম্ম অর্থে বিহিত কর্ম্ম বুঝাইতেছে। আবার, কর্ম্ম, অনুষ্ঠাতা ও উপকরণাদি ব্যতীত সম্ভব হয় না; সুতরাং 'কর্ম্মের অতীত' শব্দের অর্থে কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠাতা, কর্ম্মের সহকারী উপকরণ দ্রব্যাদি এবং কর্ম্মের উদ্দিষ্ট দেবতাদি সকলেরই অতীত বুঝিতে হইবে। সেইরূপ 'অধর্ম্মের অতীত' শব্দের অর্থে নিষিদ্ধ কর্ম্ম, তাহার অনুষ্ঠাতা ও উপকরণ দ্রব্যাদি এবং তাহার উদ্দেশ্য ভোগাদি বিবিধ স্বার্থেরও অতীত বুঝিতে হইবে। 'কৃত' শব্দের অর্থে যাহা করা হইয়াছে অর্থাৎ 'জন্য বস্তু' বা কার্য্য বুঝায়। কিন্তু এই 'কার্য্য' বা 'কৃত' শব্দের অর্থে উপরোক্ত কর্ম্মানুষ্ঠান বুঝায় না। বস্তুত, শাস্ত্রোক্ত 'কৃত' শব্দের অর্থে 'জন্য' বা যাহা উৎপন্ন হইয়াছে ধরা যায়। অকৃত শব্দের অর্থে যাহা কৃত নয়। কিন্তু এস্থলে উহার অর্থে 'অজন্য' অর্থাৎ যাহা উৎপন্ন নহে, এইরূপ ধরিতে হইবে। সুতরাং 'অকৃত' শব্দের দ্বারা কার্য্যের উৎপাদক বা কারণ সূচিত হইতেছে। অতএব "কৃতাকৃতের অতীত" শব্দের অর্থে "কার্য্যকারণের অতীত" বুঝিতে হইবে। "ভূতভব্যের অতীত" অর্থে অতীত কাল ও ভবিষ্যৎ কালের অতীত। কিন্তু "সংদংশ ন্যায়" অনুসারে ঐ দুই কালের ভিতর বর্ত্তমান কালও অন্তর্ভুক্ত হইতেছে। সংদংশ শব্দের অর্থে সাঁড়াশি। সাঁড়াশি দ্বারা কোন বস্তুর দুই প্রান্ত আকর্ষণ করিলে যেমন তাহার অন্তর্ব্বর্ত্তী অংশ স্বতই আকৃষ্ট হয়, সেইরূপ সংদংশ ন্যায় অনুসারে কালের দুই প্রান্ত অতীত ও ভবিষ্যৎ উল্লিখিত হইবার ফলে বর্ত্তমান কাল স্বতই উপলক্ষিত হইতেছে। অতএব "ভূত ও ভব্যের অতীত" অর্থে ত্রিকালের অতীত বুঝিতে হইবে। টীকায় উদ্ধৃত কঠোপনিষদের উপরোক্ত শ্রুতিবাক্যের অর্থ দাঁড়াইতেছে—ধর্ম্মাধর্ম্ম, কার্য্যকারণ ও কালত্রয়ের অতীত পরমেশ্বর বিষয়ে উপদেশ দিবার জন্য যম নচিকেতা কর্ত্তৃক অনুরুদ্ধ হইলেন।

তদুত্তরে যম বলিলেন "যাহার ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই ভোজ্য, মৃত্যু যাঁহার (ভোজ্যের) উপকরণ, তিনি এই স্থানে বা এই প্রকার, ইহা কে জানে ?" অর্থাৎ কেহই তাহা বলিতে পারে না। এখানে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় এই দুইটী শব্দ ধরা হইয়াছে। দুইটী প্রধান বর্ণ উল্লিখিত হওয়ায় অপ্রধান অপর দুইটী বর্ণ বৈশ্য ও

শূদ্রও সূচিত হইতেছে। ভাবার্থ হইতেছে—চতুর্ব্বর্ণ উপলক্ষিত সমগ্র জগত। "সমগ্র জগত যাঁহার ওদন (বা ভোজ্য)" উক্ত হইয়াছে। এস্থলে প্রশ্ন এই যে "ওদন" শব্দ (যাহার ব্যুৎপত্তিলব্ধ অর্থ হইল ভোজ্য) তাহা কি অর্থে ব্যবহৃত হইয়াছে? ভোজ্য এবং ভোজ্যের উপকরণ বলিলেই ভক্ষকের অস্তিত্ব প্রতীত হয়। সেই ভক্ষক কে? ভক্ষকের স্বরূপ নিরূপিত হইলেই ভোজ্য কি তাহা সুস্পষ্ট হইবে। ভক্ষক ও ভোজ্য নির্দ্ধারিত হইলেই নচিকেতার প্রশ্নের উত্তরে যমের উক্তির প্রকৃত অর্থ আমাদের নিকট সুস্পষ্ট প্রতিভাত হইবে।

ভোজনের কথা বলিলেই সর্ব্বপ্রথমে জীবের কথাই মনে আসে। সাধারণত আমরা দেখি যে প্রাণী বা জীবমাত্রেই ভক্ষণ করে। তদ্ব্যতীত, একটী শ্রুতিতে আছে—"তাহাদিগের অন্যতর পিপ্পল বা কর্ম্মফল সুখে ভক্ষণ করে"। ইহা দ্বারাও জীবের ভক্ষকত্ব সূচিত হইতেছে। দ্বিতীয়ত, অগ্নির একটী নাম সর্ব্বভুক্ সাধারণত প্রচলিত থাকাতে এবং বৃহদারণ্যকের একটী শ্রুতিতে "অগ্নি অন্নভক্ষক" উক্ত হওয়ায় ভোজনের কথায় অগ্নিকেও ভক্ষকরূপে ধরা হইয়াছে বলিয়া মনে হইতে পারে। কিন্তু চতুর্ব্বর্ণ উপলক্ষিত সমগ্র জগত ভোজ্যরূপে উল্লিখিত হওয়ায় ঈশ্বরই তাহার ভক্ষকরূপে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছেন বলিয়া সংশয় উপস্থিত হয়। পূর্ব্বপক্ষ মহা সংশয়ে পড়িয়া প্রশ্ন করিতেছেন—এইরূপে ওদন বা ভোজ্যের সহিত জীব, অগ্নি এবং ঈশ্বর তিনেরই সম্বন্ধ থাকায়, ইহাদের মধ্যে কোন্‌টী যমের উপরোক্ত উত্তরে প্রতিপন্ন হইতেছে?

প্রথমত জীবকেই ভক্ষকরূপে ধরা যাক। পূর্ব্বপক্ষের এই প্রশ্নের উত্তরে উত্তর পক্ষ বলেন, উপরোক্ত শ্রুতিকথিত ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উপলক্ষিত সমগ্র জগত একটী সামান্য জীবের ভোজ্য হওয়া অসম্ভব হইবার কারণে এস্থলে জীবকে ভক্ষকরূপে ধরা যাইতে পারে না। তদ্ব্যতীত জীবকে ভক্ষকরূপে ধরিলে নচিকেতার প্রশ্নের সমাধান হয় না। তিনি জানিতে চহিয়াছেন যে, ধর্ম্মাধর্ম্মের অতীত, কৃতাকৃতের অতীত ও ভূতভব্যের অতীত যিনি তিনি কে? পূর্ব্বপক্ষের দ্বিতীয় প্রশ্ন এই যে, তবে অগ্নিকেই ভক্ষকরূপে ধরা হউক। ইহার উত্তরে উত্তরপক্ষ বলিতেছেন—সমগ্র জগত অগ্নিরও ভোজ্যরূপে ধরা যাইতে পারে না—কারণ অগ্নি নিজের অপেক্ষা স্থূল পদার্থকে ভক্ষণ করিতে পারে। কিন্তু নিজের অপেক্ষা সূক্ষ্মতর পদার্থকে (যথা বায়ু) ভক্ষণ করিতে পারে না। তদ্ব্যতীত, অগ্নিকে ভক্ষকরূপে ধরিলেও নচিকেতার প্রশ্নের সমাধান হইবে না। তখন প্রশ্ন হইল যে, তবে কি ঈশ্বরই জগতের ভক্ষক? সিদ্ধান্ত পক্ষ তদুত্তরে বলিতেছেন যে ঈশ্বরই জগতের ভক্ষক। কারণ সমগ্র জগৎ যদি ভক্ষণ করিতেই হয়, তবে সেরূপ ভক্ষক একমাত্র ঈশ্বর ব্যতীত অপর কেহ হওয়া সম্ভব নহে। কিন্তু মুণ্ডকোপনিষদের শ্রুতিতে ঈশ্বর সম্বন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, তিনি "ভক্ষণ না করিয়া দর্শন করেন"। যেমন অগ্নিকে ভক্ষক বলিলে জীবের উপযুক্ত ভোজন উপলক্ষিত হইবে না, সেইরূপ ঈশ্বরকেও জগতের ভক্ষক বলিলে জীবের উপযুক্ত ভোজন-কার্য্য উপলক্ষিত হইবে না, কিন্তু বেদান্তের সর্ব্বত্র স্বীকৃত ঈশ্বরের সংহারকর্ত্তৃত্বই বুঝিতে হইবে। সুতরাং কঠশ্রুতিতে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়-উপলক্ষিত চরাচর গ্রহণ হেতু এবং প্রকরণ ঈশ্বরবিষয়ক হইবার কারণে ঈশ্বরই এই সূত্রদ্বয়ের প্রতিপাদ্য হইতেছেন।

হিমালয় পরিভ্রমণ।

(শ্রীরত্নমালা দেবী)

কেদার দর্শনের পর যখন বদরীনাথ দর্শনে চলিলাম, তখন মনটা বিপুল আনন্দ উৎসাহে ভরিয়া উঠিল। আবার সকলে নববলে নবীন উদ্যমে পথ হাঁটিতে আরম্ভ করিলাম। একদিন পথ চলিতে চলিতে ক্লান্তভাবে বসিলাম। কিছুক্ষণ পরে দেখিলাম পাহাড়ীরা একটা মৃতদেহ বহন করিয়া তাহার সমাধি দিবার জন্য লইয়া যাইতেছে। তাহার আত্মীয়স্বজনের করুণ আর্ত্তনাদ শোনা যাইতেছে। ভাবিলাম, হায় এই অনিত্য সংসার! ইহার মধ্যে ত এতটুকু সত্যতা নাই। এই মিথ্যাময় মায়ার সংসারে আসিয়া জীবমোহ বশতঃ আমার আমার বলিয়া ভ্রান্ত হইয়া ভগবানকে ভুলিয়া থাকে; কিন্তু এ গৃহ যে আমার নিত্য নিকেতন নহে, এ যে আমার চিরদিনের

বাসস্থানও নহে—আমার সময় পূর্ণ হইলেই আবার আমাকে সেই নিত্য নিকেতনে ফিরিতে হইবে। স্বামী পুত্র আত্মীয় স্বজন সুহৃদ কেহই আমার শেষ-যাত্রার সহগামী হইবে না। শুধু কৃতকর্ম্ম পাপ-পুণ্যই আমার সহগামী হইবে। এ কথা ভ্রমেও একদিন কেহ মনে করে না। আহা! ঐ দেহের একদিন কত সৌন্দর্য্য ছিল? ঐ মুখের একদিন কত শোভা ছিল। ঐ কণ্ঠে একদিন মধুর বাক্যস্ফুরণ হইত। আজ ঐ দেহের এই পরিণাম—শৃগাল-কুকুরের শকুনি-গৃধিণীর আহার; অথবা শেষ পরিণাম ভস্ম। হায় মানুষ, তবু এ অনিত্য দেহের গর্ব্বে দম্ভে অহংকারে আত্মহারা হইয়া তুমি আপনাকে কতই মহান্ কতই শক্তিশালী মনে করিতেছ! এই মরণশীল মরজগতকে অমর ভাবিয়া কতই আমিত্বের গর্ব্ব করিতেছ!

এ সংসারে যাহা কিছু দেখিতেছি সকলই ক্ষণধ্বংসী সকলই বিকারময় সকলই অসৎ। সেই সৎচিৎ আনন্দময় পুরুষই সত্য। তিনি নির্ব্বিকার নিরঞ্জন, তিনি অনাদি জন্মমৃত্যু-বর্জ্জিত। জীব জগতে জন্ম লইয়া নিজের সুকৃতি দুষ্কৃতি অনুসারে ফলভোগ করিতে থাকে। যতদিন নিবৃত্তির পথে যাইতে না পারে ততদিনই জীবের এই অবস্থা; কর্ম্মবন্ধন মোচন হইলেই পরা গতি লাভ হয়। গীতাও বলিয়াছেন—

বাসাংসিজীর্ণাণি যথা বিহায়
নবানি গৃহ্ণাতি নরোঽপরাণি।

ঐ দেহটী যেন জীর্ণ বাস; উহাকে ত্যাগ করিয়া দেহী আবার নূতন দেহরূপ নববস্ত্র পরিয়া নূতন জগতে নূতন জীব হইয়া জন্মগ্রহণ করে। তাহার সঙ্গে সঙ্গে আবার তাহার সুখ দুঃখরূপ কর্ম্মফলগুলিও ভোগ হইবে। মানব যদি একই রক্তমাংসের উপাদানে গঠিত, তবে তাহার মধ্যে এই সুখদুঃখের তারতম্য কেন? কেহ বা জগতে সুখী কেহ বা দুঃখী, কেহ রাজাধিরাজ কেহ মুষ্টিমেয় অন্নের কাঙ্গাল। কেহ চির সুস্থ দেহ, কেহ বা চির রোগী। সৃষ্টিকর্ত্তা ভগবান জীবকে একই উপাদানে গঠিত করিয়াছেন. তবে এ সুখদুঃখের তারতম্য হইল কেন তাহার উত্তর কর্ম্মফল। কর্ম্মই জীবের সুখ-দুঃখের হেতু।

এই সকল ভাবিতে ভাবিতে অনেক পথ চলিলাম। বেলা অতিরিক্ত দেখিয়া একটী চটীতে আশ্রয় লইলাম। তথায় স্নানাদি করিয়া আবার বদরীনাথের পথে অগ্রসর হইলাম। তখন বেলা অপরাহ্ণ হইয়াছে। ধূসর শৈলমালা যেন পথের চতুর্দ্দিকে ঘিরিয়া আছে। অস্তগামী রবির সোনালি আভা পশ্চিম গগন রঞ্জিত করিয়া তুলিয়াছে। পাখীগুলি দলে দলে কুলায় ফিরিতেছে, শান্ত সন্ধ্যা যেন ধীরে ধীরে ধূসরবাসে আচ্ছাদিত হইয়া নামিয়া আসিতেছেন। ক্রমে দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা সমাগত হইল। নীরব নির্জ্জন বনপথ যেন শান্ত মৌন ভাব ধারণ করিল। গোধূলির ললাটে দুএকটী করিয়া তারকা দেখা দিল। আমার সঙ্গীরা 'মণ্ডল' চটী বলিয়া একটী চটীতে আশ্রয় লইলেন। আমিও গোলাপসিংকে লইয়া তথায় গিয়া আশ্রয় লইলাম। কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া সন্ধ্যাবন্দনা সমাপনান্তে একটু দুগ্ধ খাইয়া শয়ন করিলাম। শয়ন মাত্রেই নিদ্রাদেবীর সুকোমল ক্রোড়ে আশ্রয় লইয়া জগতের সকল চিন্তা বিস্মৃত হইলাম।

আবার উষার তরুণ অরুণের আলোকে জগৎ হাসিয়া উঠিল। বিহগেরা ললিত কূজনে বিভুর বন্দনাগান গাহিতে লাগিল। বনফুলগুলি ফুটিয়া সুবাসে বনপথটী ভরিয়া দিল। আমি শয্যা ত্যাগ করিয়া মুখহাত ধুইয়া গমনোপযোগী পরিচ্ছদ পরিয়া গোলাপ সিংহের সহিত পথে বাহির হইলাম।

চাহিয়া দেখিলাম, আবার নূতন জগত যেন নবীন শোভাসম্পদে সাজিয়াছে। কৈ, এ জগত ত চিরদিনই দেখিয়া আসিতেছি, কোন দিন ত ইহার নূতনত্ব গেল না। চিরদিনই ত এই বিশ্বভরা অনন্ত সৌন্দর্য্য দেখিতেছি। পত্রে পুষ্পে লতায় পাতায় আকাশে বাতাসে এ বিশ্ব নব নব ভাবেই সুসজ্জিত। এ চিরবৈচিত্র্যময় জগতের বুকে রূপে রসে বর্ণে গন্ধে এক বিচিত্র সৌন্দর্য্যের আধার করিয়া রাখিয়াছে। দেখিয়াই মনে হয় কে গো তুমি যাদুকর? তোমার অদ্ভুত কুহকজালে প্রতিদিনই আমরা এ জগত নূতন ভাবেই দেখি; তুমি কি বহুরূপী, তাই বহুরূপে এ সংসারে খেলা করিতেছ? আমরা অনেক চেষ্টা করিয়াও তোমার স্বরূপটি বুঝিতে পারি না। ঐ প্রভাত অরুণে তোমারই ছবিটি দেদীপ্যমান। ঐ বিকসিত কুসুমেরদলে দলে তোমারি মাধুরী ও সুবাস। ঐ মৃদুল সমীরে তোমারি স্পর্শ। ঐ বিহগকূজনে তোমারি মধুর কণ্ঠ মিলাইয়া রাখিয়াছে। ঐ অনন্ত নীলাকাশ তোমারি গভীর ওঁকারনাদে পূর্ণ। ঐ বিশাল সাগর ক্ষীণকায়া নদী ও নির্ম্মল নির্ঝররূপে তুমিই জগতের বুক রসে পরিতৃপ্ত করিয়া রাখিয়াছ। ওগো নূতন! ওগো নবীন! কোন দিনই ত তোমার এ নূতনত্ব গেল না। তুমি কখনো জননীরূপে শিশুকে স্নেহের আড়ালে রাখিয়া জননীর ভিতর দিয়া দেখা দিতেছ, কখনো বা পতিপত্নীর ভিতর দিয়া প্রেমের পরশে সংসারকে স্বর্গ করিতেছ! শিশু তুমিই হইয়া যখন চক্ষু মেলিল প্রথমেই দেখিল তোমারি আলো। প্রথমে চিনিল তোমারি স্নেহভরা মাতৃমুখ। প্রথমেই শিশুর অস্ফুট

কাকলীতে শিশু ডাকিল মা! কে মা তুমি জননীরূপে ধাত্রীরূপে পীযূষভরা স্তনদানে শিশুর জীবন রক্ষার ব্যবস্থা কর? জ্ঞানহীন মূর্খ আমি তাই তোমার এত দয়া এত করুণা দেখিয়াও তোমায় চিনিতে পারি না। তাই তোমায় খুঁজি মা; কিন্তু মা যে জগৎজননী মা যে বিশ্বপ্রসবিনী তাহা ভুলিয়া যাই। চণ্ডীও বলিয়াছেন—

নিত্যৈব সা জগন্মূর্ত্তিস্তয়া সর্ব্বমিদং ততম্।

এই জগতই ত মায়ের রূপে উদ্ভাসিত। তবে আবার আমরা মাকে কোথায় খুঁজি? মা যে আমায় স্নেহের বাহু দুটী বাড়াইয়া বলিতেছেন—এস এস আমার সন্তান, আমার ক্রোড়ে আসিয়া আশ্রয় লও। অধম সন্তান আমরা মাতৃনামের মহিমা জানিতে না পারিলেও মাতৃচক্ষু যে সন্তানের উপর চিরজাগ্রত। মাতাই সন্তানের পালয়িত্রী রক্ষাকর্ত্রী। আমরা মোহজালে পতিত হইয়া যদি বিশ্বজননী মাকে না চিনিলাম তবে আমাদের জন্ম ও জীবনই বৃথা। মা আমার অরূপ হইয়াও কখন মাতৃরূপে কখন পিতৃরূপে আমাদের পরিপালন করিতেছেন। তিনি চির সুন্দর! চির মধুর! চির আনন্দের নিকেতন। তাঁহাকে জানিলে জীবের সকল দুঃখ দূরে যায়। এই কথা ভাবিতে ভাবিতে একটী অপূর্ব্ব আনন্দে মন উদ্ভাসিত হইল। নয়নে অশ্রুধারা বিগলিত হইল। মনে মনে ডাকিলাম মা! অধম সন্তান যেন তোমায় ভুলিয়া না যায়।

ক্রমে বেলা অধিক হইল। ক্ষুধা ও তৃষ্ণার তাড়নায় একটী চটীতে আশ্রয় লইলাম ও কিছুক্ষণ বিশ্রাম করিয়া রন্ধনের আয়োজন করিতে গেলাম। আহারের পর ক্ষণকাল বিশ্রাম করিয়া আমার এই ভাবগুলি লিখিলাম। আমি স্নান-আহার সমাপনান্তে বা কোন দিন সন্ধ্যায় দিনলিপি লিখিতাম। যাঁহারা সঙ্গে গিয়াছিলেন তাঁহারা অত্যন্ত বিষয়ী লোক। পাঁচজনে একত্র বসিলেই বিষয়ের কথা কহিতেন। হিসাবপত্র কড়াক্রান্তি কম হইলেই তাঁহাদের ঝগড়া বিবাদ বচসা চলিত। আমি একপার্শ্বে নির্জ্জনে বসিয়াই লিখিতাম। কাহারও সহিত আমার মনের মিল হইত না ও মতেরও মিল হইত না। সমধর্ম্মী ভিন্ন মতের বা মনের ঐক্য হয় না।

মানবজীবনে ধর্ম্ম। *

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ)

একদিন ধর্ম্ম ছিল মানুষের জীবনে অপাংক্তেয়। মানব ভাবিত যে, তাহার দীর্ঘ জীবন ধরিয়া যাহা কিছু পুণ্যার্জ্জন করিবে তাহার ফল পাইবে সে জীবনের পরপারে। সুবৃহৎ বেদী নির্ম্মাণ করিয়া সুবহুল দ্রব্যসমূহের আয়োজনে বেদের বিপুল বিধি-নিষেধের অনুশাসনে মানুষ দীর্ঘকাল ধরিয়া যে যাগ-যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিত তাহার প্রধান ফল সে ভোগ করিবার আশা করিত স্বর্গে বসিয়া। অরণ্যে কান্তারে গিরিগুহায় লোকচক্ষুর অন্তরালে মানুষ সুকঠোর তপশ্চর্য্যার দ্বারা জীবনকে শুষ্ক করিত ভবিষ্যতের আশায়—স্বর্গসুখের কল্পনায়। এক কথায়, তখন মানুষের এই ঐহিক জীবন তাহার নিজের দৃষ্টিতে নিতান্ত নগণ্য ও তুচ্ছ হইয়া পড়িয়াছিল। মানুষের যাহা কিছু কাম্য যাহা কিছু সাধ্য যাহা কিছু লভ্য সব যেন ঐ 'অসৌ'-লোকের ভিতরে সমাবিষ্ট। তাই মানুষ আপন অন্ধকারাবৃত জীবলোক হইতে ঊর্দ্ধমুখে কেবল ঐ জ্যোতির্ম্ময় লোকের প্রতিই আপন দৃষ্টিকে জাগ্রত রাখিয়াছিল।

কিন্তু আজ আর সেদিন নাই। এখন যুগভেদে মানুষের স্বভাব বদলাইয়া গিয়াছে। আজ মানুষ এত ঐহিক, এত বর্ত্তমাননিষ্ঠ হইয়া পড়িয়াছে যে, কেবলমাত্র ভবিষ্যতের প্রলোভনে তাহাকে আর আচার-অনুষ্ঠানে প্ররোচিত করা যায় না। মানুষের ঐহিক জীবনের ঐশ্বর্য্য অকস্মাৎ এত বাড়িয়া গিয়াছে যে, ভবিষ্যতের ভাবনা ভাবিবার সত্যই যেন তাহার আর অবকাশ মিলিতেছে না। যাঁহারা অতীতের অবলম্বিত আচারের অন্ধ অনুষ্ঠানে এখনো মানুষকে পরলোকনিষ্ঠ হইবার জন্য তাগিদ ও তাড়না করিতেছেন, ভবিষ্যতের পূজা-বেদীতলে বর্ত্তমানকে বলি দিবার আয়োজন করিতেছেন, তাঁহাদের সে সবই দিন দিন কেমন অন্তঃসারশূন্য ও ব্যর্থ হইয়া পড়িতেছে। এখন মানুষ জীবনের এত ভক্ত ও অনুরক্ত হইয়া পড়িয়াছে যে, যাহা উহার অনুকূল তাহাই তাহার গ্রাহ্য এবং যাহা প্রতিকূল তাহাই ত্যাজ্য। যাহা জীবনকে সুগঠিত সুন্দর ও শোভন করে, মানুষ আজ তাহারই অনুশীলনে রত; যাহা তাহার জীবনের বাধা ও বোঝা, নির্ম্মমভাবে তাহাকে আজ উচ্ছেদ করিতে সে বদ্ধপরিকর।

ধর্ম্ম যদি কেবলমাত্র পারলৌকিকতা হয়, মানুষের ইহজীবনের সহিত যদি উহার কোনই যোগ না থাকে, তবে বর্ত্তমানের মানুষ উহাকে বর্জ্জন করিবেই। তোমার আমার শত বাধা সত্বেও এই যুগস্রোত প্রতিরুদ্ধ হইবার নহে। আর যদি উহা সত্যই সনাতন হয়, তবে কালের অনুশাসনে উহার আবশ্যক পরিবর্ত্তন ঘটিলেও শাশ্বত সত্তার কখনও বিলোপ হইবে না।

আমরা সাধারণতঃ সংসারী লোকেরা বড়ই স্থূলদর্শী।

---

* ১৮৫০ শক ৩০শে কার্ত্তিক শুক্রবার সায়ংকালে 'বেহালা ব্রাহ্মসমাজে'র পঞ্চসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব উপলক্ষ্যে বিবৃত।

চোখের দৃষ্টিতে যাহাকে স্পষ্টরূপে দেখিতে পাই, হিসাবের জালে যাহাকে জড়াইয়া ধরিতে পারি, তাহাকেই আমরা মানি জানি ও বুঝি। যাহা সূক্ষ্ম যাহা 'হৃদা মনীষা মনসাভিক্লৃপ্তঃ' তাহাকে আমরা সব সময় ধরিতে পারি না। তাই জীবনের পথে আমরা এত ভুল করি, বার বার এত ঠকি যে তাহা বলিবার নহে। তবু কিন্তু আমরা উদ্বুদ্ধ হই না—আমাদের সত্যবোধ জাগ্রত হয় না। ছোট শিশুর মত আকাশের চাঁদকে আমাদের খেলার সামগ্রী করিতে ছুটিয়া যাই, উহাকে হাতের মুঠায় ধরিতে না পারিলে তৃপ্ত হই না—কাঁদিয়া ভাসাইয়া দিই। মানুষের জীবনে আচার-অনুষ্ঠানের বাহুল্যে ধর্ম্মের কোন স্থূলরূপ যতক্ষণ আমরা লক্ষ্য না করি ততক্ষণ আমরা কিছুতেই যেন সন্তুষ্ট হই না। যে ছেলেটী পড়িতে বসিয়া চেঁচাইয়া পাড়া সরগরম না করিল তাহার সেই পড়া যেন পড়াই নয়। তাই মানুষের বর্ত্তমান সমাজজীবনের প্রতি লক্ষ্য করিয়া বার বার আমাদের মনে এই শঙ্কা জাগ্রত হয়, বুঝি এতকালের ধর্ম্মবোধটা আজ আমাদের নিকট হইতে ধীরে ধীরে বিদায় গ্রহণ করিতেছে; আচার-অনুষ্ঠান ব্রত-উপবাস বিধি-নিয়মের প্রতি মানুষের আর সে নিষ্ঠা ও শ্রদ্ধা নাই?

কিন্তু জিজ্ঞাসা করি, আচার অনুষ্ঠান ত্যাগ করিতেছি বলিয়া কি আমরা ধর্ম্মকেও ত্যাগ করিতেছি? ধর্ম্মকে কি ত্যাগ করা যায়? নদী তাহার জলধারাকে ত্যাগ করিয়া যেমন আর নদী থাকে না, মানুষ তেমনই ধর্ম্মকে ছাড়িয়া আর মানুষ থাকে না। ধর্ম্ম যদি আমাদের জীবনের উপর প্রক্ষিপ্ত কতকগুলি বাহ্য আচারঅনুষ্ঠান হত তবে এরূপ কথনই হইতে পারিত না। কিন্তু উহা যে আমাদের জীবনের উপর দীপ্যমান সেই দিব্য আলোক, যাহার প্রভায় আমাদের সমগ্র সত্তা সূর্য্যকরোদ্দীপ্ত ক্ষুদ্র শিশিরবিন্দুর মত জ্ঞানে ও প্রেমে আশায় ও আকাঙ্ক্ষায় উজ্জ্বল হইয়া উঠে। মানবজীবনের এই অপরিহার্য্য উপাদান—শোভা ও শাশ্বত সত্যের কি কথনও বিলোপ ঘটিতে পারে? মাতা যেমন অসহায় শিশুটীকে কোলে পিঠে করিয়া আপন বুকের রসধারায় মানুষ করিয়া তুলেন, ধর্ম্ম তেমনই সকল দিক হইতে আমাদের জীবনকে আচ্ছন্ন করিয়া তাহার প্রচ্ছন্ন রসধারায় আমাদিগকে বর্দ্ধিত করিয়া তুলিতেছে, ধর্ম্ম আমাদের জীবনের সেই অতৃপ্ত আশা—অনন্তের ক্ষুধা, যাহা মানুষের সমষ্টি ও ব্যষ্টি জীবনকে কোথাও স্থির থাকিতে না দিয়া প্রতি মুহূর্ত্তে সম্মুখের অভিমুখে অগ্রসর করিয়া দেয়। কিন্তু সংশয়ী হয় তো ক্রুদ্ধ হইয়া প্রশ্ন তুলিবেন যে, ইহা মিথ্যা কথা; এই যে আমরা সবাই আপন আপন সংসারের ক্ষুদ্র গণ্ডীতে বাঁধা পড়িয়া গিয়াছি—এখানে ধর্ম্ম কোথায়? ধর্ম্ম যদি অনন্তের ক্ষুধা—ব্রহ্মজিজ্ঞাসা হয়, তবে এই ক্ষুদ্র গণ্ডীতে সত্যই কি তাহার কোন স্থান আছে? কিন্তু আমি জিজ্ঞাসা করি, আমাদের এই গণ্ডীগুলি যতই ক্ষুদ্র যতই নিরন্ধ্র হউক না কেন তবুও কি তাহার মাথার উপর আকাশের বিশালতা জাগিয়া নাই? দরজা-জানালাগুলা ইহার যতই ছোট্ট ও যতই অল্প হউক, তবু কি সেই ফাঁকে ফাঁকে অন্তর্কিতে অনন্তের আলো-বাতাস আসিয়া হাজির হয় না? আমরা বুঝি আর নাই বুঝি মানি আর নাই মানি তবু তাহা আসে। না আসিলে আমরা বাঁচিতামনা—মরিয়া যাইতাম। এই ধন-ধান্য-পুষ্পভরা বসুন্ধরার অনন্ত ঐশ্বর্য্য দেখিয়া মনে হয় এ বুঝি পৃথিবীরই একার সৃষ্টি, কিন্তু মাথার উপরের আকাশ হইতে যদি আলো-জল-বাতাস ইহার বুকের উপর ঝরিয়া না পড়িত তবে কি উহা কথনও সম্ভব হইত? তেমনই আমাদের এই জীবনের যা কিছু সৃষ্টি ও সম্পদ তার কিছুই আমাদের একার নহে। অনন্ত যখন আমাদের অন্তরকে আকুলিত ও হৃদয়কে নন্দিত করেন তখনই কবির কাব্য শিল্পীর শিল্প জ্ঞানীর জ্ঞান ও প্রেমিকের প্রেম শোভন ও সার্থক হইয়া উঠে। মানুষের সৃষ্টি যতই সান্ত ও সীমাবদ্ধ হউক তবু অনন্তের প্রেরণায় তাহার জন্ম ও অসীমের বুকে তাহার স্থিতি। এমন কি, যদি আনন্দবোধের অভাব না ঘটে—জীবন যদি শীর্ণ ও শিথিল মনে না হয় তবে বুঝিব যে আমাদের এই অতি তুচ্ছ দৈনন্দিন সংসারযাত্রার মাঝেও আমরা সেই অনন্তেরই স্পর্শলাভ করিতেছি। বনস্পতির সহিত তুলনায় তৃণাঙ্কুর যতই ক্ষুদ্র হউক তবু কি তার মাথার উপর সেই এক অনন্ত আকাশই নামিয়া আসে নাই? মানুষ অন্ধকারকে ভয় করে; সে আলোর উপাসক, তাই তাহার প্রার্থনা—'তমসো মা জ্যোতির্গময়'। তাই সে সবিতৃদেবতার বিশ্বব্যাপী বরেণ্য ভর্গকে ধ্যান করে, উহাই তাহার বুদ্ধিবৃত্তিকে উদ্বুদ্ধ ও হৃদয়কে উদার করে।

বনস্পতি যেমন আপন সহস্র পত্রপুটে সূর্য্যরশ্মি পান করিয়া বুকের মধ্যেই উহাকে সঞ্চিত করিয়া রাখে, আমরাও তেমনি 'যস্য ভাসা সর্ব্বমিদং বিভাতি' সেই জ্যোতির্ম্ময় পুরুষের পুণ্যস্পর্শ লাভ করিয়া, আমাদের অন্তরের গোপন গুহায় জ্ঞানের প্রেমের প্রাণের অগ্নি নিত্য জালিয়া রাখিয়াছি। এ অগ্নির যাহা উপকরণ—যাহা ইন্ধন তাহা তুচ্ছ ও নগণ্য হইতে পারে, কিন্তু অগ্নি তুচ্ছ নহে; উহা 'দীপ ইব প্রদীপাৎ' সেই পরম পুরুষের নিকট হইতেই লব্ধ। তাই তো উহার শিখা সদাই ঊর্দ্ধমুখী। উহাকে 'অধঃকৃত' করিলেও 'নাধঃ শিখা যাতি কদাচিদেব'। উহার শিখা কথনও অধোমুখী হয় না, সে সদা আপন ব্যগ্র বাহুকে অনন্তের অভিমুখেই

উদ্যত রাখে। এই জন্যই তো একটা তুচ্ছ বালুকণাকেও কেন্দ্র করিয়া যখন জ্ঞানের অগ্নি জ্বলিয়া উঠে তখন সে আপন দিব্য বিভায় জ্ঞাতা ও জ্ঞেয় উভয়কেই ধন্য করে; অতি কুৎসিৎ ও রুগ্ন সন্তানকেও ঘিরিয়া মায়ের হৃদয়ে যে কি অপূর্ব্ব প্রেমের আলো জ্বলিয়া উঠে তাহার দৃষ্টান্ত কি আমরা ঘরে ঘরে পাই না? আর প্রাণের আগুনে দগ্ধ হইয়া কেমন করিয়া যে মাটি-জলের এই পাঞ্চভৌতিক অপূর্ব্ব পরিণাম ঘটে তাহা কি সত্যই বিস্ময়ের বিষয় নহে?

এইরূপ, কেবল জীবনে নহে, জগতের যখন যেদিকে তাকাই, দেখি যে অনন্ত পুরুষ তাঁহার ভুবনজোড়া আসনখানি বিছাইয়া বসিয়া আছেন, সূর্য্যচন্দ্রগ্রহতারকায় তাঁর আসনখানি যেমন ভুবনজোড়া অতি তুচ্ছ এক বালুকণায়ও উহা তেমনই ভুবনজোড়া। শিশিরে সাগরে তিনি সমান। কোথাও তিনি ছোট হইয়া যান নাই, অংশ হইয়া পড়েন নাই। পূর্ণ যিনি, এক যিনি, অনন্ত যিনি তাঁহার তো কখনও খণ্ড বা অংশ হইতে পারে না। 'পূর্ণস্য পূর্ণমাদায় পূর্ণমেবাবশিষ্যতে'। যেমন প্রত্যেকেরই আমাদের মনে হয়, যে সীমাহীন প্রসারের মাঝে চন্দ্র-সূর্য্য-গ্রহতারকাগুলি ধূলিকণার মত ইতস্ততঃ ঘুরিয়া ফিরিয়া বেড়াইতেছে সেই আকাশ যেন আমাকেই কেন্দ্র করিয়া দশ দিকে প্রসারিত হইয়া গিয়াছে—আমিই উহার মধ্যবিন্দু, অথচ একের অনুভূতির সহিত অপরের অনুভূতির বাস্তবক্ষেত্রে কোনও বিরোধ ঘটিতেছে না; ঠিক তেমনই কোনরূপ অসঙ্গতির সৃষ্টি না করিয়াই অনন্ত পুরুষ স্বীয় অনন্ত ভাবে এই জগৎ ভরিয়া রাখিয়াছেন।

এমন করিয়া চাহিবার আগেই যদি তাঁহার সবখানি নিঃশেষে বিলীন হইয়া গিয়া থাকে তবে আমাদের আর কি করিবার রহিল? মানুষের কি কোন সাধনা নাই? হাঁ আছে বৈকি। দাতা তো না চাহিতেই দিয়াছেন। আমাদের যে এখনও পাওয়া হয় নাই—তাঁহার ভুবনজোড়া আসনখানিকে যে এখনও হৃদয়মাঝে আনা হয় নাই। ইহাই মানবজীবনের সাধনা—গ্রহণ করা, বিছান স্বীকার করিয়া লওয়া; দুঃখে সুখে, হর্ষে বিষাদে, ব্যথায় বেদনায় তাঁহাকে পাওয়া—মানিয়া লওয়া। যেমন অম্বর ও অবনীর সুগম্ভীর অন্তর দিগন্তে অনন্তের বুকে ধীরে ধীরে মিলাইয়া গিয়াছে, তেমনই ভূমার মাঝে ব্রহ্মের মাঝে আমাদের সাধ্য ও সাধনা এক হইয়া অভিন্ন হইয়া গিয়াছে। এখানে সাধনা ও সাধ্যে কোনও ভেদ নাই—উভয়ই পাওয়া।

হে বিশ্বব্যাপী! হে অনন্ত, হে ভূমা, তোমার কাছে অধিক আর কি প্রার্থনা করিব, তুমি তো নিঃশেষে তোমার সকলই আমাদিগকে বিলাইয়া দিয়াছ; এখন আশীর্ব্বাদ কর, আমরা যেন তোমার এই অযাচিত দানের মর্য্যাদা রক্ষা করিতে পারি—উহাকে যথাযথভাবে গ্রহণ করিতে পারি। আমাদের অন্তরে ধর্ম্মের সেই অনির্ব্বাণ শিখা জ্বলিয়া উঠুক, যাহা সম্পদে বিপদে, সুদিনে দুর্দ্দিনে, আলোয় অন্ধকারে চিরদিন তোমাকেই আমাদিগকে চিনাইয়া দিবে।

প্রভাতী—বন্দনা।

আশাবরী—তেওরা।

মঙ্গলোজ্জ্বল উদারগীতি পূরিত মহাগগন
সুপ্রভাত! প্রণিপাত, বিশ্বনাথ, হে ভবখণ্ডন
অরুণালোকপ্লাবিত অম্বর তলে
গলিত-স্বর্ণ-রঞ্জিতধারা তটিনী চলে
গাহে বিহঙ্গ বৈতালিক দলে জয় জয় বিশ্বপালন।
উদ্ভাসিত হসিত প্রকৃতি
গীতিমুখরিত করে আরতি
প্রথমাঞ্জলি প্রথম প্রণতি
পুলকে করিছে অর্পণ
ফুল্লকুসুম মন্দ সমীরে
প্রণতি করিছে অবনত শিরে
সকল কণ্ঠে গাহে গম্ভীরে
জয় জয় জগবন্দন

সহজ ব্যায়াম প্রণালী।

(শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেনগুপ্ত, বি-এ)

"স্বাস্থ্যই সুখ, সুখই স্বাস্থ্য," এ কথা বুঝেন দুই ব্যক্তি—এক, যিনি যত্ন পূর্ব্বক স্বাস্থ্য লাভ করিয়াছেন, আর যিনি স্বাস্থ্যলাভ করিয়া তাহা হেলায় হারাইয়াছেন। যদি বল স্বাস্থ্য দ্বারা ধর্ম্ম, অর্থ, কাম ও মোক্ষ সকলই লাভ হয় তাহা হইলেও আপত্তির কাহারও কোন কারণ দেখি না। বক্তৃতা করিয়া স্বাস্থ্য-সুখ বুঝান দায়। স্বাস্থ্যবান্ ব্যক্তির মনের উল্লাস দেখিয়া হিংসা করিয়া কোন লাভ নাই। চেষ্টা ও যত্ন করিলে সকলের পক্ষে স্বাস্থ্যলাভ সম্পূর্ণ সম্ভব—এই আশার বাণী বজ্রগম্ভীর স্বরে জগতের নিকট প্রচার করা আবশ্যক। চেষ্টা ও যত্ন করার অর্থ—নিয়মিত ব্যায়ামচর্চ্চা করা। ব্যায়াম জন্ম হইতে মৃত্যু পর্য্যন্ত সর্ব্বদা সকল ব্যক্তির পক্ষে সম্ভব এবং অবশ্য কর্ত্তব্য। ব্যায়াম প্রকৃতির অলঙ্ঘ্য নিয়ম এবং মানবের একমাত্র সুখের নিদান। যে কোন বয়সে ব্যায়াম করিলেই নিশ্চয় সুফল ফলে। "৩৫ বৎসরের পরে শরীরের আর বৃদ্ধি হয় না" ইহা মূর্খের উক্তি। ৫০ বৎসর বয়সে

ব্যায়াম আরম্ভ করিয়া ৭২ বৎসর বয়সে আমেরিকার বিখ্যাত স্বাস্থ্যবিদ ম্যানফোর্ড বেনেট্ নব যৌবন লাভ করিয়াছেন। তিনি এখনও জীবিত। তৎপ্রণীত "Old age, its cause and prevention"—"বার্দ্ধক্য, ইহার কারণ ও প্রতিকার" নামক পুস্তকখানি পাঠ করুন, যদি এ বিষয়ে কাহারও কোন সংশয় থাকে তাহা দূরীভূত হইবে। তাঁহার এই পুস্তকখানার মূল্য ১৪৲ টাকা, সুতরাং সাধারণের পক্ষে ক্রয় করা কঠিন। আমেরিকা ও ইউরোপে উহার বহু সংস্করণ বিক্রীত হইয়াছে, আমাদের দেশেরও বড় লোকেরা অনেকে এই পুস্তক আগ্রহে ক্রয় করিয়াছেন। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে তাঁহার প্রদত্ত সকল যুক্তি তর্কের অবতারণার স্থান হইবে না। শুধু তাঁহার আবিষ্কৃত, অভিনব ব্যায়ামপদ্ধতির সঙ্ক্ষিপ্ত বিবরণ প্রদান করা যাইবে। যাহারা কথা চান না, কাজ চান, তাহাদের পক্ষে ইহাই পর্য্যাপ্ত। এতদ্ব্যতীত অত্যাবশ্যকীয় কতকগুলি স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়ম সন্নিবেশিত হইল। সকলকেই হাত ধরিয়া বলিতে ইচ্ছা হয়, "ভাই, মাত্র একমাস কাল এই পুস্তকের নিয়মাবলী ও ব্যায়াম প্রণালীর অনুসরণ করিয়া দেখ, আশানুরূপ উপকার পাইবে। একবার মন খাঁটি করিয়া লাগিয়া যাও।" বৈষ্ণব ভক্ত সকলকে বিনয় করিয়া বলিয়া থাকেন, "ভাই, তোর হাতে ধরি হরিবোল, তোর পায়ে ধরি হরিবোল।" এই জাতীয় অধঃপতনের দিনে, আমিও ততোধিক বিনয়ের সহিত সকলকে বলিতেছি, "ভাই, তোমার হাতে ধরি ব্যায়াম কর, তোমার পায়ে ধরি ব্যায়াম কর। তোমাদের মুখভরা হাসি দেখিয়া জীবন ধন্য করি।"

কোন্ ব্যায়াম সর্ব্বোত্তম—মানব শিশুকালে যেরূপ দ্রুত বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে হাঁটিতে চলিতে আরম্ভ করিলে তদ্রূপ হয় না কেন? আমরা কি কখনও এ বিষয়ে চিন্তা করিয়া দেখিয়াছি? চিন্তা করিলে স্বতঃই আমাদের এ প্রশ্ন উঠে না কি যে—শিশু কি কোন ব্যায়াম করে?

আমরা সকলেই অবগত আছি যে, সকল দেশের সকল শিশুই শয্যায় থাকিয়া এপাশ ওপাশ করে, বাঁকা হয়, হাত পা ছোড়ে; ইহারই বা অর্থ কি? তবে কি তাহাদের ঐ সকল অঙ্গ চালনার মধ্যে কোন নিয়ম, কোন ধারা আছে? নিশ্চয় আছে। যিনি শিশুদের এই চরিত্র লক্ষ্য করিয়াছেন তিনি বুঝিতে পারিয়াছেন, তাহারা ঐ অঙ্গভঙ্গী অযথা করে না। ঐরূপ করিয়াই তাহারা ব্যায়াম করে। এই ব্যায়ামপ্রণালীই, বিধি-নির্দ্দিষ্ট সর্ব্বোত্তম ব্যায়ামপ্রণালী। শিশুদের হৃৎপিণ্ডে সমধিক জোর থাকায় এবং মাংসপেশী ও অঙ্গপ্রত্যঙ্গ খুব কোমল থাকায় তাহারা অতি দ্রুত ঐ ব্যায়াম করিয়া যায়, আমরা ধরিতে পারি না। কিন্তু একজন ধরিয়াছেন, তিনি জগতে এক নূতন বার্ত্তা প্রচার করিয়াছেন, তাঁহারই নাম মহাত্মা ম্যানফোর্ড বেনেট্। এই ক্ষুদ্র প্রবন্ধে সেই তত্ত্বেরই আলোচনা করা হইয়াছে।

অন্য পক্ষে, যে ব্যায়ামে ক্লান্তি বোধ হয় না, শরীর অবসাদগ্রস্ত হয় না, বিনা ব্যয়ে, বিনা যন্ত্রের সাহায্যে সর্ব্বদা, সর্ব্বত্র, সকলে যাহা করিতে পারে তাহা হইতে শ্রেষ্ঠতর ব্যায়ামপদ্ধতি আর কি হইতে পারে? অধিকন্তু, যাহা প্রকৃতি হইতে লব্ধ, তাহাই বরণীয়, তাহাই গ্রহণীয় তাহাই পালনীয়।

এই ব্যায়াম করিতে কাহারও দ্বারস্থ হইতে হইবে না। নিজ শয্যায় আরামে শয়ন করিয়া, নিদ্রাভঙ্গের সঙ্গে সঙ্গে আস্তে আস্তে অধ্যবসায় ও অনুরাগের সহিত করিয়া গেলেই সুফল আসিতে বাধ্য।

ব্যায়াম করিবার স্থান ও সময়।—নিদ্রাভঙ্গ হইবামাত্র শয্যায় থাকিয়া এই ব্যায়াম আরম্ভ করা যায়। তবে হাত মুখ ধুইয়া, শৌচ ও উপাসনাদি সমাপনান্তে করাই সঙ্গত। ব্যায়াম কালে দরজা, জানালা খুলিয়া রাখা উচিত, যাহাতে মুক্তবায়ু এমন কি সূর্য্যালোক গৃহ মধ্যে প্রবেশ করিতে পারে।

অবশ্য পালনীয় উপদেশ।—১। আমরা ব্যায়াম করি পেশীর। পেশী সবল হইলেই শরীর সবল হয়। এই নিমিত্ত শরীরের কোন্ স্থলে কোন্ পেশী আছে জানা কর্ত্তব্য।

২। যে পেশীর ব্যায়াম করা হইতেছে, সেই দিকে মনোযোগ দিতে হইবে।

৩। ব্যায়ামগুলি তাড়াতাড়ি করিয়া যাওয়া কোন কাজের নহে; একটী একটী করিয়া ধীরে ধীরে করিতে হইবে।

৪। প্রথমেই সকলগুলি আরম্ভ করা ভাল নয়। ৩।৪টী করিয়া অভ্যাস করিয়া নিতে হইবে।

৫। যে ধারায় ব্যায়ামগুলি লিপিবদ্ধ করা হইয়াছে, তাহাই অনুসরণ করা যুক্তিযুক্ত। তবে নিজ নিজ আবশ্যক বুঝিয়া কোনটী বাদ দেওয়া বা কম করিয়া করা যাইতে পারে।

৬। নিজ মস্তিষ্ক হইতে নূতন কোন প্রক্রিয়া আবিষ্কার করার কোন দরকার নাই, যাহা প্রয়োজন ও আবশ্যক তাহা সকলই ইহাতে আছে।

৭। প্রথমে এক একটী প্রক্রিয়া ৫ বার করিয়া করিবে, পরে ক্রমে বৃদ্ধি করিবে। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার সংখ্যা গণিবে। যাহাতে কম বেশী হয় না, অথচ মনোযোগ বদ্ধমূল হয়।

৮। ব্যায়ামকালে মুখ দিয়া শ্বাসপ্রশ্বাস করা একেবারেই নিষেধ।

৯। মধ্যে মধ্যে গভীর শ্বাস গ্রহণ করিতে হয়।

১০। ব্যায়ামান্তে ঈষৎ উষ্ণ জলে স্নান করিলে ভাল হয়। কিন্তু অধিকক্ষণ জলে থাকিবে না, নামিয়াই উঠিয়া পড়িবে।

ইচ্ছাশক্তি।—সকল কার্য্যের সাফল্য নির্ভর করে ইচ্ছাশক্তির উপর। ব্যায়ামেও যত ইচ্ছাশক্তি প্রয়োগ করা যায় ততই শীঘ্র ও সহজে উন্নতি হয়। এই ইচ্ছাশক্তিও পরিচালনা দ্বারা ক্রমে বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়। মন লিপ্ত না থাকিলে, যে কোন কাজ করা যায় তাহাতে ফলোদয় হয় না। আমাদের মানসিক অবস্থার উপর স্বাস্থ্য বহুল পরিমাণে নির্ভর করে। এই বোধ যাহার আছে, সে কখনও নিজেকে বৃদ্ধ, অক্ষম, অকর্ম্মণ্য মনে করে না। বয়সে বৃদ্ধ করে না, মনে বৃদ্ধ করে। লোক যেমন ভাবে তেমনই হইয়া যায়। যখন যে অঙ্গের বা পেশীর ব্যায়াম করিবে, তখন সেই দিকে মনঃস্থির করা সর্ব্বোতোভাবে কর্ত্তব্য।

কেন আমরা বৃদ্ধ হই।—আমাদের ধমনী ও শিরার মধ্যে কতকগুলি তলানি পড়ে; এ গুলি যতই জমা হয় ততই আমাদের শরীরের নমনীয়তা অর্থাৎ প্রয়োজন মত সঙ্কোচন-প্রসারণ শক্তি কমিতে থাকে, অথবা আমরা বৃদ্ধত্ব বা জড়ত্ব প্রাপ্ত হই। বৃদ্ধত্বটা ব্যাধিবিশেষ। বাষ্পীয় যন্ত্রের বয়লারের গায়ে যেমন এক প্রকার চূর্ণময় বহিরাবরণ পড়ে, আমাদের দেহযন্ত্রেও সেই জাতীয় একটা তলানি পড়ে। এই তলানিগুলির মধ্যে মরা মাংসতন্তু থাকে। ব্যায়াম দ্বারা এগুলি দূর হইয়া যায়। সুতরাং ব্যায়াম করিলেই সবল ও সুস্থ হওয়া যায়, বার্দ্ধক্য অকালে আসিয়া গ্রাস করে না, দীর্ঘজীবন লাভ করা যায়—ইহাতে আর সন্দেহ কি ?

মানবের, বিশেষতঃ হিন্দুর, ন্যূনকল্প বয়স একশত বৎসর। সকলের তৎপ্রতি লক্ষ্য রাখা কর্ত্তব্য। আমার এই ধারণা ক্রমে বদ্ধমূল হইতেছে যে শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করা কঠিন নহে। এই বিষয়ে কাহারও নিরাশ হওয়ার কোন হেতু নাই।

কি উপায়ে স্বাস্থ্য লাভ হয় ?—প্রকৃতির নিয়ম পালনে স্বাস্থ্যলাভ হয়। স্বাস্থ্য কিনিতে পাওয়া যায় না। কোন ঔষধ খাইলেও স্বাস্থ্যলাভ হয় না। বরং ঔষধ যত না খাইয়া পারা যায় ততই মঙ্গল। বিশেষ এলোপ্যাথিক ঔষধ।

স্বাস্থ্যের উপাদান কি ?—সূর্য্যালোক, বিশুদ্ধ জল বায়ু, পুষ্টিকর খাদ্য, পরিচ্ছন্নতা ও নিয়মিত ব্যায়াম

স্বাস্থ্যরক্ষার সাধারণ নিয়মাবলী।—১। আর ম্যান্ প্রবচন—"If you rest you rust",—আলস্য করিলেই শরীরে মরিচা ধরে, অর্থাৎ শরীর নষ্ট হয়, কর্ম্মশক্তি নষ্ট হয়।

২। মনের উৎকর্ষ সাধন করা চাই। শরীর ও মনের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক। একের অধঃপতনে অপরের অধঃপতন অবশ্যম্ভাবী। সুতরাং দৈহিক ব্যায়ামের সঙ্গে সঙ্গে মানসিক ব্যায়ামের ব্যবস্থা করা করা আবশ্যক, অর্থাৎ কোন সুখকর, স্বাস্থ্যকর ব্যাপারে মনটাকে নিযুক্ত রাখা কর্ত্তব্য। নিজ নিজ রুচি অনুসারে ইহার বিধান। মূলকথা, পাঠ দ্বারা ও সৎসঙ্গের দ্বারা মনটি সর্ব্বদা স্ফুর্ত্তিযুক্ত রাখা প্রয়োজন।

৩। "Shut your lips and live long"—ইহার অর্থ কেবল কথা কম বলা নহে; নাসিকা দ্বারা শ্বাস প্রশ্বাস করা। তাহাতে দীর্ঘ জীবন লাভ হয়।

৪। সর্ব্ব বিষয়ে মিতাচারে সুখ, অমিতাচারে দুঃখ। ইহা বিধাতার নিয়ম, লঙ্ঘন করিলেই শাস্তি।

৫। দাঁত সর্ব্বদা পরিষ্কার রাখা কর্ত্তব্য। লোকে দাঁত থাকিতে তাহার মর্য্যাদা বুঝে না। নিম, আঁটাদি কিম্বা অন্য কোন কোমল কুঁচি-বিশিষ্ট ডাল দিয়া উত্তমরূপে দাঁত মাজা কর্ত্তব্য। দিনে দুইবার মাজিলে ভাল হয়। আহারান্তে ভাল করিয়া দন্তধাবন ও মুখ প্রক্ষালন করা কর্ত্তব্য, যেন খাদ্য দ্রব্যের অংশ দাঁতের মধ্যে না থাকে। তাহা দূরীকরণার্থ খড়কে ব্যবহার করা উচিত। শয়নের পূর্ব্বে বেশ করিয়া মুখ ধুইয়া শুইতে হয়।

৬। যকৃৎ আমাদের পরিপাকক্রিয়ার সাহায্য করে। উহার কার্য্যের উপর আমাদের স্বাস্থ্য বহু প্রকারে নির্ভর করে। যে ঋতুতে যে খাদ্য খাইলে, উহার কার্য্য ভাল হয় তাহা খাইতে হয়। যকৃতের ৩টী ব্যায়াম যত্নপূর্ব্বক করিতে হইবে। ঐ ব্যায়ামগুলি খালি পেটে করা দরকার।

৭। কোষ্ঠকাঠিন্য থাকিলে শয়নের পূর্ব্বে ও প্রত্যূষে এক এক গ্লাস ঠাণ্ডা জল পান করিবে। জল অধিক খাইলে কোন ক্ষতি নাই। অধিক পরিমাণে জল খাইয়া একটু হাঁটিয়া আসিলে কোষ্ঠশুদ্ধি হইবেই। আর কোষ্ঠশুদ্ধি হওয়া খুবই প্রয়োজন।

৮। স্নানকালীন উত্তমরূপে গাত্র মার্জ্জন কর্ত্তব্য। লোমকূপে যেন ময়লা না জমে। মধ্যে মধ্যে সাবান ব্যবহার করাও ভাল। আমাদের দেশের সরিষার তেল সাবানের কাজ করে। তেল খুব মালিশ করিবে, কিন্তু ভাল করিয়া ধুইয়া তুলিয়া দিবে।

৯। বাত রোগে বা পায়ের পেশীর-শিরা-স্ফীতিতে উত্তমরূপে মর্দ্দন, ঘর্ষণ ও প্রচাপনেই উপকার হয়।

১০। কখনই মলমূত্রের বেগ ধারণ করিবে না।

১১। যত অধিকক্ষণ মুক্ত বাতাসে ও সূর্য্যালোকে থাকা যায় ততই ভাল।

১২। ব্যায়ামান্তে মুক্ত বাতাসে দাঁড়াইয়া গভীর শ্বাস গ্রহণ পূর্ব্বক আস্তে আস্তে তাহা ত্যাগ করিবে। ইহাতে বক্ষ বিস্ফারিত ও রক্ত বিশুদ্ধ হইবে।

১৩। সর্দ্দি, কাশী হইলে ২।৩ দিন উপবাসই সর্ব্বোত্তম ঔষধ। উপবাস অনেক ব্যাধিরই ঔষধ। উপবাসান্তে প্রথম দিন লঘু আহার করিবে, নতুবা কুফল হইবার আশা। উপবাসে শরীর ক্ষীণ হইবার কারণ নাই। মনে করিতে হয়, ইহাই ঔষধ ও পথ্য। মনের ঐ ভাব আসিলে উপবাসেই উপকার হয়।

১৪। চুল খাট করিয়া কাটিবে, তাহাতে শরীর ভাল থাকে। চুলের মধ্যে অঙ্গুলি প্রবেশ করাইয়া দিয়া উহা বেশ করিয়া টানিবে এবং মাথার চামড়া অঙ্গুলি দিয়া টিপিয়া দিবে।

১৫। আহারান্তে ১০।১৫ মিনিট বিশ্রাম না করিয়া কোন কাজ করিবে না।

১৬। সন্ধি-সময়ে আহার করিবে না।

শয্যাব্যায়াম প্রণালী।—(Bed Exercises)।

পর্য্যায়ক্রমে সংকোচন ও শিথিলীকরণ সকল ব্যায়াম প্রক্রিয়ার মূলমন্ত্র। প্রত্যেক প্রক্রিয়ার পূর্ব্বে কোন্ পেশীর ব্যায়াম তাহা উল্লেখ করা হইয়াছে। ব্যায়াম কালে তৎপ্রতি মন স্থির করিতে হইবে।

১। তল পেট।—মাথার নীচে বালিশ দিয়া, চিৎ হইয়া শরীর সোজা করিয়া শয়ন করিয়া প্রথমে এক পায়ের হাঁটু ভাজিয়া, তৎসহ সেই দিকের নিতম্ব উপরের দিকে আকুঞ্চন করিবে। তৎপর সেই পা ছড়াইয়া দিয়া, অপর পা ভাজিয়া উক্তরূপ প্রক্রিয়া করিবে। এই প্রক্রিয়ায় উত্তম কোষ্ঠশুদ্ধি হয়।

২। কটিদেশ বা কোমর।—চিৎভাবে শয়ন করিয়া হাত ভাঁজ করিয়া বক্ষোপরি রাখ। ঘাড় ও মাথা বালিশ হইতে ঈষৎ উপরে তোল, তৎপর এক পাশের দিকে যতদূর নোয়ান সম্ভব নোয়াও, পুনরায় অপর পাশে নোয়াও।

৩। পেট।—চিৎ হইয়া শয়ন করিবে, ঘাড় ও মাথা তুলিলেই পেট শক্ত হইবে। তখন উভয় হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া, পেটের উপর সর্ব্বত্র, ক্ষিপ্র এবং লঘু আঘাত করিবে, মস্তক নত করিলেই পেট স্বাভাবিক অবস্থায় আসিবে। উভয় অবস্থায়ই আঘাত করিবে অর্থাৎ একবার শক্ত করিয়া, পুনরায় নরম করিয়া আরম্ভে ২৫ বার আঘাত করিবে। পরে ১০০ বার পর্য্যন্ত করিতে পার। ইহাতে অজীর্ণতা দূর করে।

যাহাদের পেট মোটা, চর্ব্বিময় তাহাদের পক্ষে এই ক্রিয়া অন্তে হাতের তলা দিয়া, উপর হইতে নীচে, নীচ হইতে উপরে জোরে মর্দ্দন করিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য, তাহাতে চর্ব্বি দূর হইবে।

৪। স্কন্দেশ।—চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া বামহাতে ডান কনুই ধরিবে, ডানহাতে বাম কনুই ধরিবে, হাতে জোর দিয়া চাপিবে। একবার ছাড়িবে, আবার চাপিবে, ইহাতে স্কন্ধ প্রশস্ত হইবে।

৫। অংসফলক বা স্কন্ধফলক। চিৎ হইয়া শয়ন কর। হস্ত মুষ্টিবদ্ধ কর। মুষ্টি নাকের দিকে থাকিবে এবং কনুই উপরে থাকিবে। পরে কনুই বুকের দিকে আঘাত কর। ইহাতে স্কন্ধফলক বিস্ফারিত হইবে উভয় হাতে সমান সংখ্যক আঘাত করিবে।

৬। ঘাড় ও পেট।—চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া মস্তক ও ঘাড় একবার উত্তোলন করিবে, পুনরায় শয়ন করিয়া শিথিল করিবে। ইহাতে ঘাড়ের পিছনের দিকের ও পেটের পেশী দৃঢ় হইবে।

৭। ঘাড়ের পশ্চাদ্দিকে।—চিৎ হইয়া শয়ন কর। একহাতের আঙ্গুল অপর হাতের আঙ্গুলের মধ্যে প্রবেশ করাইয়া, উভয় হাত দিয়া মাথার নীচে ধর। এখন হাত দিয়া মাথা উপরে তুলিতে চেষ্টা করিবে, কিন্তু ঘাড়ে জোর দিয়া পশ্চাতে চাপিয়া রাখিবে। ইহাতে ঘাড়ে বলাধান হইবে।

৮। গলদেশ বা কণ্ঠ।—চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া কাঁধের নীচে বালিশ রাখিয়া, মস্তক ঝুলাইয়া যতদূর পিছনে নিতে পারা যায় নিবে, পুনরায় তুলিয়া সম্মুখে আনিবে।

৯। হস্ত।—এই প্রক্রিয়া লঘু ডাম্বেল সহযোগেও করা যায়। খালি হাতেও করা যায়। চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া এক হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া বক্ষের সমান্তরাল ভাবে উপরে ছুড়িবে, তৎপর আস্তে আস্তে জোর দিয়া ভাজিবে। পুনরায় অপর হস্ত ছুড়িবে। উভয় হস্তের কার্য্য শেষ হইলে, হস্তদ্বয় পার্শ্বদ্বয়ের সমকোণে প্রসারিত করিয়া মুষ্টি বদ্ধ করিয়া কব্জি ইতস্ততঃ ঘুরাইবে। ঐরূপ করিলে স্কন্ধাস্থি কোটর মধ্যে ঘুরিবে।

১০। বাহু মর্দ্দন।—চিৎ হইয়া শয়ন করিয়া, এক হস্ত বাহুর উপরিভাগ জোরে ধরিবে এবং যে হাত ধরিলে সেই হাত বলপূর্ব্বক ঘুরাইয়া নিবে। উভয় হস্তে ঐরূপ করিবে।

১১। লিভার বা যকৃত প্রচালন।—লিভারের স্থান পেটের ডান দিকে, মাজার হাড়ের উপরে, শেষ পাঁজরার হাড়ের নীচে।

চিৎ হইয়া, হাঁটু উপরে তুলিয়া পেট নরম করিবে। উভয় হাতের আঙ্গুল দিয়া, ডান দিকে, পাঁজরার হাড়ের নীচে, উপরের দিকে, একবার চাপিবে আবার ছাড়িবে

এই ভাবে প্রথমে ২০ বার করিবে। ক্রমে বৃদ্ধি করিয়া ১০০ বার পর্য্যন্ত টিপিবে ও ছাড়িবে।

১২। গলদেশ—কাত হইয়া শয়ন করিয়া নীচের হাতের বুড়ো আঙ্গুলের মাথা গলার উপরে থুতনী বা চিবুকের ঠিক নীচে রাখিয়া, মস্তক যতদূর পশ্চাতে নিতে পার নিবে, পুনরায় সম্মুখে আনিবে. চিবুক যেন বুকের সঙ্গে প্রায় লাগে। মস্তক পিছনে নিলে গলায় জোর পড়িবে, সমানে আনিলে ঢিল পড়িবে। আঙ্গুলের চাপ যেন সকলই সময় ঠিক থাকে। এক পাশের কাজ হইয়া গেলে অপর পাশে ফিরিয়া ঐরূপ করিবে।

১৩। গলা ও ঘাড়ের পার্শ্বদেশ।—কাত হইয়া শয়ন করিয়া চিবুক উপরের স্কন্ধের দিকে বাঁকা করিয়া যতদূর তুলিতে পার তুলিবে, পুনরায় নামাইবে। উভয় পার্শ্বে করিবে।

১৪। সর্ব্ব শরীর খিচন।—কাত হইয়া শুইয়া, হাত ভাজ করিয়া বুকের উপর রাখিয়া এক হাতে অপর হাতের কনুই ধরিবে। মস্তক পিছনের দিকে সমস্ত শরীর টান করিবে। এই ভাবে থাকিয়া হাতে জোর দিবে ও ঢিল দিবে। জোর দিবার সময় সর্ব্বশরীর টান করিবে, যেন শক্ত হইয়া যায় এবং তদবস্থায় ২।৩ সেকেণ্ড রাখিয়া ঢিল দিবে। উভয় পার্শ্বে করিবে।

১৫। পার্শ্ব ও কটি।—কাত হইয়া শুইয়া, মস্তক ও উভয় পা এক সঙ্গে উপরের দিকে তুলিবে। পা একটু ভাঙ্গিয়া নিতে হইবে। উভয় দিকে করিবে।

১৬। অংশফলক অর্থাৎ ঘাড়ের নীচে, পশ্চাদ্দিকে উভয় পার্শ্বে যে পেশী আছে।

চিৎ হইয়া শুইয়া, পর্য্যায়ক্রমে স্কন্ধ উপরের দিকে তুলিবে। যে স্কন্ধ তুলিবে সেই হাতের মধ্যদেশ অপর হাতে ধরিয়া নিলে সুবিধা হয়।

১৭। নিতম্ব ও কটি।—কাত ভাবে শুইয়া উপরের নিতম্ব সম্মুখ দিকে চাপিবে, তৎসহ বাহু বক্র করিয়া যতদূর পশ্চাদ্দিকে নিতে পার নিবে। পা একটু ভাঙ্গা অবস্থায় থাকিবে। উভয় দিকে করিবে।

১৮। সম্মুখ বাহু (fore arm)।—কাত হইয়া শুইয়া, নীচের হাতের কব্জি, উপরের হাতে ধরিয়া, নীচের দিকে চাপিবে, কিন্তু নীচের হাতে জোর দিয়া বাধা দিবে। উভয় দিকে করিবে।

১৯। বাহুর পশ্চাতের পেশী।—কাত হইয়া শুইয়া, নীচের হাত দিয়া, হাতের কাঁধ ও কনুইর মধ্যস্থল শক্ত করিয়া ধর। উপরের হাত উপরের দিকে টান, নীচের হাতে নীচের দিকে টানিয়া বাধা দাও। উভয় হাতে কর।

২০। হস্ত, স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ।—কাত হইয়া শুইয়া, উপরের হাত দিয়া উপরের পায়ের হাঁটুর নীচ ধরিয়া সবলে টান। পা ভাঙ্গিয়া শয়ন করিবে। উভয় দিকে কর।

২১। স্কন্ধ ও পৃষ্ঠ।—কাত হইয়া শুইয়া, উভয় হাতে পায়ের হাঁটুর নীচ ধরিয়া টান। উভয় দিকে কর।

২২। যকৃৎ।—ডানকাৎ হইয়া শুইয়া বামহাতে যকৃৎ বেশ করিয়া টিপিয়া দাও।

২৩। পায়ের ডিম। চিৎ বা অর্দ্ধ কাত হইয়া শুইয়া, এক পায়ের পাতার অগ্রভাগ অপর পায়ের মাথায়, ডিমটার উপর রাখিবে। নীচের পা শক্ত কর এবং উপরের পায়ের মাথা দিয়া নীচের দিকে চাপ দাও। উভয় পায়ে কর।

২৪। যকৃৎ।—বামকাতে শয়ন করিয়া, ডান হাতে যকৃতের উপর আস্তে আস্তে কিল দাও।

২৫। বাহু মোচড়ান।—কাত হইয়া শুইয়া, উপরের হাত শরীরের উপর দিয়া মেলিয়া দিয়া, ইতস্ততঃ মোড়াও। উভয় হাতে কর।

২৬। বাহু।—কাত হইয়া শুইয়া, নীচের হাত দিয়া উপরের হাতের কব্জি ধর। উপরের হাত উপরের দিকে টানিয়া ছাড়াইয়া নিবার চেষ্টা কর, নীচের হাতে শক্ত করিয়া রাখ। উভয় হাতে কর। হাত চিৎ করিয়া ও কাত করিয়া উভয় প্রকারেই ধরিবে।

২৭। পায়ের ডিম। কাত হইয়া শুইয়া, উপরের পায়ের গোড়ালি যতদূর নীচের দিকে দিতে পার দিবে। ইহাতেই পায়ের ডিম শক্ত হইবে। ঐ ভাবে নীচের দিকে সবলে লাথি দাও। অপর কাত হইয়া অপর পায়ে কর।—(কায়স্থ পত্রিকা—
এডুকেশন গেজেট, ১৪ই পৌষ, ১৩৩৪)।

মন্ত্রবিংশতি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মহর্ষিদেবের বাণী।

পূজ্যপাদ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর এক পারিবারিক উপাসনার দিবসে বলিয়াছিলেন—"সমস্ত জাতি অপেক্ষা ব্রাহ্মেরা সকল বিষয়ে, কি জ্ঞানে কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী।"

মন্ত্রবিংশতি।

আজ প্রায় পঞ্চাশ বৎসর অতীত হইতে চলিল, ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষা গ্রহণের পর সর্ব্ববিষয়ে উন্নতিলাভের আশায় আমার নিজের চলিবার পথ স্থির করিয়া কয়েকটী মন্ত্র স্বীয় আত্মাতে সেই পথের নির্দ্দেশক স্তম্ভস্বরূপে প্রতিষ্ঠিত করিবার প্রয়াস পাইয়াছিলাম। সেই মন্ত্রগুলি

আমার ধর্ম্মপথে চলিবার পক্ষে বিশেষ সহায়তা করিয়াছিল। আমার মত পশ্চাদ্বর্ত্তী সকল সম্প্রদায়েরই পান্থদিগের সেই মন্ত্রগুলি অন্তত কতকাংশে উপকারে আসিতে পারে, এই আশায় সেই কয়েকটী মন্ত্র সর্ব্বসাধারণ্যে প্রকাশ করিলাম। মন্ত্রগুলি এই—

১। ঈশ্বরকে সম্মুখে রাখিয়া সকল কার্য্য করিব।

২। পিতার অভিপ্রায় অনুসারে এবং মাতৃ-আজ্ঞানুসারে কার্য্য করিব।

৩। অনাসক্ত ও ব্রহ্মনিষ্ঠ হইয়া সর্ব্বকর্ম্মে প্রবৃত্ত হইব।

৪। প্রতিদিন অন্তত দুই বেলা উপাসনা করিব।

৫। কাম প্রভৃতি ষড়রিপু হইতে সর্ব্বদা দূরে থাকিবার চেষ্টা করিব।

৬। কলহ প্রভৃতি দুশ্চিন্তার স্থানে কদাপি যাইব না।

৭। আত্মপ্রশংসা ও পরনিন্দা পরিত্যাগ করিব।

৮। মিথ্যা কথা সর্ব্বতোভাবে পরিত্যাগ করিবার চেষ্টা করিব।

৯। মিথ্যা ছুতা করিয়া লেখাপড়া বন্ধ করিব না।

১০। সাধ্যমত ধর্ম্মপুস্তক পাঠ করা বন্ধ করিব না।

১১। মন্দ কর্ম্ম করিব না; দৈবাৎ করিলে অনুতাপ সহকারে ভগবানের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিব।

১২। সাধু ব্যতিরেকে কাহারও সঙ্গ গ্রহণ করিব না।

১৩। উপায় থাকিতে পরগৃহে বাস করিব না।

১৪। কাহারও প্রতি মন্দ দৃষ্টি করিব না।

১৫। পরশ্রীকাতর হইব না।

১৬। শ্রদ্ধার সহিত দান করিব—অসৎপাত্রে কদাপি দান করিব না।

১৭। অসুস্থ না হইলে দিবানিদ্রা করিব না।

১৮। সাধ্যমত প্রতিদিন ব্যায়াম করিব।

১৯। সাধ্যমত কাহারও সহিত অনাবশ্যক বাক্যালাপ করিব না।

২০। অতিরিক্ত হাসিব না।

বলা বাহুল্য, এই কয়টী মন্ত্রের যথারীতি সাধনা পূর্ব্বক পরমাত্মাকে আত্মাতে প্রতিষ্ঠিত করিবার এবং সত্যধর্ম্মকে অন্তরে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতির পথে অনেকদূর অগ্রসর হইতে পারিব। ইহা নিঃসংশয় সত্য যে, যে হৃদয়ে ঈশ্বরের আসন নাই, সে হৃদয় শূন্য—বিদ্যায়, জ্ঞানে বা অন্য বিষয়ে কতকটা উন্নতি লাভ করিলেও তাহার কোন দৃঢ় ভিত্তি থাকে না,—সে হৃদয় যথার্থই শূন্য। সকল মঙ্গলের নিদান ঈশ্বরের প্রতিষ্ঠা যে পরিবারে নাই, সে পরিবারের কল্যাণ কোথায়? যে দেশে ঈশ্বরের নাম কীর্ত্তন হয় না, সে দেশ অরণ্য সমান। যে হৃদয়ে ঈশ্বর বিরাজ করেন, সে হৃদয় সর্ব্বদা প্রফুল্ল; যে পরিবারে তিনি বিরাজ করেন, সে পরিবার পুণ্যে উজ্জ্বল হয়; যে দেশে তাঁহার জয়ধ্বনি উঠে, সে দেশ ধন্য হয়।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

সিন্ধু-বারোয়াঁ—তেতালা।

প্রাণ-মন ডুবানো এমন কেহ নাই রে—কিছু নাই রে।
জুড়াতে এমন বেদন দহন কেহ নাই রে—কিছু নাই রে।

আঁধার হৃদয়ে দিতে আলো
নিমেষে ঘুচাতে সব কালো
সব দিকে এত ভালো কেহ নাই রে—কিছু নাই রে॥

ঢালিতে সুধা বিষজ্বালায়
ভরিতে কুসুম হৃদি-ডালায়
সাজাতে গেহ প্রীতি-মালায় কেহ নাই রে—কিছু নাই রে।

তাঁরে এস সবে নমি
তিনি-ধনে হই ধনী
এ হেন পরশ-মণি কেহ নাই রে—কিছু নাই রে।

কথা সুর ও স্বরলিপি—শ্রীনির্ম্মল চন্দ্র বড়াল।

আস্থায়ী।

০ ১ ২´ ৩

II সা -া সা -রা। ণ্ সা রা সা। রা -া -া -া। -া -া রা সা I

প্রা ণ্ ম ন্ ডু বা নো এ ম • • • ন্ • কে হ

০ ১ ২´ ৩

I রা -পা মা -া। -জ্ঞা -া রা সা। ন্সা -রজ্ঞা সরা -া। -া -া -া -া I

না ই রে • • • কি ছু না• •ই রে • • • • •

০ ১ ২´ ৩

I সা গা গা গা। মা -া -া -া। গা মা মা পা। মা -া -জ্ঞা -া I

জু ড়া তে এ ম • ন্ • বে দ ন দ হ • ন্ •

০ ১ ২´ ৩

I রা সা ন্সা -রজ্ঞা। জ্ঞা -া -া -া। রা সা ন্সা -রজ্ঞা। সরা -া -া -জ্ঞা II

কে হ না• •ই রে • • • কি ছু না• •ই রে • • •

অন্তরা ও আভোগ।

০ ১ ২´ ৩

[না না না না না না না র্সা ধনা -র্সরা নর্সা]

া -া { II পা পা পা পা। পা পা পা ধা। না -র্সা র্সা -া। -া -া -া -া I

• • আঁ ধা র হ দ য়ে দি তে আ • লো • • • • •

তাঁ রে এ স • • স বে ন • মি • • • • •

০ ১ ২´ ৩

I পা র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা র্রা। নর্সা -র্রা র্রা -া। -া -া -া (-র্জ্ঞা)} I -া I

নি মে ষে ঘু চা তে স ব কা• •লো • • • • • •

তি নি ধ নে • • হ ই ধ• •নী • • • • • •

০ ১ ২´ ৩

I র্রা -া র্রা র্রা। -া -া -র্রা র্সা। র্রা -র্মা র্জ্ঞা -া। -া -া র্রা র্সা I

স ব্ দি কে • • এ ত ভা • লো • • • কে হ

এ হে ন প র • শ • ম • ণি • • • কে হ

০ ১ ২´ ৩

I নর্সা -র্রজ্ঞা র্জ্ঞা -া। -া -া র্রা র্সা। নর্সা র্রজ্ঞা র্সরা -া। -া -া -া -া II

না• •ই রে • • • কি ছু না• •ই রে • • • • •

না• •ই রে • • • কি ছু না• •ই রে • • • • •

সঞ্চারী।

০ ১ ২´ ৩

II { ন্া ন্া ন্া ন্া। ন্া -া ন্া সা। ধ্ন্া -সরা ন্া -সা। -া -া -া -া I

ঢা লি তে সু ধা • বি ষ জ্বা• • • লা • • • য় •

•　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　　৩
I প্া সা সা সা। সা -া সা রা। ন্‌সা -রা রা -া। -া -া -া -া I
ভ রি তে কু সু ম হৃ দি ডা০ ০ লা • • • য় •

•　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　　৩
I রা রা রা রা। রা -া রা সা। রা -মা জ্ঞা -া। -া -া রা সা I
সা জা তে গে হ • প্রী তি মা • লা য় • • কে হ

•　　　　　　১　　　　　　২´　　　　　　৩
I ন্‌সা -রজ্ঞা জ্ঞা -া। -া -া রা সা। ন্‌সা -রজ্ঞা সরা -া। -া -া -া (-জ্ঞা) } I
না• •ই রে ০ • • কি ছু না০ ০ই রে • • • • •

-া III
•

জীবের জন্ম-তত্ত্ব।

(রায় বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ বি-এল বিদ্যার্ণব)

ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর শিশুর জীবনের প্রতি লক্ষ্য রাখিলে কতকগুলি বিস্ময়কর ব্যাপার দৃষ্টিকে আকর্ষণ করে। অধরপ্রান্তে মৃদু হাসির শুভ্র জ্যোতিতে সূতিকা-গৃহকে আলোকিত করিয়া শিশু যখন প্রেমার্দ্রলোচনে জননীর মুখ পানে তাকাইতে থাকে সে এক দৃশ্য! সূতিকাগৃহ এক অপার্থিব শোভায় মণ্ডিত হয়। সেই স্বর্গের জ্যোতিতে উৎফুল্ল কোমল দৃষ্টি জননীর সঙ্গে যেন কত পুরাতন কালের সম্বন্ধ স্মরণ করাইয়া দেয়। এই হাসি—ইহা মানবশিশুর বিশিষ্টতা; অপর কোন প্রাণীর মধ্যে ইহার স্ফুরণ নাই।

দিন দিন এই শিশুর বৃদ্ধিপ্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে দেখা যায় তাহার ললাটদেশ, মুখের গঠন ও শরীরের অন্যান্য অবয়বের মধ্যে যেন জনক-জননীর প্রতিকৃতি ফুটিয়া উঠিতেছে। শুধু তাহাই নহে; এই যে শিশুর হাসিতে গৃহ আলোকিত হইতেছিল, হঠাৎ তাহার ভাবান্তর উপস্থিত হইল, শিশুর ললাটদেশে এক কালিমার ছায়া পড়িল, অধরপ্রান্তকে অভিমান, ঘৃণা, দ্বেষ ও ঈর্ষার এক বিকৃত ভাবে কলঙ্কিত করিয়া তুলিল। যাহার সৌরভে গৃহকে আমোদিত করিতেছিল, হঠাৎ সেই কুসুমে কীটের প্রবেশ কেন? প্রসূতি হয়ত বলিবেন এই সব তাঁহারই দুর্ব্বলতা শিশুতে অনুক্রমিত হইয়াছে।

পরীক্ষার ফলে জানা গিয়াছে, তিন সপ্তাহ বয়ঃক্রমের সময় শিশুর জীবনে প্রথম ভয়ের উদ্রেক হয়। সাত সপ্তাহ পরে পারিবারিক স্নেহ ও ভালবাসার স্ফুরণ হয়। দ্বাদশ সপ্তাহের পর ক্রোধ ও হিংসার ভাব ফুটিয়া উঠে, আট মাস বয়সের পর অহঙ্কার ও ঘৃণা দেখা দেয়, পনেরো মাস বয়ঃক্রমের পর লজ্জা ও গ্লানির উদয় হয়। কি কারণে মানবচরিত্রে এই সকল নীচ বৃত্তিনিচয়ের উন্মেষণা হয়, পাশ্চাত্য বিজ্ঞান ও আমাদের দেশের শাস্ত্র সকল তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে প্রয়াসী হইয়াছে। উভয় মতেই কারণগুলি বড় জটিল, কিন্তু তাহা না জানিতে পারিলে, প্রকৃতিরাজ্যে মানবের স্থান ও তাহার জীবনের গতি ও লক্ষ্য সম্বন্ধে ভালরূপ ধারণা করা সম্ভবপর হইবে না। পাশ্চাত্য বিজ্ঞান যে সকল কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে তদপেক্ষা এদেশীয় শাস্ত্রকারদের মত অধিকতর সূক্ষ্ম ও জটিল এবং স্থানে স্থানে দুর্ব্বোধ্যও বটে, কিন্তু পাশ্চাত্য মত যুক্তিমূলক, বিশেষতঃ অনেক পরিমাণে পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে। ইহার একটা ধারণা থাকিলে এদেশীয় মত বুঝিতে সহায়তা হইবে, তাই আমরা প্রথমতঃ পাশ্চাত্য মত কি কি কারণ নির্দ্দেশ করিয়াছে তাহার আলোচনা করিব। Ultimate Principle of Life কি? কিরূপে প্রথম জীবের উদ্ভব হইয়াছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান এখন পর্য্যন্ত তাহা নিরূপণ করিতে পারে নাই—এদেশীয় শাস্ত্রকারদের মতে এবিষয়ে কোন সন্দেহ নাই—

মুণ্ডক-শ্রুতি বলিতেছেন;

তদেতৎ সত্যম্—
যথা সুদীপ্তাৎ পাবকাৎ বিস্ফুলিঙ্গাঃ
সহস্রশঃ প্রভবন্তে সরূপাঃ।
তথাক্ষরাৎ বিবিধাঃ সৌম্য ভাবাঃ
প্রজায়ন্তে তত্র চৈবাপি যন্তি॥

২মমু'১ম খ১

ইহা সত্য—যেমন প্রজ্বলিত অগ্নি হইতে অগ্নিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গ নির্গত হয়, তেমনি হে সৌম্য, অক্ষর পুরুষ হইতে বিবিধ জীব উৎপন্ন হয় এবং তাঁহাতেই বিলীন হয়।

সেই অক্ষর পুরুষ হইতেছেন—

"দিব্যো হ্যমূর্ত্তঃ পুরুষঃ স বাহ্যাভ্যন্তরো হ্যজঃ।

অপ্রাণো হ্যমনাঃ শুভ্রো হ্যক্ষরাৎ পরতঃ পরঃ॥

সেই দিব্য পুরুষ নিরাকার, বাহ্যাভ্যন্তরবর্ত্তী, অজ, অপ্রাণ অর্থাৎ প্রাণাদি পঞ্চবায়ুবর্জ্জিত, (ইন্দ্রিয়প্রধান মন-বিবর্জ্জিত, শুদ্ধ এবং শ্রেষ্ঠ অক্ষর পুরুষ (হিরণ্যগর্ভ) হইতে শ্রেষ্ঠ।

এতস্মাজ্জায়তে প্রাণো মনঃ সর্ব্বেন্দ্রিয়াণি চ।

খংবায়ুর্জ্যোতিরাপঃ পৃথিবী বিশ্বস্য ধারিণী॥

এই পুরুষ হইতে প্রাণ, মন, সমুদয় ইন্দ্রিয়, আকাশ বায়ু আলোক জল, এবং বিশ্বের আধারভূতা পৃথিবী উৎপন্ন হইয়াছে।

জীব ও জগৎ উভয়ই এক অক্ষর পুরুষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে এখানে বলা হইল। জীব সম্বন্ধে বিশেষ ভাবে ইহাও বলা হইল যে প্রজ্বলিত অগ্নির সঙ্গে তাহা হইতেই নির্গত অগ্নিরূপ সহস্র সহস্র স্ফুলিঙ্গের যে সম্বন্ধ সেই অক্ষর পুরুষের সঙ্গে জীবেরও সেই সম্বন্ধ, অধিকন্তু জীব পরিণামে তাঁহাতেই বিলীন হয়।

কিরূপে জীব প্রথম প্রাদুর্ভূত হইয়াছে পাশ্চাত্য বিজ্ঞান তাহার কারণ নির্দ্দেশ করিতে না পারিলেও ডিম্বাণু ও শুক্রাণুর সংযোগরূপ উপায় অবলম্বন ক্রমে বহির্জ্জগত হইতে উপাদান আহরণ পূর্ব্বক তিনি কি প্রকারে দেহীরূপে প্রকাশিত হন, তৎসম্বন্ধে স্থির সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছে। বিজ্ঞানের যে শাখায় এতদ্বিষয়ের আলোচনা রহিয়াছে তাহার নাম জ্রণতত্ত্ব।

এই বিদ্যার প্রথম ও সর্ব্বপ্রধান আবিষ্কার এই যে স্থাবরজঙ্গমাত্মক সর্ব্বপ্রকার জীবের পক্ষেই জীবনপ্রবাহের প্রথম ক্রম একটী ক্ষুদ্রাদপিক্ষুদ্র জীবকোষকে লইয়া। উদ্ভিদ ও প্রাণী উভয় রাজ্যেই সর্ব্বনিম্নস্তরস্থ জীব এই একটী জীবকোষ মাত্র। কিছু কাল জীবনযাত্রা নির্ব্বাহের পর, এক অপূর্ব্ব কৌশলে ইহা দ্বিধা বিভক্ত হয়, এবং যথাকালে এই বিভক্ত অংশগুলি প্রথম জীবকোষের রূপ ও আকার ধারণ করে। এইরূপ ২টী হইতে ৪টী, ৪টী হইতে ৮টী, অনুপাতে ইহাদের সংখ্যাবৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম জীবকোষটী রূপান্তর প্রাপ্ত হয় বটে, কিন্তু ইহার বিনাশ নাই। এই এক-কোষবিশিষ্ট জীবের দেহে কোনরূপ অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভাগ নাই। জীবনধারণার্থ যাহা যাহা প্রয়োজন সমগ্র কোষটী দ্বারা তাহা নিষ্পন্ন হয়। নিজের বংশ রক্ষার্থ ভাবী কোষের উদ্ভবও এই কোষ হইতে হইয়া থাকে; কিন্তু যতই নিম্ন স্তর হইতে উর্দ্ধদিকে উঠিতে থাকা যায়, এই প্রথম কোষ হইতে উৎপন্ন কোষগুলির বিশেষ বিশেষ অংশ বা সংখ্যা বিশেষ বিশেষ কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত হইতেছে দেখিতে পাওয়া যায়।

এককোষ-বিশিষ্ট জীব হইতে অপেক্ষাকৃত সামান্য উন্নততর জীবের বেলায় প্রধান লক্ষ্যের বিষয় এই যে, ইহাদের মধ্যে দুইটী স্বতন্ত্র জীবকোষ প্রথম পরস্পরের সঙ্গে সংযুক্ত হয়, এবং কিয়ৎকাল তদবস্থায় থাকার পর এককোষ জীবের ন্যায় বিভক্ত হইয়া নূতন কোষের সৃষ্টি করে। এই সংযুক্ত অবস্থা ব্যতীত এই শ্রেণীর জীবে নূতন কোষ উৎপন্ন হইতে পারে না, কিন্তু যে দুইটী কোষ পরস্পরের সঙ্গে মিলিত হয় তাহাদের কোনটির মধ্যেই স্ত্রী বা পুরুষপরিচায়ক কোন চিহ্ন নাই।

এমিবা (Amœba) নামক জীব এই শ্রেণীর অন্তর্গত। ইহা অপেক্ষা কথঞ্চিৎ উন্নত শ্রেণীর প্রাণীতে এবং উদ্ভিদের মধ্যে প্রথম দেখা যায় যে অনেকগুলি জীব কোষ একত্রিত হইয়া জীবের দেহসৃষ্টিরূপ কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছে। আরও দেখা যায় যে কোষগুলি শ্রেণীবিভাগক্রমে বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত থাকিয়া বিশেষ বিশেষ আকৃতিবিশিষ্ট বিশেষ বিশেষ জীবের সৃষ্টি করিতেছে—যেমন, কতকগুলি কোষ দ্বারা আহার্য্য গ্রহণ কার্য্য নিষ্পন্ন হইতেছে, কতকগুলি দ্বারা পরিপাক কার্য্য চলিতেছে, কতকগুলি দ্বারা গমনাগমন কার্য্যনির্ব্বাহোপযোগী শক্তি উৎপন্ন হইতেছে, কতকগুলি বিশেষভাবে জনন কার্য্যে ব্যাপৃত রহিয়াছে।

এই সকল বহুকোষবিশিষ্ট জীবের মধ্যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে, কতকগুলি কোষ ঐ জীবের আবির্ভাবের প্রারম্ভেই জনন কার্য্যের জন্য পৃথকভাবে চিহ্নিত হইয়া থাকে। এই জননকার্য্য সম্পাদন ভিন্ন বংশ রক্ষা পাইতে পারে না। সৃষ্টিক্রমের যতই উপরের দিকে উঠা যায় প্রত্যেক প্রাণীর জীবনপ্রবাহের প্রারম্ভ হইতেই এই বিশেষ কার্য্য সম্পাদনোপযোগী কোষদিগকে রক্ষা করিবার যত্ন ও প্রচেষ্টা ততই বৃদ্ধি পাইতেছে দেখা যায়। কোষগুলির সমাবেশে জটিলতাও বৃদ্ধি পাইতে থাকে, কোষগুলির গঠন এবং এক কোষ হইতে অপর কোষের উৎপত্তি-ব্যাপারের মধ্যেও জটিলতা দৃষ্ট হয়।

নিম্নস্তরের জীবের সব কোষই স্বাধীনভাবে নিজেদের কার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে, ইহারা পরস্পরের সাহায্যের অপেক্ষা রাখে না। প্রত্যেকেই যথাসময়ে দুইভাগে বিভক্ত হইয়া ২টী নূতন জীবের সৃষ্টি করে। উর্দ্ধতন স্তরের জীবসকলের মধ্যে দেখা যায়—কোষের মধ্যে একটা পদার্থ রহিয়াছে যাহাকে কেন্দ্র-মূল (Nucleus)

রূপে গণ্য করা যাইতে পারে। এই কেন্দ্রমূলের বহির্ভাগে আবার অতিসূক্ষ্মকারে আর একটী গঠন রহিয়াছে যাহা কেন্দ্রমূল ও প্রাণপঙ্ক (Protoplasm) উভয় হইতে স্বতন্ত্র; জ্রূণ-বিদ্যার ভাষায় ইহাকে কৈন্দ্রিককণিকা (Centrosome) সন্ট্রোসম বলা হয়। এই পদার্থটাই প্রথম দুইভাগে বিভক্ত হয়, তৎপর কেন্দ্রমূল, তাহারপর সমগ্র কোষটি বিভক্ত হইতে থাকে। এই কেন্দ্রমূলের গঠন বড়ই জটিল। ইহা প্রথমতঃ কতকগুলি সূক্ষ্ম লতা-তন্তুরূপে বিভক্ত হয়; অত্যন্ত বিস্ময়ের বিষয় এবং বিশেষ-ভাবে লক্ষ্য করিবার বিষয় এই যে লতাতন্তু বিভিন্ন জাতীয় জীবের পক্ষে নির্দ্দিষ্ট সংখ্যক। কোন এক শ্রেণীর জীবের মধ্যে এই সংখ্যার ন্যূনাধিক্য নাই, এবং কোন দুই জাতীয় জীবের সমসংখ্যক নহে। এই বিশিষ্টতার মধ্যে বিশেষ জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যাইতেছে; বিভিন্নজীবের বিভিন্ন প্রকৃতি ও আকার ধারণের মূলভিত্তি এই স্থানে।

উন্নতস্তরস্থ প্রাণীদিগের ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য অসংখ্য-কোষের সমাবেশ ও কার্য্যকারিতা দ্বারা রক্ষা পাইয়া থাকে। ইহাদের কতগুলি কোন এক নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সম্পাদনে নিযুক্ত থাকে, কতগুলি দ্বারা অপর কোন কার্য্য নিষ্পন্ন হয়, অপূর্ব্ব শৃঙ্খলার সহিত ইহারা যাহার যাহার নির্দ্দিষ্টকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। এই ভাবে দেখিলে একটী মানবদেহ এক বিশেষ সঙ্ঘবদ্ধ কোষ সমষ্টি বলিয়া অনুমিত হইবে। মূলতঃকিন্তু একটী কোষ হইতে এই সকলের সৃষ্টি। এই সর্ব্বপ্রথম কোষটীকে অণ্ড বা ডিম্ব বলা যাইতে পারে। ভ্রূণবিদ্যার ভাষায় ইহার নাম ফলন্ত ডিম্বকোষ (Fertilized ovum)। "সংখ্যাতীত অন্যান্য যাবতীয় কোষ এই একটী ডিম্বকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে।

এককোষ জীবদিগের কোষগুলি একই আকৃতিবিশিষ্ট হইলেও কোষের সংখ্যা ও জটীলতাবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে পরিণামে উন্নততর জীবসকলের মধ্যে প্রাথমিক কোষের সঙ্গে অধিকাংশ কোষেরই সাদৃশ্য রক্ষিত হয় না। ইহার মধ্যেও এক সূক্ষ্মতত্ত্ব নিহিত রহিয়াছে; শিক্ষিত সৈন্য-গণ যেমন সুনিপুণ সেনানায়কের অধীনে থাকিয়া নানা দলে বিভক্ত হইয়া একই উদ্দেশ্যসাধন করে ভিন্ন ভিন্ন কার্য্যে ব্যাপৃত হয়, তেমনি কতগুলি কোষ মস্তিষ্ক নির্ম্মাণ কার্য্যে, কতকগুলি রক্ত নির্ম্মাণ কার্য্যে কতকগুলি মাংসপেশী, কতকগুলি বা অস্থি, এইরূপ শরী-রের নানা অঙ্গপ্রত্যঙ্গ নির্ম্মাণে নিযুক্ত হইয়া থাকে। সংগ্রামে জয়লাভ করিতে হইলে যেমন অশ্বারোহী সৈন্য পদাতিক সৈন্য প্রভৃতি নানারূপ সৈন্যের প্রয়োজন হয়, এবং যে দলের উপর যে কার্য্যের ভার থাকে তাহার প্রয়োজনীয়তা অনুসারে যেমন এই সব ভিন্ন ভিন্ন সৈন্যদলের অস্ত্র ও সাজসজ্জার পার্থক্য থাকে, তেমনই এই সকল বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত কোষগুলির মধ্যে আকারপ্রকারে ভেদ ঘটিয়া থাকে। এই সকল কোষ মূলতঃ এক ডিম্বকোষ হইতে উৎপন্ন হইলেও যাহার যে নির্দ্দিষ্ট কার্য্য সেইটী তৎকার্য্যেই নিযুক্ত থাকে, তদ্ভিন্ন অপর কোন কার্য্য করিবার ইহার শক্তি নাই। ইহাদিগের মধ্যে কতকগুলি কোষ আছে, বংশ বা জাতিরক্ষার জন্য সন্তান উৎপাদন করা যাহাদিগের একমাত্র কার্য্য। ইহাদিগের নাম জননকোষ। স্ত্রীজাতীয় দৈহিক উপাদান পেশী (tissue) হইতে উৎপন্ন এই সকল জননকোষের নাম ডিম্বকোষ (ova) এবং পুংজাতীয় দেহ হইতে উৎপন্ন জননকোষগুলির নাম বীর্য্যকোষ (Sperm)। এই সকল ডিম্ব ও বীর্য্যকোষের মধ্যে আকৃতিগত বৈষম্য থাকিলেও স্ত্রী-পুরুষত্বের কোন চিহ্ন বিদ্যমান নাই। স্ত্রীদেহ-সমুৎপন্ন ডিম্বকোষ স্ত্রীজাতীয় এবং পুং-দেহসমুৎপন্ন বীর্য্য-কোষ পুংজাতীয়, অথবা তাহারা ইহার বিপরীতধর্ম্মাবলম্বী এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। এই সকল কোষ হইতে সমুৎপন্ন শিশুর জীবনেও এক জাতীয় কোষ অপেক্ষা অপর জাতীয় কোষের প্রভাবের কোন ইতর-বিশেষ নাই। জীবদেহ গঠনের সঙ্গে সঙ্গে এই উভয়-জাতীয় জননকোষ নানারূপ পরিবর্ত্তনের ভিতর রক্ষিত হইয়া যথাসময়ে পূর্ণতা প্রাপ্ত হইলে তাহারা আবার জননকার্য্য সম্পাদনের উপযোগী হয়। মানুষের পক্ষে এই পরিপক্কতা প্রাপ্তির বয়স দেশের জলবায়ু ও জাতির উপর নির্ভর করে; এক জাতির মধ্যেও আবার বিভিন্ন ব্যক্তির শারীরিক গঠন ও সুস্থতা অনুসারে এই বয়সের ইতরবিশেষ ঘটে। জননকোষ সকল পরিপক্কতা লাভের পর স্ত্রীদেহে ডিম্বকোষের সঙ্গে বীর্য্যকোষের সংযোগ সংস্থাপিত হইলে উভয় কোষ পরস্পর মিলিত হইয়া একটী স্বতন্ত্র কোষের সৃষ্টি করে। তখন ডিম্ব-কোষটী উর্বর প্রাপ্ত হইয়াছে বলা যায়। জননাগর্ভে যত্নতঃ রক্ষিত হইয়া এবং যথোচিত পুষ্টিসাধক আহার্য্য লাভ করিয়া এই ফলপ্রাপ্ত কোষ বিভক্ত হইতে থাকে; এই উপায়ে অসংখ্য নূতন কোষের সৃষ্টি হয় তাহার মধ্যে কতগুলি নির্দ্দিষ্টসংখ্যক কোষ জননকোষ হয়; ইহারা জ্রূণাবস্থা হইতে দেহে অবাহত থাকিয়া পরিপক্কতা লাভ করিতে থাকে এবং যথাকালে বংশরক্ষারূপ সৃষ্টি কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। বাকী কোষগুলি নানারূপে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ গুলির সৃষ্টিকার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া জীবদেহের পুষ্টি সাধন করে।

—

গ্রন্থপরিচয়।

পূজনীয় গুরুদাস।—শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী প্রণীত। ৭৭।১ হরি ঘোষের ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৩৲ টাকা।

গ্রন্থখানিতে গুরুদাস বন্দোপাধ্যায় মহাশয় এবং তাঁহার মাতা ৺সোনামণি দেবীর দুইখানি 'হাফটোন' ছবি দেওয়া আছে। গ্রন্থের নাম হইতেই প্রকাশ পাইতেছে যে, ইহা বঙ্গের গৌরব পরলোকগত বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের জীবনী। গ্রন্থকার গুরুদাস বাবুর আত্মীয়, সুতরাং গুরুদাস বাবুর সম্বন্ধে অনেক তথ্য তাঁহার প্রত্যক্ষভাবে জানিবার সুযোগ ঘটিয়াছে। তাই তিনি গুরুদাস বাবুর জীবন সংক্ষিপ্ত আকারে কিন্তু সমগ্র ভাবে অতি সরস ভাষায় বলিতে পারিয়াছেন। নব্য যুগের প্রত্যেক যুবককে আমরা এই গ্রন্থখানি পড়িতে অনুরোধ করি।

THE CROSS IN THE CRUCIBLE.—By S. Haldar—Ranchi.

ইহা প্রচলিত বাইবেলোক্ত খৃষ্টধর্ম্মের সমালোচনা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। খৃষ্টধর্ম্মের নামে দুর্ব্বল প্রাচ্য জাতিগণের উপর পাশ্চাত্য বলবান জাতিসমূহের আধ্যাত্মিক, মানসিক ও শারীরিক যে অত্যাচার বিতরিত হইতেছে, গ্রন্থকার তাহারও তীব্র প্রতিবাদ করিতে কুণ্ঠিত হন নাই। এই সমালোচনা ও প্রতিবাদ-কার্য্যে গ্রন্থকার কোথাও সংযম হারান নাই বা অসংযত ভাষা প্রয়োগ করেন নাই। লেখকের লিখিবার ভঙ্গির কারণে ইহা সুখপাঠ্য হইয়াছে। যাঁহারা খৃষ্টীয় মিশনরিদিগের বক্তৃতা শুনিয়া বা প্রবন্ধাদি দেখিয়া নিজেদের ধর্ম্মকে হেয় ও কুসংস্কারপূর্ণ মনে করেন, তাঁহাদিগকে এই গ্রন্থখানি মনোযোগ সহকারে পাঠ করিতে অনুরোধ করি।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত শঙ্করনাথ পণ্ডিতের গ্রন্থাবলী—প্রাপ্তিস্থান—৬২ শম্ভুনাথ পণ্ডিতের ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা।

গ্রন্থকার কলিকাতা আর্য্যসমাজের সভাপতি। পণ্ডিতজীর গ্রন্থাবলী বাংলাভাষায় সম্পদবিশেষ। বর্ত্তমানে বাঙ্গালী লঘুসাহিত্যে এতই অনুরক্ত যে, এই গ্রন্থাবলীর মূল্য বুঝিবেন কি না সন্দেহ; কিন্তু সময়ে এই প্রকার সৎসাহিত্যের জন্য আগ্রহ ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর অন্তরে যে জাগিয়া উঠিবে, তাহাতে সন্দেহ নাই। পণ্ডিত শঙ্করনাথের গ্রন্থাবলীতে শিখিবার ও ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তির গৃহে এই সকল গ্রন্থের স্থান হওয়া উচিত। গ্রন্থগুলি পাঠ করিয়া আমরা নিজেরাও যে আনন্দলাভ করিয়াছি তাহা বলা বাহুল্য। গ্রন্থগুলির মূল্যও বেশী নহে—বলিতে গেলে আর্য্যসমাজের মত প্রচারের জন্য সম্ভবমত অল্প করা হইয়াছে।

বসুধারা (সচিত্র মাসিকপত্র)।—সম্পাদক শ্রীকালিদাস রায় এবং শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ। ১২, হরিতকী বাগান লেন হইতে প্রকাশিত। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

এই নবপ্রকাশিত মাসিক পত্রের প্রথম সংখ্যা পাইয়াছি সম্পাদকদিগের নামেই বুঝা যাইতেছে, ইহা শীঘ্রই পাঠকগণের নিকট আদরণীয় হইয়া উঠিবে। আমরা এই সহযোগীর উত্তরোত্তর উন্নতি কামনা করি।

কুরুক্ষেত্র (সচিত্র মাসিকপত্র)।—সম্পাদক শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন। বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা।

ইহার ১ম বর্ষের ১ম সংখ্যা পাইয়াছি। পড়িয়া বড়ই প্রীতিলাভ করিলাম। এই সংখ্যার পদ্য গদ্য উভয়ই নামের উপযুক্ত গুরুত্বে ও গাম্ভীর্য্যে পূর্ণ। আমাদের মনে হয়, কুরুক্ষেত্র যে বাণী লইয়া অবতীর্ণ, তাহার সহিত "ভাবের বিকাশের" চিত্রগুলির ঠিক সামঞ্জস্য হয় না। যদি সম্পাদকগণ গ্যালারির হাততালি পাইবার প্রত্যাশা পরিত্যাগ করিয়া একনিষ্ঠহৃদয়ে দেশের কল্যাণসাধক প্রবন্ধাদির দ্বারা প্রত্যেক সংখ্যার কলেবর পূর্ণ করেন, তবেই দেশের মঙ্গলসাধনের সঙ্গে "কুরুক্ষেত্র" প্রকাশ সার্থকতা লাভ করিবে।

হোমিওপ্যাথিক পরিচারক।—২য় বর্ষ ৮ম সংখ্যা—সম্পাদক ডাঃ কে, কে, রায়, এম-ডি (ক্যালিফর্ণিয়া) ও ডাঃ অজিতশঙ্কর দে H. M. B. প্রকাশক—হোমিওপ্যাথি সার্জ্জিং সোসাইটী (ইণ্ডিয়া) ৫ ভিক্টোরিয়া রোড, পোঃ বরাহনগর কলিকাতা। বার্ষিক মূল্য ২৲ টাকা।

একটা কথা আছে—দরিদ্রের শীতনিবারণে ৩টী বন্ধু জানু, ভানু ও কৃশানু। সেইরূপ আমরা বলিতে পারি দরিদ্রের রোগনিবারণে অন্তত দুইটী বন্ধু আছে, হোমিওপ্যাথিক ও বাইয়োকেমিক চিকিৎসা। এলোপ্যাথিক চিকিৎসকগণ উক্ত দ্বিবিধ চিকিৎসাকে অকিঞ্চিৎকর প্রমাণ করিবার যতই চেষ্টা করুন না কেন, অনেকেই সময়ে সময়ে এই চিকিৎসার আশ্চর্য্য ফল দেখিয়া অবাক হইয়াছেন। এলোপ্যাথিক চিকিৎসাকে যদি বিজ্ঞানসম্মত ও পরীক্ষিত বলিয়া গ্রহণ করা যায়, তবে উপরোক্ত চিকিৎসাপদ্ধতি দুটীকেও কেন যে বিজ্ঞানসম্মত ও পরী-

ক্তি বলিব না জানি না। আলোচ্য সংখ্যায় হ্যানিম্যানের অর্গ্যানন অফ মেডিসিনের ব্যাখ্যা ভাল হইলেও বড় অল্প প্রকাশিত হইয়াছে। এত অল্প করিয়া প্রকাশ করিলে কবে শেষ হইবে জানি না। চিকিৎসিত রোগীর বিবরণ দিয়া বড়ই ভাল করিয়াছেন। আমাদের মনে হয়, রোগীর পুরা নাম কিছুতেই দেওয়া কর্ত্তব্য নয়। ঈগলফোলিয়া পরীক্ষার কথা লিখিয়াছেন—এই গাছের বাংলা নাম কি লিখিলে ভাল হইত।

সংবাদ।

বেহালা ব্রাহ্মসমাজ।—গত ৩০শে কার্ত্তিক শুক্রবার বেহালায় পঞ্চসপ্ততিতম সাম্বৎসরিক উৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বেহালা ব্রাহ্মসমাজের কর্ণধার শ্রীযুক্ত চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহাশয় এবার রোগে দীর্ঘকাল শয্যাশায়ী ছিলেন। সুখের বিষয়, তিনি উৎসবের কিছুদিন পূর্ব্বেই সারিয়া উঠিয়াছিলেন। চিন্তামণি বাবু অদ্যাপি দুর্ব্বল ও অসমর্থ থাকিলেও তাঁহার সুযোগ্য পুত্রগণের যত্নে ও চেষ্টায় উৎসব পূর্ব্বের ন্যায় যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়াছে, কোথাও কোন ত্রুটী পরিলক্ষিত হয় নাই। প্রাতে ৭টার পরে উপাসনা, দ্বিপ্রহরে প্রীতিভোজন ও প্রসঙ্গ, অপরাহ্ন ৩টার পরে ব্রাহ্মধর্ম্মের পারায়ণ এবং সন্ধ্যা ৬টার পরে ব্রহ্মোপাসনা হইয়াছিল। সান্ধ্য উপাসনায় বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য ও শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য বেদান্ততীর্থ। বেদান্ততীর্থ মহাশয় যে লিখিত উপদেশটী পাঠ করিয়াছিলেন, উহা পুস্তিকাকারে মুদ্রিত হইয়া সভামধ্যে বিতরিত হইয়াছিল। তত্ত্ববোধিনীর বর্ত্তমান সংখ্যার স্থানান্তরে উহা প্রকাশিত হইল। সঙ্গীতের ভার লইয়াছিলেন প্রখ্যাত গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায়, তদীয় পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় এবং শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র বড়াল। উপাসনান্তে আদর ও আপ্যায়ন পূর্ব্বক সমাগত উপাসকবর্গকে স্বগৃহে আহ্বান করিয়া সপুত্র চিন্তামণি বাবু তাঁহাদিগকে যথারীতি পরিতোষ পূর্ব্বক জলযোগ করাইয়াছিলেন।

শোকসংবাদ।

৺সতীশরঞ্জন দাশ।—গত ৯ই কার্ত্তিক শুক্রবার রাত্রি ১০৷৷০ ঘটিকায় স্বনামধন্য শ্রীযুক্ত সতীশরঞ্জন দাশ মহাশয় (মিঃ এস্ আর দাশ) কলিকাতায় ডাক্তার ডি. এন রায়ের বাস-ভবনে হঠাৎ পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৫৬ বৎসর হইয়াছিল। কিছুদিন হইতে ইঁহার স্বাস্থ্য ভাঙ্গিয়া পড়িতেছিল। শেষে হৃদ্‌যন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হইয়া এই দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। মৃত্যুকালে ইনি ভারত-গভর্ণমেণ্টের 'আইন সচিব' পদে প্রতিষ্ঠিত ছিলেন। স্বনামধন্য ব্রাহ্ম-নেতা সুপ্রসিদ্ধ ৺দুর্গামোহন দাশের ইনি অন্যতর পুত্র ছিলেন। স্বজনবাৎসল্যে, অকপট ব্যবহারে এবং সর্ব্বোপরি নারীর উপর অত্যাচার দমনের চেষ্টায় তিনি আপন বংশের সহৃদয়তার সম্যক্ পরিচয় দিয়া গিয়াছেন। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত পত্নী ও পুত্রদ্বয়কে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।

পরলোকে প্রখ্যাত নেতা লালা লাজপৎ রায়।—বর্ত্তমান সংখ্যা পত্রিকার মুদ্রণ-কার্য্য পরিসমাপ্ত-প্রায় হইয়াছে, এমন সময় হঠাৎ এই দুঃসংবাদ আসিল যে দেশনেতা পঞ্জাবকেশরী ধর্ম্মপ্রাণ লালা লাজপৎ রায় আর ইহলোকে নাই। গত ১লা অগ্রহায়ণ শনিবার প্রাতে প্রায় ৭ ঘটিকার সময় হৃদযন্ত্রের ক্রিয়া রুদ্ধ হওয়ায় তিনি হঠাৎ লাহোরে পরলোকগত হইয়াছেন। লালাজীর এই আকস্মিক মৃত্যুতে সমগ্র ভারত আজ শোক-বিহ্বল। ভারতের প্রত্যেক ধূলিকণা হইতে শোক উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। আমরা এই আকস্মিক দুর্ঘটনায় স্তম্ভিত হইয়া গিয়াছি—আত্মীয়স্বজনের মৃত্যুর ন্যায় বেদনা অনুভব করিতেছি। ইঁহার পরিবারবর্গকে আমরা সন্তপ্তহৃদয়ে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

ভাদ্র মাস, ১৮৫০ শক।

আয়	৫৩৪৷৴০
পূর্ব্ব স্থিত	১৮৶৩
সমষ্টি	৫৩৬৷৴৩
ব্যয়	৫৩০৷৯
স্থিত	৬৻৬

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিকদান	২০৲
হাওলাত জমা	১৬৲
সস্পেন্স	১৩০৲
সমষ্টি	৩৪৬৲

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	১৲
হাল	৪৲
বিজ্ঞাপন	১৩৲
মাশুল	॥০
সমষ্টি	১৮॥০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	১৩১৷০
কাগজের মূল্য	২৸৶০
দপ্তরী	৩০৲
সমষ্টি	১৬৪৷৶০

পুস্তকালয়।

গচ্ছিত	৫৲
মাশুল	৷৶০
সমষ্টি	৫৷৶০
সর্ব্বসমষ্টি	৫৫৪৷৵০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	১০৲
গায়ক	৯০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বেহারা	১২৲
মেথর	২৷০
সরঞ্জামী	৸৶০
মাশুল	॥৵০
ইলেক্‌ট্রিক	৪৷০
টেক্স	৬৭॥৵৬
কেরোসিন	৸৴৯
ড্রেণপরিষ্কার	৬॥৵০
হাওলাত শোধ	৪৬৲
পার্ব্বণী	১৲
হাওলাত প্রদান	১৩৲
বারবরদারী	১৸৶৬
বিবিধ	৴০
গচ্ছিত	৩০৲
সমষ্টি	৩০২৶৯

তত্ত্ববোধিনী।

দপ্তরী	১০৸৶০
মাশুল	১১৷৵০
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বিবিধ	৶০
সমষ্টি	৩৭॥৵০

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	২৮৲
কম্পোজিটর	৪৭৲
প্রেসম্যান	২০৲
ইঙ্কম্যান	১২৲
কাগজতোলা	৬৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
জলপানি	৷৬
ছাপার কাগজ	৬৷৶৯
কালি	৸৵০
শিরীষ	১৵০
তৈল	॥০
তামাক	৷৵০
সাজিমাটী	॥৴০
কুলঢালা	৷৩
মাশুল	৷৬
বাতি	৷৬
ব্রাস	৷৶৬
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	৯৵০
লেই জন্য ময়দা	৷০
অন্যান্য	৬৸৵৬
দপ্তরী	২০৸৶০
সমষ্টি	১৭৬॥৶৬

পুস্তকালয়।

মাশুল	১॥৴৬
গীতারহস্যের মূল্য বাবত	১২৵০
সমষ্টি	১৩॥৶৬
সর্ব্বসমষ্টি	৫৩০৷৯

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

নিবেদন।

এবার শারদীয় অবকাশের জন্য পত্রিকা প্রকাশে বিলম্ব ঘটিল। আশা করি, গ্রাহক ও পাঠকগণ অনুগ্রহপূর্ব্বক কোন ত্রুটী গ্রহণ করিবেন না। ইতি

বিনীত
শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 432

সংখ্যা ১০২৪ অগ্রহায়ণ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সাল ১৩৩৫। শক ১৮৫০। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯। অগ্রহায়ণ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা ডাকমাশুল ৶০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ৷৹ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫। ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০৪ অঞ্জলি।—জননী দেবতা।

১। তুমি আমাদিগের রক্ষকেরও রক্ষক। তোমারই স্নেহপ্রেম বর্ম্মস্বরূপে আমাদিগকে ঘিরিয়া রাখিয়াছে। শত্রুগণ আমাদের বিনাশ প্রার্থনা করিলেও বিনাশসাধন করিতে পারিতেছে না। তুমিই আমাদের জ্ঞানদাতা। তুমি নিয়তই আমাদের আত্মাতে শুভ বুদ্ধি প্রেরণ করিতেছ। নদীসমূহ দুই উপকূলকে যেমন অযাচিত জল প্রদান করিয়া শস্যশ্যামল করে, মেঘসকল যেমন চাতকপক্ষীকে জল না চাহিতেই জল প্রদান করে, তুমিও সেই-রূপ আমাদিগকে নিয়তই তোমার প্রেমবারি দ্বারা সিক্ত করিতেছ। আমরা তোমার সেবক। তুমি আমাদিগকে প্রচুর ধনরত্ন প্রদান কর, যাহাতে আমরা তোমারই প্রিয়কার্য্যসাধনে তাহা নিয়োগ করিয়া কৃতার্থ হইতে পারি।

২। তোমার উজ্জ্বল দৃষ্টি সমগ্র ব্রহ্মচক্রের সর্ব্বত্র সমভাবে অনিমেষভাবে নিপতিত আছে। তোমার দৃষ্টি উচ্চতম পর্ব্বতশিখরেও যেমন, সাগরের নিম্নতম জলেও সেইরূপ। তোমার দৃষ্টি গগনের প্রতি অংশে যেমন, প্রতি জীবজন্তুর অন্তরেও সেইরূপ, প্রতি মানবের আত্মাতেও সেই-রূপ। বহু যুবক যেমন একটী সুন্দরী যুবতীর পাণি-গ্রহণে অভিলাষ করে, শতসহস্র ভক্তও সেইরূপ একমাত্র তোমারই চরণস্পর্শ করিতে ধাবমান হয়।

৩। তোমারই আশীর্ব্বাদে আমাদের রসনা হইতে তোমার জয়গান বহির্গত হইয়া তোমারই চরণাভিমুখে সমুত্থিত হইতেছে। তুমি আমাদিগকে তোমারই কার্য্যে একনিষ্ঠ রাখ। তোমার কার্য্যেই আমাদের তুষ্টি, তোমার কার্য্যেই আমাদের পরি-পুষ্টি। তুমিই আমাদিগকে তোমার কার্য্য করিবার উপযুক্ত বলবীর্য্য প্রদান কর।

৪। তুমিই আমাদের অন্নপূর্ণা জননী। তোমার এই জগতভাণ্ডার অন্নে পরিপূর্ণ রহিয়াছে। তুমি তোমার এই পূর্ণ ভাণ্ডার হইতে দুই মুষ্টি অন্ন আমাদের হস্তে প্রদান কর, তাহাই আমাদের অনন্ত কালের সম্বল হইবে। তোমারই আদেশে এক মহাতেজ সমগ্র ব্রহ্মচক্র ব্যাপ্ত করিয়া রহিয়াছে এবং আমাদের বলবীর্য্য বিধান করিতেছে। তুমিই কর্ম্মপ্রবর্ত্তক। তোমারই আদেশে আমরা শত বিধ শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানে নিরত হইয়াছি এবং তাহার ফলে ধনরত্ন ও গো-অশ্ব প্রভৃতি লাভ করি-বার অধিকার পাইয়াছি।

৫। ঋষিরা আমাদিগকে তোমার সিংহাসনতলে উপস্থিত হইবার সুন্দর পথ প্রদর্শন করিয়াছেন। তাহার দুইধারে কত শত সুগন্ধ ও সুদৃশ্য ফুল ফুটিয়া শোভা পাইতেছে। আমরা সেই পথে চলিয়া প্রকৃত আনন্দলাভ করিতেছি। তোমার এই জগতে শতশত লক্ষ লক্ষ ঋষি আবির্ভূত হইয়া জগতবাসীকে মঙ্গলের পথ দেখাইয়া দিতেছেন। তুমি যে আমাদের আত্মার আত্মা পরমাত্মা, মহামুনি শাণ্ডিল্য এই মহাসত্য সর্ব্বপ্রথম প্রচার করিয়া জগতবাসীর উদ্ধারের পথ উন্মুক্ত করিয়া দিয়াছেন। আমরা তাঁহাকে নমস্কার করি।

৬। তোমাকে আত্মার আত্মারূপে পূজা করিয়া আমরা জানিয়াছি যে, আমাদের ভক্তি শ্রদ্ধা যেমন তোমার চরণে অর্পিত হইতেছে, তোমারও স্নেহপ্রেম সেইরূপ প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের মস্তকে অজস্রধারে বর্ষিত হইতেছে। আমরা তোমার নামে জয়ধ্বনি করিয়া আনন্দলাভ করিতেছি; তুমিও সেইরূপ তোমার সন্তানগণের মুখে তোমার জয়োচ্চারণ শুনিয়া আনন্দিত হইতেছ।

১০৫ অঞ্জলি।—ভক্তবৎসল ও শান্তিদাতা দেবতা।

১। হে পরমেশ্বর! তোমার পূজার জন্য আমরা সম্মিলিত হইয়াছি। তুমি আমাদিগকে বল দাও। তুমি আমাদের শত্রুদিগকে পরাজয় প্রদান কর। তাহারা ধনগর্ব্বে ও বলগর্ব্বে বড়ই গর্ব্বিত হইয়া তোমার ভক্তদিগকে দুঃখ ও ক্লেশ দিতে উদ্যত হইয়াছে। যে তেজের দ্বারা তুমি সূর্য্যচন্দ্রকে তেজোময় করিয়াছ, সেই তেজের দ্বারা তুমি আমাদের ক্লেশদায়ী শত্রুদিগকে পরাহত কর।

২। তুমি আমাদিগকে হিংসা করিও না, আমাদিগকে বিনাশ করিও না। আমরা যেন সর্ব্বদা তোমা কর্ত্তৃক অপরিত্যক্ত থাকি।

৩। তুমি পাপনাশক। তুমি আমাদের পাপতাপ সমস্তই দূর কর। তোমার নামের অমোঘ মন্ত্র আমাদের রক্ষাকবচ হইয়া থাকুক। আমাদের সমস্ত হৃদয়ের প্রীতি তোমার অভিমুখে সমুত্থিত হইয়া তোমার সুঘন প্রেমকে আকর্ষণ করুক।

৪। হে ভক্তবৎসল! আমাদের হৃদয়কানন হইতে বাছিয়া বাছিয়া সুগন্ধ পুষ্প সংগ্রহ করিয়াছি এবং তাহা দ্বারা অনেকগুলি সুন্দর স্তবমালা সংরচিত করিয়াছি। আমরা জানি, এগুলি তোমার অতীব প্রিয় হইবে। তুমি প্রীতির সহিত এগুলি গ্রহণ করিয়া আমাদিগকে কৃতার্থ কর।

৫। আমাদের পূজার্চ্চনার ধূম তোমার চরণতল স্পর্শ করুক। আমাদের স্তবস্তুতি তোমার কর্ণে প্রবেশ করুক। আমাদের প্রীতি তোমার প্রীতিকে আকর্ষণ করুক। তুমি মন হইতেও বেগবান। তুমিই তোমার স্বাভাবিক জ্ঞান ও বলের দ্বারা এই বিশ্বজগত সৃষ্টি করিয়াছ। তুমিই আমাদের একমাত্র সম্ভজনীয়। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

৬। তুমিই আমাদের মনরথের একমাত্র সারথি। আমাদের মন যখন বিপথে কুপথে ধাবিত হয়, তখন তুমিই তাহাকে যথাযুক্ত দণ্ড প্রদান করিয়া আবার তোমার পথে ফিরাইয়া আন। সুশাসিত মনের ন্যায় তোমার উৎকৃষ্টতর বাহন দ্বিতীয় নাই। তোমার বল সর্ব্বত্র অপ্রতিহত।

৭। তুমি তোমার ভক্ত ও অভক্ত সকলেরই প্রতি তোমার স্নেহপ্রেম সমভাবে বর্ষণ কর। তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবানকে যে জ্ঞান দাও, যে সুখশান্তি দাও তাহাও তোমার স্নেহপ্রেমের পরিচায়ক; তোমার প্রতি সংশয়াত্মা মানব যে অশান্তি ভোগ করে, যে অজ্ঞানের ভিতর ডুবিয়া মুক্তিলাভের জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠে, তাহারও ভিতরে তোমার অগাধ প্রীতির নিদর্শন পাওয়া যায়। সাধু অসাধু সকলেই তোমার স্নেহপ্রেমের নিত্য অধিকারী।

৮। অধর্ম্ম যখন সংসারকে আচ্ছন্ন করিতে উদ্যত হয়, তখন তোমার প্রীতি রুদ্রবেশে নামিয়া তাহাকে পদদলিত করে। ধর্ম্ম যখন সংসারে স্বীয় প্রভাব বিস্তৃত করে, তখন তোমার প্রীতি সুখশান্তির মূর্ত্তিতে নামিয়া তাহাকে সুরক্ষিত করে।

৯। তুমি তোমার ভক্তদিগকে এই অমোঘ আশ্বাসবাণী দিয়াছ যে, তুমিই তাহাদের যোগক্ষেম বহন করিবে। আমাদের যোগক্ষেম বহন করিয়া তোমার সেই আশ্বাসবাণী সফল কর।

১০। আমাদের কপিলা গাভীসকল সুমিষ্ট

দুগ্ধ প্রদান করুক। সেই দুগ্ধ আমাদের সন্তান-সন্ততিকে বলবীর্য্য প্রদান করুক। বলবীর্য্যে পরিপুষ্ট হইয়া তাহারা আমাদের অভীষ্ট সিদ্ধ করুক। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ হউক।

১১। আমাদিগকে তোমার চরণস্পর্শ করিবার অধিকার প্রদান কর। তোমার চরণস্পর্শ করিবার ফলে আমাদের হৃদয় হইতে শতবিধ মধুময় ভাবের গীতসকল সমুত্থিত হউক—সুরনর সকলে নিস্পন্দ নির্ব্বাক হইয়া তাহা শ্রবণ করিতে থাকুক। আমাদের যশ ও কীর্ত্তি দিগন্তবিশ্রুত দেখিয়া শত্রুগণ হিংসায় জর্জ্জরিত হইবে। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সফল হউক।

১২। আমাদিগকে বংশপরম্পরায় বিজ্ঞানে ও প্রজ্ঞানে প্রবর্দ্ধিত কর, যাহাতে আমরা সত্যস্বরূপ তোমাকে সত্যভাবে পূজা করিতে পারি। আমরা তোমার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছি বলিয়া তোমার শত্রুগণ আমাদের সঙ্গে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছে। তোমার মাভৈবাণী আমাদের কর্ণে প্রবেশ করিয়াছে, আমরাও সেই যুদ্ধে নামিতে পরাংমুখ হইব না। তোমার মঙ্গল ইচ্ছা সফল হউক।

১৩। তুমিই এই বিশ্বজগতের একমাত্র অধীশ্বর। তোমার প্রতিদ্বন্দ্বী দ্বিতীয় কেহ নাই। তোমার মঙ্গল বিধানে তোমার শত্রুগণ নিজকৃত পাপের অগ্নিতে নিজেরাই দগ্ধ হয়।

১৪। কাপুরুষ পাপাত্মাগণ তোমার মঙ্গল পদধ্বনি শ্রবণ করিবামাত্র চতুর্দ্দিকে পলায়ন করিয়া আত্মগোপন করিতে ইচ্ছা করে—তোমার ভয়ে তাহারা মুহূর্ত্তেরও জন্য স্থির থাকিতে পারে না।

১৫। তুমি আদিত্যবর্ণ। তোমাকে অন্ধকার স্পর্শ করিতে পারে না। তুমিই বিশ্বকর্ম্মা। তোমারই যন্ত্রের মুখে এই অগণিত চন্দ্রসূর্য্য অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র প্রকাশ পাইয়া আমাদের আনন্দ বর্দ্ধন করিতেছে।

১৬। আমাদের ইন্দ্রিয়সকল যখন উদ্দাম হইয়া উঠে এবং দুষ্ট অশ্বের ন্যায় যখন আমাদিগকে তোমা হইতে দূরে লইয়া যাইতে উদ্যত হয়, তখন তুমিই আমাদের সারথি হইয়া সেই ইন্দ্রিয়গণকে আবার তোমার পথে ফিরাইয়া আন। সেই দুষ্ট ইন্দ্রিয়গণকে সুপথে ফিরাইয়া আনিবার শক্তি তুমি ব্যতীত অন্য কেহই ধারণ করে না। তোমার সারথ্য লাভ করিয়া যাহারা ইন্দ্রিয়গণকে সুপথে পরিচালিত করে, তাহারা শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করে এবং অপার সুখশান্তি লাভ করে। তাহারা নিশ্চয়ই শতবর্ষ পরমায়ু লাভ করে।

১৭। তুমি আমাদের সকল ভয়বিপদদের মাঝে বর্ম্মদুর্গ হইয়া আছ। আমরা তাই নির্ভর হইয়া গিয়াছি। শতসহস্র শত্রুও আমাদের বিনাশ সাধন করিতে পারে না। আমাদিগকে মৃত্যুও বিভীষিকা দেখাইতে পারিতেছে না। তুমিই আমাদের রক্ষক। তোমার স্নেহপ্রেম আমাদিগকে সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছে। তুমি আমাদিগকে শ্রদ্ধাবান ও সবল বহু পুত্র প্রদান কর। তুমি আমাদিগকে এমন পুত্র দাও, যাহারা সকল কর্ম্মে তোমার ইঙ্গিত বুঝিতে পারিবে; যাহারা আমাদিগকে, আমাদের পরিজনদিগকে, এবং আমাদের ধনভাণ্ডার ও আমাদের দেশ ও সমাজকে সর্ব্বতোভাবে রক্ষা করিতে পারিবে।

১৮। তুমিই আমাদের অগ্রণী। তুমিই আমাদের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ সেনাপতি। তোমার নামে আমরা শত্রুগণের উপর বিজয়লাভ করিয়া দানযজ্ঞের দ্বারা তোমার পূজা করিব। তুমি আমাদিগকে যে অবস্থায় আনয়ন করিয়াছ, সেই অবস্থায় স্থির ভাবে দাঁড়াইবার উপযুক্ত প্রচুর ধনরত্ন প্রদান কর। আমরা একমাত্র তোমাকেই আমাদের নেতা বলিয়া জানি। আমাদের এই যজ্ঞসভায় উপস্থিত জনগণের মধ্যে তোমার প্রসাদ অজস্রধারে বিতরণ কর।

১৯। হে পরমপুরুষ, সকল দেবতার পরম দেবতা! তুমি আমাদিগকে সর্ব্বতোমুখী বিজয় প্রদান কর। তুমিই একমাত্র আমাদের সুখদাতা শান্তিদাতা। আমরা তোমাকে নমস্কার করি।

২০। তোমারই আদেশে আমরা দুর্লভ মানবজন্ম লাভ করিয়া এই শ্যামলশোভন জগতে বাস করিবার অধিকার লাভ করিয়াছি। সমস্ত প্রকৃতি আমাদের সহায় হউক। তুমি আমা-

দিগকে পরিত্যাগ করিও না। অমঙ্গল যেন আমাদের কেশস্পর্শ করিতে না পারে। তুমি মঙ্গলবিধাতা। তুমি নিয়তই জগতের মঙ্গলবিধান করিতেছ। আমরা নিয়তই তোমার জয়গান করিতেছি। তুমি আমাদের প্রতি সুপ্রসন্ন হইয়া আমাদের সুখস্বাচ্ছন্দ্য বিধান কর।

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাস।

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

ধর্ম্মমত ও ধর্ম্মবিশ্বাস দুটী সম্পূর্ণ বিভিন্ন বস্তু। এক-জন লোক ধর্ম্মের কোন্ কোন্ মত মানে আর কোন্ কোন্ মত মানে না, তাহা জানিলেও আমরা তাহার জীবন ও চরিত্রের কোন পরিচয় পাই না। বিভিন্ন প্রকৃতির লোকও ধর্ম্মমতে এক হইতে পারে, এবং এক প্রকৃতির লোকও ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মমত পোষণ করিতে পারে। মত অনেক স্থলেই অবস্থা ও ঘটনাচক্রের ফল। একজন লোক ভারতবর্ষে হিন্দুগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া হিন্দু হয়, অপর একজন লোক আরবদেশে মুসলমানগৃহে জন্মগ্রহণ করিয়া মুসলমান হয়। ভ্রান্ত মতের জন্য ঈশ্বর কখনই কাহাকেও দণ্ড দিবেন না। ধর্ম্মের যাহা মূল কথা, সে বিষয়ে সকল দেশের এবং সকল সম্প্রদায়ের ভক্ত বিশ্বাসীদের মধ্যে আশ্চর্য্য মিলন দেখা যায়। ঈশ্বরের অস্তিত্ব ও স্বরূপ সম্বন্ধে, পরকাল সম্বন্ধে, মানবের আধ্যাত্মিক স্বাধীনতা ও পাপপুণ্য সম্বন্ধে, নীতিপালনের আবশ্যকতা সম্বন্ধে এবং জনসমাজে পরস্পরের সহিত ব্যবহার সম্বন্ধে সকল দেশের ও সকল কালের সাধুভক্ত-দের একই প্রকার বিশ্বাস। এ সকল বিষয়ে তাঁহাদের মধ্যে কোন বাদবিসংবাদ নাই। ধর্ম্মমতের মূলে জ্ঞান-বুদ্ধি কিন্তু বিশ্বাসের মূলে হৃদয় ও প্রকৃতি। ধর্ম্মমতের সহিত জীবনের সম্বন্ধ অতি ক্ষীণ কিন্তু ধর্ম্মবিশ্বাসের সহিত জীবনের সম্বন্ধ অতি গূঢ়। একজন লোকের ধর্ম্মমত অতি বিশুদ্ধ হইতে পারে, অথচ তাহার জীবন ভাল নাও হইতে পারে, কিন্তু বিশ্বাসীর জীবন ভাল হইবেই হইবে। যাহার জীবন ভাল নয়, নিশ্চয় জানিও তাহার বিশ্বাস নাই।

আমরা জীবনে যাহা দেখি শুনি, সেই অভিজ্ঞতা বা বহুদর্শিতা হইতে যে আমরা ধর্ম্মবিশ্বাস লাভ করি এ কথা সত্য নহে। আমাদের প্রকৃতিভেদে আমরা যাহা দেখি শুনি তাহার ভিন্ন ভিন্ন অর্থ করিয়া লই, লোকের ব্যবহারের মূলে সরল বা কুটিল অভিসন্ধি ধরিয়া লই। যাহার হৃদয় কুটিল, সে সর্ব্বত্র কুটিলতাই দেখে। সে জগতের মুখে কোথাও শোভা-সৌন্দর্য্য দেখিতে পায় না এবং জনসমাজে কোথাও সত্য ও মহত্বের সন্ধান পায় না। যে ঘটনার ফল ভাল হইতে পারে মন্দও হইতে পারে সেখানে সে মন্দটাই ধরিয়া লয়। যে কাজের পশ্চাতে সাধু এবং অসাধু দুই প্রকার অভিসন্ধি থাকাই সম্ভব, সেখানে সে অসাধু অভিপ্রায়টাই ধরিয়া লয়। একজন সরলহৃদয় ব্যক্তির বহির্জ্জগৎ সম্বন্ধে এবং মানব-প্রকৃতি সম্বন্ধে যে সহজ ধারণা তাহারই নাম বিশ্বাস। এই ধারণা বশতঃ তিনি জগতের মুখে কত শোভা সৌন্দর্য্য ও কল্যাণের কৌশল দর্শন করেন এবং মানবপ্রকৃতির মূলে কত প্রেম ও সাধুতা দর্শন করেন।

এক-একজন লোক কেমন খোলা প্রাণ। তাঁহারা সকলকেই ভাল বলিয়া মনে করেন। যতক্ষণ একজন লোককে মন্দ বলিয়া প্রমাণ না পান ততক্ষণ তাহাকে সন্দেহ করিতে পারেন না। তাঁহারা জানেন যে মানব-প্রকৃতির দেবভাবগুলি নীচ পশুভাবের প্রভু ও রাজা, পশুভাবের নিকট কখনই তাহারা লাঞ্ছিত হইবে না। তাঁহারা জানেন মানুষ যে ঈশ্বরের সন্তান, এই দেবভাব-গুলিই তাহার সাক্ষী। তাঁহারা জানেন যে জগৎ ধর্ম্ম-বিধির উপরে প্রতিষ্ঠিত এবং বিশ্বপ্রবাহের অন্তরালে ঈশ্বরের মঙ্গলহস্ত বিরাজিত।

অপরিচিত লোকের সঙ্গে প্রথম আলাপেই তুমি দেখিলে যে তাহার মুখে কেমন একটা সরলতার ছাপ আছে, তাহার দৃষ্টি কেমন বিশ্বাসপূর্ণ, তাহার কথা শুনিলেই বুঝা যায় যে, তোমার প্রতি তাহার অন্তরে একটা প্রীতির ভাব আছে, তখন তুমিও মন খুলিয়া সরল ভাবে তাহার সহিত মিশিয়া যাও। তুমি আর একজন অচেনা লোকের সংস্পর্শে আসিলে, সে হয় ত প্রথম লোকটীর হইতেও অধিক ভদ্রতা ও শিষ্টাচার দেখাইল; কিন্তু তাহার হাসির মধ্যে কেমন একটু বক্রতা আছে, তুমি যাহা বলিতেছ তাহার পশ্চাতে তোমার মনের মধ্যে কি অভিসন্ধিটা লুকান আছে তাহার চক্ষু যেন সেই অভিসন্ধিটা খুজিতেছে, এবং তাহার কথা শুনিয়া তাহার মনের ভাব তুমি কিছুই ধরিতে পারিতেছ না। কোন ভাল বিষয়ে তুমি আনন্দ ও উৎসাহ প্রকাশ করিলে, সে তোমার ছেলেমানুষী দেখিয়া ভ্রূকুঞ্চনের দ্বারা একটু বিদ্রূপ করে; কোন অন্যায় ও অত্যাচারের কথা শুনিয়া যদি তুমি ক্রোধে অধীর হইলে, সে একটু ঠোঁট বাঁকাইয়া বিস্ময় প্রকাশ করে। সহানুভূতির কথাটার অর্থই সে বুঝে না। তুমি যে কি প্রকৃতির লোক তাহা এই দুজ-নের মধ্যে একজনও জানে না, কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন আসে তোমার প্রতি অন্তরের বিশ্বাস লইয়া, দ্বিতীয় ব্যক্তি আসে তোমার প্রতি অবিশ্বাস লইয়া।

তাহারা যে তোমার সম্বন্ধে প্রমাণ লইয়া অনুসন্ধান করিয়া তোমাকে বিশ্বাস বা অবিশ্বাস করিতেছে তাহা নহে; কিন্তু একজনের প্রকৃতিই সরল, দ্বিতীয় লোকটীর প্রকৃতিই কুটিল। এই ত গেল প্রথম সাক্ষাতের কথা। তাহার পরে যখন তোমার সহিত তাহাদের ঘনিষ্ঠতা জন্মিবে, তখন তোমার সম্বন্ধে তাহাদের বিপরীত ধারণা আরও বদ্ধমূল হইবে। একজন তোমার সদ্গুণের পরিচয় পাইয়া তোমার প্রতি আরও আকৃষ্ট হইবে; আর দ্বিতীয় ব্যক্তি তোমার প্রত্যেক কথায় ও কাজে বুঝিবে যে তুমি বড় শঠ ও স্বার্থপর, কিন্তু সে তোমাকে চিনিয়া ফেলিয়াছে, তাহার কাছে তোমার চাতুরী খাটিবে না। এ কথা সত্য যে কখন কখন আমরা লোকের সঙ্গে ব্যবহার করিয়া ঠিক ঠিকই বুঝি যে সে কি প্রকৃতির লোক; কিন্তু অধিকাংশ স্থলেই আমরা যে অপরের দোষগুণ দেখি তাহা আমাদের নিজ নিজ প্রকৃতিরই প্রতিচ্ছায়া—আমরা নিজে যেমন লোক, অপরকে তেমনি দেখি এবং অপরের সমালোচনাতে নিজেদেরই স্বভাবের পরিচয় দিই।

এক শ্রেণীর লোক আছে যাহারা বড় লঘুচিত্ত। তাহারা আমোদপ্রমোদ করিয়াই জীবন কাটাইতে চায়। পাপ ও দুর্নীতিকে তাহারা বড় হালকা ভাবে দেখে। তাহারা মুরুব্বিয়ানার সুরে বলে "আঃ ও সব যেতে দাও, ও সব ধর্ত্তব্য নয়, ও সব ক্ষমা করা উচিত।" যেন তাহারাই পাপ ক্ষমা করিবার মালিক! যেন পুণ্যময় ধর্ম্মরাজ ঈশ্বর তাহাদিগকে বিচারাসন ছাড়িয়া দিয়াছেন! পাপ সম্বন্ধে এইরূপ লঘুভাবে কথা বলা উদারতার ভাণ মাত্র, বাস্তবিক ইহা স্পর্দ্ধার পরাকাষ্ঠা। ইহাকে মানব প্রেম বলা অপেক্ষা প্রেমের আর অধিক অবমাননা সম্ভব নহে। পাপসম্বন্ধে উদারতার অর্থ—ধর্ম্মসম্বন্ধে উদাসীনতা এবং মানবপ্রকৃতির স্বাভাবিক সাধুতাতে অবিশ্বাস। তাহাদের নিকট চরিত্রের কোন মূল্য নাই। নির্ম্মল জীবনের সৌন্দর্য্য তাহাদিগের আকাঙ্ক্ষার অতীত। যিনি মানবপ্রকৃতিকে শ্রদ্ধা করেন তিনি স্বভাবতঃ সকল লোককেই ভাল বলিয়া মনে করেন। একজন লোক যে পাপ করিতে পারে এ কথা তিনি সহজে বিশ্বাস করেন না। যখন তিনি নিঃসন্দেহ প্রমাণ পান যে অমুক ব্যক্তি সত্য সত্যই একটা ভয়ানক গর্হিত কর্ম্ম করিয়াছে তখন তিনি মনে বড় ব্যথা পান, তখনও তিনি সেই ব্যক্তির সহজ সাধুতাতে অবিশ্বাস করিতে পারেন না। সেই দুষ্কর্ম্মের জন্য সে ব্যক্তি যে কত লজ্জা অশান্তি ও আত্মগ্লানি ভোগ করিতেছে তিনি সেই কথাই চিন্তা করেন। ভগবৎকরুণা যে আবার তাহাকে ধর্ম্মপথে ফিরাইয়া আনিবে, অনুতাপের আগুনে পুড়িয়া সে যে পূত ও পরিশুদ্ধ হইবে, এবং তাহারও জীবনে যে প্রেমপুণ্যের জয় হইবে সে সম্বন্ধে তাঁহার অনুমাত্র সন্দেহ থাকে না। সত্য কথা এই যে, যাহারা মানবপ্রকৃতিকে শ্রদ্ধার চক্ষে না দেখে, তাহারা মানুষকে ভালবাসিতেও পারে না। বিশ্বাসের অভাবে প্রেমও শুষ্ক হইয়া যায়।

খৃষ্টধর্ম্মের মতে ঈশ্বরের আশীর্ব্বাদ ভক্তহৃদয়ে বিশ্বাস আশা ও প্রেম এই তিন আকারে অবতীর্ণ হয়। এই তিনের মধ্যে এমন সূক্ষ্ম যোগ যে একটীর অভাবে আর দুটীও শুষ্ক হইয়া যায়। কিন্তু বোধ হয় সর্ব্বপ্রথমে বিশ্বাসেরই মৃত্যু হয় ও পরে আশা এবং প্রেম তাহার অনুগামী হয়।

মানুষকে ভালভাবে দেখা বা মন্দভাবে দেখা ক্রমে একটী অভ্যাসে পরিণত হয়, এবং যখন আমরা মানুষ ছাড়িয়া ঈশ্বরের দিকে দৃষ্টিপাত করি, তখনও আমরা এই অভ্যাসকে অতিক্রম করিতে পারি না। আমাদের ধর্ম্মবিশ্বাসের উপরে এই অভ্যাসের ছায়া পড়িবেই পড়িবে। মানুষের সহিত সম্বন্ধ যদি বিশ্বাস ও সদ্ভাবের সম্বন্ধ না হয় তবে ভগবানকেও আমরা বিশ্বাস ও সদ্ভাবের চক্ষে দেখিতে পারি না। যদি আমরা মানুষকে কেবল সন্দেহ ও অবিশ্বাস করিতে অভ্যস্ত হই, তবে আমরা ভগবানকেও পরম বন্ধু বলিয়া মনে করিতে পারি না এবং তিনি আমাদের সম্বন্ধে যে ব্যবস্থা করেন তাহা মঙ্গল বিধান বলিয়া মস্তকে গ্রহণ করিতে পারি না। অন্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া আমাদের নিজ নিজ অন্তর পরীক্ষা করিলেই এ কথা আমাদের স্বীকার করিতে হয় যে হৃদয়ের ভিন্ন ভিন্ন অবস্থায় ঈশ্বরের প্রতি দৃষ্টি আমাদের কত বিভিন্ন। যখন আমাদের চিত্ত শান্ত ও প্রসন্ন থাকে, তখন ঈশ্বর, পরলোক ও ধর্ম্মবিধি কত সহজ সত্য বলিয়া মনে হয়; আর যখন ভয় বিরক্তি ও নিরাশায় চিত্ত শুষ্ক কঠিন ও অবসন্ন হয়, তখন ঐ সকল সত্য কত ছায়া-ছায়া ও কত অস্পষ্ট মনে হয়! এ দুটী অবস্থায় আমাদের অন্তর্দৃষ্টির কত প্রভেদ! দৃশ্য জগতের কথাই বল আর অধ্যাত্ম জগতের কথাই বল, আমাদের চিন্তার ধারা হৃদয়ের অবস্থার উপরে যে পরিমাণে নির্ভর করে আমাদের বিদ্যাবুদ্ধির উপরে সে পরিমাণে নির্ভর করে না। ধর্ম্মবিশ্বাস ও নাস্তিকতা যে দুটী বিপরীত দার্শনিক তত্ত্ব মাত্র—এ কথা সত্য নহে। কেহ যদি বলেন যে যখন আমরা স্বাধীন চিন্তার পক্ষপাতী, তখন আমরা আস্তিক ও নাস্তিককে সমান চক্ষে দেখিব—ইহাকে উৎকট উদারতা বলা যাইতে পারে। আস্তিকতা ও নাস্তিকতা শুধু বুদ্ধির সিদ্ধান্ত নহে, কিন্তু উহাদের মূলে ধর্ম্মবিধিতে বিশ্বাস এবং অবিশ্বাস। প্রেম ও বিদ্বেষ, বিলাসিতা এবং বৈরাগ্য, বিনয় ও দম্ভ, সরলতা ও চাতু-

রীকে আমরা সমান চক্ষে দেখি না। সুতরাং আস্তিকতা ও নাস্তিকতা যদি শুধু দুটী দার্শনিক মত না হয়, উহাদের মধ্যে যদি হৃদয় ও চরিত্রের পরিচয় থাকে, তবে আস্তিকতা ও নাস্তিকতা সম্বন্ধে আমাদের সমদৃষ্টি হওয়া সম্ভব নহে। অবশ্য আস্তিক ও নাস্তিকের রাজদ্বারে সমান অধিকার থাকা কর্ত্তব্য; কিন্তু উহাদের মধ্যে একজন মানবহৃদয়ের স্বাভাবিক সাধুতাতে বিশ্বাস করে আর এক জনের সে বিশ্বাস নাই, সেই জন্য আমরা উভয়কে সমান প্রীতির সহিত গ্রহণ করিতে পারি না।

যে ব্যক্তি সর্ব্বদাই সন্দেহ করে যে তাহার বন্ধু-বান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলেই ক্রমাগত তাহার সর্ব্বনাশের চেষ্টা করিতেছে, সে যখন ঈশ্বরের দিকে চক্ষু উত্তোলন করে তখন মুহূর্ত্ত মধ্যে তাহার দৃষ্টি সরল শিশুর মত নিশ্চিন্ত ও নিরুদ্বেগ হইয়া যাইবে—ইহা বড় সম্ভব নয়। যে মানুষকে বিশ্বাস করে না সে ঈশ্বরকেও বিশ্বাস করে না। ঈশ্বর আছেন একথা সে মনে মানিতে পারে কিন্তু তিনি যে প্রেমময় মঙ্গলময় বিধাতা—তাহার হৃদয় এ কথায় সায় দেয় না। যাহার অন্তরে প্রেম নাই মানবজীবনের মর্ম্ম গ্রহণ করা তাহার পক্ষে যেমন দুরূহ, বহির্জ্জগতের রহস্য-ভেদ করাও তাহার পক্ষে তেমনি কঠিন। নিখিল বিশ্ব প্লাবিত করিয়া প্রকৃতির কণ্ঠ হইতে যে উদাত্ত সামগান ধ্বনিত হইতেছে, তাহার কোথাও একটু মাত্রা ভুল হইতেছে কি না কেবল সেই দিকেই তাঁহার লক্ষ্য। প্রাকৃতিক নিয়মের যে বিশাল প্রবাহ যুগযুগান্তর ধরিয়া মঙ্গলের দিকে অগ্রসর হইতেছে এবং যে প্রবাহে তিনি নিজেও ভাসমান, তাহার মঙ্গল ভাবের প্রতি তিনি অন্ধ, কিন্তু তাহার মধ্যে খুঁজিয়া খুঁজিয়া দোষ বাহির করিবার জন্যই তিনি ব্যাকুল। গুপ্তচরের মত সন্দেহের দৃষ্টিতে তিনি চারিদিক নিরীক্ষণ করেন এবং ব্রহ্মাণ্ডের কোন কিছু দেখিয়াই তিনি ভক্তিতে আপ্লুত বা বিস্ময়ে উৎফুল্ল হন না। না দেখিয়া তিনি কিছুই বিশ্বাস করেন না, কিন্তু যাহা কিছু দেখেন তাহাই তাঁহার চক্ষে কুৎসিত লাগে ও তাহারই তিনি দোষ বাহির করেন। নক্ষত্রখচিত নৈশাকাশে তিনি সম্ভ্রম ও রহস্যের কিছুই দেখিতে পান না, কিন্তু চন্দ্র কেন মরুময় হইল এই তাঁর আপত্তি। বর্ষার বারিধারা কোটী কোটী ক্ষেত্রকে শস্যসম্ভারে পূর্ণ করিতেছে সে কথা তাঁহার মনে হয় না, কিন্তু তাঁহার পথে কেন কাদা হইল এই তাঁহার তর্ক। যে মহা জীবনধারা সংখ্যাতীত প্রাণিপুঞ্জের মধ্য দিয়া প্রবাহিত হইতেছে সে বিপুল আনন্দকল্লোলের প্রতি তিনি বধির, কিন্তু মশা-মাছির উৎপাতেই তিনি ব্যতিব্যস্ত। "ভগবান যদি দয়াময় তবে আমার হাঁটুতে বাত হইল কেন?" তাঁহার মুখে এই তর্ক। "জগতে যদি ন্যায়বিচার থাকিত তবে আমি নিশ্চয়ই উচ্চ বেতনের রাজকর্ম্মচারী হইতাম" তাঁহার কণ্ঠে এই আক্ষেপ।

আমাদের সকলের মধ্যে সন্দেহ অবিশ্বাসের বীজ নিহিত আছে এবং উপরে যে দুর্দ্দশার কথা বলিলাম সে দুর্দ্দশা অল্পাধিক পরিমাণে আমরা সকলেই সময়ে সময়ে জীবনে ভোগ করিয়া থাকি। সময়ে সময়ে আমাদের সকলেরই বিশ্বাসদৃষ্টি ক্ষীণ হইয়া আসে ও হৃদয়ের প্রীতি ম্লান হইয়া পড়ে। তখন বিশেষ মনোযোগ দিয়া না শুনিলে বিবেকের বাণী আমরা শুনিতে পাই না। তখনই ঈশ্বরের অস্তিত্বে আমাদের সন্দেহ হয়। জীবনের দুঃখ-দুর্দ্দিনে, শোকের অন্ধকারে, দুশ্চিন্তার উদ্বেগে, দুর্দ্দম রিপু-সংগ্রামে প্রকৃতির নিকট হইতে সহানুভূতির কোন সাড়া শব্দ না পাইয়া আমাদের মনে হয় প্রকৃতি বুঝি নির্ম্মম ও উদাসীন, বুঝি বা অন্ধ ও বধির। তখন ভুলিয়া যাই যে ভগবানের করুণা জীবনে কত দিন সম্ভোগ করিয়াছি এবং কতবার তাঁহার পুণ্যস্পর্শে মৃত্যু হইতে নবজীবনে সঞ্জীবিত হইয়াছি। একটী ছোট বস্তু যেমন আমাদের চক্ষুর নিকটে ধরিলে তাহা আমাদের দৃষ্টি হইতে সূর্য্যকেও ঢাকিয়া ফেলিতে পারে সেইরূপ একটু সামান্য দুঃখকষ্ট আমাদের অন্তশ্চক্ষু হইতে ভগবানকে আচ্ছন্ন করে। ইহা বড় আশ্চর্য্য কথা, বড়ই পরিতাপের কথা, কিন্তু তথাপি সত্য। আমাদের আত্মা যখন সুস্থ অবস্থায় থাকে তখন আমরা পরিষ্কার বুঝিতে পারি যে মানুষ স্বাধীন, আমাদের ভার আমাদের প্রত্যেকের আপন আপন হাতে, আমরা ইচ্ছা করিলে গভীরতম নরকে ডুবিতে পারি আবার ইচ্ছা করিলে স্বর্গের আকাশেও উড়িতে পারি। বাস্তবিক স্বর্গের আকাশে মুক্তপক্ষে উড়িবার শক্তি মানু-ষের আছে এবং মানুষ যতই সেই আকাশে উড়িতে থাকে ততই তাহার পক্ষ আরও সবল ও দৃঢ় হয়। আমাদের আত্মার সুস্থ অবস্থায় ইহার অপেক্ষা সহজ সত্য যেন আর কিছুই নাই বলিয়া মনে হয়, কিন্তু দুর্দ্দশার দিনে যখন জীবন যাপন না করিয়া জীবন লইয়া তর্ক-বিতর্ক ও আলো-চনা করি, তখন মনে হয় কৈ আমাদের স্বাধীনতা?—আমরা প্রকৃতির অধীন এবং নিয়তির শৃঙ্খলে দৃঢ়রূপে বদ্ধ। যখন আমাদের কোন ভক্তিভাজন আত্মীয় বন্ধুর আসন্ন-কাল উপস্থিত হয় এবং আমরা তাঁহার সুন্দর জীবন, তাঁহার হৃদয়ের মহত্ব, আমাদের প্রতি তাঁহার সুকোমল স্নেহ ও আশীর্ব্বাদ স্মরণ করি—তখন সহজেই বিশ্বাস হয় যে তিনি অমৃত ধামে যাত্রা করিতেছেন এবং সেই লোকে তাঁহার আত্মা দিন দিন উন্নতি হইতে আরও উন্নতিতে অগ্রসর হইবে। কিন্তু যদি দীর্ঘকাল ধরিয়া সেবাশুশ্রূষা এবং জাগরণের ক্লেশে আমরা ক্লান্ত হইয়া পড়ি এবং তাঁহার সুন্দর জীবন, তাঁহার হৃদয়ের মহত্ব ও আমাদের

প্রতি তাঁহার স্নেহপ্রেমের কথা ভুলিয়া গিয়া কেবল বহিশ্চক্ষে যাহা দেখা যায় তাঁর সেই জীর্ণশীর্ণ বিকলেন্দ্রিয় দেহটার প্রতিই দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখি—তবে পরলোক সম্বন্ধে কত সন্দেহ, কত কঠিন কঠিন প্রশ্ন আমাদের মনে আসে এবং অনন্তজীবনের আশা ও গৌরব আমাদের হৃদয়ের অন্ধকারে বিলীন হইয়া যায়।

এই সকল স্থলে আমাদের জড়দৃষ্টির নিকটে আমাদের আধ্যাত্মিক দৃষ্টি পরাভূত হয়। এরূপ অবস্থায় আমরা যে সন্দেহে আকুল হই তাহার মূলে যুক্তির আলোক নয় কিন্তু হৃদয়ের অন্ধকার।

মানবের সম্পর্কে এবং ঈশ্বরের সম্পর্কে যেন আমরা সন্দেহ অবিশ্বাসকে অন্তরে স্থান না দিই। একজন লোকের সরল মুখ দেখিয়া এবং সরল কথা শুনিয়া যেমন আমরা তাহাকে বিশ্বাসের সহিত আত্মীয় বলিয়া গ্রহণ করি, তেমনি জগতের শোভাসৌন্দর্য্যে, বিবেকপ্রদর্শিত ধর্ম্মবিধিতে, মানবহৃদয়ের অনন্তমুখী আশা ও আকাঙ্খায় এবং সকল দেশের ও সকল যুগের ঋষি-মহর্ষিদিগের দিব্যচক্ষে উদ্ভাসিত নরজাতির ভবিষ্যৎ উন্নতিতে আমরা যেন ভগবৎকরুণা দর্শন করি। বিশ্বজননী আমাদের প্রত্যেকের জন্য অমৃতধামে কত জ্ঞান, কত ভক্তিবিশ্বাস কত প্রেমপুণ্য, কত আনন্দ-শান্তি সঞ্চিত করিয়া রাখিয়াছেন—তাহা আমরা কল্পনা করিতেও পারি না। ইহা ভক্তির অত্যুক্তি নহে। অনন্তস্বরূপ যিনি, তাঁহার সম্বন্ধে কোনরূপ অত্যুক্তি করা সম্ভব নহে। আমাদের সর্ব্বোচ্চ চিন্তা ও কল্পনা তাঁহার জ্ঞান প্রেম ও পুণ্যের ক্ষীণ ছায়া মাত্র, আমাদের সর্ব্বোচ্চ আশা ও আকাঙ্ক্ষা আমাদের সত্য সৌভাগ্যের তুলনায় কিছুই নহে। যখনই সন্দেহের মেঘ আসিয়া আমাদের অন্তশ্চক্ষুকে আচ্ছন্ন করিবে এবং আমাদের মনে হইবে যে এত সৌভাগ্য কি সত্য হয়?—যখনই এই প্রকার হীনতা ও অবিশ্বাস আমাদিগকে আক্রমণ করিবে, তখনই যেন আমরা বিশ্বাসের জন্য ভগবানের চরণে ব্যাকুল অন্তরে প্রার্থনা করি।

ভারতচন্দ্র রায়ের বাটী ও কাউগাছির দুর্গ দর্শন।

(৺রাখালদাস হালদার)

যে সকল মনুষ্য ধর্ম্মপ্রচার বা বিদ্যানুশীলন করেন, তাঁহাদের প্রতি আমার অত্যন্ত ভক্তির উদয় হয়। তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত জানিতে পারিলে আমি সাতিশয় সুখী হই। জীবনবৃত্তান্ত সংগ্রহে ইংরাজদের ও অন্যান্য ইউরোপীয় জাতির বিশেষ যত্ন আছে; আমি কৌতূহলাক্রান্ত হইয়া অন্যূন দুইশত ব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত অদ্যাপি পাঠ করিয়াছি। স্বদেশীয় বিখ্যাত ব্যক্তিদের জীবনচরিত জানিবার উপায় অতি অল্প। যাঁহারা অনতিদীর্ঘকাল পূর্ব্বে প্রাদুর্ভূত হইয়াছেন, তাঁহাদের পুত্রপৌত্রাদির সাহায্যে তাঁহাদের জীবনবৃত্তান্ত সংগৃহীত হইতে পারে।

আমি শুনিয়াছিলাম, ভারতচন্দ্র রায়ের পৌত্র তারকনাথ রায় মূলাজোড় গ্রামে বাস করেন। ভারতচন্দ্র রায়ের ন্যায় মহাব্যক্তির জীবনবৃত্তান্ত জানিবার এমত সহজ উপায় আছে, শুনিয়া আমি আনন্দিত হই; এবং স্বকীয় প্রিয় অভিলাষ পূর্ণ করিবার মানস করিয়া আমি গত ১২ই কার্ত্তিক [১৭৭৬ শকে] তারকনাথ রায় মহাশয়ের বাটীতে গমন করিলাম। আমি পূর্ব্বে জানিতাম না যে ভারতচন্দ্র রায় যে গ্রামে বাস করিয়াছিলেন, তাহার এত নিকটে আমরা বাস করিয়া থাকি। মূলাজোড় আমাদের জগদ্দল হইতে এক ক্রোশের অধিক দূর নহে। ভারতচন্দ্র মূলাজোড়ে বাস করিয়াছিলেন কাহারও মুখে শুনি নাই। আমি ইহাও জানিতাম না যে, ভারতের পৌত্র রামধন রায়ের সহিত আমার পিতার সৌহার্দ্দ্য ছিল। উভয়ে বহুকাল একস্থানে অবস্থিতি করিতেন, এবং পরস্পর ভ্রাতৃসম্বোধন করিতেন। এ সকল অবগত হইয়া যখন ভারতের বাটীতে পদার্পণ করিলাম, তখন একেবারে কৃতার্থম্মন্য হইলাম। নিজ পরিচয় প্রেরণ করাতে তারকনাথ রায় আমাকে অতি আত্মীয়ের ন্যায় গৃহমধ্যে গ্রহণ করিলেন। দেখিলাম তাঁহার বয়স অশীতিবর্ষের অতীত হইয়াছে। তিনি বহুদিবসাবধি পক্ষাঘাতগ্রস্ত; এবং কিয়দ্দিন পূর্ব্বে সম্পূর্ণরূপে দৃষ্টিশক্তিহীন হইয়াছেন। তাঁহার বিজ্ঞতা প্রতীতি করিয়া আমি পরিতুষ্ট হইলাম। আমার আগমন ও তাৎপর্য্য অবগত করাতে তিনি কহিলেন কিয়ন্মাস গত হইল জয়গোপাল বন্দ্যোপাধ্যায় নামক এক ব্যক্তি তাঁহার নিকট আসিয়া সেই সকল বিষয় লিখিয়া লইয়া গিয়াছেন। তৎপরে রায় মহাশয়ের সহিত গৃহ সম্বন্ধীয় নানাপ্রকার কথাবার্ত্তাতেই অনেক সময় বিগত হইল। আমিও তাঁহাকে পুনর্ব্বার বিরক্ত করিবার ইচ্ছা করিলাম না; ভাবিলাম, পূর্ব্বোক্ত বন্দ্যোপাধ্যায় যখন যত্নপূর্ব্বক ভারতচন্দ্র রায় সম্পর্কীয় বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়াছেন, তখন অবশ্যই প্রকাশ করিবেন। রায় মহাশয়ের পুত্রের নাম বাবু অমরনাথ।

পূর্ব্বোক্ত দিবসে আমি কৌতূহলাবিষ্ট হইয়া কাউগাছির দুর্গ দর্শনে গমন করিয়াছিলাম। এই দুর্গ ক্ষুদ্র নহে; বোধ হয় ফোর্টউইলিয়াম ব্যতীত ইহার অপেক্ষা

উৎকৃষ্টতর দুর্গ বঙ্গদেশ মধ্যে অতি অল্পই আছে। যে সময়ে মহারাষ্ট্রীয়েরা বঙ্গদেশ লুঠ করিত, তখন ধনপ্রাণ রক্ষার্থে বর্দ্ধমানের ভূস্বামীরা তাহা নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন; এবং মধ্যে মধ্যে তথায় আসিয়া অবস্থিতি করিতেন। দুর্গের দুই পরিখা আছে; বহিঃপরিখা ও অন্তঃপরিখা, সুতরাং বপ্র অর্থাৎ বেষ্টনের সংখ্যাও দুই; সেগুলি কেবল মৃত্তিকাময়, উর্দ্ধে ১০ বা ১২ হাত। শুনা গেল, পরিখা নিঃশেষে কখনও শুষ্ক হয় না। অন্তঃ বেষ্টনের পশ্চিমভাগে এক ইষ্টকনির্ম্মিত সিংহদ্বার আছে; তাহার খিলান উর্দ্ধে অন্যূন ১৩ হাত ও প্রস্থে প্রায় ৮ হাত। দ্বার অবশ্যই জীর্ণ হইয়াছে; কিন্তু তথাপি এক সময়ে যে বিলক্ষণ দৃঢ় ছিল, তাহা স্পষ্টই বোধ হয়। অন্তর্বেষ্টন ও বহির্বেষ্টনের মধ্যস্থিত স্থানে ইতর লোকেরা বাস করিতে আরম্ভ করিয়াছে; কিন্তু দুর্গের মধ্যস্থল অত্যন্ত জঙ্গলাকীর্ণ। বাবু প্রসন্নকুমার ঠাকুর এই দুর্গকে পরিষ্কৃত করিতেছেন; ইহা এক্ষণে তাঁহারই অধিকৃত। পরিষ্কৃত বপ্রোপরি সর্ষপবীজ রোপিত হইতেছে। আমি প্রায়ই বলিতে ভুলিয়াছিলাম যে বিশেষ নৈপুণ্যের সহিত এই দুর্গ নির্ম্মিত হয়; বোধ হইতেছে, ভোজরাজকৃত যুক্তিকল্পতরু গ্রন্থে যে প্রকার আকৃতিবিশিষ্ট দুর্গসকল দুষ্য বলিয়া অভিহিত হইয়াছে, প্রস্তাবিত দুর্গ তাহার বহির্ভূত। আমি বঙ্গদেশস্থ অন্য কোন দুর্গ দেখি নাই, এই নিমিত্ত ইহাকে এক বিশেষ প্রকার দুর্গ বলিয়া নির্দ্দেশ করিতে সাহসী হইলাম না।

দুর্গমধ্যে প্রবিষ্ট হইলে আমার বঙ্গদেশের মারহাট্টা সম্পর্কীয় সমস্ত ইতিহাস স্মরণ হইল। তাহারা আমাদের পূর্ব্বপুরুষদিগকে কত কষ্ট দিয়াছে। তাহারা যে দেশ শাসন করিতে না পারিত, লুঠের দ্বারা তাহার সর্ব্বস্বাপহরণ করিত। তাহারা ভাস্কর পণ্ডিতের অধীনে বঙ্গদেশে আসিয়া প্রথমেই বর্দ্ধমান নগর দগ্ধ করে, তাহা হইতেই বর্দ্ধমানের ভূস্বামীরা কাউগাছিতে পলায়ন করিতে বাধ্য হয়েন। পরমেশ্বরকে ধন্যবাদ যে তিনি এক শুভতর কালকে আমাদিগের উপর রাজত্ব করিতে প্রেরণ করিয়াছেন। ১৭৭৬ শক।

* * * *

বাবু ঈশ্বরচন্দ্র গুপ্ত সংপ্রতি ভারতচন্দ্রের জীবনবৃত্তান্ত প্রকাশ করিয়াছেন; রচনা যদিও উত্তম হয় নাই বটে, তথাপি আমরা তাঁহার নিকট বাধিত হইয়াছি। ১৭৭৭ শক।

ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বকথা।

(৩)

(শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায়)

আমরা গত ভাদ্র-সংখ্যায় বলিয়াছি যে নন্দকিশোর বাবু রাজা রামমোহন রায়ের জনৈক প্রিয় শিষ্য ছিলেন। ইনি মহাত্মা রাজনারায়ণ বাবুর পিতা। রাজনারায়ণ বাবু ১৭৬৭ শকে ১৯ বৎসর বয়সে ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ করেন। ইনি তদানীন্তন কালে যে কয়েকজন প্রতিভাশালী ব্যক্তি বঙ্গদেশে জন্মগ্রহণ করিয়া সকলের মুখ উজ্জ্বল করেন, তাঁহাদের অধিকাংশের সমপাঠী। তাঁহার সমপাঠী সঙ্গীদিগের মধ্যে ভূদেব মুখোপাধ্যায়, মাইকেল মধুসূদন দত্ত, প্যারীচরণ সরকার, জ্ঞানেন্দ্রমোহন ঠাকুর ও আনন্দকৃষ্ণ প্রভৃতি ছিলেন। ইহাঁর জন্ম কলিকাতার দক্ষিণ টালীগঞ্জের সন্নিকট বোড়াল গ্রামে। জন্ম তারিখ ১৭৪৮ শকের ২৩এ ভাদ্র। ইনি যখন হেয়ার সাহেবের স্কুলে পড়েন তখন সুবিখ্যাত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের পিতা দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার জনৈক যোগ্যতম শিক্ষক ছিলেন। পরবর্ত্তী সময়ে দুর্গাচরণ বাবু চিকিৎসাবিদ্যা অবলম্বনে কলিকাতায় যথেষ্ট সুখ্যাতি অর্জ্জন করেন। ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণের পর হইতে দেবেন্দ্র বাবুর সহিত রাজনারায়ণের ঘনিষ্ঠতা দিন দিন বর্দ্ধিত হইতে লাগিল। রাজনারায়ণ প্রতিভাশালী ও বিশেষ সুশিক্ষিত লোক ছিলেন। ইংরাজি ভাষায় তাঁহার যথেষ্ট ব্যুৎপত্তি ছিল। মহর্ষি তাঁহার পরামর্শ ও সাহায্য গ্রহণ করিতেন। রাজনারায়ণ বাবু তাঁহার আত্মচরিতে (৪৭ পৃঃ) লিখিয়াছেন যে আমি দেবেন্দ্র বাবুর নিকট গিয়া দেখিতাম যে আমার ভূতপূর্ব্ব শিক্ষক দুর্গাচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় ও বিবিধ ভাষাবিদ্ ব্যবস্থাদর্পন-প্রণেতা সুবিখ্যাত শ্যামাচরণ সরকার তাঁহার প্রধান সঙ্গী। দুর্গাচরণ বাবু উপনিষদ্ অনুবাদ করিতেন এবং শ্যামাচরণ বাবু ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দিতেন। শ্যামাচরণ বাবু যেদিন সমাজে বক্তৃতা করিতেন, সেদিন লোকে লোকারণ্য হইত ও অসংখ্য যুবকের আগমন হইত। পরে ব্রাহ্মসমাজে অক্ষয়কুমার দত্ত ও আমার প্রাদুর্ভাব হইলে দুর্গাচরণ বাবু ও শ্যামাচরণ বাবু তাঁহাদের কার্য্য হইতে কতকটা অবসর গ্রহণ করেন। ১৭৭৮ শকের ফাল্গুনের পত্রিকায় দেখিতে পাই যে শ্যামাচরণ সরকার আদিব্রাহ্মসমাজের প্রেসের জনৈক যন্ত্রাধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। তিনি ব্রাহ্মসমাজের সভ্য ছিলেন। ১৭৮২ শকের কার্ত্তিক মাসের পত্রিকায় দেখি, তিনি ব্রাহ্মসমাজের একদিনের সভার সভাপতি মনোনীত হইয়াছিলেন। তাহার পর হইতে তাঁহার নামের আর বড় উল্লেখ দেখিতে পাই না।

রাজনারায়ণ বাবু ব্রাহ্মসমাজে প্রবিষ্ট হইবার অল্প কাল পরে ঐ তত্ত্ববোধিনী সভা কর্ত্তৃক উপনিষদের ইংরাজি অনুবাদের কর্ম্মে ৬০৲ টাকা বেতনে নিযুক্ত হন (আত্মচরিত পৃঃ ৫০)। ঐ কার্য্য সম্পন্ন করিবার পরে ব্রাহ্মসমাজের সাধারণ কার্য্যে নিযুক্ত হন। উপনিষদের অনুবাদ করিবার সময় দেবেন্দ্র বাবু উপনিষদের শ্লোক ব্যাখ্যা করিয়া দিতেন, আর রাজনারায়ণ বাবু তাহা ইংরাজিতে অনুবাদ করিতেন। রাজনারায়ণ বাবু বলেন যে উপনিষদ তর্জ্জমা করিতে করিতে ক্লান্ত হইয়া সন্ধ্যায় নিদ্রিত হইতাম। দেবেন্দ্র বাবু জাগাইয়া আমাকে খাওয়াইতেন। তাঁহার বন্ধুত্বের কথা ভুলিবার নহে। সংস্কৃতের মধ্যে উপনিষদ দেবেন্দ্র বাবুর নিকট পড়িয়াছিলাম। রাজনারায়ণ বাবু কঠ, ঈশ, কেন, মুণ্ডক ও শ্বেতাশ্বতর উপনিষদ যাহা, অনুবাদ করিয়াছিলেন তাহা তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। ঐ সুন্দর অনুবাদের জন্য তিনি নানা স্থান হইতে যথেষ্ট প্রশংসা লাভ করেন। দেবেন্দ্র বাবু তাঁহাকে ব্রাহ্মসমাজে বক্তৃতা দেওয়াইতে লাগিলেন। রাজনারায়ণ বাবু বলেন পূর্ব্বে যে সমস্ত বক্তৃতা দেওয়া হইত তাহা জ্ঞানপ্রধান ছিল কিন্তু তাঁহার বক্তৃতায় প্রীতির ভাব যথেষ্ট পরিমাণে থাকিত। এই সময়ে দ্বারকানাথ ঠাকুর মহাশয়ের পরিত্যক্ত ঋণভার পরিশোধের জন্য দেবেন্দ্র বাবু ব্যতিব্যস্ত হওয়ায় চারিদিকে ব্যয়ের পরিমাণ সংযত করিয়া লইতে বাধ্য হন। তন্নিবন্ধন ব্রাহ্মসমাজের আয় হ্রাস হইয়া যায়। এবং রাজনারায়ণ বাবু আয়ের অল্পতা দেখিয়া এক বৎসরের অধিক কাল ব্রাহ্মসমাজের সেবা করিয়া ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যালয়ের সহিত সম্বন্ধ রহিত করিতে বাধ্য হন। তাহার পর তিনি দেড় বৎসর বসিয়া থাকেন। এই সময়ে রাজনারায়ণের পিতৃতুল্য মহর্ষি তাঁহাকে মধ্যে মধ্যে সাহায্য করিতেন (আত্মচরিত ৬১ পৃঃ)। তৎপরেই তিনি সংস্কৃত কলেজের দ্বিতীয় শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন। রাজনারায়ণ বাবু বলেন যে শ্রদ্ধাস্পদ দেবেন্দ্র বাবু ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের জন্য এই সময়ে যেরূপ অসাধারণ পরিশ্রম করিতেন, যিনি নিজ চক্ষে তাহা দেখিয়াছেন তিনিই কেবল তাহা বুঝিতে পারেন। এক একদিন অক্ষয় বাবুর রচিত প্রস্তাব সকল তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে তাহা সংশোধন করিতে করিতে তিনি গলদ্ঘর্ম্ম হইতেন।

রাজনারায়ণ বাবু সংস্কৃত কলেজে প্রায় ২ বৎসর যাবৎ কার্য্য করিবার পরে মেদিনীপুর জেলা স্কুলে প্রধান শিক্ষকের পদে নিযুক্ত হন, এবং সেইখানে একাদিক্রমে ১৫ বৎসর কয় মাস কার্য্য করেন। ক্রমে তাঁহার মাথাঘোরা পীড়া আরম্ভ হয়। উহাই তাঁহার শিক্ষকতা পরিত্যাগের কারণ। তাঁহার সময়ে বিদ্যালয়টী যথেষ্ট উন্নতিলাভ করিয়াছিল। তিনি উদ্যমশীল লোক ছিলেন। তিনি মেদিনীপুর ব্রাহ্মসমাজের পুনঃসংশোধন ও শ্রীবৃদ্ধি সাধন করেন। তথায় সুরাপান নিবারিণী সভা স্থাপন, বালিকাবিদ্যালয়-প্রতিষ্ঠা, বক্তৃতা, ধর্ম্মতত্ত্ব-দীপিকা, ব্রাহ্মধর্ম্মসাধনা ও Defence of Brahmo Somaj and Brahmoism নামক বক্তৃতা তাঁহার অবকাশের সময়কে অধিকার করিয়াছিল; এতদ্ব্যতীত পার্শ্ববর্ত্তী গ্রামে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচারের জন্যও তিনি বাহির হইতেন।

আদিব্রাহ্মসমাজের বৈষয়িক কার্য্যভার হইতে বিদায় গ্রহণ করিলেও তিনি আদিব্রাহ্মসমাজের প্রাণস্বরূপ ছিলেন। তাঁহাকে পাইয়া আদিব্রাহ্মসমাজের গৌরব সত্য সত্যই বিবর্দ্ধিত হইয়াছিল। তাঁহার অপূর্ব্ব রচনাশক্তি, তাঁহার অখণ্ড যুক্তি, যাহা তাঁহার ইংরাজি ও বাঙ্গালা গ্রন্থে প্রতিফলিত, তাহা সত্য সত্যই বিস্ময়কর। তিনি মহর্ষির সহিত একমনা হইয়া কার্য্য করিতেন। পরস্পরের মধ্যে মতগত পার্থক্য কখন উদ্ভূত হয় নাই। মেদিনীপুর হইতে অবসর গ্রহণের পরে তিনি "হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা" নাম দিয়া যে বক্তৃতা করেন তাহা এমনই সারগর্ভ ও সুযুক্তিপূর্ণ যে তাহা হিন্দুসমাজের অধ্যাপকগণেরও ভূয়সী প্রশংসা লাভ করিয়াছিল এবং চমকের সৃষ্টি করিয়াছিল। ইহার পূর্ব্ব হইতেই কেশব বাবু ও তাঁহার অনুবর্ত্তীগণ বাইবেলের উপর বিশেষভাবে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছিলেন, তাঁহাদের চক্ষে হিন্দুধর্ম্মের (উপনিষদাদির) মহৎ ভাব সে ভাবে প্রতিফলিত হইত না। কেশববাবু এতদূর অগ্রসর হইয়াছিলেন যে তিনি একটি বক্তৃতাতে বলেন যে India can do nothing without the Bible অর্থাৎ বাইবেল ভিন্ন ভারতের গত্যন্তর নাই। হিন্দুধর্ম্মের প্রশংসাবাদ শুনিয়া কেশববাবু অধীর হইয়া পড়েন, এবং উক্ত বক্তৃতার বিরুদ্ধে কলিকাতায় দুইটি ও এলাহাবাদে একটি বক্তৃতা করেন এবং তাঁহার শিষ্য শিবনাথ শাস্ত্রীও একটি বক্তৃতা করেন। কেশব বাবুর দলস্থ ব্রাহ্মগণও বক্তৃতার পর বক্তৃতা করিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন এবং তাঁহাদের মুখপত্র "ইণ্ডিয়ান মিররেও" গালাগালি যথেষ্ট বাহির হইত (আত্মজীবনী ৯০ পৃঃ)। আমাদের মনে হয় যে দেশের প্রতি, দেশীয় লোকের ও দেশীয় ধর্ম্মের প্রতি শ্রদ্ধা যদি আমরা হারাইয়া ফেলি তাহা হইলে নিজ দেশের মধ্যে প্রকৃত সত্য ধর্ম্মপ্রচার সুদূরপরাহত। অবশ্য পুরাণ-তন্ত্রের ভিতরে আপত্তিকর অংশ যথেষ্ট পরিমাণে আছে; ধীরভাবে, সহিষ্ণুতার সহিত তাহার সংস্কারসাধন করিতে হইবে। কিন্তু উহাদের ভিতরে এমন সুস্পষ্ট উপদেশ ও সাধনের প্রণালী সন্নিবেশিত আছে, যাহাতে ঐ সকল গ্রন্থ একেবারেই

পরিত্যাজ্য নহে। আমার কথা এই যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজই বল আর সাধারণ ব্রাহ্মসমাজই বল উভয়ের ভিতরে উপনিষদাদির উপরে ও সংস্কৃত ভাষার উপরে শ্রদ্ধা ধীরে ধীরে ফিরিয়া আসিতেছে। এক দিকে শ্রদ্ধেয় গৌরগোবিন্দ আর অন্যদিকে সীতানাথ তত্ত্বভূষণ ব্রাহ্মসাধারণের শ্রদ্ধা উপনিষদ-বেদান্তাদির উপরে ফিরিয়া আনিবার কতকটা চেষ্টা পাইয়াছেন ও পাইতেছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, যে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ হিন্দুধর্ম্মের এত প্রতিকূল ছিলেন, সেখানেই এবৎসর আধ্যাত্মিক দুর্গোৎসব ও লক্ষ্মীপূজা হইয়া গেল। আমরা এইরূপ আচরণের বিরোধী। ইহাকে কেহ কেহ ধর্ম্মসমন্বয় বলিতে পারেন, কিন্তু আমরা বলি মাত্রা ছাপাইয়া যাইতেছে, ওজনের বহির্ভূত হইয়া পড়িতেছে।

রাজনারায়ণ বাবু পশ্চিমাঞ্চলে কাণপুর এলাহাবাদ প্রভৃতি স্থানে অবস্থান কালে ব্রাহ্মধর্ম্ম-প্রচার বিষয়ে যথেষ্ট প্রয়াস পান। ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে কেশব বাবুকে লইয়া নরপূজার যে আবির্ভাব হইয়াছিল তাহার বিপক্ষে তিনি লেখনী ধারণ করেন। তিনি Brahmic advice, caution and help নাম দিয়া পুস্তিকা প্রকাশ করেন। পেন্‌সন লইয়া অবসর গ্রহণের পর রাজনারায়ণবাবু কলিকাতায় প্রায় ১০ বৎসর অবস্থান করেন। এই সময়ের মধ্যে তিনি A lecture in reply to the query, what is Brahmoism, সেকাল একাল, ব্রাহ্মধর্ম্মের উচ্চ আদর্শ ও আমাদের বর্ত্তমান আধ্যাত্মিক অভাব, বঙ্গভাষা ও সাহিত্য এই কয়েকখানি পুস্তিকা প্রণয়ন করেন। The Adi Brahmo Somaj, its views and principles, Theist's toleration and diffusion of Theism, Adi Brahmo Somaj as a Church, Science of Religion, what is Brahmo Somaj, Hindu Theist's Brotherly gift to English Theists ক্রমে ক্রমে পরে প্রকাশিত হয়। তাঁহার রচিত পুস্তিকাগুলি এতই সারগর্ভ ও সুযুক্তিপূর্ণ যে তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। দুঃখের বিষয় এই যে তাঁহার রচিত পুস্তিকাগুলি ক্রমে ক্রমে দুষ্প্রাপ্য হইয়া যাইতেছে। উহাদিগকে একত্রিত করিয়া একখানি নূতন সংস্করণ বাহির হইলে উদ্‌ভ্রান্ত অনেকের চক্ষু খুলিয়া যাইবার উপায় হয়। বিলাতের Rev. Charles Voysey প্রভৃতি অনেকে তাঁহার প্রণীত কয়েকখানি গ্রন্থের যথেষ্ট প্রশংসা করেন। ইংরাজী ১৮৭২ সালের বিবাহ আইন Brahmo Marriage Bill বলিয়া বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে যে আপত্তি লাট সাহেবের সভায় প্রেরিত হয়, উহার মধ্যে রাজনারায়ণ বাবুর যথেষ্ট হস্ত ছিল। ঐ আইন বিধিবদ্ধ হইবার সময়ে কেশব বাবু ও তাঁহার দলস্থ লোকেরা "আমরা হিন্দু নহি" ইহা প্রকাশ্যভাবে ঘোষণা করেন।

ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা হইবার পরে মহিলাগণ ব্রাহ্মসমাজে আসিয়া পর্দ্দার আড়ালে বসিতেন। কিন্তু এই বৎসরে স্ত্রীস্বাধীনতার বিশেষ পক্ষপাতী অন্নদাচরণ খাস্তগির, দুর্গামোহন দাস, রজনীনাথ রায়, দ্বারকানাথ গাঙ্গুলি প্রমুখ কয়েকজন আপনাদের বাটীর মহিলাগণকে পর্দ্দার বাহিরে বসাইবার জন্য অধ্যক্ষগণের নিকট আবেদন করিলে তাঁহারা ইহাতে সম্মত না হওয়ায় উঁহারা স্বতন্ত্র সমাজ স্থাপন করেন। দেবেন্দ্রনাথের পরামর্শ মতে রাজনারায়ণ বাবু এই নূতন সমাজের আচার্য্যের কার্য্য করেন। দেবেন্দ্রবাবু ও রাজনারায়ণ বাবুর মধ্যে এইরূপ স্থির হয় যে, আদিব্রাহ্মসমাজ সংস্কার বিষয়ে রক্ষণশীল হইলেও উপাসনা করিতে তাঁহাদিগকে যে ডাকিবে তাহাতে আপত্তি করা হইবে না। নূতন সমাজে আচার্য্যের অব্যবহিত সম্মুখে মহিলাগণ অর্দ্ধচন্দ্রাকৃতি আকারে বসিতেন এবং তাহার পশ্চাতে পুরুষেরা বসিতেন। (রাজনারায়ণ বাবুর আত্মচরিত ১৯৭ পৃষ্ঠা)। বহুবাজারে একটী ভাড়াটিয়া বাটীতে প্রতি রবিবার ঐ সমাজ হইত। স্ত্রীলোকেরা সমস্বরে গান করিতেন। বরিশালের লাকুটিয়ার জমিদার রাখালচন্দ্র রায়ের স্ত্রী প্রধান গায়িকা ছিলেন। ঐ সমাজ ৬।৭ মাস পরে উঠিয়া যায়। অন্নদাচরণ খাস্তগির সমাজসংস্কার সম্বন্ধে অগ্রসর হইলেও ধর্ম্মসংস্কার বিষয়ে তত অগ্রসর ছিলেন না। তাঁহার কন্যার বিবাহ হিন্দুশাস্ত্র মতে হয়।

ইতিপূর্ব্বে রাজনারায়ণ বাবু আদিব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিতেন না। তিনি বেদীর সম্মুখ হইতেই উপদেশ দিতেন। তিনি বেদীতে বসিবার জন্য দেবেন্দ্র বাবুর নিকট প্রস্তাব করিলে দেবেন্দ্র বাবু তাহাতে সম্মত হন, এবং আমার পিতা ৺ বেচারাম চট্টোপাধ্যায়কে, রাজনারায়ণ বাবুকে আদরের সহিত বেদীতে বসাইতে ও তাঁহার সহিত একত্র উপাসনা করিবার জন্য পত্র লিখেন (১৭৯৩ শক ২৯শে আষাঢ়) রাজনারায়ণ বাবু ১৭৯৫ শকের (?) মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে মহর্ষির বাটীতে বেদীতে বসিয়া "ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রকৃত অসাম্প্রদায়িকতা" সম্বন্ধে যে সারগর্ভ উপদেশ দেন, সেদিন আমি ঐ উৎসবে উপস্থিত ছিলাম।

রাজনারায়ণ বাবু ব্যাপক কাল ধরিয়া দেওঘরে স্থায়ীভাবে আমৃত্যু অবস্থান করেন। তাঁহার ও তাঁহার সুযোগ্য পুত্র যোগেন্দ্রনাথ বসুর অশেষ সারগর্ভ প্রস্তাব তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশ পাইয়াছে। ১৮২১ শকের ২রা

আশ্বিন তারিখে রাজনারায়ণ বাবুর কর্ম্মঠ জীবনের অবসান হয়। শ্রদ্ধেয় দ্বিজেন্দ্র বাবু ও আমি দেওঘরে গিয়া তাঁহার শ্রাদ্ধ করিয়া আসি। শ্রাদ্ধ-বাসরে অনেক সম্ভ্রান্ত লোক উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার মত অমায়িক প্রকৃতির লোক বর্ত্তমান কালে দুষ্প্রাপ্য। তাঁহার মৃত্যুর পরে পুত্র যোগেন্দ্রনাথবাবু অকালে পরলোক গমন করেন। রাজনারায়ণ বাবু চলিয়া গিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার দৌহিত্র, অরবিন্দ ঘোষ প্রভৃতি এবং তাঁহার অন্যান্য দৌহিত্রীগণ তদীয় প্রতিভা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত হইয়াছেন।

স্নেহের দাবী।

(শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায় এম-এ)

কোথা হ'তে এলি তুই, ঝড়ের মতন ?
কেমনে চিনিলি মোরে ?
সুধামাখা মুখখানি, দেখিনি কখন—
দেখেছি কি জন্মান্তরে ?

কেড়ে নিতে চাস্ স্নেহ, কেন জোর ক'রে ?—
কি দাবী আছে রে তোর ?
বাঁধিতে স্নেহের ডোরে, কেন চাস্ মোরে,
ওরে ক্ষুদ্র স্নেহচোর !

ভালবাসা রাশি নিয়ে, ব্যাকুল পরাণে—
কেন কাছে ছুটে এলি ?
হারায়ে কাহার বুঝি, স্নেহের আহ্বানে,
এসেছিস্ পথ ভুলি।

এসেছিস্ যদি তুই, যাস্ নিকো চলে,
আছে মোর শূন্য প্রাণ,
অজানা অতিথি ওরে ! তোর স্নেহ বলে,
কেড়েনে রে সেই স্থান।

জীবের জন্মতত্ত্ব।

(রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ, বি-এল তত্ত্বনিধি)

(২)

উচ্চতর জীবনস্তরে অবস্থিত জীবমাত্রই স্ত্রীদেহ সমুৎপন্ন ডিম্বকোষের সঙ্গে পুং-দেহস্থ জীবকোষের সংযোগ ব্যতীত সন্তান উৎপাদনোপযোগী কোষের পরিণতি সম্ভব হয় না। এইরূপে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত সম্মিলিত কোষ হইতে যে সকল কোষ উৎপন্ন হয় তাহারা প্রধানতঃ দুই শ্রেণীতে বিভক্ত ;—

(১) জীবাণুকোষ—ইহারা অল্পসংখ্যক, কিন্তু ইহাদিগকে রক্ষা করিবার জন্য বিচিত্র উপায়সকল উদ্ভাবিত হইয়াছে। ইহারা যে অভ্রভেদী বিশাল মন্দিরের মণি কোঠরে যত্নতঃ রক্ষিত দেবমূর্ত্তি। কালসহকারে ইহারা পরিপক্বতা লাভ করিলে পর পূর্ব্বকথিত উপায়ে ইহাদের হইতে বিশেষজাতীয় জীবের সৃষ্টি হইবে। এই বিচিত্র উপায়ে বংশ ও জাতির বিশিষ্টতা রক্ষা পাইতেছে।

(২) এই শ্রেণীর কোষসকলের মধ্যেও বিভাগ রহিয়াছে। ইহাদিগের দ্বারা দেহের নানা প্রকার অঙ্গ-প্রত্যঙ্গাদি গঠিত হয়। জ্রূণবিদ্যার ভাষায় এই শ্রেণীর কোষগুলিকে সোমাটিক (Somatic) কোষ বলে। ইহাদিগের কোন দুই কোষ পরস্পরের সহিত মিলিত হইতে পারে না এবং দেহের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ ও নানা প্রকার যন্ত্র গঠন ভিন্ন ইহাদিগের অপর কোন কার্য্য নাই। জীবাণুকোষসকল তদপেক্ষা মহত্তর কার্য্য সম্পাদনের জন্য চিহ্নিত হইয়াছে, এবং সেই কার্য্য সম্পাদনোপযোগী পরিপক্বতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত যত্নতঃ স্ত্রী ও পুরুষ উভয় জাতীয় জননেন্দ্রিয়ের মধ্যে রক্ষিত হইয়া থাকে।

এককোষজীবের ন্যায় এই দ্বিতীয় শ্রেণীর কোষ সকল আপনা আপনি বিভক্ত হইয়া বৃদ্ধি পাইতে থাকে। প্রথম শ্রেণীর কোষের কার্য্য কিন্তু তদ্রূপ নহে। পুরুষদেহ-সমুৎপন্ন বীর্য্যকোষের সঙ্গে স্ত্রী-দেহ সমুৎপন্ন ডিম্বকোষের সম্মিলন দ্বারা উভয়ে একত্র মিলিত হইয়া একটী কোষ না হওয়া পর্য্যন্ত ইহারা গঠনকার্য্যে নিযুক্ত হয় না। প্রকৃত প্রস্তাবে আমরা যৌনসম্বন্ধ বলিতে যাহা বুঝি এই কোষে কোষে সম্মিলনই তাহা ঘটিয়া থাকে।

Dr. Archdall Reid তাহার "The Laws of Heredity" নামক গ্রন্থে এই সম্মিলন সম্বন্ধে লিখিয়াছেন ;—

"Only the germs are marriageable......... in the great majority of animals and plants. They observe the degrees of consanguinity very strictly and do not unite except with members of another cell community, and they only found a new colony of cells, an offspring.

"কেবল জীবাণুগুলির মধ্যেই যৌনসম্বন্ধ স্থাপিত হয় ; উদ্ভিদ ও জান্তব উভয় জগতেই এই সম্মিলন-কার্য্য বংশগত ঘনিষ্ঠতার প্রতি বিশেষ লক্ষ্য রাখিয়া সম্পন্ন হয়। দুইটী বিভিন্ন সমাজের কোষ ভিন্ন এক সমাজের মধ্যে তাহা হয় না ; এবং এই সম্মিলনকার্য্য একমাত্র অপত্য উৎপাদন উদ্দেশ্যেই নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

এই জীবদেহ-সৃষ্টিটা অনেকটা যেন মধুচক্র নির্ম্মাণের ন্যায়। মধুচক্রে রাণী-মাছি মাত্র একটী থাকে ; ইহা হইতে শত শত মৌমাছি উৎপন্ন হয়, কিন্তু তাহাদের

মধ্যে অতি অল্পসংখ্যকেরই সন্তানোৎপাদন-শক্তি থাকে। যাহারা নানাস্থানে ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা জাতীয় ফুল হইতে মধু আহরণ করে ও চক্রনির্ম্মাণ কার্য্যে ব্যাপৃত থাকে তাহারা সন্তানোৎপাদন-শক্তিবিহীন। ইহাদিগকে সোমাটিক বা দৈহিক কোষের সঙ্গে তুলনা করা যাইতে পারে এবং অল্পসংখ্যক সন্তানোৎপাদনক্ষম মক্ষিকাজীবাণু-কোষগুলির স্থানীয়। ইহা একটা ধ্রুবসত্য যে পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের আকার ও স্বভাবগত অনেক সাদৃশ্য থাকে, তদ্রূপ প্রভেদও খুব কম নয়। এই যে তত্ত্ব ইহা সমগ্র মানবজাতি সম্বন্ধেও প্রযোজ্য। কতকগুলি বিষয়ে পরস্পরের সঙ্গে এমন মিল রহিয়াছে, যাহা অপর কোন প্রাণীতে দেখিতে পাওয়া যায় না, এবং যাহা হইতে আমরা তাহাদিগকে মানুষ বলিয়া জানি; কিন্তু ইহা সত্বেও কোন দুই ব্যক্তি পাওয়া যাইবে না, যাহারা সব বিষয়ে একরূপ। বিষয়টি অন্য ভাবে ব্যক্ত করিতে হইলে বলিতে হয় যে সমগ্র মানবজাতি একরূপ-বিশিষ্ট, সমগ্র মানবজাতি বিভিন্ন রূপ-বিশিষ্ট; কেনই বা এই সদৃশতা এবং কেনই বা এই বিসদৃশতা, ভ্রূণ-তত্ত্ব হইতে এই প্রশ্নের উত্তর পাওয়া যাইবে।

যে সকল জীবাণু-কোষ হইতে ভাবী সন্তানের সৃষ্টি হইবে সেই কোষসকল পূর্ব্ববর্ত্তী জীবাণুকোষ হইতে উৎপন্ন হইয়াছে। যে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত ডিম্বকোষ এই সন্তান সৃষ্টির উপাদান, তাহা পুরুষ ও স্ত্রী দেহ হইতে উৎপন্ন দুইটী স্বতন্ত্র কোষের সম্মিলনে সৃষ্টি হয়। এই স্বতন্ত্র কোষ দুইটী যে স্ত্রী ও পুরুষ দেহে রক্ষিত হইয়াছিল, তাহারা ইহাদিগকে যথাক্রমে অপর একটী উর্ব্বরতা-প্রাপ্ত কোষ হইতে লাভ করিয়াছিল। পিতা মাতার দেহেতে এই সকল জীবাণু কোষ কখনও উৎপন্ন হয় না। তাঁহারা মাত্র ইহাদিগকে নিজেদের দেহেতে ধারণ ও পোষণ করিয়া থাকেন। ইহারা পুরুষপরম্পরা এক বিচিত্র বিধানে দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবিষ্ট হইয়া আসিতেছে। এইরূপ দেহ হইতে দেহান্তরে প্রবেশের পর দুইটি জীবকোষের সম্মিলন দ্বারা রূপান্তর ঘটে মাত্র। মধু আহরণকারী মৌমাছি দ্বারা যেমন মৌমাছিবংশ বৃদ্ধি হয় না সেইরূপ সোমাটিক অর্থাৎ দৈহিক কোষ দ্বারা জীবকোষের সৃষ্টি হয় না।

যৌনসম্মিলন কোন নূতন জীবকোষের সৃষ্টির কারণ নহে; পিতামাতার সঙ্গে সন্তানের যে আকার ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্য দেখা যায় এই মিলন সাক্ষাৎ সম্বন্ধে তাহার কারণ নহে; পিতামাতার তাহার উপর অতি সামান্য প্রভাবই থাকে। এই সাদৃশ্যের প্রকৃত কারণ এই যে, যে সকল জীবাণুকোষ হইতে সন্তানের উদ্ভব হয়, তাহা পিতৃমাতৃকর্ত্তৃক তাহাদের পিতৃপুরুষ পরম্পরায় পূর্ব্ববর্ত্তী জীবাণুকোষগুলির খণ্ডিত ও স্খলিত অংশবিশেষের বিকাশ মাত্র। এইরূপ পর পর ঊর্দ্ধতন হইতে অধস্তন সন্তানে এই কোষ সকল অনুক্রমিত হয়। প্রকৃত কথা উত্তরাধিকারীত্ব বলিতে আমরা যাহা মনে করি তাহা পিতামাতা হইতে সন্তানে অনুক্রমিত না হইয়া বরং পিতৃপুরুষ পরম্পরা জীবকোষ হইতে জীবকোষে অনুক্রমিত হইতেছে বলা উচিত।

এই সম্বন্ধে Doctor Archdall Reid লিখিয়াছেন;—

"The somatic cells of the parent, as far as we know, contribute no living elements to the child, therefore, does not as is popularly supposed, resemble his parent, because his several parts are derived from similar parts of the parent—his head from his parent's head, his hands from his parent's hand, and so forth, he resembles him only because the germ-plasm which directed his development was a split off portion of the germ-plasm which directed the development of the parent."

পিতামাতার দেহস্থিত সোমাটিক কোষগুলি হইতে সন্তান জীবউপাদানের কোনরূপ কিছু লাভ করে না, এই সকল মাত্র কোন নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহাকে আশ্রয় ও পরিপোষণ করিয়া থাকে; সুতরাং প্রচলিত বিশ্বাস যে সন্তান পিতামাতার বিবিধ অঙ্গ হইতে নিজের বিবিধ উপাদান লাভ করিয়া থাকে, যেমন মাথা হইতে মাথার উপাদান, হাত হইতে হাতের উপাদান ইত্যাদি ধারণা ভ্রান্তিমূলক। এই সাদৃশ্য রক্ষিত হওয়ার প্রকৃত কারণ এই যে, যে জীবাণু-কোষ সন্তানের উৎপত্তি ও গঠনের কারণ, তাহা যে জীবাণু কোষ হইতে পিতা মাতার উদ্ভব ও দেহ গঠিত হইয়াছে তাহাদের অংশ।

অনেক সময় এরূপও দেখা যায় যে সন্তানের সঙ্গে পিতা মাতার কোনরূপ সাদৃশ্য থাকে না, কিন্তু কোন দূরবর্ত্তী পূর্ব্বপুরুষের সঙ্গে তাহার সাদৃশ্য পরিষ্কাররূপে লক্ষিত হয়। যে সকল প্রাণপঙ্কের অংশকে (protoplasm) উপাদানরূপে গ্রহণক্রমে শিশুসৃষ্টির প্রথম জীবকোষ নির্ম্মিত হইয়াছে, তাহা ধারাবাহিকরূপে উপর হইতে অধস্তন পুরুষে অনুক্রমিত হইয়া আসিতেছে। এই ব্যাপার স্মরণাতীতকাল হইতে চলিতেছে, সুতরাং বংশ ও ধারাগত এই মিল থাকার ভিতর বিস্ময়কর কিছু নাই, বরং যতটা সাদৃশ্য থাকা মনে করা যাইতে পারে ততটা যে নাই তাহাই বিবেচনার বিষয়।

নানা কারণে এরূপ ঘটিয়া থাকে। দুইটী জীবাণু-

কোষের সম্মিলনে সমুৎপন্ন যে যুগ্মজীবাণুকোষ (germ plasm) সাদৃশ্যের মূল কারণের ন্যায় কোন কোন বৈষম্যের মূল কারণও তাহাতে নিহিত রহিয়াছে কতকগুলি আবার ভ্রূণের জননীজঠরে অবস্থানকালে পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে সমুদ্ভূত হইয়া থাকে। এই বিষয়টি বিশেষরূপ হৃদয়ঙ্গম করা আবশ্যক। এ সম্বন্ধে পরিষ্কার জ্ঞান না থাকিলে, জীবতত্ত্ব, বিশেষতঃ মানবতত্ত্ব সম্বন্ধে অনেক কথাই বুঝা যাইবে না।

যে বীর্য্যকোষ ও ডিম্বকোষের সম্মিলনে ডিম্বকোষ ফলিত হয়, তাহারা দুইটি স্বতন্ত্র ধারা হইতে উৎপন্ন হইয়াছে; সুতরাং যে যুগ্ম-জীবাণু-কোষ হইতে সন্তানের উৎপত্তি, তাহার মধ্যে উভয় ধারারই অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি অবয়বভেদ ও স্বাভাবিক বিশিষ্টতা সন্তানে প্রকাশ পাইবার কথা; এবং ঊর্দ্ধ হইতে অধস্তন পুরুষে ক্রমেই এই সকল অধিকতর জটিলতার আকার ধারণ করিতে থাকিবে। এই জটিলতা নিরাকরণের কোন উপায় না থাকিলে পরিনামে পুরুষপরম্পরাপ্রাপ্ত এই সকল বৈচিত্র্যের গুরুভার বহন করা অসম্ভব হইবে।

প্রকৃতিরাজ্যে যোগ্যতমের স্থিতি ও অযোগ্যের বিলয়-রূপ যে নিয়ম ক্ষুদ্রবৃহৎ-নির্ব্বিশেষে সকলের মধ্যে পরিলক্ষিত হয়, ইহার কার্য্য এই জীবসৃষ্টির প্রথম কর্ম হইতেই আরম্ভ হইয়াছে। যে দুইটী কোষের সম্মিলনে ডিম্বকোষ ফলবত্তা প্রাপ্ত হইয়াছে, এরূপ হওয়া অসম্ভব নহে যে ইহাদিগের গতি পরস্পর বিপরীত দিকে, একটি পুরুষসন্তান সৃষ্টির দিকে, অপরটি স্ত্রী-সন্তান উৎপত্তির দিকে; উভয়টির কার্য্য যদি অপ্রতিহতভাবে চলিতে থাকে তবে সন্তানের মিলিত দেহ স্ত্রী-পুরুষবিশিষ্ট হইবার কথা। কিন্তু তাহা হইতে পারে না—একটিকে পরাভব স্বীকার করিতে হইবেই। এমনও হইতে পারে যে এক ধারা হইতে সমাগত যে জীবকোষ তাহার সকলেরই চক্ষু কটাবর্ণ-বিশিষ্ট, অপর ধারার সকলের চক্ষু কৃষ্ণবর্ণ। দুই কোষের সংযোগের প্রারম্ভে উভয়েরই সমভাবে কার্য্য করিবার কথা। দুইটী শক্তিই যদি অপ্রতিহত থাকে তবে ভাবী সন্তানের দুই চক্ষু দুই বর্ণবিশিষ্ট হওয়া, অথবা একই চক্ষুতে এই দুই বিভিন্ন বর্ণ প্রকাশ পাওয়া কিছু বিচিত্র ব্যাপার হইত না। কিন্তু তাহা কখনও হইতে দেখা যায় না। প্রথমাবস্থায় প্রতিদ্বন্দ্বীরূপে কার্য্যে প্রবৃত্ত হইলেও অবশেষে একটিকে হার মানিতে হয়। নানারূপ গুণবিশিষ্ট দুইটী জীবাণুকোষের সম্মিলনে সমুদ্ভূত সন্তানের মধ্যে উভয় প্রকৃতিরই কিছু না কিছু বর্ত্তমান থাকে সত্য, কিন্তু এই প্রতিকূল সংগ্রামে লিপ্ত অপেক্ষাকৃত ক্ষীণশক্তি-সম্পন্ন অধিকাংশ বিশেষত্ব বিনাশ প্রাপ্ত হয়। ইহা হয় বলিয়াই মানবের পক্ষে জীবনধারণ সম্ভবপর হইয়াছে।

সুতরাং দেখা যাইতেছে, জনকজননী ও সন্তানের মধ্যে যে সকল শারীরিক ও মানসিক বৈষম্য দৃষ্ট হয় তাহার অধিকাংশই জীবাণুকোষের রূপান্তর প্রাপ্তি হইতে উদ্ভূত হইয়া থাকে। ডিম্বকোষের উর্ব্বরতা প্রাপ্তির সঙ্গে সঙ্গে তাহা আরম্ভ হয়। কতকগুলি মাতৃগর্ভে অবস্থানকালে ভ্রূণের পারিপার্শ্বিক অবস্থা হইতে উৎপন্ন হইয়া থাকে, যেমন ভ্রূণের স্বাভাবিক পুষ্টির অনুকূল বা প্রতিকূল অবস্থা। যে সকল উপাদান হইতে ভ্রূণের দেহ সৃষ্ট হয়, তাহা কলুষিত হইলে কাজে কাজেই দেহের পরিপুষ্টির বিঘ্ন ঘটে। একটি রহস্যময় ব্যাপার এই যে প্রতিকূল অবস্থার মধ্যে স্থাপিত হওয়া সত্ত্বেও ভ্রূণ হইতে জাত সন্তান হয়ত কোন প্রকার রোগ দ্বারা আক্রান্ত নাও হইতে পারে, কারণ যে জীবাণুকোষ হইতে সন্তানের উদ্ভব হইয়াছিল, তাহা ঐ রোগদুষ্ট জননীর দেহে পূর্ব্বেই রক্ষিত হইয়াছিল। জীবাণুকোষ (germ plasm) নিজে অপরিবর্ত্তিত থাকিয়া এক হইতে অন্যে অনুক্রমিত হয় মাত্র। যে সোমাটিক কোষগুলির দ্বারা দেহ গঠিত হয় তাহাদেরই বিষাক্ত উপাদানের মধ্যে সৃষ্টি হইলে ক্ষতির সম্ভাবনা। এই কারণে দেখা যায় পিতা মাতার অনেক গুরুতর ব্যাধি সন্তানে সংক্রামিত হয় না, কিন্তু তৃতীয় পুরুষে তাহা দেখা দেয়।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

ভৈরব—সুরফাঁকতাল।

হে ওঙ্কার মহাদেব শঙ্কর,
তুমি সকল শুভকারন, দুরিতনাশ।
তোমা চাহে ধরিতে ধ্যান, অনুখন ষম্যমন,
তোমা পাইলে দর্শন যায় ত্রাস॥
হরি' দুঃখ দ্বন্দ্ব করহ দূর শঙ্কা,
রুদ্র কালকাল, দেব মহাশ্মশানবাস
হর সব কলুষ হর পাপভীতি,
সকল সন্তাপ হর, চিত-উল্লাস।
প্রাণ দেব হে মম ধাইছে তব পদে;
তব সেবকে দাও চরণে নিবাস॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

১´ ২ ৩ ‖ ১´ [পপা] ২
I ম্মাঃ গঃ মা পা। পদা -া। পদা -া পা -া I দা পা মা পা। গা মা।
হো • ও • স্বা • • • র • ম হা • দে • ব

৩ ১´ ২ ৩
। গা ঋা ঋা সা I সা সা মাঃ গঃ। মা পা। মপা পা দা র্সা I
শ • ঙ্ক র তু মি • • স ক ল শু ভ •

১´ ২ ৩
I পদা -া পা মা। গা পা। মা গঃ ঋাঃ সা II
কা • র ণ ভু রি ত না • শ

১´ ২ ৩ ১´ ২
I { দা দা র্সা র্সা। র্সা না। র্সা র্ঋা -া র্সা} I র্ঋা র্মা র্গা র্পা। র্মা র্গা।
তো মা চা হে ধ রি তে ধ্যা • ন অ নু খ ন দ য়া

৩ ১´ ২ ৩
। র্ঋা -া র্ঋা র্সা I র্সা -া গঃ দাঃ। পদা -া। পদা -া পা মা I
• • ঘ ন তো • মা • পা • • • ই লে

১´ ২ ৩
I গা ঋা গা মা। পা মা। গা ঋা -া সা II
দ • র্শ ন যা য় ত্রা • • স

১´ ২ ৩ ১ ২ ৩
সা সা দা দা। পদা -া। পদা -া পা -া I পা দা মা পা। মা গা। মা গঋা -া সা I
হ রি' দু খ দ • • • ন্দ • ক • র হ দূ • র শ • ঙ্কা

১´ ২ ৩ ১´ ২
I সা -া সা সা। দ্‌া -া। সা ন্‌া ঋা সা I সা ঋা গা মা। পগা -া।
রু • দ্র কা ল • • • কা ল দে • ব ম হা •

৩ ১´ ২ ৩ ১´
। গঋা -া গা মপা I গা ঋা -া সা। সা সা। সা সা মা গা I মা গা মা গা।
• • স্ব র • বা • • স হ র স ব ক লু ষ হ র •

২ ৩ ১´ ২ ৩
। পদা র্সা। র্সা পদা -া পা I পা ণা দা পা। দা মা। পা গা মা গা I
পা • প ভী • তি স ক ল স ন্তা • • • • প

১´ ২ ৩ ১´ ২
I মা ণা দা পা । মা গা । মা গঋা -া সা I {দা -া দা র্সা । -া র্সা ।
হ র চি ত উ • • ল্লা • স প্রা • ণ দে • ব

৩ ১´ ২ ৩
। র্সা না র্ঋা র্সা } I র্ঋা র্মা র্গা র্পা । র্মা র্গা । র্গর্ঋা -া র্সা -া I
হে • ম ম ধা • ই ছে ত ব প • দে •

১´ ২ ৩ ১´ ২
I র্সা র্সা পদা -া । পদা পা । দা মা পা মগা I ঋা মা গা পা । মা মা ।
ত ব সে • ব কে দা • • ও • চ • র • ণে নি

৩
। গা ঋা -া সা IIII
বা • • স

আস্থায়ী।

(রায় বাহাদুর শ্রীদীননাথ সান্যাল)

বাঙ্গলায় সঙ্গীতের প্রারম্ভ পদটীকে "আস্থায়ী" শব্দে অভিহিত করা হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ শব্দটীর ব্যুৎপত্তি এবং উহার ঐরূপ অর্থ কিরূপে হইল, তাহা বুঝা যায় না; অভিধান দেখিয়াও এই প্রশ্নের কোন উত্তর পাওয়া যায় না। গায়কেরা ঐ শব্দটী যে অর্থে ব্যবহার করিয়া থাকেন, অভিধানকারগণও পারিভাষিক স্বরূপে ঐ শব্দটী এবং তাহার ঐ অর্থ নির্ব্বিচারে গ্রহণ করিয়াছেন।

আমার বোধ হয় "স্থায়ী" শব্দটী উচ্চারণ বিভ্রাটে "আস্থায়ী" আকার ধারণ করিয়াছে। এককালে সঙ্গীতের প্রথম পদ বা চরণ "ধ্রুব" নামে অভিহিত হইত। প্রাচীন বাঙ্গলা-সাহিত্যে সঙ্গীতের প্রথম চরণ "ধ্রু" নামে চিহ্নিত থাকিত। "ধ্রু" অর্থাৎ ধ্রুব। "স্থায়ী" শব্দটী "ধ্রুব" শব্দেরই প্রতিশব্দ অর্থাৎ সমার্থবাচক। বোধ হয় ভারতের উত্তরপশ্চিমাঞ্চলে (যেখানে সঙ্গীত-বিদ্যার সবিশেষ চর্চ্চা ছিল এবং এবং এখনও আছে) সেইখানে "ধ্রুব" শব্দের পরিবর্ত্তে "স্থায়ী" শব্দের ব্যবহার প্রচলিত হয়। সাধারণতঃ দেখা যায় যে, পশ্চিমাঞ্চলের লোকে (সংস্কৃত পণ্ডিতগণের কথা বলিতেছি না) যুক্তাক্ষর উচ্চারণে একটু বিভ্রাট ঘটায়। "আস্নান" শব্দটী তাহার প্রকৃষ্ট উদাহরণ। বিহারে এক মঠধারী বাবাজীর মুখে "আস্কন্দ পুরাণ" শুনিয়াছি। আমরা বাঙ্গালীরাও এবিষয়ে একেবারে নির্দ্দোষ নহি। "স্কন্ধ" স্থলে "আস্কন্ধ" এবং "স্কন্ধ" স্থলে "আস্ক ফলা" বাঙ্গলায় সুপরিচিত উচ্চারণ-বিভ্রাট। এখন আবার ইংরাজীযুগে "স্কুল" বলিতে গিয়া আমরা "ইস্কুল" বলিয়া থাকি (অবশ্য যখন বাঙ্গলা বলি)। "ঋষভ" ও "নিষাদ" স্বরকে যথাক্রমে "রেখাব" ও "নিখাদ" বলাও উক্তরূপ সূত্রে ঘটিয়াছে। পশ্চিমে "ষ" "খ" র মত উচ্চারিত হয়।

সঙ্গীতশিক্ষার্থী বাঙ্গালী প্রধানত উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের সঙ্গীতাচার্য্যগণের কাছে গান শিক্ষা করিতেন। সুতরাং আচার্য্যের মুখে "আস্তাই" শুনিয়া তাঁহারাও "আস্তাই" বলিতে লাগিলেন। (বলা বাহুল্য "আস্থায়ী" শব্দ ঐ মৌখিক "আস্তাই" শব্দের সাধু সংস্করণ মাত্র)। পরে বাঙ্গালী সঙ্গীতাচার্য্যগণের ঐ শব্দ ব্যবহার করায়

বহুকাল হইতে শিষ্যপরম্পরায় উহা প্রচলিত হইয়া আসিতেছে এবং তাহাই স্বাভাবিক। কিন্তু অভিধানকারদিগের পক্ষে উচিত ছিল, শব্দটী গ্রহণ করিবার পূর্ব্বে উহার সম্যক পরিচয় লওয়া এবং উহার ঐরূপ অভিধান হইতে পারে কিনা, তাহার বিচার করা।

যাহা হউক "আস্থায়ী" শব্দটী ভ্রষ্ট উচ্চারণজনিত ও অর্থহীন। কিন্তু সঙ্গীতসাহিত্যেও শুদ্ধ পদ ব্যবহার করাই বাঞ্ছনীয় বলিয়া আমি এই ক্ষুদ্র প্রস্তাবটীর অবতারণা করিলাম। কিছুকাল পূর্ব্বে "মানসী ও মর্ম্মবাণী" পত্রিকায় আমি এ বিষয়ে আলোচনা করিয়াছিলাম এবং তাহার পরেই দেখিলাম যে, শ্রীযুক্তা মোহিনী সেন গুপ্তা (যিনি প্রধান প্রধান সকল মাসিক পত্রিকাতেই নানাবিধ সঙ্গীতের স্বরলিপি প্রকাশ করিতেন) তিনি "আস্থায়ী" ত্যাগ করিয়া "স্থায়ী" শব্দটী গ্রহণ করিলেন। কিন্তু সঙ্গীতাচার্য্য মহোদয়গণের কাছে, বোধ হয়, আমার প্রস্তাবটী পৌঁছায় নাই। কারণ, তৎপরেও এক মাসিকপত্রিকায় প্রসিদ্ধ সঙ্গীতাচার্য্যকৃত স্বরলিপিতে একবার দেখিয়াছি "আস্থায়ী" আর একবার "অস্থায়ী"—একেবারে "স্থায়ীর" বিপরীত। সেই জন্য তাঁহাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার অভিপ্রায়ে আমি এই পত্রিকাতে আমার বক্তব্য বিষয় আলোচনা করিলাম। আমার যদি ভ্রম হইয়া থাকে, তবে অপরাধ মার্জ্জনীয়। *

সহজ ব্যায়াম প্রণালী।

(পূর্ব্বানুবৃত্তি)

(শ্রীজিতেন্দ্রনাথ সেন গুপ্ত বি-এ,)

মুখ ও চক্ষু।—বয়োবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে আমাদের গাল ভাঙ্গিয়া যায়, মুখ নিম্নদিকে ঝুলিয়া পড়ে, চর্ম্ম সঙ্কুচিত হইয়া যায়, কপালে ও নাকের নীচে বহু রেখা দেখা দেয়, চক্ষু কোটরগত হয় এবং দৃষ্টিশক্তি কমিয়া যায়। ইহার একমাত্র কারণ আমরা মুখচক্ষুর পেশীগুলির কোনই ব্যায়াম করি না। ক্রমে উহাদের শক্তি কমিতে থাকে এবং ঐ সকল চিহ্ন প্রকাশিত হয়। মুখ ও চক্ষুর ব্যায়ামগুলি যথারীতি অধ্যবসায়ের সহিত সম্পন্ন করিলে উহা দূর হইয়া যৌবনোচিত মুখকান্তি এবং দৃষ্টিশক্তি ফিরিয়া আসে, ইহা পরীক্ষিত সত্য।

মুখ।—মুখের ত্বক মসৃণ ও তরুণ করিবার এবং রেখা দূর করিবার একমাত্র উপায় ঘর্ষণ। সকল প্রকার চর্ম্মই ঘসিলে পালিশ হয়, মুখের চামড়া কেন হইবে না? মুখমার্জ্জনের উত্তম যন্ত্র শুষ্ক হাতের তালু এবং অঙ্গুলির অগ্রভাগ।

পেশী হিসাবে মুখ পাঁচ ভাগে বিভক্ত, যথা :—

(ক) চিবুক বা থুতনি। (chin)

(খ) হনু বা চোয়াল। (jaws)

(গ) কপোল বা গাল। (cheek)

(ঘ) মুখ-বিবর। (mouth)

(ঙ) শঙ্খদেশ অর্থাৎ মস্তকের উভয় পার্শ্বস্থ সমতল অংশ—যে স্থানে নাড়ীর স্পন্দন অনুভব করা যায়। (Temples)

(ক) চিবুক।—এই পেশীদ্বয় গদির মত চিবুকের হাড়খানির উপর আছে। তাহাতেই চিবুক গোল দেখায়। এই পেশীগুলি অচ্ছেদ্য অর্থাৎ ইচ্ছাপূর্ব্বক নড়ান যায় না। তবে দাঁত উপরের দিকে খিঁচিলে একটু সঙ্কুচিত হয় মাত্র।

(খ) চোয়াল।—এই পেশীগুলি মোটা, চওড়া ফিতার ন্যায়।

চোয়ালের হাড়ের নীচে হইতে আরম্ভ করিয়া গালের হাড় পর্য্যন্ত বন্ধনীর মত। ইহাদের দৃঢ়তায় উপরই মুখের সৌন্দর্য্য অধিক পরিমাণে নির্ভর করে।

(গ) গাল।—গালের প্রত্যেক দিকে চারিটী করিয়া পেশী। ইহারা ইচ্ছাধীন। ইহাদের একদিক চক্ষুর নীচে, গালের হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত। অপর দিক মুখ-বিবরের চতুর্দ্দিকে যে গোল পেশী আছে তাহার সঙ্গে মিশিয়াছে। আমরা যে ইচ্ছানত সঙ্কুচিত করিয়া চক্ষুর নীচে থোবার ন্যায় করিতে পারি, তাহা ইহাদের সাহায্যে।

(ঘ) মুখ-বিবর। ইহার চতুর্দ্দিকে একটী প্রশস্ত বন্ধনীর ন্যায় পেশী আছে।

(ঙ) শঙ্খদেশ। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে।

প্রক্রিয়া।

(ক) চিবুক।—হাতের তালুর উপর চিবুক স্থাপন করিয়া দৃঢ়ভাবে চাপিবে এবং জোরে ঘসিয়া দিবে। উভয় পার্শ্ব এবং সূক্ষ্মাগ্র সমানভাবে মর্দ্দন করিবে।

(খ, গ) চোয়াল ও গাল।—হাতের তালুর গোড়

---

* প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্ন্যাল মহাশয়ের এই সঙ্গত প্রস্তাবটীর সাধারণ্যে বহুল প্রচারার্থ আমরা ইহা প্রকাশ করিলাম। আশা করি সঙ্গীতজ্ঞ গুণীবর্গ এবিষয়ে আলোচনা করিয়া উপকৃত করিবেন। তঃ পঃ সং।

চিবুকের কাছে সংলগ্ন করিয়া উপরের দিকে দৃঢ়ভাবে ঘসিয়া দিবে।

গালের এক এক দিকে যে চারিটী পেশীর কথা বলা হইয়াছে, উহাদিগকে হাতের তালুর সাহায্যে মুখ-বিবরের উভয় প্রান্ত হইতে চক্ষুর দিকে ঠেলিয়া তুলিবে, তাহা হইলেই দুই দিকে দুইটী খোবার মত হইবে; ঐ অবস্থায় চাপিয়া রাখিয়া মুখ একবার হাঁ করিবে পুনরায় বুজিবে। ইহাতে ঐ পেশীগুলির উপর জোর পড়িবে। তৎপরে শক্ত হাতে কানের দিকে ঘসিয়া দিবে।

(ঘ) মুখ-বিবর।—মুখের মধ্যে দুই হাতের কনিষ্ঠা প্রবেশ করাইয়া দিয়া প্রসারিত করিবে; কিন্তু মুখের পেশীতে জোর দিয়া বুজিয়া থাকিতে চেষ্টা করিবে। ইহাতে মুখ প্রশস্ত হইবার কোন আশঙ্কা নাই।

(ঙ) শঙ্খদেশ হাতের তালু দিয়া ঘসিয়া চক্ষুর কোণের দিকে আনিবে।

প্রক্রিয়া সমাপনান্তে হাতের আঙ্গুল দিয়া মুখের ত্বক মাজিয়া দিবে। তৎপর ঠাণ্ডা জল দিয়া বেশ করিয়া ধুইয়া একটু শাদা ভেসেলিন্ মাখিবে। খানিক পরে গামছা দিয়া মুছিয়া দিবে।

চক্ষু।—প্রত্যেক চক্ষুর ক্রিয়া ছয়টী পেশীর ক্রিয়ার উপর নির্ভর করে। এই পেশীগুলি চক্ষুগোলকের সঙ্গে সংবদ্ধ এবং তথা হইতে চক্ষুর চতুর্দ্দিকের হাড়ের সঙ্গে সংযুক্ত।

পেশীগুলির কার্য্যবিভাগ, যথা, (১) যে পেশী দ্বারা চক্ষু উপরে তুলি, (২) যদ্দ্বারা নীচে নামাই, (৩) যদ্দ্বারা ভিতরের দিকে লই, (৪) যদ্দ্বারা বাহিরের দিকে আনে, (৫) ও (৬) যদ্দ্বারা চক্ষু ঘুরাই।

প্রক্রিয়া দ্বিবিধ। (ক)—পেশীগুলি দৃঢ়ভাবে ঘসিয়া দেওয়া।

(খ)—(১) যতদূর সম্ভব একবার ডানদিকে পুনরায় বাম দিকে তাকাও, তৎপর শক্ত করিয়া চক্ষু বোজ, আবার জোরে তাকাও।

(২) বক্রভাগে একবার ডান দিকে উপরে, আবার বামদিকে নীচে, পুনরায় বাম দিকে উপরে, ডান দিকে নীচে (Diagonally) তাকাও।

(৩) চক্ষু ডান হইতে বাম, বাম হইতে ডানে ঘুরাও।

এই প্রক্রিয়াগুলি প্রথম প্রথম অধিক বার করিবে না।

যতক্ষণ এই সকল প্রক্রিয়া চলিবে ততক্ষণ সঙ্গে সঙ্গে উভয় শঙ্খদেশে হাতের তালুর গোড় দ্বারা ক্ষিপ্র আঘাত করিতে থাকিবে। এই আঘাতে বিশেষ ফলোদয় হয়।

সমাপনান্তে চক্ষু মেলিয়া ঠাণ্ডা জলের ছিটা দাও।

উপসংহার। প্রত্যেকটী প্রক্রিয়া শয্যায় শয়ন করিয়া নিজে আস্তে আস্তে উপদেশগুলির প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া চেষ্টা না করিলে ব্যাখ্যাত্মক চিত্রের সাহায্যে বুঝান মুস্কিল। কয়েকবার নিজে নিজে পরীক্ষা করিলেই এক একটী প্রক্রিয়া আয়ত্ত হইয়া আসিবে। অতএব অনাবশ্যক বোধে নিয়মের সহিত ব্যয়সাধ্য চিত্র মুদ্রণ করা হইল না। আমি নিজ অভিজ্ঞতা হইতে বলিতেছি, এই প্রক্রিয়াগুলি প্রত্যেকের পক্ষেই সহজসাধ্য এবং আশু ফলপ্রদ। ভগ্ন-স্বাস্থ্য ও দীর্ঘজীবনকামী ব্যক্তিগণ এই ব্যায়ামপ্রণালী অবলম্বন করুন। *

লালা লাজপত রায়।

(শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ)

আমাদের মত সাধারণ সংসারী মানুষেরা প্রায়ই একটী বিশেষ পরিচয়ের নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে বাঁধা পড়িয়া যাই। কিন্তু সময় সময় এমন এক-একজন লোকের আবির্ভাব হয়, যাঁহাদের মনুষ্যত্ব এত মহান যে, পরিচয়ের কোন নির্দ্দিষ্ট গণ্ডীতে কিছুতেই তাঁহাদের ধরা-ছোঁয়া যায় না। লালা লাজপত রায় একজন এই শ্রেণীর লোক ছিলেন। তাই আমরা তাঁহাকে যদি কেবল মাত্র একজন রাজ-নীতিজ্ঞ বলিয়া মনে করি, তবে ভুল করিব। তাঁহার সাধনা জীবনের কোনও একটী ক্ষেত্রে মাত্র পর্য্যবসিত হয় নাই—উহা বিশ্বজনীন ও বহুব্যাপক ছিল; তাই ভারতীয় সমাজের সর্ব্ববিধ দুঃখ ও দুর্গতির মাঝে সর্ব্বত্র তিনি অভয় মূর্ত্তিতে নিত্য অগ্রসরশীল ছিলেন। অধুনা জনসেবার ভাব সমাজের মধ্যে তবু কতকটা প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছে; কিন্তু যে যুগে স্বার্থ ছাড়িয়া পরার্থের চর্চ্চা করা মূর্খতার নামান্তর ছিল, সে যুগে লালাজী অকপটে এই জন-সেবাকেই আপন জীবনের ব্রতরূপে গ্রহণ করিয়াছিলেন। যৌবন প্রারম্ভে 'হিসারে' যখন তিনি কেবলমাত্র আইন ব্যবসায়ে লিপ্ত হইয়াছেন, তখন তাঁহার তরুণ চিত্ত সংসারের গতানুগতিক পথে ধনার্জ্জনের সঙ্কীর্ণ গণ্ডীতে বাঁধা পড়িতে চাহে নাই; সে অসহিষ্ণু হইয়া আর্য্যসমাজের সহায়তায় ধর্ম্মের উদার আশ্রয় গ্রহণ করিয়াছিল। এত-কাল তাঁহার মধ্যে যে মহত্বের বীজ আত্মবিকাশের সুযোগ না পাইয়া সঙ্কুচিত হইয়া ছিল, আজ সে ধর্ম্মের বাধাহীন বিস্তারের মধ্যে, নানা শাখা-প্রশাখায় আপনাকে ব্যাপ্ত করিয়া তৃপ্ত হইল। বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার দ্বারা শিক্ষা-বিস্তারে, দুর্ভিক্ষনিবারণী সভার সাহায্যে অনাহারক্লিষ্ট-দিগকে অন্নদানে, ভূকম্পে ক্ষতিগ্রস্ত অসহায় অধিবাসী-দিগকে সর্ব্ববিধ সাহায্য প্রদানে, অবনত জাতির উন্নতি সাধনে, সমাজসংস্কারে ও ধর্ম্মনীতির প্রচারে—এককথায় সমাজের সর্ব্বাঙ্গীন সেবায় তিনি নিঃশেষে আপনাকে বিলাইয়া দিয়াছিলেন। যৌবনপ্রারম্ভে লালাজী ধর্ম্মের

* এডুকেশন গেজেট।

যে উদার স্পর্শ লাভ করিয়াছিলেন, আমাদের মনে হয়, উহাই তাঁহার জীবনের এই বিচিত্র পরিণতির হেতু। তাঁহার দেশপ্রীতি ছিল একান্ত অকপট। ভারতের নরনারীকে তিনি প্রকৃতই আপনার পরমাত্মীয় বলিয়া জ্ঞান করিতেন, তাহাদের দুঃখে তিনি সত্যই দুঃখিত হইতেন। তাঁহার সমগ্র জীবন এই দুঃখবোধের প্রতিক্রিয়ায় উদ্দীপিত ও উৎসর্গীকৃত। সাধারণতঃ স্বীয় পরিবারের দুঃখমোচন ও সুখবর্দ্ধনের জন্যই মানুষের সমগ্র অর্থ ও সামর্থ্য বিনিযুক্ত হয়; কিন্তু লালাজী আপন পরিবারের কথা বিন্দুমাত্র না ভাবিয়া চিরদিন দেশের জন্যই অকাতরে খাটিয়া গিয়াছেন। সমগ্র ভারতবর্ষই যেন তাঁহার এক বিরাট পরিবার। তিনি পঞ্জাবের অধিবাসী—কিন্তু কোন্ সুদূর বাঙ্গলার নিভৃত পল্লীতে বন্যার প্রবল জলোচ্ছ্বাসে গৃহহীন নর-নারীর ব্যথায় তিনি ব্যথিত হন, তাহাদের চোখের জল মুছাইবার জন্য আপন আর্জ্জিত অর্থ অকাতরে বিলাইয়া দেন। মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্ব্বেও ভারতের কোনও স্বাস্থ্যকর স্থানে একটী যক্ষ্মা-হাসপাতাল স্থাপনের জন্য তিনি এককালীন দুই লক্ষ টাকা দান করিয়া গিয়াছেন। এদিক দিয়া তাঁহার সমকক্ষ পাওয়া বড়ই বিরল।

লালাজীর সমগ্র জীবন একটী পরিপূর্ণ সামঞ্জস্যে সুন্দর ফুটিয়া উঠিয়াছে। তাঁহার কথায় ও কাজে কোথাও অনৈক্য দেখি না। তিনি ছিলেন ধর্ম্ম, সত্য ও স্বাধীনতার উপাসক। তাঁহার ধর্ম্মানুরাগ ছিল বলিয়াই সত্যনিষ্ঠা সম্ভব হইয়াছিল; এবং সত্যনিষ্ঠার ফলেই তিনি স্বাধীনতার প্রতি স্থিরলক্ষ্য হইতে পারিয়াছিলেন। তিনি কেবল মুখে বলিতেন তাহা নহে, তিনি আপন মনপ্রাণে বিশ্বাস করিতেন যে, ধর্ম্মই মানুষের সকল উন্নতির একমাত্র মূল। এই জন্য শেষ বয়সে হিন্দুসংগঠন ও শুদ্ধির জন্য তিনি যথেষ্ট চিন্তা ও পরিশ্রম করিয়া গিয়াছেন। সত্যে তাঁহার নিষ্ঠা ছিল অপূর্ব্ব। যাহা সত্য বলিয়া তিনি জানিতেন, তাহার প্রকাশে তাঁহার কোনও ভয় বা কুণ্ঠা ছিল না। এই সত্যনিষ্ঠাই তাঁহাকে নির্ভীক ও সাহসী করিয়াছিল। ইহারই ফলে তাঁহাকে বহু দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে, কিন্তু কদাপি তিনি সত্য ও স্বাধীনতায় স্থির লক্ষ্য হইতে বিন্দুমাত্র ভ্রষ্ট হন নাই। আজ বিশেষ করিয়া মনে পড়ে, বঙ্গভঙ্গের সেই দুর্দ্দিনে লালাজীর সত্যপূত সেই অপূর্ব্ব সাহসবাণী! বাঙ্গালী জীবনে কখনও কি তাহা ভুলিবে? লালাজীর বহুমুখীন ব্যক্তিত্বকে যে ফুটাইয়া ফলাইয়া পূর্ণরূপে দেখাইতে পারি, সেরূপ সামর্থ্য আমাদের নাই। তিনি একাধারে বিদ্বান, রাজনীতিজ্ঞ, আইনজ্ঞ, সূক্ষ্মদর্শী, সত্যসন্ধ, নির্ভীক, বাগ্মী, লেখক, প্রচারক, ত্যাগী, কর্ম্মবীর, ধর্ম্মবীর ও দানবীর ছিলেন। তাই আজ তাঁহার মৃত্যুতে ভারতের দিগ্‌দিগন্ত শোকে আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিয়াছে, তাঁহার স্মৃতিরক্ষার আন্দোলনে উদ্যত হইয়াছে। কিন্তু আমরা বলি, সঙ্গে সঙ্গে ভারত যেন তাহার মহনীয় নেতার পদাঙ্ক অনুসরণপূর্ব্বক ধর্ম্ম সত্য ও স্বাধীনতার জয়ঘোষণা করিতে পারে।

গ্রন্থপরিচয়।

বঙ্গলক্ষ্মী।—অগ্রহায়ণ—সম্পাদিকা শ্রীহেমলতা দেবী।

৺সরোজনলিনী দত্ত কর্ত্তৃক লিখিত 'জাপানে বঙ্গনারী' প্রবন্ধটী সুন্দর লাগিতেছে। জবরদস্তি উপদেশ অপেক্ষা বিভিন্ন দেশের নারীগণের অবস্থার বর্ণনা বোধ হয় অধিকতর শিক্ষাপ্রদ। 'প্রকৃতি' হইতে উদ্ধৃত অধ্যাপক শ্রীঅতুলচন্দ্র দত্তের 'বিজ্ঞানসাধিকা শ্রীমতী কুরী' বড় সুন্দর। শ্রীযুক্ত গুরুসদয় দত্তের "সাম্য ও মৈত্রী" কবিতাটীর বিদ্যালয়সমূহে আবৃত্তির ব্যবস্থা করা উচিত। শ্রীমতী লাবণ্যলেখা-লিখিত "সৌন্দর্য্যবোধ ও গৃহশিল্পে নারী' প্রবন্ধের বক্তব্য আর একটু ফুটাইয়া তুলিলে ভাল হইত। বঙ্গলক্ষ্মীতে "প্রতীক্ষায়" কবিতার ন্যায় কবিতা প্রকাশের আমরা পক্ষপাতী নহি।

আর্থিক উন্নতি।—কার্ত্তিক—সম্পাদক শ্রীবিনয়কুমার সরকার।

মোটের উপর বলিতে পারি, কাগজ খানি সুন্দর চলিতেছে। "মোলাকাৎ"এ লিখিত বিষয় hits straight। আমাদের মনে হয়, স্বাধীনজীবিকা প্রত্যক্ষভাবে যাহাতে দেশীয়গণ অবলম্বন করিতে পারেন, এইরূপ প্রবন্ধ প্রকাশিত হইলে ইহা দেশের প্রকৃত মঙ্গলসাধন করিবে।

মাতৃমন্দির।—অগ্রহায়ণ—সম্পাদক শ্রীঅক্ষয়কুমার নন্দী ও শ্রীসুশীলা নন্দী।

'পতিতাসমস্যা' প্রবন্ধোক্ত মতের সহিত আমরা একমত যে, পতিতাদিগকে পদদলিত না করিয়া ধাত্রী প্রভৃতি কার্য্যে নিযুক্ত করিলে ভালই হয়। কিন্তু সমাজহিতৈষীমাত্রেরই লক্ষ্য রাখা উচিত যে, যাহাতে পতিতাদিগকে ভদ্রমহিলাদিগের সহিত কোনও সূত্রে একস্তরে না দাঁড় করানো হয় এবং সদাসর্ব্বদা তাঁহাদিগের সহিত মেশামেশি করিতে না দেওয়া হয়। শ্রীমতী রত্নমালা লিখিত 'এথার' সমালোচনা বড় সহজ ও মিষ্ট লাগিয়াছে। শ্রীশশধর রায়ের 'বেদ ও স্ত্রীজাতি' সময়োপযোগী হইয়াছে। আমাদের দেশ এখনও যেরূপ শাস্ত্রানুরাগী, তাহাতে শাস্ত্র হইতে স্ত্রীজাতির কর্ত্তব্যাদি দেখাইলে নারীজাতির বিশেষ উপকার হইবে।

'চোখের কথা'র ন্যায় কবিতা প্রকাশের উপযোগিতা দেখি না। 'সঙ্কলন' মাতৃমন্দিরের উপযোগী হইয়াছে। 'রন্ধনবিদ্যার' মত প্রবন্ধের বর্ত্তমান সময়ে বড়ই প্রয়োজন পড়িয়াছে। এক সময়ে আমরা "পুণ্য" পত্রিকায় এইরূপ প্রবন্ধ সর্ব্বপ্রথম প্রকাশ করিতে থাকি—এখন দেখিয়া সুখী যে, অনেক মাসিকপত্রই এই বিষয়ের উপকারিতা বুঝিতেছে। পদ্মিনী কবিতাটী বড় ভাল লাগিয়াছে। আমরা খুব ভাবিয়া দেখিয়াছি যে, জন্মশাসন সম্বন্ধীয় প্রবন্ধ বা পুস্তকাদি দেশের বিশেষ অনিষ্টকর। আমরা তাই সম্পাদক ও সম্পাদিকার নিকটে করযোড়ে প্রার্থনা করি, তাঁহারা যেন এবিষয়ের বিজ্ঞাপন প্রকাশেও নিরস্ত থাকেন।

মানসী ও মর্ম্মবাণী।—অগ্রহায়ণ—সম্পাদক মহারাজ শ্রীযোগীন্দ্রনাথ রায় এবং শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়।

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের 'শৈবধর্ম্ম' প্রবন্ধের ৪র্থ কিস্তি চলিতেছে। প্রবন্ধটী গবেষণাপূর্ণ। 'শ্রীশ্রীবুদ্ধদেবের জন্মোৎসব' প্রবন্ধ সম্বন্ধে শ্রীরাসমোহন চক্রবর্ত্তী বলিতেছেন যে, বুদ্ধদেব নাস্তিক ছিলেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথও তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে ঐ কথাই স্পষ্ট সপ্রমাণ করিয়াছেন। শ্রীমন্মথনাথ ঘোষ লিখিত 'রঙ্গলালের' ৬ষ্ঠ পরিচ্ছেদ চলিতেছে। বাংলার সাহিত্যরথীগণের পুরাকাহিনী লিখিতে মন্মথ বাবু সিদ্ধহস্ত। এই সকল জীবনী লিখিয়া তিনি যে উপকার করিতেছেন তাহার প্রকৃত ভাব অদূর :ভবিষ্যতে বঙ্গের সাহিত্যিকগণ উপলব্ধি করিবেন। 'আপেক্ষিকতাবাদের স্থূলকথা' যদিও বিশেষজ্ঞদিগের জন্য লিখিত, তবু উহা যেরূপ সহজভাবে লিখিত তাহাতে আমাদের ন্যায় অনভিজ্ঞ লোকেরও পক্ষে দুর্ব্বোধ্য হয় নাই। 'বৌদ্ধযুগে ক্রীতদাসী' প্রবন্ধ উপাদেয় হইলেও সংক্ষিপ্ত। সম্পাদক মহাশয়দ্বয় প্রবীণ—তাঁহাদের নিকটে করযোড়ে মিনতি করি, অশ্লীল ইঙ্গিত মাত্রও যে বিজ্ঞাপনে থাকে, তাহা যেন প্রকাশ না করেন। তাঁহাদিগকে বিজ্ঞাপনীর ।৶০ পৃষ্ঠা দেখিতে অনুরোধ করি।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান।—অগ্রহায়ণ—সম্পাদক শ্রীসত্যচরণ সেন কবিরঞ্জন এবং কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্রী।

সুচিন্তিত 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য রোগবিজ্ঞানে জীবাণুবাদ' প্রবন্ধে লেখক কতকাংশে ঠিকই বলিয়াছেন যে, প্রাচ্যগণ অনুচিত আহার-বিহারকে এবং পাশ্চাত্যগণ জীবাণুকেই সংক্রামক রোগের উৎপত্তির কারণ বলেন। এরূপ একদেশদর্শিতা উভয় পক্ষেরই একটা যেন ফ্যাষণ হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মনে হয়, উভয় মতবাদেরই ভিতর সত্য আছে। পাশ্চাত্য চিকিৎসকেরা তো বলেন যে, শতবিধ সংক্রামক রোগের বীজাণু হাওয়ায় ভাসিতেছে, কিন্তু যাহার দেহ দুর্ব্বলতার কারণে সেই সকল বীজাণুকে আশ্রয় দিয়া পুষ্টিদান করে, সেই সকল দেহেই ঐ সকল বীজাণুসংক্রামিত রোগ প্রকাশ পায়। তবেই তো, দুর্ব্বলতার কারণরূপে অনুচিত আহার-বিহারের কথা আসিল। আয়ুর্ব্বিজ্ঞানে নিরপেক্ষ ভাবে সকল আনুষঙ্গ বিষয়ে প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য মতগুলি সমালোচনা করিলে ভাল হয়। 'আয়ুর্ব্বেদ ও জ্যোতিষ' প্রবন্ধটী দেশবাসীর নিকট উপাদেয় হইবে। কিন্তু এবিষয়ে পরীক্ষা পূর্ব্বক ফল জানাইলে ভাল হয়—কাহারও যদি পাণ্ডু রোগ থাকে, তবে দেখিতে হয় তাহার জন্মকোষ্ঠীতে মঙ্গল গ্রহের বৃষরাশিতে অবস্থান উক্ত হইয়াছে কি না ইত্যাদি। যদি প্রবন্ধোক্ত বিষয়গুলি সত্য প্রমাণিত হয়, তবে সমস্ত দর্শনতত্ত্বে যুগান্তর উপস্থিত হইবে নিঃসন্দেহ। 'কৃমি রোগের চিকিৎসা ও মুষ্টিযোগ' যাহা প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা আমাদের বড়ই ভাল লাগিয়াছে। "একটী রোগীর কথা" যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বড়ই ঠিক। আমরা দেখিয়াছি এলোপ্যাথিক মতে যক্ষ্মা চিকিৎসা কেবল argument in a circle—creasote দিয়া জীবাণু মরে, এদিকে creasote দিবার ফলে উদরাময়, উদরাময়জনিত দুর্ব্বলতার কারণে জীবাণু বৃদ্ধি, তখন আবার creasoteএর মাত্রা বৃদ্ধি ইত্যাদি। আমরা পরীক্ষায় দেখিয়াছি, কোন রোগে বা এলোপ্যাথি, কোন রোগে বা হোমিওপ্যাথি বা বাইওকেমিক এবং কোন রোগে বা কবিরাজী চিকিৎসা বড়ই উপকারপ্রদ। যক্ষ্মা নামীয় রোগে কবিরাজীর ন্যায় অন্য কোনও ঔষধ তেমন ফলপ্রদ হইতে দেখি নাই। "আয়ুর্ব্বেদে ঔষধ প্রস্তুত প্রণালী আলোচনার" প্রতিবাদে লেখক যাহা বলিয়াছেন, তাহার সমর্থনে একটা কথা বলি—কোন সুপ্রসিদ্ধ ঔষধকারখানায় মকরধ্বজ তড়িৎ সাহায্যে প্রস্তুত হইত। একজন সুপ্রসিদ্ধ বৈজ্ঞানিক নিজের পীড়ার সময় কবিরাজের পরামর্শে মকরধ্বজ সেব্য জানিয়া সস্তার খাতিরে সেই মকরধ্বজ আনাইয়া সেবন করিলেন, কিন্তু তাহাতে কোনও উপকার হইল না। অবশেষে কবিরাজকে সেই কথা বলায় তিনি অবাক হইলেন যে কেন উপকার হইতেছে না। তখন অনুসন্ধানে প্রকৃত কথা জানিয়া তিনি নিজের মকরধ্বজ বলপূর্ব্বক সেবন করাইলেন; সুফলও সঙ্গে সঙ্গে পাওয়া গেল। এখানেও সম্পাদক মহাশয়গণের নিকট সনির্ব্বন্ধ অনুরোধ—চিকিৎসাবিজ্ঞানের নামে অশ্লীলতাসংশ্লিষ্ট কোনও বিজ্ঞাপন যেন না প্রকাশ করেন।

হিন্দু।—১৩ অগ্রহায়ণ—শুদ্ধি সমস্যা প্রবন্ধে শুদ্ধিগৃহীতদিগকে সমাজে চল করাইবার সম্বন্ধে যে সকল

প্রস্তাব উপস্থিত করিয়াছেন, মোটামুটি হিসাবে সেই সকল প্রস্তাবের সপক্ষে বর্ত্তমানের তরুণসম্প্রদায়ের অধিকাংশই দাঁড়াইবেন এবং এরূপ চল করাইবার আমরাও পক্ষপাতী। কিন্তু তাহাদিগকে "শুদ্ধ ক্ষত্রিয়" রূপে পৃথক অপর একটা জাতির সৃষ্টির পক্ষপাতী আমরা নহি। আমরা এমন অনেক দৃষ্টান্ত জানি, ভদ্রবংশীয় ব্রাহ্মণের ঔরসে কিন্তু পতিতার গর্ভে সম্ভ্রান্ত পুত্রগণও হিন্দু সমাজে অবাধে চলিয়া গিয়াছেন এবং সমাজের বিবিধ হিতসাধক কার্য্যে নিযুক্ত রহিয়াছেন। সুতরাং শুদ্ধ-ক্ষত্রিয়দিগকে লইয়া পৃথক জাতি সৃষ্টির কোনই প্রয়োজন দেখি না।

সংবাদ।

সম্রাট পঞ্চমজর্জ্জের অসুস্থতা—

আমরা সম্রাট পঞ্চম জর্জ্জের অসুখের সম্বাদ শুনিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইলাম। পত্রিকার বর্ত্তমান সংখ্যা ছাপা শেষ হইবার সময়ে তিনি কতকটা ভাল আছেন শুনিয়া আশ্বস্ত হইলাম। ভগবানের নিকট প্রার্থনা করি, আমাদের সম্রাট শীঘ্র নিরাময় হইয়া দীর্ঘকাল রাজত্ব করিতে থাকুন।

হাবড়ায় শৌণ্ডিকালয় স্থাপনের বিরুদ্ধে প্রস্তাব গ্রহণ—আমরা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইলাম যে হাবড়া মিউনিসিপালিটীর অন্যতর কমিশনর ও বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সভ্য শ্রীযুক্ত খগেন্দ্রনাথ গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রস্তাবে হাবড়া মিউনিসিপালিটীর সীমার ভিতর হইতে মদপ্রভৃতির দোকান উঠাইয়া দিবার প্রস্তাব মিউনিসিপালিটির এক বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত সকল কমিশনর একবাক্যে গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি ঠিকই বলিয়াছেন যে নানা সাধারণ হিতকর প্রতিষ্ঠানের সন্নিকটে মদের দোকান থাকায় সেগুলি জনসাধারণের বিশেষ নৈতিক অবনতির কারণ হইয়া উঠিয়াছে। মদের দোকান যত বেশী খোলা থাকিবে, গবর্ণমেণ্টের আবগারী বিভাগের আয় ততই বৃদ্ধি হইবে বটে, কিন্তু ইহা জানা কথা যে তাহার ফলে প্রজাগণের দুঃখদারিদ্র্য বৃদ্ধি হইতে থাকিবে। পরিণামে প্রজার সর্ব্বনাশে রাজ্যের অনিষ্ট অবশ্যম্ভাবী। আমেরিকার যুক্তরাজ্যে এবং রুষিয়ার দৃষ্টান্তে স্পষ্ট বোঝা গিয়াছে যে, মদের অবাধ বিক্রয় উঠাইয়া দিলে প্রজাগণের সমূহ মঙ্গল। আমরা আরও সুখী হইলাম যে, উক্ত প্রস্তাব উপস্থিত কমিশনরগণ কর্ত্তৃক একবাক্যে গৃহীত হইয়াছে। বহুকাল অবধি এই বিষয়ে বিশেষ চেষ্টা চলিতেছিল, কিন্তু আবগারী বিভাগের আয় কমিবার ভয়ে মিউনিসিপালিটি এরূপ drastic step অবলম্বন করিতে সাহস করে নাই। বর্ত্তমানে কমিশনরগণের সৎসাহসের জন্য আমরা তাঁহাদিগকে অভিনন্দিত করিতেছি। এই প্রস্তাব গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক শেষ পর্য্যন্ত অনুমোদিত হইলে আমরা গবর্ণমেণ্টকে সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করিব।

মহারাজা আলোয়ারের বিবাহপ্রস্তাব।—মহারাজার বয়স ৫০ বৎসর, তিনি একটী ১৬ বৎসর বালিকার পাণিগ্রহণে ইচ্ছুক। ইঁহারা উভয়েই রাজপুত। শুনিয়া সুখী হইলাম যে, বালিকার পিতা এবং বালিকা স্বয়ং এই বিবাহে অসম্মতি প্রকাশ করিয়াছেন। অসম্মতির কারণ এই যে, রাজপুতগণের মধ্যে বৃদ্ধের সহিত বালিকার বিবাহ নাকি আচারবিরুদ্ধ—তাহা রাজকুলেই হোক বা প্রজাগণের মধ্যেই হোক। ভগবানের প্রতিষ্ঠিত নিয়মাবলীর প্রতি দৃষ্টি রাখিলে এরূপ বৃদ্ধ-বালিকা-বিবাহ কখনই ধর্ম্মানুমোদিত হইতে পারে না।

গার্হস্থ্য সংবাদ।

বিবাহ।—বিগত ৬ই অগ্রহায়ণ বৃহস্পতিবার সম্বলপুর নগরীতে শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্রীপতি শ্রীযুক্ত লক্ষ্মীনাথ বেজবড়ুয়া মহাশয়ের মধ্যমা কন্যা শ্রীরত্নাবলী দেবীর সহিত ডিব্রুগড় নিবাসী ৺ পুণারাম বড়ুয়ার কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ রোহিণীনাথ বড়ুয়ার শুভ বিবাহ সম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। বিবাহ সভায় ইউরোপীয় ও দেশীয় বহু গণ্যমান্য নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। ভগবান এই নবদম্পতিকে প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

শোক-সংবাদ।

৺যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার।—গত ২রা অগ্রহায়ণ রবিবার প্রাতে পাটনা কলেজের অধ্যাপক খ্যাতনামা ঐতিহাসিক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার মহাশয় চুণারের প্রবাস আলয়ে অকালে পরলোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে তাঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৪৭ বৎসর হইয়াছিল। তিনি কিছুদিন যাবৎ নানা রোগে ভুগিতেছিলেন, কিন্তু এত শীঘ্র যে চলিয়া যাইবেন তাহা কেহই মনে করে নাই। সমাদ্দার মহাশয় যশোহর জেলার অন্তর্গত 'কচুবেড়িয়া' গ্রামে জন্ম গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি গত ১৯১২ খৃষ্টাব্দে পাটনা গভর্ণমেণ্ট কলেজে ইতিহাসের অধ্যাপক পদে বৃত হইয়া আমৃত্যু ঐ পদে নিযুক্ত ছিলেন। তাঁহার "সম-সাময়িক ভারত" বঙ্গসাহিত্যে তাঁহাকে অমর করিয়া রাখিবে। ইঁহার অকালমৃত্যুতে বঙ্গভাষা ও ইতিহাস বিশেষ ক্ষতিগ্রস্ত হইল, সন্দেহ নাই। আমরা ইঁহার শোকার্ত্ত পরিবারবর্গকে আমাদের গভীর সমবেদনা জানাইতেছি। ইঁহার সপ্ততি বর্ষীয় বৃদ্ধ পিতা, শোক-বিধুর পত্নী ও পুত্রকন্যাগণের অন্তরে ভগবান শান্তি বিধান করুন।

The Message
OF THE
BRAHMO SAMAJ.

Proclaim with all your heart the victory of God—the One without a second. Do away with all doubts and misgivings of heart. There is no time for sleeping. Arise and awake. Know God and leave aside all other talks. He is the fountain of life. To worship Him in love and through good works will not only bring you spiritual liberation but freedom and prosperity in this world as well.

KSHITINDRA NATH TAGORE,

THE MESSAGE OF FREEDOM.

(ACHARYA SRIJUKTA KSHITINDRA NATH TAGORE.)

In the words of the Rishis, I place before you the simple and liberal message of freedom and hope. Accept it and be on the way to liberation :—

This Effulgent Deathless and All-knowing Being who pervades this sky ;
This Effulgent Deathless and All-knowing Being who dwells in this soul ;
By knowing Him alone one overcomes death ;
There is no other way to liberation.

On the way to liberation and freedom, we shall have to move onward. One cannot live without freedom. It is true that at one time or other of our life, we may be hit by a stunning blow of subjection, or we may be weighed down by sorrow, poverty and sins that try to grind the life out of us. But God, the fountainhead of all freedom has instilled into our hearts a strong desire for liberation from all forms of bondage. It is this that moves us to pull down the solid walls of sorrow, poverty, sins and dangers in our effort to gain freedom. Wonderful is the Divine Law—the more the fetters of bondage tighten their hold on us, the greater becomes the force which spurs us on to break the fetters down and to gain freedom.

A mere desire for freedom will not help us in anyway. It has been rightly said that

unless one realises in his own heart the Effulgent and Deathless Being, the Deliverer from all evlis, there is no other way to emancipation. Unless one knows Him and takes shelter in Him, Who pervades the infinite sky and upholds the universe, Who, by His wonderful laws, regulates the working of nature and Who makes even death stride along in nature under His inviolable laws, where—oh, where is the hope of salvation ? To lie immersed in the well of death will not certainly bring deathless life to us. To be a pilgrim to the abode of eternal life, one must realise in his soul the Deathless Being, whom death cannot touch, and feel His loving and beneficient immanence in every breath of his life, in adversity or felicity. In the days of yore, when this truth was boldly proclaimed, India rose to the highest summit of glory and advancement. The Theistic Church has once more been carrying the same hopeful message of liberation from house to house in this poor country of ours.

We, the inhabitants of this poverty-stricken country have been in a state of complete subjection for centuries, and have, in consequence become so weakened both in body and mind, that we have not up to this day been able to realise the broad, liberating and catholic spirit of this true message of hope. Awake or asleep, to be in direct communion with God in all the walks of life, is our ideal. But strange to say, we should look askance at this ideal and lose faith in this communion from which alone can flow the all-round freedom. As a result of this, scorn, oppression and contempt have been our lot. We prefer indolence, sowing seeds of death, to life, and ease and comfort to freedom. We have lived too long in bondage and in the dark well of death. We do not therefore hesitate to consider anyone, who attempts to awaken us from the hypnotic sleep of ease and comfort, as a destroyer of our peace and happiness ; we do not fail to persecute him who comes to teach us how to obtain life by shaking off the oppressive bonds of indolence and inactivity. The history of the world however bears witness to the fact that no man, nay, no nation that drank deep of the infatuating poison of indolence and inactivity, and slept in the lifesucking embrace of ease and comfort, had the privilege of proceeding on the road to freedom and of feeling in heart the eternal bliss of liberation. The Theistic Church teaches us that in the teeth of a thousand and one persecutions and oppressions, we should be above all fear and proclaim the lifegiving message of freedom and liberation, the message of direct communion with the great soul of the universe. We cannot desist from this our task, if we want to push our country-men onward to progress and advancement and lead them to freedom and emancipation.

The time for proclaiming this true message of freedom has come. On the one hand, science advances by rapid strides and exhibits the powers of the Omnipotent, bringing to man the hope of freedom from the bondage of nature ; while on the other, as a result of deep study of the religions and scriptures of different countries, the indissoluble relation of the human soul with the Soul of souls and the consequent freedom of the human soul are being constantly brought home into the heart of man. On the one hand, the limits of our knowledge are receding by far ; while on the other, the ideals of our life and creed are expanding every day. This has inevitably led to the great awakening of the human society in all directions, spiritual as well as physical and intellectual. This awakening has at the same time brought in its wake many a doubt and questioning in different matters causing deep unrest. No one cares to accept now-a-days any religion or any social custom, that might have been observed by this forefathers, without having put the same to the crucial test of the inner celestial light of his soul. Neither any dry rite nor any dry doctrine, ancient or modern, of any sectarian creed can hold the modern man in bondage. The modern man does not want to make himself a slave to the blind superstitions, nor to surrender his reason to any external authority and stifle his higher thoughts to death. We have therefore no hesitation to say that golden opportunity has come for promulgating with all our might the true

message of liberation as propounded by the Theistic Church.

The Theistic Church has, since its advent, declared in the midst of severe persecutions, war against all forms of bondage. It does not necessarily mean to uproot all ancient creeds. What it does intend, is to purify the old creeds and with the help of the new light and thought of the modern age, to show a newer way to liberation. The Theistic Church has come to re-establish, and give its firm support to, all that is true and good in the different religions. It has come to harmonise the new spirit of the new age with that smouldering under the ashes of the old doctrines and to re-establish true faith in the hearts of men by purging it of blind superstitions.

We of the modern age, do feel in our hearts the want of a religion, simple and strong, that will tell us in the plainest language about the Deity, Who pervades the heavens and shapes every event in nature; about the Deity who dwells in the soul of man and ever lifts him up towards divinity; about the Deity, who is our Father and Mother and who is the Life of our life and the source of all that is good and is the fountainhead of all freedom. We want a religion, simple and stromg, that can urge us in unmistakable accents to discard at once any creed or scripture that stands in the way of man's direct communion with God. True religion will tell us that mere disputation, mere intellect or mere bookish knowledge will be of little avail to us in our realising Him, but that every toiler on the path of righteousness can come in direct contact with Him through good work and piety. This simple and strong religion, by whatever name it may be designated, is preached by the Theistic Church, that has God alone for its centre and whose only creed is to worship Him by loving Him and doing works He loves with all our heart. It is true that at times many a doubt and misgiving will try to envelope our minds in darkness. But the Theistic Church gives us courage and says—Away with all sectarian religions and seek shelter in God alone, and all your doubts and the knotty questionings of your heart will melt away. There is no gainsaying that in your march along the road to freedom and liberation, you will meet with many a doubt and difficulty, but these you will have to conquer in order to attain freedom. An inert life under the heavy weight of bondage will give you no occasion to respond to the call of freedom, or to meet with any doubts or questionings of the heart. The great mission of the Theistic Church in the present era is to show on the one hand the way to freedom and to bring light to dispel all doubts on the other.

There are of course many things in this world, which are in the present state of our knowledge, beyond our understanding and comprehension; there is many a mystery of our life, in the maze of which we get ourselves completely bewildered. Owing to this ignorance, we often dare to express our doubts regarding the infinite wisdom and goodness of Providence. The unreasonableness of all such doubts will easily be realised if we turn our eyes inward and meditate over these in our calmer moments. We shall then perceive that it is not possible for us, finite beings as we are, born with limitations, to dive into the inner mysteries of nature and to know the essential realites of things. But that does not indeed give us any occasion to doubt the infinite wisdom and goodnes of Providence. The very fact of our limitations tells us that there is, as the centre of the universe, as the indwelling spirit of nature and the over-soul of all souls, an all-knowing, all-good and ever-present Infinite Being. Where should we stand if we have doubt in His existence? The very foundation of all our knowledge is shaken if we do not believe in His existence. In fact, there does not seem to be any occasion for entertaining any such doubts, When we see that the more the world moves on towards progress, the more do the mysteries of nature and the hidden realities of the soul gradually reveal themselves to us clearly, we may rest assured that God will as well reveal Himself to us when we become worthy of it.

We know that God revealed Himself to the sages of yore, and we are sure that He will reveal Himself to us as well. Why do we say that He *will*? He *is* always self-manifest, as in the remote past, in the sky

and in the clouds; in the flowers and in the leaves; in the majestic grandeur of the mountains and in the silent motion of the stars; and in the peace we obtain when we come out victorious in our struggle for supremacy over sins and afflictions. His life-giving message always rings in our ears as it did in those of the sages of the olden days. His bugle-call bids us not to lose heart, but encourages us every moment to walk along His path.

We are apt to forget that God is not limited to any one person, nation or country or to any one time. He is self-manifest in every atom. We forget that He, who is the presiding deity of nature and who dwells in us as the Soul of our souls, is also father and mother to us. If we go to Him straight and with an eager heart, all obstacles and difficulties in our way will be overcome. It is because we forget this simple truth that we proceed to place this great man or that on the throne of God and to worship him as such. Love man by all means and revere him, but do not seat him as God incarnate on the altar of God himself. It is obvious that no man, who is a finite being, can be supernatural or above nature the same as God, the controlling deity of nature. The large-hearted and broad-minded men, who sympathise wholeheartedly with the afflicted in their afflictions and with the sinners in their commission of sins and weep with them in their distress, have every right to be always in the forefront in our battles of righteousness and claim leadership in all our struggles for freedom. But it should never be forgotten that our goal is nothing short of God himself.

The Theistic Church gives us advice to leave aside all useless talks and disserations. There is really no time to waste over useless discussions about different doctrines and creeds. Take the sraightest path and fall weeping at the feet of God, the Absolver from all sins, and the stay and shield of his devotees, when fear will flee away from you. Expand your mind and get rid of all superstitions, and realise within you the ever-presence and all-goodness of God. Have faith and know for certain that in the kingdom of God, sin, hatred and ignorance cannot reign for all times. Truth, justice and love will come out triumphant at the end. The self-sacrifice of the mother for the child bears witness to this. Know this and be fearless. Carry this message of hope from door to door and console the sinners, the afflicted, the poor and the distressed. Know yourself and make it known to all others as well, that the love and the wisdom of God are infinitely deeper than and superior to those of ours. It is the Theistic Church that has given us this message of hope and has taught us to know God as our veritable father and mother. Accept therefore the root-principle of the Theistic Church that of worshipping God alone by loving Him and doing the works He loves and bring triumph and victory unto it. Illumine the Church with the new light of the new era. May God ever shower His blessings on this our humble endeavour.

Ōm Brahmārpaṇamastu.

Tattwabodhini Patrika　　　　　　　　　　　　　　　　Reg. No. C 432

সংখ্যা ১০২৫　　　　　　　　　　　　　　　　　　পৌষ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে　　　　　　　　　　　　　　　　চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রী[illegible]নাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৫। শক ১৮৫০। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯। পৌষ।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩ৎ টাকা ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫। ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯। পৌষ।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০৬ অঞ্জলি—রাজা দেবতা।

১। হে ভগবান! আমাদের মাথার উপর দিয়া কত না প্রবল ঝড় বহিয়া গেল। এখন সকল গোলযোগই শান্ত হইয়া গিয়াছে। আমাদিগকে প্রচুর ধনরত্ন দাও, যাহাতে আমরা আমাদের নারীগণকে নানাবিধ অলঙ্কার প্রভৃতি দ্বারা পূজা করিয়া তাঁহাদের সন্তোষ বিধান করিতে পারি। তোমার রৌদ্রতেজে শত্রুগণ পরাভব স্বীকার করিয়া মস্তক অবনত করিয়াছে। সমস্ত পৃথিবী শান্তিময় হইয়াছে। আমরাও সকলে মিলিত ভাবে তোমার প্রিয় বন্ধু হিতকর কার্য্যে প্রবৃত্ত হইয়াছি। আকাশ ও বাতাস মধুময় হইয়াছে। আজ আমাদের কর্ম্মযজ্ঞে আমরা শত্রুমিত্র সকলকেই তোমার প্রসাদ বিতরণ করিতেছি।

২। তোমারই করুণাবারি দ্বারা অভিষিক্ত হইয়া আমরা শত্রুদিগের উপর জয়লাভ করিয়াছি। শত্রুগণ পরাজয় লাভ করিয়া তাহাদের শত্রুতা ভুলিয়া গিয়াছে। তাহারা প্রত্যক্ষ করিতেছে যে, আমরা তোমারই পতাকা বহন করিয়া বিজয় লাভ করিয়াছি এবং তোমারই প্রসাদে আমাদের ভাণ্ডার সকল ধনধান্যে পূর্ণ হইয়াছে।

৩। তুমি আমাদের পাপতাপ সকল তোমার করুণাবারি দ্বারা বিধৌত করিয়া আমাদিগকে সর্ব্ববিধ সদ্‌গুণে সুশোভিত কর। আমাদিগকে ধর্ম্মের মুকুট, জ্ঞানের অসি ও কর্ম্মের বর্ম্ম পরাইয়া দাও, যাহাতে আমরা শত্রুদিগের নিকট সর্ব্বদা অপরাজিত থাকিয়া শত্রুদিগকে নিত্য পরাজিত করিতে পারি। তোমার করুণা আমাদের মধ্যে নিত্য বিকশিত হইয়া উঠুক।

৪। তোমার প্রতি যাঁহারা শ্রদ্ধাবান্ তাঁহারা শুভকর্ম্মের অনুষ্ঠানের দ্বারা সর্ব্বদাই অনিন্দনীয় যশ ও কীর্ত্তি লাভ করেন। যাঁহারা তোমার জ্ঞান ও ধর্ম্মে আপনাদিগকে সমুন্নত করেন, তাঁহারা সুখে দুঃখে সম্পদে ও বিপদে সর্ব্বদাই অবিচলিত থাকেন। তোমার উপর যাঁহাদের একান্ত নির্ভর, তাঁহারা তোমার তেজ ও বীর্য্যের কণামাত্র পাইয়া মহা তেজস্বী ও বলশালী হন। তাঁহাদের আদেশে পর্ব্বত বিচলিত হয়, সাগর শুষ্ক হইয়া যায়। তুমি তোমার সুমহান রথে চন্দ্র ও সূর্য্য দুই অশ্ব সংযুক্ত করিয়া নক্ষত্রচক্র পরিদর্শনে বহির্গত হও এবং অসংখ্য গ্রহতারকা

তোমার রথের পশ্চাতে উজ্জ্বল সৈনিকের বেশে ধাবমান হয়। তুমি মন হইতেও বেগবান। তোমার করুণাধারায় সিক্ত হইয়া বসুন্ধরা শস্য-শালিনী হইতেছে।

৫। তোমার প্রেরণায় প্রচণ্ড মার্ত্তণ্ডদেবও করুণার্দ্র হইয়া মৃগধ্বজ রথে আরোহণ করিয়া উপস্থিত হইয়াছেন এবং অজস্র বারিবর্ষণ করিয়া আমাদের দেহ ও মনের উত্তাপ হরণ করিতেছেন।

৬। তোমারই আদেশে পূর্ব্বদিকের অধিবাসী মরুৎগণ তাঁহাদের রথে বেগবান ও ক্ষিপ্রগামী অশ্ব সংযোজিত করিয়া আমাদের দেশে অতিথির বেশে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহারা আমাদের বন্ধু। বন্ধুগণের স্পর্শলাভে আমাদের দেহমন শীতল হইতেছে। আমরা যাহাতে অচিরে প্রচুর শস্য লাভ করি, তাঁহারা তাহার ব্যবস্থা করিবার আশ্বাস দিতেছেন। তোমার ভয়ে বায়ু সঞ্চলিত হইতেছে। তুমি মরুৎগণকে এই বিপুল ধরণীর আসনে উপবেশন করিবার আদেশ প্রদান কর। তাঁহাদের পশ্চাতে কৃষ্ণবর্ণ মেঘসকল আসিয়া অজস্র বারি বর্ষণ করুক। আমাদের দেহমন শীতল হউক এবং আমাদের গো-অশ্ব প্রভৃতি জীবজন্তু সকল পরম সুখে বর্দ্ধিত হউক।

৭। তোমারই বলে বলীয়ান হইয়া পূর্ব্বদিক-বাসী মরুৎগণ স্বল্পকালের মধ্যেই দিগদিগন্ত ছাইয়া ফেলিলেন এবং উত্তর পূর্ব্ব দক্ষিণ পশ্চিম সকল দিকই নিজের করায়ত্ত করিলেন। তোমারই আদেশে মেঘদলের সাহায্যে তাঁহারা স্বীয় করুণা-বারি দ্বারা ধরণীর সকল তাপ বিধৌত করিয়া দিয়া হিমালয় প্রবাসে গমন করিলেন। সেখানেও তাঁহাদের করুণাবিস্তারের বিরাম নাই। সেখানে তাঁহারা যে করুণাবারি ঢালিয়া দেন, তাহাই উত্তর দক্ষিণ ও পূর্ব্বপশ্চিমবাহিনী শত সহস্র নদ-নদীর আকারে নামিয়া আসিয়া জীবজন্তু ও মানব জাতিকে ধন্য করে। মানবগণ তখন শতবিধ কর্ম্মযজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া তোমারই নাম জয়যুক্ত করে।

৮। তুমি আমাদের নেতা, তুমি আমাদের রাজা। আমাদের শত্রুগণ তোমার তেজোময় মূর্ত্তি দেখিয়া ভয়ে সর্ব্বদাই লুকাইয়া থাকিতে চাহে। তাহাদের নিকটে তুমি ভয়ানকেরও ভয়ানক। তোমার বিজয়ী বেশে আবির্ভাব দেখিয়া বিশ্বভুবন তোমার চরণে নতশিরে বারম্বার প্রণাম করিতেছে। তুমিই আমাদের অন্তরে শৌর্য্যবীর্য্য প্রদান করিয়াছ। তোমার পতাকা বহন করিয়া শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে আমরা নির্ভয়ে অবতীর্ণ হইয়াছি। আশ্চর্য্য এই যে, যাহারা আমাদের শত্রু ছিল, তাহারাও আমাদের সহিত বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হইতে চাহিতেছে এবং ভূরিভূরি তোমার যশ কীর্ত্তন করিতেছে।

৯। তুমি বিশ্বকর্ম্মা। তোমার সকল কর্ম্মই সুনিপুণ ভাবে রচিত হইয়াছে। তোমার যে হস্তে সুকোমল কুসুম নির্ম্মিত হয়, তোমার সেই হস্তেই মরণবাহী কঠোর বজ্রও নির্ম্মিত হয়। তোমারই সুনিপুণ অঙ্গুলি কি সুকৌশলে এই মহা-শূন্যে কোটী কোটী রবিচন্দ্র বসাইয়া দিয়াছে। কোটী কোটী গ্রহতারকাখচিত এই অসীম আকাশ তোমারই হস্তের কারুকার্য্য প্রকাশ করিতেছে। তোমারই আশ্চর্য্য নিয়মে মেঘসকল সমুত্থিত হইয়া দিগদিগন্ত ছাইয়া ফেলে এবং যথাসময়ে করুণা-ধারায় নামিয়া আসিয়া তাপদগ্ধ জীবজন্তুসকলকে সিক্ত করে।

১০। তোমারই জ্ঞানের কণামাত্র লাভ করিয়া আমরা কত সুপ্রশস্ত পর্ব্বত ভেদ করিয়া জনগণের যাতায়াতের সুবিধার জন্য কত সুড়ঙ্গ প্রস্তুত করিতেছি। তোমারই জ্ঞানের কণামাত্র লাভ করিয়া আমরা ধরাবক্ষ ভেদ করিয়া ধরণীর কত গভীর প্রদেশ হইতে কত শত পিপাসিতের পিপাসা দূর করিবার জন্য সুশীতল বারি উত্তোল-নের ব্যবস্থা করিতেছি। তোমারই বলের কণামাত্র লাভ করিয়া শত্রুগণের সহিত ধর্ম্মযুদ্ধে ধীরে ধীরে বিজয় লাভ করিতেছি। তুমি আমাদের প্রতি প্রহৃষ্ট হও এবং আমাদিগকে প্রচুর ধনরত্নদানে উৎসাহিত কর।

১১। গৃহকর্ত্তা যেমন গৃহের মধ্যকে লৌহ-কীল প্রোথিত করিয়া তাহাকে লৌহবন্ধনীর দ্বারা ধরণীর সহিত একসূত্রে সংযুক্ত করে এবং তাহার গৃহকে মেঘের বজ্র-রোষ হইতে রক্ষা করে, সেই-রূপ আমরাও যখন আমাদের হৃদয়ে তোমার সুন্দর

উপদেশ সকল গ্রথিত করিয়া সেগুলি আমাদের জীবনে কর্ম্মসূত্রে সম্বন্ধ করি, তখন তোমার রুদ্র-দৃষ্টি আমাদের উপর নিপতিত না হইয়া বক্রভাবে গিয়া শত্রুগণের উপর নিপতিত হয়। আমরা তোমার করুণাধারা লাভ করিয়া পরম সুখে জীবন-যাত্রা নির্ব্বাহ করি। তুমিই আমাদের রক্ষক।

১২। সংসারে তুমি যে ধর্ম্ম প্রবর্ত্তিত করিয়াছ, আমরা তাহা অতিক্রম করিব না। তুমি যথাসময়ে সুমিষ্ট বারিধারা বর্ষণ করিয়া আমাদের গৃহভাণ্ডার তোমার এই সংসারে চলিবার উপযুক্ত ধনরত্নে পরি-পূর্ণ কর। আমাদের গৃহে নিত্য সুখশান্তি বিরাজ-মান থাকুক। আমাদের সমস্ত মঙ্গল ইচ্ছা পূর্ণ কর। আমাদিগকে শূর ও বীর পুত্র প্রদান কর। ভক্তি ও শ্রদ্ধা সহকারে তোমার নাম যেন আমা-দের অন্তরে প্রতি মুহূর্ত্তে ধ্বনিত হয়।

জীবনে ধর্ম্ম।

(শ্রীউপেন্দ্রনাথ বল এম-এ)

"The heavens is my throne, and the earth is my footstool: where is the home that ye build unto me? and where is the place of my rest?

"For all those things hath mine hand made, and all those things have been, saith the lord: But to this man will I look, even to him that is poor and of a contrite spirit, and trembleth at my word".

Isaiah ch. 66, 1. 2.

"মহাকাশ আমার সিংহাসন এবং পৃথিবী আমার পাদপীঠ; তোমরা আমার জন্য যে গৃহনির্ম্মাণ করিয়াছ তাহা কোথায়? আমার বিশ্রামের স্থান কোথায়?

"কারণ এই সমস্ত আমার হাতের সৃষ্টি, যত জিনিষ দেখিতেছ—সমস্তই। কিন্তু আমি চাই দেখিতে মানুষের হৃদয়, যে মানুষ দীন এবং অনুতপ্ত এবং আমার বাণী শুনিয়া সর্ব্বদা কম্পিত।"

"It shall come, that I will gather all nations and tongues; and they shall come and see my glory." Isaiah ch. 66. 18.

"আমি সমস্ত জাতি এবং সমস্ত ভাষাকে একত্রিত করব, এবং তারা সকলে আসবে, এবং এসে আমার জয়-গান করবে।"

একোঽহমস্মীত্যাত্মানং যত্ত্বং কল্যাণ মন্যসে।
নিত্যং স্থিতস্তে হৃদ্যেষ পুণ্যাপাপেক্ষিতা মুনিঃ॥

হে ভদ্র! আমি একাকী আছি, এই যে তুমি মনে করিতেছ, ইহা মনে করিবে না। এই পুণ্যপাপদর্শী সর্ব্বজ্ঞ পুরুষ তোমার হৃদয়ে নিত্য স্থিতি করিতেছেন।

আমাদের শরীরের ক্ষুধা ও পিপাসা আছে, এবং পঞ্চ ইন্দ্রিয় তাহাদের উপভোগের সামগ্রীর অপেক্ষা রাখে। ইন্দ্রিয়গণের স্বাভাবিক বৃত্তি আছে, তাহা প্রকাশের চেষ্টা পায়। আমার দর্শনশক্তি সুন্দর সুন্দর বস্তুর অন্বেষণ করে, আমার শ্রবণ সুমধুর স্বর প্রার্থনা করে, আমার ঘ্রাণ সুগন্ধ চায়, আমার রসনা সুমিষ্ট দ্রব্যের আস্বাদন চায়, এবং আমার স্পর্শেন্দ্রিয় কোমল পেলব বস্তু লাভের জন্য লালায়িত। কিন্তু যতই ইন্দ্রিয়গণের চরিতার্থতা সম্পাদনের চেষ্টা বাড়ে ততই লালসা বাড়িয়া যায়।

"ন জাতু কামঃ কামানামুপভোগেন শাম্যতি।
হবিষা কৃষ্ণবর্ত্মেব ভূয়এবাভিবর্দ্ধতে॥

"কাম্যবস্তুর উপভোগের দ্বারা কামনার কখন নিবৃত্তি হয় না, প্রত্যুত ঘৃতপ্রাপ্ত অগ্নির ন্যায় আরও বৃদ্ধিই হইতে থাকে।"

শুধু তাহাই নহে, কামনার সাধনায় ক্রমে আমাদের সর্ব্বনাশের সূত্রপাত হয়। যাঁহারা কেবল ইন্দ্রিয়ের সেবা করেন, তাঁহাদের সুখ ক্ষণস্থায়ী; তাঁহাদের জীবন ভঙ্গুর। ভগবানের বিধানে তাই দেখিতে পাওয়া যায়, মানুষ কেবল ইন্দ্রিয়সেবা করিয়া সন্তুষ্ট থাকিতে পারে না। তাহার আরও অনেক বৃত্তি আছে, যাহা ইন্দ্রিয়কে নিয়মিত করে। যেমন শরীরের ক্ষুধা ও পিপাসা আছে, তেমনি আমাদের জ্ঞানপিপাসা আছে। আমরা শুধু দেখিয়া শুধু শুনিয়া, শুধু আস্বাদ বা স্পর্শ করিয়া সন্তুষ্ট নহি। আমরা প্রতি ঘটনার কারণ অনুসন্ধান করিতে তাহার পরম্পরা অনুধ্যান করিতে চাই। জ্ঞান আমা-দিগকে নূতন সত্যে, নূতন সৌন্দর্য্যে, নূতন শিল্পে লইয়া যায়। সেই জ্ঞান দিয়া আমরা ইন্দ্রিয়কে দমন করিতে চাই, আমরা সংসারের আনন্দ উপভোগ করিতে চাই, কিন্তু তাহাতেও যথেষ্ট হয় না।

শিশু বাল্যে বিচিত্র রঙের খেলনা লইয়া খেলা করিতে ভালবাসে, যতই তাহার বয়স বাড়িতে থাকে, সে নিজে কিছু গড়িতে চায়, সে কল-কৌশল বুঝিতে চায়। কিন্তু এই সমস্ত বাহিরের জিনিষ তাহার পক্ষে সমস্ত নয়। তাহার খেলনা যেমন চাই, ভাঙ্গবার-গড়বার যেমন সুযোগ চাই, তেমনি সে চায় পিতামাতার ভালবাসা, সে চায় ভাই-বোনের স্নেহ। শুধু খেলা ও খেলনা তার সমস্ত অভাব মোচন করিতে পারে না। শিশুর হৃদয়ের মধ্যে প্রেম, প্রেমের ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়া না পেলে তার

জীবন প্রস্ফুটিত হয়ে উঠে না। মানুষরূপ এই যে বিচিত্র বস্তু, ইহার ইন্দ্রিয়, জ্ঞান এবং প্রেম এক সঙ্গে কাজ করে। ইহার কোন একটা অগ্রাহ্য করিলে মনুষ্যত্বের উন্মেষ হয় না। জীবনের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এই ইন্দ্রিয়, জ্ঞান ও প্রেমের উপভোগের সামগ্রীর প্রকার-ভেদ হয়। জীবনের প্রারম্ভে যে সমস্ত বস্তু আমাদের পক্ষে যথেষ্ট মনে হয়, পরে তাহা মনে হয় না; তখন আরও উচ্চতর মনের বস্তু আবশ্যক।

ছয় মাসের শিশু যে খেলনা পেলে সন্তুষ্ট, পাঁচ বছরে তাতে সে সন্তুষ্ট নয়; আবার দশ বৎসরের হলে তার আর এক রকম আমোদের দরকার; সে তখন সঙ্গী চায়; যার সঙ্গে ভাবের আদান-প্রদান হতে পারে সেরূপ লোক চায়। ক্রমে যখন সে যৌবনে পদার্পণ করেছে, তার ভাব ও জ্ঞান বদলিয়ে গেছে, সে তখন চায় প্রাণময় জীবন্ত প্রেম, ভাবময় কর্ম্ম; গৌরব অর্জ্জনের জন্য তার প্রবল স্পৃহা; যাতে আপনার জ্ঞান এবং প্রেমের অপ্রতিহত প্রভাব বিস্তার করিতে পারে তাহার জন্য অদম্য চেষ্টা। এই কর্ম্মশীল প্রাণময় জীবন্ত অবস্থায় সংসারের প্রপঞ্চ তার কাছে বাস্তব হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু সংসারের অনিত্যতা অনুভব করতে তার অধিক বিলম্ব হয় না।

পৃথিবীর সৃষ্টিতত্ত্ব আলোচনা করলে দেখতে পাওয়া যায়, আমরা তার কোথাও সীমা নির্দ্দেশ করতে পারি না। একটা ধূলিকণার সৃষ্টিতত্ত্ব অনুসন্ধান করতে কত বৈজ্ঞানিকের শক্তি পরাজিত হয়েছে। এখনও পর্য্যন্ত কেউ বলতে পারেন না যে শেষ কথা কহা হয়েছে। এই সামান্য ধূলিকণার বিষয়ে যখন এইরূপ, তখন বিশাল ব্রহ্মাণ্ড সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান কত অকিঞ্চিৎকর! আমরা অকূল সৃষ্টিসাগরের মধ্যে ভেসে আছি। সম্মুখে বিপুল সৌন্দর্য্যসম্ভার নিয়ে প্রকৃতি দাঁড়িয়ে আছেন। আকাশের দিকে তাকিয়ে দেখি সীমা হারিয়ে গেছে, স্তরের পর স্তর গ্রহ-নক্ষত্র পুঞ্জীভূত হয়ে আছে। কোথায় শেষ, কোথায় সীমা! সাগরের দিকে তাকিয়ে দেখি সীমাহীন বিপুল জলরাশি, অবিরত ধারে তরঙ্গের শব্দ। নিজের অন্তরের দিকে তাকিয়ে দেখি গভীর রহস্য। নিজের ভাব নিজে বুঝিতে পারি না। এই রহস্যময় অনন্ত সৃষ্টির মধ্যে প্রেমের অপূর্ব্ব কীর্ত্তি। সেই অনন্তের দিকে প্রাণের টান। কবি প্রেমের নব আলোকে তাই দেখেন;

"সীমার মাঝে অসীম তুমি বাজাও আপন সুর।
আমার মধ্যে তোমার প্রকাশ তাই এত মধুর॥
কত বর্ণে কত গন্ধে কত গানে কত ছন্দে
অরূপ তোমার রূপের লীলায় জাগে হৃদয়-পুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥
তোমায় আমায় মিলন হলে সকলি যায় খুলে
বিশ্বসাগর ঢেউ খেলায়ে উঠে তখন দুলে।
তোমার আলোয় নাই ত ছায়া আমার মাঝে পায় সে কায়া
হয় সে আমার অশ্রুজলে সুন্দর বিধুর।
আমার মধ্যে তোমার শোভা এমন সুমধুর॥"

সীমার মাঝে অসীমের অনুভবের শক্তি, দৃশ্যের মধ্যে অদৃশ্যকে দেখবার ইচ্ছা, আমার মধ্যে অনন্তের ইচ্ছা-প্রকাশ। ইহাকে আমরা বলি আধ্যাত্মিকতা। এই আধ্যাত্মিকতা মানবের জন্মগত অধিকার। উহা ত ভগবানের বিশেষ দান। এই আধ্যাত্মিকতা কত ভাবে প্রকাশের প্রয়াস পায়। ভারতের সেই প্রাচীন যুগে মানুষ যখন প্রকৃতির মধ্যে খুব ঘনিষ্ঠভাবে সংযুক্ত ছিল তখন সে সমস্ত মনোরম দৃশ্য ও সমুদায় বিচিত্র ঘটনা গানে এবং কাব্যে প্রকাশ করেছে। বেদের মন্ত্র আবেস্তার গাথা এই যুগের আধ্যাত্মিক ভাবের অভিব্যক্তি। আকাশ সূর্য্য চন্দ্র বায়ু অগ্নি নদী মানুষকে বিস্ময়ে পরিপূর্ণ করে দিয়েছিল। তাই সে এই সমস্তের অন্তর্নিহিত শক্তির পূজা অর্চ্চনা করেছে, এদের জয়গান করেছে। আজও পূর্ব্বাকাশ অরুণরাগে রঞ্জিত হয়ে উঠলে যখন সে তার মধ্যে অরূপের রূপ-লহরীর খেলা দেখে, আপনাপনি তাহার পূজার ভাব জাগ্রত হয়ে উঠে; যখন পশ্চিম গগনে সূর্য্য অস্তোন্মুখ হয়, বর্ণে বর্ণে চারিদিক পরিপূর্ণ হয়ে উঠে, বিশ্বের মধ্যে কি এক মোহন মহিমার প্রকাশ হয়, এমন কে আছে যার হৃদয় তখন অনন্ত দেবতার চরণে গিয়ে না পৌঁছায়? যেমন এই প্রকৃতির বিচিত্র সৌন্দর্য্যে অনন্তের পরিচয় পাই তেমনি আমার জীবনের ইতিহাসে। অসহায় শিশু জননী-ক্রোড়ে জন্মগ্রহণ করে পৃথিবীতে কত না অদ্ভুত কার্য্যই করছে—কত রাজ্য ভাঙ্গছে, কত রাজ্য গড়ছে, কত শিল্প, কত চিত্র, কত গান, কত কাব্য এই মানুষের হাত দিয়ে বেরোচ্ছে। কিন্তু কে এমন শক্তিশালী ব্যক্তি আছে যে বলতে পারে এ আমার নিজের শক্তি? কালিদাস সেক্সপিয়ার নিজের ক্ষমতায় এমন কবিতার কি সৃষ্টি করতে পেরেছিলেন? তানসেনের গান কি ঐ রক্ত-মাংসের দেহ থেকে বেরিয়েছিল; না অজন্তা গুহায় এত ছবি কেবল মনুষ্যজ্ঞানের সৃষ্টি? যারা অনন্তকে যত বুঝতে পেরেছে তারা সেইভাবে তাঁকে প্রকাশের চেষ্টা করেছে। মানবজীবনের এই কি ধর্ম্ম, ভগবানের এই কি লীলা!

আমি দেখছি, আমায় দারিদ্র্য থেকে তিনি আমাকে সংসারের সুখের দিকে নিয়ে যাচ্ছেন, অসহায় অবস্থা হতে আমাকে বন্ধুবান্ধবে পরিবেষ্টিত করেছেন; যখন মৃত্যুর ঘন

অন্ধকারের মধ্যে পড়ে থাকি তখন নবজীবনের সন্ধান দিচ্ছেন, আমি কি আর বলতে পারি যে তাঁহার পরিচয় পাই নাই? জীবনের প্রতি মুহূর্ত্তে তিনি আমাদিগকে এই শিক্ষাই দিচ্ছেন যে আমার শক্তি বলে কিছুই নাই, এ কেবল তাঁর কৃপার প্রকাশ। এই যে ধর্ম্মভাব ইহাকে ধরতে পারলে আমরা প্রাণভরে বলতে পারি "আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি ভূতানি জায়ন্তে আনন্দেন জাতানি জীবন্তি আনন্দং প্রয়ন্ত্যভিসংবিশন্তি"। আনন্দ-স্বরূপ পরব্রহ্ম হইতে এই ভূতসকল উৎপন্ন হয়। উৎপন্ন হইয়া আনন্দস্বরূপ ব্রহ্ম কর্ত্তৃক জীবিত রহে, এবং প্রলয় কালে আনন্দস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি গমন করে ও তাহাতে প্রবেশ করে। আমরা তাঁর আনন্দ দেখি নিজের জীবনে। আমার পিতামাতার স্নেহ তাঁর কৃপার প্রবাহ, পতিপত্নীর প্রেমে তিনিই বিহার করছেন। সন্তানের পিতামাতার প্রতি নির্ভর ও ভালবাসা তাঁরই প্রেমের আকর্ষণ। তিনিই বন্ধু-বান্ধবে আমাকে পরিবেষ্টিত করেন। সমস্ত সংসার তাঁরই প্রেমের প্রকাশস্থল দেখলে আমার নূতন জন্ম হয়। এই লীলা যদি না দেখলাম তবে সংসারে এসে আর কি আনন্দ পেলাম? একজন অপরিচিত যুবক আর একজন যুবতীকে দেখে যে তাঁর প্রেমে আবদ্ধ হয়, তাঁর জন্য সর্ব্বত্যাগ করতে পারে, সমস্ত স্বার্থে জলাঞ্জলি দিতে পারে ইহা কি কেবল মানবীয় শক্তির বলে? ১৯১৮ সালে যখন ইউরোপের ভীষণ সমরের অবসান হয় সেই উপলক্ষ্যে লাহোরে বিজয় ঘোষণার জন্য এক বিরাট আড়ম্বরপূর্ণ সমারোহ হইয়াছিল। একটী শিশু সেই সমারোহ দেখবার জন্য রাস্তার মধ্যে গিয়ে পড়ে। সেই সময়ে হাওয়াইয়ের আগুন দেখে কতকগুলো ঘোড়া ক্ষেপিয়া উঠে, এবং রাস্তার মধ্যে প্রবলবেগে ধাবিত হয়। ঐ শিশুর পিতা তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য রাস্তার মধ্যে গিয়া পড়েন এবং তাহাতে তাঁহার প্রাণবধ হয়। এই যে শিশুকে রক্ষা করিবার জন্য পিতা অকাতরে আপন প্রাণ বিসর্জ্জন করিলেন, এই প্রেম কি পার্থিব প্রেম? অনন্ত প্রেমের এই ধারা প্রতি মানবের জীবনে প্রবাহিত। আমরা কেহ উহাকে দেখি, আর কেহ দেখি না; দেখিতে পাইলেই জীবনের সার্থকতা। কারণ যদি অনন্ত জীবনের সঙ্গে নিজের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক বুঝতে না পারি, তাহলে প্রতি মুহূর্ত্তে আমাদের বিপদ, সর্ব্বদা অনিষ্টপাতের সম্ভাবনা। "হারাই হারাই সদা মনে হয়, হারাইয়া ফেলি চকিতে।" মৃত্যু আমাকে সন্তাপের কূপে ডুবিয়ে রাখে, দৈন্য আমাকে নীচতার মধ্যে নিয়ে যায়।

তবু অবিশ্বাসের কারণ নাই। মানুষকে আমি হাতে গড়িনি; আমি যদি গড়তাম, এ যদি আমার সৃষ্টি হত তাহলে এর পূর্ণতালাভ কখনও হত না, এর জীবনের বিকাশ সম্ভব হত না। এ যে আমার হাতে গড়া নয়, এ যে বিচিত্রকর্ম্মার অদ্ভুত সৃষ্টি। এর মধ্যে জ্ঞান আছে, এর মধ্যে প্রেম আছে, আপনাকে জানবার ক্ষমতা আছে, এবং ভগবানকে জানবার ক্ষমতা আছে। একদিন না একদিন এমন হবে যেদিন ভগবান ইহার জ্ঞান-আঁখি খুলে দিবেন, যেদিন এর প্রেমের প্রবাহ নিঃসৃত করবেন। যেদিন ইহা জ্ঞানে এবং প্রেমে পরিপূর্ণ হয়ে আপনাকে ভগবানের চরণে সমর্পণ করবে। সকলকে এই পূজার ভাবে জাগিয়ে তোলবার জন্য সংসারে এত আয়োজন। ভক্ত ভগবানকে লাভ করে অপরকে বলেন—দেখ দেখ আমি কি সম্পদ লাভ করেছি—তিনি সে আনন্দ নিজের মধ্যে ধারণ করতে পারেন না, তিনি চান অপরকে তাহার অংশ দিতে। কবি যে ভাবে উদ্বুদ্ধ হয়ে উঠেছেন সেই ভাবে অপরকে জাগাবার জন্য তাঁর বাক্য যোজনা করেন, তাঁর ভাবে যাতে অপরে অভিভূত হয়ে পড়েন। শিল্পী নূতন সৌন্দর্য্য প্রাণে অনুভব করলে সেইটাকে ফুটিয়ে তুলতে চান, তাই দেখে অপরে আনন্দ লাভ করবেন বলে। স্থপতি তাঁর হৃদয়ের ভক্তি ও সৌন্দর্য্যকে স্থাপত্যের মধ্যে আকার দিতে চেষ্টা করেন, কেবল তাঁহার হৃদয়ের ভাব ফুটাবার জন্য তাহা নয়, অপরে তাঁর আনন্দের সঙ্গে যোগ দিবে বলে। আমরা চাই ভাবের আদানপ্রদান, চাই প্রেমের সঙ্গে প্রেমের মিলন। ভগবানকে ভালবাসি এবং পূজা করি, চাই আর সকলে ভাল বাসুক এবং পূজা করুক। যখন দার্জ্জিলিঙ্গে গিয়ে কাঞ্চনজঙ্ঘার বিপুল সৌন্দর্য্য দেখেছিলাম, প্রভাতের অরুণালোকে পর্ব্বতের শৃঙ্গদেশ কিরূপ উজ্জ্বল হয়েছে বাক্যে তাহা বর্ণনা করা যায় না, তখন কেবল মনে হয় কেন আমি একলা দেখছি, যাদের ভালবাসি সবাইকে ডেকে নিয়ে আসি—দেখবে, সকল নরনারীকে ডেকে নিয়ে আসি বিশ্বের এই সৌন্দর্য্য দেখাবার জন্য, বিশ্বপতি আপনাকে কি ভাবে প্রকাশ করেছেন বুঝাবার জন্য।

গৃহে শিশুর জন্ম হলে আমরা সকলে মিলে আনন্দ করি, মৃত্যুর ছায়া পতিত হলে শোকের পবিত্র অনলে সকলে প্রবেশ করি; তেমনি ভগবানের অনুভবের মধ্যে আমরা সকলে একত্র যাইতে চাই। ইহাকেই বলি আমরা উৎসব। ভারতবর্ষে যে ব্রহ্মোপাসনার নূতন ধারা প্রবাহিত হয়েছে ইহাতে মানবের এবং সমাজের কল্যাণ। সংসারে থেকে আমরা ভগবানকে লাভ করব, জীবনে তাঁর রাজ্য প্রতিষ্ঠিত করব, সমাজের উন্নতিতে তাঁর প্রেমের সাধনা করব, সকল নরনারীকে সমান ভাবে দেখে তাঁর পূজা করব, এই ভাবের উদ্বোধনে আমাদের মাঘোৎসব। এই উৎসব ব্যক্তিবিশেষের বা মণ্ডলীবিশেষের নহে। ব্রহ্ম প্রতি মানবহৃদয়ে। মানবের

বিশ্বতোমুখী ভাবকে জাগিয়ে তোলবার জন্য ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠা। যিনি শ্রদ্ধা ও ভক্তিসহকারে ভগবানের পূজা করবেন তিনিই এই উৎসবের অধিকারী। বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজ কেবল ইহার উদ্যোক্তা।

দলাদলির প্রাচীর ভেঙ্গে, মণ্ডলীর আবেষ্টন ভেঙ্গে, দেশকালের ব্যবধান ভেঙ্গে ভগবানের প্রেমের স্রোত প্রবাহিত। তিনি সকল মানুষকে ডাকছেন তাঁর দিকে। আমাদের জীবন তাঁর পূজার জন্য প্রস্তুত করি। এতবড় দান তিনি করেছেন আর আমরা এর অপব্যবহার করছি। তিনি সৌন্দর্য্য দেখবার শক্তি দিয়েছেন আমরা কেন তবে কুৎসিত-কুরূপের পশ্চাতে ধাবমান হই? তিনি মঙ্গলের দিকে আকর্ষণ করছেন আমরা কেন তবে অমঙ্গলের দিকে দৌড়ছি? আমাদের জন্য তিনি কত আয়োজন করেছেন আর আমরা তাহা অবহেলা করে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দিই। সার সত্য তিনি—তাঁকে ভুলি কি করে? সমস্ত জীবন ব্যাপ্ত হয়ে তিনি, তিনি জীবনের পূর্ব্বে, জীবনের পরে—তাঁকে অতিক্রম করি কেমন করে?

শক্তি লাভ করলে শক্তি সাধনা করতে হয়। সত্য অন্বেষণের জন্য যেমন জ্ঞান সর্ব্বদা আবশ্যক, তেমনি ধর্ম্মলাভের জন্য আধ্যাত্মিক সাধনের আবশ্যক। তিনি কৃপা করিয়া আমাদিগকে সীমা ছাড়িয়ে যাওয়ার ক্ষমতা দিয়াছেন, সেই ক্ষমতার সদ্ব্যবহার করলে তবে আমরা ধর্ম্মে অগ্রসর হতে পরব। সকল জননীই সন্তানকে ভাল বাসেন, কিন্তু দেখিতে পাওয়া যাইতেছে যাঁহারা সন্তানপালনের নিয়ম আয়ত্ত করিয়াছেন তাঁহাদের সন্তান কেমন সুস্থ ও সবল হয়। শিক্ষিত সমাজে শিশু-মৃত্যুর হার ক্রমে কমিয়া যাইতেছে, শিশুর স্বাস্থ্যবিষয়ে জ্ঞানবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সমাজের স্বাস্থ্যের উন্নতি হইতেছে। যে সমাজে অনেক বিজ্ঞান ও দর্শনের চর্চ্চা বিশেষভাবে হয় সে সমাজের আবহাওয়াতে অনেকের জ্ঞানপিপাসা বাড়িয়া যায়। ধর্ম্ম সম্বন্ধেও ঠিক তাহাই। যে সমাজে ধর্ম্মের চর্চ্চা আছে, সেখানে লোকে অনন্তকে পাওয়ার জন্য ব্যাকুল, সেখানে আধ্যাত্মিকতা নিশ্চয়ই ফুটিয়া উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজ সেইরূপ আধ্যাত্মিকতা লাভের স্থান। আজ ভগবানের কাছে প্রার্থনা করি তিনি ব্রাহ্মসমাজকে জীবন্ত জাগ্রতভাবে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলুন। এখানে জ্ঞানের পিপাসা বাড়ুক, প্রেমের প্রভাব বাড়ুক, এবং ভগবদ্ভাবে সকলে সঞ্জীবিত হইয়া উঠুক।

জীবের জন্মতত্ত্ব।

(রায়বাহাদুর শ্রীসুরেশচন্দ্র সিংহ এম-এ বি-এল বিদ্যার্ণব)

(৩)

পূর্ব্ব প্রবন্ধে বলা হইয়াছে যে ভ্রূণ পরিণামে মানবদেহাকার ধারণ করিবে। তাহা অসংখ্য কোষের সমবায়ে গঠিত হইলেও মূলতঃ ঐ সকল মাত্র একটি সম্মিলিত যুগ্ম কোষ হইতে উৎপন্ন হয়। এই সকল কোষ বিভিন্ন দলে সংবদ্ধ থাকিয়া বিভিন্ন কার্য্যে নিযুক্ত হয়; ইহাদের কোনটীরই এমন কোন ক্ষমতা কিম্বা কার্য্যকারিতা নাই যদ্দ্বারা সমগ্র ভ্রূণটি পরিপুষ্টি লাভ করিতে পারে অথবা যদ্দ্বারা বংশের পারম্পর্য্য ও বিশিষ্টতা রক্ষা পাইতে পারে। কেবলমাত্র অল্পসংখ্যক জীবাণুকোষ দ্বারাই এই কার্য্য নির্ব্বাহিত হয়। জীবাণুকোষগুলি ভ্রূণের দেহপেশীর ভিতর রক্ষিত হয় এবং শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর যথোচিত পরিপক্কতা লাভ না হওয়া পর্য্যন্ত কয়েক বৎসর তাহার দেহপেশীতে অবস্থান করে। মানবের জীবনধারণের সঙ্গে ইহাদের আর কোন বিশেষ সম্পর্ক নাই। পুরুষদেহে ও স্ত্রীদেহে স্থিতি নিবন্ধন ইহারা যথাক্রমে জীবাণুকোষ ও ডিম্বকোষ এই আখ্যায় বিশেষিত হইলেও কোনটীরই স্ত্রীপুরুষ পরিচায়ক কোন চিহ্ন নাই; এবং প্রকৃতপক্ষে ইহাদিগের কোন জাতি নির্দ্দেশ নাই। যে সকল সোমাটিক (দৈহিক) কোষ দ্বারা বিচিত্র কৌশলে ইহারা ভ্রূণমধ্যে রক্ষিত হয়, ঐ সকল কোষের পরস্পর সম্বন্ধ ও সমবায় হইতে ভ্রূণস্থ শিশুর স্ত্রীপুরুষ বিচার নির্দ্দিষ্ট হয়; সুতরাং দেখা যাইতেছে দেহী স্বয়ং স্ত্রীপুরুষ বিচারবিহীন; সোমাটিক কোষ নির্ম্মিত যে দেহপিণ্ডকে আশ্রয় করিয়া তিনি আত্মপ্রকাশ করেন মাত্র তাহাই জাতিজ্ঞাপক।

স্ত্রীদেহে জরায়ুর অভ্যন্তরে ফলন্ত ডিম্বকোষ হইতে প্রথমে জীবাণুকোষ সকল উৎপন্ন হয়, তদনন্তর অন্যান্য কোষ দ্বারা ভ্রূণটি গঠিত হয়। জীবাণুকোষগুলি পিতামাতার ভাবী সন্তানের বীজ। উর্ব্বরতাপ্রাপ্ত ডিম্বকোষ পুনঃ পুনঃ বিভক্ত হইয়া অসংখ্য কোষের সৃষ্টি করে এবং ইহারা নানা দিকে কার্য্যে ব্যাপৃত থাকিয়া দেহপিণ্ড রচনা করে। যে মাতৃগর্ভে ইহাদিগের সৃষ্টি হইতেছে, তাহা যদি সুস্থ হয় এবং তাহা হইতে যদি উহারা উপযুক্তরূপ খাদ্য পায়, তবে এই কোষগুলি ভ্রূণকে সুস্থ ও সবল করিয়া গঠন করিতে সমর্থ হয়। জীবাণুকোষগুলি এক প্রকার নিঃসঙ্গ অবস্থায় এই অঙ্গপ্রত্যঙ্গ গঠনকারী সোমাটিক কোষগুলির আবেষ্টনের মধ্যে অবস্থিতি করে। সাক্ষাৎ ভাবে পূর্ব্ববর্ত্তী জীবাণুকোষ হইতে ইহাদের উদ্ভব হইয়াছে, এবং এই আশ্চর্য্য বিধান হইতে প্রত্যেক

পরিবারের একটা ব্যক্তিগত বিশিষ্টতা রক্ষিত হইয়া আসিতেছে।

যে ভ্রূণটী পরিণামে একটী বিশেষ শিশুর আকার ধারণ করিয়া প্রকাশিত হইবে, উহার সৃষ্টি মাতৃগর্ভে উর্ব্বরতা প্রাপ্ত ডিম্বকোষ হইতে উৎপন্ন মাত্র একটী জীবাণুকোষ হইতে। সুতরাং বলা যাইতে পারে মানবের বংশানুক্রমিক ধারা পিতা হইতে সন্তানে অনুক্রমিত হয় না, এবং বিশেষ বিশেষ বংশের যে বিশেষ বিশেষ লক্ষণ, পিতামাতাই সাক্ষাৎভাবে তাহার মূল কারণ এরূপ বলিবার হেতু নাই। প্রকৃত প্রস্তাবে এই বিস্ময়কর কার্য্য জীবাণুকোষ হইতে জীবাণুকোষে সম্পন্ন হইয়া আসিতেছে। আর এক ভাবে বিষয়টা ব্যক্ত করা যাইতে পারে। পিতা প্রকৃতপক্ষে পুত্রের জন্মদাতা নহেন; পুত্রের দেহ মাত্র একটী জীবাণুকোষের অবলম্বনক্ষেত্র। এই জীবাণুকোষটির উদ্ভব অপর একটী জীবাণুকোষ হইতে। আসল সন্তান এই জীবাণুকোষটী। ব্যক্তিগত স্বাতন্ত্র্য প্রভৃতি যাহা কিছু তাহার মূলবীজ ইহার মধ্যে নিহিত। সৃষ্টিরহস্যের ইহা এক মূলতত্ত্ব। দেহটি এই জীবাণুকোষের আশ্রয়স্বরূপ একটী সুদৃঢ় দুর্গবিশেষ মাত্র। মানুষের সাধ্য নাই যে একটী জীবাণুকোষ সৃষ্টি করে, ভ্রূণেরও সাধ্য নাই একটী জীবাণুকোষ সৃষ্টি করে। ভ্রূণসৃষ্টির পূর্ব্বে এই কোষ বর্ত্তমান ছিল, পক্ষান্তরে ইহা হইতে ভ্রূণের উদ্ভব হইয়াছে।

এই জীবাণুকোষ কিরূপে প্রথম সৃষ্টি হইয়াছে বৈজ্ঞানিকের নিকট এই রহস্যময় প্রহেলিকা অদ্যাপি অপরিজ্ঞাত রহিয়াছে। তিনি এই মাত্র স্থির করিতে সমর্থ হইয়াছেন যে, মানববুদ্ধির অনধিগম্য কোন উপায়ে প্রথম সমুদ্ভূত এই জীবাণুকোষ দেহ হইতে দেহান্তরে অনুপ্রবিষ্ট হইয়া বংশ ও জাতির ধারা রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

গভীরভাবে চিন্তা করিয়া দেখিলে বুঝা যাইবে যে সৃষ্টির এই রহস্যময় ব্যাপারের ভিতর দিয়া একটী তত্ত্ব ফুটিয়া উঠিতেছে, তাহা এই যে ব্যক্তিবিশেষের জীবনরক্ষা অপেক্ষা বংশ বা জাতির উন্নতিবিধান করাই প্রকৃতির প্রধান লক্ষ্য। মাতৃগর্ভে সংরক্ষিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়া যে ভ্রূণ মানবশিশুরূপে ভূমিষ্ট হইবে, তাহার একমাত্র কর্ম্ম হইতেছে জীবাণুকোষগুলিকে যত্নপূর্ব্বক রক্ষা করা, যেন যথাকালে তাহা হইতে অপর জীবাণুকোষ সকলের উদ্ভব হইতে পারে এবং তদ্দ্বারা বংশ ও জাতির ধারা রক্ষা পাইতে পারে। এই জন্যই বিশেষ বিশেষ জাতির মধ্যে উৎপন্ন ভ্রূণ সকল সেই সেই জাতির বিশেষ বিশেষ লক্ষণ সকল প্রাপ্ত হইয়া থাকে। এই বিধির লঙ্ঘন হয় না, কারণ একই জীবাণুকোষ (germ plasm) হইতে তাহারা উৎপন্ন হইতেছে। পিতামাতা সাক্ষাৎ সম্বন্ধে ভ্রূণস্থ শিশুকে তেমন কিছু প্রদান করেন না, তাঁহারা আপনাপন পিতামাতা হইতে যে জীবাণুকোষ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন, নিজের সন্তানদিগকে রূপান্তরিতভাবে মাত্র তাহাই দান করিয়া থাকেন।

এই সম্বন্ধে Doctor Leighton লিখিয়াছেন,—"Man is composed partly of characteristics which are derived from pre-existing germcells and over the possession of which he has no control whatsoever. Be they good, bad or indifferent, these characteristics are his from his ancestry in virtue of his inheritance the; possession of these characterestics is to him a mater of neither blame, nor praise, but of necessity. They are inevitable.

মানব একটী মিশ্র জীব। তাহার জন্মের পূর্ব্ব হইতে বর্ত্তমান যে সকল জীবাণুকোষ হইতে তাহার উৎপত্তি সেই সকল জীবাণুকোষ বহুল পরিমাণে তাহার চরিত্রের নিয়ামক হইয়া থাকে, এবং সেই সকলের উপর তাহার কোনরূপ কিছু পরিবর্ত্তন করিবার অধিকার থাকে না। এই সকল গুণ ভালই হউক আর মন্দই হউক, উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে ইহারা তাহার পূর্ব্ব পুরুষ হইতে অনুক্রামিত হইয়াছে। এই সকলের জন্য সে নিজে কোনরূপ নিন্দা বা প্রশংসাভাজন নহে। ইহারা তাহার পক্ষে অবশ্যম্ভাবী গুণ বা দোষ বলিয়া গণ্য।

এখন প্রশ্ন উঠিতে পারে উত্তরাধিকারিত্ব সূত্রে সমাগত এই বিশেষত্বগুলির প্রভাব যদি এতই প্রবল হয় তবে কি দৈহিক গঠন কি মানসিক বৃত্তি এক বংশ বা জাতির মধ্যে প্রত্যেকেরই তো একরূপ হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু তাহা হয় নাই কেন?

নানা কারণে ইহার ব্যতিক্রম ঘটে। যে জৈবিক প্রাণপঙ্ক (protoplasm) মধ্যে ভাবী সন্তানের আকার ও প্রকৃতিগত সাদৃশ্যের বীজ নিহিত রহিয়াছে, তাহাকে যত্ন পূর্ব্বক পরিপোষণ ও রক্ষা করা ভ্রূণের কার্য্য। ইহা তিনটী বাহিরের ব্যাপারের উপর বিশেষভাবে নির্ভর করে।

(১) জননীর পক্ষে জঠরস্থ ভ্রূণে পুষ্টিকারক খাদ্য সরবরাহ করিবার ক্ষমতা।

(২) জননী-দেহের স্বাস্থ্যরক্ষা ও পরিচালনা।

(৩) কোনরূপ আকস্মিক ঘটনা হইতে ভ্রূণের আঘাত প্রাপ্ত হওয়া।

জননীর যথোচিত রূপে পুষ্টিকর খাদ্য গ্রহণ এবং তাহা দ্বারা নিজের দেহকে সুস্থ ও সবল রাখার উপর ভ্রূণের দেহকে সবল ও সতেজ করিয়া নির্ম্মাণ করিবার

শক্তি নির্ভর করে। শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পরও তাহার দেহের সর্ব্বাঙ্গীন বিকাশের জন্য শরীরের পরিচালনা, বিশুদ্ধ বায়ু সেবন ও স্বাস্থ্যকর স্থানে বাস করা আবশ্যক হয়। এই সকলের অভাব হইলে কেবল পুষ্টিকর আহার দ্বারা কিন্তু সে উদ্দেশ্য সফল হয় না।

জননীজঠরে অবস্থানকালে শিশু যদি কোনরূপ আঘাত প্রাপ্ত হয়, অর্থাৎ যদি কোনও কারণে তাহার অঙ্গপ্রত্যঙ্গ সকলের স্বাভাবিকরূপে বৃদ্ধি পাইবার ব্যাঘাত ঘটে তবে ভূণস্থ শিশুর আকার ও প্রকৃতিগত রূপান্তর হওয়া অসম্ভব নহে।

এক পরিবারস্থ সন্তানদিগের মধ্যে যে এত সব বিভিন্নরূপ ও প্রকৃতিগত অসমদৃশতা দৃষ্টিগোচর হয়, অধিকাংশ স্থলে এই তিনটী কারণ হইতে তাহা উৎপন্ন হইয়া থাকে। প্রারম্ভে একই প্রকৃতির বীজ সকলের মধ্যে নিগূঢ়ভাবে অবস্থিত থাকিলেও যে সকল পারিপার্শ্বিক অবস্থা ও উত্তেজনার ভিতর (Environmental stimulus) ভবিষ্যতে ইহাদিগের জীবন বৰ্দ্ধিত হয়, সেই সকলের তারতম্যতা হেতু স্বভাব, প্রকৃতি ও আকারগত এত পার্থক্য লক্ষিত হইয়া থাকে। সুতরাং দেখা যাইতেছে যে, কতকগুলি জৈব পদার্থ (germ plasm) ইহার মূলে নিহিত; ইহারা মজ্জাগত এবং সর্ব্বতোভাবে আমাদের ইচ্ছা বা শক্তির অতীত। কিন্তু, আরও কতকগুলি এমন আছে যাহারা অনুকূল বা প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থা দ্বারা নিয়মিত হয়। চেষ্টা দ্বারা ইহাদিগকে নিজেদের ইচ্ছানুরূপ গঠিত করিয়া তুলিতে পারা যায়।

এই দুই কারণ হইতে পৃথক আর একটী ব্যাপার রহিয়াছে, যাহা অতীব বিস্ময়কর এবং যাহার বিষয়ে আজপর্য্যন্ত কোন সন্তোষজনক উত্তর পাওয়া যায় নাই; যেমন কখনো কখনো হঠাৎ কোন এক অচিন্তনীয় প্রকারে ব্যক্তিবিশেষের মধ্যে বিশেষ শক্তির বিকাশ দেখা যায়, কেহ বা শ্রুতিধর হন, কেহ অসাধারণ স্মরণশক্তি-বিশিষ্ট, কাহারও বা শাস্ত্রবিশেষে চেষ্টা বা গবেষণা ব্যতীত অসাধারণ কৃতিত্ব দেখা যায়, ইংরাজীতে যাহাকে genius বলে। প্রতিভার বিকাশ ইহার দৃষ্টান্তস্থল।

কেহ কেহ মনে করেন বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের সঙ্গে সঙ্গে মানবের জ্ঞানের পরিধি যত বৃদ্ধি পাইতে থাকিবে মানবজাতির সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিও তাহার সঙ্গে সঙ্গে সফলতার দিকে অগ্রসর হইবে এবং আশা করা যাইতেছে যে এমন সময় আসিবে যখন শারীরিক, মানসিক ও নৈতিক জীবন পরস্পরের সামঞ্জস্য রক্ষা পূর্ব্বক মানবকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর করিয়া তুলিবে। তখন তাহার জীবনে সর্ব্বতোমুখী প্রতিভার বিকাশ পাইবে, "genius" বা প্রতিভা এই বাক্যের তখন আর কোন বিশেষ অর্থ বা মূল্য থাকিবে না। আবার কাহারো কাহারো মতে মানুষ তাহার উন্নতির চরমসীমায় উপস্থিত হইয়াছে। (Fore ordained Evolutionery limit) তাহার দেহযন্ত্রটির উপর আর অধিক জটিলতা চলিবে না। ইতিমধ্যেই স্নায়বিক স্থিতিভঙ্গুরতার (nervons instability) লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে। এই সময় হইতে সাবধানতা অবলম্বন না করিলে এই স্নায়বিক বিকার সভ্যতার অভিমানী জাতিদিগকে অনুর্ব্বরতা এবং পরিশেষে ধ্বংস বা বিনাশের পথে লইয়া চলিবে।

রাত্রিকালে।

(৺হিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আকাশ মার্গে করি নিরীক্ষণ
একাকী ছাদে তারা সারাক্ষণ—
নাহি কলকলা।
সুন্দর শৃঙ্খলা
আছে বিরাজমান চারিদিকে—
সব ঠিক— ভুল নাহিক ঠিকে।
শূন্যে শশিকলা
ঢালিতেছে সুধা—
শীতল স্নিগ্ধ জোছনা তাহার—
সুন্দর শান্ত স্বপন আকার
শোভিছে বসুধা।
ছাদে বসি' একা
সম্মুখে দেখি সুদূর প্রান্তর
চলিয়া গেছে; বন বনান্তর
হয়ে গেছে রেখা।
চাঁদের আলোয়
চৌদিকে হেরি অস্পষ্ট সুন্দর
মাঠ বিল নদী অদ্রি কন্দর
আলোয়-কালোয়।
দেখিতে দেখিতে
নীরবে নিদ্রা দেখা দিল আসি'
আমারে যেন কত ভাল বাসি'
নীরব নিশীথে।
আকাশের তলে
চাঁদিমা রাতে পড়িনু ঘুমায়ে
জোছনা স্নিগ্ধ শ্রান্ত-ক্লান্ত-কায়ে
কাহার কৌশলে—
কার বিধিবলে!

THE

MESSAGE OF PEACE

(SJ. KSHITINDRA NATH TAGORE)

I shall relate to you a story—a story of Ancient India. It is the story of a war between a powerful king and a poor sage; between a high potentate fattening on the spoils of the soil and a *rishi* living on the produce of the jungle; between a spoliator sucking the life-blood of his subjects and a teacher giving his all for the good of his neighbours; between, in fact, a peace-breaker or war-spirit and a peacemaker or messenger of God.

Those who have dabbled even in the A B C of the religious books of ancient India, must have heard about the story of the war between king Viswamitra and the sage Vasistha. King Viswamitra, proud of his large powerful and well-trained army and intoxicated with his enormous wealth was not satisfied even with all he had. Tradition says, his vanity rose to such a pitch that he, in rivalry with the All-high Providence, wanted to create man; but in his endeavour to do so, the clay in his hand got transformed into a cocoanut! Evidently he was far advanced in the knowledge of materia sciences and useful arts like agriculture etc. His greed knew no bounds. He would not brook anybody in the world call anything his own. His one aim was to compass everything he wanted, and that at a moment's notice, and to make possible even what was physically impossible. Needless to say, it was beyond his power, and he in consequence felt humiliated and wretched—and an anguish of defeat was constantly present in his mind.

On the other hand, the sage Vasistha installed in his own glory went on doing his own household duties. He went far and near doing good to his neighbours. Pride and vanity could not find a place in his heart. Justice and kindness were personified in him. Whatever good things came to him he accepted gratefully as the gift of God. Whatever little good acts he did could not have been done by his own power, so he thought, but was done only by the grace of God. As a reward of his unshaken faith in God he had a "*kamadhenu*" given to him, a cow that brought peace to his home, as she supplied all the wants and fulfilled all the wishes of her master. There was necessarily no occasion for Vasistha to cast an avaricious eye on his neighbours' goods.

Unfortunately, the story of the cow supplying all the wants of the sage Vasistha reached the ears of king Viswamitra. The latter thought that such a wonderful cow as the *kamadhenu* was reported to be should be the property of an all-powerful king such as he was, and that a poor *Rishi* like Vasistha, living on his own labours and on the produce of the jungle, should have no right to her. Now that he had set his heart upon the cow, he would not care to stop at any means, however low, if he could only get the cow. The unwritten inviolable laws of hospitality were a "mere scrap of paper" to him, if he could get the cow by breaking them. Deceit and treachery were two useful instrumets in his hands in his fight over the cow. To him, the end would justify the means.

At first Viswamitra came to Vasistha as his guest and tried to win him over by subtle diplomacy and make him agree to part with his cow. When that failed, he tried deceit and treachery, the two useful handmaids of the wicked. When they also failed, king Viswamitra wanted to snatch

away the cow by force, and in that view declared war against Vasistha.

Viswamitra was a king. His legions were carefully trained in warfare and had the baptism of fire on many a battlefield; whereas, the sage Vasistha, having absolute faith in the ultimate triumph of righteousness and justice, kept no army of his own to defend his hearth and home. His few friends and attendants had no proper training and experience, and knew not how to give any battle, or to bring it to a successful issue. Vasistha, however, in order to uphold the dignity of righteousness and justice, had to take up the gauntlet thrown by his adversary and had to suffer many a defeat at the first stage of the war. At long last, Vasistha, had no other alternative but to approach the cow herself, so the tradition goes, and having explained the situation, practically asked her to save herself. In other words, he gave self-government to his own people. It was the influence of the cow or the self-governing and free people of his own land that brought together one by one practically all the nations of the then world and induced them to take up arms and fight on behalf of the righteous cause upheld by The sage Vasistha. After strenuous fight over a long period, king Viswamitra had to admit defeat in the :end. Thus the end proved to be just the reverse of what he had expected.

His conceit and pride were laid low. The proud and haughty king Viswamitra of the former days was no more, but out of his former self arose the re-born Viswamitra of the later days with the crown of humility on his head. It was this Viswamitra with his head bowed down before the might of righteousness and justice, who *saw* and gave out to the world the divine message of peace—"Accursed be the war spirit, the power militant; and victory be unto the spirit divine—the spirit of righteousness, the handmaid of God'." This message alone, and no other, if rightly and truly accepted by the nations of the world, is sure to bring about the world-peace so eagerly sought for in the present days to wipe out poverty and misery, affliction and sorrow from the face of the earth.

Ages after, we see in the late European conflagration, a counterpart of this Vasistha-Viswamitra war. The British nation had their throne firmly established on the two solid pedestals of truth and justice, and Providence allowed "Britannia to rule the waves," which proved to be a veritable "kamadhenu" to them. On the other hand. the Germans, like king Viswamitra, elated with the huge strides of progress made by them in literature and material sciences, were not satisfied with the unique hold they had on the commerce of the whole world, but had been casting ever and anon covetous glances on their neighbours' properties. Their idea was that the whole world outside their own country must stand subservient to their will and all other nations must be made to work as slaves for their benefit. Over half a century ago, Germany had by sheer luck obtained a sudden but complete victory over France. Since then, she rose step by step to the highest summit of pride and conceit. Just before the last great war, her pride and conceit reached its climax when she was fired with the ambition in her heart of depriving the British nation of their cow, their supremacy over the seas, by diplomacy if possible, or else, by force. Diplomacy failed and war was declared. The Germans did not stop at anything however mean and low, to win the fight,

The British nation, however, stood firm on the side of what was right and just and declared their policy to be the granting of self-governnent to the nations that wanted it. This practically induced almost all the nations of the time treading on the path of righteousness to side with the British to fight out the cause of justice and righteousness. After the Franco-Prussian war, Germany, with the ulterior motive of snatching away the cow of supremacy over the seas from the keeping of the British nation, had taken to developing material sciences for the last fifty years and over. Notwithstanding the fact that material sciences made a gift to Germany of whatever they could, Providence gave her a severe defeat and victory to those that had righteousness and justice on their side.

Those who have carefully followed the course of the war, step by step, could not have failed to perceive how, irrespective of victory or defeat, there burst forth from out of the maddening world-wide crash and the deafening din of the material sciences, rending the firmament into two, a cry of lamentation carrying the message of world-peace which had been ushered forth by the humbled Viswamitra of the olden days—"Accursed be the war-spirit, the spirit of militarism ; and victory be unto the spirit divine, the spirit of righteousness, the handmaid of God."

Who dare deny that it is the calm majesty and the sure power of the soul that will in the end conquer the whole world ? However advanced in the region of science man may be, nothing can put out the celestial light kindled in the heart of man by God himself. The material sciences may appear to be all-powerful in their temporary glamour and the imperishable celestial light insignificant for the time being. But the history of man bears witness to the fact, that at times when virtue is on the wane and vices reign rampant, the celestial light bursts forth in all its effulgence and glory throwing the glamour of the sciences into insignificance. The unnoticed seed of the soul-power sown in the heart of man by Providence then all on a sudden grows into a huge shady tree giving shelter to all that come weary under it.

Earthquakes and similar other catastrophes of nature have wiped out from the face of the earth, no one can say for certain how many, big continents like the Atlantis of old. But no catastrophic convulsions, great or small, could wipe out from the soul of man spiritual truths, whose first flutterings were felt by him, no one knows when. The spiritual truths seemed at times to be thrown beyond any hope of recovery, behind the thick screen of clouds of dust raised by material sciences. But they were not dead. Whenever there was felt a necessity for their re-appearance and humanity went out in quest of them with an eager heart, they tore asunder the screen of dust and there they stood with their heads erect and were as ever resplendent with glory. In the present age, just before the great war, the spiritual truths seemed to be receding before the vigorous onslaught of the material sciences. The former had only lip-service from the Westerners, but received no real response from their heart obsessed by the infatuation of wealth and riches ; whereas the latter received the real homage of their heart. It is this that brought about the whirlwind of the great European war engulfing the whole world in disaster and sweeping away the materialistic spirit of the age. Strange as it may seem, it is through the havoc caused by this war,

through what the warriors killed and wounded did and said, that great spiritual truths such as the indestructible and imperishable nature of the soul, its communion with the World-soul, the certain victory in the end of right over might and justice over injustice, became self-manifest and held their sway over the Western world more firmly than before. It is through this war again, that the cry of lamentation burst forth with its message of peace—"Accursed be the war-spirit, the spirit militant; and victory be unto the spirit divine—the spirit of justice and righteousness, the two handmaids of God." The triumph of spirituality over materialism became obvious more particularly when at least one nation participating in the war before entering into the arena of war declared unequivocally that it had done so not to enrich its own coffers by plundering others, nor to bring ruinous destruction to any other nation, but to make triumphant the cause of truth, justice and righteousness. In an era of ultra self-love, when materialism has the greatest influence and the main control over humanity, it really gladdens one's heart to see these noble sentiments expressed in such clear and unmistakable language. Our heads bow down naturally before the throne of the All-high Providence in deep reverence, and our hearts go forth to carry the divine message of peace to every hearth and home—"Accursed be the war-spirit, the spirit militant and victory be unto the spirit divine, the spirit of truth, justice and righteousness, the handmaids of God."

When we hear the four corners of the earth ringing with the echo of the great message of peace; when we see that it was President Wilson of the United States of America who boldly held up the highest ideals of justice and individual rights before he joined issues with the Allies; and when we see all those principles accepted by all the civilised nations of the world, we cannot help realising in all this the working of the purifying influence of India's teachings as given to the world by men of the stamp of Prof. Maxmuller, Brahmananda Keshab Chandra Sen, Rev. Bhai Protap Chandra Majumdar and Swami Vivekananda through their works and through institutions like the Parliament of Religions. It is the seed of "God-enquiry" with its inevitable concomitant message of peace, sown by them on practically the spiritually virgin soil of the West, that grew and grew, till it grew into an all-embracing tree of love and fellowship and found its outward expression in the formation of the League of Nations. It is the message of Oneness, oneness of God and oneness of humanity, it is the message of the spiritual unity of mankind, so ably expounded in the Sacred Books of Ancient India that have now taken deep root in the heart of humanity and are being proclaimed by all the nations of the world.

India has always, in the comity of nations, taken her seat as truth-bearer to the world. It seems that the East, and more particularly India, has been ordained by Providence to take her seat as World-teacher and to illumine the whole world with her torch of spiritual light. India, once she has accepted this her position, cannot now back out and shirk her responsibilities and obligations in this matter. If we are true sons of the soil, we should not lose a moment longer in idleness and indolence, but every one of us, man or woman, old or young, should try to preserve untarnished in thought, words, and deeds, the glory of India, our motherland. We should make the world accept the fitness of India to stand as World-teacher by our "continued endeavour

World-teacher, we, her sons and daughters, should, in every breath of our life, make our worship of God—the one without a second—a real living thing by loving Him with all our heart and doing works dear to Him. Let us not forget that we should be held responsible by posterity for bringing evil and death to our country in so far as we fail to do our duties at this juncture of time, when the old traditions and new ideas meet.

If we want to uphold our country in the role of world-teacher, it is not the spirit of the vain Brahmin of the present day, but the spirit of the real Brahmin of Ancient India that we should see revived in us. It is the spirit which made the attainment of the status of a Brahmin the proudest privilege to be sought after, that should be wakend up once again. It is the spirit, which has its foundation in the divine light of true spirituality and which could spurn aside wealth and riches without the least ado that should be cultivated by every one of us. It is this spirit that makes us realise the ever-present Providence in every iota of this universe, in every thought and in every deed of ours, great or small, and necessarily debars us from treating anyone, however low, with contempt and hatred. This spirit, if cherished by us not in words alone but in deeds, will certainly help every one of us in our march onward on the road to divinity and to bring about all-round progress in the whole world. This spirit found expression in the Indian sage, even of the historic period, whose absolute unconcern for the wealth and riches of this world brought even Alexander the Great, King of Greece down to his feet. In Russia also, this spirit found expression in the life of Count Tolstoy whose life motto was to conquer evil by good.

O ye sons and daughters of Ind; to enable mother India faithfully to discharge her duties and obligations as World-teacher, unite and render her your united help. In these days of world-wide communications, it is not possible for anyone unaided and singlehanded to render the help required. Be self-dependent and self-reliant. Have faith in yourselves. Arise and awake from the age-long slumber of indolence and lethargic inactivity, and, in the name of God, arouse and wake up the world to the sound of your buglecall, kindle the flame of spirituality within you to a burning fire and with its help purify yourself and all roundabout you. Refrain from doing injustice to anyone. Do good by all means to yourself and to all others. March onward on the road to allround good and freedom. Trample down selfishness under your feet. Look round with your eyes open, and see with what rapid strides the world is moving towards progress in many directions; but there are others still left untravelled. Do not leave any section of the society in the dark cell of ignorance. Do not do any injustice to yourself, neither allow it to be done to others. Encourage the spirit of co-operation in your own country as well as abroad. Away with wanton pleasures, and remain satisfied with the coarse rice and the coarse cloth of your own country. Nurture in your heart the spirit of the true Brahmin of Ancient India. Consider praise and abuse as of equal value. Learn how to spurn luxury and unnecessary earthly comforts with ease.

Remember, you are Indians and descendants of the Rishis of yore. Be worthy of them by acting up to their advice as laid down in the *mantra* "Sam gatchwadhwham, sam vadadwam sam bo manansi janatam"—United ye go, united ye speak and know ye each other's mind. Proclaim with all your heart the message of peace ushered forth by Rishi Viswamitra—Dhik valam Kshatra-valam Brahmatejo valam Valam—"Accursed be the war-spirit, the spirit miltant and victory be unto the spirit divine, the spirit of justice and righteousness, the handmaids of God"—and let world-peace be established on earth.

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

খাম্বাজ—তেতালা।

সব সঙ্গীত মঙ্গল বাণী
সকল বিদ্যার সৃজন কারিণী
অমর অসুর নর মুনি গুণী   কিন্নর যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব সবে মিলি'
নিতি গাহিছে গুণ তব বাখানি'॥
ত্রিভুবন আদেশ তব বিনা অচল;
তব দয়াতে নর হয় জ্ঞানী।
তব গুণ অনন্ত—অন্ত নাহি পাই।
জগতে নাহি উপমা তোমার—নাহি।
সব মঙ্গল সুখ দায়িনী॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।   স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

০ ১ ২´ ॥ ৩ ৩
{র্সা ণা | ধাঃ পঃ মা গা | মা -া পা পা I না -া র্সা -া | ণধা পধা} র্সণা ধপা ধা -া |
স ব স ০ ঙ্গী ত ম ০ ঙ্গ ল বা ০ ণী ০ ০০ ০০ ০০ ০০ ০ ০

০ ১ ২´ ৩
| না না না র্সা | -া না র্সা -া I না র্রা র্সা ণা | ধা পা র্সা ণা |
স ক ল বি ০ দ্যা র ০ সৃ জ ন কা রি ণী "স ব"

৩ ০ ১ ২´ ৩
{ মা মা ধা ধা | ণা ণধা পা ধা | না না র্সা না I র্সা -া র্সা র্সা |} র্সা র্রা র্সা র্রা |
অ ম র অ সু র০ ন র মু নি গু ণী কি ০ ন্ন র য ০ ক্ষ র

০ ১ ২´ ৩ ০
| -া র্সা না র্সা | নর্সা র্রা র্সা ণা I র্সা ণা ধা ধা | মা মা ধা ধা | ধা -া ধা ধণা |
০ ক্ষ গ ০ ন্ধ০ ০ র্ব স ০ বে মি লি নি তি গা হি ছে ০ গু ণ০

১ ২´ ৩
| র্সণা ধণা ধপা ধা I র্সা না র্সা ণা | ধা পা র্সা ণা II
০০ ০০ ০০ ০ ত ব বা খা ০ নি "স ব"

৩ ০ ১ ২´ ৩
| সা সা মা মা | মা -া গমা গা | মা মা পা পা I পা পা -া গা | গা মা ধা পা |
ত্রি ভু ব ন আ ০ দে০ শ ত ব বি না অ চ ০ ল ত ব দ য়া

০ ১ ২´
| র্সা ণা ধা পা | গা মা ধা পা I ণা -া ধা -া |
০ তে ন র হ ০ ০ য় জ্ঞা ০ নী ০

৩ ০ ১ ২´ ৩
{মা মা ধা ধা। ণা ণধা পা ধা। মা -া র্সা না I র্সা -া র্সা র্সা}। র্সা র্মা র্গা র্রা।
ত ব রূ প অ ম০ ০ উ জ্জ ০ ল না হি ০ পা ই জ গ তে না

০ ১ ২´ ৩ ০
। -া র্সা না র্সা। নর্সা র্রা না র্সা I ণা র্সা ণা ধা। মা মা ধা -া। ধা ধা -া ধা।
০ হি উ প মা০ ০ তো মা র ০ না হি স ম তু ০ ল ন ০ সু

১ ২´ ৩
। ধণা র্সণা ধণা ধপা I ধা র্সা না র্সা। ণা ধপা র্সা ণা IIII
ধু০ ০০ ০০ ০০ ০ ধা ০ ০ হি নী০ "স ব"

খাম্বাবতী—যৎ (১৪ মাত্রা)

গান (১)	গান (২)	গান (৩)
সকল সঁপিনু	মগন হইনু	মগন হইনু
তোমারি পদে	অতুল শোভা	মহিমা তব
প্রাণের প্রাণ।	নিরখিয়া।	নিরখি' নাথ্।
আশীষ বরষিয়া	আকুল মম হিয়া	আকুল মম হিয়া
শীতল কর হিয়া	উঠিছে ব্যাকুলিয়া;	প্রাণে তুমি আসিয়া
আমারে বাঁচাও হে।	আপনে হারাইনু	শীতল কর ওহে;
তোমারে নমি	তোমার শোভা	তোমারে ছাড়ি'
প্রাণের প্রাণ॥	নিরখিয়া॥	জাগে বিষাদ॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

২´ ৩ ০ ১ I
সা -া -া। গা -া মগা -া। মা -া -া। পা -া -া পধপপা I
(১) স ০ ০ ক ০ ল ০ সঁ ০ ০ পি ০ ০ নু০ ০ ০
(২) ম ০ ০ গ ০ ন ০ হ ০ ০ ই ০ ০ নু০ ০ ০
(৩) ম ০ ০ গ ০ ন ০ হ ০ ০ ই ০ ০ নু০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১
-া -া -া। গা -া মা -া। পধা ণর্সা -া। র্সণণা -া ধা -া I
(১) ০ ০ ০ তো ০ মা ০ রি০ ০০ ০ প ০ দে ০
(২) ০ ০ ০ অ ০ তু ০ ল০ ০০ ০ শো ০ ভা ০
(৩) ০ ০ ০ ম ০ হি ০ মা০ ০০ ০ ত ০ ব ০

২´ ৩ ০ ১
-া পমমা -া। পমা -া -া পধা। পমমা -া -া। গা -া -া রসসা II
(১) ০ ০০০ ০ প্রা ০ ০ ণের প্রা০ ০ ০ ণ ০ ০ ০০০
(২) ০ ০০০ ০ নি ০ ০ র০ খি০০ ০ ০ য়া ০ ০ ০০০
(৩) ০ ০০০ ০ নি ০ ০ র০ খি০০ ০ ০ না ০ ০ ০০থ্

২´
[গা] ৩ ০ ১
{মা মা -া। ধা ণা পধাঃ নঃ। র্সা না -া। র্রর্সর্সা -া -া -া I
(১) আ শী ০ ব ০ ০ ব র ষি ০ য়া০০ ০ ০ ০
(২) আ কু ০ ল ০ ০ ম ম হি ০ য়া০০ ০ ০ ০
(৩) আ কু ০ ল ০ ০ ম ম হি ০ য়া০০ ০ ০ ০

২´ ৩ ০ ১

র্সা না -া | র্সা -া -া নর্সর্রা | র্সা ণা -া | ধা -া -া পমমা I }

(১) শী ত ০ ল ০ ০ ক০০ র হি ০ রা ০ ০ ০০০

(২) উ ঠি ০ ছে ০ ০ রা০০ জা ই ০ রা ০ ০ ০০০

(৩) প্রা ণে ০ তু ০ ০ মি০০ আ সি ০ রা ০ ০ ০০০

২´ ৩ ০ ১

পা না -া | র্সা -া -া নর্সর্রা | র্সা ণা র্সা | ণা -া ধা -া I

(১) আ মা ০ রে ০ ০ বাঁ০ ০ চা ০ ০ ও ০ হে ০

(২) আ প ০ নে ০ ০ হা০ ০ রা ০ ০ ই ০ মু ০

(৩) শী ত ০ ল ০ ০ ক০ ০ র ০ ০ ও ০ হে ০

২´ ৩ ০ ১

-া -া পমমা | গা -া মা -া | পধণা র্সা -া | র্সণণা -া ধা -া I

(১) ০ ০ ০০০ তো ০ মা ০ রে০০ ০ ০ ন০০ ০ মি ০

(২) ০ ০ ০০০ তো ০ মা ০ র০০ ০ ০ শো০০ ০ ভা ০

(৩) ০ ০ ০০০ তো ০ মা ০ রে০০ ০ ০ ছা০০ ০ ড়ি ০

২´ ৩ ০ ১

-া পমমা -া | পমমা -া -া পধা | পমমা -া -া | গা -া -া রসসা IIII

(১) ০ ০০০ ০ প্রা০০ ০ ০ ণের প্রা০০ ০ ০ ণ ০ ০ ০০০

(২) ০ ০০০ ০ নি০০ ০ ০ র০ থি০০ ০ ০ রা ০ ০ ০০০

(৩) ০ ০০০ ০ জা০০ ০ ০ গে বি যা০০ ০ ০ দ ০ ০ ০০০

বঙ্গদেশে প্রাথমিক শিক্ষা।

(২)

(শ্রী পঞ্চানন রায়)

ক্রমোন্নতির ত্রিংশ বর্ষদয়।

প্রাথমিক বিদ্যালয়ে মুদ্রিত পুস্তকসমূহের প্রবর্ত্তন প্রথমত কতকটা ভয়ের সৃষ্টি করিয়াছিল। বঙ্গদেশীয়েরা আশঙ্কা করিলেন যে শিশুগণকে এই উপায়ে ফাঁদে ফেলিয়া তাহাদের জাতি নষ্ট করা হইবে, কারণ হস্তলিখিত গ্রন্থ সাহায্যেই পূর্ব্বে শিক্ষাদানকার্য্য নির্ব্বাহ হইত। গ্রাম্য শিক্ষকগণকে বলা হইতে লাগিল, "শিশুদের হাতে এই পুস্তক দেওয়া হইলে বিশেষ বেগ না পাইয়া তাহারা ইহা পড়িতেই পারে না, আর সাধারণত ইহার বিষয়সকল তাহাদের পক্ষে বোধগম্য হওয়া আরও দুষ্কর।" কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট, চুঁচুড়ানিবাসী মিঃ মের পদ্ধতিই কিঞ্চিৎ উন্নত আকারে প্রচলিত করেন।

কলিকাতা বিদ্যালয়সমিতি (Calcutta School Society) ১৮১৯ খ্রীষ্টাব্দে কলিকাতায় কতকগুলি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ভার লইয়া ইহার তত্ত্বাবধায়ককে কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট সাহেবের বিদ্যালয়ের পরিচালন-পদ্ধতি শিক্ষা করিতে পাঁচ মাসের জন্য বর্দ্ধমানে প্রেরণ করিলেন, কারণ এই পদ্ধতি অনুসারে তিনি অল্পসংখ্যক শিক্ষকের দ্বারা অধিকসংখ্যক ছাত্রকে শিক্ষাদান করিতে পারিতেন, এবং ইহাতে ব্যয়ও হইত প্রাচীন পদ্ধতির অর্দ্ধেক মাত্র। এই সকল বিদ্যালয়ে জ্যোতির্ব্বিদ্যা ও ইংলণ্ডীয় ইতিহাস সম্বন্ধীয় প্রাথমিক গ্রন্থ সকল পূর্ব্বেই প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। কাপ্তেন ষ্টুয়ার্ট এই সকলের উপর মাননীয় কোম্পানী প্রবর্ত্তিত রেগুলেশন সমূহের ভূমিকার কিয়দংশ পড়াইবার ব্যবস্থা করিলেন, যাহাতে সরকার বাহাদুর এদেশীয়দের সুখ-সুবিধা বৃদ্ধির জন্য সবিশেষ আগ্রহান্বিত ইহা ভারতবাসীগণ বিশ্বাস করে। তাহার জন্য এই ভূমিকাটী বিচিত্রভাবে প্রণয়ন করা হইয়াছিল। ইহা পড়িয়াই প্রথমত শাসকসম্প্রদায়ের

সম্বন্ধে ছাত্রগণের সুউচ্চ ধারণা হইত; তাহার ফলে প্রীতি ও মেলামেশায় সহায়তায় তাঁহাদের প্রতি আত্ম-সমর্পণের ভাব ক্রমশঃ বর্দ্ধিত হইত। হস্তলিখন এবং পাঠ্যপুস্তকের অন্তর্ভুক্ত নীতিপূর্ণ গল্পগুলিও শিক্ষাপদ্ধতির একটা অংশ ছিল। বালকগণ গল্পে প্রচুর আনন্দ লাভ করে এবং গল্প বলিবার চেষ্টা হইতে তাহাদের বুদ্ধি-বৃত্তির তীক্ষ্ণতাবৃদ্ধি ও ভাষার উন্নতি সাধন করে। নৈতিক সত্যসকল মনোরম গল্পাকারে তাহাদের নিকট প্রকাশিত হইয়া তাহাদিগকে ঐ সকল সত্যে আস্থাবান্ করিয়া তুলে।"

দেশীয় বিদ্যালয়সমূহ।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে শ্রীরামপুর-সমিতির ডাঃ জসুয়া মার্শম্যান "দেশীয় বিদ্যালয়সমূহের উন্নতি বিষয়ক উপদেশ" নামক একখানি মূল্যবান পুস্তক প্রকাশ করেন। ইহাতে একটী প্রাথমিক শিক্ষাপদ্ধতির সারাংশ প্রদত্ত হইয়াছিল। উল্লিখিত শিক্ষাপদ্ধতির একটী উদ্দেশ্য তিনি নিম্নলিখিত ভাবে তাঁহার পুস্তকে বর্ণনা করিয়াছেন;—"এই পদ্ধতি অনুসারে যদি কৃষক ও নির্ম্মাতৃসম্প্রদায় তাহাদের মাতৃ-ভাষা লিখন ও পঠনে সুশিক্ষিত হয় এবং গণিতশাস্ত্রের মূলনীতিগুলির সহিত পরিচিত হয়, তাহা হইলে তদীয় দেশবাসীগণ কর্ত্তৃক প্রতারিত হইবার সম্ভাবনা অতি অল্পই থাকে এবং প্রত্যেক সভ্য শাসকসম্প্রদায়ের উৎপীড়ন হইতে আত্মরক্ষা করিবার পূর্ণ অধিকার দাবী করিবার ক্ষমতা তাহাদের যথেষ্ট বর্দ্ধিত হয়"। ডাঃ মার্শম্যান শ্রীরামপুরসমিতির তদীয় সতীর্থগণের সহযোগিতায় বাঙ্গালীদের জন্য প্রায় একশত প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। মাত্র ষোড়শটী রজতমুদ্রা প্রত্যেক বিদ্যা-লয়ের মাসিক ব্যয় নিরূপিত হইল। তাঁহারা কৃতকার্য্য হইলেন। প্রথম বৎসর শ্রীরামপুরের খ্রীষ্টীয় প্রচারকগণ চাঁদা ও দান স্বরূপ আট সহস্র মুদ্রা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। শ্রীরামপুরে তাঁহারা একটী পরীক্ষামূলক (experimental) শিক্ষকতা-বিদ্যালয় (Normal Schoal) স্থাপন করিলেন। তাঁহাদের নিযুক্ত শিক্ষকগণ এই বিদ্যালয়ে নিজ নিজ অভিনব কর্ত্তব্য বিষয়ে আংশিক শিক্ষা প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। এই পদ্ধতি অনুযায়ী শ্রীরামপুর হইতে দুই ক্রোশ দূরবর্ত্তী নবাবগঞ্জ গ্রামে প্রথম বিদ্যালয় স্থাপিত হয়। গ্রামবাসীগণকে তুষ্ট করিবার জন্য তাঁহাদের দ্বারাই একজন শিক্ষককে নির্ব্বাচিত করাইয়া, শিক্ষকতা-বিদ্যালয়ে (normal school) প্রেরণ করিতে তাঁহারা ইচ্ছুক হইলেন।

গ্রামে গ্রামে এই দৃষ্টান্ত অনুসৃত হইল এবং গ্রামবাসীগণ আপনারা নির্ব্বাচন করিয়া শিক্ষকগণকে শিক্ষকতা বিদ্যায় পারদর্শী করিবার জন্য শ্রীরামপুরে প্রেরণ করিতে লাগিল। গ্রামবাসীগণের অনুরোধে কয়েক মাইলের মধ্যেই উনিশটী বিদ্যালয় স্থাপিত হইল। প্রতিপত্তিশালী ব্যক্তিগণ কয়েকটী স্থলে নিজেদের বাসগৃহ এবং অন্যত্র পারিবারিক দেবায়তন বিদ্যালয়ের জন্য ব্যব-হার করিতে দিতে চাহিয়াছিলেন। কোন কোন স্থানে সম্পত্তিশালী ব্যক্তিগণ ভাড়া পাইবার আশায় গৃহ নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। একবার কুড়ি জন বালক গ্রামের প্রতি-পত্তিশালী ব্যক্তিগণের সম্মতিব্যাহারে একটী বিদ্যালয় স্থাপনের প্রার্থনা জানাইবার জন্য বহু দূর হইতে শ্রীরাম-পুরে আসিয়াছিল।

মহাত্মা ডেভিডহেয়ারের কার্য্যাবলী।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দের পূর্ব্বে বাঙ্গালীদের প্রিয়, ঘড়ি-নির্ম্মাণ-কারক ডেভিডহেয়ার স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন না করিয়া তাঁহার অবশিষ্ট জীবন ও সঞ্চিত অর্থ প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার কল্পে নিযুক্ত করেন। তিনি শোভাবাজারের সুবি-খ্যাত রাজা রাধাকান্ত দেবের সহযোগিতায় তদানীন্তন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধনের জন্য বহু সময় নিয়োজিত করেন। হেয়ার তাঁহার শিক্ষাপ্রদানের উদ্যম সকল প্রথমতঃ প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির মধ্য দিয়া দেশীয় ভাষা শিক্ষায় উৎসাহ প্রদানে নিয়োজিত করেন। তিনি মুদ্রিত পুস্তক বিতরণ ও পরিদর্শক-পণ্ডিত নিযুক্ত করিয়া গুরুমহাশয়গণ-চালিত গ্রাম্য পাঠশালাসমূহের সংস্কারসাধন করেন। রাজা রাধাকান্ত দেবের উদ্যানবাটীকায় সাময়িক পরীক্ষা গ্রহণ ও পুরস্কার বিতরণ হইত। অনন্তর তিনি বিদ্যালয়-সমিতির সাক্ষাৎ তত্ত্বাবধানে এক শ্রেণীর কেন্দ্রীয় প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেন। এই বিদ্যালয়টী বৃহৎ এবং ইহার ছাত্রসংখ্যা দুইশত ছিল। ইহা তাৎকালিক শ্রেষ্ঠ প্রাথমিক বিদ্যালয় ছিল। নিয়মিত উপস্থিতির উৎসাহ দানের জন্য প্রত্যেক বালককে মাসিক আটআনা দেওয়া হইত, যদি সে সেই মাসে একটী দিনের জন্যও অনুপস্থিত না থাকিত। একদিন অনুপস্থিত হইলে ছয়আনা, দুইদিন হইলে চার আনা দেওয়া হইত। দুই দিনের বেশী অনুপস্থিত হইলে কিছুই দেওয়া হইত না। প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সুবিখ্যাত ছাত্রগণকে হিন্দু-বিদ্যালয়ে প্রেরণ করা হইত। উক্ত বিদ্যালয়ে বিদ্যালয়-সমিতি হইতে সর্ব্বদাই ত্রিশ জন ছাত্রের ব্যয়ভার নির্ব্বাহ করা হইত।

১৮১৭ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুলবুক সোসাইটী (Calcutta School Book Society) স্থাপিত হয়। এই সমিতির উদ্দেশ্য ছিল স্বল্প মূল্যের পুস্তক প্রণয়ন ও প্রকাশ করিয়া প্রাথমিক বিদ্যালয়সমূহে সরবরাহ করা। ১৮২১ সালের মে মাসে সরকার বাহাদুর এই সমিতির জন্য এককালীন সাহায্য আট হাজার টাকা

ও মাসিক সাহায্য পাঁচশত টাকা মঞ্জুর করেন। ১৮১৮ খৃষ্টাব্দে বড়লাট মার্কুইস অফ্ হেষ্টিংসের সভাপতিত্বাধীনে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি (Calcutta School Society) প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার উদ্দেশ্য ছিল তৎকালীন প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতিসাধন ও সাহায্য করা, এবং প্রয়োজনানুযায়ী আরও বিদ্যালয় স্থাপন ও তাহাদিগকে সংরক্ষণ করা। ১৮২১ সালে এই সমিতির কর্ত্তৃত্বাধীনে উচ্চ ও নিম্ন শ্রেণীর ১১৫টী বিদ্যালয় ছিল ও ৩৮২৮জন ছাত্র সেই বিদ্যালয়গুলিতে অধ্যয়ন করিত। সমিতি হইতে কর্ম্মচারিগণের সাহায্যে এই সকল বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান, পরীক্ষাগ্রহণ ও পুস্তক বিতরণ করা হইত। ১৮২৩ সালে এই সমিতি মাসিক পাঁচশত টাকা সরকারী সাহায্য প্রাপ্ত হয়। ১৮৩৩ সাল পর্য্যন্ত প্রশংসনীয় ভাবে ইহার কার্য্য চলিয়াছিল।

১৮১৯ সালে কলিকাতা ভবানীপুরের লণ্ডন খৃষ্টিয় প্রচারক সমিতি তদানীন্তন সুপরিচালিত বিদ্যালয়গুলির প্রয়োজনীয়তা উপলব্ধি করিয়া (London Missionary Society) প্রাথমিক শিক্ষা প্রচার বিষয়ে মনোনিবেশ করেন। ১৮২০ খৃষ্টাব্দে তাঁহারা চেতলা এবং কালীঘাট ও টালীগঞ্জের নিকটবর্ত্তী স্থানে কতকগুলি বিদ্যালয় স্থাপন করেন। কিন্তু যে সকল বিদ্যালয়ে খৃষ্টিয় শাস্ত্রগ্রন্থ অধ্যাপনা হয়, সেই সকল বিদ্যালয়ে যোগদানের বিরুদ্ধে তখন বাঙ্গালীদের মনে প্রবল কুসংস্কার ছিল। তথাপি এই সমিতি ১৮২০ সালে খিদিরপুরের কোন একটী বাংলোস্থিত উপাসনামন্দিরে পঁচিশজন ছাত্র লইয়া একটী প্রাথমিক বিদ্যালয় পরিচালনা আরম্ভ করেন। কলিকাতা চার্চ্চ মিশনারী সমিতির অধীনে বহু বৎসর ধরিয়া ছয় শত ছাত্র কলিকাতার বিভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয়ে অধ্যয়ন করিতেছিল। ব্যাপটিষ্ট প্রচারক সমিতির অধীনেও কয়েক শত বিদ্যালয় ছিল।

খৃষ্টিয় জ্ঞানবিধায়িনী সমিতি।

(Christion Knowledge Society)

১৮১৯ খৃষ্টাব্দে কলিকাতা স্কুল সোসাইটি ইহার অধীনস্থ কতকগুলি বিদ্যালয়ের ভার চার্চ্চ মিশনারী সমিতিকে প্রদান করেন। মিঃ জেল্‌টার ইহাদের তত্ত্বাবধায়ক নিযুক্ত হন। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে চার্চ্চ মিশনারী সমিতি তাঁহাদের কর্ত্তৃত্বাধীনে এই বিদ্যালয়সমূহের অধিকাংশেরই পরিচালন ভার গ্রহণ করেন। শিক্ষকগণ বিদ্যালয়ে যে সমস্ত পুস্তকের অধ্যাপনা করিতেন, মিঃ রিচার্ড ১৮২৫ খৃষ্টাব্দের প্রত্যেক শনিবার তাঁহাদিগকে সেইগুলি বুঝাইয়া দিতেন। তিনি বারটী বিদ্যালয়ের তত্ত্বাবধান করিতেন, ঐ সকলের ছাত্রসংখ্যা ছিল সাত শত। তাঁহার অভিজ্ঞতানুযায়ী তিনি, এই বিদ্যালয়গুলির সম্পর্কীয় যে বিবরণ প্রদান করিতেন তাহা খুবই হতাশাজনক। চার্চ্চ মিশনারীসমিতির সংযোগে ও মার্কিনেস হেষ্টিংসের আনুকূল্যে কুমারী কুক ১৮২১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় প্রথমিক স্ত্রীশিক্ষা প্রচার আরম্ভ করেন। তাঁহার অধীনে বাইশটী বিদ্যালয় ও চারিশত ছাত্র ছিল। ১৮২৪ খৃষ্টাব্দে কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় এবং ১৮৩৭ খৃষ্টাব্দে আগড়পাড়া (ই, বি, আর) অনাথাশ্রম প্রতিষ্ঠা হয়।

১৮২২ খৃষ্টাব্দের অনতিকাল পূর্ব্বে খৃষ্টিয় জ্ঞানবিধায়িনী সমিতি প্রাথমিক বিদ্যালয় বিভাগ পদ্ধতি প্রচলন করেন। প্রত্যেক বিভাগের পাঁচটী প্রাথমিক ও একটী কেন্দ্রীয় বিদ্যালয় থাকিত। ঐ বিভাগের একটী টালীগঞ্জ, অপরটী কাশীপুর ও আর একটী হাওড়া বিভাগ নামে কথিত হইত। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দে তাহাদের অধীনে ৬৯৭ জন ছাত্র ছিল, কিন্তু পরে ঐগুলি প্রচার-সমিতি (Propagation Society)তে হস্তান্তরিত হইল এবং ঐ সমিতির অর্থসঙ্গতি অন্য কার্য্যের জন্য রাখিয়া দেওয়ায় বিদ্যালয়গুলি লুপ্ত হইয়া গেল। এই বিভাগীয় বিদ্যালয়গুলি বঙ্গদেশে বিশেষ জনপ্রিয় ছিল। কাশীপুর বিভাগের তিনটী বিদ্যালয়ে প্রত্যহ গড়ে ২২০ জন ছাত্র যোগদান করিত। টালীগঞ্জ বিভাগের সাতটী বিদ্যালয়ে ৫৫০ জন ছাত্র এবং হাওড়া বিভাগের ছয়টী বিদ্যালয়ে ৬৫২ জন ছাত্র গড়ে দৈনিক উপস্থিত হইত। প্রত্যেক বিদ্যালয়ে এক-একজন গুরুমহাশয় থাকিলেও পণ্ডিত ও তত্ত্বাবধায়ক পাদরী পর্য্যায়ক্রমে উহা পরিদর্শন করিতেন। প্রত্যেক বিদ্যালয়ের মাসিক ব্যয় ছিল পনের টাকা। প্রত্যেক শ্রেণীর ছাত্রগণের সংখ্যা ও তাহাদের দক্ষতার অনুপাতে গুরুমহাশয় তাঁহার মাসিক পারিশ্রমিক পাইতেন।

জনসাধারণের শিক্ষা।

পরবর্ত্তী কালে কয়েকবার অসংবদ্ধ প্রচেষ্টা পরিদৃষ্ট হইয়াছিল বটে কিন্তু সরকার বাহাদুর জনসাধারণকে উপেক্ষা করিলেন। ১৮৩৫ খৃষ্টাব্দের জানুয়ারী মাসে সাংবাদিক মহলে সুবিখ্যাত খ্রীষ্টীয় প্রচারক উইলিয়ম অ্যাডাম সাহেব, জনসাধারণের শিক্ষার দিকে বড়লাট লর্ড বেণ্টিঙ্কের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। বড়লাট বাহাদুরের অনুরোধে তিনি বঙ্গ-বিহার-উড়িষ্যার প্রাথমিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের ভার গ্রহণ করেন। এই জাতীয় ব্যবস্থা এই প্রথম, ১৮৩৮ সালে ইহা সম্পন্ন হয়। তিনি তিনটী বিবরণীর সহিত সরকার বাহাদুরের নিকট প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় একটী প্রণালী উপস্থাপিত করেন। এই প্রণালীটী অনেকটা প্রাচীন হিন্দুদিগের গ্রাম-পরিচালন

পদ্ধতির আদর্শে গঠিত হইয়াছিল। প্রত্যেক গ্রামেই মোড়ল, গোমস্তা, যাজক, কর্ম্মকার, কুম্ভকার, সূত্রধর, ক্ষৌরকার, রজক, কবি ও চিকিৎসক থাকিত এবং গ্রাম্য শিক্ষকগণ গুরুমহাশয় নামে কথিত হইতেন। মিঃ অ্যাডাম স্থির করিলেন যে বঙ্গ-বিহারে এইরূপ বিদ্যালয়ের সংখ্যা হইবে লক্ষাধিক; ঐ বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যাবৃদ্ধি নয় পরন্তু সংস্কারসাধনই প্রধান লক্ষ্যের বিষয় হওয়া উচিত।

অ্যাডাম সাহেব বহু যত্ন ও পরিশ্রম সংকারে যে বিবরণী তিনটী প্রস্তুত করেন, কলিকাতা শিক্ষাপরিষদ্ তাহা ও প্রাথমিক শিক্ষা সম্বন্ধীয় তাঁহার পরিকল্পনা, উভয়ই নিম্নলিখিত কারণে অগ্রাহ্য করেন। "সরকার প্রথমত প্রধান প্রধান সহর ও প্রত্যেক জেলার সদর এবং জনমণ্ডলীর মধ্যস্থ অভিজাত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভিতর এই উদ্দেশ্যে শিক্ষাবিষয়িণী উন্নতির জন্য মনোযোগ দিবেন, তাহা হইলে এই সকল শিক্ষিত লোকের সাহায্যে শিক্ষাসংস্কার কার্য্য গ্রাম্য দেশীয় বিদ্যালয়সমূহে সুবিস্তৃত হইবে এবং যে সকল লোক প্রথমতঃ সুবিধাগুলির সহযোগিতা হইতে বঞ্চিত হইয়াছিল, ইহার সুফল অবিলম্বে তাহাদের মধ্যেও সঞ্চারিত হইবে। অ্যাডাম সাহেবের প্রদর্শিত পন্থা অগ্রাহ্য হওয়ায় তিনি বিরক্ত হইয়া কার্য্যভার পরিত্যাগ করেন।

১৮৫৪ এবং ১৮৫৯ খৃষ্টাব্দে বিলাত হইতে যে শিক্ষাবিষয়ক বিখ্যাত আদেশ প্রেরিত হয় উহাতে প্রাথমিক শিক্ষার রাজনৈতিক গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া উহার প্রয়োজনীয়তার দিকে বিশেষ দৃষ্টি দেওয়া হয়। ১৮৬৩ এবং ১৮৬৪ খৃষ্টাব্দে যথেষ্ট অর্থব্যয়সহ উচ্চশ্রেণীর শিক্ষার জন্য সরকারী ব্যয় বিলাতের শাসকসম্প্রদায়ের অভিমতানুযায়ী নহে এই কারণ দর্শাইয়া সার চার্লস উড উপরোক্ত বিষয়টীকে আরও দৃঢ়ভাবে সমর্থন করেন। হাউয়েল সাহেবও ১৮৭৬ খৃষ্টাব্দে ভারত সরকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত তাঁহার শিক্ষা সম্বন্ধীয় সংক্ষিপ্ত মন্তব্যে ঐ অভিমতই প্রকাশ করেন।

গ্রন্থপরিচয়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

কৃষিসম্পদ—আশ্বিন ১৩৩৫—সম্পাদক শ্রীনিশিকান্ত ঘোষ।

আমরা আশ্বিন মাসের কৃষিসম্পদ পাইলাম। এরূপ পত্রিকা দেশের মঙ্গলসাধক হইলেই বা হইবে কি? দেশের লোকের মনের অবস্থা এমনই দাঁড়াইয়াছে যে, নিজের দেহে পচ ধরিলেও তাহার প্রকৃত চিকিৎসা করিতে অগ্রসর হইবে না। ইহাতে যখন "মনস্তত্ত্বপূর্ণ" গল্প বাহির হয় না, ইহা যখন দেশবাসীর মনুষ্যত্ব হরণে উদ্যত নহে, তখন ইহার গ্রাহক ও লেখক আশানুরূপ হইবে না তাহা জানা কথা। সেই কারণেই অনুমান করি, অগ্রহায়ণ মাসে আশ্বিন-সংখ্যা প্রকাশিত হইয়াছে। "খেলের কথ" ভাল লাগিল। "ধানের খবরে" চাষীদের গ্রহণের উপযোগী বিশেষ কোন খবর পাইলাম না। আমার মনে হয়, চাষীদিগকে লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া কৃষিসম্পদের প্রবন্ধগুলি লেখা উচিত। 'মৃৎপ্রকৃতি'র বিষয় ভাল, কিন্তু এরূপ বিষয় খুব সরল ভাষায় লিখিলে ভাল হয়। 'পূর্ব্ববঙ্গের কৃষিবচনে' গরুকে আরাম দিবার বিষয় যাহা উল্লেখ করিয়াছেন, তাহা অতি ঠিক। আমি গবর্ণমেণ্টের কোন উচ্চপদস্থ ইংরাজকর্ম্মচারীর নিকট শুনিয়াছি যে, বিলাতে গরুর বাচ্ছা হইবার পরেই বাচ্ছাকে সরাইয়া লইয়া খুব যত্ন করা হয়, feeding bottleএ তাহাকে প্রয়োজনমত দুধ বা Horlick's malted milk জাতীয় দ্রব্যও খাওয়ান হয় এবং প্রসূতি গাভীকে খুবই যত্ন করা হয়। তাহার ফলে নাকি গাভীসকল অতি মিষ্ট এবং সারবান দুগ্ধ প্রচুর পরিমাণে দেয়। কিন্তু আমাদের এই পরাধীন ও দরিদ্র দেশের গুরুতর কথা এই যে, সেরূপ যত্নে রাখিবার উপযুক্ত খরচ আমরা যোগাইতে পারিব কি না? 'লাঙ্গলের ক্রমবিকাশ' বড়ই ভাল লাগিল, কিন্তু একটু বেশী দীর্ঘ হইয়াছে।

সম্পাদক লিখিয়াছেন—প্রতি মিনিটে ১১৮ মণ চাউল বিদেশে যায়। ইহা প্রতিরুদ্ধ করিবার উপায়ও সেই সঙ্গে লিখিলে ভাল হইত। 'অর্কিড' বড়ই সুন্দর, কিন্তু অনেকগুলি অর্কিডের নাম ইংরাজীতেই দেওয়া হইয়াছে। লেখক ব্রজেন্দ্র বাবু কি এগুলির দেশীয় বাংলা বা হিন্দি নাম দিতে পারেন না? 'মুর্গীচাষ' কবে পুস্তকাকারে প্রকাশ হইবে তাহার অপেক্ষা করিতেছি। দেখিয়া বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম যে, ইহাতে বাজে বিজ্ঞাপন বড় কিছু প্রকাশিত হয় নাই।

Asutosh College Magazine—Puja number—Editor. Sj. Sasibhusan Barik and Kalyan Kumar Sen Gupta.

ইহার মুখপত্রে বর্ত্তমান ভাইসচ্যান্সলরের একটী সুন্দর চিত্র দেওয়া হইয়াছে। শশীভূষণ বাবুর An Aspect of warএ যুদ্ধের প্রশংসা করিয়া শেষে বলা হইয়াছে—As soldiers we love it and worship it as well. To love it is but to worship it. ধর্ম্মপ্রাণ ভারতবাসীর মুখে যুদ্ধের অযথা প্রশংসা করা, যুদ্ধের প্রেমে পড়িয়া পূজা করা শোভা পায় না। প্রয়োজন পড়িলে আমাদের যুদ্ধ করা

নিতান্ত কর্ত্তব্য কিন্তু তার মূল নীতি হইতেছে একদিকে "ধিক্ বলং ক্ষাত্রবলং ব্রহ্মতেজোবলং বলং" অপরদিকে "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতোবাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং"। শ্রীমান্ আনন্দময় লাহিড়ির সহিত আমরা একমত যে, শ্রমজীবীদিগকে সমাজের ভিত্তিরূপে ধরিতে হইবে—এই কথা দেশের মধ্যযুগে ভুলিয়া গেলেও খুবই সত্য। খাসিয়া সম্বন্ধীয় প্রবন্ধটী সংক্ষিপ্ত হইলেও মনোগ্রাহী। শ্রীযুক্ত বিভাস রায় চৌধুরীর 'বঙ্গে পর্ত্তুগালের দান' প্রবন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা সমাবিষ্ট হইয়াছে—যাহা সাধারণত অজ্ঞাত। আনারস প্রভৃতি প্রবন্ধোক্ত ফলগুলি যে সমস্তই পর্ত্তুগীজগণ আমদানী করেন, তাহার প্রমাণ দিলে সুখী হই। আমার মনে হয়, বিভাস বাবু এই বিষয়টী সুবিস্তৃত করিয়া লিখিলে বঙ্গসাহিত্যের উপকার হয়। কিছুদিন পূর্ব্বে অনেক ইংরাজ সিভিলিয়ান (নাম ঠিক মনে পড়িতেছে না) বঙ্গে পর্ত্তুগীজদিগের আগমন সম্বন্ধে বক্তৃতা দিয়াছিলেন এবং তৎরচিত বঙ্গের ইতিবৃত্তে তাহা সমাবিষ্ট করিয়াছেন। 'মহেঞ্জ-দরো ও হরপ্পা' প্রবন্ধেও সংক্ষেপে নবাবিষ্কৃত প্রাচীন সভ্যতার বিষয় বর্ণিত হইয়াছে। শ্রীযুক্ত হরিমোহন ভট্টাচার্য্যের 'লর্ড হ্যালডেন ও তাঁহার দর্শন' প্রবন্ধের দ্বারা দার্শনিকগণ বিশেষ উপকৃত হইবেন। 'সমালোচনা সাহিত্য' প্রবন্ধটী ভাল লাগিল। সমালোচনা যেমন সৌন্দর্য্য বাহির করিবে, সেইরূপ দোষও বাহির করিতে বাধা, কিন্তু সমালোচ্য গ্রন্থকারের অন্তরে ছুরিকার কঠিন আঘাত না দিয়া। অধ্যাপক উষ্টসাগর শ্রীপূর্ণচন্দ্র দের প্রবন্ধটী মনোগ্রাহী হইলেও আমরা এ বিষয়ে তাঁহার সঙ্গে একমত হইতে পারিলাম না যে, প্রত্যেক পদক্ষেপে সংস্কৃত ভাষার অনুসরণ করিতে হইবে। চলিত কথা হইল পথ—এখানে পথপ্রদর্শক না বলিয়া পথিপ্রদর্শক কেন বলিব তাহার কারণ খুঁজিয়া পাই না। তাহা হইলে "পিতার আদেশ" না বলিয়া "পিতৃর আদেশ" বলিতে হয়—যাহা অসম্ভব। চলতি ভাষার সর্ব্বথা প্রয়োগের পক্ষপাতী না হইলেও বঙ্গভাষাকে সজীব ও ক্ষমতাশালী করিতে হইলে যে চলিত ভাষাকে প্রয়োগক্ষেত্রে আনিতে হইবে, তাহাতে আমার সন্দেহ নাই।

আর্য্য জ্যোতিষ—কার্ত্তিক—সম্পাদক পণ্ডিত শ্রীবসন্তকুমার ভট্টাচার্য্য জ্যোতির্ভূষণ।

'স্বামী-স্ত্রীর সম্বন্ধে' কৌতূহল জাগরূক করে। ইহাতে ভগবান বুদ্ধ স্ত্রীসম্বন্ধে যে শ্রেণীনির্দ্দেশ ও প্রকারান্তরে উপদেশ দিয়াছেন, তাহাই বিবৃত হইয়াছে। অধ্যাপক শ্রীযুক্ত শীতলচন্দ্র চক্রবর্ত্তীর 'আর্য্য ঋষিদের জ্যোতিষিক আবিষ্কার' বড়ই ভাল লাগিল। 'কোষ্ঠীদেখা' প্রবন্ধে জ্যোতির্বাচস্পতি মহাশয় ফলিত জ্যোতিষের মূলকথা বুঝাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। ফলিত জ্যোতিষের প্রথম শিক্ষার্থীর পক্ষে ইহা সহায় হইবে। 'উপাসনা' প্রবন্ধে বক্তব্য বিষয় যে খুব সুস্পষ্ট হইয়াছে তাহা মনে হইল না। 'ভৃগুসংহিতা' প্রবন্ধে ঐ সংহিতা সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। আমরা বিশ্বাস করি যে ফলিত জ্যোতিষকে বিজ্ঞানের মধ্যে আনা যাইতে পারে, কিন্তু সে প্রকার অনুসন্ধিৎসু লোকের অভাব, কারণ ইহা প্রার্থনামত দাম আনিতে পারে না। যেমন আধুনিক বৈজ্ঞানিকেরা হোমিওপ্যাথিক বা বাইওকেমিক, এমন কি কবিরাজী চিকিৎসাকে প্রকৃত চিকিৎসাবিজ্ঞানের মধ্যে ধর্ত্তব্য মনে করেন না, সেইরূপ ফলিত জ্যোতিষকেও বিজ্ঞানের মধ্যে স্থান দিতে চান না। কিন্তু ইহা আমরা অস্বীকার করিতে পারি না যে, হোমিওপ্যাথিক প্রভৃতি চিকিৎসার সময়ে সময়ে আশ্চর্য্য ফল পাওয়া যায় এবং ফলিত জ্যোতিষেরও গণনার ফল জীবনের ঘটনার সঙ্গে আশ্চর্য্য মিলিয়া যায়। এবিষয়ে আলোচনা বিস্তৃত ভাবে হইলে দর্শন ও বিজ্ঞান সম্বন্ধীয় নানা তত্ত্ব নূতন দৃষ্টিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। কবচ সম্বন্ধীয় বিজ্ঞাপনগুলি কাগজের বিজ্ঞাপনীর মধ্যে দিলেই ভাল হইত—মূল পত্রিকার মধ্যে দেওয়া সঙ্গত হয় নাই।

সংস্কৃত সাহিত্য পরিষৎ—আশ্বিন—সম্পাদক শ্রীকালীপদ তর্কাচার্য্য; সহঃ সম্পাদক শ্রীদুর্গামোহন ভট্টাচার্য্য বি-এ। 'লঙ্কাদ্বীপে সংস্কৃত-ভাষাসাহিত্য' প্রবন্ধের নাম হইতেই বিষয় উপলব্ধি হইতেছে—অনেক জ্ঞাতব্য বিষয় আছে। 'পাদুকাতত্ত্বং' প্রবন্ধে জুতা সম্বন্ধে শাস্ত্রোক্ত তত্ত্ব উক্ত হইয়াছে। ইহার বঙ্গানুবাদ কোন পত্রিকায় প্রকাশ হইলে ভাল হয়—অনেক নূতন কথা পাওয়া যাইবে।

জীবনের আলো।—অগ্রহায়ণ—সম্পাদক শ্রীনৃপেন্দ্রকুমার বসু।

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পালের 'নবভারতে ভক্তির নূতন আদর্শ' প্রবন্ধের সকল সকল কথার সহিত আমরা একমত হইতে পারি নাই। কিন্তু এখন মহাপুরুষদের নিয়ে অশোভন টানাটানি চলিতেছে এই কথা যে বলিয়াছেন, ইহা বড়ই ঠিক। শ্রদ্ধেয় বিপিন বাবু যে ভাবে "নববিধানের" ব্যাখ্যা করিয়াছেন, তাহার সহিত কাহারও মতভেদ হইতে না পারিলেও ঐ শব্দটী যে প্রকার পারিভাষিক অর্থে গৃহীত হইতেছে ও ব্যবহৃত হইতেছে, ব্রাহ্মসমাজ কেন, কোন জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মের সামঞ্জস্যগ্রাহী সমাজই তাহা সমর্থন করিতে পারেন না। সম্পাদক মহাশয় 'স্ত্রীজাতির যৌনবোধ' প্রবন্ধে যে বিষয় যে ভাবে আলোচনা করিয়াছেন, তাহাতে আশঙ্কা হয়, পাঠকগণের জীবন নূতন আলোকে উজ্জ্বল হইবার পরিবর্ত্তে অন্ধকারের কালিমায় ঢাকা পড়িয়া যাইবে। তিনি এই বিষয়ে

আরও অনেক কথা আগামী বারে বলিবেন বলিয়া আমাদিগকে ভয়ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছেন। আমরা তাঁহার নিকটে করযোড়ে প্রার্থনা করি—তিনি এই কার্য্যে বিরত হউন, যদি দেশের ও জাতির সত্যসত্য মঙ্গল ইচ্ছা করেন। 'গোদুগ্ধ ও গব্য খাদ্যের ব্যবসায়' প্রবন্ধে সুপ্রসিদ্ধ লেখক শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সরকার অনেক জ্ঞাতব্য ও নিতান্ত প্রয়োজনীয় কথা বলিয়াছেন। ডাক্তার নরেন্দ্রনাথ লাহা 'প্রাচীন-ভারতে রাষ্ট্রসমূহের পরস্পর সম্বন্ধ' বিষয়ে যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন তাহা বিশেষজ্ঞদিগের নিকট যথেষ্ট মনোগ্রাহী হইয়াছে। কোন কোন অংশ আর একটু সরল করিয়া লিখিলে সাধারণের বুঝিবার বিশেষ সুবিধা হইত। 'বাংলাদেশের হিন্দু-মুসলমান' প্রবন্ধটী বড়ই সময়োপযোগী হইয়াছে। মুষ্টিযোগের ঝুলিতে কামবাকল, চক্ষুরোগ প্রভৃতি কয়েকটী রোগের যে টোটকা ঔষধ কবিরাজ শ্রীইন্দুভূষণ সেন দিয়াছেন, তাহা বর্ত্তমানযুগে বড়ই কাজে আসিবে মনে হয়।

Industry—November ; Editor Mr. K. M. Banerji.

দেশীয়-পরিচালিত স্বাধীনজীবিকার পথপ্রদর্শক কাগজের মধ্যে ইহা সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছে। আজ ১৯ বৎসর ধরিয়া ইহার মর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ আছে। Tanning Hides and Skins প্রবন্ধে চামড়ায় কস দিবার প্রণালী বলা হইয়াছে। দুঃখের বিষয় ইংরাজীতে লেখা বলিয়া ইংরাজীতে অনভিজ্ঞের পক্ষে ইহা ব্যবহারে আনিবার পথ রুদ্ধ। ইহার বাংলা করিয়া দিলে আমরা প্রকাশ করিতে প্রস্তুত আছি। ইহার প্রত্যেক প্রবন্ধই প্রণিধানযোগ্য। Manufacture of Lactine প্রবন্ধে দুগ্ধ-শর্করা প্রস্তুত প্রণালী ব্যক্ত। ৩য় প্রবন্ধ Manufacture of Tinctures—ইহাতে টিংচার প্রস্তুত করিবার প্রণালী বলা হইয়াছে। এদেশের পক্ষে ইহা বড়ই উপযোগী। এই প্রবন্ধ পড়িয়া যে কোন উৎসাহী ব্যক্তি টিংচার প্রস্তুত করিবার এবং অর্থাগমের সুযোগ পাইবেন। ৪র্থ প্রবন্ধে কাপড় জলরোধক করিবার প্রণালী। চাকরীর প্রত্যাশা ছাড়িয়া B.-Sc. উত্তীর্ণ ভদ্রবংশীয় ছেলেরা মিলিতভাবে যদি এ কার্য্যে লাগিয়া যান, তবে অচিরে অর্থসংস্থান করিতে পারেন। ৫ম প্রবন্ধে নারিকেল চাষ যে কোন গৃহস্থের অল্প-সল্প জমী আছে তাঁহারাই এই প্রবন্ধোক্ত ইঙ্গিত গ্রহণ করিলে লাভবান হইবেন নিঃসন্দেহ। ৬ষ্ঠ প্রবন্ধে মধু ও তাহার গুণাগুণ উল্লিখিত হইয়াছে। ৭ম প্রবন্ধে দেশীয় রং প্রস্তুতকরণে কি কি পদার্থ প্রযুক্ত হয় তাহা উক্ত হইয়াছে। ৮ম নিবন্ধে অল্প পয়সায় কিরূপে ছোটখাটো ব্যবসায় করা যাইতে পারে তাহা বলা হইয়াছে। ১০ম নিবন্ধে সহজ উপায়ে কিরূপে মাটী পরীক্ষা করা যাইতে পারে বলা হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে কৃষিকর্ম্মে উদ্যোগী পুরুষের ইহা উপকারে আসিবে। ১০ম নিবন্ধে নানাবিষয়ক প্রশ্নোত্তর আছে—সেগুলির ভিতরেও অনেক অত্যাবশ্যক ও জ্ঞাতব্য বিষয় সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। সর্ব্বশেষ নিবন্ধে কোথায় কি পাওয়া যায় এবং কে কি চায়, প্রশ্নোত্তর উপলক্ষ্যে বলা হইয়াছে। এই কাগজখানি দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় বড়ই উপযোগী। কিন্তু ইহার বাংলা সংস্করণ প্রকাশ করিলে দেশের মহদুপকার সাধিত হয়।

তত্ত্বকৌমুদী—১৬ অগ্রহায়ণ সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু।

সম্পাদকীয় দুইটী প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। 'অনুষ্ঠানে উপাসনা' প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় বড় সত্য কথাই বলিয়াছেন যে, আজ কাল যে কোন অনুষ্ঠানেই বল, উপাসনাক্ষেত্রে শ্রদ্ধার একান্ত অভাব দেখা যায়। আমরা দেখিয়াছি উৎসবের উপাসনার সময়েও চুরুটের ধোঁয়ায় আগন্তুকদিগের বসিবার স্থান অন্ধকার হইয়া গিয়াছে এবং অশ্লীল গল্পগুজবে মুখরিত হইয়া উঠিয়াছে। আমাদের মনে হয়, যাঁহাদের উপাসনা প্রভৃতিতে যোগদান অভিপ্রেত না হয়, তাঁহারা উঠিয়া গিয়া অন্যান্য উপাসকদিগকে যোগ দানের সুবিধা করিয়া দিলে ভাল হয়। এরূপ অশ্রদ্ধার আর একটী কারণ মনে হয় যে, উপদেষ্টাগণ উপদেশ দিবার জন্য ভালরূপ প্রস্তুত হইয়া আসেন না। আমি স্বয়ং দুই-একটী উপাসনায় যোগ দিবার জন্য শ্রদ্ধাপূর্ণ হৃদয় লইয়া উপস্থিত ছিলাম, কিন্তু—"পোড় বড়ি খাড়া আর খাড়া বড়ি থোড়" গোছের উপদেশ শুনিয়া নিরাশ হৃদয়ে ফিরিয়া আসিয়াছি। দ্বিতীয় প্রবন্ধ—'ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রহণ ও দীক্ষা'। এই প্রবন্ধে সম্পাদক মহাশয় একটী কথা বলিয়াছেন যে—"ধর্ম্ম পৈত্রিক সম্পত্তিরূপে পাওয়া যায় না; উহা অর্জ্জন করিতে হয়। ব্রাহ্মের পুত্রকন্যা যে ব্রাহ্মই হইবেন • • তা ত নাও হইতে পারে ?" এই কথাই আমরা আবহমান কাল বলিয়া আসিতেছি। যতদিন "জাত-ব্রাহ্ম" গড়িবার দিকে ঝোঁক দেওয়া হবে, সে পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজ প্রবল—ধর্ম্মসমাজে পরিণত হইবে কিনা সন্দেহ। যাক, সে অনেক কথা। আচার্য্য শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় যে প্রেরণাবশে সাধনাশ্রম গঠনে হাত দিয়াছিলেন, সেই প্রেরণাসম্বন্ধে একটী উপদেশ বাহির হইয়াছে। ৺ত্রৈলোক্যনাথ দেবের স্বলিখিত জীবনস্মৃতিতে সেকালের অনেক কথা জানা যায়।

"Advent of Keshub" by Premen Ray—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের জন্মোৎসব উপলক্ষে বিতরিত। ব্রহ্মানন্দের উপর আমাদের প্রগাঢ় শ্রদ্ধা থাকিলেও

প্রেমেন বাবু যে ভাবে পুস্তিকাখানি লিখিয়াছেন, সে ভাবে লিখিবার পক্ষপাতী আমরা নহি।

ধর্ম্মতত্ত্ব—১লা অগ্রহায়ণ—সম্পাদক—রেভারেণ্ড ভাই প্রিয়নাথ মল্লিক ও ভাই গোপালচন্দ্র গুহ। 'বিশ্ব-পরিবারের কেশব' প্রবন্ধে ব্রহ্মানন্দের একটী প্রার্থনার উদ্ধৃত এক অংশ আছে—

"একমেবাদ্বিতীয়ং ব্রাহ্মসমাজ বলিয়াছিলেন উপরে। একমেবাদ্বিতীয়ং নববিধান বলিতেছেন পৃথিবীতে"। আমরা কিন্তু বাল্যকাল অবধি শুনিয়া আসিতেছি—রাজা রামমোহন রায় অবধি ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র পর্য্যন্ত সকলেই ব্রাহ্মসমাজ হইতেই প্রচার করিয়াছেন যে এক-মেবাদ্বিতীয়ং কেবল আকাশে নয়, কিন্তু প্রতি নারনারীর আত্মাতে সুপ্রতিষ্ঠিত। বিস্তরেণালং।

Navavidhan—Janmotsv Number—Editor Rev. Pramatho Lal Sen.

নববিধান সমাজের অন্যতর মুখপত্র ব্রহ্মানন্দের জন্মোৎসব উপলক্ষে নবসাজে সজ্জিত হইয়া বাহির হইয়াছে দেখিয়া সুখী হইলাম। ইহাতে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে পুরাতন হইলেও অনেক জ্ঞাতব্য কথা সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। আমাদের মনে হয়, কেশব হইতে আমাদের মত পাপীতাপী কি সাধুভাব পাইতে পারি, সেই বিষয় সবিস্তার উল্লেখ করিলে ব্রাহ্মসমাজ বেশী উপকৃত হইবে।

Indian Messenger—December 9-Editor Babu Pratul Ch. Som.

ইহাতে ৺ সতীশরঞ্জন দাস মহাশয়ের জীবন সম্বন্ধে অনেক কথা বিবৃত হইয়াছে। Modern Review হইতে রাজা রামমোহন রায়ের ইতিপূর্ব্বে অপ্রকাশিত একটী লেখা (শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়-সংগৃহীত) উদ্ধৃত হইয়াছে। তিনি বলেন, এই প্রকার তাঁহার অপ্রকাশিত আরও লেখা আছে। আলোচ্য লেখাটীতে ভারতের ইংরাজগণের বঙ্গভাষাকে স্বায়ত্ত করার কর্ত্তব্যতা লেখা হইয়াছে।

গন্ধবণিক সমাচার—অগ্রহায়ণ—সম্পাদক শ্রীঅবিনাশচন্দ্র দাস P. H. D. এবং রায় শ্রীতারকনাথ সাধু বাহাদুর C. I. E.

গন্ধবণিক সমাজের মুখপত্র।—শ্রীশ্রীমন্ত কুমার বণিক বঙ্গলা সম্বন্ধে সুন্দর একটী ক্ষুদ্র প্রবন্ধ দিয়াছেন। শ্রীযোগেন্দ্রনাথ সাধু 'গোলাপ ফুলের ইতিহাস' প্রবন্ধে গোলাপফুল সম্বন্ধে অনেক উদ্ভিদতত্ত্ব-প্রধান জ্ঞাতব্য কথা লিখিয়াছেন। মধ্য হইতে 'কালিদাসের সাহিত্য-কথা' না আসিলেই ভাল হইত। মফঃস্বলের 'গন্ধবণিক সমাজে পরিভ্রমণ বৃত্তান্ত' দেখিয়া সুখী হইলাম। কোন সমাজকে সজীব রাখিতে হইলে এইরূপ পরিদর্শনের ব্যবস্থা করা উচিত।

জন্মভূমি—শ্রাবণ—সম্পাদক শ্রীযতীন্দ্রনাথ দত্ত।

শ্রাবণ সংখ্যা বড়ই বিলম্বে হস্তগত হইয়াছে। ইহাতে মহাপ্রভু চৈতন্য দেবের জীবনী এবং স্বর্গীয় ব্যারিষ্টার উমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের জীবনী ধারাবাহিকরূপে প্রকাশ হইতেছে। বর্ত্তমান কালের ভাবী ব্যারিষ্টার প্রভৃতি উমেশচন্দ্রের জীবনী দ্বারা উপকৃত হইবেন।

গৃহস্থমঙ্গল।—সম্পাদক—শ্রীঅশ্বিনীকুমার চট্টোপাধ্যায়।

পল্লীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র। প্রজা ও জমিদার প্রবন্ধে শ্রীনলিনীরঞ্জন সরকার খুব সরল ভাষায় উভয়ের মধ্যে বর্ত্তমান আইন অনুসারে সম্বন্ধ বুঝাইয়া দিয়াছেন। টোটকা চিকিৎসা—নূতন সংগ্রহ দিয়া জনসাধারণের বিশেষ উপকার করিতেছেন। 'তেলাকুচা পাতার গুপ্ত কথায়' প্রকৃতই উহার অনেক অজ্ঞাত গুপ্ত রহস্য প্রকাশ করিয়াছেন। আমাদের দেশের একএকটী বৃক্ষ বা লতায় কতবিধ ঔষধ যে লুক্কায়িত আছে তাহা বলা যায় না। বীমা সমর্থন করিয়া একটী সুন্দর প্রবন্ধ প্রকাশিত হইয়াছে। সম্পাদক মহাশয়ের ন্যায় আমরাও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় বীমা সম্পূর্ণ সমর্থন করি। পেটের অসুখে হোমিওপ্যাথিক মতে একটী চিকিৎসা-বিধান প্রদত্ত হইয়াছে। গৃহস্থের মঙ্গলসাধক সকল বিষয়ই সম্পাদক মহাশয় দিতে উদ্যুক্ত দেখিয়া সুখী হইলাম। একটী গল্পচ্ছলে অল্পজমিতে চাষ হইতে কি উপকার হইতে পারে বলিয়াছেন—তাহার সার মর্ম্ম ৩৬০ কলা-গাছে দৈনিক ১৷৷০ টাকা আয় নিশ্চিত। কৃষির মাসিক কার্য্য লেখা হইয়াছে। কুটীরশিল্প ও পল্লীগঠনের উপ-কারিতার একটী সুন্দর দৃষ্টান্ত দিয়াছেন। মধুরেণ সমাপয়েৎ—সর্ব্বশেষে সুন্দর কয়েকটী সৎকথা প্রদত্ত হইয়াছে। পত্রিকার দীর্ঘজীবন কামনা করি।

The Message—October—Editor Sadananda.

এই সংখ্যার সঙ্গে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চির-প্রসিদ্ধ উপদেষ্টার চিত্র বিতরিত হইয়াছে। ইহার প্রথম অবধি শেষ পর্য্যন্ত উদ্ধৃত ও নূতন প্রবন্ধের ভিতর দিয়া সম্পাদক মহাশয়ের ধর্ম্মভাব ফুটিয়া উঠিয়াছে।

December—এই সংখ্যায় রাজনীতিকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্ছিন্ন করার অকর্ত্তব্যতা বিষয়ে কয়েকজন মহাপুরুষের উক্তি সংগৃহীত হইয়াছে। তুর্কী প্রভৃতি নবজাগ্রত দেশের কার্য্যই এই অকর্ত্তব্যতাবিষয়ে সাক্ষ্য দিতেছে। অধ্যাপক বাস্বনীর ধর্ম্ম ও জাতি সংগঠন বিষয়ক উপদেশ বড় ভাল লাগিল। শ্রীগৌরীপ্রসাদ মজুমদার লিখিত

ভগবানে বিশ্বাস বিষয়ক প্রবন্ধটী বিশ্বাসী ভক্তের উপযোগী হইয়াছে। ডাঃ ডি, এন, মৈত্রের লিখিত সমাজসেবার প্রথম কিস্তি বাহির হইয়াছে। জনসেবাবিষয়ক প্রবন্ধ আর একটু বেশী প্রকাশ করিলে ভাল হয়। আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আশীর্ব্বাদ করি শ্রীসদানন্দের সাধু চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সফল হউক।

বসুধারা।—অগ্রহায়ণ—সম্পাদক শ্রীকালিদাস রায় ও শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী।

বাল্যবিবাহ প্রবন্ধটী সুলিখিত। তাহার উপসংহার এই যে—"বাল্যবিবাহ অর্থে শিশু বিবাহ নহে। দ্বাদশ হইতে চতুর্দ্দশ বৎসর বয়সের মধ্যে নারীগণের এবং বিংশতি হইতে চতুর্ব্বিংশতি বয়স পর্য্যন্ত পুরুষগণের বিবাহকাল নির্দ্দিষ্ট হইলেই মোটের উপর ভাল হয়"। আমরাও সুশ্রুত এবং মনুসংহিতা অনুসরণ করিয়া বলিতে চাই যে, আমাদের দেশে শাস্ত্রের ভ্রান্ত ব্যাখ্যা অনুসরণ করিয়া যে গৌরীদান প্রথা সমাজে প্রচলিত হইয়াছে, তাহা বংশকে নির্ম্মূল করিবার অন্যতর উপায়, এবং ষোড়শ হইতে উনিশ বৎসর নারীগণের এবং চব্বিশ হইতে বত্রিশ বৎসর পুরুষগণের উপযুক্ত বিবাহকাল। 'প্রাচীন ভারতে লোকব্যবহার' প্রবন্ধে ব্রাহ্মণাদি বর্ণের ব্যবহার সম্বন্ধে অনেক reference পাওয়া যায়। তাহার অনেকগুলিই স্বভাবতই অনেক পুরাতন। 'চিকিৎসাবিপত্তি'তে অ্যালোপ্যাথিক চিকিৎসার শ্রেষ্ঠত্ব গল্পচ্ছলে দেখানো হইয়াছে। এভাবে সকল চিকিৎসাপদ্ধতিরই শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপন্ন করা যাইতে পারে। 'কেরাণীর স্বপ্ন' কবিতাটী মন্দ লাগিল না। 'জীবনযজ্ঞ' কবিতাটীও সুন্দর হইয়াছে।

ব্যবসা ও বাণিজ্য।—অগ্রহায়ণ—সম্পাদক শ্রীশচীন্দ্রপ্রসাদ বসু।

সাবান প্রস্তুত প্রণালী প্রবন্ধের শেষ অংশে Lever Soapএর জন্মদাতা William Hesketh Leverএর উন্নতির কথা ব্যবসায়েচ্ছুদিগের বিশেষ শিক্ষাপ্রদ। সোডা ও লেমনেডের ব্যবসায় প্রবন্ধে ঐ দুই বস্তু কার্য্যত প্রস্তুত করিবার প্রণালী দেওয়া হইয়াছে। আমাকে এক ইংরাজ বন্ধু বলিয়াছিলেন এই ব্যবসায়ে অল্পব্যয়ে অত্যধিক লাভ হয়। উৎসাহী যুবকেরা পাঁচজনে মিলিয়া এই ব্যবসায় করিয়া দেখিলে মন্দ হয় না। পিতল ও কাঁসার বাসনের ব্যবসা প্রবন্ধে ঐ ব্যবসা সম্বন্ধে অনেক তথ্য সংগৃহীত হইয়াছে। কোথায় কি পাওয়া যায় জানিলে ব্যবসায়ের বিশেষ সুবিধা হয়। বীমা প্রসঙ্গে যে সকল বস্তুর আমদানী ও রপ্তানী তালিকা দেওয়া হইয়াছে, তাহা দেখিয়া রাষ্ট্রনীতিজ্ঞদের উচিত আলোচনা করা যে কোন্ দ্রব্য দেশে উৎপন্ন করিলে দেশ লাভবান হয়—যথা, ধাতব পদার্থ, তৈল ইত্যাদি। তৈলের আমদানী বেশী হয় কেন? oilman's store আমদানী প্রায় দ্বিগুণ বাড়িয়াছে—হায়! তামাকে দেড়া। সাবান দেড়া। আমরা অনেক স্থলেই বিদেশকে পয়সাও দিতেছি, আবার সেই পয়সা দ্বারা রোগও কিনিয়া আনিবার ব্যবস্থা করিতেছি। 'বাংলার আর্থিক অবনতি ও তাহার প্রতিকার' প্রবন্ধে প্রতিকারের উৎকৃষ্ট উপায় যে দেখানো হইয়াছে তাহা বলিতে পারি না। কথায় কথায় জমিদারদিগের উপর ঢিল ছুড়িলে লাভ নাই, বরঞ্চ লোকসান। যাঁহারা বর্ত্তমানে জমিদারদিগের অবস্থা জানেন না, তাঁহারাই অযথা জমিদারদিগের প্রতি অপবাদ ঢিল ছুড়েন। 'কমলা পাউডারে' বেশ একটী ব্যবসায়ের পথ দেখানো হইয়াছে। 'স্বদেশী ব্যাঙ্ক' প্রবন্ধে সম্পাদক তাহাদের পক্ষে অনেক কথা বলিয়াছেন সত্য, কিন্তু আমাদের অভিজ্ঞতায় পাইয়াছি যে, স্বদেশীয়েরা, বিশেষত বাঙ্গালীরা স্বদেশী ব্যাঙ্ক প্রভৃতিতে বেশী সুদের লোভে অনেক সময়েই প্রতারিত হয়। বিলাতী ব্যাঙ্কেরও যে প্রতারণা করার অপবাদ দেওয়া যায় না তাহা নহে, কিন্তু তুলনায় অনেক কম। উহাদের অস্থিতে mercantile morality বলিয়া একটী পদার্থ ingrained। আমাদের সামান্য পুঁজি যদি স্বদেশপ্রিয়তার কারণে স্বদেশী ব্যাঙ্কে রাখিয়া নষ্ট করি, তখন উপায়? 'আটা বালাম চাউল' প্রবন্ধের সহিত আমরা একমত—অল্পমূল্যে ঘরে ঘরে একটী কল কিনিয়া উৎকৃষ্ট আটা ভাঙ্গিয়া আহারে বল লাভ হইবে। 'আলুর চাষ'—আমাদের মনে হয়, এদেশে যে সকল দ্রব্যের চাষ হইতে পারে, তাহার একএকটী দ্রব্য লইয়া তাহার চাষের প্রণালী সংক্ষেপে কিন্তু নিখুঁত ভাবে লিখিয়া দুচার পয়সায় বিক্রয়ার্থ পৃথক ছাপাইলে ভাল হয়। 'ব্যবসায়ের ডাইরেক্টরি' ব্যবসাবাণিজ্যের বড়ই উপযোগী।

শ্রদ্ধাঞ্জলি।

(শ্রীক্ষেমেন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এস্-সি, বি-এল)

এই জগতে আনন্দের সঙ্গে ব্যথার বোধ হয় অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ। সেই জন্য প্রায়ই দেখা যায় যেখানেই আনন্দের কলহাস্য উঠিতেছে সেখানেই সেই হাস্যের ভিতর দিয়া ব্যথার করুণ তান প্রবাহিত হইতেছে। আমাদের পরিবারেও এই নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই।

মাঘোৎসবটি আমাদের পরিবারে এক বিশেষ আনন্দের ব্যাপার। শীতের আরম্ভের সঙ্গে সঙ্গেই হেমন্ত ঋতু আমাদের নিকট মাঘোৎসবের এই আনন্দ বার্ত্তা বহন করিয়া আনে কিন্তু আনন্দবার্ত্তার সঙ্গে সঙ্গেই আজ কয়েক বৎসর যাবৎ এই হিম-ঋতুই আমাদের নিকট বিয়োগ-ব্যথার বার্ত্তাও বহন করিয়া আনিতেছে।

শীতের সময়েই আমরা মহর্ষিকে হারাইয়াছি—মহর্ষির পুত্রগণকেও শীতের সময়েই আমরা একে একে হারাইতেছি। এই ব্যথার শেষ আঘাত আমরা গত ১৩৩২ সালের ৪ঠা মাঘ পাইয়াছি—যখন স্বপ্নপ্রয়াণের কবি আমাদিগকে পরিত্যাগ করিয়া অনন্তের অভিমুখে মহাপ্রয়াণ করিলেন।

তাঁহার সম্বন্ধে আমার বিশেষ কিছুই মনে পড়ে না—কেবল একটী বিষয় মনে আঁকা আছে।

সেদিন খবর আসিল, বড়দাদামহাশয় কলিকাতায় আসিতেছেন। কলিকাতায় আসিলে আমরা তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তখন তিনি অসুস্থ। দেখিলাম, তিনি আরামচৌকিতে হেলান দিয়া শুইয়া আছেন। কিছুক্ষণ পরে পূজ্যপাদ পিতৃদেব (ক্ষিতীন্দ্রনাথ) তাঁহার সঙ্গে দেখা করিতে আসিলেন। দেখিলাম, তিনি এমন স্নেহপ্রবণ যে বোলপুরে থাকার কারণে তাঁহার সহিত পিতৃদেবের অধিক সাক্ষাৎ হয় না বলিয়া অত অসুস্থতা সত্ত্বেও তাঁহার সঙ্গে নানা বিষয়িণী আলোচনা দুর্ব্বলস্বরে করিতে লাগিলেন। দুর্ব্বল শরীরে অত কথা কহানো অকর্ত্তব্য বিবেচনায় বাবামহাশয় বিদায় লইতে চাহিলেও তিনি বিদায় দিতে চাহিতেছিলেন না। পিতৃদেব মহর্ষির কীর্ত্তি তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সম্পাদনভার গ্রহণ করিয়া তাহাকে সঞ্জীবিত রাখিবার জন্য চেষ্টা করিতেছেন বলিয়া অতিশয় হর্ষ প্রকাশ করিলেন। দ্বিজেন্দ্রনাথও এক সময়ে এই পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন।

তাঁহার স্নেহপ্রবণতার এই এক নিদর্শন প্রত্যক্ষ করিলাম। এতদ্ভিন্ন পূজনীয় পিতৃদেবের নিকট এই সম্বন্ধে কত গল্পই না শুনিয়াছি।

পূজ্যপাদ পিতামহদেব স্বর্গীয় হেমেন্দ্রনাথ যতদিন জীবিত ছিলেন ততদিন আমাদের পরিবারের উপযুক্ত শিক্ষাবিধানের ভার তিনিই গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি বুঝিয়াছিলেন যে, আমাদের দেশকে বর্ত্তমান হীন অবস্থা হইতে উন্নতির পথে পরিচালিত করিবার পক্ষে যথাযুক্ত ভাবে জার্ম্মানদিগের অনুরূপ নিয়মানুবর্ত্তিতাই সর্ব্বোৎকৃষ্ট। জার্ম্মানি পূর্ব্বকালে যে ইউরোপের রাজশক্তির মধ্যে গণ্যই হইত না, কেবলমাত্র এই কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার (ডিসিপ্লিনের) ফলেই আজ ইউরোপের রাজশক্তির মধ্যে আসন পাইয়াছে। সেইজন্য ৺হেমেন্দ্রনাথ ডিসিপ্লিনের বা নিয়মানুবর্ত্তিতার উপকারিতা বুঝিয়া নিজের পুত্রকন্যাগণকে এবং তাঁহার দায়ীত্বাধীন বালকবালিকাদিগকে তদনুযায়ী গড়িয়া তুলিবার প্রয়াস পাইতেন। দাদামহাশয়ের শিক্ষাধীন থাকা কালে ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথপ্রমুখ সকলকেই এইরূপ কঠোর নিয়ম পালন করিতে হইয়াছিল, এবং যেমন কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলেই আজ জার্ম্মানি অসংখ্য খ্যাতনামা সুপণ্ডিত সন্তান সন্ততি পাইয়াছে, ঐরূপ নিয়মানুবর্ত্তিতার ফলেই—বাল্যে অভ্যস্ত সদভ্যাস সমূহের ফলেই—তেমনি আজ বাংলাদেশও ৺জ্যোতিরিন্দ্রনাথকে, রবীন্দ্রনাথকে পাইয়াছে।

এই ডিসিপ্লিন, ৺হেমেন্দ্রনাথ যে আপনার গৃহমধ্যেও বিশেষ ভাবে প্রবর্ত্তিত করিয়াছিলেন তাহা বলা বাহুল্য। ইহার উপকারিতা বুঝিয়া সেই সময়ে বড়দাদামহাশয়ও (৺দ্বিজেন্দ্রনাথ) একবার আপনার এক পুত্র ও এক কন্যার শিক্ষার ভার দাদামহাশয়ের (৺হেমেন্দ্রনাথ) উপর অর্পণ করেন। কিন্তু হেমেন্দ্রনাথের কঠোর নিয়মানুবর্ত্তিতা তাঁহারা সহ্য করিতে পারিলেন না। তাহা দেখিয়া স্নেহপ্রবণ দ্বিজেন্দ্রনাথ, নিয়মানুবর্ত্তিতার প্রয়োজন ও উপকারিতা বুঝিতে পারিলেও তাঁহাদিগকে আর হেমেন্দ্রনাথের নিয়মাধীনে রাখিতে পারিলেন না—এতই অধিক ছিল তাঁর স্নেহপ্রবণতা।

তাঁহার এই স্নেহশীলতা তাঁহার প্রতি কার্য্যে সুব্যক্ত হইত। আমার বোধ হয় পাখীরা পর্য্যন্ত তাহা বুঝিতে পারিয়াই যেন নির্ভয়ে তাঁহার হাত হইতে খাদ্য গ্রহণ করিত—কাটবিড়ালী তাঁহার স্নেহপ্রবণতায় নির্ভর হইয়াই বোধ হয় তাঁহার সর্ব্বাঙ্গে আনন্দে বিচরণ করিত।

হৃদয়ে এই গভীর প্রেমের মূলে যে তাঁহার হৃদয়ের সরল ভাব ও শিশুসুলভ সরলতা বিদ্যমান ছিল তাহা নিঃসন্দেহ। তাঁহার প্রাণখোলা হাসি যে শুনিয়াছে সে-ই মুগ্ধ হইয়াছে। পূজ্যপাদ পিতৃদেব বলেন যে, স্বর্গীয় রাজনারায়ণ বসু মহাশয় ব্যতীত আর কাহাকেও সেরূপ প্রাণখোলা হাসি হাসিতে শোনা যায় নাই। তাঁহার সেই হাসি শুনিয়া কি কেহ কল্পনাও করিতে পারিত যে, এই শিশুর ন্যায় সরলপ্রাণ ও সরলহৃদয় দ্বিজেন্দ্রনাথই নিরস কঠিন তত্ত্ববিদ্যার আলোচনাকারী দ্বিজেন্দ্রনাথ?

এতকাল পরে, এই প্রেমের—এই সারল্যের উৎস চিরকালের জন্য রুদ্ধ হইল। আশা ছিল, একদিন তাঁহার নিকট যাইয়া তাঁহার জীবনের কথা জানিব—ইংরাজী সভ্যতার সহিত মুসলমান সভ্যতার প্রথম সংঘর্ষের ইতিহাস জানিব—কিন্তু সে আশা আর পূর্ণ হইল না। তাঁহার জন্য আমি শোক করিব না। যে মঙ্গলময়ের মঙ্গল হস্ত নিয়ত এই পরিভ্রাম্যমাণ সংসারচক্রকে বিঘূর্ণিত করিতেছে—যাঁহার রাজ্যে নিবিড়গহনেও বৃক্ষের একটী পত্রও বিনা উদ্দেশ্যে পতিত হয় না—তিনিই কোন মহান্ উদ্দেশ্য সাধনের জন্যই আজ আমাদের পূজনীয় বড়দাদামহাশয়কে আমাদের মধ্য হইতে লোকান্তরে অবসৃত করিয়াছেন। প্রেমময়ের মঙ্গল উদ্দেশ্য মাথায় রাখিয়া আজ ব্যথাকাতর হৃদয়ে পরলোকগত বড়দাদামহাশয়ের নামে তাঁহার অনুপযুক্ত এই শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি। স্বর্গ হইতে তিনি ইহা গ্রহণ করিয়া আমায় ধন্য করুন।

—

সংবাদ।

উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজ।—উল্টাডাঙ্গা ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ বার্ষিক উৎসব উপলক্ষে গত ৮ই পৌষ রবিবার প্রাতরুপাসনার ভার অর্পিত হইয়াছিল পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের উপর। তিনি উক্ত দিবস প্রাতঃকাল ৮।০ ঘটিকায় বেদীগ্রহণ পূর্ব্বক যথারীতি উপদেশ ও উপাসনাদি করিয়াছিলেন। কয়েকটী বালিকা সঙ্গীত করিয়া সমবেত উপাসকগণের অন্তঃকরণ মুগ্ধ করিয়াছিলেন।

শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজ।—গত ১০ই পৌষ মঙ্গলবার শ্রীরামপুর ব্রাহ্মসমাজের সপ্তষষ্টিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসব যথারীতি সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। উক্ত দিবস প্রাতঃকালে কলিকাতা বেনেপাড়া লেনের মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট দীক্ষিত ব্রাহ্ম ৺তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের পুত্রগণের আহ্বানে এবার তাঁহাদের বাসভবনে উৎসবের আয়োজন হইয়াছিল। প্রভাতে বেলা ৮ ঘটিকায় প্রাতরুপাসনা আরম্ভ হয়। শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী প্রেমানন্দের উদ্বোধন ও উপদেশ দুইটী যথারীতি বিবৃত হইয়াছিল। শ্রীসুশীলকুমার গুপ্ত স্বাধ্যায়াদি পাঠ করেন। উপাসনান্তে গঙ্গায় নৌকাবিহারে কয়েকজন উপাসকের সহিত স্বামী প্রেমানন্দ রাজা রামমোহন রায় সম্বন্ধে দীর্ঘক্ষণ প্রসঙ্গ করিয়াছিলেন। সান্ধ্য উপাসনা পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ এবং সঙ্গীত করিয়াছিলেন শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র বড়াল।

নিখিল ভারতীয় ব্রাহ্মসম্মিলন।—এবার কলিকাতা নগরীতে কংগ্রেস-সপ্তাহে গত ১২ই ও ১৩ই পৌষ, বৃহস্পতি ও শুক্রবার দিবসদ্বয়ব্যাপী 'নিখিলভারতীয় ব্রাহ্মসম্মিলনের' (All India Thiestic Conferance) বাৎসরিক অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। সভাপতি হইয়াছিলেন আমেরিকার একেশ্বরবাদী সম্প্রদায়ের অন্যতম অগ্রণী অধ্যাপক ডাঃ এফ, সি, সাউথ ওয়ার্থ এম-এ, ডি-ডি, এল-এল-ডি মহোদয়। সিটি কলেজের ত্রিতল গৃহে বৃহস্পতিবার প্রাতঃকাল ৮ ঘটিকায় ব্রহ্মোপাসনা পূর্ব্বক সম্মিলনের উদ্বোধন হয়। উক্ত দিবস সন্ধ্যা ৬টায় অভ্যর্থনাসমিতির সভাপতি অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত হেরম্বচন্দ্র মৈত্র ও মাননীয় শ্রীযুক্ত সভাপতিমহাশয় তাঁহাদের জ্ঞানগর্ভ সুচিন্তিত অভিভাষণ দুইটী পাঠ করেন। পরদিবস শুক্রবার প্রাতঃকাল ৮ঘটিকায় ডাঃ সাউথ ওয়ার্থ ইংরাজী ভাষায় ব্রহ্মোপাসনা করেন। সন্ধ্যা ৬ঘটিকায় পুনর্ব্বার সম্মিলনের অধিবেশন আরম্ভ হয়। একটী বক্তৃতা অন্তে শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও শ্রীসীতানাথ তত্ত্বভূষণ মহাশয়ের দুইটী প্রবন্ধ পঠিত হয়। ক্ষিতীন্দ্রবাবু সম্মিলনে উপস্থিত হইতে না পারায় তাঁহার ইংরাজী নিবন্ধটী (The Message of Freedom) সম্মিলনের অন্যতম সম্পাদক শ্রীধীরেন্দ্রনাথ সেন মহাশয় উহা পাঠ করেন এবং সভাস্থলে উহা বিতরিত হয়।

নবনবতিতম সাম্বৎসরিক ব্রহ্মোৎসবের

কার্য্যতালিকা।

৬ই মাঘ, ১৯শে জানুয়ারী শনিবার—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রাহ্মমন্দিরে (৮৯নং মেছুয়াবাজার ষ্ট্রীট, ঝামাপুকুর) সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দান" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

৭ই মাঘ, ২০শে জানুয়ারী রবিবার—প্রাতে ৮ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা হইবে। পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ "ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা" বিষয়ে উপদেশ দিবেন। সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় ভবানীপুর সম্মিলন সমাজে (১নং ডাঃ রাজেন্দ্র রোড, ভবানীপুর) শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপাসনা করিবেন ও "সত্যধর্ম্মের বীজমন্ত্র ও মৈত্রী সাধন" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

৮ই মাঘ, ২১শে জানুয়ারী সোমবার—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা উপলক্ষে শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস "ব্রহ্মসাধন" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

৯ই মাঘ, ২২শে জানুয়ারী মঙ্গলবার—সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে উপাসনা উপলক্ষ্যে আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ "ব্রাহ্মসমাজ ও বর্ত্তমান ভারত" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

১০ই মাঘ, ২৩শে জানুয়ারী বুধবার সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ-মন্দিরে ব্রহ্মোৎসবের বিশেষ উদ্বোধন উপলক্ষে আচার্য্য চিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় উপাসনা করিবেন ও "ধর্ম্মতরঙ্গ" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

১১ই মাঘ, ২৪শে জানুয়ারী বৃহস্পতিবার—প্রাতে ৮ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা উপলক্ষ্যে আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর "নবজাগরণ" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

১২ই মাঘ, ২৫শে জানুয়ারী সন্ধ্যা ৬॥০ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে শ্রীসদানন্দ হিন্দীতে ব্রহ্মোপাসনা করিবেন ও "স্বার্থ ও পরমার্থ" বিষয়ে উপদেশ দিবেন।

সর্ব্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর।

আদিব্রাহ্মসমাজ।

আয় ও ব্যয়।

আশ্বিন মাস, ১৮৫০ শক।

আয়	৯৩৭।৶০
পূর্ব্ব স্থিত	৬৩
সমষ্টি	৯৪৩৶৬
ব্যয়	৭৩৬৸/৬
স্থিত	২০৬॥৵০

আয়

ব্রাহ্মসমাজ।

মাসিকদান	৪০০৲
হাওলাত আদায়	১৩৲
গচ্ছিত	৩০২।০
সমষ্টি	৭১৫।০

তত্ত্ববোধিনী।

বকেয়া	৩০/০
হাল	২৭৲
বিজ্ঞাপন	১৮॥০
মাশুল	২৸/০
সমষ্টি	৭৮।৵০

যন্ত্রালয়।

অপরের পুস্তক মুদ্রণ	১১১৸৵৩
কাগজের মূল্য	৭৸/৯
দপ্তরী	১৭।০
সমষ্টি	১৩৭৲

পুস্তকালয়।

সমাজের পুস্তক	৫।০
মাশুল	।/০
গচ্ছিত	১৲
সমষ্টি	৬৸/০
সর্ব্বসমষ্টি	৯৩৭।৶০

ব্যয়

ব্রাহ্মসমাজ।

আচার্য্যের পাথেয়	৩৫৲
গায়ক	৩০৲
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বেহারা	১২৲
মেথর	২।০
মাশুল	৸৵০
পাখাপুলি	৸০
ইলেকট্রিক	৩।০
কেরোসিন	॥৶০
হাওলাত প্রদান	১৭৲
সসপেন্স	২।/০
সসপেনশোধ	৫৲
বারবরদারী	১৸০
গচ্ছিত	২৯০৸০
বিবিধ	।৶৬
সমষ্টি	৪১৭।/৬

তত্ত্ববোধিনী।

কাগজের মূল্য	৫০/০
প্রবন্ধ	১২৲
মাশুল	৬৸৵৬
কর্ম্মাধ্যক্ষ	৫৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
বিজ্ঞাপনের কমিশন	॥০
মূল্য আদায়ের কমিশন	৪।০
বিবিধ	১৩
সমষ্টি	৮৯৸০

যন্ত্রালয়।

প্রিণ্টার	২৮৲
কম্পোজিটর	৪৭৲
প্রেসম্যান	২০৲
ইঙ্কম্যান	১২৲
কাগজতোলা	৬৲
হিসাবরক্ষক	১০৲
প্রুফকাগজ	৩।৶০
ছাপার কাগজ	১৬।৵৯
কালি	১৸০
প্রেসের তৈল	॥৶৩
তামাক	।৶৬
রুলঢালা	।৩
অক্ষর ক্রয়	৩৶০
মাশুল	/৬
অতিরিক্ত পারিশ্রমিক	২০।৵৬
লেই জন্য ময়দা	৶৩
দপ্তরী	২৬৲
বিবিধ	৩/০
সমষ্টি	১৯৯৲

পুস্তকালয়।

মাশুল	।০
গীতারহস্যের মূল্য বাবত	৩০॥০
সমষ্টি	৩০৸০
সর্ব্বসমষ্টি	৭৩৬৸/৬

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্যবেদান্ততীর্থ

কর্ম্মাধ্যক্ষ।

ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা প্রাচীন মাসিক

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ **তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা** কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

সম্পাদক—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাঃ শ্রীযুক্ত বনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি. এস্ সি।

(৮৬ বৎসরে চলিতেছে)

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ-প্রতিষ্ঠিত এই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা ভারতের সমস্ত মাসিকের আদিজননী। গত বৈশাখে ইহা ৮৬ বৎসরে পদার্পণ করিয়াছে। যে যে মনীষী সাহিত্যিকগণ বাঙ্গলা ভাষাকে গড়িয়া তুলিয়াছেন, সেই অক্ষয়কুমার দত্ত ও ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর হইতে আরম্ভ করিয়া রবীন্দ্রনাথ পর্য্যন্ত প্রত্যেকের রচনা যে কেবল ইহাতে স্থান পাইয়াছে তাহা নহে, সকলেই সাময়িকভাবে সম্পাদকীয় সম্পর্কে ইহার সহিত সম্মিলিত হইয়াছেন। এই সকল দিক দিয়া তত্ত্ববোধিনীর বঙ্গসাহিত্যে একটী ঐতিহাসিক মূল্য গড়িয়া উঠিয়াছে। ইহা ব্যতীত, গত ১২। ১৩ বৎসর কাল পরলোকগত ৺সত্যেন্দ্রনাথ ঠাকুর, প্রবীণ সাহিত্যিক শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর এবং ডাক্তার বনওয়ারিলাল চৌধুরীর সম্পাদকতায় একান্ত উদার ও অসাম্প্রদায়িকভাবে তত্ত্ববোধিনী যে সমাজহিতকর সৎসাহিত্যের সৃষ্টি করিতেছেন, আশা করি, তাহা সুধীবর্গের দৃষ্টি অতিক্রম করে নাই।

মূল্য বার্ষিক মায় ডাকমাশুল ৩৷৴০ মাত্র ; অসমর্থ পক্ষে এবং অধ্যাপক, ছাত্র ও মহিলাদের জন্য ২৷৴০ মাত্র।

১৭৬৯ শক হইতে ১৮৪৯ শক পর্য্যন্ত (কয়েক শক বাদে) যে সকল তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা বিক্রয়ার্থ পাওয়া যাইবে, তৎসমুদয়ের প্রতি বৎসর ৪৲ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইবে।

আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথের নূতন পুস্তক

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা।

দ্বিতীয় সংস্করণ।

(মান্যবর জষ্টিশ শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়ের অভিমত সহ)

"গ্রন্থের উদ্দেশ্য মহৎ—ভাষা প্রাঞ্জল। গ্রন্থখানিতে জটিল শাস্ত্রীয় কথার অনুশীলনে মৌলিকতা বিশেষভাবে পরিলক্ষিত হয়। গ্রন্থখানি সমাজ ও ধর্ম্মতত্ত্বানুসন্ধিৎসুগণের সম্মুখে সরল ও সুন্দর ভাবে চিন্তার নূতন পথ প্রদর্শন করিয়াছে ও জ্ঞানের নূতন আলোক ছড়াইয়া দিয়াছে।" এই গ্রন্থপাঠে পাঠক মাত্রেই বিশেষরূপ উপকৃত হইবেন।

পাঁচখানি হাফ্‌টোন চিত্র সহ ১৬ পেজী রয়াল আকারে ৪৪৪ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। উৎকৃষ্ট সবুজ কাপড়ে বাঁধা। মূল্য ১৸০ আনা মাত্র, ডাঃ মাশুল ।৴০ আনা।

শ্রীভগবৎকথা

ক্ষিতীন্দ্রবাবুর এই সুন্দর পুস্তকখানির এইবারে তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশিত হইল। বালক-বালিকাদের জন্য অসাম্প্রদায়িকভাবের এমন উপাদেয় গ্রন্থ বাঙ্গালা ভাষায় আর একখানিও নাই। মূল্য ॥০ আনামাত্র।

"বালকদিগকে ধর্ম্ম অথবা ঈশ্বরের স্বরূপ শিক্ষাদানকল্পে বঙ্গীয় সাহিত্যে এমন উপাদেয় গ্রন্থ আর নাই বলিলেই হয়।" ব্রহ্মবাদী।

"Simplest style possible and in a manner well calculated to be effective."—Indian Mirror.

"ভাষা সরল···সুলিখিত ও পড়িবার যোগ্য।" এডুকেশন গেজেট।

"The book is fit for sudy in the primary schools, as it is nonsectarian from beginning to end."—Amrita Bazar Patrika.

"One great merit of the book is that it is written from a purely nonsectarian standpoint, and is just the book suitable for adoption as a text book in schools for boys and girls in Bengal. "The book will prove profitable reading to grown up people as well, helping the mystic, agnostic or the atheist to systematise, reason out or overhaul his faith in God or unfaith as the case may be."

Forward—9-9-2.

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড ও প্রধান প্রধান পুস্তকালয়ে প্রাপ্তব্য।

শারদীয়া সংখ্যা ॥ শারদীয়া সংখ্যা ॥

৫ম বর্ষ

(বাঙ্গলার সঙ্গীত বিষয়ক একমাত্র মাসিক পত্রিকা)

সম্পাদক— সঙ্গীত বিভাগ :—সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ও শ্রীশরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় (রূপদক্ষ)
সাহিত্য বিভাগ :—ডাঃ কালিদাস নাগ এম, এ, ডি, লিট (প্যারিস)

বাঙ্গালার প্রসিদ্ধ ওস্তাদ গুণীমণ্ডলীর গীতবাদ্য-বিষয়ক সুচিন্তিত প্রবন্ধ, স্বরলিপি, যন্ত্র ও কণ্ঠ-সঙ্গীত এবং সেতার, এস্রাস, বেহালা, হারমোনিয়ম, মৃদঙ্গ ও তবলা প্রভৃতি সকল প্রকার যন্ত্র ঘরে বসিয়া শিখিবার সহজ প্রণালীসমূহ প্রতি সংখ্যাতে বিস্তৃতভাবে আলোচিত হইতেছে।

ইহা ছাড়া সুখপাঠ্য গল্প ও উপন্যাস, বহু ত্রিবর্ণা ও বিবিধ একবর্ণা ছবিতে সুসজ্জিত হইয়া প্রতি সংখ্যা বর্দ্ধিত কলেবরে বাহির হইতেছে।

প্রতি সংখ্যা ।৵০ বার্ষিক মূল্য ৩৷৵০ আনা মাত্র। আফিস :—৮ সি লালবাজার ষ্ট্রীট কলিকাতা।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির মুখপত্র

বঙ্গলক্ষ্মী

অগ্রহায়ণ সংখ্যা হইতে ৪র্থ বর্ষে পদার্পণ করিবে

বঙ্গের শ্রেষ্ঠ সাহিত্যিকগণের প্রবন্ধ, গল্প ও কবিতায়

এবং চিত্রে সুশোভিত হইয়া প্রকাশিত হইতেছে।

শ্রীমতী হেমলতা দেবী সম্পাদিত।

মহিলাদের উপযোগী এরূপ সর্ব্বাঙ্গসুন্দর মাসিকপত্রিকা ইতিপূর্ব্বে বঙ্গভাষায় প্রকাশিত হয় নাই। কন্যা, বধূ, গৃহিণী, প্রত্যেকের অবশ্য পাঠ্য। এই পত্রিকা পাঠ করিলে মেয়েরা ঘরে বসিয়া ভারতের এবং সমগ্র জগতের মহিলাদের শিক্ষা, সভ্যতা ও উন্নতির সহিত পরিচিত হইতে পারিবেন। আর বাংলার গ্রামে গ্রামে মহিলা-সমিতির ভিতর দিয়া যে কর্ম্মের স্রোত প্রবাহিত হইয়া জাতীয় জীবনকে পুনরুজ্জীবিত করিতেছে, তাহারও সহিত সংযোগ স্থাপন করিতে পারিবেন।

বার্ষিক মূল্য সডাক ৩৲ ; 'ভিঃ পিঃতে' ৩॥০

গ্রাহক হইবার জন্য নিম্নলিখিত ঠিকানায় পত্র লিখুন :—

ম্যানেজার, 'বঙ্গলক্ষ্মী',
৪৫, বেনিয়াটোলা লেন, কলিকাতা।

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ
ঠাকুর কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—দ্বিতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০২৬ — মাঘ

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ং
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে — **মাঘোৎসব সংখ্যা** — চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫। ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

মঙ্গল আহ্বান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-স্বজন সকলকে আহ্বান করিয়া বলিতেছি—উত্থান কর, জাগ্রত হও এবং শ্রদ্ধা-প্রীতির পুষ্পাঞ্জলি ভগবানের চরণে নিবেদন করিয়া ধন্য হও। যে পবিত্র পুরুষের সান্নিধ্য উপভোগ করিবার জন্য আমরা নিত্যই প্রতীক্ষা করি, আজ সেই পরম পুরুষ আমাদের পূজা গ্রহণের জন্য এখানে উপস্থিত। এই পবিত্র স্থানে, এই পবিত্র সময়ে সেই চিরসঙ্গী চিরসখা পিতামাতা পরমেশ্বরের জয়গান করিয়া জীবনকে ধন্য কর। আজ আমাদের প্রাণমন তাঁহার চরণ স্পর্শ করিবার উপযুক্ত হোক। তাঁহাকে প্রাণের প্রাণ, হৃদয়ের দেবতা বলিয়া অন্তরে উপলব্ধি কর এবং সর্ব্বপ্রকার ভয়ভাবনা হইতে মুক্তিলাভ কর। সুনীল গগনে কোটী সূর্য্য কোটী চন্দ্র যাঁহার দিবানিশি আরতি করিতেছে, আমাদেরও মঙ্গল আরতি তাঁহার চরণবন্দনায় সমুত্থিত হোক।

আজ পরম পুরুষ পরমেশ্বর আমাদের অন্তরে এই বাণী প্রেরণ করিতেছেন—পবিত্র হও, মানবের সেবায় নিরত হও, সকলকে ভ্রাতৃভাবে আলিঙ্গন কর। তাঁহাকে মানবমাত্রেরই একই পিতামাতা জানিয়া তাঁহার মঙ্গলভাবে স্থিরনিশ্চয় হও এবং তাঁহার পবিত্র চরণে আপনাকে নিবেদন করিয়া দাও—তবেই অন্তরে তাঁহার বাণী সুস্পষ্ট হইয়া উঠিবে। আজ সকল কথা, সকল চিন্তা পরিত্যাগ করিয়া তাঁহারই পুণ্যগাথা গান কর, হৃদয়ে আশ্চর্য্য বল পাইবে। তাঁহার চরণে আত্মনিবেদন করিবার পথে যতই অগ্রসর হইবে, তাঁহার প্রেম ততই উপলব্ধি করিবে; ততই তাঁহার মহিমা নয়নের সম্মুখে উদ্ভাসিত হইয়া তোমাকে আত্মবিস্মৃত করিয়া তুলিবে; ততই তাঁহার নিত্যনব রূপ, নিত্যনব সৌন্দর্য্য অন্তরে প্রকাশ পাইবে; ততই তাঁহার নিত্যনব কৃপা, নিত্যনব দান হৃদয়ে উপলব্ধি করিবে; ততই তাঁহার অনাহত সুরে নিত্যনূতন বাণী, নিত্যনূতন সঙ্গীত অন্তরে ধ্বনিত হইয়া উঠিবে।

আমাদের প্রত্যেকেরই তো চতুর্দ্দিকে ঘন অন্ধকার ঘিরিয়া আছে; আমাদের প্রত্যেকেরই তো চতুর্দ্দিকে শতবিধ অশান্তি অমঙ্গল মরণনাশী হস্ত বিস্তৃত করিয়া আছে। কিন্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের নিকট আমরা এই শিক্ষালাভ করিয়াছি যে, শতবিধ অশান্তির মধ্যেও সেই শান্তিসমুদ্রের প্রতি মনকে স্থির রাখিতে হইবে; শত অমঙ্গলের মধ্যেও ভগবানের মঙ্গলহস্ত প্রসারিত দেখিতে হইবে। আমাদের চারিদিকে মৃত্যুর লীলাখেলা দেখিয়া সময়ে সময়ে মন বিকল হইয়া পড়ে বটে এবং প্রাণের ভিতর সংশয় আসে বটে যে, যাঁহার শাসনে এই বিশ্বজগত মঙ্গলভাব অনন্ত প্রত্যক্ষ মূর্ত্তিতে দাঁড়াইয়া আছে, তাঁহার রাজ্যে মৃত্যু এপ্রকার বিকট সংহারমূর্ত্তিতে বিচরণ করে কেন? বিপদের কঠোর কশাঘাত যখন আমাদের প্রাণের উপর কঠিন আঘাত করিয়া আমাদিগকে ব্যথিত করিয়া তোলে; দুঃখশোকের মর্ম্মন্তুদ জ্বালাযন্ত্রণা যখন

আমাদিগকে ক্ষতবিক্ষত করে, তখন মৃত্যুর মধ্যে সেই অমৃতপুরুষের দর্শন না পাওয়ায় আমাদের শ্রদ্ধা ও বিশ্বাস অনেক সময়ে টলমল করে বটে। কিন্তু মৃত্যুর বিভীষিকাকে ছিন্নবিচ্ছিন্ন করিয়া শত অশান্তির মধ্যে হৃদয়ে শান্তি প্রতিষ্ঠিত করিতে পারিলেই ব্রহ্মোপাসনার সার্থকতা।

হৃদয় হইতে সকল সংশয় দূর করিয়া দাও, আতঙ্ক অপসারিত কর। যাঁহার আদেশে সৃষ্টির আদি অবধি জগতসংসার উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে, সেই বিশ্বপতি আমাদিগকে নিয়তই অভয় দিতেছেন এবং আমাদের অন্তরে কোটী সূর্য্যের প্রদীপ জ্বালাইয়া নিত্যই বলিতেছেন যে, এই বিশ্বজগত তাঁহারই রাজ্য। সকল অমঙ্গল, সকল দুঃখ বিপদ, সকল অশান্তি অতিক্রম করিয়া ভগবানের চরণে মনপ্রাণ ঢালিয়া দাও, হৃদয়ের ভয়ভাবনা সমস্তই ভস্মীভূত হইয়া যাক। তাঁহার অনিমেষ নয়ন যখন আমাদের জীবনের প্রতি নিমেষের উপর স্থিরভাবে নিপতিত আছে; যখন আমাদের জীবনের চারিদিকে তাঁহারই পুণ্য আলোকে নিত্য উদ্ভাসিত; সেই মঙ্গলময় অমৃত পুরুষ যখন আমাদের নিত্যসঙ্গী, তখন আমাদের ভয়ের অবসর কোথায়? পিতামাতার নিকটে সন্তান যেমন ভয়হীন হয়, পরমেশ্বরকেও পিতামাতা জানিয়া, তাঁহাকেই একমাত্র সুহৃৎ ও সহায় জানিয়া এবং তাঁহাতেই একান্ত নির্ভর করিয়া সম্পূর্ণ নির্ভয় হও—শান্তি-সমুদ্র পরমাত্মাতে আত্মা সমাহিত করিয়া জীবনকে সার্থক কর।

তাঁহার আশ্রয় লাভ করিলে সত্যই আমাদের কোনই ভয় নাই। এই সংসারে দুঃখশোক যে আসে, তাহা অস্বীকার করি না। কিন্তু যতই কেন দুঃখবিপদ আসুক না, ইহা ধ্রুব সত্য যে, যে দেবদেব আমাদিগকে সৃষ্টি করিয়াছেন, যাঁহার প্রেমপূর্ণ ইঙ্গিতে আমরা সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে চলিবার অধিকার লাভ করিয়াছি, তিনি বিনাশ করিবার জন্য আমাদিগকে সৃষ্টি করেন নাই। তিনি আমাদের স্নেহময়ী জননী। তাঁহারই প্রেমের কণামাত্র লাভ করিয়া জননী স্বীয় জীবনের বিনিময়েও সন্তানের জীবন রক্ষায় পশ্চাৎপদ হন না। সেই স্নেহময়ী জননী সমস্ত দুঃখবিপদ তাঁহার সঞ্জীবনী সুধায় নিশ্চয়ই বিধৌত করিয়া দিবেন। আমরা অনেক সময়ে তাঁহার স্নেহ প্রেম বুঝিতে না পারিলেও আত্মার নিভৃততম প্রদেশে দৃষ্টি স্থির রাখিলেই স্পষ্ট প্রতীতি করি যে, তিনি আমাদের অন্তরতম প্রাণসখারূপে নিত্য স্বপ্রকাশ; তিনি তাঁহার অক্ষয়স্নেহে আমাদিগকে নিত্যই অভিষিক্ত রাখিয়াছেন। সুখসম্পদের ভিতর দিয়া এবং দুঃখবিপদের ভিতর দিয়া তাঁহার মঙ্গলমূর্ত্তিই পরিস্ফুট হইয়া উঠিতেছে। মৃত্যুর বিকট করাল অন্ধকারের ভিতর হইতেও তাঁহারই মঙ্গল জ্যোতি নিত্য প্রকাশ পাইতেছে; তাঁহারই অমৃতভাব নিত্য উৎসারিত হইতেছে। তাঁহারই মঙ্গল বিধানে মৃত্যু আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হয়, আবার তাঁহারই মঙ্গলবিধানে মৃত্যু আমাদের নিকট হইতে দূরে পলায়নও করে। সেই অমৃত পুরুষ একদিকে সমস্ত বিশ্বের অধিপতিরূপে নিজ মহিমায় স্থিরভাবে অবস্থিতি করিতেছেন, অপরদিকে তিনি করুণাময়ী জননীমূর্ত্তিতে আমাদের নিত্য সহচররূপে থাকিয়া আমাদের প্রতি নিমেষের অশ্রুধারা মুছাইয়া দেন এবং সকল বিপদ-আপদে রক্ষাকর্ত্তারূপে আমাদিগকে ঘিরিয়া থাকেন। সেই দয়াঘন ভগবানের চরণে আশ্রয়লাভ করিলে মৃত্যু শতবিধ প্রকারে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইলেও আমাদিগকে কিছুতেই ভয় দেখাইতে পারিবে না। শান্তিলাভের জন্য, মৃত্যু হইতে পরিত্রাণের জন্য তাঁহার চরণে ব্যাকুলচিত্তে আছড়াইয়া পড়িলেই তিনি নিশ্চয়ই আমাদিগকে নিজ ক্রোড়ে তুলিয়া লইবেন এবং আমাদের সকল জ্বালা নির্ব্বাণ প্রাপ্ত হইবে, সকল দুঃখকষ্টের শান্তি হইবে। তাঁহার করুণার অন্ত নাই—অন্ত নাই।

এই প্রত্যক্ষ সত্য ভুলিয়া বিভীষিকায় ভীত হইও না। পশ্চাতে ফিরিয়া চাহিও না। ভুলভ্রান্তি যাহা করিয়াছ, তাহা ফিরিবে না; তাহার ফলাফলের জন্য কিছুমাত্র ভীত হইও না—মঙ্গলবিধাতা ভগবান সে সমস্তই তাঁহার মঙ্গল উদ্দেশ্য সাধনে নিযুক্ত করিবেন। ইহা স্থির জানিয়া সম্মুখে অগ্রসর হও। সংসারের ও সংশয়ের মেঘ-কুজ্‌ঝটিকা ছাড়াইয়া উপরে ওঠ; সূর্য্যের আলোকে, মুক্ত গগনের মুক্ত বাতাসে আপনাকে ভাসাইয়া দাও। নীচে ঘুরিয়া বেড়াইও না; হৃদয়নাথের হাত ধরিয়া নির্ভরে পর্ব্বতের শিখরে উঠিয়া যাও। শিখরদেশে দাঁড়াইয়া সেই অনন্তস্বরূপের করুণার অজস্র পরিচয় লও এবং জীবনে তাঁহার নিত্যনব লীলা প্রত্যক্ষ করিয়া আশ্চর্য্য হও। একবার জীবনের প্রত্যেক কার্য্যে, জগতের প্রত্যেক ঘটনায় সেই পরমাত্মার স্বপ্রকাশ প্রেমমুখ দেখিবার চেষ্টা কর—প্রাণে অতুল সাহস ও বিক্রম আসিবে। সংসারে যতই কেন বৃহৎ মৃত্যুযজ্ঞ অনুষ্ঠিত হউক না, অশান্তির যতই কেন বৃহৎ ঘূর্ণাবায়ু আমাদিগকে সমাচ্ছন্ন করুক না, তাহার মধ্যেও শান্তির চক্র হস্তে ভগবান মঙ্গলবিধাতার মূর্ত্তিতে সর্ব্বদাই দেখা দেন। নিশ্চয়ই জানিও, তিনি সর্ব্বদর্শী, সর্ব্বশক্তিমান এবং তিনিই আমাদের রক্ষাকর্ত্তা বিধাতা ও নেতা। তিনি নিজেই আমাদের ভয়ভাবনা নিত্যই বহন করিতেছেন। তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদ নিঃশব্দে আমাদের মস্তকে শতধারে নামিয়া আসিতেছে। তাঁহার করুণা বর্ম্মদুর্গরূপে আমাদিগকে

সর্ব্বদাই রক্ষা করিতেছে। তাঁহা হইতে দূরে থাকিও না—তাঁহাকে হৃদয়ের সিংহাসনে সুপ্রতিষ্ঠিত কর। তাঁহার স্বপ্রকাশ মঙ্গলমূর্ত্তি প্রত্যক্ষ করিয়া আনন্দসাগরে অবগাহন কর। তাঁহাকে প্রত্যক্ষ পিতামাতা জানিয়া অভয়প্রাপ্ত হও। তাঁহার মঙ্গল আশীর্ব্বাদে তোমাদের সকল দুঃখ সকল ভয়ের অবসান হউক, মনপ্রাণ শীতল হোক, আত্মা শান্তিলাভ করুক; তোমাদের সকল দ্বন্দ্ব, সকল পাপতাপ দগ্ধ হইয়া যাক। যে আনন্দহাসি আজ চারিদিকে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিতেছে, নিজের চক্ষে তাহা দেখিয়া, নিজের প্রাণে তাহা উপলব্ধি করিয়া কৃতার্থ হও। তাঁহার সুমঙ্গল আহ্বানবাণী আমাদের সকলের অন্তরে সুস্পষ্ট হইয়া উঠুক; আমাদের হৃদয় হইতে নিরাশা নিরানন্দ মুছিয়া যাক। যাঁহার আদেশে এই ব্রহ্মচক্রের অগণিত সূর্য্যচন্দ্র অসংখ্য গ্রহনক্ষত্র আমাদের মঙ্গলসাধনে নিরন্তর নিরত রহিয়াছে, তাঁহার স্নেহ ও প্রেমের শতস্রোতে আজ দিকসকল সুপ্রসন্ন হোক, রবির কিরণ মধুময় হোক; নিশীথের শিশিরধারা মধুময় হোক; আমাদের হৃদয়মন মধুময় হোক, আমাদের সঙ্গীত মধুধারা বর্ষণ করুক। আমাদের সকলের সমবেত কণ্ঠ হইতে ভগবানের নামে সুমহান জয়ধ্বনি সমুত্থিত হোক। এসো, আজ তাঁহার চরণে সকলে ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া জীবনকে ধন্য করি।

সত্যধর্ম্মের বীজমন্ত্র ও মৈত্রীসাধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

ভগবান বৎসরে বৎসরে মাঘোৎসবের ভিতর দিয়া আমাদিগকে নিবিড় প্রেমের মধ্যে মিলিত হইবার যে সুন্দর অবসর দিয়াছেন, ইহার গুরুত্ব আমাদিগকে উপলব্ধি করিতে হইবে। এই গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া আমাদের পরস্পরের ভুলভ্রান্তি ক্ষমা করিয়া পরস্পরের হাত ধরাধরি করিয়া আমাদিগকে একতার পথে, উন্নতি ও মঙ্গলের পথে এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইতে হইবে। নিজের কথা ভুলিয়া যাও, স্বার্থের কথা মুখেও আনিও না। স্মরণ রাখিও—ভগবানই আমাদের নেতা ও সেনাপতি এবং ভগবানই আমাদের একই পিতামাতা; আমরা তাঁহার সৈনিক, আমরা তাঁহার সন্তান। সম্মুখের বৎসর কিভাবে কার্য্য করিলে, কি উপায় অবলম্বন করিলে ধর্ম্মসংগ্রামে বিজয় লাভ করিব, উৎসবের ভিতর দিয়া, ভক্তসমাগমের ভিতর দিয়া তাহারই সম্বন্ধে ভগবানের ইঙ্গিত আদেশ লাভ করিয়া বীরপদক্ষেপে অগ্রসর হইতে হইবে—দ্বেষহিংসা দ্বন্দ্ববিবাদ পদতলে চূর্ণবিচূর্ণ করিয়া মিলিতশক্তিতে অধর্ম্ম ও মৃত্যুর বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইবে।

চারিদিকে দৃষ্টিনিক্ষেপ করিলেই আমরা দেখিতে পাই যে, দেশবিদেশের চারিদিক হইতেই প্রকৃতই মিলনের ক্ষুদ্র বৃহৎ শত শত নির্ঝর নিঃসৃত হইয়া প্রবল বন্যার আকারে জগতকে, বিশেষত প্রাচ্য ভূখণ্ডকে ভাসাইয়া দিবার উপক্রম করিতেছে। আমরা যে সত্যধর্ম্মের পতাকা বহন করিয়া অমৃতধামের যাত্রী হইয়া অগ্রসর হইতে চলিয়াছি, তাহারও মূল প্রাণ মৈত্রীসাধন। আমাদের কর্ত্তব্য, দেশে বা বিদেশে যেখানে যে কোন মিলনের নির্ঝর নিঃসৃত হইয়াছে বা হইবে, সকলগুলির সূত্র একত্র করিয়া যথাসম্ভব একটী সুনির্দ্দিষ্ট পন্থায় তাহাকে পরিচালিত করিবার ব্যবস্থা করা। সেদিকে আমাদের যতটুকু দৃষ্টি প্রদান করা আবশ্যক ততটুকু দৃষ্টি দিই বলিয়া মনে হয় না। সেদিকে আমরা খুবই কম মনোযোগ দিতেছি বলিয়া আমাদিগকে অনেক ক্ষতি সহ্য করিতে হইতেছে, আমরা অনেক বিষয়ে অগ্রসর হইবার পরিবর্ত্তে পিছাইয়া পড়িতেছি। একগাছি খড়ে বিশেষ কোনই কাজ না হইতে পারে, কিন্তু উপযুক্ত পরিমাণে খড় একত্র করিলে মত্ত হস্তী বাঁধিবারও উপযুক্ত রজ্জু প্রস্তুত করা যায়। এই ভাবের ভাবুক হইয়া, মহর্ষি যখন চুঁচড়ায় মৃত্যুশয্যায় শয্যাগত, সেই মৃত্যুশয্যা হইতেও তাঁহার শেষ "উপহার" স্বরূপে ব্রহ্মোপাসকদিগের প্রতি যে সকল অমূল্য উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে এই একটী উপদেশ সন্নিবিষ্ট আছে—"মৈত্রীই যেন তোমাদের ব্যবহারের নিয়ামক হয়।" শুনিতে কথাটী খুব সরল ও সহজ সত্য বলিয়া মনে হয় বটে। মৈত্রীকে তো সকল সমাজেরই নিয়ামক করা উচিত। সুতরাং মৈত্রীকে যে বিশেষ ভাবে ধর্ম্মসমাজমাত্রেরই ব্যবহারের নিয়ামক করা উচিত, ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবেন না। কিন্তু আমরা অন্তর হইতে সত্যসত্য মহর্ষির সেই উক্তির সাড়া দিতেছি বলিয়া মনে হয় না। সত্যসত্য অন্তর হইতে সেই উক্তির সাড়া দিলে আজ ব্রাহ্মসমাজে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র মতভেদ লইয়া দ্বন্দ্ববিবাদ মাথা তুলিবার অবসর পাইত না এবং আমাদের অন্তর হইতে ক্রন্দন উঠিবার প্রয়োজন আসিত না।

যে রোগ দেহমনকে ধ্বংসের পথে লইয়া যায়, সে রোগকে চাপা দিয়া লুকাইয়া রাখিলে আত্মপ্রতারণা করা হয়, এবং তাহা ক্ষয়রোগে পরিণত হইবার সম্ভাবনা আসে। ব্রাহ্মসমাজে যে মৈত্রীভাবের অভাব আছে মৈত্রীভাব যে ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যকলাপ সর্ব্বতোভাবে নিয়মিত করিতেছে না, ইহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু আমাদের এই গর্ব্ব যেন খর্ব্ব না হয় যে আমরা বিগতবিবাদং পরমেশ্বরের উপাসক। শত মতভেদ

সত্ত্বেও সকল কার্য্যের, সকল চিন্তার নিয়ামকরূপে মৈত্রী-ভাবকেই ব্রাহ্মসমাজে সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে হইবেই। চীন, তাতার, তুরস্ক, জাপান প্রভৃতি দেশকে আজ অর্দ্ধশতাব্দী পূর্ব্বেও অসভ্য বলিয়া আমরা আত্মতৃপ্তি লাভ করিতাম। যখন দেখি যে, সেই সকল দেশেরও অধিবাসীগণ আপনাদিগকে মিলনের অপূর্ব্ব বন্ধনে আবদ্ধ করিয়া স্বাধীনতার পথে দ্রুতগতিতে অগ্রসর হইয়া চলিতেছে, তখন আমরা তাহাদিগকে শতমুখে প্রশংসা করিতে বিরত হই না। তবে তাহাদের নিকট হইতে দ্বন্দ্ববিবাদের উপরে উঠিয়া দ্বেষহিংসা অতিক্রম করিয়া মিলিত শক্তিতে উন্নতি ও মঙ্গলের পথে, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথে অগ্রসর হইবার শিক্ষা লাভ করিতে যত্নবান হই না কেন? প্রকৃত কথা এই যে, যুগ-যুগান্তর ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার, বিশেষত আধ্যাত্মিক পরাধীনতার ক্রোড়ে লালিত পালিত হইবার এবং তাহার অপরিহার্য্য ফলে পদে পদে ছোটখাটো বিষয় লইয়া বিবাদকলহে মত্ত হইবার অভ্যাসের ফলে আমরা আজও ব্রাহ্মধর্ম্মের মুক্তিপ্রদ ও মৈত্রীসাধক মহান উদার ভাব অন্তরে ধারণ করিতে পারিতেছি না। মৈত্রীসাধনের অভাবে আমরা মিলনের অনেক সুন্দর অবসর হেলায় হারাইতেও কুণ্ঠিত হই না। মৈত্রীসাধনের অভাবে আমরা প্রকৃত কল্যাণজনক কোন কার্য্যে বলের সহিত অগ্রসর হইতে পারি না, অগ্রসর হইলেও বিশেষ সাফল্য লাভ করিতে পারি না। মৈত্রীসাধনের অভাবে, আমাদের নিজেদের ঘরে যে ভয়াবহ ভাঙ্গন ধরিবার সূত্রপাত হইয়াছে, স্বাধীনতার মুক্ত বায়ু সেবন করিবার পরেও আবার যে গুরুবাদ প্রভৃতির সাহায্যে সংরচিত পরাধীনতার বেড়াজালে আমরা আপনাদিগকে ইচ্ছাপূর্ব্বক ধরা দিতে চলিয়াছি, চক্ষুষ্মান ব্যক্তিমাত্রই তাহা প্রত্যক্ষ করিতেছেন, কিন্তু সাধারণত ব্রাহ্মসমাজ সেদিকে কোনই দৃষ্টি রাখিতেছেন না, অথবা দৃষ্টি রাখিবার ক্ষমতা হারাইতেছেন।

ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখা যদি সত্যই আমাদের মনোগত অভিপ্রায় হয়; ব্রহ্মোপাসনাকে দেশের মধ্যে সুপ্রতিষ্ঠিত করিবার ব্রত যদি সত্যই আমরা অন্তরে পোষণ করিয়া থাকি; ধর্ম্ম, কর্ম্ম, ও চরিত্রে যদি সন্তানগণকে ব্রাহ্মধর্ম্মের উন্নত আদর্শে লব্ধপ্রতিষ্ঠ দেখিবার ইচ্ছা রাখি, তবে শত মতভেদ সত্বেও—অনন্তস্বরূপ ভগবানের রাজ্যে অসংখ্য মানবের অসংখ্য মতভেদ তো থাকিবেই—শত মতভেদ সত্ত্বেও বিবাদবিসম্বাদকে ব্রাহ্মসমাজ হইতে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা দূরে রাখিতে হইবে; শত মতভেদ সত্বেও অন্তরে দ্বেষহিংসাকে স্থান দিতে পারিব না। আমাদের দেশে ৯৯এর ধাক্কা বলিয়া একটী কথা প্রচলিত আছে। বর্ত্তমানে ৯৯তম মাঘোৎসব চলিতেছে। এই মাঘোৎসব যেন ব্রাহ্মসমাজ হইতে সকল দ্বন্দ্ববিবাদ সকল বিরোধবিচ্ছেদ বিদূরিত করিয়া দেয়। আমার অন্তরের এই প্রার্থনা যে, সম্মুখের বৎসরে আমাদিগকে আর ৯৯এর ধাক্কা যেন সামলাইতে না হয়; আমরা যেন সর্ব্বপ্রকার দ্বন্দ্ববিবাদ হইতে বিমুক্ত হইয়া সম্মুখের শতাব্দীতে মিলিত শক্তিতে পুণোদ্যমে ভগবানের উপাসনাপ্রচার কার্য্যে বহির্গত হই। এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতে যাহাতে কি রাষ্ট্রনৈতিক, কি সমাজনৈতিক, সকল কার্য্য সকল প্রতিষ্ঠান সত্যধর্ম্মের ভিত্তিতে অনুষ্ঠিত হয়, তাহারই উদ্দেশ্যে ব্রাহ্মসমাজের সমগ্র শক্তি নিয়োগ করিতে হইবে এবং ব্রাহ্মসমাজের কার্য্যের পরিসর বিস্তৃত করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে সজীব রাখিতে চাহিলে, ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিমান করিয়া তুলিতে চাহিলে মৈত্রীসাধনের সাহায্যে কেবল ব্রাহ্মসমাজের ভিতরে নয়, কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের বাহিরেও উহার কার্য্যের পরিসর বিস্তৃত করিতে হইবে। যেখানে যে কোন ক্ষেত্রে শুভ কার্য্য বা কল্যাণপ্রদ অনুষ্ঠান অনুষ্ঠিত হইবে, নিজের স্বার্থের প্রতি দৃষ্টিপাত না করিয়া, কিন্তু সত্যধর্ম্মের বীজমন্ত্রকে অক্ষুণ্ণ রাখিয়া সেই সকল অনুষ্ঠানে ব্রাহ্মসমাজকে যোগদান করিতে হইবে—বীজমন্ত্রের অপ্রতিকূল অনুষ্ঠান আচার ব্যবহারসকলকে নিজের অন্তরঙ্গ করিয়া লইতে হইবে।

ইহা ধরা কথা যে, কার্য্যক্ষেত্র বিস্তৃত করিতে গেলেই ব্রাহ্মসমাজকে অনেক স্থলে রক্ষণশীল জনসাধারণের নিকট উপহাস ঘৃণা ও তুচ্ছতাচ্ছিল্য লাভ করিতে হইবে, অনেক স্থলে সাংসারিক নানা কঠোর অসুবিধাও ভোগ করিতে হইবে। আমাদের মধ্যে এমন অনেকে আছেন যাঁহারা উপহাস ঘৃণা সহ্য করিতে অক্ষম হইয়া এবং সাংসারিক অসুবিধা ভোগের বিভীষিকায় ভীত হইয়া, অন্তরে ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করেন কি না জানি না, কিন্তু বাহিরে আপনাদিগকে ব্রহ্মোপাসকরূপে পরিচিত করিতে বড়ই কুণ্ঠিত হন এবং বন্ধুবান্ধবকে ব্রহ্মোপাসনার ব্রত গ্রহণে নিরস্ত করিয়া সুবিধা ও সুখসোয়াস্ত সম্ভোগের জন্য উৎসাহিত করেন। কিন্তু ব্রাহ্মসমাজের সৈনিকের পদে যাঁহারা আপনাদিগকে বরণ করিয়াছেন, ভগবানের আদেশ ও প্রিয়কার্য্য ভাবিয়া তাঁহার সত্যধর্ম্মের পতাকা যাঁহারা স্কন্ধে বহন করিবার অধিকার লাভে অগ্রসর হইয়াছেন, তাঁহাদিগকে উপহাস ঘৃণা প্রভৃতির ভয়ে মৃতপ্রায় হইলে অথবা সাংসারিক অসুবিধার বিভীষিকায় ভয়ত্রস্ত হইলে চলিবে না। আবশ্যক হইলে মৃত্যুকেও বরণ করিব, এই প্রতিজ্ঞা গ্রহণ করিয়া তবে তাঁহাদিগকে সত্যধর্ম্মের ব্রতগ্রহণে অগ্রসর হওয়া উচিত। এই ভাবে অগ্রসর হইলেই তাঁহারা প্রত্যেকে সত্যধর্ম্মের

এক একটী অগ্নিময় কেন্দ্র হইয়া উঠিবেন। এক সময়ে এইভাবে অগ্রসর হইবার ফলেই শক্তিমান হইয়া ব্রাহ্মসমাজ কেবল হিন্দুসমাজে নয়, সমস্ত বিশ্বসমাজে সত্যধর্ম্মের আগুন ছড়াইয়া দিতে পারিয়াছিলেন; আমাদিগকে আবার সেই শক্তি সঞ্চয় করিতে হইবে। সেই শক্তি সঞ্চয় করিয়া মৈত্রীভাবের ভিতর দিয়া সমগ্র দেশে যাহাতে ব্রহ্মোপাসনা সুপ্রতিষ্ঠিত করিতে পারি, সেই পথে আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

ভগবানের ইঙ্গিত সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিতেছি যে, সর্ব্ববিধ দ্বন্দ্ব অতিক্রম করিয়া অনতিবিলম্বে আমাদিগকে মিলনের মহামন্ত্রে দীক্ষিত হইতে হইবে। দেশের ও বিদেশের চারিদিকে মিলনের রাগিণী শতবিধ যন্ত্রে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, মুষ্টিমেয় আমরা কয়েকজনই কি সেই মিলনের আনন্দগীতে আনন্দমনে যোগ দিতে পারিব না?—তাহার মধ্যে বেসুরা তান বাজাইয়া বসিব? বিশ্বের চতুর্দ্দিকে মিলনের শত নির্ঝর, সহস্র উৎস মানবহৃদয়ের পাষাণস্তর ভেদ করিয়া প্রকাশ হইয়া পড়িতেছে; বিশ্বময় এই মিলনের আনন্দের মাঝে আমরাই কি শুধু নিরানন্দের তপ্তনিশ্বাস ফেলিতে ফেলিতে কোণে বসিয়া হাহুতাশ করিতে থাকিব? আমাদের মধ্যে বিরোধবিবাদের ছোট বড় যাহা কিছু কারণ আছে, এই ৯৯তম মাঘোৎসবে সমস্তই শান্তিসমুদ্রে সমাধি লাভ করুক। পরস্পরের সহিত মৈত্রীভাবে মিলিয়া মিশিয়া কার্য্য করিতে হইবে বলিয়া আমরা সত্যধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিয়া মিলিতে বলি না। প্রত্যুত, সত্যধর্ম্মের ভিত্তির উপরেই আমরা মৈত্রীসাধনকে গাঁথিয়া তুলিতে বলি। মৈত্রীসাধনের ধর্ম্মমূলক সুদৃঢ় ভিত্তিই হইল—সত্যধর্ম্মের ঐ বীজমন্ত্র—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ শুভম্ভবতি—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনই তাঁহার উপাসনা; একমাত্র তাঁহার উপাসনার দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। এই বীজমন্ত্রের গায়ে আর যে কোন মতবাদ সংযুক্ত করা হইবে, তাহা স্থান কাল ও অবস্থাবিশেষে বিরোধের কারণ দ্বন্দ্ববিবাদের মূল হইলেও হইতে পারে। কিন্তু যে বীজমন্ত্র রাজা রামমোহন রায় সৃষ্টি করিয়াছিলেন এবং যাহা মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ উদারতম ভাষায় সুস্পষ্টরূপে ব্যক্ত করিয়াছেন, সেই বীজমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া মৈত্রীসাধনে অগ্রসর হইলে বিরোধের কোনও অবসরই আসিতে পারে না, কারণ উহা স্থান কাল ও অবস্থার অতীত সত্য।

এই বীজমন্ত্র সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার এবং উন্নতি ও মঙ্গলের একমাত্র উৎস পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগসাধক উপাসনার বীজমন্ত্র। সেই কারণে এই বীজমন্ত্রে স্বাধীনতা, উন্নতি ও মঙ্গলের মূল সংহত আকারে সমাবিষ্ট আছে। তাই এই বীজমন্ত্রকে কেবল মুখে নয়, কিন্তু সর্ব্বান্তঃকরণে ধারণ করিলে নাস্তিকতা বল, বা অন্য যত কিছু মতবাদ বল, সকলের সঙ্গেই সংগ্রামে বিজয়লাভ অবশ্যম্ভাবী। বশিষ্ঠবিশ্বামিত্রের সংগ্রামে বশিষ্ঠের কামধেনু যে প্রকার রাশি রাশি সৈন্য বাহির করিয়া তাঁহার জয়লাভে সহায়তা করিয়াছিল, আমাদেরও এই বীজমন্ত্র রাশি রাশি সত্যসমূহ প্রকাশ করিয়া সর্ব্ববিধ উপধর্ম্ম ও অসত্য অন্যায় প্রভৃতির উপর আমাদিগকে বিজয়দান করিবেই। যেখানে যত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম আছে, সেই সমস্ত সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মেরই মূলে সত্যধর্ম্মের ঐ বীজমন্ত্র স্বভাবতই নিহিত আছে বলিয়াই ইহা মিলনেরও ভিত্তিভূমি।

এই বীজমন্ত্রের উপরেই সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্ম গড়িয়া উঠিয়াছে, কিন্তু তাই বলিয়া সকল সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মকেই যে স্থান কাল ও অবস্থানিরপেক্ষ সত্য অথবা সেই সকল ধর্ম্মের প্রত্যেক অংশকেই যে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হইবে এমন কোন কথা নাই। সকল ধর্ম্ম বা সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মই সত্য বলিলেই তো সমস্ত বিরোধবিবাদ থাকিয়া গেল। এতদিন ধরিয়া তো ঐ মতবাদের উপরেই ঘোরতর দ্বন্দ্ববিবাদ চলিতেছে। প্রত্যেক সম্প্রদায়ই তো নিজ নিজ ধর্ম্মের অ হইতে ক্ষ পর্য্যন্ত প্রত্যেক অক্ষরটী সত্য ধরিলেই অপর ধর্ম্মের প্রতি অসহিষ্ণু হইয়া উঠে। সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মমাত্রই সর্ব্বাংশে সত্য হইলে এত ধর্ম্মসংস্কারেরও প্রয়োজন হইত না এবং ব্রাহ্মসমাজের আবির্ভাবও সম্ভব হইত না। বিভিন্ন উপধর্ম্মের যে সকল অংশ ঐ বীজমন্ত্রের অপ্রতিকূল, সেই সকল অংশই আমরা সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে পারি। এই যে যুগে যুগে মহাপুরুষেরা আবির্ভূত হইয়া ধর্ম্মসংস্কারে প্রবৃত্ত হন, তাহা ঐ সকল উপধর্ম্ম হইতে দেশ কাল ও অবস্থার অতীত ঐ বীজমন্ত্রকে, ঐ সত্যধর্ম্মকে মুক্ত করিয়া উহার স্বাভাবিক উজ্জ্বল মূর্ত্তিতে প্রকাশ দিবার জন্য। সকল ধর্ম্মেই ঐ বীজমন্ত্র কেন্দ্ররূপে অবস্থিত বলিয়াই উহা সকল সম্প্রদায়ের মিলনের ভিত্তিভূমি হওয়া সম্ভব হইয়াছে। ইহার প্রত্যক্ষ দৃষ্টান্ত দেখি, যখন ঐ বীজমন্ত্রের উপর দণ্ডায়মান সত্য ব্রহ্মজ্ঞানের আবির্ভাবের ফলে প্রবল শাক্ত-বৈষ্ণবের দ্বন্দ্বের অবসান হইল। এই বীজমন্ত্রের সবলতা ঐখানে যে, কোনও ধর্ম্মের সহিত ইহার বিরোধ আসিতে পারে না। এই সত্যের উপর দাঁড়াইয়া আজ আমরা সকল দেশবাসীকে, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়কে এই অগ্নিময় মন্ত্রে দীক্ষা গ্রহণ করিবার জন্য তারস্বরে আহ্বান করিতেছি।

এই বীজমন্ত্র কাহারও উন্নতি, মঙ্গল বা স্বাধীনতা

লাভের পরিপন্থী নয়, বরঞ্চ বিশেষ সহায়। অন্য যে কোন ধর্ম্ম গ্রহণ কর, তাহা দেশ কাল ও অবস্থাবিশেষে উন্নতির পথে, স্বাধীনতালাভের পথে বাধা হইলেও হইতে পারে, কিন্তু এই বীজমন্ত্র ও তদবলম্বিত সত্যধর্ম্ম বাধা তো কিছুতেই হইতে পারে না, বরঞ্চ সর্ব্বদাই অনুকূল হইবে। এই বীজমন্ত্রকে পরিত্যাগ কর, অথবা ইহার উপর অন্য কোন মতবাদ সংযুক্ত কর, তাহাতে আপাতত দলপুষ্টি হইলেও কালে তাহা বিরোধের সম্ভাবনা আনিয়া মিলনের সমস্ত প্রয়াস ব্যর্থ করিয়া দিতে পারে। এই বীজমন্ত্রকে যদি আমরা ধরিয়া থাকি, তবে কালক্রমে ইহাই আমাদের দেশকে, সমগ্র জাতিকে মিলনের পথে চালিত করিবার এক অমোঘ যন্ত্র হইবে। সুবিধাবাদীর ন্যায় কেবল সাংসারিক সুবিধাস্বাচ্ছন্দ্যের দিকে দেখিলে চলিবে না। এপর্য্যন্ত মাত্র সুবিধাবাদী কোন দেশকে বা জাতিকে প্রকৃত উন্নতির ও মঙ্গলের পথে বা স্বাধীনতা লাভের পথে পরিচালিত করিতে সমর্থ হইয়াছেন বলিয়া ইতিহাস বলে না। বরঞ্চ বিপরীতে ইতিহাস ইহাই সপ্রমাণ করে যে, প্রকৃত ধর্ম্মপথের পথিক, প্রকৃত সত্যধর্ম্মাই জগতের সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতিসাধনে সমর্থ হইয়াছেন।

নিজের মঙ্গল যদি প্রার্থনীয় হয়, পরিবারের ও সন্তানগণের উন্নতিসাধন যদি প্রার্থনীয় হয়, দেশের ও জাতির স্বাধীনতা যদি প্রাণের ঈপ্সিত বস্তু হয়, তবে সত্যধর্ম্মের ঐ বীজমন্ত্রকে কি অন্তরে কি বাহিরে, কি গোপনে কি প্রকাশ্যে গ্রহণ করিয়া ব্রাহ্মধর্ম্মকে জয়যুক্ত কর এবং ব্রাহ্মসমাজকে সফল করিয়া তোল। *

ব্রহ্মসাধনা।

(সদানন্দ শ্রীকালীপ্রসন্ন বিশ্বাস)

সম্মুখের ১১ই মাঘের শুভদিনে শুভক্ষণে, আজ শতাব্দী-প্রায় পূর্ব্বে, ব্রহ্মর্ষি রাজা রামমোহন রায় সার্ব্বভৌমিক ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারার্থ এই বর্ত্তমান উপাসনাগৃহে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন। সুতরাং এই দিনটি আমাদের শুভ উৎসবের দিন বলিয়া পরিগণিত হয়। আজ প্রত্যেক ব্রাহ্মের গৃহে, প্রত্যেক ব্রাহ্মের হৃদয়ে এক অনির্ব্বচনীয় আনন্দের ধ্বনি উত্থিত হইতেছে। বৎসরান্তে সকলে সংসারের শোক দুঃখ অভাব ভুলিয়া গিয়া সেই পরব্রহ্মের আশ্রয় লইবার জন্য তৎপর হইতেছে। সকলের প্রাণ সেই জগতের একমাত্র কেন্দ্রস্বরূপ ব্রহ্মের প্রতি ধাবিত হইতেছে। ভ্রাতৃপ্রেম জাগরিত হইয়া বিশ্বসংসারকে আজ আলিঙ্গন করিতে উদ্যত। আজ আমাদের কি আনন্দের দিন!

এই আনন্দের দিনে সর্ব্বপ্রথমে আমরা সেই আনন্দের প্রস্রবণ ভগবানকে বারম্বার নমস্কার করি। তৎপরে জগতের যেখানে যত ঋষি, মহর্ষি, সাধু সন্ত ছিলেন বা আছেন, তাঁহাদের চরণে শত সহস্র প্রণাম করি। জগতবাসী সকল সম্প্রদায়ের ধর্ম্মপিপাসু ব্যক্তিগণকে বিনীত ভাবে অভিবাদন করি; এবং সকলকে আমাদের এই আনন্দের হবির অংশ গ্রহণ করিবার জন্য সাদরে আহ্বান করি। প্রার্থনা করি যে আজ তাঁহাদের সকলের আত্মা আমাদের আত্মার সহিত মিলিত হইয়া সেই জগতপ্রসবিতা পরমেশ্বরের পূজার অর্ঘ্য প্রদানপূর্ব্বক আমাদিগকে ধন্য করুক। আজ আমাদের সকল সংকীর্ণতা, সকল সাম্প্রদায়িকতা, সকল অহংকার, সকল মলিনতা, সকল কুটিলতা ব্রহ্মাগ্নির তেজে ভস্মীভূত হইয়া আমাদিগের হৃদয়কে বিমল করিয়া দিউক। বিগত-বিবাদ ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের সকল বিবাদ-বিসম্বাদ, ঘাত-প্রতিঘাত চিরদিনের জন্য দূর হইয়া যাউক।

ব্রাহ্মধর্ম্ম কেবল আমাদের সমাজের মুষ্টিমেয় সভ্যগণের ধর্ম্ম নহে। ইহা একের নহে, শতের নহে, সহস্রের নহে, লক্ষের নহে, কোটীর নহে, সমস্ত জগতের —অখিল ব্রহ্মাণ্ডের ধর্ম্ম। ইহা বিশ্বজনীন ধর্ম্ম। বিশ্ব-সংসারের প্রত্যেক ব্যক্তিই ইহার অধিকারী। ব্রাহ্মধর্ম্মের উপাস্য দেবতা সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই কেন্দ্র। সকল ধর্ম্মের মধ্যে যাহা কিছু সত্য, যাহা কিছু নিত্য, যাহা কিছু শ্রেয়, যাহা কিছু সুন্দর, যাহা কিছু মধুর তাহাই এই ধর্ম্মের অঙ্গীভূত। ব্রাহ্মধর্ম্মের অধিষ্ঠাত্রী দেবতা যেমন অনন্ত অসীম, ব্রাহ্মধর্ম্মও সেইরূপ অনন্ত ও অসীম। ব্রাহ্মধর্ম্ম অতীতের ধর্ম্ম, বর্ত্তমানের ধর্ম্ম এবং ভবিষ্যতের ধর্ম্ম। সৃষ্টির প্রারম্ভ হইতে ইহা বর্ত্তমান আছে, সৃষ্টির শেষ পর্য্যন্ত ইহা বর্ত্তমান থাকিবে। এক কথায় ব্রাহ্মধর্ম্ম সকল ধর্ম্মের সারস্বরূপ। ঋষি মহর্ষিগণ বারংবার এই কথাই উচ্চৈঃস্বরে ঘোষণা করিয়া গিয়াছেন। রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ আমাদের বর্ত্তমান ব্রাহ্মসমাজের ঋষিগণও সেই অনন্ত কালের ধর্ম্মবাণী লইয়া ব্রাহ্মধর্ম্মের এই বীজমন্ত্র গ্রথিত করিয়া গিয়াছেন।

১। পূর্ব্বে কেবল পরব্রহ্ম মাত্র ছিলেন; অন্য আর কিছুই ছিল না; তিনি এই সমুদয় সৃষ্টি করিলেন।

২। তিনি জ্ঞান-স্বরূপ, অনন্ত-স্বরূপ, মঙ্গল-স্বরূপ, নিত্য, নিয়ন্তা, সর্ব্বজ্ঞ, সর্ব্বব্যাপী, সর্ব্বাশ্রয়, নিরবয়ব, সর্ব্বশক্তিমান, স্বতন্ত্র এবং পরিপূর্ণ; কাহারও সহিত তাঁহার উপমা হয় না।

৩। একমাত্র তাঁহার উপাসনায় দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়।

---

* গত ৭ই মাঘ মাঘোৎসব উপলক্ষে ভবানীপুর সম্মিলন ব্রাহ্মসমাজে পঠিত।

৪। তাঁহাকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা।

পৃথিবীতে এমন কোন ধর্ম্ম নাই যাহা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ ভাবে এই ধ্রুব সত্যকে অস্বীকার করিতে পারে। যখন সকল ধর্ম্মেরই কেন্দ্র একমাত্র অদ্বিতীয় ব্রহ্ম, যখন সকল ধর্ম্মই তাঁহাকে একমাত্র বিশ্বসংসারের সৃষ্টিকর্ত্তা বলিয়া স্বীকার করে, যখন সকল ধর্ম্মেরই মূল উদ্দেশ্য সেই অনাদি অনন্ত, নিত্য, সত্য ভগবানকে প্রাপ্ত হওয়া, তখন ঐ সম্বন্ধে কোন বিরোধ হইবার কারণ নাই। নানা শাস্ত্র হইতে উদ্ধৃত বচনাবলীও ইহাই সপ্রমাণ করিতেছে।

একমেবাদ্বিতীয়ম্ ছান্দোগ্য উপনিষৎ।

Ahura Mazda—The secondless—Zoroastrianism.

The Lord He is God; there is none else beside Him.

—Hebrew.

One God and father of all, who is above all, and through all, and in you all.

—Ephestians (Christian).

But to us there is but one God, the Father, of whom are all things, and we in Him.

1, Corinthians, (Christian)

Your God is one God; there is no God but He, the most merciful.

Quran. (Islam)

He Himself is One. Japji (Sikh)

One and One alone is He called.

Guru, III, (Sikh)

সত্য বটে বৌদ্ধ ধর্ম্মশাস্ত্রে ঈশ্বরের নামগন্ধ নাই এবং এইজন্য অনেকে ইহাকে নিরীশ্বর ধর্ম্ম বলিয়া বিশ্বাস করেন। আমি কিন্তু এ বিশ্বাসের পক্ষপাতী নহি। বৌদ্ধ ধর্ম্মের শাস্ত্রগ্রন্থ পাঠ করিয়া দেখা যায় যে উহা হিন্দু-ধর্ম্মের ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত। ইহাতে ঈশ্বরের নাম না থাকিলেও ইহার প্রত্যেক ছত্রে ভগবৎপ্রেমের জলন্ত বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। নিরীশ্বরবাদীর নীরস প্রাণ হইতে এতদূর মাধুর্য্যের ও প্রেমের উৎস প্রবাহিত হইতে পারে না।

বুদ্ধের সময়ে ধর্ম্মের অবস্থা এতদূর হীন হইয়া পড়িয়াছিল, ধর্ম্মের নামে নানাপ্রকার কুসংস্কার, বলিদানাদি পাশবিক হত্যাকাণ্ড, অত্যাচার, অবিচার, ব্যভিচার প্রভৃতি দ্বারা মানবসমাজ এমন বিশৃঙ্খল অবস্থায় পরিণত হইয়াছিল যে সেই অধর্ম্মের স্রোত হইতে লোককে ভগবৎ-প্রেমের পথে ফিরাইয়া আনা তিনি অসম্ভব জ্ঞান করিয়াছিলেন। সেই জন্য "তাঁহাকে প্রীতির" পন্থা ছাড়িয়া দিয়া "তাঁহার প্রিয় কার্য্য সাধনের" পন্থার উপরেই তিনি বিশেষ জোর দিয়াছিলেন। তিনি জানিতেন যে ইহাতে কৃতকার্য্য হইলে প্রথম পন্থা-দ্বার সহজেই উন্মুক্ত হইয়া যাইবে। প্রকৃতপক্ষে হইয়াছিলও তাহাই।

কেহ কেহ বলিতে পারেন যে, যাহারা অসভ্যজাতি মধ্যে পরিগণিত, যাহাদের মধ্যে কোন ধর্ম্মশাস্ত্র নাই—তাহাদের হৃদয়েও ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজ বর্ত্তমান আছে কি না? আমি বলি আছে। তাহারাও এক অনির্দ্দেশ্য দেবতাকে প্রধান জ্ঞান করিয়া তাঁহার নিকট মস্তক অবনত করিয়া থাকে—তাহারাও এক অপ্রকাশিত দেবতাকে ভক্তি করিয়া থাকে, তাহারাও তাহাদের সংকীর্ণ সমাজের মধ্যে অজ্ঞাতভাবে সেবাধর্ম্মরূপ ভগবানের প্রিয় কার্য্য সাধন করিয়া থাকে। যখন তাহারা দেবতার উদ্দেশে সরল মনে, সরল প্রাণে আনন্দে নৃত্য করিতে থাকে, তখন তাহাদের হৃদয়ের অভ্যন্তর হইতে সেই একই বীজ সত্য—একই বীজমন্ত্র উত্থিত হইতে থাকে। যদি কেহ ইহা দেখিয়া থাকেন তিনিই ইহার অর্থ বুঝিতে পারিবেন।

এখন কথা হইতেছে যে, যদি সকলের মধ্যেই ব্রাহ্ম-ধর্ম্মের বীজ বর্ত্তমান আছে, তবে ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন কি? ইহার উত্তরে আমার বক্তব্য এই যে, বাগানের জমি প্রস্তুত করিয়া ভাল ভাল বৃক্ষাদির রোপণ করা সত্বেও মালি রাখিবার আবশ্যকতা কি? সকলেই দেখিয়াছেন যে, তত্ত্বাবধানের অভাবে বাগান জঙ্গলে পরিণত হয়। নানা প্রকার আগাছা আসিয়া বৃক্ষগুলিকে ঘেরিয়া ফেলিয়া নির্জ্জীব করিয়া দেয়। তখন তাহার শোভা সৌন্দর্য্য সকলই নষ্ট হইয়া যায়, ফলের কথা ত দূরে থাকুক। সেইরূপ, ধর্ম্মরূপ বাগানও অজ্ঞতা, অলসতা, উপেক্ষা, স্বার্থপরতা, অথবা অবহেলার দোষে কুসংস্কারাদি কুধর্ম্মরূপ আগাছার দ্বারা আচ্ছাদিত ও পরিবেষ্টিত হইয়া যখন ঘোর জঙ্গলে পরিণত হয়, তখন দয়ানিধান পরব্রহ্ম তাঁহার শক্তিকে তথায় বিশেষভাবে আবির্ভূত করিয়া আবার প্রকৃত ধর্ম্মের পুনঃপ্রতিষ্ঠা করেন এবং তাঁহার ধর্ম্মরাজ্য পুনঃ স্থাপন করেন। ইহাই তাঁহার অনন্ত মহিমা। গীতায় শ্রীকৃষ্ণ বলিয়াছেন—

যদা যদাহি ধর্ম্মস্য গ্লানির্ভবতি ভারত—

ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে॥

হে ভারত, যখন যখন ধর্ম্মের গ্লানি উপস্থিত হয়,

তখন সেই গ্লানিকে দূর করিয়া ধর্ম্মরাজ্য স্থাপন করিবার জন্য ভগবান যুগে যুগে অবতীর্ণ হইয়া থাকেন।

ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইবার পূর্ব্বে ধর্ম্মের যে কিরূপ গ্লানি উপস্থিত হইয়াছিল তাহা সকলেই অবগত আছেন। এই গ্লানি দূর করিবার জন্য ভগবান ব্রাহ্মসমাজের ঋষিগণের হৃদয়ে বিশেষভাবে আবির্ভূত হইয়া জগতের মঙ্গলের জন্য তাঁহাদিগকে ব্রাহ্মধর্ম্মের পুনরুদ্ধার কার্য্যে নিযুক্ত করিয়াছিলেন।

দেখা যাউক এই শতপ্রায় বৎসরে ব্রাহ্মসমাজ ভগবানের কার্য্যে কতদূর সাফল্য লাভ করিতে পারিয়াছে। একটু বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে যে ব্রাহ্মসমাজের প্রভাবে, ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণে, কেহ স্বীকার করুন বা না করুন, সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ই আপন আপন ধর্ম্ম ও সামাজিক গ্লানি অপসারিত করিয়া দিবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতেছেন; তাঁহাদের ধর্ম্মনীতি, সমাজনীতি, রাজনীতি, সকলই ব্রাহ্মসমাজের আদর্শে সংশোধিত ও পুনর্গঠিত হইতেছে। যে হিন্দুসমাজ অজ্ঞতা বশতঃ এক সময় ব্রাহ্মসমাজের ঘোর বিরোধী ছিল, আজ ব্রাহ্মসমাজের প্রচারিত প্রায় সকল সত্যই আপনার করিয়া লইতেছে। মূর্ত্তিপূজা প্রায় লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে; অস্পৃশ্যতা দূর হইতে চলিয়াছে; জাতিভেদের কঠিন বাঁধন অতিসূক্ষ্ম সূতায় আটকাইয়া আছে মাত্র; স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীস্বাধীনতা পূর্ণোদ্যমে চলিতেছে; বিধবাবিবাহের আপত্তি ক্রমশঃ নিস্তেজ হইতেছে; বাল্যবিবাহ পাপে পরিগণিত হইতেছে, সমুদ্রযাত্রাদি কুসংস্কার বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। আর কত উল্লেখ করিব—কি আধ্যাত্মিক বিষয়ে, কি সমাজসংস্কার কার্য্যে, কি সাহিত্যক্ষেত্রে, আজ সমগ্র ভারত ব্রাহ্মসমাজের অনুকরণ করিয়া ধন্য হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠার পূর্ব্বে এই সব স্বপ্নেরও অতীত বলিয়া বোধ হইত।

আজ আর ব্রাহ্মসমাজ একটি সংকীর্ণ গণ্ডীর মধ্যে আবদ্ধ নহে। বিশ্বরূপ প্রকাশ করিয়া আজ ইহা সমস্ত জগতকে আপনার শান্তিপ্রদ সুশীতল ছায়ায় আশ্রয় দিতেছে। ইহা আশ্চর্য্যের বিষয় নহে যে পণ্ডিত মালব্যের ন্যায় নিষ্ঠাবান ব্রাহ্মণও একদিন ব্রাহ্মসমাজের বেদীতে বসিয়া মুক্তকণ্ঠে ব্রাহ্মধর্ম্মের জয় ঘোষণা করিবেন। ইহাই ব্রাহ্মসমাজের গৌরব, ইহাই ব্রাহ্মসমাজের সাধনার ফল।

ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ লইয়া সকল সম্প্রদায় উন্নতির পথে অগ্রসর হইতেছে সত্য, কিন্তু আমরা রাজা রামমোহন রায় প্রমুখ ব্রাহ্ম ঋষিগণের উত্তরাধিকারীগণ কি করিতেছি? আমাদের ধার্ম্মিক, নৈতিক ও সামাজিক জীবনে ব্রাহ্মসমাজের উদ্দেশ্য কতদূর সিদ্ধ করিতে পারিয়াছি? আমরা ব্রাহ্মসমাজের অসীম শক্তিতে কতদূর শক্তিমান হইতে পারিয়াছি? আমাদের হৃদয়ে ব্রহ্মজ্ঞান কতদূর প্রস্ফুটিত হইয়াছে? আমাদের সাধনা কতদূর সফলতা লাভ করিয়াছে? আজ শত বৎসরের হিসাব নিকাশের সম্মুখে ইহাই নিরাকরণের সময় আসিয়াছে।

হিসাব জুড়িয়া দেখিতেছি যে আমরা অনেক দূর পিছাইয়া পড়িয়াছি। যে ভারতে একদিন শত শত ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হইয়া চারিদিক হইতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ভেরী নিনাদিত হইত, আজ সেই সকল সমাজের মধ্যে অধিকাংশই লোপ প্রাপ্ত হইয়াছে। যেগুলি অবশিষ্ট আছে তাহাদের মধ্যে কয়েকটি ভিন্ন সকলই আজ নিস্তেজ মৃতপ্রায় হইয়া রহিয়াছে। অপ্রিয় সত্য বলিতেও দুঃখ হয়, আজ প্রধান সমাজগুলির মধ্যেও পূর্ব্বের সেই উদ্যম, সেই উৎসাহ, সেই প্রাণ দেখিতে পাওয়া যায় না। ইহার কারণ কি?

ব্রাহ্মসমাজ শত-বেণী-সঙ্গম। সকল ধর্ম্মক্ষেত্রে প্রবাহিত হইয়া গঙ্গা, যমুনা, সরস্বতী, গোদাবরী, সিন্ধু, কাবেরী প্রভৃতি শত অমৃতধারা আসিয়া এই মহাতীর্থে মিলিত হইয়াছে। সাধনাই হইতেছে ইহার লুপ্তসলিলা গঙ্গা। যেমন কালক্রমে গঙ্গানদীবক্ষে চড়া পড়িয়া ইহাকে কৃশ এবং নিস্তেজ করিয়া ফেলিয়াছে সেইরূপ আমাদের ব্রহ্মসাধনারূপ গঙ্গাও এখন নিস্তেজ হইয়া পড়িয়াছে। ইহা কেহই অস্বীকার করিতে পারিবে না। সাধনাই একমাত্র ভগবৎপ্রাপ্তির উপায়, সাধনার দ্বারাই আমরা ভগবৎশক্তিতে শক্তিমান হইতে পারি এবং সেই শক্তির প্রভাবে কর্ম্মক্ষেত্রে জয়লাভ করিতে পারি। এই শক্তির অভাবে আমাদের সকল কর্ম্ম পণ্ড হইয়া যায়। ব্রাহ্মসমাজের ঋষিগণ তাঁহাদের সাধনার শক্তিতে ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠা এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারকার্য্যে এত সফলতা লাভ করিতে পারিয়াছিলেন। আর আমরা সেই শক্তির অভাবে তাঁহাদের সেই সঞ্চিত সম্পত্তি নষ্ট করিয়া ফেলিতেছি। সাধনা যতই ক্ষীণপ্রভ হইতে থাকে ততই দ্বেষ, বিদ্বেষ, সাম্প্রদায়িকতা, প্রভৃতি শত্রুগণ চারিদিক হইতে আসিয়া আমাদিগকে অধিকার করিয়া বসে। এই সকল রক্তভুক্ পরগাছাগুলি ক্রমশঃ আমাদের রক্তমাংস শোষণ করিয়া আমাদিগকে তেজহীন, শক্তিহীন করিয়া দেয়। আমাদের শক্তিহীনতার কারণও ইহাই। একটু চক্ষু খুলিয়া দেখিলেই সকলেই ইহা স্পষ্ট দেখিতে পাইবেন।

সাধনা কাহাকে বলে? কায়মনবাক্যে পরমাত্মায় আত্মসমর্পণ করিবার ক্রিয়াকে সাধনা বলে। সাধনার সমাপ্তিকে মোক্ষ বা Salvation বলে। সর্ব্বশরীর দ্বারা ভগবানকে ধরিতে পারিলেই সিদ্ধিলাভ হয়। সাধনার প্রথম স্তরে সকল মান, অভিমান, অহঙ্কার বিলাসিতাকে

চূর্ণ করিয়া দিয়া নিজেকে ছোট করিতে হইবে। চৈতন্যদেব বলিয়াছেন সাধককে তৃণের ন্যায় সুনীচ হইতে হইবে। মহাত্মা যীশুর কণ্ঠেও সেই সত্যই ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিয়াছিল—Humble thyself. ঋষি কবীর বলিয়াছিলেন "হাম সবসে বুরে, হামসে ভলা সবকোই, য্যাসা কারিয়ে যো বুঝিয়ে মিত হমারে সেই" অর্থাৎ 'আমি সর্ব্বাপেক্ষা হীন, অপর সকলেই আমাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ, যিনি এইরূপ বুঝেন তিনিই আমার বন্ধু'। যাঁহারা আপনাদিগকে এইরূপ ছোট করিতে পারিয়াছেন তাঁহারাই ইহার শক্তি জানেন।

তৎপরে ধীরে ধীরে আপনাকে সমস্ত সংসার হইতে বাহিরে লইয়া যাইতে হইবে। ক্রমে আপনাকে সংসার হইতে এমন ভাবে নির্লিপ্ত করিতে হইবে যে সংসারের দাগ যেন মনে লাগিতে না পারে। কোন প্রলোভনই যেন চিত্তকে বিকৃত করিতে না পারে। তার পর সেই নিকটতম প্রিয়তম বন্ধুকে এমন ভাবে প্রাণে ধরিতে হইবে যে তাঁহার এবং আমার মধ্যে কোন ব্যবধান না থাকে।

গোরীঘাট নামক স্থানে সরযূতীরে এক জন সাধু আছেন। তাঁহার নাম নাগাবাবা, কারণ তিনি বস্ত্র পরিধান করেন না। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে আমি একদিন তাঁহাকে দেখিতে যাই। তিনি আমাকে দেখিবামাত্রই নিকটে আহ্বান করিয়া বসিয়া পড়িলেন। আমি যখন তাঁহার সম্মুখে উপস্থিত হইলাম তিনি আমাকে একেবারে জড়াইয়া ধরিয়া বলিতে লাগিলেন "চিপক রহ, চিপক রহ, চিপক রহ,"। তাঁহার হাব ভাব ও অপার আনন্দ দেখিয়া আমি স্তম্ভিত হইয়া গেলাম। তারপর অনেকক্ষণ ধরিয়া তিনি আমার সহিত ধর্ম্ম বিষয়ে কথাবার্ত্তা কহিতে লাগিলেন। একজন স্থানীয় ভদ্রলোক যিনি আমাকে সঙ্গে লইয়া গিয়াছিলেন, বলিলেন যে নাগাবাবা এখানে পাঁচ বৎসর-কাল আছেন। তাঁহাকে আর কখন কেহ এত কথা কহিতে শুনেন নাই। তাঁহার এত আনন্দও তাঁহারা আর কখন দেখেন নাই। হে ব্রাহ্ম বন্ধুগণ! যদি তোমরা ভগবানকে লাভ করিতে চাও তবে আমিও সেই ব্রহ্মানন্দী সাধুর কথায় তোমাদিগকে বলিতেছি "চিপক রহ, চিপক রহ"—আত্মহারা হইয়া তাঁহাকে ধরিয়া থাক। তখন দেখিবে যে তোমাদের সকল দুঃখ, সকল শোক, সকল কষ্ট, সকল অভাব দূরে চলিয়া গিয়াছে—তোমাদের আত্মা সেই পরম আত্মার সহিত অচ্ছেদ্য বন্ধনে মিলিত হইয়াছে। সে অবস্থা জাত হইলে তোমাদিগকে কোন পার্থিব শক্তিই তাঁহা হইতে বিচ্ছিন্ন করিতে পারিবে না। তখন দেখিবে যে তোমাদের শক্তি এক মহাশক্তিতে পরিণত হইয়াছে। সেই শক্তির প্রভাবে তোমরা সকল কর্ম্মক্ষেত্রেই অনায়াসে সফলতা লাভ করিতে পারিবে।

হে ভগবান, আজ আমাদিগকে তোমার সেই মোক্ষপ্রদ সাধনার পথে অগ্রসর করিয়া দাও, যাহাতে আমরা সর্ব্বদা তোমাকে হৃদয়ের কেন্দ্র করিয়া তোমারই প্রিয় কার্য্য সাধনে কৃতকার্য্য হইতে পারি। আবার জগৎ গাহিয়া উঠুক—

"প্রাণ ব্রহ্মপদে, হস্ত কর্ম্মে তাঁর,
ইহা হতে হবে জীবের উদ্ধার।" *

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

পূরবী—ধামার।

বীণা বাজাইয়া মন হরিলে হে—
মধুর মধুর ধ্বনি, গগন ছাইল রে ;
অনাহত তানে প্রাণ ভরি' মন হরিলে হে।

খাম্বাজ—তেতালা।

সব সঙ্গীত মঙ্গল বাণী
সকল বিদ্যার সৃজনকারিণী
অমর অসুর নর মুনি গুণী কিন্নর
যক্ষ রক্ষ গন্ধর্ব্ব সবে মিলি
নিতি গাহিছে গুণ তব বাখানি॥
ত্রিভুবন আদেশ তব বিনা অচল
তব দয়াতে নর হয় জ্ঞানী।
তব গুণ অনন্ত অন্ত নাহি পাই।
জগতে নাহি উপমা তোমার—নাহি—
সব মঙ্গল-সুখ-দায়িনী॥

ভূপালী—ধামার।

জাগিল আমার প্রাণ আজি গানে গানে।
মম চিত 'পরি ঝরিছে আশীষ তাঁহার।
রবি শশী তারক গ্রহ সবে গাহিছে
হরষে আকুলিত নাম তাঁর।
তাঁর শুনিলে নাম হয় লাভ জীবন ;
ঐ তাঁর লভি' পদরজ যায় দুখভার।
অকিঞ্চনপ্রভু নিত্য পদে ধরি রাখি' হে—
ডুবি' যাই আনন্দে অপার॥

---

* গত ৮ই মাঘ মাঘোৎসব উপলক্ষে আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে পঠিত।

খাম্বাজ—যৎ।

মগন হইনু অতুল শোভা নিরখিয়া।
আকুল মম হিয়া উঠিছে রাঙ্গাইয়া—
আপনে হারাইনু অতুল শোভা নিরখিয়া॥

বেহাগ—চৌতাল।

নাথ প্রেমচন্দ্র ডাকি হে ব্যাকুল চিতে
শঙ্কা বড় জাগিছে প্রাণে ; দেখ হে দুঃখ ঘিরিছে।
বিপদনাশন রক্ষা কর কল্যাণঘন শোকহর
দুঃখহরণ কৃপা-আগার তব চরণ ধরিছি॥
দশ দিশি উঠি' বেজে বিজয়বারতা, সুশীতল
করে চিত-শতদল—যত ভয় মরিছে।
এসো পরাণবন্ধু আজি দুঃখ শোক অপসারি—
পুরাও মহান আশা—এই দীন মাগিছে॥

খাম্বাজ—চৌতাল।

বংশী-ধ্বনি গো তোমার বাজিছে হৃৎবৃন্দাবনে।
মগ্ন বধির যেন করমে বৃথা—তব না শুনি আহ্বান।
রহিয়া রহিয়া মরমেতে জাগে যেন দামিনী চমকিত
নাম তব—নারে ধরি' বাঁধিবারে মম পরাণ॥
এস হে এস চিদাসনে আদিত্যবরণ অরূপ অতনু।
ভক্তি দাও শক্তি দাও—কলুষহরণ নাথ হে ;
চরণ ধরিয়া যাহে উতরিতে পারি ভবসিন্ধু,
তব নয়নে রাখি' হে অনিমেষ দুই মম নয়ান॥

বেহাগ—আড়াঠেকা।

হৃদয়ে মোর এসো তব চরণে প্রাণ ধাইছে হে।
জগত ভরিয়া নামি' তোমারি প্রেম
আকুল করি দিছে হে।

খাম্বাজ—ঠুংরী।

জননীর ডাক এসেছে ভাই,
কে যাবি রে আয়রে আয়।
ওপারে কে যাবি আয়,
প্রাণ যে সেথা আকুল ধায়,
পড়তে গিয়ে তাঁরি পায়,
সকল ব্যথা বলতে চাই।
সুগন্ধ যে আসছে বায়,
পাগল আরো করছে আমায়।
রইতে নারি আর যে হেথা,
রইতে নারি আর যে ব্যথা
জয় মা ব'লে ঝাঁপ দিনু তাই,
কে জানে ভাই উঠব কোথা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দান।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

মহাপুরুষ—জীবনে ও মরণে।

মহাপুরুষদের মৃত্যু নাই। শুভক্ষণে তাঁহাদের জন্ম—তাঁহাদের জীবন মানবের হিতসাধনে অতিবাহিত হয়, মরণও জীবের কল্যাণজনক। জগতে যখন অধর্ম্ম প্রবল হইয়া ধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিবার চেষ্টা করে, এবং জনসাধারণের মতিগতি যখন প্রকৃত মঙ্গলের পরিবর্ত্তে আপাত-সুখের দিকেই ধাবিত হয়,—তাহার জন্য পাপেরও প্রশ্রয় দিতে কুণ্ঠিত হয় না, তখন ভগবান রুদ্রমূর্ত্তিতে সংসারে অবতীর্ণ হন এবং সাধুচরিত ও শ্রদ্ধাবান ব্যক্তিগণের ভিতর দিয়া প্রকাশিত হইয়া ধর্ম্মসংস্থাপনে উদ্যত হন। সেই সকল শ্রদ্ধাবান সাধুপুরুষদিগের সংস্পর্শে আসিয়া দুর্ব্বলও সবল হয়, ভীরু যে সেও সাহস প্রাপ্ত হয় এবং হতাশ ও ব্যাকুলচিত্তেও আশার সঞ্চার হয়। এই সকল মহাত্মা মৃত্যুঞ্জয় এবং মৃত্যুর পরেও তাঁহাদের আদর্শ আমাদিগকে উৎসাহিত করে—তাঁহাদের জীবন হইতে আমরা অন্তরে এক আশ্চর্য্য প্রেরণা প্রাপ্ত হই। তাঁহাদের প্রচারিত সত্যসকল গৃহীত হইলে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথ এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার পথ সহজেই উন্মুক্ত হইয়া যায়। চলিত একটী কথা আছে—গেঁয়ো যোগী ভিখ পায় না। সেইরূপ মহাপুরুষদিগের জীবনকালে তাঁহাদের সংস্পর্শে সর্ব্বদা আসিবার ফলে তাঁহাদের মহাপুরুষত্ব খুব সুস্পষ্টরূপে আমাদের লক্ষ্যভূমিতে উপস্থিত হয় না ; তাঁহাদের তিরোভাব হইলে তাঁহাদিগকে ফিরিয়া পাইবার জন্য, তাঁহাদের মুক্তিপ্রদ সত্য বাণীসকল শুনিবার জন্য আমরা হায় হায় করিতে থাকি। তখন আমরা অনুসন্ধান করিতে ধাবিত হই যে, তাঁহাদের নিকট কি পাইলাম—উত্তরাধিকারসূত্রে ভোগ করিয়া আমাদের জীবনকে উন্নত করিবার জন্য তাঁহারা কি দান দিলেন, কি আদর্শ রাখিয়া গেলেন।

আজ যাঁহার তিরোভাবের দিন ; বিভিন্ন স্থানে স্মৃতি-সভার অনুষ্ঠান করিয়া দেশবাসীগণ যাঁহার পুণ্যস্মৃতি সযত্নে পোষণ করিতেছেন, আজ আমরা দেখিব, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের জন্য কি দান রাখিয়া গিয়াছেন। আজ আমরা সন্ধান করিয়া দেখিব, তাঁহার জীবনে এমন কি আদর্শ রাখিয়া গিয়াছেন, যাহা ধরিয়া আমরা জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিলে তাঁহার পরলোকগত আত্মা তৃপ্তি লাভ করিতে পারেন।

দেবেন্দ্রনাথের প্রথম দান—ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনে স্বাধীনতা।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ আমাদের গ্রহণের জন্য, আমাদের

আদর্শস্থলে রক্ষা করিবার জন্য যে সকল মহাসত্য দান করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী প্রধান সত্য হইতেছে এই যে, ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনে প্রত্যেক মানবের স্বাধীনতা আছে—দেশ কাল ও অবস্থানির্বিশেষে প্রত্যেক নরনারীরই ব্রহ্মবিৎ ও ব্রহ্মবাদী হইবার অধিকার আছে। এই সত্যের মধ্যে বর্তমান যুগের আমরা এতই ডুবিয়া আছি যে, এই সত্য প্রচারের গুরুত্ব আমরা এখন উপলব্ধিই করিতে পারি না। কিন্তু যে সময়ে এই সত্য ঘোষণা করা হইয়াছিল, তখন ইহা ভারতবাসীর প্রাণে বজ্রের আঘাত প্রদান করিয়াছিল। উপনিষদের কালে ভারতবাসীদের নিকট এই সরল ও সহজ সত্য যে সহজই ছিল, তাহার অনেক প্রমাণ পাওয়া যায়। কিন্তু নানা বিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে কালক্রমে এই সরল ও সহজ আধ্যাত্মিক সত্যের জ্যোতি ধূলিসমাচ্ছন্ন হইয়া পড়িয়াছিল। অবশেষে বর্তমান যুগে রাজা রামমোহন রায় সেই সত্যকে ধূলিনির্মুক্ত করিয়া মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের হস্তে ইহার জ্যোতি পুনরায় সমুদ্ধৃত করিবার ভার সমর্পণ করিলেন। দেবেন্দ্রনাথও উপযুক্ত জহুরির ন্যায় সেই সত্যের জ্যোতি পুনরায় সমুজ্জ্বল আকারে প্রকাশ করিয়া আধ্যাত্মিক পরাধীনতার অন্ধকারে চলিতে অভ্যস্ত দেশবাসীর সম্মুখে ধারণ করিলেন। যেদিন দেবেন্দ্রনাথ এই আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার কথা ব্রাহ্মধর্মগ্রন্থের প্রথমেই স্পষ্ট ভাষায় সন্নিবদ্ধ করিলেন, সেই দিনই বর্তমান যুগে দেশের আধ্যাত্মিক পরাধীনতা এবং সেই সঙ্গে সর্ববিধ পরাধীনতারই মূলোচ্ছেদ করা হইয়াছিল। সে সময়ে দেশবাসী উপলব্ধি করিতে পারেন নাই যে, তাঁহাদের কারাগারের দ্বার খুলিয়া দেওয়া হইয়াছে। সে সময়ে একদিকে, যদি বা কেহ পৌরোহিত্য গুরুবাদ প্রভৃতির অধীনতা অতিক্রম করিয়া স্বাধীনভাবে ভগবানের সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগসাধনের অধিকার উপলব্ধি করিতেন তথাপি তাহা প্রকাশ্যে ব্যক্ত করিতে সাহস পাইতেন না; অপর দিকে অন্যান্য ধর্মবক্তাগণ হিন্দুধর্মের ভাল মন্দ সমস্তই চূর্ণবিচূর্ণ করিবার জন্য দেশবাসীকে উত্তেজিত করিতেছেন। এই উভয়বিধ পরাধীনতা হইতে যিনি ভগবৎপ্রসাদে এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিকে রক্ষা করিয়া সংযত স্বাধীনতার পথ প্রদর্শনে সক্ষম হইয়াছেন, আজ আমরা তাঁহার উদ্দেশে নমস্কার করিতেছি।

দেবেন্দ্রনাথের দ্বিতীয় দান—সত্যধর্মের বীজমন্ত্র।

এই স্বাধীনতা যে সত্যধর্মের উপর দণ্ডায়মান, সেই সত্যধর্মের উদারতম, সবলতম ও সরলতম বীজমন্ত্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের আর একটী দান। সেই বীজমন্ত্র হইতেছে—তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব; একস্য তস্যৈবোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ শুভম্ভবতি—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা; একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারাই ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। এই বীজমন্ত্র এখন আমাদের নিকট স্বতঃসিদ্ধ সত্যরূপে উপলব্ধ হইলেও ইহার আবির্ভাবের সময় জনসাধারণের নিকট আধ্যাত্মিক স্বাধীনতার ন্যায় ইহাও স্বতঃসিদ্ধ প্রতীত হয় নাই। বলিতে কি, ব্রহ্মোপাসনার মূলমন্ত্র যে এত সংক্ষেপে প্রকাশ করিতে পারা যায়, তাহাই কাহারও ধারণাতেই আসে নাই। কিন্তু তাই বলিয়া এই ভাবটী সম্পূর্ণ নূতন নহে। এই ভাব সকল ধর্মের মধ্যে, সকল শাস্ত্রের ভিতর ন্যূনাধিক পরিমাণে বিক্ষিপ্ত ছিল এবং আছেও। শ্রুতি স্মৃতি পুরাণতন্ত্র সকলেরই ভিতর এই ভাব ওতপ্রোত হইয়া আছে। কেবল আমাদের শাস্ত্র কেন, সকল দেশের সকল শাস্ত্রেরই ভিতর এই ভাব অন্তর্নিহিত আছে। এই ভাব না থাকিলে কোনও ধর্ম দাঁড়াইতেই পারে না। কোন শাস্ত্র শাস্ত্রনামেরই যোগ্য হইতে পারে না। সার্বভৌমিক সত্যসকল তো চিরকালই আছে—দেশ কাল ও অবস্থানির্বিশেষে আছে ও থাকিবে। কিন্তু মহাপুরুষদিগের কাজ হইল, প্রয়োজনমত সেই সকল সত্যের মধ্য হইতে এক বা একাধিক সত্য বাছিয়া লইয়া দেশ কাল ও অবস্থাবিশেষে উপযুক্ত আকার প্রকার দিয়া জনসাধারণের নিকট বোধগম্যরূপে প্রকাশ করা। ইহা অসম্ভব মনে করি না যে, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তাঁহার প্রকাশিত বীজমন্ত্রের মূলসূত্র রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী হইতে পাইয়া থাকিবেন। রাজা রামমোহন রায়ের গ্রন্থাবলী আলোচনা করিলে তাহারও স্থানে স্থানে ঈশ্বরপ্রীতি ও মানবপ্রীতি ধর্মের মূল বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে দেখি। কিন্তু সত্যধর্মের বীজমন্ত্রকে ঈশ্বরপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনরূপ উদারতম ভিত্তির উপর দাঁড় করাইয়া সংহত আকারে পরিস্ফুটভাবে প্রকাশ করিবার সক্ষমতাতেই দেবেন্দ্রনাথের বিশেষত্ব।

মহর্ষি তাঁহার আত্মজীবনীতে এই বীজমন্ত্র তাঁহার অন্তরে প্রকাশিত হইবার একটী পদ্ধতি ব্যক্ত করিয়াছেন, কিন্তু সেটী বাহিরের পদ্ধতি। তাঁহার অন্তরে সত্যধর্মের সার্বভৌমিক তত্ত্ব বিশেষভাবে মূর্ত্তিলাভ না করিলে তাঁহার হৃদয়ে এই বীজমন্ত্র আবির্ভূত হইতে পারিত বলিয়া মনে হয় না। বৈদিক ঋষিরা যেমন ধ্যানস্থ হইয়াই অধ্যাত্মরাজ্যের অপূর্ব্ব সত্যসকল লাভ করিয়াছিলেন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও সেইরূপ ধ্যানস্থ হইয়াই ব্রহ্মোপাসনার মূলতত্ত্ব, সত্যধর্মের এই বীজমন্ত্র দৃষ্টি করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের অষ্টাবিংশ সাম্বৎসরিক উৎসবে একজন নিষ্ঠাবান চিন্তাশীল ব্রাহ্ম বক্তৃতাতে এই বীজমন্ত্রের

প্রশংসায় যাহা বলিয়াছিলেন, আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে তাহারই প্রতিধ্বনি করিয়া বলিতেছি যে, "পৃথিবীমধ্যে যে পর্য্যন্ত সত্যের সমাদর থাকিবে, যে পর্য্যন্ত মনুষ্যের হৃদয়সিংহাসনে বিবেকরাজার অধিষ্ঠান থাকিবে, যে পর্য্যন্ত বিশ্বরাজ্যের বিলয়দশা উপস্থিত না হইবে, সে পর্য্যন্ত উহা মানবপ্রকৃতিকে অবশ্যই বিভূষিত করিবে, সন্দেহ নাই।"

দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় দান—ধর্ম্মজীবন।

মহর্ষির তৃতীয় দান হইল তাঁহার ধর্ম্মজীবন। সংসারে থাকিয়া ধর্ম্মপালনের ব্রত আমরা তাঁহার জীবন হইতে শিক্ষা করি। এই ব্রত যে কিরূপ কঠোর, যিনি এই ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন, তিনিই তাহা জানেন। ব্রাহ্ম জীবনের উদ্দেশ্য গৃহের সকল কর্ম্মে ব্রহ্মপ্রতিষ্ঠা। ব্রাহ্ম-জীবনের মন্ত্র—জীবনের প্রতি পদে ভগবানের আদেশ মানিয়া চলা। ধন মান বা যশের জন্য, বা লোকের মনোরঞ্জনের জন্য বা অন্যান্য নানা কারণে লোকে নানা কার্য্য করে; কিন্তু ঈশ্বরপ্রীতির উদ্দেশ্যে কর্ত্তব্য সাধনেই আমাদের প্রকৃত মনুষ্যত্ব। যোগসাধক প্রকৃত ব্রহ্মোপাসকের লক্ষ্যই হইল ব্রহ্ম। সুখে দুঃখে সম্পদে বিপদে রোগে শোকে ধর্ম্মে কর্ম্মে সকল সময়ে সকল অবস্থাতেই ব্রহ্মকে জীবনে প্রতিষ্ঠা করাই হইল ব্রহ্মনিষ্ঠ গৃহস্থ যোগীর ব্রত। গৃহে গৃহে অমূর্ত্ত অপ্রতিম পরমাত্মার প্রত্যক্ষ উপাসনা প্রতিষ্ঠা করাই দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের প্রাণ ছিল। এখানে আমরা সাকার ও নিরাকার উপাসনার দৈধর্ম্ম্য বা উপকারিতা বিষয়ে কোনও বিচার উপস্থিত করিতে চাহি না। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবনের ভাবটুকুই ব্যক্ত করিতে চাই। তাঁহার ধর্ম্মজীবনের প্রতি লক্ষ্য করিলে আমরা এইটুকু বুঝি যে, তাঁহার মতে আবাল্য অপ্রতিম পরমাত্মার উপাসনা সম্ভব এবং সেইমত গৃহে গৃহে ব্যবস্থা করিলে মঙ্গল ও উন্নতি অবশ্যম্ভাবী। এই বিষয়ে তাঁহার মত সুদৃঢ় ছিল বলিয়াই তিনি শত নিন্দাগ্লানি, শত স্বার্থত্যাগ ও শত আত্মীয়বিচ্ছেদ সহ্য করিতেও সক্ষম হইয়াছিলেন। এই ধর্ম্মজীবনেই তাঁহার হৃদয়ের স্বাধীনভাব সম্যক্ পরিস্ফুট হইয়া উঠিয়াছিল।

দেবেন্দ্রনাথের চতুর্থ দান—দেশের স্বাজাত্যবোধ।

তাঁহার হৃদয়ের এই স্বাধীনভাব হইতেই তাঁহার স্বাজাত্য বোধ বা nationalistic spiritও প্রস্ফুটিত কমলের মত ফুটিয়া উঠিবার অবসর পাইয়াছিল। শতাব্দী প্রায় পূর্ব্বে সুদূর পশ্চিম হইতে কর্ম্মবাহুল্যের একটা প্রবল বায়ু আসিয়া আমাদের চক্ষে ধাঁধা লাগাইয়া দিয়াছিল; তাহার ফলে দাসমনোভাবের বীজসকল ভারতবাসীর অন্তরে রোপিত হইয়া গেল। রাজা রামমোহন রায়ের যথেষ্ট চেষ্টা সত্ত্বেও সেই বীজগুলি সম্যক্ উৎপাটিত হয় নাই। কিন্তু তাঁহার উত্তরাধিকারীরূপে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ তত্ত্ববোধিনী সভা, তত্ত্ববোধিনী পাঠশালা, হিন্দুহিতৈষী বিদ্যালয় প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান সমূহের ব্যবস্থা করিয়া এবং তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার সাহায্যে দেশের শাস্ত্রের ভিতর দিয়া ব্রহ্মজ্ঞান এবং দেশের যেখানে যাহা ভাল তাহা প্রকাশ করিয়া ঐ দাসমনোভাবের মূলোচ্ছেদ করিয়া এদেশের ধর্ম্মক্ষেত্র সুপরিষ্কৃত করিয়া স্বাজাত্যবোধের নবতর বৃক্ষসকল রোপণ করিলেন, যাহার ফল ধরিতে সবেমাত্র আরম্ভ হইয়াছে। বর্ত্তমান যুগে ভারতবাসী হিন্দুশাস্ত্রের প্রতি, হিন্দুধর্ম্ম ও সমাজের প্রতি শ্রদ্ধা ও ভক্তি যে ফিরাইয়া পাইয়াছেন, তাহার জন্য রাজা রামমোহন রায়ের পরে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের উদ্দেশে মস্তক অবনত হইয়া আসে। খুব গুরুতর সঙ্কটের সময়েও তিনি তাঁহার দৃঢ় মুষ্টিতে সমাজের হাল ধরিয়াছিলেন বলিয়াই দেশ বিজাতীয়তার স্রোতে আজ ভাসিয়া যায় নাই—ভারত আজ তাহার বৈশিষ্ট্য হারাইয়া বসে নাই। স্বাজাত্যবোধ সম্বন্ধে তাঁহার মন্ত্র ছিল—"স্বজাতির প্রতি নির্দ্দয় হইয়া ব্রাহ্মসমাজকে হিন্দুসমাজ হইতে বিচ্ছিন্ন হইতে দিও না"।

বর্ত্তমানযুগে বঙ্গদেশে, সমগ্র ভারতভূমির, সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার ও উন্নতির পথ যিনি সর্ব্বপ্রথম প্রশস্ত করিয়া দিয়াছেন; ভারতবাসীকে স্বাজাত্যবোধে সর্ব্বপ্রথম যিনি বিশেষ ভাবে উদ্বুদ্ধ করিবার ব্যবস্থা করিয়া স্বাধীনতা অর্জ্জনে প্রেরণা দিলেন এবং জগতের মহাসভায় বসিবার অধিকার দিবার সূত্রপাত করিলেন, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি জানাইবার এই অবসর যদি আমরা হেলায় হারাইতে না চাই, তবে আমাদিগকে ব্রহ্মোপাসনার ঐ বীজমন্ত্র অন্তরে ধারণ করিয়া সত্যসত্য তাহার সাধনা করিয়া ব্রাহ্মসমাজকে জয়যুক্ত করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজকে সযত্নে রক্ষা করিলে, অপ্রতিম ভগবানের সহিত মানবের প্রত্যক্ষ যোগসাধন যাহার ভিত্তি, সেই সত্যধর্ম্মকে পরিবার মধ্যে প্রতিষ্ঠিত করিলে, কেবল ব্রাহ্মসমাজের প্রতিষ্ঠাতা মহাপুরুষদিগেরই প্রতি শ্রদ্ধাভক্তি প্রদর্শিত হইবে না, কিন্তু এই সত্য ঋষিবাক্য জানাইতেছি যে, ইহার ফলে আমাদের প্রত্যেকের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হইবে, এবং দেশের ও সমাজের কল্যাণ সাধিত হইবে।

— —

* গত ৬ই মাঘ মহর্ষির স্বর্গারোহণ উপলক্ষে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে পঠিত।

হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে খেয়ালের স্থান

(শ্রীঅমিয়নাথ সান্যাল)

আজকাল উত্তর-ভারতীয় হিন্দুস্থানী সঙ্গীতবিৎগণের অধিকাংশই খেয়াল গায়ক এবং খেয়াল গান করিয়াই কৃতিত্ব লাভ করিতেছেন। খেয়াল ও ধ্রুপদের তুলনা করিলে দেখা যায় যে খেয়াল গায়ক ধ্রুপদ গায়কের সংখ্যার প্রায় দশ গুণ। ইহাও আবার প্রথম শ্রেণীর গায়কদের কথা; সুতরাং সাধারণ গায়কদের মধ্যে খেয়াল গায়কের সংখ্যা আরও বেশী হইবার কথা। সাধারণ গায়কদের কথা ছাড়িয়া দিলেও, প্রথম শ্রেণীর খেয়াল গায়কদের সংখ্যা পঞ্চাশ ষাট জনের কম হইবে না। তার মধ্যে আল্লাদিয়া খাঁ, আবদুল করিম, ফৈয়াজ খাঁ, নাসির খাঁ, বদল খাঁ, মুস্তাক্ হোসেন, গোকুর খাঁ, মজাফর খাঁ, রাজা ভাইয়া প্রভৃতি ধুরন্ধর খেয়াল গায়ক এখনও বর্ত্তমান। ইহা ব্যতীত, স্বনামধন্য পণ্ডিত ভাতখণ্ডের কলেজ হইতে বৃত্তিলব্ধ আরও পাঁচ-সাত জনের নাম করা যাইতে পারে যাঁহারা এখনও তরুণ, এবং শীঘ্রই যে তাঁহারা প্রথম শ্রেণীর গায়ক হইবেন, এরূপ প্রতিভা তাঁহাদের আছে। পরিশেষে বক্তব্য এই যে, বাইজী শ্রেণীর মধ্যেও প্রথম শ্রেণীর খেয়াল গায়িকাও অনেক আছেন; কিন্তু নিখিল-ভারতীয় সঙ্গীত-সম্মেলনে তাঁহাদের এখনও প্রবেশ-অধিকার জন্মে নাই; এবং তাঁহারা পুরুষ গায়কদের সমকক্ষ ও সমান আসনের অধিকারী কিনা—এ প্রশ্নেরও মীমাংসা হয় নাই।

উল্লিখিত খেয়াল গায়কদের গান,—Presentation (বা যাহাকে গায়কী বলা হইয়া থাকে)—যাঁহারা শুনিয়াছেন, তাঁহারাই খেয়াল গানের বিশিষ্টতা ও মনোহারিত্ব এই দুই গুণের পরিচয় পাইয়াছেন।

খেয়ালের সৃষ্টি সম্বন্ধে ঐতিহাসিক সত্যাসত্য নির্দ্ধারণ করিবার উপায় না থাকিলেও, যে সকল কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহা অবিশ্বাস করিবার কোনও কারণ দেখিতে পাওয়া যায় না। সমস্ত বাদ দিলেও মূল সত্যটুকু রহিয়া যায়। তাহা চিরন্তন এবং সর্ব্বপ্রকার চারুশিল্পকলার ক্রমবিকাশ ও বৈচিত্র্যের ইতিহাস। তাহা এই—মানুষের মন সর্ব্বদাই নূতন সৌন্দর্য্য সৃষ্টি করিতে প্রয়াস পাইতেছে; এবং পৃথিবীতে একটা ভাল জিনিষ, একটা সুন্দর জিনিষ আছে বলিয়া যে আরও দশটা ভাল ও সুন্দর জিনিষ হইবে না, ইহা ব্যবহারিক ও চরম, দুই প্রকার সত্যেরই বাহিরে।

যদিও দুই তিন প্রকারের কিম্বদন্তী প্রচলিত আছে, তাহাদের মধ্যে একটা সাধারণ ও সহজ সারাংশ গ্রহণ করিলে, নিম্নলিখিত প্রকারের ঘটনা কল্পনা করা যায়; এবং তাহাকে সত্য বলিয়া ধরিয়া লইতে আপত্তি থাকিলেও, সম্ভব বলিয়া স্বীকার করিতে কুণ্ঠা হওয়া উচিত নহে।

আকবর বাদশাহের পরবর্ত্তী কোনও সময়ে সদারঙ্গ নামক জনৈক প্রসিদ্ধ গায়ক মহম্মদ্ শাহ নামক কোনও বাদশাহের সভায় গায়ক ছিলেন। ইনি তানসেনের দৌহিত্র-বংশের লোক; এবং ইঁহার পৈত্রিক নাম ন্যামৎ খাঁ ছিল। শুনা যায় যে, ইঁহার পিতৃপুরুষগণ বীণাবাদক ছিলেন এবং দরবারে বসিয়া ধ্রুপদ গানের সঙ্গে বীণা বাজাইতেন। পরে ঐ প্রকার রীতি ইহাঁরা অপমান-সূচক বোধ করিয়া ত্যাগ করিয়াছিলেন, এবং স্বাধীন ভাবে সঙ্গীত-চর্চ্চা করিতেন। সুতরাং সদারঙ্গ Reactionary schoolএর লোক ছিলেন বুঝা যায়। তিনি ধ্রুপদ গান করিতেন এবং ধ্রুপদ রচনাও করিয়া গিয়াছেন। তাঁহার দুইজন তরুণ ইতরজাতীয় পরিচারক ছিল। সদারঙ্গ তৎকালীন ধ্রুপদের রাগ-রাগিণী অবলম্বন করিয়া এবং স্বীয় প্রতিভা ও কল্পনা-শক্তির সাহায্য লইয়া অভিনব সঙ্গীত রচনা ও তাহারই উপযোগী অভিনব প্রণালী উদ্ভাবন করিয়া তাঁহার পরিচারকদিগকে শিক্ষাদান করেন। ইহারা কথঞ্চিৎ পটু হইলে সদারঙ্গ ইহাদিগকে রাজ-দরবারে পেশ্ করেন; এবং ইহাদের অভিনব সঙ্গীত দরবারে উপস্থিত সভাসদদিগকে শুনান হয়। দরবারে বোধ হয় গোঁড়া সমজ্দার অপেক্ষা উদারপন্থী শ্রোতার সংখ্যা বেশী ছিল। তজ্জন্য এই তরুণ গায়কদের কণ্ঠনিঃসৃত অভিনব সঙ্গীত অনেকেরই চিত্তাকর্ষণ করে। ফলে, এই শ্রেণীর সঙ্গীতের উত্তরোত্তর অনুশীলন, শ্রীবৃদ্ধি ও মর্য্যাদা লাভ হইতে থাকে। সদারঙ্গ ধ্রুপদ-গায়ক হইয়াও যে এই প্রকার পাগলামির সৃষ্টি করেন, তজ্জন্য তাঁহাকে ধ্রুপদের গোঁড়াদিগের মুখে নানা প্রকার টিটকারী সহ্য করিতে হইয়াছিল, ইহাও কথিত আছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, ঠুংরীর সৃষ্টিকর্ত্তাকেও এ প্রকার ব্যবহার সহ্য করিতে হইয়াছে। ইহা ঠুংরীর ইতিহাস আলোচনার সময় জানা যাইবে।

যাহাই হউক, ক্রমে ইহার নূতনত্ব ও চমৎকারিত্ব সঙ্গীতামোদীদিগকে এতই মুগ্ধ করিয়াছিল যে, ঐ প্রকার রচনা, গীত-প্রণালী বা ঢং প্রচলিত হইয়া যায়। এমন কি, মহম্মদ শাহ স্বয়ং অনেকগুলি খেয়াল রচনা করিয়া গিয়াছেন; তাহা এখনও গায়কেরা গাহিয়া থাকে।

কিম্বদন্তীগুলি নানাপ্রকার কাল্পনিক ও অসম্ভব ঘটনার শাখা-পল্লব দ্বারা বেষ্টিত বলিয়া এবং অতিরঞ্জন ও আড়ম্বর-বহুল বলিয়া তাহাদের উল্লেখ প্রশস্ত বলিয়া বোধ হইল না। যে অংশ সত্য বলিয়া বোধ হইয়াছে তাহাই বলা হইয়াছে। অবশ্য ইহা দেখা যায় যে, একটা প্রাচীন

ঘটনা বা কিম্বদন্তী অসম্ভব কল্পনামূলক বা অদ্ভুত হইলেও, লোকে বিশ্বাস করিতে পশ্চাৎপদ হয় না। সেই প্রকার ঘটনা লিখিয়া লাভও নাই, সময়ও নাই।

সদারঙ্গের পরে বিশেষ উল্লেখযোগ্য নাম পাওয়া যায় না। সদারঙ্গ ও মহম্মদ শাহ রচিত ন্যূনাধিক আড়াই শত খেয়াল প্রচলিত আছে। ইহাদের মধ্যে অধিকাংশই "বধাওবা" বা উৎসবাদির জন্য মাঙ্গলিক গান; কতকগুলি নায়ক-নায়িকা-ভাব অবলম্বন করিয়া রচিত; এবং কতকগুলি মিশ্র অর্থাৎ নায়কাদির ভাব ও প্রকৃতি বর্ণনা দুইই আছে; অতি অল্পসংখ্যক ঈশ্বরবিষয়ক প্রার্থনার গানও আছে। উল্লেখযোগ্য এই যে, মহম্মদ শাহ রচিত কতকগুলি গানে শ্রীরাধাকৃষ্ণের লীলাদির বর্ণনা আছে।

তানসেনী যুগের ধ্রুপদ ধামার প্রভৃতি রচনাগুলি পাঠ করিলে প্রথমেই এই মনে হয় যে, ভাগ্যক্রমে আকবরের ন্যায় বাদশাহ ছিলেন, তাই তানসেনের ন্যায় প্রতিভার বিকাশ সম্ভবপর হয়। অপর দিকে অনেক রচনায় আকবর বাদশাহের সভা বর্ণনা, বাদশাহের মাহাত্ম্য প্রভৃতি ব্যক্তিগত ভাব লক্ষ্য করিলেই একটু মোসাহেবীর চেষ্টা বুঝা যায়। যাহাই হউক, এই প্রকার গান শুদ্ধ রাগ-রাগিণীর রচনা ভঙ্গীর জন্যই এখনও পর্য্যন্ত চলিত আছে। কারণ, ভক্তিরস বা শৃঙ্গার রসে যেমন Universal appeal আছে—ইহাতে তাহা নাই। প্রায়ই দেখা যায়—আকবরকে প্রভু ও তানসেনকে ভৃত্য এই প্রকারের তুলনা আছে। ইহার মধ্যে আমাকে ও আপনাকে মোহিত করিবার কিছুই নাই, যদিও তানসেনের পক্ষে ঐরূপ রচনা বিশেষ দরকার ছিল।

খেয়াল রচনায় ঐ প্রকারের দাস্যভাব (মানুষের প্রতি) পাওয়া যায় না। বরং অনেক গানে সদারঙ্গ ও মহম্মদ শাহ যে পরস্পরের পরম বন্ধু ইহারই উল্লেখ আছে। মোটের উপর ধ্রুপদগুলি যেমন aristocratic খেয়ালগুলি তেমনই democratic ভাবাপন্ন।

দ্বিতীয়তঃ—mystic বা symbolic গান—(আধ্যাত্মিক গান বলা যাইতে পারে) ধ্রুপদে অনেক পাওয়া যায়। খেয়ালে একেবারেই তাহা নাই। অর্থাৎ খেয়ালের সময় হইতে বা তাহার কিঞ্চিৎ পূর্ব্বে classical গানের মধ্যে romance এবং humanisation প্রবেশ লাভ করিয়াছিল, ইহা আন্দাজ করা যাইতে পারে। অনেকে জিজ্ঞাসা করিতে পারেন যে, তাহার পূর্ব্বে কি romantic গান বা সাধারণের উপযোগী গান ছিল না? ছিল—কিন্তু তাহা classical বলিয়া; দরবারী বা মাইফেলী বলিয়া চলিত ছিল না। আরও সতর্কতার সাহিত বলা যাইতে পারে যে, যদিই বা চলিত ছিল, তাহা অতি অল্প। শ্রীকৃষ্ণ-রাধা সম্বন্ধে যে সকল গান ছিল, তাহা মন্দিরেই হইত এবং অধিকার ও সম্প্রদায়ভুক্ত ছিল। সাধারণ লোকের মধ্যে যাহা ছিল, তাহা দেশী বা Provincial শ্রেণীর অন্তর্গত। এখনও এই সব গান শুনিতে পাওয়া যায়।

এই কথার অবতারণা করিবার তাৎপর্য্য এই যে, যে কয়েকটী কারণে খেয়াল গান classical অধিকার লাভ করে—তাহার একটী প্রধান কারণ এই যে রচনাগুলির মধ্যে universal human interest ছিল—দুর্ব্বোধ্য আধ্যাত্মিকতা ছিল না; এবং democratic ছিল। অন্যান্য কারণের ক্রমশঃ আলোচনা করা যাইতেছে।

সদারঙ্গের যুগের পরেই আধুনিক যুগ। গোয়ালিয়রের মহম্মদ খাঁ, হর্দ্দু খাঁ, হাস্সু খাঁ, নথ্থু খাঁর নাম এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য। ইঁহাদের জীবনও বিচিত্র ঘটনাপূর্ণ।

মহম্মদ খাঁ আন্দাজ একশত পঞ্চাশ বর্ষ পূর্ব্বে বর্ত্তমান ছিলেন। ইনি প্রথমে গোয়ালিয়রের নিকটবর্ত্তী রেবা নামক স্থানে বাস করিতেন। পরে গোয়ালিয়রের রাজদরবারের গায়ক হইয়াছিলেন। ইঁহার জায়গীর ছিল, এবং অবস্থা সাধারণ লোকের অবস্থা অপেক্ষা স্বচ্ছল ছিল। ইঁহার পুত্র-পৌত্রাদির কোনও কথা শুনা যায় না। ইনি তৎকালের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ খেয়াল গায়ক ছিলেন। ইঁহার কণ্ঠ হইতে সম্পূর্ণ তিন সপ্তক তান নির্গত হইত। ইনি কলাবিদ্যা-দান বিষয়ে অত্যধিক কৃপণ ছিলেন। কাহাকেও শিখাইতেন না এবং রাজদরবার ব্যতীত কোথাও গান করিতেন না। শুনা যায় যে, ইনি কণ্ঠ ও স্বরের সুস্থতা অব্যাহত রাখিবার জন্য গলদেশ গরম কাপড় দ্বারা সর্ব্বদা ঢাকিয়া রাখিতেন, জলভক্ষণ ত্যাগ করিয়াছিলেন এবং পাছে কাণে বেসুরা আওয়াজ যায় তজ্জন্য কাণও তুলা দিয়া ঢাকিয়া রাখিতেন।

ইঁহার যখন প্রৌঢ়াবস্থা তখন রেবায় হর্দ্দু, হাস্সু ও নথ্থু খাঁ নামক তিন ভাই উদীয়মান যুবক গায়ক ছিলেন। ইঁহারা সঙ্গীতকলা শিক্ষা করিবার অভিপ্রায়ে মহম্মদ খাঁর সমীপস্থ হইলেও মহম্মদ খাঁ তাহাতে স্বীকৃত হন নাই। ফলে—ইঁহারা গুপ্তভাবে থাকিয়া মহম্মদ খাঁর গীত শ্রবণ করিতেন এবং স্বগৃহে অভ্যাস করিতেন। ক্রমে ইঁহারাও খ্যাতনামা গায়ক হইয়া পড়েন। এক দিন ইঁহারা তিন ভাই রাজ-দরবারে উপস্থিত হইয়া রাজাকে গান শুনাইবার নিবেদন করেন। মহম্মদ খাঁও সভায় উপস্থিত ছিলেন। ইঁহারা তিনজনে একসঙ্গে গান করিতেন এবং তাঁহাদের কণ্ঠস্বরও সমধিক প্রশস্ত ছিল। ইঁহাদের গান শুনিয়া রাজা বিশেষ আনন্দিত হন এবং ইঁহাদিগকে যথোচিত পুরস্কৃত করেন। সেই

মাইফেলের মধ্যেই মহম্মদ খাঁ ও ইহাঁদের মধ্যে ঈর্ষার সঞ্চার ও বাদানুবাদ হয়। তখন ইঁহারা মহম্মদখাঁকে সঙ্গীতযুদ্ধে আহ্বান করেন। মহম্মদ খাঁও নিজের প্রতিষ্ঠা অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য গান করেন। মহম্মদ যে সকল "কর্তব" দেখাইয়াছিলেন, ইঁহারাও সেগুলি দেখাইতে কৃতকার্য্য হইয়াছিলেন। পরিশেষে মহম্মদ খাঁ সমবেত ব্যক্তিবর্গকে আহ্বান করিয়া বলেন যে, আমি এইবার যে তান লইব, ইহা কাহারও সাধ্য নহে যে অনুকরণ করে। এবং অনুকরণ করিতে চেষ্টা করিলে মৃত্যু পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই বলিয়া সার্দ্ধ-ত্রিসপ্তক স্বর দ্বারা এক নিঃশ্বাসে তিনবার আরোহী ও অবরোহী তান গাইয়াছিলেন। তিন ভাই এই অদ্ভুত কার্য্যের অনুকরণ করিতে একটু ইতস্ততঃ করিতেছিলেন। কিন্তু হাস্সু খাঁ ক্ষান্ত থাকিতে পারিলেন না। তিনি বলিলেন আমি ঐ প্রকারে তান দেখাইব। এবং সভাস্থ অনেকের নিষেধ অগ্রাহ্য করিয়া ঐ প্রকার তানের অনুকরণ করিয়াছিলেন; কিন্তু তৎক্ষণাৎ তাঁহার ফুস্‌ফুস্ ফাটিয়া যায় ও রক্তবমন করিতে করিতে প্রাণত্যাগ করেন। সভাস্থ সকলেই যৎপরোনাস্তি সন্তপ্ত হইয়া হাহাকার করিতে লাগিল। মহম্মদ খাঁও অতীব অনুতপ্ত হইয়া বলিলেন যে, হায়, কেন আমি এই তান ইহাদের শুনাইলাম! ইহারা যুবক—হিতাহিত বিবেচনা না করিয়া অনুকরণ করিতে গিয়া, এমন একটি উজ্জ্বল তারকা ম্লান হইয়া গেল—ইত্যাদি।

যাহা হউক, অবশিষ্ট দুই ভাই মহম্মদ খাঁর সমতুল্য গায়ক বলিয়া প্রসিদ্ধ হইলেন; এবং রাজ-দরবারে আসন ও প্রতিষ্ঠালাভ করিলেন। ইহার পর মহম্মদ খাঁর আর বিশেষ উল্লেখ পাওয়া যায় না। সম্ভবতঃ তিনিই হদ্দু ও নথ্থু খাঁকে সুমার্জ্জিত গায়করূপে পরিণত করেন।

হদ্দু খাঁর সম্বন্ধে অনেক গল্প প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে দুইটি উল্লেখযোগ্য। প্রথম—তাঁহার কঠোর একাগ্র সাধনার প্রণালী। যদিও তিনি বিবাহিত ছিলেন, তথাপি একাদিক্রমে দশ বর্ষ কাল তিনি একাকী এক ঘরে বাস করিয়া কণ্ঠসাধনা করিতেন এবং সংযত ভাবে আহার-বিহারাদি করিতেন। তাঁহার ঘরে তাঁহার পনের-কুড়িজন শিষ্য পালা করিয়া ক্রমান্বয়ে তম্বুরা ছাড়িয়া স্বরযোজনা করিত—যাহাতে সকল সময়েই কোনও না কোনও রাগ-রাগিণী ধ্বনিত হইতে থাকিত। তাঁহার কঠোর ব্রহ্মচর্য্য তাঁহার কুটুম্বগণের অভিযোগের বিষয় হইয়াছিল।

দ্বিতীয়—কোনও দিন, সভাতে হদ্দু ও নথ্থু খাঁ বলিয়াছিলেন যে তাঁহারা তান দ্বারা হস্তীর গতিরোধ পর্য্যন্ত করিতে পারেন। এই প্রকার কথার উপর বিশ্বাস করিয়া রাজা সত্যসত্যই একটি মাইফেল করিয়া—অবশ্য মাঠের মধ্যে—তন্মধ্যে একটি গুজরাটি হস্তী ছাড়িয়া দেন এবং সেই হস্তীটি ইহাদের সমস্বরের অদ্ভুত তান শুনিয়া ভীত হইয়া পলায়ন করে।

এই ঘটনা অবিশ্বাস্য নহে; অন্ততঃ যাঁহারা গোয়ালিয়রের খেয়ালীদের নিকট হলক্ তান শুনিয়াছেন, তাঁহারা বিশ্বাস করিবেন যে, যদি প্রশস্ত কণ্ঠস্বর হয়, এবং ত্রিসপ্তক পর্য্যন্ত বিস্তৃত হয়, তাহা হইলে, এইরূপ দুইজন খেয়ালিয়া একসঙ্গে দুই-তিনবার তিনসপ্তক হলক্ তান লইলে যদি হস্তী পলায়ন করে, তাহা হইলে হস্তীকে বিশেষ দোষ দেওয়া যায় না। হলক্ তান কি প্রকারের বস্তু তাহা পরে আলোচনা করা যাইবে। আপাততঃ এই ঘটনা হইতে বুঝা যায় যে, হদ্দু ও নথ্থু খাঁর অসাধারণ প্রশস্ত কণ্ঠস্বর ছিল এবং ততোধিক সাহসও ছিল। নতুবা ইহার তাৎপর্য্য এই নহে যে, হস্তীকে ভয়প্রদর্শন করিতে পারিলেই সঙ্গীতের চরম পরাকাষ্ঠা হয়। ইহা হইতে আরও সপ্রমাণ হয় যে, তৎকালে ঐ প্রকার কণ্ঠস্বরশালী লোক ছিল এবং আদর্শও ঐ প্রকারের ছিল।

এই প্রকার ঘটনা যে স্থানে ঘটিতে পারে, সে স্থান যে খেয়ালের পীঠস্থান হইয়া থাকিবে, ইহা খুবই স্বাভাবিক। এখনও পর্য্যন্ত গোয়ালিয়র Classical খেয়ালের জন্য বিখ্যাত। অতঃপর খেয়ালের অদ্ভুত মাহাত্ম্য সম্বন্ধে আর কোনও গল্প শুনা যায় না।

ইহাদের পরে, নিসার হোসেন, ইনায়েৎ হোসেন, বাহাদুর হোসেন, রহমৎ খাঁ, আহমদ্ খাঁ, মুন্না খাঁ, বড়ে দুঁদি খাঁ আলিয়া ও ফত্তু নামক কয়েক জন ধুরন্ধর খেয়ালীর খ্যাতি শুনা যায়। ইহারা কিছু দিন আগেও জীবিত ছিলেন; এবং এখন যাঁহারা ষাট বৎসরের উপর বৃদ্ধ, এমন অনেক সঙ্গীতামোদী ব্যক্তির নিকট ইহাদের কথা শুনিয়াছি।

উল্লিখিত খেয়ালীদিগকে প্রথম শ্রেণীর খেয়ালী বলা যাইতে পারে। অর্থাৎ প্রথম শ্রেণীর Artist আমি তাঁকেই মনে করি, যিনি Institution এর নিয়ম লঙ্ঘন না করিয়াও বিশিষ্ট বা ব্যক্তিগত ভাবে কোনও Art বা চারুশিল্পকলার উন্নতি সাধন করিতে পারেন ও বিচিত্র সৃষ্টি করিতে পারেন। আমাদের গান-বাজনার সমালোচনা সম্বন্ধে কয়েকটা গোড়ার কথা এস্থলে আলোচনা করার প্রয়োজন মনে করিতেছি। গান-বাজনার দুইটা ঢং আছে; প্রধানতঃ বা মূলতঃ—একটি Classical অপর Provincial বা দেশী। একই গান, এমন কি, রাগ-রাগিণী ভিন্ন ভিন্ন দেশে কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ ভিন্ন মূর্ত্তি ধারণ করে; আবার সেই গানই সমস্ত দেশের সেরা

কলাবিৎদিগের পরস্পর আলোচনা ও সম্বন্ধ দ্বারা একটি প্রধান বিশিষ্ট মূর্ত্তি ধারণ করে। ইহা ধ্রুপদেও আছে, খেয়ালেও আছে, টপ্পাতে কিছু কিছু আছে, ঠুংরিতে বিলক্ষণ আছে। বলা বাহুল্য, দুই প্রকার ঢংই সৌন্দর্য্য-সৃষ্টির সহায়তা করিয়াছে।

মনে করা যাউক—রামপুরের একটী অপরিণত-বয়স্ক গায়ক রামপুরী ঢংএ গান শুনাইতেছে। তদ্রূপ, গোয়ালিয়রের খাস দেশী ঢংএ আর একজন গায়ক গান শুনাইতেছে। উভয়ই অতি চমৎকার; কিন্তু দেখা গেল যে, কতকগুলি "কাম" বা কর্ত্তব গোয়ালিয়রী ঢংএ পাওয়া যায় ও রামপুরী ঢংএ পাওয়া যায় না, এবং তদ্বিপরীত। মনে করা যাউক—ইহাদের দুইজনের নিকট হইতে একজন প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তি গান শিখিল। এখন আমরা দেখিব যে, শেষোক্ত ব্যক্তি এমন একটি Standard সৃষ্টি করিয়াছে, যাহাকে আমরা "দেশী" বলিতেই পারি না; কিন্তু Classical বলিতে পারি। আমাদের হিন্দুস্থানী সঙ্গীতের ইতিহাসে এই প্রকার অসংখ্য ঘটনা পাওয়া যায়। দুই একটি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। স্বয়ং তানসেন প্রথমাবস্থায় মথুরাদেশী ছিলেন। তখন হরিদাস স্বামীর নিকট তাঁহার সঙ্গীত শিক্ষা হয়। তার পর, গোয়ালিয়রের মহম্মদ গৌসএর নিকট দরবারী ও গোয়ালিয়রী ঢং (যাহা হইতে গুবরহার বাণ্ হইয়াছে) শিক্ষা করিয়া যখন দরবারে গান করেন, তখন তিনি এমন একটি উচ্চতর স্তরে সঙ্গীতকে পৌছাইয়া দেন, যাহাকে Classical বলিতে পারি। অবশ্য Classical ঢংও দেশ, কাল, পাত্র হিসাবে Relative; এক যুগের Classical পরবর্ত্তী কোনও যুগের সাধারণ ঢং হইয়া যাইতে পারে। আর একটি উদাহরণ—বীণা সুরবাহার ও সেতার বাদ্যে অনেক দিন হইতে (অর্থাৎ তানসেনীয় যুগ হইতে) দুইটি বিশিষ্ট ঢং চলিয়া আসিতেছিল—পূরববাজ ও পছাঁওবাজ—অর্থাৎ পূর্ব্বদেশীয় বাজনা ও পশ্চিমদেশীয় বাজনা। দিল্লীকে রাজধানী করিলে দিল্লীর পূর্ব্বদিকের দেশের বাজনা পূরববাজ এবং পশ্চিমস্থ দেশের বাজনা পছাঁওবাজ। এখনও ইহাদের বিশুদ্ধ Representative আছে—আমি একজনকে মনে করিতেছি—জয়পুরের হাফিজ খাঁ। ইনি বিশুদ্ধ পছাঁওবাজ। অমৃতসেনজী নামক সুপ্রসিদ্ধ বীণাকর, ও তাঁহার বংশীয় বাদকগণ সকলেই পছাঁওবাজ বাজাইতেন। আবার বন্দে আলী খাঁ বীণকার পূরববাজ ছিলেন। ইমদাদ খাঁ পূরববাজ ছিলেন। ইমদাদের পুত্র আধুনিক শ্রেষ্ঠ সেতারী ইনায়েৎ খাঁর মধ্যে কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন লক্ষ্য করিতে পাই—যাহাতে বুঝা যায় যে, ইনি পূরববাজ রাখিয়াছেন এবং পছাঁওবাজে অনেক সুন্দর "যোড়ের কাজ"ও যোজনা করিতেছেন। তদ্রূপ, মজিদ খাঁ নামক বীণকারও পূরব ও পছাঁওবাজের সুন্দর সম্মিলন করিয়াছেন। পরলোকগত প্রসিদ্ধ সরোদীয়া ফিদা হুঁসেন খাঁ (ইনি লক্ষ্ণৌ Conferenceএ সরোদ বাজনায় প্রথম হইয়াছিলেন) প্রধানতঃ পছাঁওবাজী ছিলেন এবং ফরমাইষ্ করিলে মধ্যে মধ্যে পূরববাজ গৎ ইত্যাদি বাজাইতেন। আধুনিক শ্রেষ্ঠ সরোদীয়া হাফিজ আলি খাঁ পূরব ও পছাঁওবাজের সুমধুর সম্মিলন করিয়াছেন। ফলে—Standard উন্নত হইতেছে। আমার বিশ্বাস যে Provincial ঢংগুলির সার সৌন্দর্য্য গ্রহণ করিয়া, mannerism গুলি বর্জ্জন করিয়া যে প্রতিভাশালী ব্যক্তি সৌন্দর্য্য-সৃষ্টি করিতে পারে, তাহাকে প্রথম শ্রেণীর বলা যায় এবং তাহার রচিত সৌন্দর্য্যকে Classical নাম দেওয়া যাইতে পারে।

উপরি-উল্লিখিত গায়কগণ সকলেই Institution] এবং গুরুমুখী বিদ্যা শিক্ষা করিয়াও অনেক কিছু নূতন করিয়া গিয়াছেন এবং এই উন্নতিশীলতার জন্য খেয়াল গানের উত্তরোত্তর শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। *

সাত্ম্য ও পথ্য।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

মাদেয়নামে পরিভাবিত মৎস্যের মধ্যে রোহিত বর্ম্মী (বাইম্) মুরল এই কয়টি মাত্র আমাদের সুপরিচিত। পাঠীন শব্দের অর্থ বোয়ালমাছ বলিয়া আমাদের ধারণা। এই মৎস্য হব্য-কব্যে উক্ত হইয়াছে। তন্নিবন্ধন আমরা বোয়াল মাছের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিয়া থাকি এবং কালীপূজা প্রভৃতির ভোগেও দিয়া থাকি। বগুড়া জেলাতে প্রসিদ্ধ ভবানী মাতার ভোগে প্রত্যহই বোয়াল মাছ দেওয়া হইয়া থাকে। ময়মনসিংহ যামালপুরে দয়াময়ী মাতার ভোগেও প্রতিদিন বোয়াল মাছ দেওয়া হয়। অমর সিংহ "পাঠীন" "সহস্র দংষ্ট্র" এই উভয়কে একার্থে প্রযুক্ত করিয়াছেন—"সহস্রদংষ্ট্রঃ পাঠীনঃ" সহস্র অর্থাৎ অনেক দংষ্ট্রা (দাঁত) আছে ইহার, সহস্রদংষ্ট্র শব্দের এই অর্থ টীকাকার ভানুজী এবং বাঙ্গালী টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী উভয়েই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। বোয়াল মাছের অনেক দন্তও দেখিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সুশ্রুতে স্পষ্টই পাঠীন ও সহস্রদংষ্ট্র এই উভয়ের ভিন্নতা প্রতিপাদিত হইয়াছে। রঘুনাথ চক্রবর্ত্তীর টীকা পাঠেও বুঝা যায় যে, পাঠীনের ও সহস্রদংষ্ট্রের মধ্যে অবান্তর ভেদনিবন্ধন একত্ব বিষয়ে মতভেদ

* 'ভারতবর্ষ'—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫।

চিরদিনই চলিত আছে। রঘুনাথ অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "বৃহৎ বোয়াল ইতি খ্যাতে" অর্থ—সহস্র-দংষ্ট্র ও পাঠীন এই দুইটী শব্দই বোয়াল নামে প্রসিদ্ধ মৎস্যের বাচক। অতঃপর অমর-মতের সমর্থন-প্রসঙ্গে বলিয়াছেন যে,—"অন্যত্র তু সহস্রদংষ্ট্রো বোদালঃ, পাঠীনশ্চিত্র-বোদাল ইতি"।

অন্যান্য কোষগ্রন্থে সহস্রদংষ্ট্র শব্দের অর্থ বোদাল এবং পাঠীন শব্দের অর্থ চিত্র-বোদাল অর্থাৎ যাহার গায়ে চক্র চিহ্ন আছে। অমর সিংহ অবান্তর সূক্ষ্ম ভেদ স্বীকার না করিয়াই সম্ভবত উভয়কে এক পর্য্যায়ে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। বোয়াল মাছের গায়ে চক্রচিহ্ন দেখা যায় না, হয়ত কোন সময়ে তাদৃশচিহ্নিত মাছ ছিল, অথবা কোন দেশে এখনও থাকিতে পারে। "কালো হ্যয়ং নিরবধি র্বিপুলা চ পৃথ্বী"। বোদালশব্দের দকারটি প্রাকৃত-প্রভাবে বিলুপ্ত হওয়ায় "বোয়ালরূপ দেখা দিয়াছে"। প্রাচীন বাঙ্গলা সাহিত্যে এবং তন্ত্রের নানা স্থানে বদাল, বদালী নাম দেখিতে পাওয়া যায়।

সুশ্রুতে নাদের ও সামুদ্র এই দুই শ্রেণীর মৎস্যের সাধারণগুণ এবং মৎস্যভেদে বিশেষ গুণ কথিত হইয়াছে। যথা,—

"নাদেয়া মধুরা মৎস্যা গুরবো মারুতাপহাঃ।
রক্তপিত্তকরাশ্চোষ্ণা বৃষ্যাঃ স্নিগ্ধাল্পবর্চ্চসঃ॥ ৫৮॥"

নাদের মৎস্য মধুর গুরু বায়ুনাশক রক্তপিত্তবর্দ্ধক উষ্ণস্বভাব শুক্রবর্দ্ধক স্নিগ্ধ এবং অল্প মলজনক অর্থাৎ কোষ্ঠকাঠিন্যকর।

ইহাদের মধ্যে শষ্প (বাল তৃণ) এবং শৈবাল-ভোজনকারী রোহিত মৎস্য কষায়ানুরস, বায়ুনাশক এবং পিত্তের অধিক প্রকোপ করে না।

"কষায়ানুরস স্তেষাং শষ্পশৈবাল-ভোজনঃ।
রোহিতো মারুতহরো নাত্যর্থং পিত্তকোপনঃ॥৫৯॥"

চরকের মতের সহিত সুশ্রুতের মতের কতটুকু পার্থক্য সুধীগণ তাহা লক্ষ্য করিবেন। চরক সাধারণতঃ রোহিত মৎস্যকে দীপনীয় এবং লঘুপাক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। কিন্তু সুশ্রুত উহাকে বাতনাশক এবং আংশিক পিত্তকোপন বলিয়া অভিমত করিয়াছেন। লঘুপাকের কথা উল্লেখ করেন নাই। আমরা কিন্তু পাকা রুই মাছের গুরুপাকতাই অনুভব করিয়া থাকি।

ভাবপ্রকাশ গ্রন্থে রোহিতের আকৃতি সম্বন্ধে এবং গুণ সম্বন্ধে কিঞ্চিৎ অন্যরূপ বর্ণনা দেখা যায়। যথা—

"রক্তোদরো রক্তমুখো রক্তাক্ষো রক্তপক্ষতিঃ।
কৃষ্ণপুচ্ছো মৎস্যশ্রেষ্ঠো রোহিতঃ কথিতো বুধৈঃ॥
রোহিতঃ সর্ব্বমৎস্যানাং বরো বৃষ্যোঽর্দ্দিতার্ত্তিজিৎ।
কষায়ানুরসঃ স্বাদু র্বাতঘ্নো নাতিপিত্তকৃৎ।
ঊর্দ্ধজত্রু-গতান্ রোগান্ হন্যাচ্চোক্তিগুণস্তথা॥"

রোহিত-মৎস্যের উদর মুখ চক্ষু এবং কৈড় রক্তবর্ণ। ইহার পুচ্ছ কৃষ্ণবর্ণ। পণ্ডিতগণ উহাকে সমস্ত মৎস্যের মধ্যে শ্রেষ্ঠ বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন। এই মৎস্য বৃষ্য অর্দ্দিত-রোগনাশক, কষায়ানুরস, সুস্বাদ, বাতঘ্ন এবং পিত্তের অধিক প্রকোপন নহে। রোহিতের মস্তক ঊর্দ্ধজত্রুগত রোগনাশক (স্কন্ধ ও বক্ষঃস্থলের সন্ধির নাম জত্রু)। গ্রন্থকার মিশ্রমহাশয় মৎস্যের সহিত বিশেষ পরিচিত ছিলেন না, হয়ত কাহারও নিকট জিজ্ঞাসা করিয়া, তদনুসারে লক্ষণ প্রস্তুত করতঃ গ্রন্থমধ্যে সন্নিবেশিত করিয়াছেন। কারণ সমস্ত রোহিতের উদর প্রভৃতি রক্তবর্ণ হয় না। পুচ্ছের বর্ণও কৃষ্ণ বলিয়া উল্লিখিত হইবার যোগ্য নহে। জলভেদে মাছের বর্ণের, স্বাদের ও গুণের অনেক প্রভেদ হইয়া থাকে। কোন কোন বিলের মাছ, দামের নীচের মাছ একেবারে গাঢ় কাল হইয়া থাকে, কোথাও তামাটে রং হইতেও দেখা যায়। কোন কোন নদীর অংশবিশেষের রুই মাছ স্বর্ণবর্ণ হইয়া থাকে।

শাস্ত্রে স্বর্ণবর্ণ রোহিত অভক্ষ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে; যথা—

"চক্রাঙ্কিতস্তু যঃ কূর্ম্মো রোহিতঃ কণকপ্রভঃ।
শ্বেতবর্ণো বরাহশ্চ ত্রয়মেত ন্ন ভক্ষয়েৎ॥"
(একাদশীতত্ত্ব)

ইহার অর্থ চক্রচিহ্নিত কূর্ম্ম, কণকবর্ণ রোহিত এবং শ্বেতবর্ণ শূকর ভক্ষণ করিবে না। এখানে প্রসঙ্গতঃ বক্তব্য এই যে, অনেকের ভ্রান্ত সংস্কার আছে, শ্বেতবর্ণ শূকর খাদ্য। বাস্তবিক গ্রাম্যশূকর অখাদ্য, মহারণ্যবাসী শূকর খাদ্য। খাদ্যের মধ্যেও শ্বেতবর্ণ নিষিদ্ধ।

মৎস্য সম্বন্ধে আরও অনেক কৌতুকপ্রদ ব্যাখ্যা এবং নামনির্দ্দেশ প্রাচীন গ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায়। মাধবাচার্য্য রাজীব মৎস্য চিনাইতে যাইয়া বলিয়াছেন, "রাজীবাঃ পদ্মবর্ণা মৎস্যাঃ।" অভিধানে রাজীবশব্দ পদ্মবাচক, ইহার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবতঃ তিনি মাছের তাদৃশ বর্ণ কল্পনা করিয়াছেন। কিন্তু মৎস্যভোজী বাঙ্গালী টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী অঙ্গুলিনির্দ্দেশ বুঝাইয়াছেন, "রাজী রেখা, তদ্যোগাৎঃ।" রাজী অর্থ রেখা, যাহার গায়ে তাহা আছে। "রাজীবো রায়াগ বা রায়খড়া ইতি খ্যাতে।" রায়াগ বা রায়খড়া নামে প্রসিদ্ধ মাছের নাম রাজীব। তিনি ইহাও বলিয়াছেন যে, মহেশ্বর নামক টীকাকারের মতে উহার নাম "রায়া"; "'রায়া' ইতি মহেশ্বরঃ।"

অমর সিংহের মতে "গড়কঃ শকুলার্ভকঃ" অর্থাৎ

শকুল মৎস্যের শিশুর নাম গড়ুক। প্রকৃতপক্ষে "গড়ে" মাছ যে শকুল হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন, তাহা বুঝিতে আর বাঙ্গালীকে বেগ পাইতে হয় না। অমরকোষে সিং (জিঙল) মাছ, মাগুরের স্ত্রী বলিয়া নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে, "মদ্‌গুরস্য প্রিয়া শৃঙ্গী"; কিন্তু শৃঙ্গী মদ্‌গুর হইতে ভিন্ন, তাহা বাঙ্গালী বিশেষ ভাবে অবগত আছেন। উচ্চ শ্রেণীর হিন্দুগণ উহা ভক্ষণ করেন না। নিষেধক একটি প্রমাণও পূর্ব্ববঙ্গে প্রচলিত আছে,—

"শুষ্কমীন মসৃত্বন্নং শৃঙ্গী-কর্কটকস্তথা।
অবীরায়া স্তথা চান্নং ভুক্ত্বা চান্দ্রায়ণং চরেৎ॥"

সোরামাছ, যাহার ঋতু হয় নাই তেমন স্ত্রীলোকের পক্বান্ন, শৃঙ্গী কাঁকড়া এবং পতি-পুত্র-হীন স্ত্রীলোকের হস্তান্ন খাইলে চান্দ্রায়ণ কর্ত্তব্য।

এখন প্রকৃতের অনুসরণ করা যাউক। সুশ্রুতে রোহিতের পরেই পাঠীনের গুণ বর্ণিত হইয়াছে—

"পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বৃষ্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদম্লপিত্তঞ্চ কুষ্ঠরোগং করোত্যসৌ॥"

ইহার অর্থ—পাঠীন মৎস্য শ্লেষ্মবর্দ্ধক বৃষ্য নিদ্রালু মাংসভোজী। এই মৎস্য অম্লপিত্ত দূষিত করে, অর্থাৎ অম্লপিত্তরোগীর অনিষ্টকর, এবং কুষ্ঠরোগ জন্মাইয়া থাকে। এই মৎস্যই ভাবপ্রকাশে বলকর ও রক্তপিত্তের দূষক বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"পাঠীনঃ শ্লেষ্মলো বল্যো নিদ্রালুঃ পিশিতাশনঃ।
দূষয়েদ্রুধিরং পিত্তং কুষ্ঠরোগং করোতি চ॥"

এখানে আমাদের বিশেষ বক্তব্য এই যে, শাস্ত্রপাঠে বোয়াল মাছের যে গুণ জানিতে পারা যায়, আমাদের দেশে তাহা সর্ব্বাংশে সত্য বলিয়া প্রমাণিত হয় না। কারণ যদি সকলের পক্ষেই বোয়াল মাছ কুষ্ঠরোগকর হইত, তবে পূর্ব্ববঙ্গবাসী মৎস্যভোজীদিগের মধ্যে শতকরা ৯৫ জনই কুষ্ঠরোগাক্রান্ত রূপে দেখা দিত। কারণ আমাদের দেশে উহার ব্যবহার খুব বেশী। রোগীর পক্ষে এই মাছ সাধারণত অপথ্য বলিয়া বিবেচিত হয়। একটি ছড়াও সাধারণের মুখে শুনা যায়—"শাক অম্বল দধি বাইট্‌কা বোয়াল পুঁঠী" এই কয়টি জিনিস সর্ব্বরোগে অপথ্য। কিন্তু সুস্থাবস্থায় বাইট্‌কা বোয়াল পুঁঠী প্রচুর পরিমাণে খাওয়া হইয়া থাকে। উহা আমাদের সাত্ম্য, সুতরাং পথ্য। বাইট্‌কা মাছের মুড়ীর সহিত খেঁসারীর ডাইল আমাদের প্রাত্যহিক উপাদেয় খাদ্য। খেঁসারীর ডাইলে আমাদের পক্ষাঘাত রোগ হয় না, কারণ উহা স্মরণাতীত কাল হইতেই পূর্ব্ববঙ্গে এবং পাবনা রাজসাহীতে নিত্য খাদ্যশ্রেণীভুক্ত হইয়া আসিতেছে। অনেক দিন এমন ঘটনাও হয় যে, কোন অতিথি উপস্থিত হইলে, ঘরে অন্য উপকরণ না থাকিলে এক খেঁসারী হইতেই সিদ্ধ, ডাইল, ডাইলের বড়া, ডাইলের মুঠিয়া, (বাটা ডাইল পিঠার আকারে জলে সিদ্ধ করিয়া, তাহা বেশ করিয়া ছানিয়া বরফীর আকারে তৈলে ভাজিতে হয়। তৎপর উহার দ্বারা অম্ল ঝোল-যুক্ত যে ব্যঞ্জন পাক করা হয়, তাহারই নাম মুঠিয়া—চলতি নাম মুট্যা। ইহাতে ঘৃত গরমমসলা দিতে হয়), ও ডাইলের অম্বল,এই পাঁচ তরকারী নিষ্পন্ন হইয়া থাকে।

বোয়ালের পরেই মুরল মাছের কথা।

"মুরলো বৃংহণো বৃষ্যঃ স্তন্যশ্লেষ্মকরস্তথা।"

মুরলা (ময়া মলা) মাছ দেহ-পোষক বৃষ্য স্তন্যবর্দ্ধক এবং শ্লেষ্মবর্দ্ধক।

সুশ্রুত সংহিতায় এই পর্য্যন্ত নাদের মৎস্যের গুণ বলিয়া, সামুদ্র মৎস্যের নাম ও গুণ কথিত হইয়াছে। সামুদ্রের নাম পূর্ব্বেই প্রদর্শিত হইয়াছে; এখন গুণের কথা বলা যাইতেছে।

"সামুদ্রা গুরবঃ স্নিগ্ধা মধুরা নাতি পিত্তলাঃ।
উষ্ণা বাতহরা বৃষ্যা বর্চ্চস্যাঃ শ্লেষ্মবর্দ্ধনাঃ॥ ৬৪॥
বলাবহা বিশেষেণ মাংসাশিত্বাৎ সমুদ্রজাঃ।

অর্থ—সমুদ্রজাত মৎস্য গুরুপাক স্নিগ্ধ মধুর অধিক পিত্তকর নহে, উষ্ণবীর্য্য বাতনাশক শুক্রবর্দ্ধক পুরীষকারক শ্লেষ্মবর্দ্ধক এবং মাংসাশিত্ব-নিবন্ধন বিশেষ বলকারক।

নাদেয় মৎস্যের গুণ-কথনের পর সুশ্রুতে প্রসঙ্গত অন্যান্য জলাশয়সম্ভূত মৎস্যের গুণ অতি সংক্ষেপে বর্ণিত হইয়াছে। যথা—

"সর-স্তড়াগ-সম্ভূতাঃ স্নিগ্ধাঃ স্বাদুরসাঃ স্মৃতাঃ॥" ৬১॥

সরঃসংজ্ঞক এবং তড়াগসংজ্ঞক জলাশয়ে যে সকল মৎস্য জন্মে, সেইগুলি স্নিগ্ধ ও মধুররস বলিয়া বিবেচিত হইয়াছে। অতঃপর ইহাও বলা হইয়াছে যে,—

"মহাহ্রদেষু বলিনঃ স্বল্পেঽম্ভস্যবলাঃ স্মৃতাঃ॥" ৬২॥

মহাহ্রদে জাত মৎস্য সবল এবং অল্পজলের মৎস্য দুর্ব্বল। সামুদ্র মৎস্যের গুণকথনের পর সুশ্রুতে নানা প্রকার জলাশয়-জাত মৎস্যের গুণ কথিত হইয়াছে; যথা—

"তেষামপ্যনিলঘ্না চৌণ্ট্যকৌপ্যৌ গুণোত্তরৌ।
স্নিগ্ধত্বাৎ স্বাদুপাকত্বাৎ তয়োর্বাপ্যা গুণোত্তরাঃ॥৬৫॥

মৎস্যের যে সকল গুণাগুণ কথিত হইল, তন্মধ্যে চুণ্টা (পাঠান্তর চুণ্ডা) ও বাপী এই দুই প্রকার জলাশয়ের মৎস্য বায়ুনাশকত্ব-নিবন্ধন গুণে শ্রেষ্ঠ। এই, উভয়ের মধ্যেও আবার স্নিগ্ধকর ও বিপাকে মধুরত্ব, এই গুণ-দ্বয়ের জন্য বাপীজাত মৎস্য শ্রেষ্ঠ। *

* চুণ্টা (ণ্ডা) প্রভৃতির লক্ষণ পানীয় প্রকরণে দ্রষ্টব্য।

কুত্রত্য মৎস্যের কোন অংশ লঘু এবং কোন অংশ গুরু, তাহা নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

"নাদেয়া গুরবো মধ্যে যস্মাৎ পুচ্ছাস্যচারিণঃ।
সরস্তড়াগজানাস্তু বিশেষেণ শিরো লঘু॥ ৬৬॥

নাদের মৎস্যের মধ্যভাগ গুরু, কারণ ইহারা ইচ্ছামত পুচ্ছ এবং মুখ সঞ্চালন করিয়া বিচরণ করিতে পারে। সরোজাত এবং তড়াগজাত যে মৎস্য, তাহাদের মস্তক বিশেষরূপে লঘু।

"অদূরগোচরা যস্মাত্তস্মাদুৎসোদপানজাঃ।
কিঞ্চিন্মুক্ত্বা শিরোদেশ-মত্যর্থং গুরবস্তু তে" ॥ ৬৭॥

প্রস্রবণের মৎস্য ও কূপজাত যে মৎস্য তাহাদের শিরোভাগ ব্যতীত অন্যান্য অংশ অত্যন্ত গুরু। কারণ উহারা ক্ষুদ্রস্থানে বাস নিবন্ধন স্বেচ্ছামত বিচরণ করিতে পারে না।

অধস্তাদ্‌গুরবো জ্ঞেয়া মৎস্যাঃ সরসিজাঃ স্মৃতাঃ।
উরোবিচরণাত্তেষাং পূর্ব্বমঙ্গং লঘু স্মৃতম্‌॥

বৃহৎ সরোবর-জাত মৎস্যের অধোভাগ গুরু। উহারা বুকের উপর চাপ দিয়া বিচরণ করে, তন্নিবন্ধন ইহাদের পূর্ব্বভাগ লঘু।

আমাদের পরিচিত অসংখ্য মৎস্যের মধ্যে কয়টীমাত্র মৎস্যের গুণ-দোষ নির্দ্দেশ করিয়াই সংহিতাকার নিরস্ত হইয়াছেন।

ভাবপ্রকাশ-নিবন্ধে মৎস্যের কিঞ্চিৎ বিস্তৃত বিবরণ দেখা যায়। তন্মধ্যে আমাদের পরিচিত এবং ব্যবহৃত কতিপয় মৎস্য উল্লিখিত হইয়াছে। কিন্তু গুণাগুণ সর্ব্বত্র যথার্থ বলিয়া স্বীকার করা যায় না।

প্রথমতঃ মৎস্য মাত্রকেই গ্রন্থকার স্নিগ্ধ উষ্ণ মধুর গুরু কফ-পিত্তকর বাতনাশক শরীরপোষক বৃষ্য রুচিকারক ও বলবর্দ্ধক বলিয়া নির্দ্দেশ করিয়াছেন; এবং মদ্যপানাসক্ত স্ত্রীসংসর্গী ও দীপ্তাগ্নিদিগের বিশেষ উপযোগী বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন।

"মৎস্যাঃ স্নিগ্ধোষ্ণমধুরা গুরবঃ কফপিত্তলাঃ।
বাতঘ্না বৃংহণা বৃষ্যা রোচকা বলবর্দ্ধনাঃ।
মদ্যব্যবায়াসক্তানাং দীপ্তাগ্নীনাঞ্চ পূজিতাঃ॥

ভাবমিশ্র ঋতুভেদে মৎস্যের গুণ নির্দ্দেশ করিয়াছেন—

হেমন্তে কূপজা মৎস্যাঃ শিশিরে সরোবরস্থিতাঃ।
বসন্তে তে তু নাদেয়া গ্রীষ্মে চুণ্ড-সমুদ্ভবাঃ।
তড়াগজাতা বর্ষাসু তাস্বপথ্যা নদীভবাঃ।
নৈর্ঝর্য্যা শরদি শ্রেষ্ঠা বিশেষোঽয়মুদাহৃতঃ॥

অর্থ—হেমন্ত ঋতুতে কূপজাত মৎস্য, শিশিরে সরোবর-জাত মৎস্য, বসন্তে সরোজ এবং নদীজাত মৎস্য, গ্রীষ্মে চুণ্ডজাত মৎস্য, বর্ষাতে তড়াগজাত হিতকর। বর্ষাতে নদীজাত মৎস্য অপথ্য। শরৎকালে নির্ঝরজাত অর্থাৎ ঝরণার মৎস্য পথ্য।

ভাবপ্রকাশে ইলিশ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে—

"ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বহ্নিবর্দ্ধনঃ।
পিত্তঘ্নঃ কফকৃৎ কিঞ্চিল্লঘু বৃষ্যোঽনিলাপহঃ॥

ইলিশ মৎস্য মধুররস স্নিগ্ধ রুচিকর বলবর্দ্ধক, পিত্তনাশক কিঞ্চিৎ কফকারক লঘু বৃষ্য ও বায়ুনাশক। চক্রপাণির দ্রব্যগুণে কিন্তু বলা হইয়াছে যে, ইলিশ মৎস্য মধুর স্নিগ্ধ ও পিত্ত-শ্লেষ্মার প্রকোপজনক; কিন্তু মৈথুনশীল ব্যক্তিদিগের হিতকর ও অগ্নিবর্দ্ধক। ভাবমিশ্র ও বাঙ্গালী চক্রপাণি উভয়েই উহাকে অগ্নিবর্দ্ধক বলিয়াছেন। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে উহার অগ্নিমান্দ্যকারিতা গুণই অনুভূত হইয়া থাকে। অপিচ ভাবপ্রকাশের মতে উহা পিত্তঘ্ন, চক্রপাণির মতে পিত্তপ্রকোপন। বর্ত্তমান অবস্থার প্রতি লক্ষ্য করিয়াই সম্ভবত আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞান নামক আধুনিক সংগ্রহে উহাকে "দুর্জ্জর" অর্থাৎ দুষ্পাচ্য বলিয়া নির্দ্দেশ করা হইয়াছে।

"ইল্লিশো মধুরঃ স্নিগ্ধো রোচনো বলবর্দ্ধনঃ।
কফপিত্তকরো বৃষ্যো দুর্জ্জর স্বনিলাপহঃ॥"

ইলিশ মাছ খাইলে অনেকেই পেটে বায়ুর আধিক্য অনুভব করিয়া থাকেন। আমরা কোষ্ঠকাঠিন্য অনুভব করি। আমবাত রোগীর পক্ষে উহা অত্যন্ত অনিষ্টকর। পচা ইলিশের সঙ্গে সঙ্গেই কলেরার শুভাগমন হইয়া থাকে।

যাহারা ইলিশ হজম করিতে অসমর্থ তাহাদের পক্ষেও আমড়া তেঁতুল প্রভৃতির সহিত টক করিয়া উহার ব্যবহার হইতে পারে।

বিক্রমপুর ফরিদপুর প্রভৃতি স্থানের অধিবাসিগণ প্রচুর পরিমাণে প্রতিদিন ইলিশ মাছ হজম করিতে পারেন, কারণ উহা তাঁহাদের সাত্ম্য।

বর্ম্মি মৎস্য (বাইস) উৎকৃষ্ট পথ্য। উহা দৃঢ় হইলেও সহজে হজম হয়, উহা ক্ষয়নিবারক উদরাময়ীর ও সূতিকা রোগগ্রস্ত স্ত্রীলোকের পক্ষেও বিশেষ উপকারক।

দ্রব্যগুণে বলা হইয়াছে যে—

বর্ম্মিমৎস্যস্তথা বৃষ্যো মধুরো রসপাকতঃ।

বাইস মাছ বৃষ্য, উহা বিপাকে মধুর। ভাবপ্রকাশের মতে উহা রুচিকর লঘুপাক এবং বাত-পিত্তনাশক।

বর্ম্মিমৎস্যো হরেদ্বাতং পিত্তং রুচিকরো লঘুঃ॥

বর্ম্মি বলিলে বাইস মাছ বুঝা যায়, পথ্যরূপেও উহাই ব্যবহৃত হইয়া থাকে। কিন্তু চক্রপাণি-কৃত দ্রব্যগুণের টীকাকার শিবদাস একটি অদ্ভুত মতের অবতারণা করিয়া সাধারণের ভ্রান্তি উৎপাদন করিয়া গিয়াছেন, যথা—"বর্ম্ম শকলং তদস্যাস্তীতি বর্ম্মী রোহিতঃ তদুক্তং চরকে

"রোহিতো" মৎস্যানামিতি। ব্রহ্মদত্তোঽপি বর্ম্মী মহাশকলো রোহিত-ভেদঃ। ন তু সর্পাকার-মৎস্য ইত্যাহঃ।"

বর্ম্ম শব্দের অর্থ শকল অর্থাৎ আঁইস, তাহা আছে ইহার, এই অর্থে ইন্ প্রত্যয় যোগে বর্ম্মীশব্দ নিষ্পন্ন হইয়াছে। বর্ম্মী অর্থ রোহিত। চরকেও বলা হইয়াছে, মৎস্যের মধ্যে রোহিত শ্রেষ্ঠ। ব্রহ্মদত্তনামক গ্রন্থকারও বলিয়াছেন যে, বর্ম্মী "মহাশকল" রোহিত বিশেষ—সর্পাকার মৎস্য নহে। প্রদর্শিত সমর্থক প্রমাণ একেবারেই অসমঞ্জস হইয়াছে। কারণ লোকপ্রসিদ্ধিতে বাধা দিবার কোনই উপায় নাই। মৎস্যের মধ্যে রোহিতকে চরক শ্রেষ্ঠ বলিয়াছেন, ইহাতে রোহিতের বর্ম্মিত্বসাধন হয় নাই। বিশেষতঃ বৌধায়নের ধর্ম্মসূত্রে (১।৫।১৬৪) রোহিত হইতে বর্ম্মীর ভিন্নত্ব স্পষ্টতঃ কথিত হইয়াছে। যথা—

"মৎস্যাঃ সসহস্রদংষ্ট্র, শিলিচিমো, বর্ম্মী,
বৃহচ্ছিরো, মসকরি-রোহিত-রাজীবাঃ।"

মৎস্যের মধ্যে এই কয়টি ভক্ষ্য। এইস্থলে বৃহচ্ছির অর্থাৎ যাহার মাথা বড় তাহা খাদ্য, সুতরাং ক্ষুদ্রমস্তক মৎস্য অখাদ্য। ক্ষুদ্র মস্তকের মধ্যে বর্ম্মী খাদ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। স্মৃতিশাস্ত্রে সর্পাকৃতি মৎস্য অখাদ্য শ্রেণীতে পরিগণিত হইয়াছে। তন্মধ্যে বর্ম্মীর প্রতিপ্রসব করা হইয়াছে। চিলিচিম মৎস্য কাহারও মতে "বনকই" (স্থলচর রোহিতাকার জন্তুবিশেষ); উহার আঁইস খুব পুরু, এই আঁইসের আংটী অর্শরোগের ঔষধ বলিয়া প্রসিদ্ধ আছে।

অমরকোষের টীকাকার রঘুনাথ চক্রবর্ত্তী "নলমীন-শিলিচিমঃ" এই অংশের ব্যাখ্যানে বলিয়াছেন,—

"স্বয়ং বাইলা ইতিখ্যাতে, ইকা ইচা বা খ্যাতে ইতি কশ্চিৎ। প্রায়ো নলবনে তিষ্ঠতীতি নলমীনঃ"।

নলমীন ও চিলিচিম এই দুইটি শব্দ বাইলা নামে প্রসিদ্ধ মৎস্যের বাচক। কেহ বলেন ইকা বা ইচা নামে খ্যাত মাছই নলমীন ও চিলিচিম। প্রায়ই এই মাছ নলবনে থাকে বলিয়া উহাকে "নলমীন" বলা হয়। রঘুনাথ বৈদ্যক শাস্ত্রের প্রমাণ উদ্ধৃত করিয়া দেখাইয়াছেন যে, "চিলিচীম" দীর্ঘ ঈকারযুক্ত শব্দও দেখা যায়। যথা—

'চিলিচীমস্তু কথলো নলমীনো বিলোটকঃ" ইতি
চিলিচীম ত্রিদোষঘ্নৎ, ইতি বৈদ্যকে দীর্ঘবানপি ॥"

ইহার অর্থ—চিলিচীম কবল নলমীন ও বিলোটক এই কয়টি একার্থক শব্দ, "চিলিচীম" ত্রিদোষনাশক। প্রদর্শিত প্রমাণের সাহায্যে ত্রিদোষ-নাশকতা-নিবন্ধন চিলিচীমের উৎকর্ষ উপলব্ধ হয়।

আধুনিক সংগ্রহে চিংড়িমাছের গুণ বলা হইয়াছে—

"চিঙ্গড়স্তু গুরুগ্রাহী মধুরো বলবর্দ্ধকঃ"।

অর্থ—চিংড়িমাছ গুরুপাক কোষ্ঠকাঠিন্যকারক মধুর ও বলবর্দ্ধক। এইস্থলে বিশেষ বক্তব্য এই যে, উক্ত মৎস্য সাধারণতঃ দৃঢ়তা-নিবন্ধন গুরুপাক ও সংগ্রাহী হইলেও দ্রব্যান্তর-সংযোগে উহার কোমলতা এবং তন্নিবন্ধন গুণের বিপর্য্যয় পরিলক্ষিত হয়। হলুদ নুন তেল সহ কলার পাতায় বাঁধিয়া উহা তাতে সিদ্ধ করিতে দিলে একেবারে মোমের মত হইয়া যায়, অতি সুখাদ্য হয়, এবং সহজেই হজম হইয়া যায়, কোষ্ঠকাঠিন্যও করে না। নারিকেলের সহিতও উহা অগ্নিসংযোগে কোমল হইয়া যায়।

এই মৎস্যটি ঋষিযোগে অতি উপাদেয় খাদ্য বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল।

গোভিলের শ্রাদ্ধসূত্রে অক্ষয্যতৃপ্তিপ্রকরণে অর্থাৎ কোন্ বস্তু দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে পিতৃলোকের অক্ষয্য (অক্ষয়) তৃপ্তি হয়, তৎপ্রতিপাদক অংশে বলা হইয়াছে যে, মহাশল্কের দ্বারা শ্রাদ্ধ করিলে অক্ষয্য তৃপ্তি হয়।

"অথাক্ষয্যতৃপ্তীঃ ॥ ১ ॥ বর্ষ্যানঃ। মহাশল্কঃ ॥ ৬ ॥ (শ্রাদ্ধকল্প ১ম কণ্ডিকা) মহাশল্ক কি, তাহা বুঝাইবার জন্য গ্রন্থকারদিগের নানাপ্রকার মতবাদের সৃষ্টি হইয়াছে।

পূজ্যপাদ গোভিল-সূত্র-ভাষ্যকার মহামহোপাধ্যায় স্বর্গীয় চন্দ্রকান্ত তর্কালঙ্কার মহাশয় উল্লিখিত সূত্রের ভাষ্যে মহাশল্কের পরিচয় প্রসঙ্গে প্রথমতঃ বাচস্পতি মিশ্রের মত এবং মিশ্রপ্রদর্শিত প্রমাণের উপন্যাস করিয়া পুলস্ত্য বচনানুযায়ী নিজ মত প্রদর্শিত করিয়াছেন। তাঁহার মত পাঠে বুঝা যায় যে, চিংড়ি মাছই মহাশল্ক নামে শাস্ত্রে অভিহিত হইয়াছে। যথা—

"মহাশল্কো মৎস্যবিশেষঃ। স চ রোহিতাদিরিতি বাচস্পতিমিশ্রঃ।"

তথাচ ব্রহ্মপুরাণে—

"রোহিতামিষমুৎপন্নং দত্ত্বা তু বহুলোত্তবাঃ।
অনন্তাং বিপ্রবর্য্যায় তৃপ্তিং গৌরীসুতস্তথা ॥" ইতি
একশঙ্কেঽর্দ্ধচন্দ্রশ্চ ললাটে খড়্গসংযুতঃ।
শুক্লবর্ণশ্চ যো মৎস্যো মহাশল্কঃ স উচ্যতে ॥

ইতি পুলস্ত্য-বচনোক্তস্তু যুক্তঃ।

অর্থ—যে মৎস্য একটি মাত্র শঙ্খযুক্ত এবং যাহার আকৃতি অর্দ্ধচন্দ্রের মত, যাহার কপালে খড়্গাকার চিহ্ন আছে, সেই মৎস্যই মহাশল্ক বলিয়া অভিহিত। এই মতই যুক্ত।

পিপলে শোল বা পিপুলিয়া শোল নামে এক প্রকার মাছ আছে। উহা শকুল মৎস্যের আকৃতি-যুক্ত, তদপেক্ষা বেঁটে, গায়ে চক্র-চিহ্ন যুক্ত। এই মাছ ভূমিতে গর্ত্তমধ্যে বাস করে, প্রবল বৃষ্টি হইলে লাফাইয়া লাফাইয়া গমন করে। এই মাছ কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায়। আধুনিক আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহে বলা হইয়াছে; "পিপলে শোল"।

গ্রন্থপরিচয়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

সজ্জনসেবক—ভাদ্র, সম্পাদক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ভাগবতভূষণ।

'ভক্তিযাজনে বিচার' প্রবন্ধে লেখক "কেহ কেহ বলেন" বলিয়া বলিয়াছেন, কিন্তু তাঁহার নিজেরও মত বলিয়া মনে হয় যে, "ভক্তিযাজনে বিচারের স্থান নাই"। এই কথার সহিত শাস্ত্রের "যুক্তিহীনবিচারেণ ধর্ম্মহানিঃ প্রজায়তে" এই মূল কথার বিরোধ হয়; এবং তাহার ফলে "অন্ধেন যথা নীয়মানাঅন্ধাঃ" কথাটী সাফল্য লাভ করে। কিন্তু কোনও rational being যে অন্তরে অন্তরে অন্ধবিশ্বাসের বশবর্ত্তী হইতে চান না, বরঞ্চ বিচার পূর্ব্বক "হৃদয়াভানুজ্ঞাত" ধর্ম্মেরই অনুসরণ করিতে চান, তাহার প্রমাণস্বরূপে লেখকই পরে বলিতেছেন—"তৎসহ (ভক্তিশাস্ত্রের সহিত) গুরুবাক্য সমন্বয় করিয়া উহা হৃদয়ভাবের সহিত মিলিয়া গেলে, আর অনাবশ্যক বিচারের কচকচিতে যেও না।" এখানে অন্তত দুইটী বিচারের কথা উক্ত হইয়াছে। অবশ্য তাঁহার শেষোক্ত উক্তির সহিত আমরা একমত। "শ্রদ্ধা শরণশক্তি"তে ঠিক বলা হইয়াছে যে প্রকৃত শ্রদ্ধাবান সুদুরাচারী হইতে পারেন না। "শ্রীগৌরাঙ্গের সন্ন্যাস" ভাবে গদগদ ও পরিপূর্ণ। "মহাজনভজনপ্রণালী" সুন্দর লাগিল। "ভক্ত-চরিত' ধারাবাহিক আকারে চলিতেছে। "প্রেম" প্রবন্ধটী এক সংখ্যায় শেষ করিলেই ভাল হইত। "উপদেশামৃত" এমন ভাবে লেখা উচিত যে পড়িবামাত্র তাহা পাঠকের হৃদয়ে মুদ্রিত হইয়া যায়।

সজ্জনসেবক—আশ্বিন,—"গুরাষ্টক তণ্ডুলতোজা" ভক্তিভাবে লিখিত। "শ্রীকার্ত্তিকব্রত" প্রবন্ধে বৈষ্ণবগণ এই ব্রত বিষয়ে সন্ধান পাইবেন। অবশিষ্ট প্রবন্ধগুলির অধিকাংশই পূর্ব্বানুবৃত্তি।

VEDIC MAGAZINE—September & October—Editor Prof. Ramdeva.

Vedic Principles of the Constitution of a State প্রবন্ধে প্রধানত অথর্ব্ববেদ অবলম্বনে রাষ্ট্রনীতি সম্বন্ধীয় অনেক কথা বলা হইয়াছে। গবেষণার অনেক ইঙ্গিত পাওয়া যায়। Young India and the Coming Renaisance প্রবন্ধে অধ্যাপক বাস্বানি যুবকদিগের প্রতি সুন্দর উপদেশ দিয়াছেন—প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের শিক্ষার প্রভেদ বুঝাইয়া দিয়াছেন। প্রাচ্য শিক্ষা আসলে সকলকে চায়, প্রতীচ্য আপনাকে চায়। A study in Vedic Polity প্রবন্ধে অপর এক দিক দিয়া বৈদিক রাষ্ট্রনীতি আলোচিত হইয়াছে। Thoughts on Nationalism প্রবন্ধে জাতীয়তার সপক্ষে লেখিকা অনেক কথা বলিয়াছেন। Paternal Government এ প্রাচীনকালে অর্থাৎ হিন্দুযুগে রাজাদের শাসনপ্রণালী ব্যক্ত হইয়াছে। Dayananda Greater than Luther প্রবন্ধে অধ্যাপক বাস্বানি স্বামী দয়ানন্দের শ্রেষ্ঠতা দেখাইয়াছেন। লুথারের সহিত তাঁহার তুলনা কোথাও দেখিলাম না। এ অবস্থায় তুলনাত্মক শিরোনামা না দিলেই ভাল হইত। Contemporary Thought Reviewed এবং Editorial Reflection নিবন্ধদ্বয়ে অনেক ভাল বিষয় আলোচিত হইয়াছে। এই মাসিক-পত্র নিজের গৌরব অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

ব্রহ্মবিদ্যা—কার্ত্তিক ও শ্রীযুক্ত অগ্রহায়ণ—সম্পাদক শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রনাথ দত্ত বেদান্তরত্ন ও শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ মিত্র।

"শ্রীগুরুচরণে"র মহাভাষ্যের ১১শ অংশ প্রকাশিত হইয়াছে। ইহার সারাংশ হইতেছে—আমরা জীবনকে সৎপথে নিয়ন্ত্রিত করিয়া "নিজের নিকট যাহা ন্যায় বোধ হইবে, তাহাই করিয়া যাইব"। শ্রীযুক্ত কৃষ্ণমূর্ত্তির কবিতার অনুবাদ "কে তোমায় সান্ত্বনা দিবে" বেশ মিষ্ট লাগিল। "থিওসফিক্যাল সোসাইটি কর্ত্তৃক সত্যপ্রচার" প্রবন্ধের উপসংহারের উক্ত সোসাইটীর সমালোচকগণকে যে অভিধা প্রদান করিয়া অভিশাপের ভয় দেখাইয়াছেন, তাহা আমাদের যুক্তিসঙ্গত মনে হইল না। "অক্ষর ব্রহ্ম-যোগ" প্রবন্ধের উপসংহার আমাদের ন্যায় সংসারী লোকের দুর্ব্বোধ্য, সুতরাং সেবিষয়ে কিছু বলিতে যাওয়া ধৃষ্টতা হইবে। শ্রীমতী অ্যানি বেসান্টের জীবনী ধারাবাহিকরূপে চলিতেছে। এই মহীয়সী মহিলার জীবনী বঙ্গভাষায় লিখিত থাকা কর্ত্তব্য। "অক্ষয়কুমার বড়ালের কাব্যে নারীচরিত্র" প্রবন্ধে "এষা"র সমালোচনা সুলিখিত হইয়াছে। "অতিমানব" প্রবন্ধে মানবের পর কি? এই বিষয় সুন্দররূপ আলোচিত হইয়াছে। "কৃষ্ণার্জ্জুন" কাব্যের আরম্ভ সুন্দর হইয়াছে—কথকশ্রেষ্ঠ শ্রীহেমচন্দ্র কবিরত্নের উপযুক্ত হইয়াছে। ব্রহ্মবিদ্যায় "স্বাতন্ত্র্য ও স্বরাজ" নিছক রাজনৈতিক দৃষ্টিতে আলোচনা না করিয়া ধর্ম্মের ভিত্তিতে আলোচনা করিলে বেশী জোর পাইত বলিয়া মনে হয়।

হিন্দুমিশন—১লা কার্ত্তিক—সম্পাদক স্বামী নগেশানন্দ গিরি।

"মায়ের পূজা" ভক্তের নিবেদন। "ক্ষত্রিয়ত্বের পুনরুদ্ধার" প্রবন্ধে ভাবিবার অনেক বিষয় আছে। "সনাতন আর্য্যধর্ম্ম ও তাহার শ্রেষ্ঠত্ব" প্রবন্ধে সনাতন হিন্দুধর্ম্মকে প্রচারের ধর্ম্ম প্রমাণ করিবার প্রয়াস পাইয়াছেন কিন্তু কতদূর কৃতকার্য্য হইয়াছেন বলিতে

পারি না। অবশ্য তাঁহার বক্তব্যের সঙ্গে আমরা একমত। "মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় ও হিন্দুমিশন" প্রবন্ধে—লেখক (৪) প্যারাতে রাজার উক্তি অর্থবাদরূপে না ধরিয়া অক্ষরশ ধরিয়া ভ্রমে পড়িয়াছেন বলিয়া আশঙ্কা হয়।

মহাত্মা বিনয়েন্দ্রনাথ সেনের জীবনী—শ্রীদেবেন্দ্রনাথ বসু লিখিত।

প্রাপ্তিস্থান ২৮ নিউরোড, আলিপুর কলিকাতা।

গ্রন্থখানি নববিধান ট্রষ্টের সম্পত্তি। ইহার মূল্য ২৲ একটু বেশী হইয়াছে বলিয়া মনে হয়। আমরা বহুকাল ধরিয়া বিনয়েন্দ্র বাবুর নাম অর্থাৎ তাঁহার সদ্গুণ সমূহের কথা শুনিয়া আসিতেছি। আমরা বরাবর মনে করিতাম যে, তাঁহার একখানি জীবনী লিখিয়া প্রত্যেক ছাত্রের হাতে পড়িবার ব্যবস্থা করিলে ভাল হয়। দেখিয়া সুখী হইলাম যে এতদিনে একখানি জীবনী প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য জীবনীতে তাঁহার চিঠিপত্র উদ্ধৃত করিয়া তাঁহার জীবন first hand রূপে ফুটাইবার ব্যবস্থা হইয়াছে। কিন্তু ইহাতে একটু যেন মাঝে মাঝে ধারণা করিবার ছেদ পড়িয়া যায়। আমাদের মনে হয়, একটা চার আনা seriesএর মত একখানি ধারাবাহিক জীবনী লিখাইয়া বিস্তৃত প্রচার করিলে ভাল হয়। বিনয়েন্দ্র বাবু সম্বন্ধে স্বর্গীয় সার আশুতোষ মুখোপাধ্যায় যাহা বলিয়াছেন, তাহা অপেক্ষা বেশী আমরা আর কি বলিব? ঐ চার আনা মূল্যের গ্রন্থেও যেন মুখোপাধ্যায় মহাশয়োক্ত প্রত্যেক গুণ ও প্রত্যেক point ফুটাইয়া তুলিতে ভুল না হয়। আলোচ্য গ্রন্থেও, Calcutta University Instituteএর তিনি এক সময়ে যে প্রাণস্বরূপ ছিলেন, তাহা পরিস্ফুট করা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। বর্ত্তমানের যুবক ছাত্রগণ জানেন কি না, অন্তত স্মরণ করেন কি না জানি না—আমরা তো তাহার কোন লক্ষণ দেখি না—স্বর্গীয় সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়- স্বর্গীয় বিনয়েন্দ্রনাথ সেন প্রভৃতি মহাশয়দিগের নিকট উক্ত প্রতিষ্ঠান কতদূর ঋণী। এবিষয়ে ছাত্রগণকে প্রতিপদে স্মরণ করাইয়া দেওয়া কর্ত্তব্য মনে করি।

আরতি—শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ সেন।

গ্রন্থখানিতে বিনয়েন্দ্রনাথের কয়েকটা বক্তৃতা ও উপদেশ সন্নিবদ্ধ আছে। সর্ব্বপ্রথম উপদেশ "আরতি" আমাদের বড়ই মিষ্ট লাগিল। "নব ব্রহ্মবিদ্যা" বক্তৃতায় বিনয়েন্দ্র বাবু একটা মস্ত তর্কের বিষয় উপস্থিত করিয়াছেন—"সকল ধর্ম্মে সত্য আছে" অথবা "সকল ধর্ম্মই সত্য"? এই বিষয়ের সবিস্তার আলোচনা এই ক্ষুদ্র 'গ্রন্থপরিচয়ে' করা সম্ভব নয়, তবু এবিষয়ে দুচার কথা না বলিলে পাঠকদের মনে একটা সংস্কার থাকিয়া যাইতে পারে যে আমরাও এবিষয়ে বিনয়েন্দ্র বাবুর সঙ্গে একমত। তিনি বলেন—যদি evolution ক্রমবিকাশ ঠিক হয় এবং নববিধান যদি এই evolutionএর সর্ব্বোন্নত পর্য্যায় হয়, তবে সকল ধর্ম্মে সত্য আছে, এই নীতিতে আমরা সন্তুষ্ট হইতে পারি না। যদি "ধর্ম্ম" অর্থে "ধর্ম্মমত" বুঝা যায় হইলে এই নীতি মানা চলে তাহা হইলে * * * সকল ধর্ম্মমত হইতে মন্দ পরিহারপূর্ব্বক যাহা ভাল তাহাকে বাছিয়া লইতে পারি। কিন্তু * * * এক কঠিন সমস্যা আছে। আজ আমাদের যাহা ভাল বলিয়া মনে হইতেছে কাল হয় তো আবার তাহাই মন্দ বলিয়া মনে হয়। এরূপ হওয়া অবশ্যম্ভাবী, সুতরাং ধর্ম্মমতের আকারের পরিবর্ত্তনও অনিবার্য্য। * * * কিন্তু ধর্ম্ম অর্থে যদি বুঝি ভগবানের সহিত মানুষের নিত্য সাক্ষাৎ জীবন্ত সম্বন্ধ, তাহা হইলে কি সকল ধর্ম্মই সত্য নহে? সকল জাতিই কি বিধাতার এই সাক্ষাৎ সম্বন্ধ অনুভব করে নাই? * * * যুগে যুগে, জাতিতে জাতিতে সকলেই এ সম্বন্ধ এ স্পর্শ অনুভব করিয়াছে। তবে কি আমরা বলিব না যে জগতের সকল ধর্ম্মই সত্য, সকল ধর্ম্মেই সেই এক বিধাতার প্রকাশ?" আমরা দুঃখের সহিত বলিতে বাধ্য, এই প্রকার উক্তিসকল অনেক সময়েই আমাদের স্পষ্ট বুঝিবার শক্তিকে আচ্ছন্ন করিয়া ফেলে। বিনয়েন্দ্র বাবু বলিতেছেন যে, "নববিধান evolution এর সর্ব্বোন্নত পর্য্যায়"—এই উক্তিতেই তো "সকল ধর্ম্ম সত্য" বলিবার পথে বাধা পড়ে; কারণ সকল ধর্ম্ম সত্য হইলে নববিধান আসিবার এবং ক্রমবিকাশে "সর্ব্ব" অপেক্ষা উন্নত পর্য্যায় অধিকার করিবার অবসরই আসিত না। সর্ব্ববাদসম্মত মূল ধর্ম্ম অথবা প্রকৃত ধর্ম্মমূল একই এই যে, "তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব; একস্য তস্যৈবোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ শুভং ভবতি"—ভগবানকে প্রীতি করা এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন করাই তাঁহার উপাসনা; একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারা ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। 'সকল ধর্ম্মেই ভগবানের জীবন্ত স্পর্শ অনুভূত হয়' ইহা স্বীকার না করিলে উপরোক্ত ধর্ম্মমূলের অস্তিত্বই আসিতে পারে না। বিনয়েন্দ্র বাবু রাজা রামমোহন রায়ের বিষয় বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"তিনি কুসংস্কার পরিবর্জ্জন করিয়া সকল ধর্ম্মমত হইতে সত্যসংগ্রহে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং এখানে আমরা বিধানের প্রকাশ দেখিতে পাইতেছি না"। আমরা কিন্তু এই কার্য্যের ভিতরেই বিধাতার বিধান সুস্পষ্ট দেখিতেছি। তারপর মহর্ষির কথা বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"ভগবান যে আপনার দিক হইতে অগ্রসর হইয়া পাপী তাপী দীনদুঃখী সকলকেই মঙ্গলের উচ্চভূমিতে উত্তোলিত করিয়া লইতে-

ছেন, এভাব এখানে নাই।" এবিষয়ে আমরা অধিক কি বলিব ? আমাদের বিশ্বাস, বিনয়েন্দ্র বাবু মহর্ষির "ব্রাহ্মধর্ম্মের ব্যাখ্যান" এবং অন্যান্য উপদেশসমূহ ভাল করিয়া আলোচনা করেন নাই। একথা বলা হয় তো ধৃষ্টতা হইতে পারে, কিন্তু না বলিয়াও তো উপায় দেখি না। তিনি বিধানের ভাব বলিতে গিয়া বলিয়াছেন—"মানুষের সঙ্গে ভগবানের জীবন্ত সংস্পর্শ" হইল বিধানের ভাব। এক্ষেত্রে অন্যান্য ব্রাহ্মসমাজপ্রচারিত ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রাণ হইতে এই ভাবের প্রভেদ কোথায় তাহা হৃদগত করিতে পারিলাম না। "সকল ধর্ম্মকে গ্রহণ—সকল সাধুকে গ্রহণ"—এই সকল কথার অর্থ কি ? বিধানবাদী কি বলেন যে, প্রত্যেক ধর্ম্মের প্রত্যেক অংশ স্থান কাল ও অবস্থানির্ব্বিশেষে চিরন্তন সত্য ? বিধানবাদী কি বলেন যে, প্রত্যেক সাধু পূর্ণপুরুষ এবং প্রত্যেক সাধুর প্রত্যেক কথা অভ্রান্ত সত্য ? তাহা যদি হইত, তবে নববিধান বল, আর রাজা রামমোহন হইতে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র বল, এ সমস্ত কোন কিছুরই আবির্ভাব আবশ্যক হইত না, সম্ভবই হইত না। বিনয়েন্দ্র বাবু নববিধানের সাধন সম্বন্ধে যাহা কিছু বলিয়াছেন, তাহা তো পুরাতন ও সনাতন, তাহার মধ্যে নবত্ব দেখিলাম না। "নববিধানের আদর্শ" প্রবন্ধের শেষে বলিয়াছেন—"ধর্ম্ম অখণ্ড উদার বস্তু, আকাশের ন্যায় বিশাল—বাতাসের ন্যায় বিশ্বব্যাপী—উহাতে সীমা নাই, সঙ্কীর্ণতা নাই, গণ্ডী নাই। বিভাগ মানুষ করিয়াছে, কিন্তু প্রকৃত ধর্ম্মকে লাভ করিতে হইলে এই সকল কৃত্রিম বিভাগের ঊর্দ্ধে উঠিতে হইবে—অনন্তের সহিত নিগূঢ় সম্বন্ধ বুঝিয়া, তাঁহার ইঙ্গিত দেখিয়া, তাঁহারই মঙ্গল আলোকে শুভ সমন্বয় সাধন করিতে হইবে।" আমরাও ইহার সহিত একমত—এইখানেই সকল ধর্ম্মে অর্থাৎ সাম্প্রদায়িক ধর্ম্মে "প্রকৃতধর্ম্ম" যে সন্ধানের বিষয়, তাহা ফুটিয়া উঠিয়াছে। "বিভিন্ন আদর্শের মিলন ও ভাবী আদর্শের বিকাশ" বিষয়ক উপদেশেও আমাদের উপরোক্ত উক্তি সম্পূর্ণ সমর্থিত হইয়াছে বলিতে পারি। "বিধান ও নববিধান" বিষয়ক উপদেশে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত তুলনা করিতে গিয়া অনেক তর্কনাপেক্ষ বিষয় উপস্থিত করিয়াছেন, যাহার মীমাংসা বিনয়েন্দ্রবাবু উপদেশের স্বল্প সীমার মধ্যে করিতে পারেন নাই বলিয়া মনে হয় এবং এই ক্ষুদ্র সমালোচনার গণ্ডীর ভিতরে আমাদেরও কোন মীমাংসা করিবার চেষ্টা করাও বাতুলতা হইবে মনে করি। "প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য আদর্শের সংঘর্ষ ও সম্মিলন" আমাদের বেশ ভাল লাগিল—দুই এক স্থলে সামান্য একটু মতভেদ আছে। গ্রন্থখানির উপসংহারে "পাশ্চাত্য আদর্শের অভিব্যক্তি" এবং "প্রাচ্য আদর্শের অভিব্যক্তি" বিষয়ক দুইটী উপদেশ আছে।

শ্রীকৃষ্ণচিন্তা—শ্রীজ্ঞানানন্দ রায় চৌধুরী কর্তৃক লিখিত। ৭৭ হরিঘোষের ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত—মূল্য ৮০ বার আনা।

গ্রন্থে আছে—"শ্রীকৃষ্ণের রাসলীলা", "শ্রীকৃষ্ণের বেণু", "শ্রীকৃষ্ণের কদম্বপুষ্প", "শ্রীকৃষ্ণের শ্রীরাধাকে ঈক্ষণ", এবং "শ্রীকৃষ্ণের আকার"। এই সকল বিষয় হইতেই সুস্পষ্ট প্রকাশ পাইতেছে যে, লেখক ভক্তের প্রাণ লইয়া প্রবন্ধগুলি লিখিয়াছেন। ভক্তের পূজার বিষয়ে সমালোচনার লেখনী চালনা করা সম্ভব নয়, সম্ভব হইলেও করা অসঙ্গত।

নবনবতিতম মাঘোৎসব।

(বাংলার কথা—১১ই মাঘ, ১৩৩৫)

আজ পুণ্য মাঘোৎসবের দিন। এই শুভদিনেই বঙ্গদেশে পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রতিষ্ঠা হইয়াছিল। রাজা রামমোহন, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ, আচার্য্য কেশবচন্দ্র—কত মহাপুরুষের স্মৃতি এই ধর্ম্মের সঙ্গে জড়িত হইয়া আছে। বাংলায় এই নবধর্ম্মের একান্ত প্রয়োজন হইয়াছিল বলিয়াই—ব্রাহ্মধর্ম্মের উদ্ভব হইয়াছিল। প্রাচীন ভারতের পুণ্য তপোবনের হৃদয় হইতে একদিন যে 'বিরামবিহীন মহা ওঙ্কার ধ্বনি' রণিয়া উঠিয়াছিল, সেই পরম একের মন্ত্রকে ব্রাহ্মসমাজ আজিও জাগাইয়া রাখিয়াছে।

আজ তাই সমস্ত বাঙ্গালীর উৎসবের দিন।

তাই উৎসবের দিনে আমরা প্রণাম করি সেই 'শান্তম্, শিবম্, অদ্বৈতম্'কে—যিনি সমস্ত বৈচিত্র্যকে একটী সূত্রে বিধৃত করিয়া মহাকালরূপে জাগিয়া আছেন; আর প্রণাম করি তাঁহাদিগকে, যাঁহারা বহুর মধ্যে সেই একের পরম বাণীকে প্রকাশ করিয়াছিলেন।

মাননীয় আদিব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক মহাশয়েষু—

সবিনয় নিবেদন,

ভগবানের দয়া ও আশীর্ব্বাদ এবার মাঘোৎসবের উপর অনুপম ধারায় বর্ষিত হইয়াছিল। কলিকাতা মহানগরী ব্রহ্মনামে সত্যকার একটা সাড়া দিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। আদিব্রাহ্মসমাজও ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখার সহিত সহযোগিতায় উৎসবকার্য্য সম্পাদনের ব্যবস্থা করিয়াছিলেন দেখিয়া সুখী হইলাম। শুনিলাম, কয়েকজন ব্রাহ্মসমাজহিতৈষী বন্ধুর অনুরোধে ও উৎসাহে আদিব্রাহ্মসমাজ হইতে সপ্তাহব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছিল। আমাদেরও মনে হয়, একমাত্র ১১ই মাঘেই উৎসব শেষ না করিয়া কয়েক দিন ধরিয়া উৎসবের অনুষ্ঠান না করিলে আমাদের মত দীনদরিদ্রের শুষ্ক হৃদয়ের আনন্দ উৎস

উৎসারিত হয় না। আদিসমাজের কর্ত্তৃপক্ষগণকে প্রতি বৎসরই এবারকার মত কয়েকদিবসব্যাপী উৎসব অনুষ্ঠানের জন্য অনুরোধ করি। সাধারণের সুদৃষ্টি আকর্ষণের জন্য এবারকার উৎসববিবরণ আপনাদের নিকট পাঠাইলাম। আশা করি প্রকাশ করিয়া বাধিত করিবেন।

৬ই মাঘ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তিরোভাব উপলক্ষ্যে কলিকাতার বিভিন্ন স্থানে স্মৃতিসভা আহূত হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারতবর্ষীয় ব্রহ্মমন্দিরে অনুষ্ঠিত স্মৃতিসভায় আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রদত্ত "মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দান" বিষয়ক বক্তৃতাটী বড়ই মনোগ্রাহী হইয়াছিল। দেখিয়া সুখী হইলাম যে সুপ্রসিদ্ধ "বাংলার কথা" সংবাদপত্রে উহা মুদ্রিত হইয়াছে। সংবাদপত্রের সাহায্যে আদিসমাজের সত্য মতসকল সাধারণ্যে প্রচার করা আবশ্যক হইয়া পড়িয়াছে। তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার মাঘোৎসব সংখ্যায় তো উহা নিশ্চয়ই প্রকাশিত হইবে। ক্ষিতীন্দ্রনাথের পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় মহর্ষিদেবের সহৃদয়তা সম্বন্ধে কিছু বলিয়াছিলেন। ৭ই মাঘ প্রাতে ৮ ঘটিকায় আদিসমাজের উপাসনামন্দিরে মহর্ষিপ্রতিষ্ঠিত মাসিক সমাজের উৎসব উপলক্ষে পণ্ডিতপ্রবর শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ "ধর্ম্ম ও সাম্প্রদায়িকতা" সম্বন্ধে উপদেশ দেন। মাসিক সমাজের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উৎসবের অনুষ্ঠান আদি সমাজের পক্ষে নূতন হইলেও সময়োপযোগী হইয়াছে। সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় ভবানীপুর সম্মিলন সমাজের আহ্বানে আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ তথায় উপাসনা করেন ও তদুপলক্ষে "সত্যধর্ম্মের বীজমন্ত্র ও মৈত্রীসাধন" বিষয়ে উপদেশ দেন। উপদেশটি খুবই মনোগ্রাহী ও সময়োপযোগী হইয়াছিল। উপদেশের মধ্যে একটী বড়ই সারগর্ভ কথা ছিল এই যে, সকল ধর্ম্মেই সত্য আছে, এই সত্যের উপরেই সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মিলন সম্ভব। উপাসনার প্রারম্ভে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার সুগম্ভীর কণ্ঠে যে উদ্বোধনবাণী দ্বারা ভক্তবৃন্দকে উদ্বুদ্ধ করিয়াছিলেন, তাহা অনেক দিন ধরিয়া তাঁহাদের প্রাণে অনুরণিত হইতে থাকিবে। শ্রীমতী বাণী দেবী তাঁহার সুমিষ্ট কণ্ঠে কয়েকটী গান গাহিয়া সকলের প্রাণ ভগবানের অভিমুখীন করিয়াছিলেন। ৮ই মাঘ সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় আদিসমাজের উপাসনা মন্দিরে উৎসবের উদ্বোধন উপলক্ষে বিশেষ উপাসনা হয়। তদুপলক্ষে শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় ও শ্রদ্ধাস্পদ "শ্রীসদানন্দ" কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস বেদীগ্রহণ করেন এবং "সদানন্দ" ব্রহ্মসাধন বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ দেন। ৯ই মাঘ সন্ধ্যা ৬৷৷০ ঘটিকায় আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী "ব্রাহ্মসমাজ ও বর্ত্তমান ভারত" বিষয়ে একটী সময়োপযোগী উপদেশ দেন। ১০ই মাঘ শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীচিন্তামণি চট্টোপাধ্যায় "ধর্ম্মতরঙ্গ" বিষয়ে উপদেশ দেন। এইভাবে উপাসকগণের হৃদয়মন মাঘোৎসবের জন্য প্রস্তুত করা হইল। উৎসবের উৎসবত্বের সঙ্গে শান্তস্বরূপের উপাসনার শান্তভাব উপাসকদিগের মনপ্রাণ অধিকার করিয়া বসিয়াছিল।

অবশেষে রজনীর অন্ধকার আবরণ উন্মোচন করিয়া পুণ্যপ্রভাত পূর্ব্বগগনে নামিয়া আসিবার সঙ্গে সঙ্গে আমাদের প্রিয় ১১ই মাঘের ব্রহ্মোৎসব উপস্থিত হইল। প্রভাতের আরম্ভেই সানাই প্রভাতী রাগিণীতে ধ্বনিয়া উঠিল। উৎসব উপলক্ষে মহাত্মা রাজা রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত এবং মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পরিপোষিত আদিসমাজগৃহটী আচার্য্য শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ও তাঁহার বন্ধুবর্গের উদ্যমে ও উৎসাহে পুষ্পপত্রে সুসজ্জিত হইয়া শোভন মূর্ত্তি ধারণ করিয়াছিল। প্রাতে ৮ ঘটিকায় উপাসনা হইবে, কিন্তু তাহার বহু পূর্ব্বেই উপাসনামন্দিরটী ভক্তজনে পরিপূর্ণ হইয়া গিয়াছিল। উপাসনার পূর্ব্বে ব্রাহ্মসমাজের ঋষিগণের স্মৃতি দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়া নববিধান সমাজ ও সাধারণ ব্রাহ্মসমাজ হইতে সমাগত কয়েকজন ভক্ত ভগবানের নাম কীর্ত্তন আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন। ৮টা বাজিল। কীর্ত্তন থামিল। বেদীর দুই পার্শ্বে দুইটী ধুনাচিতে ধুনা দেওয়া হইল। ধুনার গন্ধে মন্দিরটী আমোদিত হইয়া উঠিল। সুমঙ্গল শঙ্খ ও ঘণ্টা বাজিতে লাগিল। আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ এই সকল সুপ্রথা বজায় রাখিয়াছেন দেখিয়া আমরা বড়ই সুখী হইলাম। শঙ্খ ও ঘণ্টাধ্বনি থামিল। তখন ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সরল ও মিষ্ট কণ্ঠে ওঁ যো দেবোঽগ্নৌ বেদগানটী করিলেন। তাঁহার কন্যা শ্রীবাণী দেবী ইহাতে তাঁহাকে সাহায্য করিলেন। তৎপরে শান্ত সমাহিত ভাবের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রনাথ বেদীগ্রহণ করিলেন। প্রথমে বাণীদেবী তাঁহার সুকণ্ঠে "রক্ত রবি উঠল গগন ভরে" গানটী গাহিলেন। "এমন বিমল সকালবেলা কাটায়ো না অবহেলে" ছত্রটী গীত হইবার সঙ্গে সঙ্গে ভক্তদিগের প্রাণ ভগবানের প্রতি ভক্তিভরে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল। তৎপরে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার সবল বোধনবাণী দ্বারা সকলকে উদ্বুদ্ধ করিয়া তুলিলেন। গায়কগণ ভৈরবী চৌতালের গম্ভীর রাগিণীতে যখন "প্রাণ মন সঁপিনু" গানটী করিলেন, তখন মহর্ষিদেবের সেই পুরাকালীন অনুপ্রাণনায় যেন সকলে অনুপ্রাণিত হইয়া উঠিয়াছিলেন। পরে সুকণ্ঠ যুবক শ্রীঅজিৎকুমার রায় "হো ওঙ্কার মহাদেব শঙ্কর" গানের দ্বারা সমস্ত গৃহ প্রতিধ্বনিত করিয়া ভগবানকে আহ্বান করিলেন। অনন্তর যথারীতি স্বাধ্যায়সম্বলিত উপাসনা অন্তে বাণীদেবী দুইটী গান করিলে ক্ষিতীন্দ্রনাথ তাঁহার গুরুগম্ভীরকণ্ঠে

উদার স্বরে "নবজাগরণ" বিষয়ে উপদেশ দিলেন। সবল স্বাধীনতার বাণীতে ওতপ্রোত সে উপদেশ শ্রোতৃবর্গকে মন্ত্রমুগ্ধ করিয়া তুলিয়াছিল। উপদেশে স্বদেশহিতৈষণা, ব্রাহ্মসমাজের মঙ্গল ইচ্ছা ও ভগবৎপ্রীতি ছত্রে ছত্রে সমুজ্জ্বল আকারে প্রকাশ পাইয়াছিল। সঙ্গীতনায়ক শ্রীগোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় ৯ই মাঘে এবং ১১ই মাঘে তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীরমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় সঙ্গীত করিয়া উৎসবের সফলতায় যথেষ্ট সাহায্য করিয়াছিলেন। দেখিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম যে, ক্ষিতীন্দ্রনাথের "নবজাগরণ" উপদেশটীও "বাংলার কথা" সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে।

উপসংহারে ১২ই মাঘ সন্ধ্যা ৬॥০টার পশ্চিম হিন্দীভাষীদিগের জন্য হিন্দী ভাষায় উপাসনা হয়। তদুপলক্ষে গোরক্ষপুর হইতে সমাগত শ্রীসদানন্দ "স্বার্থ ও পরমার্থ" বিষয়ে একটী সুন্দর উপদেশ দেন। কলিকাতার ব্রাহ্মসমাজে হিন্দী ভাষায় উপাসনা ও উপদেশ এই প্রথম প্রবর্তিত হইল। উৎসব সমাপ্ত হইবার পর শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের উদ্যোগে ও চেষ্টায় যে ধর্ম্মমহাসম্মেলন আহূত হইয়াছিল, তাহার বিবরণ বিবিধ সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইয়াছে বলিয়া আমরা এই পত্রে সে সম্বন্ধে লিখিতে বিরত হইলাম। এই উৎসবের মধ্যে এবারে একটী বিষয় লক্ষ্য করিয়াছি যে, দেশবিদেশের সকলেই একটী সরল সত্যধর্ম্মের অনুসন্ধানে চলিয়াছে এবং সকলেই সাম্প্রদায়িকতার বিরুদ্ধে খড়্গহস্ত। আমরা শুনিয়া বড়ই আনন্দ লাভ করিলাম যে গত ১৩ই মাঘ আচার্য্য ক্ষিতীন্দ্রনাথ এবং শ্রীসদানন্দ উভয়ে মিলিয়া ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখায় গিয়া নেতা ও বন্ধুবান্ধবের সঙ্গে মেলামেশা ও সাদর আলাপন করিয়াছিলেন। ব্রাহ্মসমাজের পক্ষে এরূপ সমাগম বড়ই শুভলক্ষণ সন্দেহ নাই। ইতি

বিনীত

মহর্ষিদেবের জনৈক প্রাচীন ভক্ত।

উপরোক্ত পত্রখানি আমরা সাদরে প্রকাশ করিলাম। এবার সঙ্গীতনায়ক শ্রীযুক্ত গোপেশ্বর বন্দ্যোপাধ্যায় এবং তাঁহার সুযোগ্য পুত্র শ্রীযুক্ত রমেশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়, শ্রীযুক্ত গোবিন্দচন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত অজিৎকুমার রায় উৎসবের সঙ্গীতসাধনে আমাদের যথেষ্ট সহায়তা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত পরেশনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় এস্রাজ এবং শ্রীযুক্ত অমিয়ভূষণ অধিকারী সেতার বাজাইয়াছিলেন। মেসার্স ডোয়ার্কিন এণ্ড সন কোম্পানির স্বত্বাধিকারী শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ একটী সুন্দর অর্গ্যান হারমোনিয়ম পাঠাইয়া বিশেষ অনুগৃহীত করিয়াছিলেন।

এবারকার মাঘোৎসবকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার জন্য যাঁহারা বেদী গ্রহণ করিয়াছিলেন, যে সকল ভক্তবৃন্দ তাঁহাদের সমবেত শ্রদ্ধা ও ভক্তির সংস্পর্শদানে আমাদিগকে আনন্দসাগরে ডুবাইয়া দিয়াছিলেন; যে সকল বন্ধুবান্ধব উৎসাহদানে ও নানাপ্রকারে আমাদিগকে সাহায্য দান করিয়াছিলেন; এবং যে সকল কর্ম্মচারী আনন্দ সহকারে উৎসব উপলক্ষে বিশেষ পরিশ্রম করিয়াছেন, আমরা তাঁহাদের সকলকে আমাদের আন্তরিক কৃতজ্ঞতা ও ধন্যবাদ সহকারে সাদর নমস্কার জানাইতেছি।

সংবাদ।

ধর্ম্মমহাসম্মেলন—এবার শ্রীযুক্ত হেমচন্দ্র সরকার মহাশয়ের যত্নে ও চেষ্টায় উৎসবের উপসংহারে, মহাসমারোহে একটী ধর্ম্মমহাসম্মেলনের আয়োজন ও অনুষ্ঠান হইয়াছিল। গত ১৪ই মাঘ রবিবার প্রাতঃকাল ৮॥০ ঘটিকার 'সেনেট-হলে' পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের সভাপতিত্বে ইহার প্রথম উদ্বোধন হয়। ইউরোপ আমেরিকা ও এশিয়া মহাদেশের নানা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিগণ এই সম্মেলনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। 'অধুনা মানবসমাজে ধর্ম্মের প্রতি ক্রমবর্দ্ধমান উদাসীনতাকে কিরূপে বিদূরিত করা যায়' ইহাই ছিল প্রথম দিনের সাধারণ আলোচনার বিষয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁহার সভাপতির অভিভাষণে অধুনা সংসার বর্দ্ধমান সাম্প্রদায়িকতার নিন্দা করেন। তৎপরে অসুস্থতার কারণে তিনি চলিয়া গেলে ডাঃ ডুমণ্ড সভাপতির আসন গ্রহণ করিলে মহামহোপাধ্যায় প্রমথনাথ তর্কভূষণ হিন্দুধর্ম্মের উদার ভাব সম্বন্ধে বক্তৃতা করিলেন। এই দিবস বেলা ২টায় পুনর্ব্বার সম্মেলনের অধিবেশন আরম্ভ হয় এবং বেলা ৫টা পর্য্যন্ত বিভিন্ন বক্তা কর্ত্তৃক বিভিন্ন ধর্ম্মবিষয়ক বক্তৃতা ও প্রবন্ধ পাঠ চলিতে থাকে। ১৫ই মাঘ সোমবার অপরাহ্ণ ৪ ঘটিকায় সম্মেলনের শেষ অধিবেশনে ডাঃ সাউথওয়ার্থ সভাপতি হন। এদিনের সাধারণ আলোচ্য বিষয় ছিল "বিশ্বশান্তি ও বিশ্বপ্রেমের বিকাশ"। এদিনেও রাত্রি ৭টা অবধি বহু বক্তৃতা ও প্রবন্ধাদি পঠিত হইয়াছিল। আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর সকলের অনুরোধে "ওঁ পিতানোঽসি" বেদমন্ত্রে প্রার্থনা করিলে সভার কার্য্য আরম্ভ হয়। তিনি এই দিনে "The Message of Peace" বিষয়ে ইংরাজী ভাষায় একটী সুন্দর প্রস্তাব পাঠ করেন এবং সভাস্থলে উহা পুস্তিকাকারে বিতরিত হয়। উহা আমরা তত্ত্ববোধিনীর গত পৌষ সংখ্যায় প্রকাশ করিয়াছি। অন্যান্য সংবাদপত্রে

সম্বাদে যেরূপ যথাযথ বিবরণ প্রকাশিত হইবে, আমরা তাহা প্রকাশ করিতে সচেষ্ট হইব।

উপাধিলাভ—আমরা শুনিয়া সুখী হইলাম যে, ধর্ম্মমহাসম্মেলন উপলক্ষ্যে ইউরোপ ও আমেরিকা হইতে সমাগত ধর্ম্মবেত্তাগণ গত ৯ই মাঘ সিটিকলেজে একটী প্রকাশ্য সভায় শ্রীহেমচন্দ্র সরকার এম-এ মহাশয়কে শ্রদ্ধাস্পদ 'ডি. ডি.' অর্থাৎ 'Doctor of Dviinity' উপাধিতে বিভূষিত করিয়াছেন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

বিবাহ—গত ১৭ই মাঘ বুধবার ৪৭নং শাঁখারী টোলা ইষ্ট লেনে ৺প্রেমাংশুনাথ চক্রবর্ত্তীর কনিষ্ঠা কন্যা শ্রীমাধবীলতা দেবীর সহিত ৪৮।৫ বিডন রো নিবাসী শ্রীনিবারণচন্দ্র পাকড়াশী মহাশয়ের জ্যেষ্ঠপুত্র শ্রীমান্ নীতিকুমার পাকড়াশীর শুভ বিবাহকার্য্য আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে সুসম্পন্ন হইয়া গিয়াছে। শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বেদী হইতে দম্পতীকে উপাসনান্তে যথাযথ উপদেশ প্রদান করিয়াছিলেন। সভাস্থলে বিভিন্ন সমাজের বহু নরনারীর সমাগম হইয়াছিল। ভগবান এই নব দম্পতীকে নিত্য প্রেম ও কল্যাণের পথে অগ্রসর করুন।

জাতকর্ম্ম—গত ১৪ই মাঘ রবিবার শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের তৃতীয় পুত্র পূজ্যপাদ ৺হেমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের পৌত্র শ্রীমান্ ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুরের একটী নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তদুপলক্ষ্যে গত ১৯শে মাঘ শুক্রবার সায়ংকাল ৬॥০ ঘটিকায় পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদসম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে নবকুমারের জাতকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান ইহাকে নিত্য শ্রীসৌন্দর্য্যে ও সাধুগুণে বিভূষিত করুন।

আনুষ্ঠানিক ও মাঘোৎসবের দান।

আমরা কৃতজ্ঞতার সহিত নিম্নলিখিত দানগুলির প্রাপ্তিস্বীকার করিতেছি।

শ্রীলক্ষ্মীনাথ বেজবরুয়া তাঁহার মধ্যমা কন্যার শুভ বিবাহ উপলক্ষ্যে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীকৃষ্ণদাস দে তাঁহার মাতার আদ্যশ্রাদ্ধ উপলক্ষ্যে ৫৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীসত্যাংশুনাথ চক্রবর্ত্তী তাঁহার ভ্রাতুষ্পুত্রীর বিবাহোপলক্ষ্যে ১০৲ টাকা দান করিয়াছেন।

কবিরাজপ্রবর শ্রীগিরিজাপ্রসন্ন সেন কবিকণ্ঠভূষণ মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ১০৲ দান করিয়াছেন।

শ্রীতুলসীদাস দত্ত মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শ্রীঅবিনাশচন্দ্র মিত্র মাঘোৎসব উপলক্ষ্যে ১৲ টাকা দান করিয়াছেন।

ARYA RAMANIR SIKSHA O SWADHINATA (REVIEW)

By Kshitindanath Tagore B.A. Tatwanidhi, 2nd Edition. Price Rs. 1-12

Published from 55, Upper Chitpore Road, Calcutta.

Motherhood is the supreme ideal of womankind, but it does not imply that woman is a kind of breeding animal as some would erroneously presume from the inference. Motherhood means something higher and nobler. So the education that helps the harmonious development of all the faculties that make the true mother of a woman is the only education that is most fitted for our mothers and sisters. The system may have some external modifications under varying conditions but the principle underlying it should remain one and the same for all times and under all circumstances. The writer of the volume under notice, who is a keen observer of the social customs and morals obtaining in different countries and under different climes and who is also an ardent admirer of Hindu social institutions has sought to show in this book that the education that was imparted in ancient times to Aryan women was the best to help them to the realisation of that ideal. He has proved to the hilt that the modern system which is blindly copied from showy and materialistic West has been a complete failure inasmuch as it is utterly incompatible with the healthy growth of motherhood and as it unnecessarily awakens in them a craze for European system of dressing and toiletting. And who knows in this mad rush for westernisation, eastern veil—by this we do not mean Moslem purdah—will not shortly give place to western bowler hat and the comely 'sari' to the indecent short-skirt of the latest Paris fashion which is but an apology for nakedness?

The author's deep learning in the Vedas, Upanishads and other Hindu Sastras on one hand, and careful study of the western society and its morals and finally his independent research have led him to hold that the sort of education and liberty that woman in Europe enjoys and are so eagerly sought after by a section of Indian feminists have the effect of carrying them away from their ideal.

Another proposition he has put forward in his book and it will be rather shocking to any modern and liberal-minded Indian is that for the preservation of the motherhood and chastity of Aryan women the system of seclusion prevalent in Vedic times is absolutely necessary. It may look oldfashioned and ludicrous in an age of democracy. But we can assure our readers who may startle at this seemingly reactionary view that our author does not want to thrust thick-veiled purdah upon our sisters or keep them shut up within the four walls of the kitchen. What he wants them is not to go much—as the Frenchman would say—'dans le monde', for their sphere of activity does not lie there. His ideas are healthy; arguments convincing and conclusions emanating from cool reasoning.

He is unsparing in his condemnation of the adoption of western dress by Indian women and proposes for them a dress at once cheap and decent for out-door use.

These are only a few of the points he has dealt with. This publication is the result of vast experience, independent research and an earnest desire on the part of the author for the amelioration of the condition of our sisters. We do not know a fitter man in our present age who can more competently handle those intricate and vital problems that stand before us for solution than our author. We wish we had more time to give it a better notice. The book coming as it does from the pen of a man of Sj. Kshitindra Nath Tagore's learning and experience deserves careful perusal by all educationists, feminists, reformers, and general students of Sociology.

—(*Forward*, 27. 1. 29)

Tattwabodhini Patrika **Reg. No. C 462**

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯। সাল ১৩৩৫। শক ১৮৫০। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা।
আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীরণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫। ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

উদ্বোধন।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

আজ এই পবিত্র স্থানে পবিত্র সময়ে সমাগত হইয়া এমন শুভ অবসরকে বৃথা নষ্ট হইতে দিও না। আজ এই উৎসবের মুখে সকলে একপ্রাণ হইয়া সেই প্রিয়তম ভগবানের জয়ঘোষণা কর এবং জীবনকে ধন্য কর। আজ নিরানন্দ যেন আমাদের হৃদয়কে স্পর্শ না করে। যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ সম্মুখের এই অনন্ত আকাশে দেদীপ্যমান; যে তেজোময় অমৃতময় পুরুষ আমাদের প্রত্যেকের আত্মাতে জাগ্রতমূর্ত্তিতে প্রকাশমান; যাঁহার উজ্জ্বল প্রকাশ আমরা অন্তরে প্রত্যক্ষ উপলব্ধি করিতেছি, সেই দেবতাকে আজ এই শুভ মুহূর্ত্তে ভক্তিপুষ্পের অর্ঘ্যাঞ্জলি প্রদান করিয়া ধন্য হও। আজ তোমাদের হৃদয়দ্বার উদ্‌ঘাটিত কর, ব্যাকুল অন্তরে হৃদয়নাথ পরমেশ্বরকে আহ্বান কর। "যাঁহারি কৃপায় তুমি খুলিলে নয়ন, তাঁরে আগে দেখিও"।

প্রভাতের সুমন্দ পবনহিল্লোল আজ সেই দেবাদিদেবেরই নিশ্বাস বহন করিয়া আনিতেছে। প্রভাতসূর্য্যের কনকচ্ছটা তাঁহারই বিমল জ্যোতি প্রকাশ করিতেছে। যে মহান পুরুষকে এই প্রকৃতি আমাদের সম্মুখে ধারণ করিতেছে, তিনি জাগ্রত দেবতা; তিনি আমাদের চিরসঙ্গী। আজ ঊর্দ্ধেতে অধোতে, দক্ষিণে বামে, সম্মুখে পশ্চাতে, অন্তরে বাহিরে, সর্ব্বত্র তাঁহার দর্শন লাভ করিয়া আনন্দে বিভোর হও। আজ হৃদয়কে প্রশস্ত কর, আত্মাকে উন্নত কর। উৎসবের এই প্রথম প্রভাতে আজ তাঁহাকে সমস্ত জ্ঞানের মধ্যে সমস্ত ভাবের মধ্যে সুখে দুঃখে, সম্পদে বিপদে, সকল অবস্থাতেই তাঁহাকে চিরসঙ্গী বলিয়া, কেবল মুখে নহে, অন্তরেও উপলব্ধি করিয়া তাঁহার প্রতি হৃদয়ের সমস্ত পূজা অর্পণ করিয়া কৃতার্থ হও।

যাঁহার প্রসাদে আমরা অযাচিতভাবে কত সৌভাগ্য কত আনন্দ অহর্নিশি উপভোগ করিতেছি, আজ সেই বিশ্বপিতা অখিলমাতাকে তাঁহার প্রসন্ন মুখে আনন্দমূর্ত্তিতে প্রকাশমান দেখ। আজ তাঁহাকে মৃত্যুমাঝে অমৃতসোপানরূপে উপলব্ধি করিয়া নির্ভয় হও; হৃদয় হইতে দুঃখশোক নিরাশা নিরানন্দ বিদূরিত কর। সংসারে থাকিতে গেলেই তো সুখদুঃখ বিপদসম্পদ চক্রের মত সম্মুখে আসে, আবার ঘুরিয়া ফিরিয়া পশ্চাতে চলিয়া যায়। কিন্তু আজ সংসারে ডুবিয়া আপনাকে মৃতপ্রায় ও অসাড় হইতে দিও না; ব্রহ্মানন্দ উপভোগে আপনাকে বঞ্চিত রাখিও না। আজিকার প্রাতঃসূর্য্য তাঁহারই নাম লইয়া অরুণাচল ভেদ করিয়া উদিত হইয়াছে, আর সঙ্গে সঙ্গে আনন্দরাশি জগতের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ছড়াইয়া দিয়াছে। আজ এসো, আমরাও তাঁহার নাম লইয়া অন্তর হইতে জড়তা মলিনতা বিদূরিত করিয়া আত্মাকে চিরনূতন উৎসাহে ও চিরনূতন উদ্যমে পূর্ণ করি। অন্তর হইতে পাপ তাপ যাহা কিছু সমস্তই

দূর করিয়া দাও; দুঃখ শোক বিপদ আপদের কথা, অমঙ্গল অকল্যাণের কথা আজ মন হইতে অপসারিত করিয়া দাও। ব্রহ্মের নামে আজ সকলে নবোৎসাহ লাভ কর এবং নববলে বলীয়ান হও। প্রাণের দুয়ার খুলিয়া দাও—প্রাণের ভিতর ভগবানের বাতাস, তাঁহার মঙ্গল আলোক প্রবেশ করুক। অন্তরের আবর্জ্জনা সেই প্রেমময়ের মঙ্গল নিশ্বাসে উড়িয়া যাক।

যে দেবতা আজ আমাদের এখানে পূজা গ্রহণের জন্য সমুপস্থিত, একবার তাঁহাকে পিতামাতা বলিয়া উপলব্ধি কর, একবার আপনাকে সেই অমৃত পুরুষের সন্তান বলিয়া উপলব্ধি কর, তোমাদের সমস্ত ভয় ভাবনা নিমেষের মধ্যে অন্তর্হিত হইয়া যাইবে, তোমাদের জীবন মঙ্গলভাবে কাটিবে, তোমাদের সমস্ত কাজ সুসম্পন্ন হইবে; পাপ-চিন্তার প্রতি, পাপকার্য্যের প্রতি তোমাদের চিত্ত ধাবিত হইবার অবসরই আসিবে না। তাঁহার নামের মত মঙ্গল ও কল্যাণকর আর কিছুই নাই। তাঁহার নামের গুণে সমস্ত দুঃখশোক, সকল বিঘ্নবিপত্তি মুহূর্ত্তের মধ্যে কোথায় যেন অন্তর্হিত হইয়া যায়, কোথা হইতে সুশীতল শান্তি-ধারা নামিয়া তপ্ত প্রাণকে অভিষিক্ত করে। সেই পরম পুরুষ আমাদের জীবনের প্রতি নিমেষ প্রতি ঘটনা মঙ্গল উদ্দেশ্যে নিয়মিত করিতেছেন, ইহা স্থির জানিয়া নির্ভয় হও। তাঁহাকে জীবনসহচর জানিয়া জীবনের পথে অগ্রসর হও—দুঃখবিপদ রোগশোক কোন কিছুই তোমাদিগকে ভয় দেখাইতে পারিবে না, মৃত্যু তোমা-দিগকে স্পর্শ করিতে পারিবে না।

আজ এই ১১ই মাঘের উৎসবদিবসে সকল কর্ম্মের প্রারম্ভে সেই অভয়দাতা পিতামাতা পরমেশ্বরকে আত্মার অন্তরে উপলব্ধি কর এবং ভক্তিভরে প্রণাম কর। তাঁহাকে আজ সম্মুখে দেখিয়া তাঁহার চরণে সমুদয় হৃদয়ের প্রীতি সমর্পণ করিয়া এবং তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনে প্রাণ মন ধন নিয়োগ করিয়া দুর্লভ মানব জন্মকে সার্থক কর। সকল ভয়ের যিনি ভয়, যিনি ভয়া-নকেরও ভয়ানক, তাঁহাকে বন্ধুরূপে গ্রহণ কর, তোমা-দের হৃদয় হইতে সকল ভয় বিদূরিত হউক; সমস্ত বিভীষিকা তোমাদের পদতলে পড়িয়া বিদলিত হউক; তোমাদের নিকটে মৃত্যু অমৃতে পরিণত হউক। হৃদয় হইতে দ্বেষহিংসা বিদূরিত করিয়া সকলকে প্রেমালিঙ্গন প্রদান কর। অন্তরে জ্ঞানের কর্ম্মের ও ভক্তির অগ্নি প্রজ্বলিত কর। অমৃত পুরুষের অমৃতবারিতে আপনাকে অভিষিক্ত কর—তোমাদের আত্মা শান্তি-সমুদ্র পরমাত্মার সহিত একযোগে নিযুক্ত হউক। দুঃখশোক, বিঘ্ন-বিপত্তি, পাপতাপ হইতে উত্তীর্ণ হইয়া তোমাদের জীবন সতত জয়যুক্ত হউক।

নবজাগরণ।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

অগ্রসর হও—জীবনলাভ হইবে; পশ্চাতে পড়িয়া থাক—
মৃত্যু ও বিনাশ অপরিহার্য্য।

ভগবান আজ ভারতভূমিতে যে নবজাগরণের জোয়ার প্রেরণ করিয়াছেন, তাহার প্রবল বেগ প্রতিরুদ্ধ করে কাহার সাধ্য? একে তো জাগরণের জোয়ার তরতর বেগে ছুটিয়া চলিয়াছে, তাহার উপর আবার সমগ্র বিশ্বের প্রাণ হইতে, অন্তত পৃথিবীর অর্দ্ধাংশ প্রাচ্য ভূখণ্ডের প্রাণ হইতে, এই জাগরণের অনুকূল এক আশ্চর্য্য পবনহিল্লোল প্রবাহিত হইতেছে। এমন জোয়ারের লগন এবং এমন অনুকূল বায়ুকে অবহেলা করিয়া হাত হইতে পিছলাইয়া যাইতে দিও না। এই নব-জাগরণের দিনে পশ্চাতে পড়িয়া থাকিলে চলিবে না। নিজের জীবনতরীতে পাল তুলিয়া দাও; এবং শুভ ভাব ও চিন্তা, শুভ কর্ম্ম ও অনুষ্ঠানের সাহায্যে নবজাগরণের জোয়ার বাহিয়া সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও মঙ্গলের পথে এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা লাভের পথে খরবেগে চলিয়া যাও। কর্ণধার ভগবানের হস্তে হালটী সন্যস্ত করিয়া আত্মদৃষ্টির সমুজ্জ্বল আলোকের সাহায্যে অমৃতধামের পথে নির্ভয়ে অগ্রসর হও। বর্ত্তমানের জোয়ার ধরিয়া অগ্রসর হইলেই জীবন লাভ করিবে এবং তোমার দৃষ্টির সম্মুখে জ্ঞান ভক্তি ও কর্ম্মসমুজ্জ্বল কত শত নব নব রাজ্য উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। আর, যদি জাগরণ-জোয়ারের প্রবল বেগের বিভীষিকায় ভীত হইয়া পশ্চাতে পড়িয়া থাক, এবং নিদ্রা ও আলস্যকে প্রশ্রয় দিতে সতত উন্মুখ হও, তবে মৃত্যু ও বিনাশ অপরিহার্য্য।

স্বাধীনতার আকাংক্ষা ও রাজা রামমোহন রায়।

এই নবজাগরণের মূল প্রাণ হইল স্বাধীনতার আকাংক্ষা। এই স্বাধীনতাস্পৃহার উৎস রুদ্ধ করা কাহা-রও সাধ্যায়ত্ত নহে, কারণ ইহা ভগবানের একটী অমূল্য মঙ্গল্য দান। এই স্বাধীনতাস্পৃহাকে ভগবান প্রতি মানবের অন্তরে তাহার জন্মগত অধিকাররূপে নিহিত করিয়া দিয়াছেন। তাই মানবাত্মার অন্তরস্থিত স্বাধীন-তার উৎস চিরন্তন ও অক্ষয়। এমন মানুষ থাকিতে পারে না, যাহার আত্মা হইতে স্বাধীনতাস্পৃহা সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিদেশীদের লিখিত মিথ্যা ইতি-হাসের বোঝা বহিতে বহিতে বহুকাল যাবৎ যেমন সত্য ইতিহাসের মর্য্যাদা আমরা বিস্মৃত হইয়াছিলাম, সেইরূপ শতাব্দীর পর শতাব্দী ধরিয়া সর্ব্বাঙ্গীন পরাধীনতার তমসাচ্ছন্ন কারাগারে বাস করিবার ফলে ভারতবাসী স্বাধীনতার মর্য্যাদা একপ্রকার ভুলিয়া গিয়াছিল বলিলেও

চলে; স্বাধীনতাস্পৃহা এতটুকু পরিস্ফুট হইয়া বাহিরে প্রকাশ হইতে গেলেই ভারতবাসী ভয়ে আতঙ্কিত হইয়া পড়িত, পাছে তাহার ফলে নিজেদের জীর্ণ গৃহ ধূলিসাৎ হইয়া সুখের স্বপ্ন ও সোয়াস্তির মোহ সহসা চূর্ণ হইয়া যায়। নিজেদের হিতাহিত ভুলিয়া, স্বাধীনতার সঞ্জীবনী-সুধার বিন্দুমাত্র যাহাতে দেশের মধ্যে প্রবেশ করিয়া কোনপ্রকারে এতটুকু শক্তিসঞ্চার করিতে না পারে, দেশবাসীর প্রাণে বল, মনে বীর্য্য ও আত্মায় তেজ প্রদান করিতে না পারে—এককথায়, স্বাধীনতা-স্পৃহাকে নিশ্বাসরোধ করত সমূলে নির্ম্মূল করিবার উদ্দেশ্যে, ভারতবাসী স্বয়ংই অজ্ঞান, কুসংস্কার, উপধর্ম্ম গুরুবাদ প্রভৃতি শতবিধ উপকরণের সাহায্যে সুপ্রশস্ত বাঁধ বাঁধিয়া প্রবহমান নিষ্কলঙ্ক স্বাধীনতাস্রোতকে আটক করিবার যথাসাধ্য ব্যবস্থা করিল। পরাধীনতা সর্ব্ববিধ দুঃখ ও অমঙ্গলের নিদান এবং সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতা উন্নতি ও মঙ্গলের একমাত্র কারণ, একথা ভারতবাসী ভুলিয়া গেল। ক্রমে স্বাধীনতার জীবনপ্রদ শক্তির স্পর্শ হইতে বিচ্যুত হইতে হইতে, স্বাধীনতা ও পরাধীনতার উপর যে আমাদের জীবন মরণ নির্ভর করে, একথা ভারতবাসী ভুলিয়া গেল। কিন্তু ভগবান মানবাত্মার অন্তরে স্বাধীনতার যে অক্ষয় উৎস খুলিয়া রাখিয়াছেন, সেই অক্ষয় উৎস হইতে স্বাধীনতাস্রোত নীরবে নিঃশব্দে অবিরল-ধারে প্রবাহিত হইতে হইতে ভারতবাসীর হৃদয় ভরিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছিল। এমনও ইঙ্গিত বড় অল্প পাওয়া যায় নাই যে, সেই স্বাধীনতাস্রোত সময়ে প্রবল বন্যার আকারে বহির্গত হইয়া ভারতবাসীর রুদ্ধ হৃদয় শতধা বিভক্ত করিয়া এই পুণ্যভূমি ভারতের বিভিন্ন বিষয়ের প্রাচীন ধারাসমূহ নির্ম্মূল করিতে পারে। আজ ৯৯ বৎসর অতীত হইতে চলিল, ঐ বিশালবপু ও বিরাটহৃদয় দূরদর্শী মহাত্মা রাজা রামমোহন রায় সুস্পষ্টদৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, এই স্বাধীনতাস্রোত কিছুতেই বদ্ধ হইবার নহে, প্রত্যুত ইহাকে অজ্ঞান কুসংস্কার প্রভৃতির গণ্ডী দ্বারা আবদ্ধ করিতে গেলে যখন উহা ফাটিয়া ফুটিয়া বাহির হইবার চেষ্টা করিবে, তখন ইহার সংহত বেগ ভারতের বৈশিষ্ট্যকে ধুইয়া কোথায় যে লইয়া যাইবে তাহা কেহই বলিতে পারে না। ইহা উপলব্ধি করিয়া তিনি অসম সাহসের সহিত সাধারণ দেশবাসীর মতের বিরুদ্ধেও ঐ সকল অজ্ঞান, কুসংস্কার উপধর্ম্ম প্রভৃতির বাঁধ ও গণ্ডী যথাসাধ্য ভাঙ্গিয়া চুরিয়া ঐ স্বাধীনতা-স্রোতের সাহায্যে ভারতভূমিকে এবং ভারতের ভিতর দিয়া সমগ্র জগতকে শস্যশ্যামল করিবার ব্যবস্থা করিলেন।

স্বাধীনতা ও ভগবদুপাসনা।

নবযুগের নবজাগরণের প্রাণ বা কেন্দ্র যেমন স্বাধীনতা, সেইরূপ এই স্বাধীনতারও কেন্দ্র ভগবান—ইহার মূল উৎস তিনিই। স্বাধীনতার অর্থ উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা নয়। স্বাধীনতা ও উচ্ছৃঙ্খলতা দুই বিপরীত মেরুতে অবস্থিত। স্বাধীনতা জীবন আনয়ন করে, দেহে মনে ও আত্মাতে শক্তি ও তেজ সঞ্চার করে; উচ্ছৃঙ্খলতা দেহ মন ও আত্মার সকল শক্তি ও তেজ হরণ করিয়া মানুষকে মৃত্যু ও বিনাশের অভিমুখে পরিচালিত করে। স্বাধীনতা মানবের অন্তরে ভগবন্নিহিত অমোঘ শক্তি; উচ্ছৃঙ্খলতা মানবপ্রবর্ত্তিত ধ্বংসসাধক প্রলয়ের তাণ্ডব-লীলা। স্বাধীনতার ভিতরে কে এই জীবনীশক্তি অন্তর্নিবিষ্ট করিয়া দিলেন? আর, কেই বা মানবের অন্তরে এই স্বাধীনতাস্পৃহা খোদিত করিয়া দিলেন? এই স্বাধীনতাস্পৃহাও মানবের অন্তরে তুমি আমি প্রবেশ করাইয়া দিই নাই—প্রবেশ করাইবার ক্ষমতাও তোমার আমার নাই; আর, এই স্বাধীনতার ভিতরে জীবনী-শক্তির সমাবেশ করাইবার ক্ষমতাও তোমার আমার নাই। তখন ইহা কেহ অস্বীকার করিতে পারে না যে, এই স্বাধীনতার মূল উৎস ভগবান এবং ইহার কেন্দ্রও তিনিই। ইহাও ঐ দূরদর্শী রাজা রামমোহন রায় সুস্পষ্ট উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়াই তিনি ভগবদুপাসনার পথে স্বাধীনতাস্রোতকে পরিচালিত করিয়া দেশের নব-জাগরণকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপর সুপ্রতিষ্ঠিত করিলেন।

ভগবদুপাসনার দুই অঙ্গ—প্রীতি ও প্রিয়কার্য্যসাধন।

নবজাগরণকে যদি আমরা জাগাইয়া রাখিতে চাই, স্বাধীনতাস্রোতকে যদি আমরা অব্যাহত রাখিতে চাই, তবে রাজা রামমোহন রায়ের পদাঙ্ক অনুসরণ করিয়া ভগবদুপাসনার উপরেই উঁহাদিগকে দাঁড় করাইতে হইবে। এই ভগবদুপাসনার দুইটী অঙ্গ—একটী হইতেছে ভগবানকে সমস্ত হৃদয়ের সহিত প্রীতি করা; দ্বিতীয়টী হইতেছে তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধন। তাই ভগবদুপাসনা যে সত্যধর্ম্মের কেন্দ্র, সেই সত্যধর্ম্মের উহাই হইল বীজমন্ত্র। এই উপাসনার প্রথম অঙ্গ—ভগবানকে প্রীতি করা—নির্জ্জন সাধনের সহায়তা করে এবং দ্বিতীয় অঙ্গটী তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধন—সজন সাধনের অনুকূল। সাধনের অভাবে কোন একটী অঙ্গ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে ভগবানের চরণে সরল পথে উপস্থিত হওয়া কঠিন হয়। উভয় অঙ্গের যথাযথ সামঞ্জস্যের সহিত সাধন করিলেই আমাদের প্রকৃত উপাসনা উদ্‌যাপিত হয়। মানবের শুভজনক ও কল্যাণ-কর যে কোন চিন্তা ভাব ও কর্ম্ম, সে সমস্তেরই এই উপা-সনার মধ্যে সমাবেশ আছে। ইহা স্বতঃসিদ্ধ এবং বিভিন্ন দেশের ও জাতির এবং বিভিন্ন মানবসমাজের ইতিহাস পদে পদে ইহা প্রতিপন্ন করে যে, এই বীজমন্ত্রের উপর আমরা যতটুকু দাঁড়াইয়া জীবনযাত্রা নির্ব্বাহ করিব, সংসারের পথে

পদক্ষেপ করিব, ততটুকুই আমাদের মঙ্গল; এই বীজ-মন্ত্র হইতে আমরা যতটুকু বিচ্যুত হইয়া, বিচ্ছিন্নসম্বন্ধ হইয়া বিচরণ করিব ততটুকুই আমরা অমঙ্গল ও অশান্তির কবলে গিয়া পড়িব।

স্বাধীনতাসংগ্রাম ও ধর্ম্ম।

দুঃখের বিষয় আমাদের দাসমনোভাবের কারণে সম্প্রতি দেশের মধ্যে একটা অশুভ হাওয়া উঠিতে সুরু করিয়াছে। যে ভারতবাসী আহারে বিহারে শয়নে জাগরণে সকল কার্য্যেই ভগবানকে কেন্দ্রে রাখিবার শিক্ষা প্রাপ্ত হয়, দুঃখের বিষয়, আজ সত্যধর্ম্মের প্রকৃত মর্ম্ম হৃদগত করিতে না পারিয়া এবং তুরস্ক রষিয়া প্রভৃতি কয়েকটী নবজাগ্রত দেশের ঘটনাকে বিকৃত অর্থে গ্রহণ করিয়া, সেই ভারতের অধিবাসী কেহ কেহ এদেশের নবজাগরণ ও তাহার অনুসঙ্গী স্বাধীনতাসংগ্রামকে ধর্ম্ম হইতে বিচ্যুত ও বিচ্ছিন্নসম্বন্ধ করিয়া চালাইবার পরামর্শ দেন। স্বাধীনতার সহিত ধর্ম্মের সম্বন্ধ বিচ্ছিন্ন করিলে তাহা প্রতি মুহূর্ত্তে উদ্দাম উচ্ছৃঙ্খলতা বা ঘোর স্বার্থপরতায় পরিণত হইবার সম্ভাবনা। তোমার আমার মঙ্গলের জন্য, পরিবারের মঙ্গলের জন্য, সমাজ দেশ ও জাতির মঙ্গলের জন্য, সমগ্র মানবের হিতের জন্য কি স্বাধীনতা চাই? ভগবানকে সমগ্র মানবজাতির একই পিতামাতা ও বিশ্বজগতের মঙ্গলবিধাতা জানিয়া মানবের ভ্রাতৃত্ববোধে উদ্বুদ্ধ না হইলে পরিবারের জন্য, সমাজের জন্য, দেশের জন্য, নিজের ক্ষতি স্বীকার করিয়া, নিজের স্বার্থ বলিদান করিয়া মঙ্গলসাধক স্বাধীনতা সংগ্রামে প্রবৃত্তিই আসিবে কিরূপে, তাহা আমাদের ধারণাতেই আসে না। সকল মঙ্গলের একমাত্র উৎস ভগবানকে প্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনের ভিতর দিয়া স্বাধীনতা-সংগ্রামে অগ্রসর না হইলে তাহার মধ্যে মঙ্গলের বন্ধনসূত্র কিছুতেই থাকিতে পারে না—তাহার স্থায়িত্ব আশা করা আকাশকুসুম মাত্র। তুরস্ক প্রভৃতি দেশের ঘটনাবলী আলোচনা করিলে স্পষ্টই বুঝা যাইবে যে, ঐ সকল দেশে রাষ্ট্রনীতিকে যে ধর্ম্মের সহিত বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা চলিতেছে, তাহা প্রকৃত সত্যধর্ম্ম নহে—যাহার ভিত্তিভূমি পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার প্রত্যক্ষ ও একান্ত যোগ, কিন্তু তাহা ধর্ম্মবাদ বা ধর্ম্ম সম্বন্ধে সাম্প্রদায়িক মতামত মাত্র। ঐ সকল দেশের রাষ্ট্রনেতাগণ জগতের ইতিহাস এবং তাঁহাদের নিজ নিজ দেশের ইতিহাস আলোচনা করিয়া স্পষ্ট দেখিলেন যে, ধর্ম্মের নামে প্রচলিত সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্মসকল শতবিধ অমঙ্গল অশান্তি ও শতবিধ বিরোধ-বিবাদের কারণ হইয়া উঠে এবং দেশ ও জাতিকে পরিণামে সমগ্র মানবসমাজকে মৃত্যু ও ধ্বংসের পথে লইয়া যায়। তাই তাঁহারা দেশের মধ্যে স্বাধীনতা ও মৈত্রী সংস্থাপনের চেষ্টায় সর্ব্বপ্রকার সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্ম এবং তাহার অবিচ্ছিন্ন পার্শ্বচর গুরুবাদ পৌরোহিত্য প্রভৃতির বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়াছেন। আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি যে তাঁহারা অসাম্প্রদায়িক প্রকৃত সত্যধর্ম্মের বিরুদ্ধে দাঁড়ান নাই।

রাজা রামমোহন রায় ও সত্যধর্ম্ম।

এই পুণ্যভূমি ভারতভূমিতেও নানা রাষ্ট্রবিপ্লব ও সমাজবিপ্লবের ঘাতপ্রতিঘাতের ফলে শতবিধ সাম্প্রদায়িক উপধর্ম্ম সমুদ্ভূত হইয়া কলহবিবাদে ও দ্বন্দ্বহিংসায় দেশকে ক্ষতবিক্ষত করিবার ব্যবস্থা করিয়াছিল। উপধর্ম্মের নিত্যসহচর গুরুবাদ, অযথা পৌরোহিত্য, শতবিধ অনাচার ও কদাচার অবসর বুঝিয়া দেশকে পরাধীনতার পথে, ধ্বংসের পথে মৃত্যুর পথে অগ্রসর করিয়া দিতেছিল। অবশেষে বিগত উনবিংশ শতাব্দীর প্রারম্ভে সাঙ্গোপাঙ্গ উপধর্ম্মসকল সত্যধর্ম্মকে আচ্ছন্ন করিয়া স্বাধীনতার পথ, উন্নতি ও মঙ্গলের পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেছিল। কিন্তু ভগবানের যাহা দান তাহার নিশ্বাস রোধ করে, তাহার পথ সম্পূর্ণ রুদ্ধ করে এমন কাহারও সাধ্য নাই। তখন ভগবান কর্ম্মমূর্ত্তিতে অবতীর্ণ হইয়া মহাবলী রাজা রামমোহন রায়ের ভিতর দিয়া প্রকাশ পাইলেন। রাজা রামমোহন রায় উপধর্ম্ম ও অনাচার প্রভৃতির কঠিন শৃঙ্খল ভেদ করিয়া পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার নিত্য ও প্রত্যক্ষ যোগমূলক সত্যধর্ম্মের দীপ্ত দীপ তুলিয়া ধরিলেন এবং সর্ব্বপ্রকার মঙ্গল ও কল্যাণের পুণ্যপ্রবাহ ভারতে পুনঃপ্রবাহিত করিবার ব্যবস্থা করিলেন। স্বাধীনতার ভিত্তি কোথায়, নবজাগরণের মূল কোথায়, তাঁহার স্বাভাবিক দিব্যদৃষ্টিতে উপলব্ধি করিয়া সত্যধর্ম্মকে দেশের মধ্যে চিরজাগ্রত রাখিবার জন্য রাজা রামমোহন রায় ভগবদ্বিধানে তাঁহার কয়েকজন অন্তরঙ্গ বন্ধুর সহযোগে এই দরিদ্র বঙ্গদেশের এককোণে উদারতম অধিকারপত্রের ভিত্তির উপর সর্ব্বপ্রথম ব্রহ্মমন্দির স্থাপন করিলেন এবং জগতের মহাসভায় অন্ততঃ ধর্ম্মবিষয়ে ভারতভূমিকে সর্ব্বোচ্চ স্থানে বসিবার অধিকার পুনঃপ্রদান করিলেন।

রাজা রামমোহন রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী।

আজ ৯৯ বৎসর অতীত হইতে চলিল, যখন রামমোহন রায় ব্রহ্মমন্দির প্রথম প্রতিষ্ঠিত করেন, তখন তাঁহার মতানুসারী সঙ্গীগণের সংখ্যা তো মুষ্টিমেয় ছিল। আর, সেই সঙ্গীগণেরও মধ্যে তাঁহার বিশেষ অন্তরঙ্গ কয়েকজন বন্ধু ব্যতীত অপর কাহারও হৃদয়ের অন্তস্তম প্রদেশকে তাঁহার প্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞানমূলক ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শ স্পর্শ করিয়াছিল কিনা সন্দেহ। রাজা রামমোহন রায় এই ভবিষ্যদ্বাণী করিয়াছিলেন যে, তাঁহার প্রচারিত সত্যসকল শতাব্দী পরে তাঁহার দেশ-

বাসীর নিকটে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিবে। ব্রাহ্মসমাজের প্রথম উদ্যম ও উৎসাহের যুগে, রামমোহন রায়ের প্রতিষ্ঠিত ব্রহ্মমন্দিরের ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠ যখন দিনে দিনে উপাসকবর্গে পরিপূর্ণ হইতে লাগিল, মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরও হৃদয় ততই আনন্দে ও উৎসাহে ভরিয়া উঠিতে লাগিল এবং তিনি অগত্যা একটী বৃহত্তর প্রকোষ্ঠ নির্ম্মাণ করিয়া দিলেন। আমাদের নিকট কিন্তু ইহা কম আশার কথা নয় যে, ব্রাহ্মসমাজের সত্যসকল এখন ভারতের মাত্র কয়েকজন শিক্ষিত ব্যক্তি অথবা ভারতের কেবলমাত্র শিক্ষিতমণ্ডলীর মধ্যেই আবদ্ধ নাই, কিন্তু সংবাদপত্রের সাহায্যে, বক্তৃতাদির সাহায্যে সেই সকল সত্য এখন ভারতবাসী জনসাধারণের অন্তর স্পর্শ করিতেছে। ব্রাহ্মধর্ম্মের সরল মুক্তিপদ সত্যবাণীসকল আজ কেবলমাত্র একটী প্রকোষ্ঠের চারি কোণের মধ্যে অথবা একটী ব্রহ্মমন্দিরের চতুঃসীমার মধ্যেই আবদ্ধ না থাকিয়া ভারতের এক প্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত ঝঙ্কার দিয়া উঠিতেছে—ভারতবাসী জনসাধারণের মর্ম্মে মর্ম্মে মিশিয়া গিয়া সুফলপ্রসূ শতবিধ আকারে প্রকারে প্রকাশ পাইতেছে। আজ ভারতের সুদূরতম পল্লীগ্রামেরও চক্ষুষ্মান অধিবাসীমাত্রেই পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার প্রত্যক্ষ যোগসাধনকেই ধর্ম্মের উচ্চতম আদর্শ ও প্রকৃত সত্যধর্ম্ম বলিয়া স্বীকার করিতে সহজেই অগ্রসর হন। স্ত্রীশিক্ষা, স্ত্রীশূদ্রাদির বেদাদি অধ্যয়ন প্রভৃতি যে সকল বিষয় সত্যধর্ম্ম প্রচারে সহায়তা করে এবং ব্রাহ্মসমাজ সংস্থাপনের প্রথম অবস্থায় যে সকল বিষয়ের বিরুদ্ধে দণ্ডায়মান হইয়া ভারতের হিন্দুসাধারণ তীব্র প্রতিবাদ করিয়াছিলেন, আজ তাঁহারা সেই সকল বিষয় সহজ সত্যরূপে অবাধে গ্রহণ করিতেছেন, এবং সেগুলির বহুল প্রচারকল্পেও যথেষ্ট সাহায্যদানে অগ্রসর হইতেছেন। রাজা রামমোহন রায়ের ভবিষ্যদ্বাণী আজ সর্ব্বতোভাবে সফল হইতে চলিয়াছে দেখি। আজ শতাব্দীপ্রায় পরে, কেবল ভারতবাসী নয়, সমগ্র জগদ্বাসী আজ তাঁহাকে চিনিতে পারিয়াছে, তাঁহার প্রচারিত সত্যধর্ম্ম ও তদনুকূল অন্যান্য মতের প্রতি যথোচিত মর্য্যাদা প্রদান করিতে শিখিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজপ্রচারিত ব্রহ্মজ্ঞানমূলক সত্যসকল বর্ত্তমানে শুধু বৃহত্তর হিন্দুসমাজের নয়, কিন্তু উত্তরে দক্ষিণে পূর্ব্বে পশ্চিমে জগতের সর্ব্বত্র পরম সমাদরে গৃহীত হইতেছে। খৃষ্টধর্ম্ম, মহম্মদীয় ধর্ম্ম প্রভৃতি বহুজনসেবিত প্রবলপরাক্রান্ত উপধর্ম্ম হইতেও সকল অনিষ্ট অমঙ্গলের মূল, সকল কলহবিবাদের কারণ সাম্প্রদায়িকতার গণ্ডীসকল অপসারিত করিতে জনসমাজ বদ্ধপরিকর হইতেছে দেখিয়া আজ ব্রাহ্মসমাজের প্রকৃত আনন্দ-উৎসবের দিন সমীপবর্ত্তী মনে করি। সমগ্র মানবসমাজের প্রাণ হইতে আজ, যে ধর্ম্ম ভগবানের সঙ্গে মানবের প্রত্যক্ষ যোগসাধনের পথ দেখাইতে পারে, সেই সরল ও সবল সত্যধর্ম্মের জন্য কাতর প্রার্থনা সমুত্থিত হইতেছে দেখিয়া ব্রহ্মোপাসকমাত্রেরই হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠিবে সন্দেহ নাই।

ব্রাহ্মধর্ম্ম প্রচারের সুন্দর অবসর।

ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র এবং তদবলম্বিত ব্রাহ্মসমাজপ্রচারিত সত্যসকল দেশবিদেশে বহুল পরিমাণে প্রচার করিবার সুন্দর অবসর আসিয়াছে। বর্ত্তমানে ব্রাহ্মসমাজের মধ্যে নানাবিধ মনোভাববিশিষ্ট লোকজনের সমাবেশ হইতেছে এবং ব্রাহ্মসমাজের সহিত দেশবিদেশের রাষ্ট্রনৈতিক সমাজনৈতিক প্রভৃতি বিভিন্ন সভাসমিতির ও বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের সংঘর্ষ ও ঘাতপ্রতিঘাত চলিতেছে। কাজেই, ব্রাহ্মসমাজের আদিম অবস্থায় যে সকল সমস্যার সমাধানে ব্রাহ্মসমাজকে যত্নবান থাকিতে হইয়াছিল, এখন ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে সেগুলি ব্যতীত আরও অনেক বেশী এবং আরও গুরুতর সমস্যা উপস্থিত হইয়াছে ও হইতেছে। ব্রাহ্মসমাজকে যদি সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া বাঁচিয়া থাকিতে হয়, তবে তাহাকে ঐ বীজমন্ত্রের উপর দাঁড়াইয়া উহার অপ্রতিকূল আচার ব্যবহারকে অন্তরঙ্গ করিয়া লইয়া বিভিন্ন দেশের বিভিন্ন জাতির লোকজনের সহিত মিশিয়া যাইতে হইবে, বিভিন্ন সভাসমিতি ও ধর্ম্মসম্প্রদায়কে ধর্ম্মানুকূল পথ প্রদর্শনে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং নব নব উত্থিত সমস্যাসমূহের সমাধানে সর্ব্বদা ও সর্ব্বথা প্রস্তুত থাকিতে হইবে। ভগবৎপ্রেরণায় আমাদের পরিপার্শ্বস্থ বিভিন্ন সমাজ সবেই দ্রুতগতিতে উন্নতির পথে ছুটিয়া চলিয়াছে। ব্রাহ্মসমাজকে সত্যধর্ম্ম প্রচার করিয়া যদি বাঁচিতে হয়, তবে তাহাকে ঐ সকল সমাজেরও অগ্রবর্ত্তী হইয়া চলিতে হইবে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জাগরণবাণী।

যতদিন না ব্রাহ্মসমাজকে আশানুরূপ অগ্রসর হইতে দেখিব, ততদিন আমি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের এই জাগরণবাণী ধ্বনিত করিতে ক্ষান্ত হইব না যে "ব্রহ্মোপাসকগণ সমস্ত জাতি অপেক্ষা সকল বিষয়ে, কি জ্ঞানে, কি বিদ্যায়, কি ধর্ম্মে, কি অর্থে উন্নত না হইলে ব্রাহ্মসমাজের পতন অবশ্যম্ভাবী।"

ব্রাহ্মসমাজের পতনে হিন্দুভারতের পতন।

যে জর্ম্মানির সহিত মিত্রসংঘ যুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়াছিলেন, সেই জর্ম্মানির পতনে সমস্ত পাশ্চাত্য ভূখণ্ডের পতন অপরিহার্য্যরূপে বিজড়িত, ইহা মিত্রসংঘ উপলব্ধি করিয়া সেই জর্ম্মানির পুনর্গঠনে নানাভাবে সাহায্য করিতে উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়াছিলেন। সেইরূপ ইহা নিঃসংশয়ে বলা যাইতে পারে যে,

ব্রাহ্মসমাজের পতন হইলে তাহার আবর্ত্তে ভারতের, বিশেষত যাহার ক্রোড়ে ব্রাহ্মসমাজের জন্ম, সেই হিন্দু-ভারতের সকল সমাজই অবনতির পঙ্কিল হ্রদে ডুবিয়া যাইবে। হিন্দুসমাজ যদি বাঁচিতে চায়, প্রকৃত হিন্দু-ধর্ম্মকে যদি বাঁচাইয়া রাখিতে হয়, তবে ব্রাহ্মসমাজ-কেও বাঁচাইয়া রাখিতে হইবে এবং ব্রাহ্মধর্ম্ম সত্যধর্ম্মের যে সত্যমূর্ত্তি প্রকাশ করিয়াছেন, সেই সত্যমূর্ত্তিকেও সজীব রাখিতে হইবে।

ব্রাহ্মসমাজকে সজীব রাখিবার উপায়।

ভগবানের দান সত্য ব্রাহ্মধর্ম্মকে সজীব রাখিতে চাহিলে এবং তাহার প্রচারকেন্দ্র ব্রাহ্মসমাজকে বাঁচাইয়া রাখিতে চাহিলে আমাদিগকে নবোদ্যমে নবোৎসাহে ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য তত্ত্বসকল ধনীর অট্টালিকায় এবং দরিদ্রের পর্ণকুটীরে, সুখের সংসারে এবং পাপীর তাপক্লিষ্ট আঁধার প্রাণে, সর্ব্বত্র বহন করিতে হইবে; সময়ে সময়ে যুগে যুগে রাষ্ট্রনৈতিক, সমাজনৈতিক বা যে কোন বিষয়ের যে কোন নূতন সমস্যা মানবসমাজে সমুদিত হইবে, সেই সমস্যার নিরাকরণে তাহার উপর ব্রাহ্মধর্ম্মের কেন্দ্র হইতে নবতর আলোকপাত করিতে হইবে। আমাদের বক্তৃতা উপদেশ প্রভৃতি কেবলমাত্র ব্রহ্মোপাসকদিগের উদ্দেশে দিলে চলিবে না; কেবলমাত্র ব্রহ্মোপাসক-দিগকেই লক্ষ্যস্থলে রাখিয়া আমাদের সমস্ত কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলে চলিবে না। যে হিন্দুসমাজ হইতে ব্রাহ্ম-সমাজের জন্ম, সেই বৃহত্তর হিন্দুসমাজ এবং বৃহত্তম মানবসমাজের প্রতি লক্ষ্য রাখিয়া আমাদের সকল কার্য্য করা কর্ত্তব্য। ব্রাহ্মসমাজকে শক্তিমান করিতে চাহিলে কেবল শিক্ষিতদের মধ্যে ইহার বিশুদ্ধ মতসকল আবদ্ধ রাখিলে আর চলিবে না। উচ্চনীচনির্ব্বিশেষে, পাপী-সাধুনির্ব্বিশেষে, বালকবৃদ্ধনির্ব্বিশেষে, নরনারীনির্ব্বিশেষে, দেশবিদেশনির্ব্বিশেষে জগতবাসীমাত্রকেই ইহার আশ্রয়ে টানিয়া আনিতে হইবে। হিন্দুজাতির অবনতিকালের মত, বর্ত্তমান যুগে ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্রকে কুহেলিকার পর্দ্দার সাহায্যে, জনসাধারণের দৃষ্টির অন্তরালে রাখিয়া, কেবলমাত্র গুরুর অন্তরের কৌটায় পুরিয়া, মধ্যে মধ্যে প্রয়োজনমত ব্যবহারের জন্য বাহির করাইলে চলিবে না। ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র, যাহার মধ্যে জীবনের সমস্ত শুভ, সমস্ত মঙ্গল ও সমস্ত কল্যাণের সমাবেশ আছে, সেই বীজমন্ত্র অদ্বিতীয় ঈশ্বরের ন্যায় এক ও অদ্বিতীয়—

ব্রাহ্মধর্ম্মের বীজমন্ত্র।

তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব; একস্য তস্যৈবোপাসনয়া ঐহিকং পারত্রিকঞ্চ শুভম্ভবতি —ভগবানকে প্রীতি করা ও তাঁহার প্রিয়কার্য্য সাধনই তাঁহার উপাসনা, এবং একমাত্র তাঁহার উপাসনা দ্বারাই মানবের ঐহিক ও পারত্রিক মঙ্গল হয়। এই বীজমন্ত্রে লুকাইবার কিছুই নাই। সুবিধাসুযোগ পাইলেই এই বীজমন্ত্র চারিদিকে ছড়াইয়া দেওয়াই আমাদের কর্ত্তব্য। কতকগুলি বীজমন্ত্র উষরভূমিতে পড়িবে বলিয়া দুঃখের কোনই কারণ নাই; যেগুলি উর্ব্বরভূমিতে পড়িয়া মহা-মহীরুহে পরিণত হইবে, সময়ে তাহারই পত্রপুষ্পফল সেই উষরভূমিকেও উর্ব্বর করিয়া তুলিবে।

বিভীষিকাকে পদদলিত কর।

ব্রাহ্মসমাজের ন্যায় মহত্ত্বপূর্ণ সুবৃহৎ প্রতিষ্ঠানের অনুষ্ঠানে অগ্রসর হইবার পথে বারেবারে পদেপদে ভুলভ্রান্তি হইতে পারে, কিন্তু তাহার জন্য হাহুতাশ করিয়া নিশ্চিন্ত থাকিলে চলিবে না; পদেপদে বৃথা ও মিথ্যা নিন্দাবাদ সহ্য করিতে হইবে, কিন্তু তাহার জন্য কর্ত্তব্যসাধনে বিমুখ হইলে চলিবে না; মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে উপহাসের সুতীব্র বাণসকল বর্ষিত হইবে, কিন্তু তাহার জন্য কাপুরুষের মত সংগ্রামে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করিলে চলিবে না। ভগবানের উপর নির্ভর করিয়া দৃঢ়তার সহিত কর্ত্তব্যের পথে, দিকে দিকে ঐ বীজমন্ত্র বপন করিবার পথে অগ্রসর হইতে হইবে, এবং সঙ্গে সঙ্গে ভুলভ্রান্তির মূলও নষ্ট করিতে হইবে। ব্রাহ্মসমাজের পূর্ব্বতন আচার্য্যগণ শত অত্যাচার অবিচার, শত অপবাদ উপহাস সহ্য করিয়াও শত ভুলভ্রান্তি সত্ত্বেও কঠোর সাধনার ভিতর দিয়া তাঁহাদের আন্তরিক নিষ্ঠার সহিত ঐ বীজ-মন্ত্রকে অন্তরে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন এবং জনসমাজে প্রচার করিয়াছিলেন বলিয়াই ব্রাহ্মসমাজ বর্ত্তমানে জন-সমাজে এক আশ্চর্য্য সবল প্রভাব বিস্তার করিতে সক্ষম হইয়াছে। এই মাঘোৎসব তাঁহাদিগকে স্মরণ করিবার সুন্দর অবসর। তাঁহাদের জীবন কেবল ব্রাহ্মসমাজের নয়, সমগ্র জগতের ধর্ম্মসমাজের গৌরবের বিষয় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। তাঁহাদের সাধুজীবন পথপ্রদর্শকরূপে আমাদের গন্তব্যপথ নির্দ্দেশ করিতেছে। তাঁহারা সুখ-সোয়াস্তি অপেক্ষা মন্ত্রের সাধনকেই শ্রেষ্ঠ আসন প্রদান করিয়াছিলেন। তাঁহাদের অনেকে ভগবৎনামের পতাকা বহন করিয়া পল্লীগ্রামে গিয়াছেন এবং পল্লীবাসী-দিগের নির্য্যাতনের ফলে কতদিন অনশনে কাটাইয়া দিয়াছেন, তথাপি স্বীয় কর্ত্তব্যসাধনে পরাংমুখ হন নাই। কিন্তু আমরা এখন মন্ত্রের সাধন অপেক্ষা সুখসোয়াস্তিকেই অধিক করিয়া দেখি। পল্লীগ্রামে গিয়া পল্লীবাসী-দিগের হস্তে এতটুকু নির্য্যাতন, এতটুকু বাধাবিঘ্ন, এতটুকু দুঃখকষ্ট প্রাপ্ত হইলাম, অমনি নিজেরাও ব্রহ্মোপাসনা পরিত্যাগ করিলাম এবং ভীরু কাপুরুষের ন্যায় ব্রহ্মোপাসনা প্রচারের ব্রত উদযাপনেও পশ্চাৎপদ হইলাম। ইহা কল্পিত উপন্যাস নহে, কিন্তু প্রত্যক্ষ

অভিজ্ঞতার কথা। বিনা স্বার্থত্যাগে, দেশের মঙ্গল ও জাতির কল্যাণরূপ বৃহত্তর স্বার্থের নিকট নিজের ক্ষুদ্র স্বার্থকে বলিদান না করিলে কোনও সদনুষ্ঠান দাঁড়াইয়াছে বলিয়া দেখিতে পাই না। খৃষ্টভক্ত কত ধর্ম্মপ্রাণ ব্যক্তিকে তিলে তিলে কুরিয়া কুরিয়া নিহত করা হইয়াছে, কত অজ্ঞাত মহাত্মা অগ্নিকুণ্ডে বদ্ধ হইয়া তিলে তিলে দগ্ধ হইতে বাধ্য হইয়াছেন, তথাপি তাঁহারা নিজেদের অবলম্বিত ধর্ম্মকে পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করেন নাই, তাই না আজ আমরা খৃষ্টধর্ম্মকে উন্নতশিরে দাঁড়াইতে দেখিতেছি। অধিকাংশ ধর্ম্মসমাজের সংস্থাপকগণকে আদিম অবস্থায় অনেক নির্য্যাতন, অনেক কষ্ট সহ্য করিতে হইয়াছে। আমাদেরও সম্মুখে ভারতের ধর্ম্মপ্রাণ ব্রহ্মবাদী কত মহাত্মার সমুন্নত আদর্শ সুপ্রতিষ্ঠিত আছে। সেই সকল আদর্শ ধরিয়া শত ভয়বিভীষিকাকে পদদলিত করিয়া আমাদিগকে সম্মুখে সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি মঙ্গল ও স্বাধীনতার পথে সাহসের সহিত অগ্রসর হইতে হইবে।

সাধু যাঁহার ইচ্ছা ঈশ্বর তাঁহার সহায়।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের অন্তর হইতে নিঃসৃত এই মহা সত্যবাণী শ্রবণ কর এবং অন্তরে ধারণ করিয়া নির্ভয় হও—'আমাদের সম্মুখে পর্ব্বতসমান বাধা, কিন্তু সাধু যাঁহার ইচ্ছা, ঈশ্বর তাঁহার সহায়'। ভয় নাই—ভয় নাই—ভগবানের হুঙ্কারিত মাভৈরবের এই শঙ্খধ্বনি গগন ভেদ করিয়া আমাদের কর্ণে ও মর্ম্মে আসিয়া প্রবেশ করিতেছে। চারিদিক হইতে স্বাধীনতালাভের জন্য, উন্নতি সাধনের জন্য, মঙ্গলের জন্য একটা প্রবল বেগবান বায়ু সমুত্থিত হইতেছে। সকলের সমবেত শক্তিতে এই বায়ুর অভিমুখে পাল তুলিয়া দাও—নিশ্চিন্ত থাকিও এবং নির্ভয় হও, সত্যধর্ম্মের তরণী কখনই ডুবিতে পারে না—কর্ণধার ভগবান তাঁহার সবল হস্তে হাল ধরিয়া আছেন। ভগবানের আদেশে ব্রাহ্মসমাজই বর্ত্তমান যুগে এই উন্নতি ও মঙ্গলসাধক স্বাধীনতার বায়ু ভারতে বহাইবার সূত্র ধরাইয়া দিয়াছে; আজ যখন সেই বায়ুর বেগ প্রবর্দ্ধিত হইতে চলিয়াছে, তখন আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে, ব্রাহ্মসমাজই আবার তাহার অনুকূলে পাল ধরিলেই দেশকে ও জাতিকে প্রকৃত উন্নতির পথে, প্রকৃত স্বাধীনতালাভের পথে তরতর বেগে পরিচালিত করিতে পারিবে এবং তখনই ব্রাহ্মসমাজ সার্থকতা লাভ করিবে।

ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুও বরণীয়।

উপসংহারে আমি ঋষিবাক্যে এই সত্য কথা বলিতে চাই যে, "ধর্ম্মযুদ্ধে মৃতো বাপি তেন লোকত্রয়ং জিতং" ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুর কবলে কেহ নিপতিত হইলেও তিনি ত্রিলোকজয়ী হন। যদি তোমাদের সত্যই এই বিশ্বাস থাকে যে, অপ্রতিহতশক্তি ভগবান আছেন এবং তিনিই এই বিশ্বচক্রের মঙ্গলবিধাতা ও নিয়ন্তা, তবে তাঁহার পতাকা বহনে এবং তাঁহার সত্যধর্ম্মের মন্ত্রশক্তিবিতরণে কার্পণ্য প্রদর্শন করিও না। একনিষ্ঠ হও। ব্রত উদ্‌যাপনে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ হও। সত্যধর্ম্মের ঐ বীজমন্ত্র দিনে নিশীথে প্রতিমুহূর্ত্তের প্রত্যেক কার্য্যে প্রত্যেক চিন্তায় তোমাদের জপমন্ত্র হউক। ঐ বীজমন্ত্রে অঙ্কিত ভগবানের বিজয়পতাকার তলে তোমরা সকলে সমবেত হও এবং ধর্ম্মযুদ্ধে মৃত্যুও বরণীয়, তোমাদের বিজয়বিষাণে এই অমরবাণী ধ্বনিত করিতে করিতে অগ্রসর হও। দেশকে স্বজাতিকে সর্ব্বাঙ্গীন স্বাধীনতার মূল উৎস একমাত্র অদ্বিতীয় ভগবানে স্থিরপ্রতিষ্ঠ করিতে না পারা পর্য্যন্ত কোন দুঃখকষ্টে মুহ্যমান না হইয়া কোন ভয়ে ভীত না হইয়া অগ্রসর হও—অগ্রসর হও—পশ্চাতে পড়িয়া থাকিও না, বিরাম বিশ্রামের আকাংক্ষা করিও না, আলস্যে ও বিলাসে গা ভাসাইয়া দিও না। ভগবান আমাদের এই উদ্যম উৎসাহে বল প্রদান করুন এবং আমাদের প্রতিজ্ঞাকে সাফল্যমণ্ডিত করুন। *

নূতন ব্রহ্মসঙ্গীত।

প্রাতঃকাল।

ভৈরবী—চৌতাল।

প্রাণমন সঁপিনু তোমার পদে অন্তর্যামী
তোমা নাথ যেই চাহে তাহে দাও অচল শরণ।
তব প্রথম তেজ দেব অসংখ্য ভুবন সৃজিল
সকল পাপ অজ্ঞান দূরিল প্রীতি তব হে অতুলন॥
গাহিছে গুণ অশেষ সুর মানব, দেবেশ! —তব
অন্ত কেহ নাহি পায়।
চিত্তে দাও ভক্তি অচল, দাওহে কৃপা আনন্দ;
নাহি আর যাচি কিছু, তুমি মোর হে দারিদ্র্য-হরণ॥

ভৈরব—সুরফাকতাল।

হে ওঙ্কার মহাদেব শঙ্কর,
তুমি সকল শুভকারণ, দুরিতনাশ।
তোমা চাহে ধরিতে ধ্যান, অনুখন দয়াঘন,
তোমা পাইলে দর্শন যায় ত্রাস॥
হরি' দুখ দ্বন্দ্ব করহ দূর শঙ্কা,
রুদ্র কালকাল, দেব মহাম্বরবাস!

* গত ১১ই মাঘ বৃহস্পতিবার প্রাতঃকালে আদিব্রাহ্মসমাজের উপাসনামন্দিরে বিবৃত।

হর সব কলুষ হর পাপভীতি,
সকল সন্তাপ হর চিত্ত-উল্লাস !
প্রাণ দেব হে মম ধাইছে তব পদে ;
তব সেবকে দাও চরণে নিবাস ॥

ভৈরবী—তাল দাদ্‌রা।

বাঁশরী মরমে আজি বাজিছে তোমারি—
লভি' সমাধি ভুলিনু হে সবি আপনারি।
পেলে তোমারে চাহিনাকো বেদ সাঙ্গ চারি ;
তব নামে আনন্দ জাগে হৃদয়ে আমারি।
সাথে তব রহিবারে চাহি সব ছাড়ি'।
পরাণে আজি উজান বহে জীবনকাণ্ডারী !
গগনাঙ্গনে নব নব হে ত্রিলোকধারী
রূপ তব অবাক হেরে যত নরনারী।
সুন্দর তুমি মনহর বরিষ প্রেমবারি—
ধরি তোমার কলুষহরণ চরণ সুখকারী ॥

আস্থায়ী।

(শ্রীহিমাংশুশেখর বন্দ্যোপাধ্যায়)

অগ্রহায়ণ (১৩৩৫) মাসের তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার ২১৩ পৃষ্ঠায় রায় বাহাদুর শ্রীযুক্ত দীননাথ সান্যাল মহাশয়ের "আস্থায়ী" শীর্ষক প্রবন্ধে, স্থায়ী ঠিক বা আস্থায়ী ঠিক, ও আস্থায়ী সংস্কৃতমূলক কি না, এই সব আলোচনা দৃষ্টে এই পত্রিকার সম্পাদক মহাশয় (২১৪ পৃষ্ঠার টিপ্পনীতে) ঐ বিষয়ের আলোচনা করিতে পাঠকবর্গকে অনুরোধ করিয়াছেন। আস্থায়ী ও স্থায়ী শব্দদ্বয় সম্বন্ধে আমি যতটুকু অবগত হইয়াছি তাহা নিম্নে দিলাম।

বাঙ্গলাদেশে সঙ্গীতের (কলি বা তুক) খণ্ডভাগের প্রথম ভাগকে "আস্থায়ী" বলে, তাহা বোম্বাই ও যুক্তপ্রদেশ ইত্যাদিতে "স্থায়ী" বলিয়াই উক্ত হয়। যুক্তপ্রদেশ হইতে প্রকাশিত (এখন অপ্রচলিত) সঙ্গীতসুধা নামক সঙ্গীত বিষয়ক মাসিক পত্রিকায় ("আস্থায়ী" শব্দ ব্যবহৃত হইয়াছে। বোম্বাই ও পুনা হইতে প্রকাশিত সঙ্গীতপুস্তকসমূহে (যথা গীতমালিকা, হিন্দুস্থানী সঙ্গীতপদ্ধতি ক্রমিকপুস্তকমালিকা প্রভৃতিতে), "স্থায়ী" শব্দই ব্যবহৃত হইয়াছে। ইহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায় যে বাঙ্গালার "আস্থায়ী" শব্দ, উক্ত "স্থায়ী" শব্দেরই অপভ্রংশ। যুক্তপ্রদেশ, বোম্বাই ও পুনা অঞ্চলে স্থায়ীর পর সঙ্গীতের অন্যান্য তিনটি খণ্ডের নাম বাঙ্গালা দেশের ন্যায়ই অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ।

ভারতে এইভাবে স্থায়ী (বা আস্থায়ী) শব্দ যে অর্থে ব্যবহৃত হইতেছে, প্রাচীন সংস্কৃত সঙ্গীতগ্রন্থে সে অর্থে ঐ শব্দের ব্যবহার দেখি নাই।

সঙ্গীতরত্নাকরে একটি সম্পূর্ণ যন্ত্র-বা কণ্ঠ-সঙ্গীতের নানারূপ ভাগ বর্ণিত হইয়াছে, তন্মধ্যে কোথাও "স্থায়ী" শব্দ ব্যবহৃত হয় নাই। ঐ গ্রন্থে শাস্ত্রীয় নিয়মবদ্ধ কণ্ঠ বা যন্ত্রসঙ্গীতের 'উদ্‌গ্রাহ', 'মেলাপক' 'ধ্রুব' ও 'আভোগ' এই চারিটি অবয়ব, এবং স্থলবিশেষে ধ্রুব ও আভোগের মধ্যে 'অন্তরা' এই একটা, মোট পাঁচটা অবয়ব বর্ণিত হইয়াছে (সং র০ ৪। ৭—৯।* শাস্ত্রীয় নিয়মবদ্ধ ছাড়া অন্যান্য সঙ্গীতের অবয়ববিভাগ, সঙ্গীতরত্নাকরে অন্যরূপ বর্ণিত আছে। ঐ সকল বিভাগের সহিত আধুনিক স্থায়ি, অন্তরা, সঞ্চারী, আভোগ এই বিভাগের কোনরূপ মিল নাই।

উক্ত প্রাচীন বিভাগের মধ্যে যে খণ্ড বা অবয়বে সঙ্গীতটির প্রারম্ভ হয়, তাহাই 'উদ্‌গ্রাহ' এবং যে অবয়ব দ্বারা উদ্‌গ্রাহের সহিত ধ্রুব ভাগের সংযোগ হয় তাহার নাম 'মেলাপক'। তাহার পর 'ধ্রুব' অবয়ব। উদ্‌গ্রাহের পর মেলাপক থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, এবং ধ্রুব অবয়বের পর অন্যান্য অবয়ব থাকিতেও পারে, না থাকিতেও পারে, কিন্তু উদ্‌গ্রাহের পর ধ্রুব নিশ্চয় থাকিবেই, এই ধ্রুবত্ব অর্থাৎ নিশ্চিত থাকিবেই এই জন্য এই অবয়বের নাম 'ধ্রুব' হইয়াছে (সং র০ ৪। ৮)। এই ধ্রুবশব্দ হইতেই আধুনিক "ধ্রুব" বা "ধ্রু" অথবা "ধুয়া" শব্দসমূহের উৎপত্তি হইয়া থাকিবে। উক্ত প্রাচীন সঙ্গীতের অন্তিম অবয়বের নাম "আভোগ" (সং র০ ৪। ৮ ;, আভোগের অর্থ পরিপূর্ণতা, এই জন্য শেষ অবয়বের নাম আভোগ হইয়াছে (ঐ কল্লিনাথের টীকা)।

সঙ্গীতরত্নাকরে নিম্নলিখিত অর্থে "স্থায়ী" শব্দের ব্যবহার দেখিয়াছি :—স, রি, গ, ম ইত্যাদির এক একটী স্বর (স, রি, গ, ম ইত্যাদির একটী স্বর) বিলম্বিত ও বিশ্লিষ্ট ভাবে প্রয়োগ বা উচ্চারণ হইলে, তাহার নাম স্থায়ী বর্ণ † (সং র ১। ৬। ২), যথা স স স স, বা ম ম ম ম ইত্যাদি। যে স্বরে রাগ উপবেশন করে, অর্থাৎ যে স্বরের ভিত্তিতে আরোহ ও অবরোহ হইয়া

---

* এইরূপ সংক্ষেপ লিখন অন্যত্রও ব্যবহার করিয়াছি। ইহার অর্থ সঙ্গীতরত্নাকর, শ্রীমঙ্গেশ রামকৃষ্ণ তেলঙ্গ মহাশয় সম্পাদিত, আনন্দাশ্রম মুদ্রণালয়, পুনা ১৮৯৬—৯৭ খৃষ্টাব্দে প্রকাশিত, ৪র্থ অধ্যায়, ৭ম হইতে ৯ম শ্লোক। কলিকাতা হইতে শ্রীকালীবর বেদান্তবাগীশ ও শ্রীসারদাপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়দ্বয় কর্ত্তৃক (নূতন আর্য্যধর্ম্ম ১৮১৯ শকে) সঙ্গীতরত্নাকর প্রথম ভাগ মাত্র প্রকাশিত হইয়াছিল। উভয় পুস্তকের শ্লোকসংখ্যায় মিল নাই।

† প্রাচীন সঙ্গীতে স্বরের বিস্তারের নাম বর্ণ। স র গ ম এইরূপ হইলে 'আরোহী বর্ণ', নি ধ প ম গ এইরূপ প্রয়োগের নাম 'অবরোহী বর্ণ'। স্থায়ী, আরোহী ও অবরোহী বর্ণের মিলনে "সঞ্চারী" বর্ণ।

রাগের রূপ প্রকাশিত হয়, সেই স্বরের নাম স্থায়ীস্বর। * এইভাবে স্থায়ী শব্দের ব্যবহার ছাড়া সঙ্গীতরত্নাকরেও রাগবিশেষে "স্থায়" শব্দ ব্যবহার হইয়াছে। "রাগস্যাবয়বঃ স্থায়…" সং রং ৩।৯১, এই স্থলে টীকাকার কল্লিনাথ বলিয়াছেন, "সোঽপ্যত্র ন্যাসাপন্যাসসংন্যাসবিন্যাসেনান্যতম-স্বরবিশ্রান্তত্বেন প্রযুক্তো হংসাদি-কতিপয়-স্বরসন্দর্ভো বেদিতব্যঃ।" রাগবিশেষে উক্ত হইয়াছে :— "স্থায়ো নাম ন্যাসাপন্যাসসংন্যাসবিন্যাসান্যতমস্বরবিশ্রান্তত্বেন প্রযুক্তঃ কতিপয়স্বরসন্দর্ভরূপোমুহুরাবর্ত্তমানো রাগৈকদেশঃ"। রাগবিশেষের একটী সঙ্গীতের মূল বিভাগের ছন্দ, স্বরবিশেষে সমাপ্ত হয়। রাগবিশেষের জন্য, ঐ সকল সমাপ্তিকারী স্বরসমূহ, নির্দ্দিষ্ট থাকে। মূল বিভাগস্থ ছন্দের শেষে অথবা উপবিভাগস্থ ছন্দসমাপ্তিকারী স্বর অনুসারে, ঐ সমাপ্তিকারী স্বরসমূহের নাম ন্যাস, অপন্যাস, সংন্যাস, বিন্যাস স্বর। ঐ সকল মূল বিভাগ (principal part) বা উপবিভাগ (subordinate part) ছাড়া রাগের অন্যরূপ খণ্ডবিশেষের নাম "স্থায়ঃ"। সঙ্গীতরত্নাকরে নানাপ্রকার স্থায় ভেদের বর্ণনা আছে (সং রং ৩।৯৭—১৯২) তন্মধ্যে এক প্রকার স্থায়ের নাম "অংশ" (সং রং ৩।৯৮, ১০০ ও টীকা)। এই "অংশ" নামক স্থায়, ও অংশ-স্বর (বাদী স্বর ও অংশস্বর একই) আলাদা জিনিস। আধুনিক সঙ্গীতে রাগের যেমন স্থায়ী, অন্তরা, সঞ্চারী ও আভোগ এই সকল মূল বিভাগ ছাড়া, ঐ সকল বিভাগের স্থলে স্থলে কম্পন, গিটকারী, তান, এই সব তান কর্ত্তব প্রয়োগ হয় ও অলঙ্কার দ্বারা রাগের বিস্তার হয়, প্রাচীনকালে রাগের ঐরূপ অলঙ্কার, তান, কর্ত্তব অংশ (খণ্ড, ক্ষুদ্র বিভাগ) গুলির নাম "স্থায়ঃ" ছিল।

এই "স্থায়ঃ" (খণ্ড) অবয়বের সহিত আধুনিক "স্থায়ী" বা "আস্থায়ী" শব্দের কোনরূপ মিল নাই। প্রাচীন সঙ্গীত শাস্ত্রে "স্থায়ী", স্থিতি বা অবস্থিতি অর্থবাচক। আধুনিক সঙ্গীতের প্রথম বিভাগে (স্থায়ীতে) রাগ আরম্ভ হয়, আবার অন্তরার পর স্থায়ীতে ফিরিয়া আইসে, শেষ আভোগ হওয়ার পর স্থায়ীতে ফিরিয়া আসিয়া ঐ স্থায়ীতে বা স্থায়ীর প্রথম চরণে রাগটী সমাপ্ত হয়, রাগের মূল বিভাগে (principal part) প্রথম বিভাগে, রাগের পুনঃ পুনঃ ঐরূপ স্থিতি হওয়ায়, এই প্রথম বিভাগটির নাম "স্থায়ী" হইয়া থাকিবে। ঐ স্থায়ীর উচ্চারণের অপভ্রংশ হইয়াই বঙ্গদেশে "আস্থায়ী" হইয়াছে।

* যত্রোপবেশাত্তে রাগঃ স্বরে স্থায়ী স কথ্যতে ॥…(সং রং ৩।১৮৮)।

সঙ্গীতরত্নাকরের কালে, প্রাচীনতর শাস্ত্রনিবদ্ধ রাগসমূহের নির্দ্দিষ্ট "বাদী" স্বর ছিল, এবং ঐ বাদী স্বর বহুল প্রয়োগ হওয়ার কথা, এবং ঐ বাদী স্বর হইতে আরোহ ও অবরোহ হওয়ার কথা শাস্ত্রে উক্ত ছিল; কিন্তু সঙ্গীতরত্নাকর লেখক শার্ঙ্গদেবের সময়ে সকল ক্ষেত্রে ব্যবহারিক কার্য্যে ঐ শাস্ত্রীয় নিয়ম পালন হইত না, ও শাস্ত্রনির্দ্দিষ্ট "বাদী" স্বর ছাড়া অন্য স্বরের প্রাধান্য হইত এবং সেই স্বর হইতে আরোহ ও অবরোহ হইত (সং রং ৬ ৩৩১, ৫৪৩, ৫৪৫, ৫৪৭, ৫৪৯ ইত্যাদি)। সঙ্গীতরত্নাকর সিংঘণ দেবের রাজত্বকালে লিখিত বলিয়া ঐ গ্রন্থে উক্ত আছে। পুনায় মুদ্রিত সঙ্গীতরত্নাকরের সম্পাদক মহাশয় ইতিহাস দৃষ্টে স্থির করিয়াছেন যে, দাক্ষিণাত্যে দেবগিরি (আধুনিক দৌলতাবাদ) নগরের সিংঘণ নৃপতির রাজত্বকালে ১২১০ - ১২৪৭ খৃষ্টাব্দে এই গ্রন্থ লিখিত হয়।

সাত্ম্য ও পথ্য।

(শ্রীগিরিশচন্দ্র বেদান্ততীর্থ)

[পূর্ব্বানুবৃত্তি]

"শকলী রোহিতাকারো ভূমৌ প্রায়শ্চরত্যসৌ।
গুর্ব্বী পাকে চ মধুরা ভেদিনী দোষ-কোপনী॥"

শকলী মৎস্য রোহিতাকার, প্রায়ই ভূমিতে বিচরণ করে। উহা গুরুপাক মধুর ভেদকারী ও দোষের প্রকোপজনক। রোহিতাকার ভূমিচর মৎস্য বনরুই নামেই প্রসিদ্ধ। উহা পিপ্‌লে সোল নহে।

আয়ুর্ব্বেদসংগ্রহে দেখা যায় মৌরলা মাছ (মলা, মরা) মধুর হৃদ্য বাতনাশক শ্লেষ্মজনক ও গুরুপাক।

"মলঙ্গী মধুরা হৃদ্যা বাতঘ্নী শ্লেষ্মলা গুরুঃ।"

কিন্তু এই মাছ সর্ব্বরোগে পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

চাপিলা (খয়রা) মাছ গুরুপাক, বৃষ্য, মধুর, বাতপিত্তনাশক, শুক্রজনক, বলকর, স্নেহজনক ও শ্লেষ্মজনক।

"চম্পকুন্দো গুরুর্বৃষ্যো মধুরো বাতপিত্তজিৎ।
শুক্রলো বলকৃৎ প্রোক্তঃ স্নেহনঃ শ্লেষ্মকোপনঃ॥"

এই মাছের গুণ ইলিসের মত, উহা রোগীর পথ্য নহে।

ফলি বা ফলুই মাছ সর্ব্বরোগেই পথ্য। সূতিকা রোগিণীর পক্ষে উহা বিশেষ উপকারী বলিয়া উল্লেখযোগ্য। উদরাময়ীর পক্ষেও উহা পথ্যতম। উহার গুণ সম্বন্ধে আয়ুর্ব্বেদবিজ্ঞানে বলা হইয়াছে —

"ফলিঃ স্বাদুর্গুরুঃ স্নিগ্ধো বলকৃচ্ছুক্রবর্দ্ধনঃ।"

ফলি মাছ গুরুপাক স্বাদু স্নিগ্ধ বলকারী ও শুক্রবর্দ্ধক। অধুনা উহার গুরুপাকত্ব অনুভব করা যায় না। চিতল মাছও উহারই অনুরূপ —

"চিত্রফলো গুরু-গুরুঃ স্বাদুঃ স্নিগ্ধো বৃষ্যো বলপ্রদঃ"

বড় চিতল মাছ গুরুপাক বলিয়া অনুভূত হয়।

খলিশা মাছ সর্ব্বরোগের পথ্য, উহা বলকর বাত-পিত্ত-কফনাশক। রূক্ষ লঘুপাক শূলনাশক কিঞ্চিৎ পরিমাণ আমনাশক।

"খলিশঃ কথিতো বল্যো বাতপিত্তকফাপহঃ।
রূক্ষো লঘুঃ শূলহরঃ কিঞ্চিদামবিনাশনঃ॥"

চক্রপাণি দ্রব্যগুণে—

কবয়াঃ স্নিগ্ধমধুরা শ্চলদঙ্গো গড়ো যথা।

কৈ মাছ স্নিগ্ধ ও মধুর চলদঙ্গ (চণ্ড্‌মাছ) গড়ই মাছের মত, অর্থাৎ রূক্ষ।

ভাবপ্রকাশে—

কবিকা মধুরা স্নিগ্ধা কফঘ্না রুচিকারিণী।
কিঞ্চিৎ পিত্তকরী বাতনাশিনী বহ্নিদীপনী॥

কৈ-মাছ মধুর স্নিগ্ধ কফনাশক রুচিকর কিঞ্চিৎ পিত্ত-বর্দ্ধক, বাতনাশক ও অগ্নিবর্দ্ধক। কৈ-মাছ অতীব পথ্য, ইহার পিত্তকারিতা গুণ অনুভূত হয় না। খুব বড় কৈ-মাছ, কিঞ্চিৎ গুরুপাক।

মাগুর মাছ সকল রোগেই প্রায় পথ্যরূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে। রক্তহীন রোগীর পক্ষে উহা জীবন-স্বরূপ। ক্রমে দুই সপ্তাহকাল মাগুরের ঝোল খাইলে উন্নতির দিকে শরীরে একটা বেশ পরিবর্ত্তন বুঝা যায়। প্রাচীন কবিরাজদিগের একটা উপদেশ আছে যে, গাছ-পাঠা, জলপাঠা ও স্থলপাঠা—এই তিন শ্রেণীর পাঠা আছে। তাহাদের মধ্যে, গাছ পাঠা কলার মোচা, জল পাঠা মাছ, ও স্থল পাঠা ছাগপুত্র। ইহা হইতে বুঝা যায় যে, মাগুরমাছ ও মোচাতে ছাগমাংসের গুণ বিদ্যমান আছে। কিন্তু যরদুষ্ট রোগীর পক্ষে ছাগমাংস পথ্য নহে। তেমন রোগীর পক্ষেও মাগুর মাছের পথ্যতা পরিলক্ষিত হয়।

চক্রপাণির দ্রব্যগুণে দেখা যায়, মাগুর মাছ মধুর বৃষ্য বিপাকে মধুর ও গুরুপাক।

"মদ্‌গুরো মধুরো বৃষ্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ।"

ভাবমিশ্রের মতে মাগুর মাছ বাতনাশক বলকারক বৃষ্য কফকর ও লঘুপাক; সুতরাং চক্রপাণির এবং ভাব-মিশ্রের মতের মহান প্রভেদ দেখা যায়। বিচারদৃষ্টিতে মাগুরমাছ পথ্যতম। কিন্তু দীর্ঘকাল সমভাবে উহা খাইলে মাছের প্রতি একটা বিদ্বেষভাব ও অরুচি জন্মিয়া থাকে। আমি নিজেই এবিষয়ে ভুক্তভোগী। শল্করহিত মৎস্য মাত্রেরই এই গুণটি অনুভূত হইয়া থাকে।

সিং বা সিঙ্গল মাছ রক্তহীনতাবস্থায় ও সূতিকা-রোগিণীর বিশেষ পথ্য। ভাবপ্রকাশে ইহার গুণ বলা হইয়াছে যে, শৃঙ্গী মাছ বাত-প্রশমনকারী, স্নিগ্ধ, শ্লেষ্মার প্রকোপজনক তিক্ত ও কষায়-রস, লঘু ও রুচিকর।

"শৃঙ্গী তু বাত-শমনী স্নিগ্ধা শ্লেষ্মপ্রকোপণী।
রসে তিক্তা কষায়া চ লঘ্বী রুচ্যা স্মৃতা বুধৈঃ॥"

উহার শ্লেষ্মা-বর্দ্ধকতা-গুণ অধুনা পরিলক্ষিত হয় না। পূর্ব্ববঙ্গে উচ্চবর্ণ হিন্দুগণ উহা খায় না। রুগ্না-বস্থায় স্ত্রীলোককে খাইতে বলিলেও অনেকেই সহজে খাইতে চায় না।

শিলোন মৎস্যটি বৈদ্যক শাস্ত্রের বিবিধ গ্রন্থেই কথিত হইয়াছে। কোথায় উহার নাম "শিলিন্দ" কোথাও বা "শিলিন্ধ" নাম দেখিতে পাওয়া যায়। উহার গুণ সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে,—

"শিলিন্ধঃ শ্লেষ্মলো বল্যো বিপাকে মধুরো গুরুঃ।
বাতপিত্তহরো বৃষ্য আমবাতকরো মতঃ॥"

অর্থ, শিলিন্ধ মাছ শ্লেষ্মজনক বলকারক মধুর বিপাক-গুরু। উহা বাতপিত্ত বিনাশক ও বৃষ্য, কিন্তু আমবাত-কারক।

এই মৎস্যের বাতনাশকতাগুণ আমি নিজে বিশেষ-ভাবে উপলব্ধ করিয়াছি। প্রায় তিন বৎসর পূর্ব্বে উরুতে বাতের আক্রমণে কয় দিন শয্যাশায়ী থাকিয়া পরে কষ্টে গতায়াত করিতে পারিতাম। অনেক দিন পর্য্যন্ত নিরামিষ ও সামান্য সুপথ্য মাছ খাইয়া রোগের উপশম বুঝিতে পারিলাম না। তাহাতে মনে হইল যে, রুক্ষ বাত হইতে এই রোগ হইয়া থাকিবে। সুতরাং স্নেহ-বহুল বস্তু খাওয়া উচিত। প্রথমত আইড় মাছ কয় দিন খাওয়াতেই সামান্য উপশম বোধ হয়। পরে কয়দিন শিলোন মাছ খাওয়াতেই আমার রোগ-নিবৃত্তি হইয়াছে। বড় শিলোন নাম, "টাইন" ও অতি ছোটর নাম মেট্‌কা।

রাজবল্লভ-দ্রব্যগুণে মৎস্যের পুটপাক-রূপ এক প্রকার পাকবিশেষ কথিত হইয়াছে। যথা—

"পলাশবেষ্টিতো মৎস্যঃ কর্দ্দমেন চ লেপিতঃ।
দগ্ধোঽঙ্গারৈঃ সলবণো বেশবার ইতি স্মৃতঃ॥
বেশবারো গুরুঃ স্নিগ্ধো বলোপচয়কৃৎ পরম্।
সাদ্রকঃ কটুতৈলেন সম্যক্ সন্তলিতো ভবেৎ॥
সুস্বাদুঃ কফবাতঘ্নঃ শুক্রলো বলবর্দ্ধনঃ॥"

ইতি মৎস্যপুটপাকঃ।

পাতার দ্বারা মৎস্যকে বেষ্টন করিয়া তাহাকে কর্দ্দমের দ্বারা লেপন করিবে। তৎপর অঙ্গারের দ্বারা উহাকে দগ্ধ করিতে হইবে। লবণ আদা এবং কটু তৈল এই

সকলের দ্বারা উক্ত পুটপক্ক মৎস্যকে ভালরূপে ভর্জিত অর্থাৎ মর্দ্দন করিতে হইবে। বলা আবশ্যক যে, উহাতে হরিদ্রাও অবশ্য দেয়। উক্ত প্রণালীতে প্রস্তুত পদার্থের নাম "বেশবার"। বেশবার গুরু স্নিগ্ধ অতীব বলকর শরীরের বৃদ্ধিকর সুস্বাদু কফবাতনাশক এবং শুক্রবর্দ্ধক।

রাজবল্লভে তরকারীর সহিত পক্ব ব্যঞ্জনের নাম বলা হইয়াছে, "শাকমৎস্য"। উহা হৃদ্য বৃষ্য এবং পুষ্টিকর। মৎস্যের ঘণ্ট বাতনাশক বলকর এবং রুচিকর। বাঙ্গালী গ্রন্থকার এই কয়টি কথা বলিতেও ভুলেন নাই।

"ব্যঞ্জনং শাকমৎস্যাখ্যং হৃদ্যং বৃষ্যঞ্চ পুষ্টিদম্।
মৎস্যঘণ্টো বলকরো বাতঘ্নো রোচনঃ পরঃ॥"

উক্ত গ্রন্থে লোণামাছের এবং পচা মাছের গুণও বর্ণিত হইয়াছে।

"কুথিতা দোষলা মৎস্যাঃ শুষ্কা বিষ্টম্ভি-দুর্জ্জরাঃ।
লবণৈর্ভাবিতা মৎস্যাঃ কফপিত্তকরাঃ সরাঃ॥"

পচা মাছ দোষকর, শুষ্ক মৎস্য বিষ্টম্ভী ও দুষ্পাচ্য। লোণামাছ কফপিত্তবর্দ্ধক ও সারক।

অধিকন্তু বর্ণভেদে মৎস্যের গুণবিশেষ রাজবল্লভে দেখিতে পাওয়া যায়।

"কৃষ্ণমৎস্যা লঘুস্নিগ্ধা বাতঘ্না বহ্নিদীপনাঃ।
পাণ্ডুরা দোষলাঃ স্নিগ্ধা গুরবো ভিন্নবর্চ্চসঃ॥"

কৃষ্ণবর্ণ মৎস্য লঘু স্নিগ্ধ বাতনাশক ও অগ্নিদীপক। পাণ্ডুর (শ্বেতরক্তবর্ণ) মৎস্য দোষজনক স্নিগ্ধ গুরুপাক ও ভেদজনক।

পরন্তু বাঙ্গালাদেশে ব্যবহৃত অন্যান্য অনেক মাছের নাম ও গুণবিশেষ উক্ত রাজবল্লভে দেখা যায় এবং সুপরীক্ষিত বলিয়াও মনে হয়। দৃষ্টান্তস্বরূপ কয়টি উদাহরণ দেওয়া যাইতেছে। যথা:—

"পাঠীনঃ শ্লেষ্মলঃ স্নিগ্ধো মধুরঃ স কষায়বান্।
বল্যো বৃষ্যঃ কটুঃ পাকে রোচনো বাতপিত্তজিৎ॥"

এস্থলে পাঠীনকে কুষ্ঠকর বলা হয় নাই।

"বায়ুষো মধুরো বৃষ্যো বৃংহণো ধাতুবর্দ্ধনঃ।"

বাউস মাছ মধুর বৃষ্য বৃংহণ ও ধাতুবর্দ্ধক।

ইত্যাদি।

সাধারণতই ভাজা মাছের গুণ উৎকৃষ্ট। চক্রপাণি দগ্ধমৎস্যের উৎকৃষ্ট গুণবর্ণনার পরেই বলিয়াছেন যে,—

"তস্মাদ্ধীনগুণঃ কিঞ্চিদ্ ভৃষ্টমৎস্য উদাহৃতঃ।"

দগ্ধমৎস্য অপেক্ষা ভৃষ্ট মৎস্যের গুণ কিঞ্চিৎ হীন।

মাছের তৈল (চর্ব্বী) একটি মুখপ্রিয় পুষ্টিকর খাদ্য। কিন্তু অজীর্ণ রোগীর পক্ষে উহা অপথ্য। তবে শুচি আইড় গাগল প্রভৃতি মাছের টাটকা তৈল অজীর্ণ রোগীর পক্ষেও হজম হইতে দেখা যায়।

আইড় মাছ সম্বন্ধে চক্রপাণি বলিয়াছেন,—

"আড়িমৎস্যো গুরুঃ স্নিগ্ধঃ স্বাদুর্বৃষ্যো বলপ্রদঃ।"

আড়িমৎস্য গুরুপাক স্নিগ্ধ সুস্বাদ বৃষ্য ও বলকারক। কিন্তু অন্যত্র উহা বাতশ্লেষ্মপ্রকোপক বলিয়া উল্লিখিত হইয়াছে।

"আড়িমৎস্যো গুরুঃ স্নিগ্ধো বাতশ্লেষ্ম-প্রকোপণঃ।"

বিচারদৃষ্টিতে দেখা যায়, উহা রুক্ষবাতে সুপথ্য এবং আমবাতে বিশেষ অপথ্য। জ্বরাক্রান্ত ব্যক্তি সর্ব্বতোভাবে প্রকৃতিস্থ না হওয়া পর্য্যন্ত আইড় মাছ খাইলে গায়ে প্রবল বেদনাযুক্ত জ্বরের পুনরাবর্ত্তন অনেক সময় দেখা গিয়াছে।

আইড় মাছ সাধারণতঃ তিন শ্রেণীতে বিভক্ত। আইড় ভেটুস্ ও শুচি। ইহাদের মধ্যে শুচি আইড় তত অনিষ্টকর নহে এবং অন্যাপেক্ষা সুস্বাদও বটে।

গাগল মাছ ঈষৎ পিত্তবর্দ্ধক বাতনাশক কফবর্দ্ধক।

"গর্গরঃ পিত্তলঃ কিঞ্চিৎ বাতজিৎ কফকোপনঃ।"

উহার উল্লিখিত গুণ এখন পরীক্ষায় সপ্রমাণ হয় না। উহা পথ্য ও বল্য বলিয়াই প্রতীয়মান হয়।

মৎস্যের প্রকারভেদ এবং গুণাগুণ-ভেদ অতি বিস্তৃত। "সুবিচারিত দ্রব্যগুণসংগ্রহে" মৎস্যতত্ত্বের বিস্তৃত আলোচনা করিতে ইচ্ছা আছে। তবে মোটামুটি এই মাত্র বলিয়া রাখিতেছি যে, জ্বরাদি রোগনিবন্ধন ক্ষয়াক্রান্ত শরীরে মৎস্য অতীব পথ্য। এমন কি, অন্নপথ্যের দিনেই বাঙ্গালীকে মাছের ঝোল ভাত ও শেষে পাতলা দুধ পথ্যরূপে দেওয়া হইয়া থাকে। অনেক চিকিৎসক মৎস্য খাওয়ার পর দুগ্ধ খাওয়া ব্যবস্থেয় নহে এমত অভিমত প্রকাশ করিয়া থাকেন। কিন্তু বৃদ্ধ বৈদ্যের এমত উপদেশ আছে যে, সাত্ম্য নিবন্ধন বাঙ্গালীর পক্ষে একোপক্রমে দুগ্ধ ও মৎস্য অপথ্য নহে। স্বনামপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত হারাণ কবিরাজ মহাশয়ের মুখে এই উপদেশটি অনেকবার শুনিয়াছি।

উদরাময়ীর মধ্যে অনেকের পক্ষে মৎস্য সহ্য হয় না। ইহা বিশেষ পরীক্ষার দ্বারা প্রতিপন্ন হইয়াছে।

মৎস্যের গুণাগুণ সম্বন্ধে যে সময়ে গ্রন্থাদি রচিত হইয়াছিল, সে সময়ের তুলনায় বর্ত্তমান সময়ের অবস্থা অনেক পরিবর্ত্তিত হইয়াছে। জল দূষিত করা অতীব পাপজনক বলিয়া হিন্দুশাস্ত্রে অবধারিত হইয়াছিল। জলে মলমূত্র প্রভৃতি অমেধ্য পদার্থ প্রক্ষেপ নিষিদ্ধ ছিল। সুতরাং সর্ব্বভুক্ মৎস্যের পক্ষেও সব সময়ে রোগজনক পদার্থ খাওয়ার সুযোগ ছিল না। সেই জন্য কেবল বর্ষা ঋতুতেই "নাদেয়" মৎস্য ভক্ষণ অহিতকর বলিয়া বিবেচিত হইয়াছিল। কিন্তু বর্ত্তমান সময়ে ধর্ম্মশাস্ত্রের

মর্য্যাদা শিথিল হওয়াতে, শব প্রভৃতি রোগজনক পদার্থ নদীতে প্রক্ষিপ্ত হইয়া থাকে। তাহার ফলে বসন্ত কলেরা প্রভৃতি রোগের শবভক্ষক মৎস্য-ভক্ষণে অনেক স্থলেই সংক্রামক ব্যাধি ছড়াইয়া পড়ে। অতএব মৎস্য স্বাস্থ্য হইলেও "নাদেয়" মৎস্য এখন নিরাপদ নহে। বিশেষ সতর্কতার সহিতই মৎস্য ভক্ষণ কর্ত্তব্য। নিরামিষভোজী-দিগের মধ্যে উল্লিখিত রোগের আক্রমণ কম দেখা যায়। আমাদের দেশে কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণ মাসে মৎস্য হইতেই প্রায় কলেরার শুভাগমন হইয়া থাকে।

অন্নপ্রস্তুতপ্রণালী

মৎস্যপ্রসঙ্গের পর এখন বাঙ্গালীর প্রধান খাদ্য অন্নের বিষয় আলোচনা করিব। অন্নের প্রস্তুতপ্রণালী সম্বন্ধে চরক প্রভৃতি প্রাচীন বৈদ্যক গ্রন্থের ঐকমত্যই প্রায় দেখা যায়। সুশ্রুত সংহিতায় (সূত্রস্থান ৪৬ অধ্যায়) কথিত হইয়াছে যে,—

"ধৌতস্তু বিমলঃ শুদ্ধো মনোজ্ঞঃ সুরভিঃ সমঃ।
স্বিন্নঃ সুপ্রস্রুত স্তূষ্ণো বিশদ স্তোদনো লঘুঃ॥ ৩৬
অধৌতোঽপ্রস্রুতোঽস্বিন্নঃ শীতশ্চাপ্যোদনো গুরুঃ।
লঘুঃ সুগন্ধিঃ কফহা বিজ্ঞেয়ো ভৃষ্টতণ্ডুলঃ॥" ৩৭

অর্থ—শুক্লতণ্ডুল ধৌত করিয়া সিদ্ধ করত তাহার মাড় ছাঁটিয়া ফেলিলে সমান অর্থাৎ সমপক্ক বা আস্ত সুগন্ধ মনোরম যে অন্ন প্রস্তুত হয়, উষ্ণাবস্থায় সেই অন্ন লঘুপাক। অধৌত তণ্ডুলকৃত অপ্রস্রুত অর্থাৎ যাহার মাড় গালিয়া ফেলা হয় নাই তাদৃশ অন্ন, যাহা সম্যক্ সিদ্ধ হয় নাই ও শীতল অন্ন গুরু। ভৃষ্টতণ্ডুল অর্থাৎ ভাজা চাউল হইতে যে অন্ন প্রস্তুত হয়, তাহা সুগন্ধি লঘু ও কফনাশক।

চরকের সূত্রস্থানে (২৭অ) পঠিত বচন—

"সুধৌতস্তণ্ডুলঃ স্বিন্নঃ সন্তপ্ত শ্চৌদনো লঘুঃ।
ভৃষ্টতণ্ডুলমিচ্ছন্তি গর-শ্লেষ্মাময়েষ্বপি॥
অধৌতোঽপ্রস্রুতোঽস্বিন্নঃ শীতশ্চাপ্যোদনো গুরুঃ।২৫৪

সুধৌত তণ্ডুলকৃত সম্যক্ সিদ্ধ সন্তপ্ত অন্ন লঘু। ভৃষ্টতণ্ডুলকৃত অন্ন বিষরোগাক্রান্ত রোগীর পক্ষে এবং শ্লৈষ্মিক রোগীর পক্ষে হিতকর। এস্থলে টীকাকার অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন যে, "সন্তপ্ত" শব্দের অর্থ—সহজ উষ্মার দ্বারা অর্থাৎ পাকজনিত তাপের দ্বারা গরম, একবার শীতল হইয়া গেলে পুনরায় তাপের দ্বারা উষ্ণী-কৃত নহে। কারণ বচনান্তরে পুনর্ব্বার উষ্ণীকৃত অন্ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। "বিবর্জ্জয়েৎ স্থিরং শীতমন্নমুষ্ণীকৃতং পুনঃ।" পক্ষান্তরে অপ্রক্ষালিত তণ্ডুলকৃত অন্ন, যাহার মণ্ড পরিত্যাগ করা হয় নাই তাদৃশ অন্ন, যাহা উপযুক্তরূপ সিদ্ধ হয় নাই সেইরূপ অন্ন ও শীতল অন্ন গুরুপাক। চরক এইমাত্র বলিয়াই থামিয়াছেন। কিন্তু ভাবপ্রকাশে অন্নের প্রস্তুতপ্রণালীটি লোকব্যবহারের সহিত বেশ মিলাইয়া লিখিত হইয়াছে এবং গুণাগুণও বিশদভাবে বর্ণিত হইয়াছে। যথা,—

সুধৌতাংস্তণ্ডুলান্ স্ফীতাং স্তোয়ে পঞ্চগুণে পচেৎ।
তদ্ভক্তং প্রস্রুতং চোষ্ণং বিশদং গুণবন্মতম্॥
ভক্তং বহ্নিকরং পথ্যং তর্পণং রোচনং লঘু।
অধৌতমস্রুতং শীতং গুর্ব্বরুচ্যং কফপ্রদম্॥

তণ্ডুলগুলি বেশ করিয়া ধুইয়া কিছু সময় হাওয়াতে রাখিয়া দিলে যখন ফুলিয়া উঠে, তখন ঐগুলিকে পাঁচগুণ জলে পাক করিতে হয়। উত্তমরূপে সিদ্ধ হইলে ভাল রূপে মাড় ছাঁটিয়া ফেলিতে হয়। এই প্রণালীতে প্রস্তুত বিশদ অর্থাৎ শুভ্র উষ্ণ অন্ন প্রকৃষ্টগুণযুক্ত বলিয়া বিবেচিত হইয়া থাকে। ঈদৃশ অন্ন অগ্নিবর্দ্ধক, পথ্য রুচিকর শরীর-পোষক ও লঘুপাক। পক্ষান্তরে অধৌত তণ্ডুলকৃত অন্ন, মণ্ডসহিত অন্ন এবং শীতল অন্ন গুরুপাক অরুচিজনক এবং কফবর্দ্ধক।

চক্রপাণিকৃত দ্রব্যগুণসংগ্রহে সদ্যোধৌত অন্নের গুণ বিশেষ দেখা যায়। যথা—

"সদ্যোঽন্নং বারিণা ধৌতং শীঘ্রপাকং বলপ্রদম্।
শীতলং মধুরং রুক্ষং শ্রমঘ্নং তর্পণং পরম্॥"

অন্ন পাক করিয়া তৎক্ষণাৎ ঠাণ্ডা জলে প্রক্ষেপ করিয়া তাহার মাড় বাড়াইয়া ফেলিতে হয়। ঈদৃশ অন্ন শীতল হইলে উহা মধুররস রুক্ষ শ্রমনাশক অত্যন্ত তর্পণ শীঘ্র পরিপাকশীল ও বলপ্রদ হয়। পেট গরম হইলে দধি ঘোল বা লেবুর রসের সহিত সদ্যোঽন্ন অতীব পথ্য। ইহা অনেকেরই বিশেষরূপ পরীক্ষিত।

গ্রন্থে যাহা লিপিবদ্ধ হইয়াছে, তদ্ব্যতীত অন্নসম্বন্ধে আরও অনেক বক্তব্য আছে। ভেতো বাঙ্গালী ভাত রাঁধিতে নানারূপ কৌশলের অবতারণা করিয়াছে। মাড়ের দোষ বাঙ্গালীরা বেশ বুঝিতে পারিয়াছিল, সুতরাং উহাকে নিঃশেষ করিবার উপায়ও তাহারা উদ্ভাবিত করিয়া গিয়াছে। দীর্ঘকাল জ্বরাদি রোগের আক্রমণ-নিবন্ধন তজ্জনিত ক্ষীণকায় ব্যক্তির অন্নপথ্যের ব্যবস্থা হইলে তাহার অন্ন অনেক সময়ে দোলাযন্ত্রে পাক করা হয়। একখানা নেকড়াতে সুধৌত তণ্ডুলগুলি বেশ টিপ করিয়া বাঁধিয়া ঐ নেকড়ার গ্রন্থি একটি শলাতে লাগাইয়া হাঁড়ার উপর শলাটি রাখিয়া চাউলগুলি উপযুক্ত জলে ডুবাইয়া জাল দিতে হয়।

—

এসো।

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি সহ।

ভৈরব—ধামার।

আজি হে তুমি এসো
হৃদয়ে মনমোহন।
নাথ তোমা ডাকি
অশ্রুজলে ভাসি’।
দেবেশ কর দয়া—
চরণপাতে মম
দুখ সব নাশি’॥

গান—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

১´ ০ ২ ০ ৩ ০ ॥
II মা -ণা -দা। -া -া। দা পা। পা -মা -পা। মা -গা। -মা গা I
আ • • • • জি হে তু • • মি • • •

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
I মা গা ঋা। মা -গা। পা -া। মা গা -ঋা। ঋা সা। -া -া I
এ • • সো • • • হৃ • • দ য়ে • •

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
I সা -ন্া ঋা। সা -া। ন্া সা। -া -া -া। ন্া সা। -ন্া -সা I
ম ন মো হ ০ ন • • • • • • • •

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
I সা -া -া। মা গা। মা -পা। মা -পা -া। মা গা। মা -া I
না • • থ • তো • মা • • ডা • কি •

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
I মা ণা -দা। দা -া। মা -পা। পা -মা -গা। মা গা। মা পা II
অ • • শ্রু • জ • লে • • ভা • সি •

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
II মা -পা -া। ণা -দা। -া -া। ণা র্সা র্সা। র্সা -না। র্সা -া I
দে • • বে • • • শ ক র দ • য়া •

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
I র্সা র্সা -া। র্গা -র্ঋা। -া -া। র্সা -না -া। র্ঋা -র্সা। -ণা দা I
চ র • ণ • • • পা • • • • • •

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
I দা র্সা না। র্সা -না। র্ঋা র্সা। র্সা ণা দা। দা র্সা। না র্সা I
তে • • • • ম ম দু খ • স • • ব

১´ ০ ২ ০ ৩ ০
I র্সা -ণা -দা। -ণা দা। মা -পা। -মা -গা। -মা -গা -া। মা পা IIII
না • • • • শি • • • • • • • •

প্রার্থনা। *

(শ্রীদেবেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় এম-এ)

বর্ত্তমান যুগে লোকের ধর্ম্মবিশ্বাস বড় শিথিল হইয়া গিয়াছে। তর্কবিতর্কের ধূম এবং জড়বিজ্ঞানের ধূলিতে মানবের অন্তশ্চক্ষু আচ্ছন্ন হইয়া গিয়াছে। মানুষ মনে করে যে জগতের ঘটনাপ্রবাহ কার্য্যকারণশৃঙ্খলে এরূপ দৃঢ়রূপে গ্রথিত যে এই সুদীর্ঘ শৃঙ্খলের পশ্চাৎভাগে আদি কারণরূপে ঈশ্বর থাকিলেও থাকিতে পারেন, কিন্তু থাকিলেও তিনি এখন নিষ্ক্রিয়, সুতরাং তাঁহার সহিত সাক্ষাৎভাবে আমাদের কোন সম্বন্ধ নাই। আজ যদি ভূতত্ত্বের কোন মত (theory) ভুল বলিয়া প্রমাণ হয় তাহাতে যেমন আমাদের জীবনের বিশেষ কিছু ক্ষতিবৃদ্ধি হইবে না, সেইরূপ যদি পণ্ডিতেরা প্রমাণ করিতে পারেন যে ঈশ্বর নাই তাহা হইলেও আমাদের জীবন এখন যে ভাবে চলিতেছে সেইভাবেই চলিবে, তাহার বিশেষ কোন ব্যতিক্রম হইবে না। আকাশের দূরতম নক্ষত্রের সঙ্গে আমাদের জীবনের সম্বন্ধ যেমন ক্ষীণ, ঈশ্বরের সহিত আমাদের জীবনের সম্বন্ধ সেইরূপ ক্ষীণ হইয়া গিয়াছে বলিলে কিছুই অত্যুক্তি হইবে না। তাঁহার বাণী আমরা শুনিতে পাই না, তাঁহার মুখের জ্যোতি আমরা দেখিতে পাই না, তাঁহার জীবন্ত স্পর্শ আমরা অনুভব করি না।

আমরা প্রার্থনা ও নিবেদনকে কি ভাবে দেখি তাহা চিন্তা করিলেই বুঝা যায় যে ঈশ্বর আমাদের কাছে কতখানি সত্য। যদি পথে ঘাটে বাসগৃহে এবং কার্য্যালয়ে আমরা তাঁহাকে জাগ্রত দেবতা বলিয়া মনে করিতাম তবে তাঁহার নিকট আমাদের সুখদুঃখের কথা না বলিয়া এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা না করিয়া আমরা থাকিতে পারিতাম না। তাঁহার নিকট আত্মনিবেদন কি কুসংস্কার এবং তাঁহার নিকট প্রার্থনা কি দুর্ব্বলতা? মানুষের মধ্যে পরস্পরের সহিত চিন্তা ও ভাবের আদান প্রদান না থাকিলে আমাদের জ্ঞানবুদ্ধি ম্লান হইয়া যায় এবং হৃদয়ের স্নেহপ্রীতি শুষ্ক হইয়া যায় একথা যেমন সত্য,—ভগবানের সঙ্গে যদি আমরা কোনরূপ সংশ্রব না রাখি তবে সুধু তিনি জগতের সৃষ্টিকর্ত্তা বা আদি কারণ, এই জ্ঞানের উপরে যে ধর্ম্ম দাঁড়াইতে পারে না, একথাও তেমনি সত্য। হয় ত কেহ কেহ এ কথার সাক্ষ্য দিতে পারিবেন। যাঁহারা এক সময়ে ভগবানের চরণে উচ্ছ্বসিত ব্যাকুলতার সহিত প্রার্থনা ও আত্মনিবেদন করিতেন, দুঃখদুর্দ্দিনে তিনি হৃদয়ের ভার মোচন করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করিতেন, অন্তরের অন্তরে তাঁহার পুণ্যস্পর্শের আকাঙ্ক্ষা করিতেন, এবং পাপপ্রলোভনের সহিত সংগ্রামে তাঁহার নিকট হইতে আশ্বাস ও ইঙ্গিত পাইতেন,—কিন্তু ক্রমে যাঁহারা প্রার্থনা ও নিবেদন সম্বন্ধে সন্দেহ বশতঃ এ সকল পরিত্যাগ করিয়াছেন, তাঁহারা কি অনুভব করেন না যে এখন জীবন কত শুষ্ক ও কঠোর হইয়া গিয়াছে, ভাবনা-চিন্তার ভার এখন কত দুর্ব্বহ হইয়াছে, এখন স্নেহ-প্রেমের আর তেমন মধুরতা নাই? একদিন যে অনুতাপ হৃদয়ের মধ্যে স্বর্গীয় অগ্নি জ্বালিয়া দিত এখন কি তাহা কেবল আত্মগ্লানি ও দুর্ব্বলতাতে পরিণত হয় নাই? দুঃখ-দুর্দ্দিনে কি তাঁহারা পূর্ব্বের ন্যায় দৃঢ়তার সহিত ঈশ্বরের মঙ্গলস্বরূপের উপরে নির্ভর করিতে পারেন? নির্ম্মল জীবনের জন্য একদিন যে ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা ছিল সেই ব্যাকুল আকাঙ্ক্ষা কি এখন আর আছে? কিন্তু নাস্তিকের কুতর্ক চিরদিনের মত মানবাত্মাকে অভিভূত করিয়া রাখিতে অসমর্থ। আমাদের বর্ত্তমান দুর্দ্দশা যেমনই হউক না কেন, এমন দিন আসিবেই আসিবে যেদিন শোকের উচ্ছ্বাসে বা আনন্দের আবেগে আমরা ঈশ্বরের নাম না করিয়া থাকিতে পারিব না।

আমাদের প্রার্থনা করা কর্ত্তব্য একথা বলিতেছি না। ঈশ্বর আমাদিগকে প্রার্থনা করিতে আদেশ করিয়াছেন, এবং এই আদেশ মান্য করিলে আমাদিগকে তাঁহার অনুগত সন্তান বলিয়া তিনি পুরস্কার দিবেন, সেকথাও বলিতেছি না। হৃদয়ের কোন ভাবই ইচ্ছার অধীন নহে এবং ঈশ্বরের প্রতি প্রেমভক্তির উপরেও ইচ্ছার অধিকার নাই। ইচ্ছা করিয়া আমরা একটা কাজ করিতে পারি বা না-ও করিতে পারি, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া কাহাকেও ভালবাসিতে পারি না। প্রার্থনার মূলে আকাঙ্ক্ষা আকুলতা, প্রেম ও ভক্তি। যেখানে এগুলির অভাব সেখানে চেষ্টা করিয়া আমরা প্রার্থনার অভিনয় করিতে পারি মাত্র। এই মিথ্যা অভিনয় করিতে করিতে অভ্যাসক্রমে কোন দিন সত্য আকাঙ্ক্ষা ও আকুলতা আসিবে বলিয়া যাঁহারা মনে করেন তাঁহাদের কথাও বলিতেছি না। আমি সাক্ষাৎভাবে পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার যোগের কথাই বলিতেছি, যে যোগে আমরা তাঁহার চরণে প্রীতি ও ভক্তি অর্পণ করি এবং তিনি আশীর্ব্বাদরূপে আমাদিগের অন্তরে তাঁহার অনুপ্রাণনা দান করেন।

প্রতিদিন মানুষে মানুষে কথাবার্ত্তা হয় এবং ভাব ও চিন্তার আদানপ্রদান হয় একথা যেমন সত্য, পরমাত্মার সহিত মানবাত্মার চিন্তার বিনিময় যে সত্য, এ কথাও তেমনি সত্য। যাঁহারা এই সত্যের সাক্ষ্য দান করেন তাঁহাদের কথায় অবিশ্বাস করিবার কোন কারণ নাই। যদি বর্ত্তমান যুগ জড়বিজ্ঞানের গর্ব্বে এত স্ফীত না হইত, তবে তাঁহাদের কথায় কখনই অবিশ্বাস করিতে পারিত

* প্রবন্ধোক্ত মতামতের জন্য লেখক দায়ী। ত· স·

না। বাস্তবিক কুসংস্কার দুই প্রকার। যাহা মিথ্যা তাহাকে সত্য মনে করাও যেমন কুসংস্কার, যাহা সত্য তাহাকে স্বপ্ন ও কল্পনা বলিয়া অগ্রাহ্য করাও তেমনি কুসংস্কার। যখন সকল দেশের এবং সকল যুগের ভক্তমণ্ডলী একবাক্যে এই সাক্ষ্য দিতেছেন যে প্রার্থনাযোগে ঈশ্বরের বাণী শ্রবণ করা যায়, তখন নাস্তিক কি একবার ভাবিয়া দেখিবেন না যে, প্রার্থনা সম্বন্ধে তাঁহার যে সংশয় তাহার মূলে বাস্তবিক কি সূক্ষ্মদৃষ্টি, না তাহার মূলে অন্ধতা?

প্রকৃতির নিয়ম অলঙ্ঘ্য, প্রার্থনা দ্বারা তাহার কোন ব্যতিক্রম হইতে পারে না, অতএব প্রার্থনা নিষ্ফল—এ তর্কের কোন মূল্য নাই। মানুষের শরীরও আছে মনও আছে। মানুষ জড় ও আত্মার পরমাশ্চর্য্য মিলনক্ষেত্র। শরীরের সহিত মনের সম্বন্ধ অতি নিকট এবং গভীর রহস্যময়, তথাপি শরীর ও মন এক বস্তু নয়, কিন্তু দুটী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র বস্তু। দেখা শুনা স্পর্শ করা দেহের কর্ম্ম; জ্ঞান বুদ্ধি স্নেহ প্রেম কামনা ও আকাঙ্ক্ষা মনের ধর্ম্ম। যে সকল সামগ্রীর দৈর্ঘ্যবিস্তার আছে, যাহাদের ভার ও গুরুত্ব আছে, আমরা শারীরিক ইন্দ্রিয়ের সাহায্যেই এরূপ জড়বস্তুর জ্ঞানলাভ করি। কিন্তু ধর্ম্মজগতের কথা কেবল বিশ্বয় বিবেক ও ভক্তির দ্বারাই গ্রহণ করিতে হয়। যদি আমাদের হস্তপদ ও চক্ষুকর্ণ প্রভৃতি ইন্দ্রিয় না থাকিত তবে আমাদের সহিত জড়জগতের সম্বন্ধ থাকিত না। এই সুবিমল উন্মুক্ত আকাশ, এই বিশাল দৃঢ়পৃষ্ঠ পৃথিবী আমাদের নিকট সম্পূর্ণ অপরিজ্ঞাত থাকিত; কিন্তু যদি আমাদের কেবল দেহ ও ইন্দ্রিয় মাত্র সম্বল থাকিত তবে জগতের শোভা সৌন্দর্য্য বুঝিতাম না, এবং কর্ত্তব্যের দায়িত্ব, ভালবাসার সুখ, ভক্তসহবাসের আনন্দ এবং ঈশ্বরের সত্যরূপ আমাদের নিকট প্রচ্ছন্ন থাকিত। চক্ষুর পশ্চাতে যদি আর কিছু না থাকিত তবে কি মানুষ পাপের জন্য অনুতাপের অশ্রুবর্ষণ করিত? না রসনার পশ্চাতে যদি আর কিছু না থাকিত তবে কি মানুষ প্রিয়জনকে হারাইয়া বিলাপ ও ক্রন্দন করিত?

মানুষের যেমন দুটী দিক আছে ঈশ্বরেরও সেইরূপ দুটী দিক আছে। অবশ্য তাঁহার উপরে এবং তাঁহার বাহিরে কিছুই নাই, কিছুই থাকিতে পারে না। জড়ের যত শক্তি আছে, সকলই তাঁহারই শক্তি; জগতের যত ঘটনা, সকলের পশ্চাতে তাঁহারই ইচ্ছা; প্রকৃতির যত নিয়ম, সকলই তাঁহার প্রতিষ্ঠিত কার্য্যপ্রণালী। তিনি ধীর স্থির শান্ত এবং নির্ব্বিকার। যে নিয়মে তিনি এই বিশ্বরাজ্য শাসন ও পালন করিতেছেন সে নিয়মে কোনরূপ বিশৃঙ্খলা নাই, স্বেচ্ছাচারিতা নাই, পরিবর্ত্তন নাই। তাঁহার দৃঢ়হস্তে প্রতিষ্ঠিত নিয়ম একান্ত অলঙ্ঘ্য। কাহারও স্তবস্তুতি অনুনয়বিনয় প্রার্থনাতে সে নিয়মের এক চুল ব্যতিক্রম হয় না। অনাদি অতীত হইতে যুগযুগান্তর ধরিয়া মানবের জন্মমৃত্যু ও বংশপরম্পরার মধ্য দিয়া সমগ্র ব্রহ্মাণ্ডে সমভাবে সে নিয়ম প্রবাহিত। যদি তাঁহার নিয়ম আজ একরূপ কাল অন্যরূপ হইত তবে কি মানুষ তাঁহার নিয়ম অবধারণে সমর্থ হইত, না প্রকৃতি সম্বন্ধে মানবের অভিজ্ঞতার কোন মূল্য থাকিত? যে অন্নজল আমাদের জীবন রক্ষা করে যদি সহসা এক এক দিন উহারা বিষের গুণ প্রাপ্ত হইত; যে বায়ুমণ্ডল শব্দ বহন করে যদি সহসা এক এক দিন উহা শব্দ বহন করিতে বিরত হইত; যে ধরিত্রী আপন বক্ষে সমুদয় জীব ও জড়কে ধারণ করিয়া আছে সহসা এক এক দিন যদি সে সেই সকল বস্তুকে ঊর্দ্ধদিকে উৎক্ষেপ করিত; যদি জল নিম্নগামী না হইয়া মাঝে মাঝে সহসা ঊর্দ্ধগামী হইত ও সমুদ্রের জলরাশি আসিয়া সমুদয় দেশ ও মহাদেশকে প্লাবিত করিত; যদি পৃথিবীর আবর্ত্তন সহসা বন্ধ হইত এবং অস্তমিত সূর্য্য কিছু দিন আর না উঠিত—তবে মানবের জীবনযাত্রা বড় কঠিন হইত। পুরাণবর্ণিত সমুদয় অলৌকিক ঘটনাবলীই অলীক ও কবির কল্পনা মাত্র—তাহা হিন্দু পুরাণেই থাকুক আর খৃষ্টীয় পুরাণেই থাকুক। আমরা মানবসমাজে দেখিতে পাই যে চরিত্রবান লোকেরা খুব দৃঢ়চিত্ত। বাস্তবিক চরিত্রের অর্থই দৃঢ়তা। চরিত্রবান ব্যক্তিরা নিজে যে নিয়ম করেন নিজে তাহা কদাচ ভঙ্গ করেন না। আমরা কি বলিব ভগবান তাঁহার স্বপ্রতিষ্ঠিত নিয়ম নিজে লঙ্ঘন করিয়া তাঁহার শান্ত ও নির্ব্বিকার স্বরূপের পরিচয় দান করেন? আমরা কি প্রাকৃতিক নিয়মের দৃঢ়তায় তাঁহার মহিমা গৌরব না দেখিয়া সেই নিয়মের উল্লঙ্ঘনে তাঁহার মহিমা গৌরব দর্শন করিব?

এখন একটী বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। এই জড় দেহ এবং ইহার অন্তর্ব্বাসী চৈতন্যময় আত্মার মধ্যে একটী বিষয়ে বিশেষ ভিন্নতা আছে। আমাদের দেহটা প্রকৃতির অধীন এবং সমগ্র জড়প্রকৃতি যেমন অলঙ্ঘ্য নিয়মের শৃঙ্খলে বাঁধা, আমাদের দেহটাও সেই শৃঙ্খলে বাঁধা। কিন্তু আমাদের আত্মা প্রকৃতির অতীত ও স্বাধীন। যখন কোন স্থানে প্লেগ ওলাউঠা বা বসন্তের প্রকোপ হয় তখন দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দ্বারা আমরা ঐ সকল রোগের আক্রমণ হইতে রক্ষা পাই না, কিন্তু দৃঢ়প্রতিজ্ঞার দ্বারা আমরা পাপপ্রলোভনকে অতিক্রম করিতে সমর্থ হই। দেহটা বদ্ধ কিন্তু আত্মা স্বাধীন ও বিমুক্ত—আত্মার কোন বন্ধনরজ্জু নাই। আত্মা যে বিমুক্ত ও স্বাধীন ইহা আমাদের সাক্ষাৎ অনুভূতির বিষয়। বিবে-

কের কথা তুচ্ছ করিয়া যে লজ্জা ও আত্মগ্লানি ভোগ করিতে হয় ইহা আমরা সকলেই জানি। এই বিবেক অনুজ্ঞারূপী। কিন্তু যেখানে স্বাধীনতা নাই সেখানে ত অনুজ্ঞা বা আদেশ চলে না। যদি মানবাত্মার স্বাধীনতা না থাকিত তবে মানব-অন্তরে বিবেকের স্থান থাকিত না। আমরা যে যন্ত্রমাত্র নই, আমরা যে কলের পুতুল (automaton) নই, আমাদের এই সাক্ষাৎ অনুভূতির বিরুদ্ধে কোন তর্কই দাঁড়াইতে পারে না।

সমগ্রভাবে দেখিলে (অর্থাৎ মোটের উপরে) জড়-জগতের নিয়ম মঙ্গলের দিকেই চলিয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই, কিন্তু সে নিয়ম যে প্রত্যেক ব্যক্তির সুবিধা অসুবিধা সুখদুঃখ জীবনমরণের প্রতি লক্ষ্য রাখে তাহা বলা যায় না। সম্পূর্ণ নিঃস্বার্থ পরোপকারের জন্যও স্বাস্থ্যের নিয়ম ভঙ্গ করিলে শাস্তি অপরিহার্য্য। মহামারী অগ্নিদাহ ঝড়-তুফান বজ্রাঘাত—জ্ঞানী অজ্ঞান, পাপী সাধু, ভক্ত অভক্তের বিচার করে না, এবং কাহার অভাবে তাহার পরিবারের বা জনসমাজের কি ক্ষতি হইবে তাহাও গ্রাহ্য করে না। যদি বিশেষ বিশেষ স্থলে মানবের মুখের দিকে দৃষ্টি করিয়া ঈশ্বর জড়জগতে নিয়ম ভঙ্গ করিতেন তবে একজন দরিদ্র প্রাচীন স্ত্রীলোকের একমাত্র উপার্জ্জনক্ষম পুত্র—বুড়ীর অন্ধের যষ্টি ও নয়নের মণি—সে কখনও নৌকা ডুবিয়া মারা যাইত না। ভগবান এরূপ ঘটনাকেও মঙ্গলে পরিণত করিবেন বলিয়া বিশ্বাস করি, কিন্তু তিনি যে প্রাকৃতিক নিয়ম ভঙ্গ করেন না এরূপ দৃষ্টান্ত তাহার সুস্পষ্ট প্রমাণ।

কিন্তু ইহাও কি কখন সম্ভব যে যিনি মানবাত্মাকে স্বাধীনতা দিয়াছেন, সেই পরমাত্মার স্বাধীনতা নাই? কখনই নহে। এই জড়রাজ্য যতই বিশাল হউক না কেন, ইহার সৃষ্টিতে এবং ইহার পরিচালনে অনন্তস্বরূপের সমগ্র শক্তি নিঃশেষ হয় নাই। জড়রাজ্যে তিনি আপনি স্বহস্তে আপনাকে বাঁধিয়াছেন, কিন্তু তিনি প্রকৃতির অতীত, প্রকৃতিতেই তাঁহার সীমা নয়, প্রকৃতির বাহিরে আর একটা জগৎ আছে যেখানে তাঁহার উজ্জ্বলতম ও শ্রেষ্ঠতম প্রকাশ। সেই জগৎ অধ্যাত্ম জগৎ। সকল বিধির বিধাতা যিনি, সকল কারণের আদি কারণ যিনি, এই অধ্যাত্ম জগতে তিনি সম্পূর্ণ স্বাধীন। এখানে মানবাত্মার সহিত তাঁহার যোগ সাক্ষাৎ। এই অধ্যাত্মরাজ্যে কোন সাধারণ বিধি নাই, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের স্বভাব চরিত্র ও অবস্থাভেদে তাহার জন্য ভগবান বিশেষ বিশেষ উপায় অবলম্বন করেন। এই রাজ্যে প্রত্যেক মানব-সন্তানকে তিনি এরূপ স্নেহদৃষ্টিতে দেখেন যেন জগতে সেই তাঁহার একমাত্র সন্তান, এবং এই রাজ্যে একটীমাত্র বিধি আছে সে বিধির নাম অনন্ত করুণা—প্রত্যেক মানব-সন্তানের জন্য তাঁহার অনন্ত করুণা। আমাদের প্রত্যেকের ধর্ম্মজীবনে,—আমাদের পাপপ্রলোভনের সহিত সংগ্রামে, আমাদের পতন ও পরাজয়ের লজ্জায়, আমাদের অতীত দুষ্কর্ম্ম স্মরণ করিয়া মনস্তাপে, এবং সকল অপরাধ সত্ত্বেও মৃত্যুঞ্জয়ের অমৃতস্পর্শ লাভ করিবার আকুল আকাঙ্ক্ষায় আমরা বুঝিতে পারি যে আমাদের মুখের উপরে তাঁহার স্নেহদৃষ্টি রহিয়াছে। যে সকল পুণ্যব্রত গ্রহণ করিয়া ভঙ্গ করিয়াছি সেই সকল ব্রত আবার যখন নূতন সঙ্কল্প পূর্ব্বক গ্রহণ করি, নিরাশার অন্ধকারে যখন আবার আশার নূতন আলোক দেখিতে পাই, সংশয় ও সন্দেহের মেঘ কাটিয়া গিয়া আবার যখন শিশুর ন্যায় সরল বিশ্বাসে উপনীত হই—তখন আমরা বুঝিতে পারি যে অযোগ্য হইলেও তাঁহার আশীর্ব্বাদ আমাদের মস্তকে বর্ষিত হইতেছে। তখন আমরা তাঁহার অভয়বাণী শুনি এবং সুস্পষ্ট অনুভব করি যে তিনি নিজ হস্তে আমাদের দুর্ব্বল হস্ত ধারণ করিয়াছেন। তিনি আমাদের সুবিধার জন্য বহির্জ্জগতের বিধিব্যবস্থা পরিবর্ত্তন করেন না, কিন্তু আমাদিগকে অবনত মস্তকে তাঁহার বিধান গ্রহণ করিতে হয়; তিনি অন্তর্জ্জগতে অর্থাৎ আমাদের আত্মার মধ্যে আশা ও আকাঙ্ক্ষা, উৎসাহ ও উদ্দীপনা প্রেরণ করেন বিধান করেন।

এ কথা সত্য বটে যে প্রাচীনকালে ভক্তমণ্ডলীর মধ্যে অনেকে বিশ্বাস করিতেন যে প্রার্থনাতে সব হয়, অনাবৃষ্টির সময়ে বৃষ্টি হয়, উন্মত্ত ঝড় শান্ত হয়, মহামারী দেশ ছাড়িয়া চলিয়া যায়। তাঁহারা মনে করিতেন যে ঈশ্বর ইচ্ছা করিলে সব করিতে পারেন। প্রকৃতির নিয়ম যে অলঙ্ঘ্য, জড়রাজ্য সম্বন্ধে ঈশ্বর যে নিজ হস্তে আপনাকে বাঁধিয়াছেন—এই সত্যটা সেকালে তেমন পরিস্ফুট হয় নাই। কিন্তু এখন ঠিক তাহার বিপরীত ভাব। এখন অনেক লোকের এইরূপ বিশ্বাস দাঁড়াইতেছে যে কি জড়-জগৎ কি অন্তর্জ্জগৎ সমস্তই নিয়তির নিগড়ে বাঁধা, সুতরাং প্রার্থনা করিলে কিছুই পরিবর্ত্তিত হয় না। অন্তর্জ্জগতে যে কতকগুলি নিয়ম আছে এ কথাও সত্য কিন্তু জড়জগতের ন্যায় অন্তর্জ্জগৎ যে অচ্ছেদ্য নিয়তির অধীন এ কথা কখনই সত্য নহে। যাঁহারা মনে করেন যে, সকল প্রার্থনাতেই প্রাকৃতিক নিয়ম উল্লঙ্ঘন বুঝায় এবং যাঁহারা প্রাকৃতিক নিয়ম পালন করাকেই একমাত্র ধর্ম্ম বলিয়া মনে করেন, তাঁহারা সুগভীর অধ্যাত্মজগতের কথা একেবারেই বিস্মৃত হইয়া যান।

প্রকৃতিতে ঈশ্বর যে নিয়ম স্থাপন করিয়াছেন যদি আমাদের প্রার্থনাতে তাহার কিছু পরিবর্ত্তন না হয় তবে সেজন্য প্রার্থনা করা অবশ্য বৃথা। এখন প্রশ্ন এই যে আধ্যাত্মিক জীবনের বাহিরে কি কোন-কিছুরই জন্য

প্রার্থনা করা যায় না? যায়; কারণ সংসারের অনেক ঘটনার মধ্যে প্রাকৃতিক শক্তিও থাকে এবং মনুষ্যশক্তিও থাকে। যখন ঝড়ে একখানা নৌকা ডুবিয়া যায় তখন ঝড়ের সঙ্গে মাঝিরও অনেকখানি দোষ থাকিতে পারে। যখন একজন লোক রোগশয্যায় পড়িয়া থাকে তখন তাহার চিকিৎসায় ঔষধের শক্তি ও ডাক্তারের রোগ-নির্ণয়ের নিপুণতা দুইএর মিলন হয়। যেখানেই সংসারের কোন কাজের মধ্যে মানুষের হাত থাকে (একটা human element) সেখানেই প্রার্থনার স্থান আছে। সেখানেই আমরা বলিতে পারি—"হে পিতা, এই বিপদ ও যন্ত্রণা হইতে আমাকে রক্ষা কর", কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে যেন একথাও বলিতে বিস্মৃত না হই যে "তথাপি আমার ইচ্ছা নয়, কিন্তু তোমারই ইচ্ছা পূর্ণ হউক!"

কিন্তু যে ভক্ত বহিঃপ্রাঙ্গণ হইতে পরম জননীর অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়াছেন, তাঁহার আর নিজের কোন ইচ্ছাই থাকে না। ভক্ত যতই ভগবানের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ-যোগে যুক্ত হন এবং উচ্চ হইতে উচ্চতর অবস্থা লাভ করেন, তিনি আর প্রকৃতির বিরুদ্ধে কোন অভিযোগ করেন না। দুঃখ-দৈন্য-রোগ-শোক তিনি অবনতশিরে গ্রহণ করেন এবং ভগবান তাঁহার সকল সন্তাপ হরণ করেন। ভক্তের সহিত ভগবানের এইরূপ সম্বন্ধ যে সত্য, ভক্তের অনুভূতিই তাহার একমাত্র প্রমাণ; কিন্তু এই প্রমাণই যথেষ্ট এবং ইহার অপেক্ষা উৎকৃষ্ট প্রমাণ এক্ষেত্রে সম্ভব নহে। এই সকল কথা ভক্তগণের কথা; ইহা আমার মত ভক্তিবিশ্বাসহীন লোকের অভিজ্ঞতার অতীত, কিন্তু ইহা সত্য বলিয়া বিশ্বাস করি। ভগবান আমাদের সঙ্গে নিত্যকাল বাস করিতেছেন একথা যদি সত্য হয় তবে আমরা তাঁহার নিকটে কিছু বলিব না ও চাহিব না এবং তিনি আমাদের সঙ্গে কোন কথা বলিবেন না, ইহাও কি কখনও সম্ভব? তবে কিরূপে তাঁহার সঙ্গে আমরা অনন্ত জীবন অতিবাহিত করিব? বাক্য ব্যতীত যেমন সঙ্গীত অসম্ভব, বায়ু ব্যতীত যেমন শব্দ অসম্ভব, সেইরূপ প্রার্থনা ও নিবেদন ব্যতীত ধর্ম্ম অসম্ভব। যে হৃদয় হইতে প্রার্থনা উত্থিত হয় না, সে হৃদয়ে ধর্ম্ম অচিরে শুষ্ক হইয়া মরিয়া যায়। তাঁহার নিকট প্রার্থনা করিলে তিনি যে তাঁহার সন্তানকে পবিত্রতারূপ স্বর্গীয় অগ্নি প্রদান করেন, এ কথা সত্য।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের সাধনা বিষয়ে দু' একটি কথা।*

শ্রদ্ধা ও অবকাশ-সৃষ্টি।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথকে শ্রদ্ধার মূর্ত্তি বলিয়া বর্ণনা করা যায়। তাঁহার কথা ভাবিতে গেলে সর্ব্বাগ্রে তাঁহার অপূর্ব্ব শ্রদ্ধার কথা মনে আসে। যাঁহার হৃদয়ে শ্রদ্ধা প্রবল, তাঁহার সকল কার্য্যে সংযম শৃঙ্খলা ও সৌন্দর্য্য-বোধের পরিচয় পাওয়া যায়। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের চরিত্রে শ্রদ্ধার এই সকল ফল উজ্জ্বল ভাবে প্রকাশিত হইয়াছিল।

শ্রদ্ধার আর একটি ফল, অবকাশসৃষ্টি। একজন সঙ্গতিশালী ইংরেজ যখন নিজের জন্য বাড়ী তৈয়ারী করে, তখন সে বাড়ীর চারিদিকে প্রাঙ্গণ বাগান প্রভৃতির জন্য প্রশস্ত স্থান রাখে। সে সবটা স্থানকে নিঃশেষে কর্ম্মস্থানরূপে ব্যবহার করে না। কারণ, সে নিজ অন্তরের পল্লীপ্রেম, সন্তানস্নেহ, প্রভৃতি ভাবকে শ্রদ্ধা করে। সে-সকলের চর্চ্চার জন্য যথেষ্ট অবকাশ এবং যথেষ্ট অবসর সে রাখিতে চায়। কিন্তু একজন ধনী মাড়োয়ারী যখন বাড়ী করে, সে ফুটপাথের গা ঘেঁষিয়াই বাড়ীর ভিত্তি তোলে। কারণ, তাহার জীবনযাত্রার শ্রদ্ধার বস্তু প্রায় কিছু সে দেখিতে পায় না। প্রয়োজনসাধনের জন্য অবকাশ না হইলেও চলে, শ্রদ্ধাই অবকাশ অন্বেষণ করে।

মহর্ষি যখন তাঁহার পার্কষ্ট্রীটের বাড়ীতে থাকিতেন, তখন আমরা মাঝে মাঝে তাঁহাকে দেখিতে যাইতাম। দেখিতাম, তিনি তাঁহার ঘরটিতে একা বসিয়া আছেন। দরজায় প্রহরী দণ্ডায়মান, যেন কেহ আসিয়া হঠাৎ তাঁহার নির্জ্জনতা ভঙ্গ না করে। সম্মুখে শ্বেত পাথরের ক্ষুদ্র একটী টেবিল, তাহাতে কয়েকটি শ্বেত পদ্ম ও তাঁহার ঘাড়ি; ঘরে আর কোন বস্তু নাই; দেয়ালেও কিছু নাই। প্রশস্ত ঘরখানির মাঝখানে তিনি বসিয়া আছেন, চারিদিককার আসবাবহীন অবকাশ যেন শূন্য নয়, তাহা যেন ব্রহ্মের প্রভাবে পূর্ণ হইয়া রহিয়াছে। চারিদিকে অনেকখানি স্থানের মধ্যে সংসারের প্রবেশাধিকার রহিত,—এইভাবে নিজের চারিদিকে একটি অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লইয়া মহর্ষিদেব তাহার মধ্যে বাস করিতে ভালবাসিতেন।

তাঁহাকে সংসারের কাজও করিতে হইত। হিসাব-পত্র দেখিতে হইত, বিষয়বিভাগ সম্বন্ধে আত্মীয়দের বিবাদনিষ্পত্তিও করিতে হইত। তিনি কি প্রণালীতে এই সমুদয় কাজ করিতেন? আগে সংসারকে সরাইয়া দিয়া, দেহ মনের চারিদিকে প্রশস্ত অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লইয়া, ব্রহ্মে মগ্ন হইয়া ব্রহ্ম-সহবাসের অবস্থায় এই সমুদয় কাজ করিতেন।

যাঁহারা কোনও গ্রামের পুকুরে স্নান করিয়াছেন,

---

* মহর্ষিদেবের স্বর্গারোহণের সাংবৎসরিক উপলক্ষে ৬ই মাঘ আচার্য্য শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী কর্তৃক কলিকাতা সাধারণ ব্রাহ্ম-সমাজমন্দিরে প্রাতঃকালীন উপাসনায় নিবেদিত।

তাঁহারা কোন কোন সময়ে দেখিয়া থাকিবেন যে, স্নানার্থীকে পুকুরের জলে ভাসমান পানা দুইহাতে সরাইয়া দিয়া, নিজের চারিদিকে প্রশস্ত অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লইয়া, তারপর ডুব দিতে হয়। এতখানি স্থান পরিষ্কার করিয়া লইতে হয় যে, যেন ডুবিয়া থাকিবার সময়টুকুর মধ্যে, অথবা মাথা তুলিবার সময়ে, পানা আসিয়া গায়ে না ঠেকে। প্রকৃত ব্রহ্মসাধকও তাহাই করেন। সংসারকে দেশে, কালে, ও মনে একটু ঠেলিয়া দিয়া, একটু দূরে সরাইয়া রাখিয়া, ডুবিবার অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লন। আমরা ছুটিতে ছুটিতে আসিয়া উপাসনায় বসি, এবং তার পরেই আবার উঠিয়া ছুট দিই। ইহাতে প্রকাশ পায় যে উপাসনার প্রতি আমাদের শ্রদ্ধা নাই।

আজকাল দ্রুত কাজের ও দ্রুত পাঠের যুগ। সেলাইয়ের কল হইয়াছে, লিখিবার কল হইয়াছে। আজকাল প্রায় সকল গ্রন্থেরই চুম্বক মুদ্রিত হইয়া যায়। সংবাদপত্রের স্তম্ভশীর্ষে স্থূল অক্ষর কয়টির উপর দিয়া চক্ষু বুলাইয়া গেলেই এক পলকে পৃথিবীর সব সংবাদ জানা যায়। কিন্তু ব্রহ্মসঙ্গ তো এমন করিয়া লাভ করা যায় না। মানুষ খুব চেষ্টা করিলে না-হয় চিন্তাকে দৌড় করাইতে পারে। কিন্তু একজন পুরুষের সঙ্গ-রসে মনপ্রাণ নিমগ্ন করার কাজটি,—এমন করিয়া মগ্ন করা যে চিন্তা ভাব কামনা মেজাজ সব তাহাতে অভিষিক্ত হইয়া যায়, দেহ ও আত্মার অস্থি মজ্জা পর্য্যন্ত তাহাতে বসিয়া যায়,—এ কাজটি কি ঐ প্রকারে সম্ভব হয়? প্রকৃত ব্রহ্মসাধককে সর্ব্বদাই অবকাশ সৃষ্টি করিয়া লইতে হয়।

জীবনের সকল শ্রেষ্ঠ কাজে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যথেষ্ট পরিমাণে কালের অবকাশ গ্রহণ করিতেন। তিনি সম্ভবতঃ ১৮৩৭ সালে উপনিষদ পাঠ করিতে আরম্ভ করেন। এগারো বৎসর পাঠ করিবার পরে তিনি ব্রাহ্মধর্ম্ম গ্রন্থরচনায় মনোনিবেশ করেন। ১৮৪৮ সালে ঐ গ্রন্থের প্রথম ভাগের মন্ত্রগুলি একত্রিত হয়। ইহার পর আরও এগারো বৎসরে ১৮৫৯ সালে তিনি এই গ্রন্থ সম্পূর্ণ করিয়া প্রকাশিত করেন। ইহার ব্যাখ্যা অনুবাদ ও তাৎপর্য্যের প্রত্যেকটি বাক্যের উপরে, তাঁহার সুদীর্ঘ কালের শ্রদ্ধাপূর্ণ সযত্ন চিন্তার ও বিবেচনার চিহ্ন অঙ্কিত হইয়াছে।

উপনিষদের এক একটি বচনকে তিনি অগ্রে বহু বৎসর নিজ হৃদয়ে ধারণ করিয়াছেন ও নিজ চিন্তায় আলোড়ন করিয়াছেন; তৎপরে তিনি তাহা ব্রাহ্মধর্ম্মগ্রন্থে প্রকাশিত করিয়াছেন। এই গ্রন্থের কত বচনে যেন মহর্ষির গায়ের উত্তাপ আমরা অনুভব করিতে পারি। অনেকক্ষণ একটি রত্নমালা নিজ কণ্ঠে ধারণ করিয়া যদি কেহ তাহা বন্ধুর কণ্ঠে পরাইয়া দেয়, বন্ধু বলেন, "তুমি সারাদিন এটিকে এমন ক'রে প'রেছ যে তোমার গায়ের তাপ এতে আমি অনুভব ক'রতে পারছি"। আমরা যখন 'পিতা নোঽসি' মন্ত্রটি পাঠ করি, 'আনন্দাদ্ধ্যেব খল্বিমানি' মন্ত্রট কণ্ঠে ধারণ করি, তখন যেন তাহাতে মহর্ষির অঙ্গের উত্তাপ অনুভব করিতে পারি! কত সুদীর্ঘ বৎসর উপনিষদের এক-একটি মন্ত্রকে নিজ কণ্ঠে ধারণ করিয়া তার পরে তিনি তাহা ব্রাহ্মদিগের গলায় পরাইয়া দিয়াছেন। 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব', এবং 'ব্রহ্মকৃপাহি কেবলম্' এই দুটি মহাবাক্য মহর্ষির নিজের রচিত। নিজ হৃদয়ে বহু বৎসর ধারণ করিয়া, নিজ সাধনার উত্তাপের গূঢ় শক্তি ইহাদের মধ্যে সঞ্চারিত করিয়া দিয়া, ব্রাহ্মদিগের গলে তিনি এই দুই রত্নমালা পরাইয়া দিয়াছেন।

বলিতে কি, মহর্ষির জীবনে 'সাধনা' কথার অর্থই যেন এক-একটি সত্য বহু বৎসর ধরিয়া অন্তরে আলোড়িত করা; এক-একটি সত্যের চারিদিকে বহু বৎসর ঘুরিয়া ঘুরিয়া নানা দিক হইতে তাহাকে দর্শন করা; এক একটি সত্যকে বহু বৎসর ধরিয়া নিজ অধ্যয়নের ও নিজ জীবনের অনুভূতির সহিত জড়িত করা। 'সত্যম্' এই মন্ত্র বলিতে বলিতে তাঁহার মাথার চুল দাঁড়াইয়া উঠিত। কেন এরূপ হইত? তিনি অন্তরে বহু বৎসর এই মন্ত্রকে নিজ চিন্তায় আলোড়ন করিয়াছিলেন, তিনি নানাদিক হইতে ঘুরিয়া ঘুরিয়া এই মন্ত্রকে দর্শন করিয়াছিলেন, এবং তিনি নিজের সকল অধ্যয়নের সহিত এই মন্ত্রকে জড়িত করিয়াছিলেন।

তাঁহার তিনটি প্রিয় অধ্যয়নের বিষয় ছিল উপনিষদ্, জ্যোতিষ ও ভূতত্ত্ববিদ্যা। উপনিষদ্ বলেন, ব্রহ্মই একমাত্র সত্য। ব্রহ্মই দেশের দেশ,—'এতস্মিন্নু খল্বক্ষরে গার্গি আকাশ ওতশ্চ প্রোতশ্চ'। ব্রহ্মই কালের কাল, 'জ্ঞঃ কালকালো গুণী সর্ব্ববিদ্যঃ'। মহর্ষির সত্যম্-সাধনায় উপনিষদের এই সকল তত্ত্ব জড়িত হইয়াছিল। জ্যোতিষ শাস্ত্র বলেন, কোটি কোটি যোজন দূরবর্ত্তী নক্ষত্রে, সুদূরতম নীহারিকায়, সেই একেরই সৃষ্টি, একেরই লীলা। মহর্ষি নিজ সত্যম্-সাধনায় এই তত্ত্বকেও জড়িত করিয়া লইয়াছিলেন। ভূতত্ত্ব-বিদ্যা বলেন, কোটি কোটি যুগ ধরিয়া পৃথিবীতে কত পরিবর্ত্তন ঘটিয়াছে, কত নব নব ভূধরের ও সাগরের অভ্যুদয় ও বিলয় হইয়াছে। এই দুরবগাহ কালসাগরের সকল ঘটনার নিয়ামক সেই এক পরব্রহ্ম। মহর্ষি মনশ্চক্ষে সেই দুরবগাহ অতীতের চিত্রসকল দর্শন করিয়া নিজ সত্যম্-সাধনার সহিত তাহাকেও জড়িত করিয়া লইয়াছিলেন। তাই তাঁহার চুল দাঁড়াইয়া উঠিত।

মহর্ষিদেবের ধর্ম্মসাধনায় যে এইরূপ সুবিস্তৃত কালের অবকাশ থাকিত, তাহার একটি ফল, তাঁহার ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম ভাগের কতকগুলি মিশ্র বচন। আমি তন্মধ্যে তিনটি মাত্র বচনের উল্লেখ করিতেছি; (১) 'অসতো মা সদ্গময়' ইত্যাদি প্রার্থনাটি। (২) 'শৃণ্বন্তু বিশ্বে' হইতে আরম্ভ করিয়া 'নান্যঃ পন্থা বিদ্যতেঽয়নায়' পর্য্যন্ত বচনটি। (৩) 'যশ্চায়মস্মিন্নাকাশে তেজোময়োঽমৃতময়ঃ পুরুষঃ সর্ব্বানুভূঃ' ইত্যাদি বচনটি। ইহার কোনটিই উপনিষদে এই আকারে বর্ত্তমান নাই। নানা স্থান হইতে সংগৃহীত বচনখণ্ড একত্রিত হইয়া এই বচনসকল প্রস্তুত হইয়াছে। কিরূপে তাহা প্রস্তুত হইয়াছে, তাহা ভূতত্ত্বের একটি দৃষ্টান্তের দ্বারা বুঝাইতে ইচ্ছা হয়। একখণ্ড গ্রাণাইট প্রস্তর পরীক্ষা করিলে দেখা যায়, তাহা ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র চূর্ণীকৃত প্রস্তরকণায় রচিত। ভূগর্ভের উত্তাপ ও প্রবাহিত জলধারার বেগ, দীর্ঘ যুগে, পৃথিবীর আদিম শৈলমালা হইতে শিলাখণ্ডসকলকে খসাইয়াছে, আলোড়িত ও চূর্ণীকৃত করিয়াছে, আবার তাহাতে স্তরে স্তরে সজ্জিত করিয়াছে ও জলমিশ্রিত নানা মসলার সংযোগে একত্র বাঁধিয়াছে। এইরূপে নূতন প্রস্তর রচিত হইয়াছে। এই নব-রচিত প্রস্তর কেমন সুদৃঢ় ও কেমন সুমসৃণ! তেমনই উপনিষদের আদিম তত্ত্বশৈলের খণ্ডসকল দেবেন্দ্রনাথের ব্যাকুলতার অনলে ও তাঁহার সাধনার ধারায় পতিত হইয়া, দীর্ঘকাল তদ্দ্বারা আলোড়িত চূর্ণীকৃত ও সজ্জিত হইয়া, তাঁহার চিন্তার ও ভাবের মসলায় একত্র গ্রথিত হইয়া, প্রস্তরবৎ সুদৃঢ় ও সুমসৃণ নব নব বচনের আকার ধারণ করিয়াছে। এখন আর সে সকল বচনকে খণ্ড খণ্ড করিয়া বিভক্ত করে, কাহার সাধ্য!

মহর্ষির অন্তরের প্রকৃতি এবং তাঁহার সাধনার প্রণালী উভয়ই এইরূপ শক্ত বাঁধুনির পক্ষে অনুকূল ছিল। আজকাল বাড়ী তৈয়ারী করিবার সময়ে লোকে তাড়াতাড়ি কাজ সারিবার দিকে দৃষ্টি রাখে, স্থায়িত্বের প্রতি তত দৃষ্টি রাখে না। আজকালকার মসলা ও প্রাচীন মসলায় কত তফাৎ! মহর্ষির প্রকৃতিতে ও সাধনার প্রণালীতে যেন ছিল সেই মসলা, যাহা দিয়া প্রকৃতিদেবী প্রস্তর রচনা করেন,—the slow cement of the ages that builds rocks; তাই এমন সুন্দর সুদৃঢ় মিশ্র বচনসকল দীর্ঘকালে ধীরে ধীরে প্রস্তুত হইয়া তাঁহার অন্তরে পূর্ব্ব হইতে সঞ্চিত ছিল এবং তাই মহর্ষি "তিন ঘণ্টার মধ্যে সহজে, সতেজে," ব্রাহ্মধর্ম্ম-গ্রন্থের প্রথম ভাগ মুখে মুখে বলিয়া রচনা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। সেই তিন ঘণ্টার পশ্চাতে যে এগারোটি বৎসর আছে, ইহা যাঁহারা জানেন না, তাঁহাদের কাছে ঐ গ্রন্থ রচনা অলৌকিক ও অসম্ভব ব্যাপার বলিয়া মনে হয়।

ধর্ম্মের দ্বিবিধ অনুপ্রাণন।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের জীবন আলোচনা করিলে আর একটি চিন্তা আমার মনে উদিত হয়। ধর্ম্ম মানুষের মনকে যে যে প্রণালীতে অনুপ্রাণিত করেন, তাহার মধ্যে দুইটি পরস্পর হইতে বিভিন্ন। (১) ব্রহ্মের শাশ্বত প্রকাশের অনুপ্রাণন; (২) মানব-ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলার অনুপ্রাণন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ধর্ম্মজীবন প্রথম ধারায়, এবং আচার্য্য কেশবচন্দ্র ও তৎপরবর্ত্তী ব্রাহ্ম নেতাগণের ধর্ম্মজীবন অনেক পরিমাণে দ্বিতীয় ধারায় পুষ্ট ও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

ব্রহ্মের শাশ্বত প্রকাশ দর্শন করিবার দুই ক্ষেত্র। প্রথম বিশ্বপ্রকৃতি; এবং দ্বিতীয়, নানা সুখ-দুঃখের ও ঈশ্বরের বিচিত্র করুণার লীলাভূমি, মানবের সাধারণ জীবন। আমাদের দেশের প্রাচীন ব্রহ্মবাদী ঋষিগণ বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে ব্রহ্মের শাশ্বত প্রকাশ অনুভব করিতেন। তাঁহারা এমন স্থানে বাস করিতে ভাল বাসিতেন, যেখানে চক্ষু খুলিলেই ব্রহ্মের এই শাশ্বত প্রকাশ দেখিতে পাওয়া যায়, এবং চক্ষু মুদ্রিত করিলেও মনের সম্মুখে তাহার ছবি সহজে উদিত হয়। ব্রহ্মের যে শাশ্বত প্রকাশ তাঁহারা দর্শন করিতেন, আমরাও একবার চিন্তানেত্রে তাহা দর্শন করিতে প্রয়াসী হই।

হিমালয়ের অথবা তাহার পাদশৈলমালার ক্রোড়ে বাস করিয়া সেই ঋষিগণ দেখিতেন, ঊর্দ্ধেও জলের খেলা, নিম্নেও জলের খেলা। নদীসকল নিম্নের জল। সপ্তসিন্ধুকে অর্থাৎ সাতটি প্রবাহিত নদীকে তাঁহারা দেখিতেন, ও মনে মনে চিন্তা করিতেন। শ্বেত পর্ব্বতসকল হইতে কোন নদী পূর্ব্বগামিনী হইয়া, কোন নদী বা পশ্চিমগামিনী হইয়া উৎসারিত হইতেছে, 'প্রাচ্যোঽন্যা নদ্যঃ স্যন্দন্তে শ্বেতেভ্যঃ পর্ব্বতেভ্যঃ প্রতীচ্যোঽন্যাঃ,' ইহা তাঁহারা দেখিতেন। কৈলাস পর্ব্বতের নিকটবর্ত্তী যে স্থান হইতে ব্রহ্মপুত্র পূর্ব্বদিকে ও সিন্ধু পশ্চিম দিকে ধাবিত হইতেছে, সেই স্থানের সুগম্ভীর দৃশ্য দেখিতে এখনও কত পরিব্রাজক গমন করিয়া থাকেন। এ যুগে Sven Hedin তথায় গমন করিয়া তাহার চমৎকার বিবরণ প্রকাশ করিয়াছেন। নিম্নের এই জলসকলকে ঋষিরা কখনও বা চক্ষে দেখিতেন, কখনও বা ব্রহ্মচিন্তার সময় মনে মনে ভাবিতেন। মেঘসকল ছিল তাঁহাদের ঊর্দ্ধের জল। মেঘ দেখিতে ঋষিরা বড় ভাল বাসিতেন। ঋগ্বেদ মেঘের বর্ণনায় পরিপূর্ণ বলিলেও হয়। আকাশে স্তরে স্তরে মেঘ সজ্জিত হয়। এক এক সময়ে সমগ্র আকাশ মেঘের সাগরে পরিণত হয়। এই মেঘসাগরের নাম ছিল "সমুদ্র অর্ণব"। আবার কখনও বা আকাশের এক প্রান্তে অনেকগুলি কাল মেঘ দেখা দেয়। পর্ব্বতের

মত তাহারা চালু হইয়া আকাশের গায়ে সংলগ্ন, তাই তাহাদের নাম "পর্ব্বত"। মরুতেরা তাহাদিগকে আকাশের এপার হইতে ওপার পর্য্যন্ত তাড়াইয়া লইয়া যায়। ঋগ্বেদের মন্ত্রে আছে, 'য ইংখয়ন্তে পর্ব্বতান্ তিরঃ সমুদ্রমর্ণবম্।' এত রকমের জল সব সময়ে ঋষিদের মনে থাকিত, তাই তখন হইতেই অপ্ শব্দ বহুবচনান্ত। তাই ঋষি গাহিয়াছেন, "যো দেবোহগ্নৌ যোহপ্সু।" সূর্য্য একটি সুন্দর পাখীর মত আকাশের একপ্রান্ত হইতে অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত উড়িয়া যায়। মাঝে মাঝে সূর্য্য সেই মেঘসমুদ্রের মধ্যে প্রবেশ করিয়া লুকোচুরি খেলে। আপনি লুকাইয়া থাকিয়াও সে বিশ্বভুবনকে দেখিতে পায়,—'একঃসুপর্ণঃ স সমুদ্রমাবিবেশ, স ইদং বিশ্বং ভুবনং বিচষ্টে'। উপরের সেই মেঘসমুদ্র হইতে বারিবর্ষণই ছিল ঋষিদের নিকটে জগতের সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ ঘটনা। বর্ষা দেখিয়াই তাঁহারা সংবৎসর গণনা করিতেন। তাঁহাদের ভাষায়, 'সমুদ্র অর্ণব হইতেই সংবৎসরের জন্ম হইয়াছিল, সমুদ্রাদর্ণবাদধি সংবৎসরোহজায়ত'। বর্ষাকালে ওষধিসকল জন্মলাভ করে, বনস্পতিসকল সতেজ হইয়া উঠে। ঋষিদের দেখিবার বস্তু ভাবিবার বস্তু, এই সকল ছিল।

ব্রহ্মের এই শাশ্বত প্রকাশের কাছে এদেশ ওদেশ নাই, এ-জাতি ও-জাতি নাই। ধনী দরিদ্র, রাজা প্রজা, মহাজন মজুর, ইহাদের বৈষম্য নাই। ব্যবসা-বাণিজ্যের ঘাত-প্রতিঘাত, সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে নানারূপ সংঘাত, জাতিতে জাতিতে নানারূপ যুদ্ধ-বিগ্রহ, এ সকলের দূরশ্রুত প্রতিধ্বনিও নাই। এ সকল ব্যাপার চক্ষের সম্মুখে ঘটিলেও, ধর্ম্মসাধনের সময়ে সাধকের মনোজগতে ছায়াপাত করিতে পায় না। ব্রহ্মের এই শাশ্বত প্রকাশের মধ্যে মানুষ আছে বটে, কিন্তু সে উন্নত জীব মাত্র। সে অন্যান্য জীব অপেক্ষা অনেক উচ্চে থাকিলেও, ব্রহ্মের মহিমার ও অনন্ততার কাছে মানবের গৌরব-জনিত পার্থক্য লুপ্ত হইয়া গিয়াছে; তাহা দেখাই যায় না। দেখা যায় কেবল বিস্তীর্ণ বিশ্বপ্রকৃতি, যাহা ব্রহ্মের বিশাল প্রকাশ। দেখা যায় কেবল সেই প্রকাশেরই নব নব মূর্ত্তি। দেখা যায় কেবল ঋতুচক্রের আবর্ত্তন, "নিমেষা মুহূর্ত্তা অহোরাত্রাণ্যর্দ্ধমাসা মাসা ঋতবঃ সংবৎসরাঃ" ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিতেছে, যাইতেছে।

মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথও সেই প্রাচীন ঋষিদিগের মত হিমালয়ে গিয়া মেঘের খেলা দেখিতে, বর্ষার উদয়ে বিলয়ে ঈশ্বরের জলযন্ত্রের ক্রিয়া দেখিতে, সংবৎসরের আবর্ত্তনে সেই অকাল পুরুষের লীলা দেখিতে ভাল বাসিতেন। বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্রহ্মের প্রকাশ দেখিয়া নির্ম্মজ্জিত হইয়া যাওয়া, ইহা তাঁহার বড় প্রিয়কার্য্য ছিল। এই জন্য তিনি সূর্য্যোদয় দেখিতে এত ভাল বাসিতেন। সেই জন্য কতদিন সারারাত্রি চাঁদ দেখিয়া, চাঁদের জ্যোৎস্না গায়ে মাখিয়া, চাঁদের সঙ্গে কথা কহিয়া কাটাইতেন। এই জন্য তিনি নৌকায় ভ্রমণ করিতে ভাল বাসিতেন। ধীরে ধীরে নৌকা চলিত, তিনি নৌকার অগ্রভাগে বসিয়া প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশি দুই পিপাসিত চক্ষু দিয়া পান করিতে করিতে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতেন।

প্রকৃতিতে ব্রহ্মদর্শনের সঙ্গে, গৃহীর দৈনিক জীবনে ব্রহ্মের করুণার অনুভূতিটি মহর্ষি যোগ করিয়া লইয়াছিলেন। তাঁহার দৈনিক পূজা আমাদের মত বাগ্‌বহুল ছিল না, অনুভূতিবহুল ছিল। কর্ত্তব্যে ঈশ্বরের আহ্বান অনুভব করিয়া, সুপথে ঈশ্বরকে একমাত্র নির্ভরের স্থলরূপে দর্শন করিয়া, সংযত সন্তুষ্টচিত্ত নির্লোভ নিরহঙ্কার ও দ্রোহশূন্য জীবন যাপন করিয়া, তিনি আর একভাবে ব্রহ্মের শাশ্বত অনুপ্রাণনের আস্বাদনে স্বীয় জীবনকে পূর্ণ করিয়াছিলেন।

ধর্ম্মজগতে অনুপ্রাণনের দ্বিতীয় ধারা মানব ইতিবৃত্তে বিধাতার লীলা দর্শন হইতে নিঃসৃত হয়। বহু মানবের চিন্তা ও কার্য্য যখন একত্রে এক পথ ধরিয়া চলে, বিশেষতঃ যখন তাহারা একটি নব আদর্শের পতাকা ধারণ করিয়া মানুষের বাধাবিঘ্নকে অতিক্রম করিয়া চলে, তখন তাহার মধ্যে বিধাতার লীলা দর্শন করিয়া মানুষের মন অনুপ্রাণিত হয়। এই অনুপ্রাণনের পথে আমরা 'ধর্ম্মবিধানের' ভাবটি প্রাপ্ত হই। এই পথ ধরিয়া আমাদের দেশে, আমাদের জাতির ইতিবৃত্তে, আমাদের ধর্ম্ম বিধানের সংগ্রামসকলে ঈশ্বরের নেতৃত্ব দর্শন করি। এই চিন্তার পথ ধরিয়াই মানুষ বলিয়াছে, "যেষাং পক্ষে জনার্দ্দনঃ"; ঈশ্বরের নাম দিয়াছে "God of Israel"; এই অনুপ্রাণন হৃদয়ে লইয়া আমরাও গাহিতেছি, "জন গণ-মন-অধিনায়ক জয় হে ভারত ভাগ্য-বিধাতা।"

মানুষের মনে যখন মহৎ কর্ম্মের ও মহৎ ত্যাগের জন্য উদ্দীপনা সঞ্চার করিতে হয়, দেশের অথবা ধর্ম্মের জন্য যখন মানুষের আত্মোৎসর্গ করিবার দিন আসে, তখন আমরা এই দ্বিতীয় অনুপ্রাণনধারার আশ্রয় গ্রহণ করি। দেশের বা সমাজের সঙ্কটসময়ে, জনসঙ্ঘকে মাতাইয়া তুলিবার অথবা নব পথে চালিত করিবার সময়ে, আমরা এই অনুপ্রাণন অন্বেষণ করি। আচার্য্য কেশবচন্দ্রের প্রভাববশতঃ, তাঁহার সময়ে এবং তাঁহার পরবর্ত্তী কালে সাধারণ ব্রাহ্মসমাজে, এই ভাবটি ব্রাহ্মসমাজকে সমাজসংস্কারের বিষম সংগ্রামের মধ্যে তেজ ও বীর্য্য প্রদান করিয়াছিল।* এই অনুপ্রাণন যেমন ইতিহাস হইতে জন্ম

* প্রবন্ধের এই অংশ পড়িলে সহসা সংশয় আসে যে, দ্বিতীয়

লাভ করে। তেমনি ইহা নব ইতিহাস সৃষ্টিও করে। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসের সর্ব্বাপেক্ষা গৌরবময়, সর্ব্বাপেক্ষা উজ্জ্বল যুগটি ইহারই সৃষ্টি।

কিন্তু এই দ্বিতীয় ধারাটির বিষয়ে ভাবিবার কয়েকটি কথা আছে। প্রথমতঃ, মানুষের সঙ্গে যাহা কিছু জড়িত, মানুষের কাজের উপরে যাহা আংশিকরূপেও নির্ভর করে, তাহা কিয়ৎ পরিমাণে চঞ্চল ও অনিশ্চিত হইতে বাধ্য। যাঁহারা নিজ ধর্ম্মসাধনে এই ধারাটির উপরে অতিমাত্রায় নির্ভর করেন, তাঁহাদের ধর্ম্মসাধনের সরসতা ও অনুপ্রাণন সকল সময়ে সমভাবে থাকে না। জনসমাজের অধিকাংশ লোক যদি অন্য পথ ধরে, অন্য কথা বলে, অথবা ব্রাহ্মসমাজেরই মানুষেরা যদি মনের মত হইয়া না চলে, তবে তাঁহাদের মনে বিষাদ ও নিরাশা উৎপন্ন হয়। এই সহজ উদ্দীপনা ও সহজ নিরাশার ছাপটি মহর্ষির পরবর্ত্তী ব্রাহ্মসমাজে দেদীপ্যমান।

দ্বিতীয়তঃ, ইহাতে কখনও বা আপনার অথবা আপনার স্বদলের মতামতের দ্বারা, কখনও বা অধিকাংশ মানুষের মনের গতির দ্বারা, ঈশ্বরের ইঙ্গিত ও ঈশ্বরের আদেশ নির্দ্ধারণ করিতে প্রবৃত্তি জন্মে; এবং তদ্দ্বারা জনসমাজে কখনও কখনও ঘোর বিবাদ ও বিদ্বেষ উৎপন্ন হইবার সম্ভাবনা হয়। ব্রাহ্মসমাজের ইতিহাসে ইহার দৃষ্টান্তও বিরল নহে।

আজ মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের স্মরণের দিনে আমার মনে হইতেছে যে ব্রাহ্মসমাজের মানুষের মনের গতি কিছু অতিরিক্ত মাত্রায় প্রথম ধারাটি হইতে দূরে সরিয়া পড়িতেছে, ও দ্বিতীয় ধারাটি ঘেঁষিয়া চলিতেছে। তাহার ফলে, ব্রাহ্মসমাজের দৃষ্টি ও নির্ভর কখনও কখনও ভুল পথে চলিয়া যাইতেছে। নীরব ব্রহ্মসঙ্গ, দৈনিক জীবনে ঈশ্বরের আলোকে বসিয়া আত্মপরীক্ষা আত্মসংশোধন ও অনুতাপ, সরল প্রার্থনা কৃতজ্ঞতা ও প্রফুল্লতা, পারিবারিক জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়মানুবর্ত্তিতা, সমগ্র জীবনকে ব্রহ্মের সহিত মিলাইয়া লওয়া, এ সকল সাধনের দিকে আমরা তত মন দিতেছি না। কিন্তু নির্ভর করিতেছি, কেবল অনেকে মিলিত হইয়া গান, কীর্ত্তন, উৎসব প্রভৃতি উত্তেজক প্রণালীর উপরে। এমন কি এই অবসরহীনতার যুগে ধর্ম্মকার্য্যে ব্যয় করিবার মত' সময় যাঁহাদের আছে, তাঁহারাও এত বেশী পরিমাণে সেই সময়টুকু এইরূপ সমবেত ধর্ম্মচর্চ্চায় ব্যয় করিতেছেন যে, ব্যক্তিগত ও পারিবারিক ধর্ম্মজীবন গভীর উন্নত ও সরস করিয়া লইবার জন্য কোন উপায় অবলম্বন করিতে তাঁহারা আর সময় পাইতেছেন না। আমাদের মন যেন এই ভাবিয়া অপেক্ষা করিয়া আছে যে, কবে আবার একটি আলোড়ন (revival) আসিবে, আমাদের ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের সাধনহীনতা ও শিথিলতাজনিত সমুদয় ক্ষতি হঠাৎ পূরণ হইয়া যাইবে। মনে হয়, কেহ কেহ ব্রাহ্মসমাজের শতাব্দীউৎসবকে এইরূপ একটি আলোড়ন বলিয়া আশা করিয়াছিলেন। চিরন্তন অনুপ্রাণনের উৎস যে বিশ্বপ্রকৃতিতে ব্রহ্মের শাশ্বত প্রকাশ এবং মানবের সাধারণ জীবনে ব্রহ্মের সরস সঙ্গ, তাহা হইতে বঞ্চিত থাকিলে মানুষের মনের এইরূপ দশা হয়।

করুণাময় পরমেশ্বর ব্রাহ্মসমাজকে এই আশীর্ব্বাদ করুন, ইহার নরনারী, ইহার আশ্রিত পরিবারসকল মধুময় ব্রহ্মসঙ্গ লাভের জন্য ব্যাকুল হউন, এবং তাহা লাভ করিয়া কৃতার্থ হউন। ঈশ্বর যে নিত্য প্রাণময়, নিত্য অনুপ্রাণনের উৎস,—তাঁহাকে আমরা প্রাণরূপে নিজ নিজ জীবনে লাভ করিতে শিখি। মহর্ষিদেবের দৃষ্টান্ত আমাদের মধ্যে ফলবান্ হইয়া উঠুক। আমাদের জীবন, আমাদের গৃহ, শ্রদ্ধা শৃঙ্খলা ও শোভার আগার হউক।

———

ধারাটী মহর্ষি কর্ত্তৃক উপেক্ষিত হইয়াছিল বা মহর্ষির প্রাণে ঐ ধারাটী কার্য্য করে নাই। আমাদের স্থির ধারণা যে, উহা বক্তা লেখকের অভিমত নহে। কিন্তু পাঠকসাধারণের মনে পাছে ঐরূপ সংশয় উপস্থিত হয়, তাই তাঁহাদিগকে স্মরণ করাইয়া দিতে চাই যে, মহর্ষিই আত্মীয়স্বজনের বিরাগভাজন হওয়া সত্ত্বেও ভগবানের প্রতি স্থির দৃষ্টি রাখিয়া সমাজসংস্কারে সর্ব্বপ্রথম হস্তক্ষেপ করিয়াছিলেন। তবে, তিনি সমাজসংস্কারে কোন প্রকার হঠকারিতার প্রশ্রয় দিতে চান নাই; সমাজসংস্কারের খাতিরে বিশাল হিন্দুসমাজের সহিত ব্রাহ্মসমাজকে বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টাকে তিনি সমর্থন করেন নাই। ত০ স০

Indian Music and Simultaneous Harmony, (1)

By Miss Bani Tagore.

1. "Music" and "Harmony"—Sense in which used.

It is generally held that in Indian music there is no place for harmony : it is melody alone that counts. The general impression seems to be that harmony has never been introduced into Indian music, nor has there been any occasion for it up tirl now. The word "music" has, of course, been taken in its wider sense to include not only vocal but instrumental music as well, and the word "harmony" is used in the sense of "symphony" or sounds in combination.

2. Raga—What it is.

It is known to every musician that there are seven principal notes with their respective sharps and flats, which latter m...

be termed as secondary notes. A tune is formed by a combination and permutation of the principal notes with or without the secondary ones. Each such tune, when played in different octaves, high and low, or when different concordant tunes are combined into one single tune, gives birth to a Raga or melody-type, pure or mixed, respectively. When this melody-type appears before us with a definite shape, the basic type of the melody, or, rather, the spirit of the tune or the melody, becomes manifest to our mind's eye.

3. Melody and Harmony.

If the different notes of a tune are played in an agreeable succession of simple and single sounds and so regulated as to give a pleasing effect, we get a melodious tune or a sweet melody. On the other hand, if any one of the notes is played discordantly, it jars on our ears, and the tune or the melody loses its life. Every song thus stands on one or other such melody or tune, pure or mixed. The basic tune manifests itself through every song. In fact, it is the tune that should be termed melody; but by implication, a melody-type or even a song based on a tune is also called a melody. But in harmony different consonant notes are so played in relation to every note of the basic tune, that the tune does not sound discordant to our ears—consonance touches every note of the tune and the tune itself as well. In fact, "harmony" has been defined as "any simultaneous combination of consonant or related notes." In harmony "it is the cluster of notes rather than the individual note which has special value."

4. Harmony, not unknown in Ancient India.

Was harmony known or unknown to the early Indian musicians? We find in ancient Sanskrit books on music the word "Rak'am"* to mean "that which is produced by a combination of the sounds of all stringed instruments, wind instruments, and those of other kinds" (*vide* the "Sangit Darpana" and other Musical Treatises by Narada). Besides this, in the ancient Sanskrit books on music are found such words as "Bibadi" or dissonant, "Sambadi" or consonant, which necessarily connote simultaneous playing of notes. From words like these, it will perhaps not be wrong on our part to surmise that simultaneous harmony was not in this country altogether unknown in ancient times. Words like the above could not have been put in, unless the coiners of those words had in their mind some idea of harmony.

* *Cf.* "The Note on Harmony," by Trevisa, as published by Bateman in A.D. 1582.

5. Exposition of "Intervals" in ancient Indian treatises on music.

"In discussing all subjects relating to the construction of chords it is necessary to find names for the various kinds of intervals." That this has been done in Indian music will be apparent from the exposition of the various musical intervals as given in a Tamil work "Tivakaram." "It is also rather interesting" says Mr. Herbert Popley, "to find that the different intervals are described in relation to one another. Sa to Ga (C to E) is recognized as a third, Sa to Ma (C to F) as a fourth, Sa to Pa (C to G) as a fifth, and Sa to Dha (C to A) as a sixth; the fourth being called a 'friendly' interval, the fifth a 'related' interval, and the third and sixth 'enemy intervals.' The Natya Shastra shows a clear perception of the various intervals—octave, fifth, fourth, tone, minor tone, and semi-tone." Thus an important step seems to have been taken in the direction of combined harmony.

6. Indian music—not void of Harmony.

It may perhaps be safely said in the words of Raja Sir Souriudra Mohan Tagore, D. MUS., C. I. E., that Indian music abounds in melody, but it is not void of harmony. It is no wonder that the musicians of the olden days had the idea of harmony developed in them. Whoever has heard the music of the aborigines—*e.g.*, the Kols etc. must have realized that simultaneous harmony does play a good part even in their music. It is needless to say that there must have been combined harmony in the

ancient music of the Aryans too, when it is found even in the music of the aboriginal non-Aryans. I have heard that my great-grandfather, the late Maharshi Debendra Nath Tagore, used to speak of harmony (in the sense of combined harmony) clearly existing in the tunes of the Vedic hymns of the Sama Veda.

7. Knowledge of Harmony—when lost.

For various reasons, which will be stated later on in the proper place, the knowledge of harmony has been lost to the musicians of this country since the great war of the Puranic age; or, if not then, certainly since the advent of Buddhism. But it is said that, long after the Buddhistic period, the great singer Mian Tansen, of the Court of Akbar the Great, could produce chords out of his throat—he could produce the combined sound of Sa and Ga or C and E, etc. In this effort of Tansen to produce a chord we can see a faint attempt at expressing simultaneous harmony. Even so great an exponent of Indian music as Mian Tansen, who is said to have stirred the very depths of nature by his music, seems to have realized simultaneous harmony as being congenial and not detrimental to Indian music.

8. Tansen and Harmony.

We cannot think that the theory of harmony as enunciated in the ancient Sanskrit books on music was unknown to a master-musician like Tansen. Probably the idea of re-introducing harmony in Indian music came very naturally to his mind by itself or it may be that, owing to the advent of the Europeans in this country at that time, the European method of harmonized music reached his ears; and the trained ears of Tansen, a musician well-versed both in the theory and practice of music, having realized the beauty of harmony, he tried to express it vocally. It is not known if he made any special effort for the improvement of instrumental music, as he did for that of vocal music. Had he tried to re-establish harmony in the instrumental music, it would surely have found a permanent place there. However, it seems to be almost certain that in Indian music simultaneous harmony was not altogether unknown.

9. Harmony in Indian music—When and why lost.

How is it then, that we do not find harmony in the Indian music of comparatively recent days? It will not perhaps be unreasonable to suppose that one of the causes of the disappearance of harmony is the disappearance, owing to the Kurukshetra War, of the old musicians well versed in the art and science of harmony. We have seen how only the other day hundreds and thousands of savants of Europe wellversed in the arts and sciences had to sacrifice themselves in the all-engulfing fire of the late European War In view of this fact, we can safely say that hundreds of musicians were sacrificed in one way or the other in the great Indian War of Kurukshtra.

10. Effect of Cataclysms on Music in India.

It does seem rather strange that the lost art of combined harmony has not been revived or more fully developed since then. But the cataclysms that befell India before the advent of the British into this country largely account for this. It is even considered by several men of eminence and learning as the chief cause of the disappearance of harmony. Writes Sir William Jones: "Had the Indian Empire continued in full energy for the last two thousand years, religion would no doubt have given permanence to systems of music invented. But such have been the revolutions of their government since the time of Alexander the Great that the practice of it [music] seems wholly lost." Mr. Howeiss also very justly observes that unrest is fatal to art. It has been especially the case with Indian music. In this connection we can do no better than quote Captain N. A Willard, a great authority on Indian music. He says: "It will appear reasonable that far from expecting a progressive improvement, we should rather be prepared to anticipate this noble science on the wane in the same proportion as the

decline of its empire and the consequent decrease of knowledge and depravity of the people of this once celebrated country. The root of the venerable tree being sapped, its blossoms are no longer supplied with nourishment by the branches which they were designed to decorate, and must soon decay. The security and stablity proferred from political motives by the British Government to the native chieftains has perhaps materially conduced to render them luxurious and effeminate in a still greater degree than the climate to which those vices are generally attributed ; and these have been the bane of the music of Hindoostan" He further rightly observes that "it is with music, as with every other art or science chiefly ornamental or amusing, that it flourishes best under steady and peaceful Governments."

11. Melody and Harmony—Their relative advantages.

With the decline of music in general it is needless to say that its special branches suffered, and harmony gradually ceased to exist Melody retained its hold on the people because of its many advantages over harmony in the process of composition and execution. Harmony, on the other hand, is difficult in composition and in execution owing to concerted action being necessary in its performance. if a tune is harmonized and has to be played or sung as such, it is obvious that a number of men will have to be requisitioned to play or sing it, and to listen to it requires a still larger audience. A big crowd, a congregational spirit, or at least a large audience is of prime importance to make a harmonized tune a real success. The best field for the display of harmony to its best advantage seems to be a large concourse of men.

—

নানা কথা।

সাঁওতাল জাগরণ—সংবাদপত্রে আমরা দেখিয়া বড়ই সুখী হইলাম যে মেদিনীপুর জেলা কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবে সাঁওতাল প্রভৃতি অনুন্নত জাতিগণের মধ্যে মদ্যপান, বিলাতী কাচের চুড়ি পরা, বিদেশী দ্রব্য ব্যবহার এবং কথায় কথায় প্রকাশ্যভাবে নারীনৃত্য প্রদর্শন তুলিয়া দিবার প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। হায়! কলিকাতায় সমুন্নত (?) অধিবাসী আমরা এ-প্রতিষ্ঠান ও-প্রতিষ্ঠানে অর্থাগমের জন্য বা গ্যালারির মনোরঞ্জনের জন্য মহিলানৃত্যের ব্যবস্থা করিতে অগ্রসর হই! অনুন্নত জাতির মধ্যে এই নব জাগরণে শ্রীযুক্ত ফকিরদাস কুণ্ডু এবং শ্রীযুক্ত রামসুন্দর সিং সহায়তা করিয়াছেন বলিয়া আমরা তাঁহাদিগকে সাদর অভিবাদন করিতেছি।

Y, W, C, A, (১৩৪ কর্পোরেশন ষ্ট্রীট)এ সঙ্গীত বিষয়ক বক্তৃতা ও "জলসা"—গত মঙ্গলবার ১৯ ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৬টার সময় উপরোক্ত স্থানে শিক্ষাবিভাগের পরিচালক শ্রীযুক্ত H. E. Stapleton মহোদয়ের সভাপতিত্বে শ্রীমতী বাণীদেবী "Simultaneous Harmony in Indian Music" সম্বন্ধে একটী সুলিখিত প্রবন্ধ পাঠ করিয়াছিলেন। তাঁহার বক্তব্যের সমর্থনে একটী সঙ্গীতের "জলসা"রও অনুষ্ঠান করিয়াছিলেন। উক্ত জলসায় প্রাচ্য ও প্রতীচ্য উভয়বিধ গীত ও বাদ্যের বন্দোবস্ত হইয়াছিল ; কেবল তাহাই নহে—ঝিঁঝিট খাম্বাজ রাগিণীকে স্বরসম্বাদে বসাইয়া প্রতীচ্য যন্ত্র পিয়ানো ও বেহালা এবং প্রাচ্য যন্ত্র সেতার, এস্রাজ, স্বরদ, বায়া, তবলা প্রভৃতির সাহায্যে বাজাইয়া স্পষ্ট দেখানো হইয়াছিল যে প্রাচ্য রাগরাগিণীকে প্রতীচ্য-প্রচলিত স্বরসম্বাদে সম্বদ্ধ করা যাইতে পারে এবং করিলে খুব ভালই লাগে। প্রাচ্য ও প্রতীচ্য যন্ত্রের সাহায্যে এইভাবে দেশীয় রাগিণীর স্বরসম্বাদ প্রদর্শন ইহাই সর্ব্বপ্রথম। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের গৃহে বালকবালিকাগণ কর্তৃক স্বভাব সঙ্গীত সকল গান করা সর্ব্বপ্রথম প্রচলিত হইয়াছিল। আমরা দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইতেছি এবং গৌরব অনুভব করিতেছি যে, সেই মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথেরই প্রপৌত্রী ও আমাদের শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথের কন্যা শ্রীমতী বাণী দেবী সঙ্গীতের ভিতর দিয়া দেশবিদেশের সুদৃঢ় আন্তর্জ্জাতিক মিলনের এক নবতর পন্থা আবিষ্কার করিলেন। এই অনুষ্ঠান Forward, Englishman প্রভৃতি জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্যবাদী সংবাদপত্রে প্রশংসিত হইয়াছে। আমরা নিম্নে গত ২১শে ফেব্রুয়ারি Forward এবিষয়ে যাহা বলিয়াছেন তাহারই কিয়দংশ উদ্ধৃত করিতেছি—"As a practical illustration of the possibily of introducing harmony into Indian Music a concert had been organised, of which the principal item was the orchestrated piece of Ragini Jhinjhit Khambaj composed by the lecturer herself in which were not only

harmoniously blended the music of the East and the West, but the musical instruments, both Eastern and Western, were also made to contribute to it. This has naver been attempted before. It is to the credit of Miss Tagore, the pioneer in this line, that the orchestra was a splendid success, * * * In fact, it was fully of an international character.

সভায় ইংরাজ ও ভারতীয় অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক ও মহিলা উপস্থিত ছিলেন। শ্রীমতী বাণী দেবীর গৌরবে আদিব্রাহ্মসমাজ গৌরবান্বিত হইল। তাঁহার প্রবন্ধটী আমরা স্থানান্তরে প্রকাশ করিলাম।

মাঘোৎসব—আমরা দেখিয়া আনন্দিত হইলাম যে, বিভিন্ন ব্রাহ্মসমাজের মুখপত্রসমূহে এবারকার আদিব্রাহ্মসমাজের মাঘোৎসবপ্রণালী সমর্থিত হইয়াছে। কিন্তু দুঃখের বিষয়, ঐ সকল পত্রের একটী ভুল ধারণা নিবারিত হয় নাই। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ যে উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মদিগকে বেদীতে বসিতে দেন নাই বলিয়া তাঁহারা বিচ্ছিন্ন হইলেন, একথা ঠিক নহে। প্রত্যুত, উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মগণ এই প্রতিজ্ঞা করিয়া বসিলেন যে উপবীতধারী কেহ বেদীতে বসিতে পারিবেন না। মহর্ষি বলিয়াছিলেন যে উপবীতত্যাগী ব্রাহ্মদল গঠিত হইবার বহু পূর্ব্বাবধি উপবীতধারী পণ্ডিতগণ শত বাধা-বিঘ্ন ও নির্য্যাতনের মধ্যেও যখন ব্রাহ্মসমাজকে ধরিয়া রাখিয়াছিলেন, তখন তিনি উপবীতত্যাগীদের অনুরোধে উপবীতধারীদিগকে ঠেলিয়া ফেলিতে পারেন না। তাঁহার উদ্দেশ্য ছিল যে, উপবীতধারী ও উপবীতত্যাগী উভয় মতের লোকই বেদীতে বসিয়া উপদেশ দিতে পারিলেই সমাজের মঙ্গল। পুরাতন তত্ত্ববোধিনীতে প্রকাশিত উভয় সম্প্রদায়ের পত্রাবলী দেখিলেই আমাদের এই উক্তি সমর্থিত হইবে। আমরা প্রত্যক্ষ করিয়াছি যে, মহর্ষির জীবদ্দশায় একবার মাঘোৎসব উপলক্ষে সম্মিলিত উপাসনার প্রস্তাব হইয়াছিল। যখন অন্যান্য দুই শাখার দুইজন নেতার সহিত ভক্তিভাজন দ্বিজেন্দ্রবাবুর বেদীতে বসিবার কথা হইয়াছিল, তখন উক্ত দুইজন নেতা স্পষ্ট বলিলেন যে দ্বিজেন্দ্রবাবু উপবীতধারী বলিয়া তাঁহার সহিত বসিলে তাঁহাদের অন্তরে উপাসনার ভাব আসিবে না, এবং বসিতে অস্বীকার করিলেন। পরিণামে দ্বিজেন্দ্রবাবু তাঁহার বক্তব্য বেদীর সম্মুখে দাঁড়াইয়া বলিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

উপবীতধারী ও ত্যাগী কে বেদীতে বসিবেন এই সামান্য বিষয়ের উপর মহাবিতণ্ডা সৃষ্টি না করিলে এবং সৃষ্ট হইবার পরেও ব্রাহ্মসমাজের বিভিন্ন শাখা আন্তরিক প্রীতির সহিত পরস্পর মিলিতভাবে শুভ কর্ম্মে অগ্রসর হইলে ব্রাহ্মসমাজ কি দ্রুতগতিতে দেশের কল্যাণসাধনে অগ্রসর হইত এবং এখনও হইতে পারে তাহা বিবেচক ব্যক্তি মাত্রেই উপলব্ধি করিতে পারিবেন।

অশ্লীল বিজ্ঞাপন—সংবাদপত্রে প্রকাশ যে, আয়র্লণ্ডে এক আইন প্রস্তুত হইয়াছে; ঐ আইন অনুসারে জনন-নিয়ন্ত্রণ বা কুৎসিত ব্যাধির চিকিৎসা প্রভৃতির বিজ্ঞাপন প্রকাশ হইলে দণ্ডবিধান হইবে। এদিকে হায় আমরা দাসমনোবৃত্তির ফলে বিলাতী হালফ্যাসনের বশে ঐ সকল বিষয়ের বিজ্ঞাপন প্রবন্ধ প্রভৃতি প্রকাশ করিয়া দেশবাসী বালক-যুবকগণকে মরণের পথে পরিচালিত করিতে দ্বিধা করি না!

থিয়েটার—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে পতিতাগণের সাহায্যে অভিনয়ের বিরুদ্ধে বরিশাল প্রভৃতি কয়েকটী স্থানে যুবকেরা দণ্ডায়মান হইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছে। কিন্তু হায়! কলিকাতায় যুবক ও বালকছাত্রগণকে শতবিধ উপায়ে ঐ সকল থিয়েটারে যাওয়া বড়ই মঙ্গলজনক বলিয়া উৎসাহিত করা হয়। আমরা সকলকে লক্ষ্য রাখিতে বলি যে ইহার ফলে কত প্রকার ভীষণ রোগে আক্রান্ত হইয়া কত ছাত্র চিরদিনের জন্য অকর্ম্মণ্য হইতেছে।

বাল্য-বিবাহ—একটা বিলাতী ঢংয়ের কথা আছে যে শীতপ্রধান দেশে বালক-বালিকার মধ্যে যৌবন বিলম্বে প্রকাশ পায় এবং গ্রীষ্মপ্রধান দেশে সত্বর প্রকাশ পায়। এবিষয়ে আমাদের বহুকাল যাবৎ সন্দেহ ছিল। কিন্তু সম্প্রতি দেখি যে, বিলাতে বালকের ১৪ বৎসর এবং বালিকার ১২ বৎসর বিবাহের ন্যূনকল্প বয়স নির্দ্ধারিত ছিল। ১৯১৪ হইতে ১৯২৬ খৃষ্টাব্দের মধ্যে ১৬ বৎসরের নিম্নে ৩০০ বিবাহ হইয়া গিয়াছে। এইবারে আইনের দ্বারা বালকবালিকা উভয়ের বিবাহের জন্য ন্যূনকল্প বয়স ১৬ বৎসর নির্দ্দিষ্ট করিবার চেষ্টা হইতেছে।

ভারতীয় সঙ্গীত—রেভারেণ্ড শ্রীযুক্ত এ, এ, পপ্লি কলিকাতা রোটারি ক্লাবে ভারতীয় সঙ্গীত সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, তাহা শ্রীমতী বাণী দেবীর বক্তব্যের সহিত খুবই মিলিয়া যায়। তিনি বলেন 'প্রাচ্য ও প্রতীচ্য সঙ্গীতের মধ্যে মূলগত কোন প্রভেদ স্বীকার করা যায় না। যাঁহারা মনে করেন প্রাচ্য ও প্রতীচ্যের ভাবধারার সংঘর্ষণে প্রাচ্য ভাবধারা বিলুপ্ত হইবে, তাঁহারা ভ্রান্ত। প্রতীচ্যের বিরুদ্ধতার সম্মুখে আজ ১৫০ বৎসর প্রাচ্য সঙ্গীত শুধু দাঁড়াইয়া নাই, কিন্তু নিজের আসন সুদৃঢ় করিয়া লইয়াছে। ভারতীয় সঙ্গীত ও সঙ্গীতজ্ঞগণ পাশ্চাত্য সঙ্গীতে অনেক কিছু দান করিতে পারে তাহার সম্ভাবনা আছে। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্য সঙ্গীত দুই সমান্তরাল রেখায় অভিব্যক্ত হইয়াছে—প্রথমটী melodyতে এবং দ্বিতীয়টী স্বরসম্বাদে। পাশ্চাত্য সঙ্গীতজ্ঞগণ যদি ভারতীয় সঙ্গীতে শ্রদ্ধাবান হন, তবে উভয় দেশের মধ্যে

অধিকতর সহানুভূতিপূর্ণ বন্ধুতা দাঁড়াইতে পারে। ভারতীয় শ্রোতাগণের হৃদয় অধিকার করিবার পক্ষে সঙ্গীত অপেক্ষা সুনিশ্চিত পন্থা দ্বিতীয় নাই'।

ভারতীয় দর্শন—ইউরোপীয়গণ আমাদের সঙ্গীত বা দর্শনশাস্ত্রকে প্রশংসা করিতেছেন বলিয়া যে আমরা কৃতার্থতার নিদর্শন স্বরূপে তাঁহাদের প্রশংসাবাদ উদ্ধৃত করিতেছি তাহা নহে, তবে আমরা যাহা জানি তাহার সমর্থনে বিদেশীদের নিকট সাড়া পাইলে আমাদের আনন্দ হয় বলিয়া উদ্ধৃত করিতেছি। সম্প্রতি বুকারেষ্ট বিশ্ববিদ্যালয়ের ডাঃ মার্সিয়া ঈলিয়াড Ph. D. অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ দাস গুপ্তের নিকট যোগ ও তন্ত্র বিশেষভাবে অধ্যয়ন করিতে আসিয়াছেন। তিনি বলেন—"দর্শন ও অধ্যাত্মশাস্ত্রে ভারতের নিকট ইউরোপের অনেক কিছু শিক্ষা করিবার আছে এবং আমার বিশ্বাস যে সময় আসিয়াছে, যখন ইউরোপীয় পণ্ডিতেরা ভারতে আসিয়া তাহার অনুপম চিন্তাধারা সকল আলোচনা করিবেন।"

সমাজসংস্কারের যোগ্যতম প্রণালী—ভারতহিতৈষী শ্রীযুক্ত সি. এফ. আণ্ড্রুজ বলেন যে, তিনি মিসেস জোসেফীন বাটলারের নামে যে সমাজসংস্কারের কার্য্য লণ্ডনে চলিতেছে, সেই সকল কার্য্যে যোগদান করিয়া যে সকল তত্ত্ব শিক্ষা করিয়াছেন, তন্মধ্যে একটী এই যে, "যে সমস্ত পাপ মানুষের অন্তরের গভীর দেশে শিকড় গাড়িয়া আছে, সেগুলিকে কেবলমাত্র সোজাসুজি আক্রমণ করিয়া উচ্ছেদ করিতে গেলে সাফল্যের সম্ভাবনা নাই; সোজাসুজি আক্রমণের সঙ্গে বাহির হইতে চরিত্রগঠনমূলক শিক্ষা দেওয়াও আবশ্যক। শরীর ও মনের স্বভাবত স্বাস্থ্যকর যে সকল কর্ম্মে মানুষের বিকৃত ও রুগ্ন মনোবৃত্তিসকল প্রবল হইতে পারে না, সেই সকল কার্য্যই পাপের ধ্বংসসাধনে সর্ব্বাপেক্ষা উপযোগী। দেখা গিয়াছে যে, লণ্ডনের চারিধারে বহু উন্মুক্ত বিস্তৃত খেলিবার স্থান খুলিয়া দিবার পর যুবকদের জীবনের ধারা অনেক বদলাইয়া গিয়াছে। দুর্ব্বল ও নির্দ্দোষকে রক্ষা করাই আইনের মুখ্য উদ্দেশ্য হওয়া উচিত। তাই যে সকল আইন বালকবালিকাদের রক্ষার জন্য প্রণীত হয়, সেইগুলিই প্রকৃতপক্ষে শ্রেষ্ঠতম আইন। বালকবালিকাদের ভিতর প্রথম অপরাধীদের সঙ্গে একটু সহানুভূতির সঙ্গে সাহায্য করিলে বিশেষ সুফল হয়। এই সমস্ত শিশুজীবনের মূল পর্য্যন্ত বিষাক্ত হইবার পূর্ব্বে চেষ্টা করিলে তাহাদিগকে অনেক পরিমাণে রক্ষা করা যায়।" তাঁহার মতে হোলি প্রভৃতি উৎসবগুলিকে ব্যায়াম প্রভৃতির সাহায্যে স্বাস্থ্যকর করিয়া তুলিলে মঙ্গল হইতে পারে। ('বাংলার কথা' ৯. ২. ২৯) পরলোকগত শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত প্রতাপচন্দ্র মজুমদার এই তত্ত্বটী বহুপূর্ব্বেই উপলব্ধি করিয়া তদানীন্তন ছোটলাটের সঙ্গে একযোগে এবং পূজনীয় শ্রীযুক্ত গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়ের বিশেষ সহযোগিতায় ঐ তত্ত্বের প্রতি দৃষ্টি রাখিয়া Calcutta Society for Higher Training নাম দিয়া একটী সভা খুলিয়াছিলেন। ঐ সভাই পরে Calcutta University Instituteএ পরিণত হইয়াছে। ছোটলাট নিজের খরচে মধ্যে মধ্যে ঐ সভার সভ্যদিগকে ষ্টীমার ভ্রমণে লইয়া যাইতেন এবং ছোটলাট-পত্নী স্বয়ং তাঁহাদিগকে জলযোগ করাইতেন। দুঃখের বিষয়, Calcutta University Instituteএর সভ্যগণ উহার এই পূর্ব্ব ইতিহাসটুকু ভুলিতে বসিয়াছেন; তাহা না হইলে তাঁহাদিগকে ইহার জন্মোৎসব উপলক্ষ্যে ঐ সকল প্রতিষ্ঠাতাদের নাম সশ্রদ্ধভাবে উল্লেখ করিতে দেখি না কেন?

সাধনা দেবীর মৃত্যু—১৬ই ফাল্গুনের সঞ্জীবনীতে সাধনা দেবীর মৃত্যু উপলক্ষে আবেগময় জ্বালাময় প্রবন্ধ পড়িতে পড়িতে আমাদের শরীর কণ্টকিত হইয়া উঠিতেছিল। পিতৃমাতৃহীনা সাধনা ১২ বৎসরের বালিকা হইলেও খুলনার প্রদর্শনী উপলক্ষ্যে রৌদ্রের তাপে অসুস্থ হইবার সম্ভাবনা সত্ত্বেও থিয়েটারের বিরুদ্ধে নির্ভীকচিত্তে পিকেটিং করিতে গিয়া জ্বরবিকারে আক্রান্ত হইলেন এবং কয়েক দিন ভুগিয়া জগজ্জননীর ক্রোড়ে আশ্রয় লাভ করিলেন। স্পষ্টাক্ষরে পণপ্রথার ফলে আত্মবলি দিতেছেন বলিয়া স্নেহলতার প্রাণ দিবার ফলেও যখন এই দুর্ভাগ্য দেশ হইতে পণপ্রথা নির্ম্মূল হইল না, তখন সাধনার আত্মবলিদানের ফলে পতিতা রমণীদের সাহায্যে চালিত থিয়েটারগুলি যে উঠিয়া যাইবে, তেমন দুরাশা আমাদের নাই; বিশেষত আমাদের নেতৃস্থানীয় লোকেরা যখন সেই সকল থিয়েটারে গিয়া এবং অন্যান্য নানা প্রকারে সেগুলিকে তুলিয়া ধরিতে কিছুমাত্র দ্বিধা করেন না, বরঞ্চ এবিষয়ে জনমতকে তুচ্ছ করিবার গর্ব্ব অনুভব ও প্রকাশ করেন এবং আমরা সেই সকল নেতাগণের বিরুদ্ধে একটী কথা বলিতেও সাহস করি না!

উপাধিলাভ—আমাদের পরিচিতগণের মধ্যে নিম্নলিখিত ব্যক্তিগণ বন্ধনীতে লিখিত উপাধি লাভ করিয়াছেন—পূজ্যপাদ শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথের কনিষ্ঠ জামাতা শ্রীযুক্ত নগেন্দ্রনাথ গাঙ্গুলি (C. I. E.)—ইনি কৃষিকমিশনের অন্যতর সভ্য ছিলেন; ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেনের পুত্র শ্রীযুক্ত নির্ম্মলচন্দ্র সেন (C. B. E.)—ইনি লণ্ডনস্থ ভারতীয় হাই কমিশনের আফিসের শিক্ষাবিভাগে পরামর্শদাতা ছিলেন; ভবানীপুর ব্রাহ্মসমাজের সম্পাদক শ্রীযুক্ত সিতিকণ্ঠ মল্লিক মহাশয়ের পুত্র শ্রীযুক্ত মনোরঞ্জন মল্লিক (রায় বাহাদুর)—ইনি হাইকোর্টের আডভোকেট; শ্রীযুক্ত চারুচন্দ্র সিংহ (রায় বাহাদুর)—ইনি হাবড়ার গবর্ণমেণ্ট প্লীডার; শ্রীযুক্ত রাধাকান্ত ঘোষ (রায় বাহাদুর)—ইনি পূর্ণিয়ার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসনজজ; রায় সাহেব গোপালচন্দ্র গাঙ্গুলি (রায় বাহাদুর)—ইনি কটকের রাভেনশ কলেজের ইংরাজীর অধ্যাপক ছিলেন; শ্রীযুক্ত কালীপ্রসন্ন বিশ্বাস (রায় সাহেব)—ইনি বেঙ্গল ও নর্থ-ওয়েষ্টার্ণ রেলওয়ের প্রেস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট—ইনি তত্ত্ববোধিনী গ্রাহকগণের নিকট সুপরিচিত। আমরা সকলকেই আন্তরিক অভিনন্দন জানাইতেছি।

গ্রন্থপরিচয়।

উদ্বোধন—পৌষ ১৩৩৫।

'শ্রদ্ধাঞ্জলি' শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক সার জগদীশচন্দ্র বসুর প্রতি অর্ঘ্যাঞ্জলি। "কথাপ্রসঙ্গে" লেখক ইউরোপীয় মনীষীগণের কথায় ভারতের শ্রেষ্ঠতা প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। পরের কথায় নয়, আজ

নিজের কাজে ভারত আবার মাথা তুলিয়া দাঁড়াইতে উদ্যত। "বিগত শতাব্দীর ধর্ম্মের ক্রমবিকাশ" প্রবন্ধে হিন্দুসমাজের বিগত শতাব্দীতে ধীরে ধীরে যে পরিবর্ত্তন সাধিত হইয়াছিল, তাহার সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দেওয়া আছে। স্বভাবতই লেখক স্বামী নিখিলানন্দ তাঁহার অবলম্বিত রামকৃষ্ণ পরমহংসদেবের সম্প্রদায় সম্বন্ধেই বেশী করিয়া বলিয়াছেন। প্রবন্ধটী "ব্রাহ্মধর্ম্মের শতবার্ষিকীতে পঠিত" হইলেও উহাতে ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কিছুই বলা হয় নাই বলিলেও অত্যুক্তি হইবে না। "জীবনের হিসাব নিকাশে" লেখক দেখাইয়াছেন যে, আমরা জীবনটাকে লইয়া কিরূপ ছিনিমিনি খেলা খেলিতেছি—"জমার ঘর শূন্য এবং খরচের দিকটা ভারী"—খুব ঠিক কথা। I. C. S. শ্রীবীরেন্দ্রকুমার বসুর শিক্ষকদিগের প্রতি অভিভাষণ খণ্ডশ বাহির না করিয়া সম্পূর্ণ আকারে বাহির করিলেই রসগ্রহণে সুবিধা হইত।

শ্রীশ্রীবিষ্ণুপ্রিয়া গৌরাঙ্গ—অগ্রহায়ণ ১৩৩৫—সম্পাদক শ্রীপাদ রসিকমোহন বিদ্যাভূষণ ও শ্রীপাদ হরিদাস গোস্বামী প্রভু।

কৃপা ও সঙ্গ প্রবন্ধে 'আস্বাদনের' যে ব্যাখ্যা দেওয়া হইয়াছে, তাহা আত্যন্তিক মানবীকরণ। "উপদেশ-শতকে" ভক্তিসাধক অনেক ভাল উপদেশ আছে।

সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকা—অগ্রহায়ণ—১৩৩৫।

প্রথম প্রবন্ধে শ্রীবীরেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী তানসেনের বংশধরগণের ব্যবহৃত ঝালা ও ঠোক সংগ্রহ করিয়া প্রকাশ করিয়াছেন—বিশেষজ্ঞদিগের উপকারে আসিবে। "সঙ্গীতে অনুশীলনের" ২য় সংবাদে লেখক দেখাইয়াছেন যে, কতকগুলি গানে "নায়ক গোপাল" উল্লিখিত থাকিলেও তাহা সুপ্রসিদ্ধ "নায়ক গোপালের" রচিত বলিয়া ধরা যাইতে পারে না। সে তো ঠিক কথা। উড়িষ্যায় গোপাল নায়ক নামে এক ব্যক্তিকে আমরা জানি। সে যদি কোন গানে নিজের নাম বসায়, তবে সে গানটীকে আসল গোপাল নায়ক রচিত ধরা যায় না। এদেশে এই প্রকার কি সাহিত্যে কি সঙ্গীতে অনৈতিহাসিক অনেক উদোর বোঝা বুদোর ঘাড়ে চাপানো আছে। সঙ্গীতদামোদরের মূল শ্রীশরচ্চন্দ্র চট্টোপাধ্যায় ক্রমশ প্রকাশ করিতেছেন। কিন্তু মনে হয় না যে উহা বিশুদ্ধ হইতেছে। শরৎ বাবু যদি যথারীতি পাঠান্তর পূর্ব্বক এই দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থের উদ্ধার করেন, তবে সঙ্গীত সম্বন্ধে বিশেষ উপকার হয়। সেতার শিক্ষার বর্ত্তমান কিস্তিতে 'ইমন শ্লথ ত্রিতালী' বাহির হইয়াছে। 'শ্লথ-ত্রিতালী' অপেক্ষা ঢিমা তেতালা নামটী রাখিলেই তো ভাল হইত। শিক্ষক এক স্থানে লিখিতেছেন যে, "আকার-মাত্রিক স্বরলিপিতে বিরামের সঙ্কেত থাকা আবশ্যক"—আছে বলিয়াই আমরা জানি। শ্রীব্রজেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী এবারে "শ্রীরাগপরিচয়" দিয়াছেন—সুন্দর হইয়াছে; কিন্তু তাঁহার উক্তিসমূহ কোথায় আছে লিখিয়া দিলে সাঙ্গীতিক গবেষকদিগের উপকার হয়। সেই কাদের বক্স "শ্রীহিন্দোল"এর পরিচয়ে বলিয়াছেন—"আমি ইহা অতি পুরাতন গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছি, * * * আশা করি ইহা * * * নূতন বলিয়া আনন্দের বিষয় হইবে।" শরৎ বাবুর "বাদ্যসঙ্গীত" ভালই হইতেছে। প্রসঙ্গত বলা যায় যে, আকার-মাত্রিক স্বরলিপি দাঁড়ি-মাত্রিক অপেক্ষা লিখিতে সুবিধাজনক। শ্রীউপেন্দ্রচন্দ্র সিংহের 'সঙ্গীত বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা' সুন্দর লাগিল। আমাদের মনে হয় আলোচ্য বিষয়গুলির এক-একটী heading দিলে ভাল হয়। শরৎবাবু হারমোনিয়ম শিক্ষাও খুব সরল করিয়া লিখিতেছেন। উপেন্দ্র বাবু "পিঙ্গলসূত্র সার" ধারাবাহিক প্রকাশ করিতেছেন। আমরা শুনিয়াছি এই গ্রন্থের একটী প্রাচীন টীকা আছে। উপেন্দ্র বাবু যদি এই টীকাসহ সূত্র দিয়া প্রথমত তাহার অর্থ ও পরে তাহার ভাব বেশ খুলিয়া বলেন তো ভাল হয়। অনেকস্থলে ভাব যাহা দিয়াছেন তাহা বুঝিয়া উঠা কঠিন। এইরূপ দুর্ব্বোধ্যরূপে লিখিবার কারণে "সঙ্গীত-প্রকাশিকায়" প্রকাশিত "রাগবিবোধ" অপাঠ্য হইয়া উঠিয়াছিল। সঙ্গীতবিজ্ঞানপ্রবেশিকার বর্ত্তমান সংখ্যার প্রকাশিত গানগুলি দেখিয়া মনে হয়, ধ্রুপদ ও প্রাচীন খেয়াল প্রভৃতি সংগ্রহ করিতে পারিতেছেন না—কারণ কি? অধ্যাপক শ্রীকালিদাস নাগ যখন ভারতীয় নৃত্য-কলাপ্রসঙ্গে ভারতীয় নাট্যশাস্ত্র লিখিতেছেন, তখন সেই শাস্ত্রটী সমগ্রভাবে মূল ও অনুবাদসহ প্রকাশ করিলে ভাল হইত। আমি ঠিক জানি না, এক একটী শ্লোকের পূর্ব্বে প্রদত্ত সংখ্যাগুলি শাস্ত্রোক্ত শ্লোকের পর পর সংখ্যা কি না। প্রদত্ত শ্লোকগুলির অনুবাদ ভালই হইতেছে।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা—আমরা দেখিয়া সুখী হইলাম যে, পত্রিকা প্রবন্ধগুণে দিনে দিনে অধিকতর জনপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে। সম্প্রতি দেওঘর হইতে একটী ভদ্রলোক তাঁহার কোন বন্ধুকে পত্রিকার গ্রাহক হইবার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করিয়া এক পত্রে (১৭-১২-২৮) লিখিতেছেন—"তুমি আজকালের মধ্যে ক্ষিতীন্দ্রবাবুর সহিত সাক্ষাৎ করিবে। ৩০।৩১ বৎসর পরে দেশে আসিয়া গত বৎসর এখানকার লাইব্রেরীতে তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা প্রথম দেখিতে পাই। প্রথম দর্শনেই কাগজখানির উপর যথেষ্ট ভক্তির উদয় হয়। কলিকাতায় কাগজ প্রায় দেখিতে পাইতাম না—এখানে আসিয়া পুনরায় লাইব্রেরীতে ঐ কাগজ দেখিতে পাইলাম। কার্ত্তিক মাসের খানি আগাগোড়া পড়িলাম—একবার, দুইবার, তিনবার, তাহাতেও আশা মিটিল না। লাইব্রেরীর কাগজ ফেরত দিতে হইল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে স্থির করিয়াছি, কাগজখানির গ্রাহক হইব। * * * বাস্তবিক আমার মত লোকের কাছে কার্ত্তিক মাসের প্রবন্ধগুলি অমূল্য রত্ন। আমাদের মত নিত ক্রিয়াবর্জ্জিত (লোক) ১ম প্রবন্ধের উপাসনাটী (অঞ্জল) ত্রিসন্ধ্যায় না পারিলে (অন্তত) ১বার করিয়া যদি প্রত্যহ একমনে উচ্চারণ করি, তাহা হইলেই বোধ হয় তাঁহার দয়ায় বঞ্চিত হইব না, আমার এই ধারণা হইয়াছে।" তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার অনেক প্রবন্ধ বিভিন্ন মাসিক-পত্রে উদ্ধৃত হইতেছে দেখিয়া সুখী হইলাম।

ভক্তি—অগ্রহায়ণ, ১৩৩৫।

'প্রার্থনা' বৈষ্ণবলিখিত না বলিলে ভাবিতে পারিতাম না যে ইহা কোন ব্রহ্মোপাসকের লিখিত নয়। "সত্যের শিক্ষা" সম্বন্ধেও আমাদের ঐ কথা। এই প্রকার অসাম্প্রদায়িক ভাবের দিকে বিভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায় বহুই

অগ্রসর হইবেন, ততই দেশ একতার দিকে সহজেই অগ্রসর হইবে। "শ্রীশ্রীঅমিয় নিমাইচরিত" বেশ মিষ্ট লাগিল। তবে উহার শেষে "স্তুতি" উপলক্ষ্যে যাহা উদ্ধৃত করা হইয়াছে, তাহা একটু বেশী দীর্ঘ লাগিল। "কৃতজ্ঞতা" বিষয়ে ভুলুয়া বাবার উপদেশে ব্রাহ্মণের উক্তিটী এ যুগে খুব খাটে—"যে আপনার প্রাণ বাঁচাইয়া অপরকে পরীক্ষা করিতে বসে, সে কখনও প্রকৃত পরীক্ষক হইতে পারে না; যে নিজের প্রাণ বাঁচাইয়া কোন লোকহিতকর বা দেশহিতকর কর্ম্ম করিতে বসে, সেও কখন কৃতকার্য্য হয় না।"

বীরভূমি—আশ্বিন—সম্পাদক শ্রীকুলদাপ্রসাদ মল্লিক।

"মহাশক্তির আরাধনা" শারদীয় পূজার উদ্বোধনসূচক দার্শনিক প্রবন্ধ—মহাশক্তি কি, শারদীয় পূজার বিভিন্ন অনুষ্ঠানের মূল তত্ত্ব কি, এই সমস্ত সুনিপুণ ভাবে বোঝান হইয়াছে। বরিশাল হিন্দুশাখার পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সত্যচরণ শাস্ত্রী মহাশয়ের অভিভাষণ আমরা ইতিপূর্ব্বেই তত্ত্ববোধিনী পত্রিকাতে উদ্ধৃত করিয়াছি।

অর্চ্চনা—সম্পাদক শ্রীকেশবচন্দ্র গুপ্ত এম-এ-বি-এল ও শ্রীকৃষ্ণদাস চন্দ্র।

'শঙ্কর ও চৈতন্য'—শ্রীনাগাজী—প্রবন্ধের শেষ সিদ্ধান্ত এই যে, শঙ্কর আমাদের বহুত্বের মধ্যে একত্বের (unity in diversity) এবং চৈতন্য আবার আমাদের একত্বের মধ্যে বহুত্বের (diversity in unity) সন্ধান দিয়াছেন। রাহু—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়—রাহু সম্বন্ধে সুলিখিত জ্যোতিষিক প্রবন্ধ। দুইখানি প্রাচীন সংবাদপত্র—শ্রীসুরেন্দ্রলাল মিত্র। জ্ঞানান্বেষণ ও Bengal Spectater দুইখানি সংবাদপত্রের কৌতূহলজনক ইতিহাস। এইরূপ পুরাতন বিষয়ের ইতিহাস সুরক্ষিত হইলে খুবই ভাল কথা। সংগ্রহ ও সঙ্কলন—সুনির্ব্বাচিত; ঊনবিংশ শতাব্দীর বাংলা গীতিকবিতা—শ্রীবিশ্বপতি চৌধুরী এম-এ সুপাঠ্য। চা'র পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধা—ইহাতে চায়ের পরিবর্ত্তে অশ্বগন্ধার পাতার ব্যবহার সমর্থিত হইয়াছে। আমাদেরও মনে হয়, অশ্বগন্ধা ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলে কুলিদের উপর চা-করদিগের অত্যাচার কমিতে পারে। বটক্ষীরের উপকারিতা—ইহা যুবকদের বিশেষ উপকারে আসিবে।

তত্ত্বকৌমুদী—১ পৌষ—সম্পাদক শ্রীবরদাকান্ত বসু বি-এ।

"ব্রাহ্মসমাজ সম্বন্ধে কয়েকটী কথায়" আছে—"ধর্ম্মসংস্থাপনার্থায় সম্ভবামি যুগে যুগে—এই অমর আশাবাণী অনুযায়ী সেই বিপদের নাথ, সেই ত্রাণকর্ত্তা মধুসূদন ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে ইহারই অন্তরালে দেখা দিয়েছিলেন।" "মধুসূদন" শ্রীকৃষ্ণ যে ব্রাহ্মসমাজকে আশ্রয় করে ইহারই অন্তরালে দেখা দিয়েছিলেন, ইহা আমাদের নিকটে নূতন কথা।

মানসী ও মর্ম্মবাণী—পৌষ, ১৩৩৫;

পণ্ডিতপ্রবর শ্রীযুক্ত প্রমথনাথ তর্কভূষণের উপাদেয় প্রবন্ধ—"শৈবধর্ম্ম" ৫ম কিস্তি চলিয়াছে। এরূপ উপাদেয় প্রবন্ধের কিস্তিগুলি আর একটু বেশী করিয়া বাহির হইলে ভাল হয়। অতীন্দ্রিয়দর্শন প্রবন্ধে লেখক নিরাকার ব্রহ্মের আকারগ্রহণ সপ্রমাণ করিতে পারিয়াছেন বলিয়া মনে হইল না। আমার মনে হয়, ভগবানের বিধানে কোন অতীন্দ্রিয় আত্মা প্রবন্ধোক্ত ব্যক্তিকে কি কারণে জানি না, দর্শন দিয়াছিলেন এবং অগ্নিদাহ হইতে রক্ষা করিয়াছিলেন। শ্রীযুক্ত মন্মথনাথ ঘোষের "রঙ্গলালের" ৭ম পরিচ্ছেদ চলিতেছে—তাঁহার লেখনীতে ফুলচন্দন পড়ুক। 'আপেক্ষিকতাবাদের স্থূল কথা' এবারে শেষ হইল। বড়ই সুন্দর ভাবে লিখিত। আশাকরি লেখক শ্রীসুরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় ইহা: পুস্তিকাকারে প্রকাশ করিবেন। শ্রীদলিলউদ্দীন আহম্মদ "ঐতিহাসিক সত্যোদ্ধার"এ জাহাঙ্গীর কর্ত্তৃক নূরজাহানকে তাঁহার স্বামীর হত্যাসাধনপূর্ব্বক স্বায়ত্ত করার কলঙ্ক মোচনের চেষ্টা হইয়াছে দেখিয়া বড় সন্তুষ্ট হইলাম। প্রবন্ধটী পড়িতে আরম্ভ করিলে শেষ না করিয়া থাকা যায় না। কথাটী ঠিক বলিয়াছিলেন যে, একটী লোক ব্যতীত জাহাঙ্গীরের সমসাময়িক লোক যখন এই বিষয় উল্লেখ করেন নাই, তখন অন্ধকূপহত্যা যে প্রকার হলওয়েল সাহেবের কল্পনাপ্রসূত, ইহাও বোধ হয় জাহাঙ্গীরের উপর কোন কারণে বিরক্ত থাফি খাঁর কল্পনাপ্রসূত। শ্রীকুমুদবন্ধু সেন "গিরিশ-স্মৃতি" লিখিতেছেন। মনোরঞ্জক। বঙ্গবাসীতেও "গিরিশ-স্মৃতি" ধারাবাহিকরূপে বাহির হইতেছে। আমাদের মনে হয়, গিরিশ বাবু সম্বন্ধে সমস্ত তথ্য সংগ্রহ করিয়া একখানি ভাল জীবনী প্রকাশ করা উচিত। শ্রীবীণাপাণি দেবীর "পুরুষ বা দ্রষ্টা" প্রবন্ধ মাত্র মানসী ও মর্ম্মবাণীর চার কলম ব্যাপী—এত অল্প পরিসরে সাংখ্যতত্ত্ব ফুটাইয়া তোলা অসম্ভব। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণের "সাধু লালাজী" লালা লাজপত রায়ের সংক্ষিপ্ত জীবনালোচনা বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের নিকট লালাজী সম্বন্ধে কিছু নূতন কথা পাইলে সুখী হইতাম। অমূল্য বাবুর আর একটী প্রবন্ধ—অধ্যাপক যোগীন্দ্রনাথ সমাদ্দার—সংক্ষিপ্ত হইলেও অধ্যাপক সম্বন্ধে অনেক জ্ঞাতব্য কথা সন্নিবিষ্ট আছে।

বঙ্গলক্ষ্মী—পৌষ, ১৩৩৫।

বঙ্গলক্ষ্মীর ন্যায় পত্রিকায় চুনবাধার ন্যায় চিত্রের সার্থকতা দেখি না। রাজা রামমোহন রায়ের "পবিত্র কেশগুচ্ছ" লক্ষ্য করিয়া ডাঃ রায় শ্রীচুণীলাল বসু বাহাদুর ৺রাখালদাস হালদার সম্বন্ধে অনেক কথা বলিয়াছেন, আমরা তাহা আগামী বারে তত্ত্ববোধিনীর পাঠকদিগকে উপহার দিব ইচ্ছা করিতেছি। অনেকদিন পরে শান্তিপ্রদ একটী কবিতা পড়িলাম—শ্রীকামিনী রায় লিখিত "তীর্থপরিক্রমা"। ৺সরোজনলিনী দত্ত লিখিত 'জাপানে বঙ্গনারী' চলিতেছে। শ্রীহিমাংশুপ্রকাশ ভাদুড়ী "বিলাতের ভালমন্দ এমনভাবে লিখিয়াছেন যে, পড়িলে মনে হয় দেশ ছাড়িয়া সকলেই বিলাতের বাসিন্দা হই। দুইচারিটী যাহা মন্দ বলিয়াছেন, সেটী এত ক্ষুদ্রাকৃতি যে নজরে পড়িতে চায় না। আসল কথা বিলাতেরও ভাল আছে, নচেৎ ইংরাজেরা এত বড় একটা জাতিতে দাঁড়াইতে পারিত না; আর ভারতেরও সহস্র সহস্র বৎসরের culture এর রসে লালিত এমন অনেক বিষয় আছে, অন্য দেশ যাহার চরণস্পর্শ করিতে সাহস করে না। "শিশুপালন" সম্বন্ধে ডাঃ শ্রীনগেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য যাহা লিখিয়াছেন, তাহা প্রত্যেক বঙ্গরমণীর জানা কর্ত্তব্য। আমরা মনে করি

এই সকল বিষয় লইয়া লিখিত পুস্তকাদি প্রকাশ করা সরোজনলিনী দত্ত সমিতির অন্যতর প্রধান কর্ত্তব্য। বঙ্গ-মহিলা কাগজখানি বাংলাভাষায়, তাহাতে—Our Association নিবন্ধে সমিতির বিবরণ ইংরাজীতে প্রকাশ করা সঙ্গত বোধ করি না।

সুবর্ণবণিক সমাচার—পৌষ, ১৩৩৫।

"মানবজীবনের" বক্তব্য সুস্পষ্ট হইয়া উঠিয়াছে বলিয়া মনে হয় না। ঈশ্বর সম্বন্ধে লেখক বলিয়াছেন —"যিনি এই বিশ্বমানবতার মধ্য দিয়া আত্মসম্পূর্ত্তি লাভ করেন"—ইহার মর্ম্ম হৃদগত হইল না। শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ "প্রাণিবিজ্ঞান" লিখিতেছেন। Evolution অর্থে বিবর্ত্তন করিয়াছেন। কিন্তু বহুপূর্ব্বে পূজ্যপাদ ৺দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্ববোধিনী পত্রিকায় ভালরূপে প্রমাণ করিয়াছিলেন যে Evolutionএর অনুবাদ অভিব্যক্তি—বিবর্ত্তন কিছুতেই হওয়া উচিত নহে। বিবর্ত্তনবাদ উপচ্ছেদে যা subh adএ ভারতবাসীর পক্ষে স্বাভাবিক দার্শনিক বিচারে নামিয়াছেন—নামিয়া অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে জটিলতা আনিয়াছেন। দ্বিতীয় উপচ্ছেদে "মানবের ক্রমবিকাশ" সবেমাত্র পদার্পণ করিয়াছে—দেখা যাক্‌। হেমেন্দ্রবিজয় বাবুর "তৃষ্ণা" বেশ লাগিল। উপেন্দ্রনাথ সেন মহাশয়ের "আমাদের আর্থিক অবস্থা"য় একটী সার কথা বলা হইয়াছে—"বঙ্গদেশে সঙ্ঘশক্তির এবং অন্যান্য বিশ্বাসের অভাবে বড় বড় কারবার নষ্ট হইয়া গিয়াছে।" আলোচ্য সংখ্যায় কবিবর রসময় লাহার মৃত্যুসংবাদ দেখিয়া সন্তপ্ত হইলাম। তাঁহার রসপূর্ণ কবিতা যিনি পড়িয়াছেন, তিনিই তাঁহার অন্তরের রস উপভোগ করিয়াছেন। শতবিধ অভাবে আমাদের দেশে কত genius যে অকালে অদৃশ্য হইয়া পড়িতেছে, রসময় বাবু তাহার অন্যতর দৃষ্টান্ত।

মাতৃমন্দির—পৌষ ১৩৩৫।

'নারীর স্বাস্থ্যনাশের বয়স' প্রবন্ধে নরনারীর জ্ঞাতব্য অনেক ভাল কথা আছে। সুখের বিষয় অনেক কাগজেই আজকাল স্বাস্থ্যরক্ষাবিষয়ে আলোচনা হইতেছে। "আলো" কবিতাটী বড় মিষ্ট লাগিল। শ্রীবিজয়ভূষণ ঘোষ চৌধুরী "কামরূপে আদ্য-ঋতু বিধি"তে আসাম-প্রদেশের একটী সামাজিক প্রথা বর্ণনা করিয়াছেন। "জীবনের আলো" হইতে ডাঃ শ্রীরমেশ চন্দ্র রায় লিখিত "ছেলে মানুষ করার কথা" উদ্ধৃত হইয়াছে। স্বাস্থ্যরক্ষা সম্বন্ধে অনেক কথা আছে। "গ্রামোফোন" প্রবন্ধ পাঠ করিলে বালকেরা ঐ সম্বন্ধে অনেক কথা বেশ সহজে বুঝিতে পারিবে। সঙ্কলনে পেঁপে ও লেবুর বিষয় উদ্ধৃত হইয়াছে। কোন পাঠক বা পাঠিকা এই দুইটীর চাষ করিয়া অভিজ্ঞতা প্রকাশ করিলে ভাল হয়।

প্রবর্ত্তক—অগ্রহায়ণ ১৩৩৫।

'দীক্ষাতত্ত্ব'—"ভারতের বীরত্ব শুধু কাহিনী নয়, উপকথা নয়, সে ভারত ফিরাইয়া আনার একদল তপস্বীর আজ প্রয়োজন হইয়াছে।" ... "এই (দীক্ষায় আত্মচৈতন্যকে উদ্বুদ্ধ করায়) অগ্নিমন্ত্রে দীক্ষা লইতে হইবে, জড়ত্বের আবরণ অপসারিত করিয়া আত্মার আনন্দে বিশ্বকে নূতন করিয়া গড়িয়া তুলিতে হইবে।" এক কথায়, ভাবরবেদ্য আনন্দস্বরূপ ভগবানকে কেন্দ্র করিয়া, তাঁহার আদেশকে সকল বিষয়ের ভিত্তি করিয়া তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনে প্রাণমন ঢালিয়া দিতে হইবে, তবেই স্বরাজ ও বিশ্বরাজ তো করতলগত। "নারায়ণীর মহাপ্রয়াণ" দুঃখশোকের উচ্ছ্বাসনায় ভরা। "দুর্গা" প্রবন্ধের ২য় কিস্তি—অমূল্য বাবু নিজের ক্ষেত্রে আছেন—দুর্গাপূজাসম্বন্ধীয় অনেক কথা জানাইয়াছেন। "বাংলার অভিব্যক্তি"র এক কিস্তি—বিপিনবাবু ইহাতে প্রধানত স্বামী বিবেকানন্দেরই মত সুবিবৃত করিয়াছেন। "বিপ্লবী ব্রহ্মবান্ধবের এক কিস্তিতে শ্রীগলাই দেবশর্ম্মা ঠিক বলিয়াছেন যে "দাসত্ব বন্ধন যাহারা মোচন করিবে, তাহারাই দাসভাবাপন্ন" এবং সেই কারণে "জাতীয়তা করিতে গিয়া সহজেই আমরা বিজাতীয়তা করিয়া ফেলি"। 'বন্ধন ও মুক্তি'র অষ্টম পরিচ্ছেদে আজকাল বিবাহ সম্বন্ধে তরুণ-সম্প্রদায়ের মনোভাব সুবিদিত হইয়াছে। অশ্লীল ছবি ও সাহিত্য সম্বন্ধে যাহা বলা হইয়াছে, তাহা আমাদের নিকটে বড়ই সুসঙ্গত মনে হইল। অশ্লীলতাসমর্থক একটী ভদ্রলোক নীরদের নিকট খুব উত্তেজিতভাবে নারীপুরুষের মাঝে অবাধমিলন ও প্রণয়ের সপক্ষে বক্তৃতা করিতেছিলেন। কিন্তু নীরদ যেই তাঁহাকে ইঙ্গিত করিল "আপনি ত স্ত্রীকে বাড়ী রেখে এসেছেন, তিনি বোধ হয় অবাধ মিলনের সুযোগ এতক্ষণ ছাড়েন নি।" তখন সেই ভদ্রলোক বলিলেন—"অবশ্য আমার অনুপস্থিতিতে তাঁর এইরূপ আচরণ নিন্দার্হ সন্দেহ নাই!" এই উপলক্ষে আমরাও দুই চারিটী বক্তব্য বলিব। মহিলানৃত্য দেখিয়া যাঁহারা আমোদ উপভোগ করিতে এবং তাহা সমর্থন করিতে অগ্রসর, তাঁহাদের অনেকের সঙ্গে আমরা আলোচনা করিতে গিয়া দেখিয়াছি যে, তাঁহারা নিজের পরিবার ছাড়িয়া দিয়া অপরের পরিবারস্থ মহিলাদিগের নৃত্য সমর্থন করিতে প্রবল উৎসাহ সহকারে উদ্যত। একটী সত্য ঘটনা এইখানে উল্লেখ করি—আশ্চর্য্য এই যে, নীরদের উক্তির সঙ্গে আমার উক্তি এক হইয়া গিয়াছিল। হগ সাহেবের বাজারে আমার একটী পরিচিত ব্যক্তির পোষ্টকার্ড ছবির দোকান ছিল। শুনিয়াছিলাম, দোকানে প্রচুর লাভ হইত। সহসা দেখি, সেই ব্যক্তি আমার নিকট দুইশত টাকা ধার চাহিতে আসিল। আমি অবাক হইয়া কারণ জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক জিজ্ঞাসাবাদের পর বুঝিলাম যে দোকানে বাহিরে নামেমাত্র পোষ্টকার্ড বিক্রয় হইলেও প্রচ্ছন্নভাবে অতি ভীষণ অশ্লীল ছবি ও পুস্তক বিক্রয় করা হইত। একদিন একটী ভদ্রলোককে একটী অশ্লীল ছবি দিবার কথা ছিল। গোয়েন্দা খবর পাইয়া সেইদিন সমস্ত জিনিসপত্র লইয়া চলিয়া গেল। কি প্রকার অশ্লীল পুস্তক কোথায় বিক্রয় হয় জানিবার জন্য তাহার সহিত গল্প লাগাইলাম। শুনিলাম, তাহার মাসিক খরচ প্রায় ২০০৲ টাকা অশ্লীল পুস্তক বিক্রয় ও circulating libraryর ন্যায় circulationএর ব্যবস্থা করিয়া তাহার এই টাকা মাসে উঠিত!! অনেক আশা ভরসা ও আশ্বাসদানের পর আমাকে দুই-একটী ছাপানো ও দুই একটী হাতে লেখা বই পড়িবার জন্য দিল। মুদ্রিত ও হস্তলিপি উভয়বিধ পুস্তকেরই মূল উদ্দেশ্য পাঠকগণকে অস্বাভাবিক কুপথে লইয়া যাওয়া। জানিলাম যে মুদ্রিত পুস্তকের মুদ্রণস্থান চন্দননগর লেখা থাকিলেও প্রকৃতপক্ষে তাহা নহে, মুদ্রণস্থান কলিকাতার কোন

সুপ্রসিদ্ধ কলেজের সম্মুখস্থ একটী রাস্তার উপরে এক অট্টালিকা। আন্দাজ ৭০ বৎসর বয়স্ক হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক নামধারী এক বৃদ্ধ ঐ সকল পুস্তকের লেখক এবং তাহার পুত্র এক উকীল ঐ সকল পুস্তক ছাপাইয়া হগ সাহেবের বাজারে লইয়া গিয়া বিক্রয়ের ব্যবস্থা করে!!! আরও আশ্চর্য্যের কথা বলি,—ঐ হস্তলিপি-গুলির মূল। আমার নিকট ভিক্ষাপ্রার্থীটী অপর একজন গণ্যমান্য ব্যক্তিরও নিকট গিয়াছিল। শেষোক্ত ব্যক্তি এখন পরলোকগত। তাঁহার সময়ে কি সমাজনীতি, কি রাষ্ট্রনীতি, কি ধর্ম্মনীতি—কোনও বিষয়েরই সভাসমিতিতে তাঁহার নাম ও উপস্থিতি না থাকিলে সে সভা অঙ্গহীন বলিয়া ধরা হইত! তিনি উক্ত ভিক্ষার্থীকে টাকা ভিক্ষা না দিয়া এই অতি—অতি—অতি অশ্লীল পুস্তক দুইখানি দিয়াছেন, আর ভিক্ষার্থী তাহাই circulate করিয়া অর্থ উপার্জ্জন করে। জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম, এই সকল বইয়ের পাঠক অধিকাংশই উকিল ব্যারিষ্টার ও জমিদার প্রভৃতি—আ—র ছেলেছোকরা ছাত্রও অনেক আছে!! যে পিতামাতা দুঃখ রাখিবার স্থান কোথায়? অবশেষে সেই ভিক্ষার্থীকে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিলাম যে, তাহার যুবতী স্ত্রী, অল্পবয়স্ক বিবাহিত কন্যা এবং একটী ১৮ বৎসরের পুত্র আছে। আমি তাহাকে ঠিক ঐ নীরদের ভাষায় বলিয়াছিলাম—"তুমি এখানে আছ, তোমার এই সকল বই ঘুরিয়া ফিরিয়া যে তোমার পাড়াপড়সীদের হাতে পড়ে নাই কে বলিতে পারে? আর যদি সেই সমস্ত পাঠকদের মধ্যে কেহ এই সমস্ত পুস্তকে প্রদত্ত উপদেশ অনুযায়ী তোমার স্ত্রী প্রভৃতিকে অন্যায় কর্ম্মে নামান, তাহলে তো তোমার আপশোষ করিবার কোন কারণ থাকিবে না।' লোকটী তখন আমার মুখের দিকে কিছুক্ষণ ফ্যালফ্যাল দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল—'আমাকে এভাবে কেহ তো বোঝায় নাই।' আমি তাহাকে আরও কিছু উত্তম মধ্যম ধমক দিয়া তাহার ইষ্টদেবের শপথে ঐ ঘৃণিত ব্যবসায় পরিত্যাগ করিতে স্বীকার করাইলাম। সমবেতভাবে এই সকল অশ্লীল কার্য্যের বিরুদ্ধে না লাগিলে বাঁচিবার আশা নাই—বাঁচিবার আশা নাই—dying race বলিয়া শত চীৎকারেও কোন লাভ হইবে না। যেমন কোন ভদ্র-লোক পতিতা রমণীর ঘৃণিত ব্যবসায়ে অর্জ্জিত অর্থ গ্রহণে অক্ষম, সেইরূপ মহিলানুত্য হইতে আগত অর্থ কোন ব্যক্তি বা institution এর গ্রহণ করা পাপ মনে করি—পদাঘাতে ফেলিয়া দেওয়া কর্ত্তব্য। 'জাতিতীর্থে' হিন্দুর কুসংস্কারের ফল সুন্দর বর্ণিত হইয়াছে, তবে একটুখানি অতিরঞ্জিত মনে হইল। 'সাহিত্যের স্বরূপ' বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত। ভক্তিশাস্ত্রের ব্যাখ্যার ওয় কিস্তি চলিতেছে; ইহাও বিশেষজ্ঞের জন্য লিখিত—ভক্ত বৈষ্ণবদিগের নিকট উপাদেয়।

সংবাদ।

রাজা রামমোহন রায়ের স্মৃতিস্তম্ভ।—ইংলণ্ডে বৃষ্টল-নগরীতে রাজা রামমোহন রায়ের সমাধি-ক্ষেত্রের উপর বন্ধুবৎসল প্রিন্স দ্বারকানাথ তাঁহার ইংলণ্ড-প্রবাসকালে শ্রদ্ধার নিদর্শন স্বরূপ একটী স্মৃতি-স্তম্ভ নির্ম্মাণ করাইয়া দেন। লণ্ডনস্থ রামমোহন-স্মৃতি সমিতির সম্পাদক সম্প্রতি তারযোগে জানাইয়াছেন যে, বহুকাল সংস্কারের অভাবে ঐ স্মৃতিস্তম্ভটীর অবস্থা নিতান্ত শোচনীয় হইয়া পড়িয়াছে। এমন কি, যে কোনও মুহূর্ত্তে উহা ভূমিসাৎ হইবার আশঙ্কা জাগিয়াছে; সুতরাং সত্বর সংস্কার কর্ত্তব্য। সংস্কার-কার্য্যে আনুমানিক চারি-পাঁচ হাজার টাকা ব্যয় হইবার সম্ভাবনা। আশা করি রাজা রামমোহন রায়ের গুণগ্রাহী ব্যক্তিগণ যথাশক্তি অর্থসাহায্য পূর্ব্বক সত্বর ইহার প্রতিবিধানে সচেষ্ট হইবেন। আগামী ১৭ই মার্চ্চ বেলা ৫টার সময় এলবার্ট হলে ইহার জন্য একটী সভা হইবে। যে মহাপুরুষের নিকট কেবল বঙ্গদেশ নহে, সমগ্র ভারতবর্ষ সর্ব্ববিষয়ে ঋণী, তাঁহার স্মৃতি বজায় রাখিবার জন্য আশা করি প্রত্যেক ভারতবাসী এই আহ্বানে সাড়া দিবেন।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

জাতকর্ম্ম।—গত ৬ই মাঘ শনিবার শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের দীক্ষিত শিষ্য ৺তারিণীচরণ গুপ্ত মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীমান্ সুহৃৎকুমার গুপ্তের একটী নবকুমার ভূমিষ্ঠ হইয়াছে। তদুপলক্ষ্যে গত ২৬শে মাঘ শুক্রবার সন্ধ্যা ৭॥০ ঘটিকায় তাঁহাদের কলিকাতার বাসবাটীতে পণ্ডিত শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরো-হিত্যে আদিব্রাহ্মসমাজের একেশ্বরবাদ সম্মত বিশুদ্ধ পদ্ধতি অনুসারে নবকুমারের জাতকর্ম্ম সুসম্পন্ন হইয়াছে। ভগবান্ ইহাকে নিত্য শ্রীসৌন্দর্য্যে ও সাধুগুণে বিভূষিত করুণ। শ্রীসুহৃৎকুমার গুপ্ত তাঁহার পুত্রের জাতকর্ম্ম উপ-লক্ষ্যে আদিব্রাহ্মসমাজে ২৲ টাকা দান করিয়াছেন।

শোক-সংবাদ।

৺সাহানা দেবী।—মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের পৌত্র অকালে পরলোকগত সুসাহিত্যিক বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী সাহানা দেবী গত ২৭শে ফাল্গুন সোমবার বেলা প্রায় দেড়টায় জোড়াসাঁকোর বাসভবনে হৃদ্রোগে পরলোক-গত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। আমরা ইঁহার শোকসন্তপ্ত শ্বশ্রূদেবী ও পরিজনদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাই-তেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার সদ্‌গতি বিধান করুন।

৺মণিলাল গঙ্গোপাধ্যায়।—শ্রীমন্মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের ভ্রাতুষ্পৌত্রবধূ ডাক্তার শ্রীঅবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের জামাতা সুসাহিত্যিক মণিলাল গঙ্গো-পাধ্যায়। গত ২৩শে ফাল্গুন বৃহস্পতিবার রাত্রিতে জোড়া-সাঁকোর বাটীতে, 'নিউমোনিয়া' রোগে অকালে পর-লোকগত হইয়াছেন। মৃত্যুকালে ইঁহার বয়ঃক্রম মাত্র ৪৫ বৎসর হইয়াছিল। আমরা ইঁহার অপ্রাপ্তবয়স্ক পুত্রকন্যা ও শোকসন্তপ্ত আত্মীয়-বন্ধুদিগকে আমাদের আন্তরিক সমবেদনা জানাইতেছি। ভগবান ইঁহার লোকান্তরিত আত্মার কল্যাণ-বিধান করুন।

ভ্রম-সংশোধন।

তত্ত্ববোধিনীর গত মাঘ-সংখ্যায় নবনবতিতম মাঘোৎসবের বিবরণে ২৭৩ পৃষ্ঠার প্রথম স্তম্ভের শেষাংশে "মেসার্স ডোয়ার্কিন এণ্ড সন্স্ কোম্পানির স্বত্বাধিকারী" এই অংশের পরে "শ্রীযুক্ত কিরণচন্দ্র ঘোষ"এর পরিবর্ত্তে "শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র ঘোষ" হইবে।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্বন্ধে অভিমত।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা।—শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর বি-এ, তত্ত্বনিধি-বিরচিত, বহু চিত্র-শোভিত, স্বর্ণাঙ্কিত শিল্কের বাঁধাই; কাগজ ও ছাপা উৎকৃষ্ট, ৪১৫ পৃষ্ঠা, মূল্য ১৷৹ আনা।

আর্য্য-নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা কিরূপভাবে প্রদান করিলে তাঁহারা আদর্শ মাতৃত্বের অধিকারিণী হইয়া গৃহ শান্তি ও সুখের আদর্শনিকেতনে পরিণত করিতে পারেন, এই পুস্তকে তিনি তাহাই দেখাইবার চেষ্টা করিয়াছেন। পুস্তক পাঠে মনে হয়, বর্ত্তমানে শিক্ষা ও স্বাধীনতার নামে যে কঠোর বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষা এবং উচ্ছৃঙ্খলতা সমাজে ধীরে ধীরে প্রবিষ্ট হইয়া নারীর স্বভাবকোমল হৃদয়কে কঠোর করিয়া তুলিতেছে এবং পরিণামে তাহাকে সুজননী হইবার পক্ষে অনুপযোগী করিয়া তুলিতেছে, তিনি সেই শিক্ষা ও স্বাধীনতার একান্ত বিরোধী। তিনি সে বিষয়ে মহর্ষি মনুর সহিত ঐকমত্য অবলম্বন করিয়া বলেন—

"মাত্রা স্বস্রা দুহিত্রা বা ন বিবিক্তাসনো ভবেৎ।
বলবান্ ইন্দ্রিয়গ্রামো বিদ্বাংসমপি কর্ষতি ॥"

বিশেষত বর্ত্তমানে আর্টের নামে যে উচ্ছৃঙ্খল আচরণ নারীনৃত্যের ব্যপদেশে সংক্রামক ব্যাধির মত সমাজের অঙ্গে অঙ্গে বিস্তৃত হইয়া পড়িতেছে, তিনি সে বিষয়েও আমাদিগকে সতর্ক হইতে উপদেশ দিয়াছেন। সহবতে শিক্ষা অধ্যায়টি বিশেষ উল্লেখযোগ্য।

তিনিও ইহুদি দার্শনিক স্পিনোজার মত নারীদের জন্য "Freedom in bondage"-শ্রেণীর স্বাধীনতার পক্ষপাতী।

এই পুস্তকের দ্বারা সমাজের প্রভূত মঙ্গল হইবে আশা করা যায়। ভাষা সহজ ও সরল।

সুবর্ণবণিক সমাচার, ফাল্গুন—১৩৩৫।

এ গ্রন্থ বাঙ্গালী সমাজের সম্পদ। আজ এই তাণ্ডব-নৃত্যের যুগে এ গ্রন্থের প্রকাশ ও প্রচার, শুধু শিক্ষাপ্রদ নয়,—সৎ। এমন অপূর্ব্ব গ্রন্থ অনেক দিন পড়ি নাই।

নারীর 'নারীত্বরক্ষা' বলিয়া খুব আস্ফালন দেখিতে পাওয়া যাইতেছে; কিন্তু নারীর নারীত্ব বলিলে কি বুঝায়, তাহার ধারণা অনেকেরই যে পরিস্ফুট নয়, এ পরিচয় আমরা নিয়ত বিবর্দ্ধমান বাঙ্গালা সাহিত্যে সর্ব্বদাই পাইতেছি এবং সমাজ কি ভাবে পাশ্চাত্য সমাজের ভাব গ্রহণ করিয়া অতিক্রতবেগে ইঙ্গ-সমাজে পরিণত হইতে চলিয়াছে, তাহা প্রত্যক্ষ করিয়া শঙ্কিত হইয়া উঠিয়াছি। সমাজের কোন দোষ নাই, নারীর অমর্য্যাদা এখানে হয় না—এমন কথা বলি না, দোষ অনেকই আশ্রয় পাইয়াছে সেই সব দোষের পরিহার করা একান্ত কর্ত্তব্য, তাহাও অবশ্য স্বীকার করিতেছি কিন্তু তাই বলিয়া সমাজের যাহা মূল ভিত্তি তাহার অপসারণ করা কখনই যুক্তিযুক্ত বলিয়া বিবেচনা করি না।

রমণীর মাতৃত্ব যে কত ভাবে হিন্দুসমাজ প্রচার করিয়াছেন—তাহার আর ইয়ত্তা নাই। এখানে দেহের সুখ কখন ভাবধারার উপরে স্থান পায় নাই। বর্ত্তমানে "নারীত্ব"-প্রচারকারীগণ পূর্ব্ব আচার্য্যপ্রতিষ্ঠিত সমস্ত ভাবধারার পরিবর্ত্তন ঘটাইয়া কেবল "সঙ্গিনী"ত্বেই লিপ্ত হইতে চলিয়াছেন। এবং পরম দুঃখের বিষয় এই যে এই আপাত-মধুর ভাবই বঙ্গসমাজকে চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে। এ হেন সময়ে এ গ্রন্থের প্রচার অত্যন্ত আবশ্যক।

গ্রন্থের আলোচনা-পদ্ধতিও অপূর্ব্ব। গ্রন্থে কেবল কতকগুলি সাবেক উপদেশ প্রথা বর্ণনা মাত্র করা হয় নাই;—কেন এ প্রথা প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, কেন তাহা ভাল বা কেন তাহা মন্দ, কোনটার কতটুকু পরিবর্ত্তন শ্রেয়ঃ, শ্রেয় ও প্রেয়র মধ্যে কোনটী গ্রাহ্য তাহা তন্ন তন্ন করিয়া বিচার করিয়া দেখান হইয়াছে।

মাতৃত্ব বলিতে কি বুঝায়, হিন্দু কি বুঝিয়াছিল, রমণীর স্বাধীনতা কেমন ও কতটুকু, রমণীর কর্ম্মভেদ কোথায় এবং কেন, রমণীর মানসিক বৃত্তিসকলের উৎকর্ষ ও উপাদান, রমণীর লজ্জা শোভা, সৌন্দর্য্য প্রতিভা, সহবৎ শিক্ষা প্রভৃতি বিষয়ে পুরুষের সহিত কোথায় কি প্রভেদ থাকা উচিত ও সঙ্গত; পূর্ব্ব সমাজ ও বর্ত্তমান সমাজের পার্থক্য কি এবং কি কি ভাবে চলিলে সে দোষ সংশোধিত হইতে পারে—তাহার সবিস্তার আলোচনা ইহাতে স্থান পাইয়াছে। গ্রন্থ সম্বন্ধে আমাদের একমাত্র বক্তব্য এই যে যাঁহারা গ্রন্থের সম্যক পরিচয় চান—তাঁহারা ইহার এক খণ্ড ক্রয় করিয়া পাঠ করিয়া দেখুন—বুঝুন—মীমাংসা করুন। যে গৃহে ইহা থাকিবে সে গৃহেও শান্তি থাকিবে। অতীতে এমন ভক্তি, সঙ্গে সঙ্গে ভবিষ্যতে এমন তীব্র দৃষ্টিসম্পন্ন পুরুষ এখনও যে বাঙ্গলায় আছেন—ইহা বাঙ্গলার গৌরবেরই কথা। সত্যসত্যই ইহা বাঙ্গলার অপূর্ব্ব সম্পদ। আমরা এ গ্রন্থ সমালোচনার্থ নয়—গৌরবের দান ও আশীর্ব্বাদ স্বরূপই গ্রহণ করিলাম। প্রার্থনা করি শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ এমনই গ্রন্থসকল প্রণয়ন করিয়া বাঙ্গলার উন্মার্গগামী সমাজকে আবার স্থিত ধারায় সঞ্জীবিত করিয়া তুলুন!

গৃহস্থ-মঙ্গল, মাঘ—১৩৩৫।

আটাশ বৎসর পূর্ব্বে ১৮২২শকে এই পুস্তকের প্রথম সংস্করণ প্রকাশিত হইয়াছিল। প্রথম সংস্করণ নিঃশেষ

Tattwabodhini Patrika Reg. No. C 462

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯। সাল ১৩৩৫। শক ১৮৫০। খৃঃ ১৯২৮। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকার বার্ষিক মূল্য ৩৲ টাকা
ডাকমাশুল ৵০ আনা। এই সংখ্যার মূল্য ।০ আনা। } আদিব্রাহ্মসমাজের কর্ম্মাধ্যক্ষের নামে পাঠাইতে হইবে।

৫৫ নং অপার চিৎপুর রোড্ কলিকাতা, আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্
সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয়ং সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া
পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

দ্বাবিংশ কল্প

দ্বিতীয় ভাগ

১৮৫০ শক

কলিকাতা

৫৫নং আপার চিৎপুর রোড্

আদিব্রাহ্মসমাজ যন্ত্রে

শ্রীমণীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য দ্বারা

মুদ্রিত ও প্রকাশিত।

সন ১৩৩৫। খৃঃ ১৯২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। কলিগতাব্দ ৫০২৯।

তত্ত্ববোধিনী পত্রিকা।

বর্ণানুক্রমিক বিষয়-সূচী।

দ্বাবিংশ কল্প, দ্বিতীয় ভাগ।

১৮৫০ শক ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

একমেবাদ্বিতীয়ং

১৭৬৫ শক ১লা ভাদ্র মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত

দ্বাবিংশ কল্প—দ্বিতীয় ভাগ

সংখ্যা ১০২৮ | ১৮৫০ শক চৈত্র

তত্ত্ববোধিনীপত্রিকা

"ব্রহ্ম বা একমিদমগ্র আসীন্নান্যৎ কিঞ্চনাসীত্তদিদং সর্ব্বমসৃজৎ। তদেব নিত্যং জ্ঞানমনন্তং শিবং স্বতন্ত্রন্নিরবয়বমেকমেবাদ্বিতীয়ম্ সর্ব্বব্যাপি সর্ব্বনিয়ন্তৃ সর্ব্বাশ্রয় সর্ব্ববিৎ সর্ব্বশক্তিমদ্ধ্রুবং পূর্ণমপ্রতিমমিতি। একস্য তস্যৈবোপাসনয়া পারত্রিকমৈহিকঞ্চ শুভম্ভবতি। তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্যসাধনঞ্চ তদুপাসনমেব"।

৮৬তম বৎসরে চলিতেছে।

সম্পাদক—

শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর ও ডাক্তার শ্রীবনওয়ারিলাল চৌধুরী ডি, এস্‌সি

কলিগতাব্দ ৫০২৯। সম্বৎ ১৯৮৫। খৃঃ ১৯২৮। শক ১৮৫০। সাল ১৩৩৫। ব্রাহ্মসম্বৎ ৯৯।

অঞ্জলি।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

১০৭ অঞ্জলি—জ্ঞানজ্যোতি দেবতা।

১। হে জ্ঞানজ্যোতি ভগবান! তুমি বাহিরে আছ, তুমি অন্তরে আছ। যে তোমাকে অন্তরে প্রত্যক্ষ করে, তাহার সকল বিপদ দূরীভূত হয়। যে তোমাকে হৃদয়ে রক্ষা করে, সে-ই সুরক্ষিত।

২। তুমি সংসারকে ধর্ম্মপথে রক্ষা করিবার জন্য কর্ম্মযজ্ঞ প্রবর্ত্তিত করিয়াছ। তোমার আদেশে আমরা যে সকল কর্ম্মের অনুষ্ঠান করিতেছি, তুমি সেই সকল কর্ম্মের উপর তোমার আশীর্ব্বাদ বর্ষণ কর—সেই সকল কর্ম্মের দ্বারা সর্ব্বপ্রকার দুরিত পরাহত হৌক।

৩। আমাদিগকে আর পরীক্ষার অগ্নিতে নিক্ষেপ করিও না। তোমার সত্যধর্ম্মে আমাদিগকে দীক্ষা প্রদান কর। আমাদের দেহ মন ও আত্মা সর্ব্ববিধ উন্নতি লাভ করিয়া শোভমান হৌক।

৪। আমাদের নিত্য ও নৈমিত্তিক সকল কর্ম্মেই যেন সর্ব্বপ্রথম তোমারই পূজা হয়, সর্ব্বপ্রথম যেন তোমারই নামে আবালবৃদ্ধবনিতার কণ্ঠ হইতে সুতানে স্তুতিগীত সমুত্থিত হয়।

৫। তুমি আমাদিগকে শত্রুগণের সহিত সংগ্রামে বিজয়দান করিয়াছ। আমাদের হৃদয় হইতে যে জয়ধ্বনি উঠিতেছে, তাহা তোমার আনন্দবর্দ্ধন করুক। তুমি আমাদিগকে সকল শুভকর্ম্মে উৎসাহিত কর এবং শুভকর্ম্মের ফলে আমাদিগকে প্রভূত ধনরত্ন প্রদান কর।

৬। তুমি সর্ব্বজ্ঞ। আমাদের কিসে মঙ্গল হইবে তাহা তুমিই জান। আমাদের অন্তরের সকল প্রার্থনাই তোমাকে জানাইব, কিন্তু আমাদের যাহাতে মঙ্গল হইবে, তাহাই তুমি বিধান করিও—অমঙ্গল যেন আমাদিগকে স্পর্শ না করে। আমাদের বংশে তোমার প্রতি অশ্রদ্ধাবান সংশয়াত্মা কেহ যেন জন্মগ্রহণ না করে।

৭। তুমি আমাদিগকে তোমার প্রতি শ্রদ্ধাবান কর। বিন্দুমাত্র অশ্রদ্ধা ও সংশয় যেন আমাদের হৃদয় অধিকার না করে। আমাদের জ্ঞান ও ভক্তিকে সমুজ্জ্বল কর। আমাদের সুখ-সৌভাগ্য বর্দ্ধিত হৌক। আমাদের গৃহে শান্তি চিরবিরাজিত থাকুক।

৮। তুমিই সকল বলের বল। সকল বল

বানের বল তোমা হইতেই উৎসারিত হইয়াছে। তুমিই বীর্য্যবানের বীর্য্য, তুমিই তেজস্বীদিগের তেজ। তুমিই আমাদের একমাত্র নির্ভরস্থল। আমাদের যাহা কিছু শুভ কামনা, তাহা তুমি অচিরে পূর্ণ কর।

৯। তুমি সকল ভয়ের ভয়। তোমার রুদ্রমূর্ত্তির সম্মুখে কে দাঁড়াইবে? আমরা ধর্ম্মপথে সত্যের পথে চলিতে চাই। আমাদের যাহারা শত্রুতা করে, তাহারা তোমার সহিত সমকক্ষতা করিবার স্পর্দ্ধা দেখায়! তোমার রুদ্রতেজ যখন তাহাদের দৃষ্টিকে অবরুদ্ধ করে, তখন তাহারা অগ্নিদগ্ধ বস্ত্রের ন্যায় মসীবর্ণ ও সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে।

১০। আমাদের হৃদয়ে যাহা কিছু অজ্ঞান-অন্ধকার আছে, তোমার জ্ঞানজ্যোতি তাহা বিদূরিত করুক। আমাদের অন্তরাকাশ তোমার সুনির্ম্মল জ্যোতিতে উদ্ভাসিত হইয়া উঠুক। সর্ব্ববিধ অমঙ্গল ও অনিষ্ট আমাদের হইতে দূরে অপসারিত হৌক। অন্ধকার হইতে তুমি আমাদিগকে জ্যোতিঃস্বরূপে লইয়া যাও।

১০৮ অঞ্জলি—বন্ধু দেবতা।

১। আমরা অমৃতধামের যাত্রী। আমাদের যাহারা শত্রু, তাহারা তোমার বজ্রের কঠিন আঘাত স্বতই আকর্ষণ করে। তুমি মহাবলী। তোমার বলের তুলনা নাই। তোমার এক ইঙ্গিতে ভূধর সাগরে পরিণত হয় এবং সাগর ভূধরে উন্নীত হয়; ভানুদেবের অগ্নিকুণ্ড হইতে কতশত সুদীপ্ত গোলক নিক্ষিপ্ত হইয়া গ্রহতারকায় পরিণত হইতেছে। ব্রহ্মচক্র হইতে তোমারই বিজয় নির্ঘোষ অবিশ্রাম নির্গত হইতেছে। তোমার চরণে আমাদের মস্তক সর্ব্বদাই আনত রহিয়াছে। তুমি মহান, তুমি অগুণ। আমরা তোমাকে অবিচলিত ভক্তিশ্রদ্ধা দ্বারা পূজা করি, আর তুমি আমাদিগকে তোমার স্নেহপ্রেমে আচ্ছাদিত রাখ। তুমি আমাদের একমাত্র নেতা। তুমি স্বপ্রকাশ। শতকোটী সূর্য্যের ন্যায় তুমি আমাদের অন্তরে প্রকাশিত হও।

২। চঞ্চল হৃদয় যখন লোভের বশবর্ত্তী হইয়া কোন দ্রব্যের পশ্চাতে দিগ্বিদিকজ্ঞানশূন্য হইয়া বিপথে ধাবমান হয়, তখন শতবিধ দুঃখের মেঘ তাহাকে ঘিরিতে থাকে। হে ভগবান! তখন তোমারই করুণা সেই মেঘের ভিতর হইতে নামিয়া আসিয়া তাহাকে বিধৌত করে। তখন সে তাহার নির্ম্মল গগনে তোমার পুনঃপ্রকাশ দেখিয়া কৃতার্থ হয়।

৩। আমরা যখন দুঃখের অগ্নিকটাহে পতিত হইয়া দগ্ধ হইতে থাকি, তখন আমরা তোমার একবিন্দু করুণাবারির প্রত্যাশায় কাতরনেত্রে চাহিয়া থাকি। তুমি তখন সহস্রধারে করুণা বর্ষণ করিয়া আমাদের জ্বালা যন্ত্রণা বিদূরিত কর। তখন আমাদের অশ্রুধারা তোমার করুণাধারার সহিত মিশ্রিত হইয়া তোমারই আশ্চর্য্য মহিমা প্রকাশ করে।

৪। বিন্দুচিহ্নিত মৃগবাহন মেঘসকল ধরণীকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলে যেমন ওষধিসকল উন্নত হয়, সেইরূপ বিন্দুচিহ্নিত ওঁকারবাহন তুমি আমাদিগকে প্রেমভরে আলিঙ্গন করিলে আমাদের হৃদয়ে জ্ঞান, ভক্তি ও কর্ম্মের মিলনোৎপন্ন অপূর্ব্ব শ্রদ্ধা শতবিধ সত্য, ধর্ম্ম ও কর্ম্মের আকারে প্রকাশ পায়।

৫। আমাদের পিতৃপিতামহগণ যেপ্রকার স্তবস্তুতি দ্বারা তোমাকে তাঁহাদের যজ্ঞে আহ্বান করিয়া আনিতেন, আমরাও সেইরূপ আমাদের সুমার্জ্জিত হৃদয়ে তোমার আসন পাতিয়া নিত্যনব স্তবস্তুতি দ্বারা তোমাকে নিয়তই আহ্বান করিতেছি। তুমি আমাদের পাপতাপসকল সংহার করিয়া আমাদের হিতকারী পরমবন্ধু বলিয়া পরিগণিত হইয়াছ।

৬। হে বন্ধু! আমরাও যেমন তোমার প্রেমলাভের জন্য লালায়িত হইয়া আছি, আমরা জানি যে, তুমিও আমাদের প্রেম উপভোগের জন্য সর্ব্বদাই অগ্রসর হইয়া আছ। লৌহ যেমন চুম্বককে সহজেই আকর্ষণ করে, তোমারও অসীম প্রেম সেইরূপ আমাদের অন্তরে নামিয়া স্বতই আমাদের ক্ষুদ্র প্রেমকে নিজের মধ্যে টানিয়া লয়। উভয় প্রেমের মিলনে যে প্রেমসাগর সংরচিত হয়, তাহারই মধ্যে আমরা অকুতোভয়ে বাস করি।

ব্রাহ্মসমাজ ও বর্ত্তমান ভারত। *

(আচার্য্য শ্রীসতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী এম-এ)

দেহের জীবনে দেখিতে পাই, মস্তিষ্ক ও হৃদ্‌যন্ত্র যেন বিশেষভাবে জীবনের যন্ত্র (vital organs)। অন্যান্য সকল অঙ্গকে ইহারা পরিচালিত করে ও পোষণ করে। যতক্ষণ এই প্রাণযন্ত্র দুইটি সতেজ ও কর্ম্মক্ষম, ততক্ষণই দেহের সর্ব্বাঙ্গ ক্রিয়াশীল। তেমনি দেশের ও জাতির জীবনে, ধর্ম্ম ও নীতি, এই দুইটিকে প্রাণযন্ত্র বলা যাইতে পারে। এই দুইটিকে রক্ষা কর, আর সকল দিক বাঁচিবে। ইহাদিগকে বাদ দিয়া যাও, জাতীয় জীবনের কোনও কল্যাণই প্রতিষ্ঠিত থাকিবে না।

বর্ত্তমান ভারতের সহস্র প্রকার নূতন উদ্যম, নূতন আন্দোলন, নূতন প্রচেষ্টার মধ্যে এ কথা স্মরণ রাখিতে হইবে। মনে রাখিতে হইবে যে, এসকলের প্রাণযন্ত্র, এসকলের জীবনীশক্তির কেন্দ্রস্থল, মানুষের ধর্ম্মভাব ও চরিত্র। ভারতের এই নবজীবনের মধ্যেও ধর্ম্মের ও চরিত্রের একটি দিক আছে। সেই দিকটিকে রক্ষা করাই ব্রাহ্মসমাজের বিশেষ কাজ। ব্রাহ্মসমাজ তাঁহাদেরই সমাজ, যাঁহারা বিশ্বাস করেন যে, ধর্ম্মে সত্যপ্রতিষ্ঠা ভিন্ন, (অর্থাৎ জীবনগত চরিত্রগত প্রতিষ্ঠা ভিন্ন) কি ব্যক্তির, কি দেশের, কি জাতির, কাহারও কোনও মঙ্গলই স্থায়ী হয় না।

মহাত্মা রামমোহন রায়, ধর্ম্ম, শিক্ষা, সমাজ, আইন, রাজনীতি প্রভৃতি সকল ক্ষেত্রেই দেশের কল্যাণসাধনে নিযুক্ত ছিলেন। তিনি তাঁহার বহুমুখীন জীবনের বিশাল অভিজ্ঞতা হইতে উপলব্ধি করিয়াছিলেন যে, বিশুদ্ধ ধর্ম্মে দেশবাসীর জীবন প্রতিষ্ঠিত হইলেই এ দেশ সর্ব্ববিধ কল্যাণের পথে অগ্রসর হইতে পারিবে।

ধর্ম্মের শক্তি ভিন্ন জাতীয় জীবন সর্ব্বাঙ্গীন ভাবে ও স্থায়ী ভাবে, উন্নত করা অসম্ভব। এ কথার প্রমাণের জন্য অধিক দূরে যাইবার আবশ্যকতা নাই। যে বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার হাওয়াতে আমরা বর্দ্ধিত, যাহা আমাদের শিক্ষা ও সংস্কারের মধ্যে প্রবিষ্ট হইয়া রহিয়াছে, তাহার কথাই চিন্তা করা যাক। নানা ঐতিহাসিক কারণে এই সভ্যতার বিস্তার অনেক পরিমাণে ধর্ম্ম-নিরপেক্ষভাবে হইয়াছিল। সে ধর্ম্মনিরপেক্ষতার ফল আমরা আজকাল দেখিতে পাইতেছি। ইতিহাসের কথা অধিক বলিবার প্রয়োজন নাই। য়ুরোপের মধ্যযুগের কুসংস্কারাবদ্ধ ধর্ম্ম, গ্যালিলিও ব্রুনো প্রভৃতির জীবনে বৈজ্ঞানিক সত্য প্রচারের পথে কিরূপ বাধা উৎপন্ন করিয়াছিল, তাহা সকলেই জানেন। ক্রমে বিজ্ঞান সে সকল বাধা অতিক্রম করিল; ক্রমে বৈজ্ঞানিক উপায়ে শিল্পের বাণিজ্যের ও ভ্রমণোপায়ের বিস্ময়কর উন্নতি, ধর্ম্মের সাহায্য-নিরপেক্ষ হইয়াই সম্পন্ন হইল। আবার ফরাসী-বিপ্লব প্রভৃতির মধ্য দিয়া সমাজে ও রাষ্ট্রে ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে প্রসারিত করিবার জন্য যে একটি প্রয়াস চলিয়াছিল, তাহাও ধর্ম্মসমাজের দ্বারা সৃষ্ট বাধার উপর জয়ী হইয়াই অগ্রসর হইতে লাগিল। এই সকল কারণে অষ্টাদশ ও উনবিংশ শতাব্দীর বৈজ্ঞানিক দার্শনিক ও রাজনীতিবিদগণ ধর্ম্মকে অবজ্ঞা করিতে লাগিলেন। ধর্ম্মের কুসংস্কারের সহিত, ধর্ম্মের সার যে ঈশ্বরে বিশ্বাস এবং পবিত্র চরিত্র, তাহাও এই অবজ্ঞার বিষয়ীভূত হইয়া উঠিল। উনবিংশ শতাব্দীতে তাঁহাদের চিন্তা সাধারণ জনমণ্ডলীর মধ্যে বহুলভাবে প্রসারিত হইল। ইহার ফলে, ক্রমে ক্রমে ধর্ম্মমন্দিরসকল শূন্যপ্রায় হইল; মানুষ ধর্ম্মকে প্রায় বিস্মৃত হইল।

কিন্তু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতার উপাদানসকল, পদার্থ-বিজ্ঞান, শিল্প, বাণিজ্য প্রভৃতি, মানুষের জ্ঞানকে ও আরামকে বর্দ্ধিত করে মাত্র। ইহারা তাহার প্রকৃতিকে পরিবর্ত্তিত করিতে পারে না; তাহার প্রবল উদ্দাম লোভকে সীমার মধ্যে আনিতে পারে না; তাহার প্রবৃত্তির জ্বলন্ত হুতাশনকে নির্ব্বাপিত করিতে পারে না। তাই নূতন জ্ঞান-বিজ্ঞান কেবল মানুষের ভোগবাসনায় সহায় হইল। এই ভোগবাসনা ক্রমে এতই প্রবল হইয়া উঠিল যে, চিরাগত আদর্শসকলকে বিকৃত করিয়া, নিজ ধর্ম্মবুদ্ধিকে ছলনা করিয়া, মানুষ পুরাতন পাপের নূতন নামকরণ করিতে লাগিল; এমন কি, পাপকে পুণ্যের পদবীতেও তুলিতে লাগিল। বিজ্ঞাপনবহুল ব্যবসায়-প্রণালী সত্য-গোপন ও অসাধুতাকে নিজ অঙ্গীভূত করিয়া লইল। জাতীয় স্বার্থপরতা, দলবদ্ধ বিদ্বেষ, এমন কি, দূতমুখে উচ্চারিত স্পষ্ট মিথ্যাবাক্যও, দেশানুরাগের নামে সমর্থিত হইতে লাগিল। "Imperialism" এই নূতন নাম লইয়া পরস্বাপহরণই রাষ্ট্রীয় জীবনের আদর্শ হইয়া দাঁড়াইল। মহাত্মা যীশু মানুষকে একটি জপমন্ত্র শিখাইয়াছিলেন; তাহা ছিল, পৃথিবীতে স্বর্গরাজ্য, (Kingdom of Heaven on earth)। তাহার পরিবর্ত্তে নূতন একটি জপমন্ত্র রচনা করিয়া মানুষকে শিখাইলেন, Imperialist ভাবাপন্ন কবি Kipling; তখন হইতে "White Man's Burden," (অর্থাৎ শ্বেতকায় জাতিসকলের উপরে ঈশ্বর অ-শ্বেত জাতি-সকলকে তুলিবার গুরুভার দিয়াছেন), এই কপট বাক্য হইল পাশ্চাত্য জগতের জপমন্ত্র। যীশুর পরিবর্ত্তে এ যুগের prophet হইলেন নীট্‌শে। তিনি বলিলেন,

* মাঘোৎসব উপলক্ষে বিগত ৯ই মাঘ আদিব্রাহ্মসমাজের বেদী হইতে বিবৃত।

একগালে চড় খাইয়া আর এক গাল ফিরাইয়া দেওয়া প্রভৃতি নিরীহ ও অহিংস নীতি একটি গোলামের জাতি হইতে উদ্ভূত হইয়াছিল; তাহা গোলামপ্রকৃতির মানুষেরই সাজে। তিনি বলিলেন, দুর্ব্বলকে ধ্বংস করা ও জগৎভোগের জন্য শক্তির সাধনা করা, ইহাই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নীতি। এই নীতির অনুসরণের চরম ফল বিগত মহাযুদ্ধ।

এই যুদ্ধের পর এখন য়ুরোপ ভাবিতে বসিয়া গিয়াছে যে, ধর্ম্মকে ঠেলিয়া রাখিলে মানুষের সভ্যসভ্যই চলিতে পারে কি না। যাহা শুধু মতের-ধর্ম্ম, বিশ্বাসের-ধর্ম্ম, অথবা বাহ্য-আচারের ধর্ম্ম, তাহাকে জীবন হইতে দূরীভূত করিলেও মানুষের চলিতে পারে। কিন্তু যতদিন মানুষ মানুষ, যতদিন মনুষ্যের প্রকৃতিতে লোভ ভোগবাসনা সুখাসক্তি অহঙ্কার দম্ভ ক্রোধ, এ সকল বিদ্যমান আছে, ততদিন এ সকলকে দমন করিয়া রাখিবার জন্য, এসকল অপেক্ষাও অধিকতর বলশালী একটি শক্তি মানুষের অন্তরে সঞ্চার করিতে না পারিলে চলিবে না। যাহা সকল বাসনাকে সংযত করিয়া মানুষকে সুপথে চালিত করিবে, মানব-জীবনে এমন প্রবল শক্তি, ধর্ম্ম ভিন্ন আর কিছুতে নাই। ধর্ম্ম হইতে কুসংস্কারকে দূরীভূত কর; কিন্তু পরিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের চরণে আত্মসমর্পণ, এবং 'তস্মিন্ প্রীতিস্তস্য প্রিয়কার্য্য সাধনঞ্চ,' অর্থাৎ তাঁহাতে প্রীতির দ্বারা এবং নির্ম্মল চরিত্র ও পবিত্র আচরণের দ্বারা তাঁহার যে উপাসনা,—এই সার ধর্ম্মকে ছাড়িলে মানুষের চলিতে পারে না। ইহাকে জাতীয় জীবনের কেন্দ্রস্থলে না রাখিলে কোনও দেশ বা জাতি দাঁড়াইয়া থাকিতেই পারে না।

শুধু বর্ত্তমান য়ুরোপীয় সভ্যতা কেন, জগতের সমগ্র ইতিহাসই এই সত্যের দৃষ্টান্তসকলে পরিপূর্ণ। বর্ত্তমান সময়ে যাঁহারা ভারতের রাজনৈতিক আন্দোলন পরিচালিত করিতেছেন, তাঁহাদের অনেকের কার্য্যকলাপ দেখিয়া বোধ হয়, যেন তাঁহারা মনে করিতেছেন, দেশের মানুষের মধ্যে ধর্ম্মানুরাগ ও চরিত্রবল সঞ্চার না করিয়াও দেশকে উন্নত করিবেন। তাঁহাদের সে প্রয়াসকে মৃতদেহে তাড়িতের ব্যাটারী প্রয়োগ করিয়া তাহাকে ক্ষণকাল সঞ্চালিত করার অনুরূপ বলিয়া মনে হয়। ধর্ম্ম ও চরিত্রই জাতীয় জীবনের প্রাণ; সে প্রাণ সঞ্চার করিতে না পারিলে মানুষকে সাময়িক উত্তেজনায় আন্দোলিত করা বৃথা।

ভারতবর্ষের জাতীয় ও রাষ্ট্রীয় জীবনের জটিল সমস্যা এখন যে আকার ধারণ করিয়াছে, তাহাতে ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের প্রয়োজন কি? এ ধর্ম্ম ও এ সমাজকে দিয়া দেশের কি কাজ হইতেছে, ভবিষ্যতেই বা কি কাজ হইবে, এই প্রশ্নের একটু আলোচনা করা আবশ্যক।

এ প্রশ্নের প্রথম উত্তর এই যে, ইহা বর্ত্তমান ভারতের উন্নততম মানুষগুলির ঈশ্বরপিপাসা চরিতার্থ করিতেছে। তাঁহাদিগের সরল ও জ্ঞানানুমোদিত বিশ্বাসের এবং হৃদয়ের মহত্তম আকাঙ্ক্ষার অনুকূল একটি বিমল ধর্ম্মের আস্বাদন দিয়া তাঁহাদিগকে কৃতার্থ করিতেছে। ধর্ম্মের জন্য এ ক্ষুধা, এ পিপাসা, মানবাত্মার পক্ষে স্বাভাবিক। মানুষ ঈশ্বর ভিন্ন এবং ঈশ্বরের উপাসনা ভিন্ন থাকিতে পারে না, বাঁচিতে পারে না; কোনওরূপে আহার নিদ্রা লইয়া বাঁচিয়া থাকিলেও মনুষ্যোচিত জীবন ধারণ করিতে পারে না। বিশেষতঃ শোকে দুঃখে ও বিপদে ধর্ম্মের শান্তি ও ধর্ম্মজনিত অভয় মানুষের চাই-ই। ব্রাহ্মধর্ম্ম বর্ত্তমান ভারতের শিক্ষিত ও মার্জ্জিত মানুষদের জীবনে তাঁহাদের হৃদয়ের তৃপ্তিকারী শান্তিপ্রদ বিমল ধর্ম্মের একটি উৎস খুলিয়া রাখিয়াছে।

ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রথম কাজ এইরূপে মানুষকে পরমেশ্বরের চরণ-ছায়াতে আশ্রয় দান করা। ইহার দ্বিতীয় ও অতি গুরুতর কার্য্য, মানুষের প্রাণে পাপ-প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে, অসত্য অন্যায় ও অশুদ্ধতার সহিত সংগ্রামে, উদ্দীপনা ও বল সঞ্চার করা। মনে হয় বর্ত্তমান যুগে বিশেষভাবে এই কার্য্যের জন্যই ব্রাহ্মধর্ম্ম এদেশে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন। ধর্ম্মের এই দিকটিকেই ধর্ম্মের সর্ব্বপ্রধান দিক বলিতে ইচ্ছা হয়। সংসার চিরদিনই মানুষের পক্ষে পাপ-প্রলোভনের স্থান। মানুষের অন্তরে বাহিরে নানা প্রলোভন। অন্তরে কাম-ক্রোধাদি রিপু রহিয়াছে। বাহিরে কত অসত্য দুর্নীতির সংস্রবে মানুষকে নিরন্তর আসিতে হইতেছে। বর্ত্তমান যুগে বিকৃত আমোদ-লালসা, কলুষিত সাহিত্য প্রভৃতি যেন মানবাত্মার চতুর্দ্দিকে কলুষিত বায়ুর সৃষ্টি করিতেছে। ইহার মধ্যে বাস করিয়া কিরূপে মানুষ আপনাকে সুস্থ রাখিবে? রক্তের তেজ না থাকিলেই সহজেই রোগ আসিয়া দেহকে আক্রমণ করে, এবং রোগের আক্রমণ দুশ্চিকিৎসা হইয়া দাঁড়ায়। শরীরের পক্ষে স্বাস্থ্যরক্ষা যেমন নিত্য সংগ্রামের ফল, আত্মার পক্ষেও সেইরূপ। ধর্ম্মই আত্মার তেজোময় সুস্থ রক্ত। যে ধর্ম্ম পাপধ্বংসকারী সুস্থ রক্ত আত্মাতে সঞ্চার না করে, যাহা প্রলোভনের সহিত সংগ্রামে আত্মাতে বীর্য্য সঞ্চার না করে, এমন ধর্ম্ম 'ধর্ম্ম' নামের যোগ্য নয়। যদি ধর্ম্মের সহায্যে প্রাণে রিপুর উত্তেজনা শান্ত করিতে না পারিলাম, তবে সে ধর্ম্ম দিয়া আমার কি হইবে? অথবা, যদি ধর্ম্মও মানিলাম, আর জীবনে অসত্য অন্যায় ও পাপের সহিত সন্ধি করিয়াই রহিলাম, তাহাদের কাছে

মাথা নত করিয়াই রহিলাম, তবে সে ধর্ম্মের কি মূল্য? অসত্য অন্যায় ও পাপ আজকাল নূতন মূর্ত্তি ধারণ করিয়া আসিতেছে। মহীরাবণের ন্যায় ইহারা কখনও দেশ-সেবার মুখোস পরিয়া, কখনও সমাজসেবার মুখোস পরিয়া আসিতেছে। যে-আকারে আসুক, যার দোহাই লইয়া আসুক, তাহার সহিত সংগ্রাম করা চাই। বর্ত্তমান ভারতে, এই সংগ্রামে যাহাতে মানুষকে বল দেয় এমন তেজোময় ধর্ম্ম চাই। নিস্তেজ ধর্ম্ম দিয়া এযুগে আর চলিবে না। যে ধর্ম্ম সংসারের দুঃখে কষ্টে সহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয়, অথচ পাপ অসত্য ও অন্যায়ের সম্বন্ধে একান্ত অসহিষ্ণুতা শিক্ষা দেয় না, সে ধর্ম্ম দিয়া কি হইবে? এ দেশে এরূপ নিস্তেজ ধর্ম্ম, কোমল ধর্ম্ম, মধুর ধর্ম্ম, এক-পিঠের ধর্ম্ম অনেক ছিল; তাহা মানুষকে পাপ হইতে বাঁচাইতে পারে নাই। "এক-পিঠের ধর্ম্ম" আমি কাহাকে বলিতেছি? যে ধর্ম্মে ধৈর্য্য তিতিক্ষা সন্তোষ প্রভৃতির শিক্ষার সঙ্গে পাপের প্রতি ঘৃণা, পাপের সহিত আমরণ সংগ্রামের শিক্ষাটি নাই, তাহা ধর্ম্মের একপিঠ মাত্র—তাহা সত্য ধর্ম্ম নয়। ছবিতে বস্তুর এক পিঠ মাত্র থাকে। সে ছবিকে দেখা ও সে বস্তুটিকে গ্রহণ করা এই উভয় কখনও সমান নহে। বস্তুকে গ্রহণ করিতে হইলে যেমন তাহার দুই দিকে হাতের আঙ্গুল দিয়া তাহাকে ধরিতে হয়, নতুবা তাহাকে "লওয়া" সম্ভব হয় না, ঠিক তেমনি, শুধু পুণ্যের ধ্যান করিলে, অথবা চরিত্রে শুধু কোমল মধুর ও শান্তভাবসকল বিকাশ করিলে, ধর্ম্মের ছবি দেখা হয় মাত্র, ধর্ম্মকে "গ্রহণ" করা হয় না। ধর্ম্মকে সত্যভাবে গ্রহণ করিতে হইলে, সত্যভাবে জীবন পালন করিতে হইলে, ইহার সঙ্গে সঙ্গে পাপের সহিত অবিচ্ছেদে সংগ্রাম করা চাই। দুইই সমান আবশ্যক।

মহাত্মা গান্ধীর 'অসহযোগ নীতিকে' অনেকে নানা ভাবে সমালোচনা করেন। রাজনীতিক্ষেত্রে ঐ নীতির প্রয়োগ সম্বন্ধে যিনি যাহাই বলুন, ধর্ম্মের ও সরল দেশ-সেবার মূলসূত্র হিসাবে উহা ঠিক। অন্যায় দেখিব বুঝিব, অথচ তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইব না, ইহা দেশসেবাও নয়, ইহা স্বাধীনতার সংগ্রামও নয়, ইহা এক প্রকার চালাকী মাত্র। তেমনি, নিজের জীবনে ও জনসমাজের জীবনে পাপ কি, অন্যায় কি, অমঙ্গল কি, তাহা দেখিব, বুঝিব অথচ তাহার বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিব না, ইহা ধর্ম্ম নয়। ইহার পশ্চাতে যত তত্ত্বজ্ঞান, যত ভাবুকতা, যত পুণ্যের মাহাত্ম্য থাকুক, যত কবিত্ব থাকুক না কেন, ইহা ধর্ম্ম নয়, ইহা চালাকী মাত্র। আপনার ও আপনার চারি-দিককার পাপের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করিতে যে ধর্ম্ম উদ্দী-পনা সঞ্চার করে না, বল দেয় না, সে ধর্ম্ম মৃত ধর্ম্ম। এমন মৃত ধর্ম্মের লাশ কাঁধে বহন করিয়া কি আমরা নিজেরা বাঁচিব, না দেশকে বাঁচাইতে পারিব? একবার বর্ত্তমান ভারতের অবস্থা চিন্তা করিয়া দেখি। এখনও কি সামাজিক দুর্নীতি ও ভেদবুদ্ধি, নিম্নশ্রেণীর প্রতি ঘোর অত্যাচার, নারীর মানবোচিত অধিকার হরণ,—এ সকল মহাপাপ দেশকে আক্রমণ করিয়া বর্ত্তমান নাই? এসকলের উচ্ছেদ-সাধনের জন্য মানুষের অন্তরে বল সাহস ও তেজ সঞ্চার করিবার প্রয়োজন কি এখন আর নাই? এ সকলের উপরে আবার বিকৃত পাশ্চাত্য সভ্যতার সঙ্গে সঙ্গে নূতন নূতন পাপ কি দেশে প্রবেশ করিতেছে না? বাজারের স্ত্রীলোকের দ্বারা যেখানে অভিনয় হয়, এমন থিয়েটার কত লোকের সর্ব্বনাশ করিল। দেখিতে দেখিতে আবার কুৎসিৎ ছবিপূর্ণ বায়োস্কোপ, ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলা, এ সকল নূতন পাপ বন্যার স্রোতের মত হু হু করিয়া দেশে প্রবেশ করিতেছে। হায় হায়, ভাবিলে শিরে করাঘাত করিতে ইচ্ছা হয় যে কত কুলনারী পর্য্যন্ত ঘোড়দৌড়ের জুয়াখেলায় মাতিয়াছেন; নিজ গহনা বিক্রয় করিতেছেন; স্বামীর বাক্স হইতে টাকা চুরী করিতে-ছেন। এ পাপ কত ঘর উজাড় করিয়া ফেলিল! কত যুবককে নষ্ট করিল! এ সকল অকল্যাণ হইতে কে বাঁচাইবে মানুষকে? কার সে শক্তি আছে, সত্যস্বরূপ পবিত্রস্বরূপ পরমেশ্বরের চরণাশ্রয় ভিন্ন? মানুষকে সেই পবিত্রস্বরূপের চরণাশ্রয়ে লইয়া আসা, মানুষের প্রাণে চরিত্রের উন্নত আদর্শ অভ্যুদিত করা, ও তাহার অনু-সরণের জন্য বল সঞ্চার করা, ইহা ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্ম-সমাজের দ্বিতীয় কাজ। ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজ যে বর্ত্তমান ভারতক্ষেত্রে দণ্ডায়মান রহিয়াছেন, তার দ্বিতীয় কারণ ইহাই।

বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের তৃতীয় কার্য্য, মানুষের মনে ধর্ম্মভাবের অগ্নি প্রজ্বলিত করিয়া তাহার জীবনের লক্ষ্যকে উচ্চ করিয়া তোলা; মানুষকে "খাও দাও সুখে থাক", এই ভাব হইতে উর্দ্ধে লইয়া যাওয়া। খুব সচ্চরিত্র হইয়াও মানুষ সুখাসক্তিতে মগ্ন থাকিতে পারে। চরিত্রবল সঞ্চার করার পরেই ধর্ম্মের কাজ মানুষের জীবনের লক্ষ্যকে উচ্চ করা, তাহাকে মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য প্রাণ ধারণ করিতে শিক্ষা দেওয়া। মানুষকে এ কথা বলা, যে, "তোমার ধন-জন, সুখ-সম্পদ, শক্তি-প্রতিভা, এ সকল ভগবানের গচ্ছিত ধন; এ সকল তাঁহার কাজে, জনসেবার কাজে, দেশ-সেবার কাজে ব্যবহৃত হওয়া চাই।" এই উন্নত জীবনের পথে চলিতে হইলে মানুষের সুখাসক্তি খর্ব হওয়া চাই, মন বিষয়বাসনার উর্দ্ধে উঠা চাই, টাকাকে মানুষ যে বজ্রমুষ্টিতে আঁকড়িয়া ধরিয়া থাকে, সে মুষ্টি শিথিল করা চাই। রামমোহন, দেবেন্দ্রনাথ, বিদ্যাসাগর,

কেশবচন্দ্র, শিবনাথ, ইঁহাদের লইয়া আমরা গৌরব করি কেন? ইঁহারা উচ্চ লক্ষ্যের জন্য জীবন এমন উৎসর্গ করিয়াছিলেন যে অর্থসঞ্চয়ের কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। টাকার মুষ্টি শিথিল করিতে, ভোগসুখ হইতে মনকে উর্দ্ধে তুলিতে ধর্ম্মের শক্তি চাই। কিছুদিন মনে হইতেছিল যে দেশমাতার আহ্বানে বুঝি বাঙ্গালী অনেক উর্দ্ধে উঠিয়া গেল, বুঝি জীবনের লক্ষ্যকে উচ্চ করিতে শিখিল, বুঝি মানুষের টাকার মুষ্টি শিথিল হইতে চলিল। কিন্তু হায়, যাহার পশ্চাতে ধর্ম্মভাব নাই, এমন স্বাদেশিকতার শক্তি অধিক দিন থাকে না। তাহা মানবপ্রাণে অনুপ্রাণন জাগাইয়া রাখিতে পারে না। ব্রাহ্মসমাজ এমন একটি স্থান হওয়া আবশ্যক, যেখানে উন্নত লক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত জীবনই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক আদৃত। "এই মানুষটা বিজ্ঞানের আলোচনা লইয়া পড়িয়া আছে, এই মানুষটা ধর্ম্মপ্রচারের জন্য সর্ব্বস্ব পণ করিয়াছে, এই একজন লোক দুর্নীতির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়া দেশের সকল শক্তিকে সেই সংগ্রামের জন্য সজ্ঞবদ্ধ করিতেছে, এই একজন লোক নারীজাতির কল্যাণের জন্য জীবন উৎসর্গ করিয়া রাখিয়াছে, এই মানুষটি নিম্নশ্রেণীর লোকেদের পরমবন্ধু, এই আর একজন শিক্ষাবিস্তারের কাজে মাতিয়া রহিয়াছে, এই লোকটি রাষ্ট্রীয় কল্যাণের কাজে নিজের সর্ব্বস্ব ঢালিয়া দিয়াছে," এই বলিয়া যাঁহাদিগকে জগতের সম্মুখে ধরিতে পারি, এমন মানুষ তৈয়ারী করাই ব্রাহ্মধর্ম্মের ও ব্রাহ্মসমাজের কাজ। কিন্তু হায়, এ বিষয়ে আমরা কত যে পশ্চাৎপদ তাহা মনে করিলে লজ্জায় মাথা হেঁট হয়। যদি ব্রাহ্মসমাজ শুধু আত্মসুখে তৃপ্ত ধনী মানী পদস্থ মানুষের সমাজ হইয়া দাঁড়ায়, তবে আর ইহার দ্বারা বিধাতার কাজ কিছুই হইবে না। আমি একথা বলিতেছি না যে সকলেই ফকির হউক। ধন মান পদ সম্ভ্রম, সবই ভাল, যদি তাহা উচ্চ জীবনের সহায় হয়, যদি তাহা বিধাতার কার্য্যে ব্যবহৃত হয়। কিন্তু আত্মসুখে মগ্ন মানুষের ধন মান সমাজের পক্ষে বৃথা, বরং বাধাস্বরূপ। আজ পর্য্যন্ত ব্রাহ্মসমাজের দ্বারা দেশের কাজ যাহা কিছু হইয়াছে, তাহা মহৎলক্ষ্যে উৎসর্গীকৃত জীবনগুলির দ্বারাই হইয়াছে।

বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মসমাজের চতুর্থ কার্য্য,—ধর্ম্মভাবের উত্তাপে দেশের মানুষের মন গলাইয়া, সব ধর্ম্মের, সব শ্রেণীর, সব জাতির মানুষকে এক করিয়া ফেলা। ধর্ম্মের উত্তাপে হৃদয় না গলিলে মানুষ পরকে আপনার করিতে পারে না। হিন্দু ও মুসলমানের একতা কিসে সাধিত হইবে? উভয়ে মিলিয়া এক জাতি কিসে গঠিত হইবে? কোনও সাময়িক রাজনৈতিক স্বার্থের বন্ধনে কি স্থায়ী একতাসাধন সম্ভবপর? সে স্বার্থ সিদ্ধ হইলেই তো একতাসূত্র ছিন্ন হইয়া যাইবে। উভয়ে একই প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বীর সহিত সংগ্রামে নিযুক্ত, এ অনুভবও হৃদয়ের মিলন উৎপন্ন করিতে পারে না। সে প্রবল প্রতিদ্বন্দ্বী যখন না থাকিবে, তখন মিলন কিসের উপর দাঁড়াইবে? "রাজনীতিক্ষেত্রে তুমি আমার ভাই, কিন্তু তুমি আমার ঘরে প্রবেশ করিলেই আমার পানীয় জল অশুদ্ধ হইয়া যাইবে", এরূপ মনের অবস্থা লইয়া কোনও আত্মসম্মানবোধবিশিষ্ট মানুষকে সরলভাবে "ভাই" বলিতে পারা যায় না। এরূপ ভ্রাতৃভাব বালির উপরে নির্ম্মিত অট্টালিকার ন্যায় অস্থায়ী। কংগ্রেসের সময় ভাবের আবেগে কোলাকুলি কর, আর যাই কর, এপ্রকার মিলন ও এপ্রকার ভ্রাতৃভাব অতি অসার। ভাই বলিয়া পরস্পরকে প্রাণ খুলিয়া গ্রহণ করিতে হইলে প্রাণ গলা চাই। উন্নত উদার বিশুদ্ধ ধর্ম্মের উত্তাপ ব্রাহ্মধর্ম্মের সত্য সাধনার উত্তাপই প্রাণ গলাইয়া মিশাইয়া দিতে পারে।

ব্রাহ্মসমাজ কি বলিয়া হিন্দু ও মুসলমানকে ডাকেন? "তুমি ও আমি যে একই—আমরা একই পিতার সন্তান। তুমি ঈশ্বরকে যে নামেই ডাক না কেন, তোমার আহারবিহারের রীতিনীতি ও সামাজিক প্রথা যাহাই হউক না কেন, তুমি আমার সঙ্গে এক। তোমার ধর্ম্মপ্রবর্ত্তক মহাপুরুষগণ আমারও পূজ্য; তোমার ধর্ম্মশাস্ত্রসকল যে পরিমাণে সত্যের ভাণ্ডার, সে পরিমাণে তাহা আমারও নমস্য। তুমি যে সভ্যতা, যে চিন্তাধারা, যে ভাবস্রোত হইতে তোমার অন্তরের মহত্তম আকাঙ্ক্ষাসকলকে পুষ্ট কর, সেই সকল আমারও। আমিও সেই সকলে অবগাহন করিব। আমি হিন্দু হইয়াও ইস্লামের পবিত্র একেশ্বরবাদকে সাদরে গ্রহণ করিব, সর্ব্বজাতিকে একীভূত করিবার যে গৌরবময় ভাব ইস্লামের ভিতরে রহিয়াছে, তাহা আমি বরণ করিয়া লইব।" তেমনি মুসলমান বলিবেন, "ভারতীয় সভ্যতার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ভাব যে ভোগবিলাসে নিস্পৃহতা ও ধর্ম্মকে সংসার অপেক্ষা উন্নত স্থান দান এবং ইহার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আদর্শ যে উদার মৈত্রী, অহিংসা ও ত্যাগ,---এ সকল আমাকেও লইতে হইবে।" পরস্পরের এ সকল ভাবসম্পৎ পরস্পরে গ্রহণ না করিলে আমরা সকলেই যে দরিদ্র থাকিয়া যাই!—এই পবিত্র ধর্ম্মভূমিতে, ও পরস্পরের প্রতি এইরূপ শ্রদ্ধার ভিত্তিতে দাঁড়াইয়া যে একতা হয়, তাহাই স্থায়ী একতা, তাহাই সত্য একতা। ভারতের সকল ধর্ম্মের সকল জাতির লোককে মিলাইয়া এক করিবার জন্য পবিত্র ব্রাহ্মধর্ম্মের সাধনাই একমাত্র উপায়।

এইরূপে নানা দিক দিয়া দেখিতে পাই, বর্ত্তমান ভারতের মানুষের শ্রেষ্ঠ জীবনকে বিকশিত করিবার

ও সম্পূর্ণ করিবার জন্য ব্রাহ্মধর্ম্ম ও ব্রাহ্মসমাজের আদর্শ-সকল গ্রহণ করা অপরিহার্য্য। শুধু অপরিহার্য্য নহে, ইহাই সর্ব্বাপেক্ষা অধিক প্রয়োজন। ইহাই একমাত্র সেই বস্তু, যাহা দেশের নবজীবনের ধারাকে সুপথে প্রবাহিত করিতে পারে; যাহা ব্যক্তিগত, পারিবারিক, সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় সকল কল্যাণের সামঞ্জস্যবিধান করিতে পারে, ও সকলকে সুদৃঢ় ভিত্তির উপরে প্রতিষ্ঠিত করিতে পারে। ভারতের নবজীবনকে সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ও সুদৃঢ় করিবার জন্য, এই নবজীবনের কেন্দ্রস্থলে স্থাপন করিবার একমাত্র যোগ্য বস্তু ব্রাহ্মধর্ম্মের পবিত্র আদর্শ।

ব্রাহ্মসমাজের উপরে এ বিষয়ে যে দায়িত্ব ন্যস্ত রহিয়াছে, তাহার কথা চিন্তা করিয়া পদে পদে আমাদের অপদার্থতা আমরা অনুভব করিতেছি। আমাদের মধ্যে সে ঈশ্বরভক্তি কৈ? পাপের বিরুদ্ধে সে সংগ্রাম কৈ? চরিত্রের শুদ্ধতার জন্য সে প্রাণপণ ব্যাকুলতা কৈ? বিষয়-সুখে পদাঘাত করিয়া উচ্চ লক্ষ্যের জন্য জীবন উৎসর্গ করিবার সে আগ্রহ কৈ? সে প্রেম কৈ, যাহাতে সকলকে এক করা যায়?

আমরা জানি আমাদের পথ কত কঠিন। অতীত হইতে আগত কুসংস্কার দুর্নীতি ও অন্যায়সকল এখনও উন্মূলিত হয় নাই। নূতন করিয়া সমাজগঠন করিতে হইলে যে সহস্র প্রকার প্রশ্ন উত্থিত হয়, তাহার সমাধান এখনও হয় নাই। ব্রাহ্মসমাজ সে সকল প্রশ্নের সমাধানের জন্য যথেষ্ট সময় প্রাপ্ত হন নাই। ইতিমধ্যেই আবার বর্ত্তমান বিকৃত পাশ্চাত্য সভ্যতা হইতে অতিরিক্ত সুখপ্রিয়তা ও ধর্ম্মের প্রতি অবজ্ঞা প্রভৃতি নূতন নূতন পাপ আসিয়া আমাদের দেশকে আক্রমণ করিতেছে! বর্ত্তমান ভারতে ব্রাহ্মসমাজের সম্মুখে যে সকল প্রশ্ন, যে সকল সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে, তাহা কত কঠিন! কিন্তু পথ কঠিন বলিয়া আমরা নিরাশ হইব না। ব্রাহ্ম-সমাজের অতীত ইতিহাসের দিকে দৃষ্টিপাত করি। তাহা একদিকে যেমন কঠোর সংগ্রামের ইতিহাস, তেমনি আবার অতুলনীয় [illegible] ইতিহাস, এবং মানবের ক্ষুদ্র চেষ্টার উপর [illegible] কৃপার ইতিহাস। আমরা রামমোহন রায়কে স্মরণ করি, দেবেন্দ্রনাথকে স্মরণ করি। কত কঠোর সংগ্রামের মধ্যে পড়িয়াও তাঁহারা সত্যের কাছে, ধর্ম্মের কাছে বিশ্বস্ত রহিয়াছিলেন! তাঁহাদের পরবর্ত্তী নেতৃগণ, এবং কত অল্পবয়স্ক বালক, কত দুর্ব্বলা নারী, এ ধর্ম্মের জন্য কত নির্য্যাতন অপমান, কত দারিদ্র্য, কত দুঃখ, অম্লানবদনে সহিয়াছেন! আমাদের অগ্রগামীদিগের জীবনের রক্ত যে বিন্দু বিন্দু করিয়া আমাদের দেশের জমিতে পড়িয়াছে, তাহা কখনও বৃথা হইবার নয়। সত্যের জন্য ধর্ম্মের জন্য সমুদয় কষ্ট বহন করিয়া, বীরের ন্যায় নির্য্যাতন অত্যাচার সহ্য করিয়া, তাঁহারা যে পবিত্র বীরত্বের আদর্শ ভারতবর্ষে প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছিলেন, আজ ভারতের রাজনীতি-ক্ষেত্রের সকল বীরত্বের মধ্যে তাহারই ছায়া দেখিতে পাই। তাঁহারাই এদেশের বর্ত্তমান যুগে নব আত্মোৎসর্গের পথপ্রদর্শক। তাঁহাদের সেই আধ্যাত্মিক অনুপ্রাণনই অদ্যকার ভারতের জাতীয় জীবনকে সতেজ রাখিয়াছে। যে পরিমাণে সেই ধর্ম্মপ্রাণতা ও পবিত্রতা অদ্যকার জাতীয় জীবনে বিদ্যমান, সেই পরিমাণেই এ জীবনের ভিত্তি দৃঢ়। প্রায় অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বে স্বর্গীয় শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় লিখিয়াছিলেন—

> "জীবনসংগ্রামে ভারতের নামে
> যত রক্তবিন্দু পড়িল এবার,
> শত পুত্র হবে বীর অবতার;
> ভারত-আঁধার ভারতের ভার
> ঘুচাইবে তারা, ভেবে ম'রে যাই!"

তাঁহার সে বাণীর সফলতা অদ্যকার জাতীয় জাগরণে দেখিতে পাইতেছি।

আজ ব্রাহ্মদের বলি, অল্পবিশ্বাসী হ'য়ো না, ভীরু হ'য়ো না। ঈশ্বরের বিশুদ্ধ উপাসনা ও তাঁর হাতে আত্মসমর্পণ, তাঁর আদেশে চলা, তাঁর সত্য হ'তে মঙ্গল হ'তে পুণ্য হতে ভ্রষ্ট না হওয়া,—ইহাতে যে ধর্ম্মজীবন হয়, যে চরিত্র হয়, তা-ই এ জাতিকে তুলবে, এই মহাসত্যে রাজা রামমোহন রায় বিশ্বাস করেছিলেন। তাই তিনি ব্রাহ্মসমাজ স্থাপন করেন। প্রত্যেক দেশকে প্রত্যেক জাতিকে উন্নত করবার জন্য বিধাতার এই একই প্রণালী যে, তিনি ধর্ম্মের শক্তি দ্বারা ব্যক্তিগত জীবন, পরিবার, সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, সকলকে উন্নত করে তবে সে-দেশকে সে-জাতিকে তোলেন। বিশ্বাস কর যে তাঁর সে প্রণালী আজ তিনি ভারত সম্বন্ধে ভুলে যান নি, বা পরিত্যাগ করেন নি। ব্রাহ্মসমাজ যদি এই বিশ্বাসে দৃঢ় থাকতে পারেন, এবং আমরা যদি বিধাতার কার্য্যে আপনাদিগকে সমর্পণ করতে পারি, আমরা যদি বিষয়সুখ অপেক্ষা ধর্ম্মকে নিজ নিজ জীবনে বড় ক'রে তুলতে পারি, তা হ'লেই বর্ত্তমান ভারতে বিধাতার গৌরবময় কার্য্যে ব্যবহৃত হ'য়ে আমরা ধন্য হতে পারব।

বর্ত্তমান সময়ে স্ত্রীলোকের কর্ত্তব্য।

(রায় বাহাদুর শ্রীচারুচন্দ্র মুখোপাধ্যায়)

দৈহিক।

আজকাল শুধু যে স্ত্রীলোকদিগের দেহ দুর্ব্বল হইয়া

পড়িয়াছে তাহা নহে, পুরুষদিগেরও দৈহিক শক্তি অনেক কমিয়া গিয়াছে। কিন্তু আজ আমি স্ত্রীলোকদিগের শরীর সম্বন্ধেই বলিব। কন্যা জন্ম হইতে আরম্ভ করিয়া যেরূপ ভাবে লালিত-পালিত হয়, তাহাতে তাহার নিতান্ত অদৃষ্টের জোর না থাকিলে বাঁচিবার কোন আশা দেখি না। কন্যা জন্মিলেই মাতা ও অন্যান্য আত্মীয়স্বজনেরা পুত্রমুখ-দর্শনে বঞ্চিত হইবার জন্য অত্যন্ত দুঃখিত হন। পিতার ত দুঃখের অবধি থাকে না, কারণ কন্যা জন্মিবামাত্র তাঁহাকে তাহার অবশ্যম্ভাবী বিবাহের খরচের কথা ভাবিয়া ব্যাকুল হইতে হয়। আমাদের প্রসবের (আঁতুড়) ঘরও আমরা বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা নিকৃষ্ট ঘর বাছিয়া ঠিক করি। সেখানে আলো ও বাতাসের প্রবেশ নিষেধ। ফলে শিশু কন্যাকে শীঘ্রই পেঁচোয় পায় ও তাহার কন্যাজন্ম গ্রহণ করিবার দুঃখ, পিতার ও আত্মীয়স্বজনের মন হইতে, আপনা আপনি লোপ পায়। সন্তান প্রসব করা স্ত্রীলোকের একটী সঙ্কটাপন্ন সময়। সেই সময়ে আঁতুড় ঘর বাড়ীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ভাল ঘর ও মাটীতে শয়ন করিতে না দিয়া, অন্ততঃ একটী তক্তাপোষের উপর প্রসূতিকে শোয়ান উচিত। তাহা হইলে শিশু-মৃত্যু অনেক কমিয়া যাইবে ও পেঁচো ঠাকুরের দৌরাত্ম্য থাকিবে না। নেহাৎ যদি কপালের জোর থাকে, তাহা হইলে মেয়ের কাপড় চোপড় ও আহার সম্বন্ধে পিতামাতার দৃষ্টি থাকে না, কারণ কন্যার এই সব ব্যাপারে কন্যা জন্মগ্রহণ করার দরুণ, কোন বিশেষ দাবী করিবার অধিকার নাই। মেয়ে একটু বড় হইতে না হইতে তাহার বিবাহের জন্য পিতা মাতা ব্যস্ত হইয়া পড়েন। দশ বৎসর পার হইলেই মেয়ের আর বাড়ীর বাহির হইবার অধিকার থাকে না; তাহাকে বাড়ীর ভিতরেই অবরুদ্ধ থাকিতে হয়। যদি দৈবক্রমে মেয়ের স্বাস্থ্য ভাল হয় এবং মেয়ে বাড়ন্ত হয় তাহা হইলে সেটাও একটা চিন্তার কারণ হইয়া উঠে। কারণ শীঘ্র বিবাহ না দিলে পিতামাতার অন্ন পরিপাক হয় না। সুতরাং মেয়ে যতই কৃশ ও দুর্ব্বল হয় ততই পিতামাতার সুবিধা—পাত্র দেখিবার অনেক সময় পাওয়া যায়, গহনাগুলিও ছোটখাট হয়—বেশী খরচ পড়ে না। জামাশাড়ী সবই কম খরচে হয়। যাহা হউক, মেয়ের বিবাহ হইলে, বার তের বৎসর হইতে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া গেল, সেখানে তাহাকে লম্বা ঘোমটা টানিয়া ঘরের ভিতর থাকিতে হইবে ও আধবয়সী রমণীর মত আচরণ করিতে হইবে।

অনেকে হয় ত বলিবেন যে এ ত চিরকালই হইয়া আসিতেছে—কিন্তু এ চিরকালের প্রথা নহে। পাড়াগাঁয়ের মেয়েরা নদীতে গিয়া স্নান করে, পুকুর হইতে জল আনে, ঢেঁকিতে চাল কুটে, জাঁতায় ডাল ভাঙ্গে, একবাড়ী ওবাড়ী নিঃসঙ্কোচে যাইতে পারে। কবিরা মধুর কক্ষে কলসী, চরণে নূপুরধ্বনি, কত কবি বর্ণনা করিয়াছেন।

যাহাই হউক পূর্ব্বে মেয়েদের শারীরিক পরিশ্রম ও মুক্তবাতাস ভোগ যথেষ্ট হইত। এখন তাহার পরিবর্ত্তে কেবল সংরে ঘরে বন্ধ থাকা ও রমণীর অনিবার্য্য কর্ম্ম, রান্নাঘর দেখা। ফলে মেয়েদের ছেলেপিলে হইলেই হয় সূতিকা, না হয় কাল-যক্ষা, শীঘ্রই আসিয়া পড়ে। এই যে আজ এই সভায় এতগুলি স্ত্রীলোক আসিয়াছেন, ইঁহাদের মধ্যে কয়জন বলিতে পারেন যে তাঁহাদের শরীরে কোন ব্যাধি নাই ও তাঁহারা হৃষ্ট, পুষ্ট, বলিষ্ঠ?

শরীর বলিষ্ঠ হইবার প্রধান উপাদান পুষ্টিকর খাদ্য; কিন্তু এ সম্বন্ধে মেয়েরা সম্পূর্ণ উদাসীন। তাহারা বিবাহের পর হইতেই খাদ্য সম্বন্ধে সন্ন্যাস-ধর্ম্ম অবলম্বন করেন। স্বামী ও অন্যান্য পুরুষগণের জন্য মাছ মাংস নানপ্রকার মিষ্টান্ন, ক্ষীর দই ইত্যাদি তাঁহারা রাঁধিয়া তাঁহাদের নারীজন্ম সার্থক করেন। পুরুষদের আহার না হইলে তাঁহাদের খাইবার হুকুম নাই, আর পুরুষেরা যাহা খাইতে পারেন তাহার দ্বিগুণপরিমাণ খাওয়াইবার জন্য স্ত্রীলোকেরা ব্যস্ত। ফলে যখন তাঁহারা নিজে খাইতে বসেন, তখন কেবল শাকচচ্চড়ী ও অম্বল ভিন্ন হেঁসেলে আর কিছু থাকে না। মেয়েরা মাছমাংস চাহিয়া খাইলে সেটা অত্যন্ত লোভের চিহ্ন। এমন কি যে সব স্ত্রীলোকেরা বৎসর বৎসর সন্তান প্রসব করিয়া, স্বামীর বংশ রক্ষা করিতেছেন তাঁহাদিগেরও, সন্তান ধারণ করিবার ও লালন পালন করিবার জন্য যেটুকু সারবান খাদ্যের আবশ্যক, তাহাও তাঁহাদের জোটে না। এ বিষয়ে শ্বশুরশাশুড়ীর কিম্বা প্রবীণা গৃহিণীর এবং পত্নীর সমস্ত ভারবহনের কর্ত্তা, অর্থাৎ স্বামীর দৃষ্টি রাখা উচিত। স্বামী যেরূপ খাইবেন স্ত্রীকেও সেইরূপ খাওয়ান উচিত। সময়ে উপযুক্ত আহার ও ব্যায়াম যাহাতে প্রত্যেক স্ত্রীলোক করিতে পারেন সে বিষয়ে আমাদের যত্নবান হওয়া উচিত। আমি বলি না যে মেয়েরা ফুটবল খেলুক কিম্বা দুবেলা সদর রাস্তায় একলা একলা বেড়াইয়া বেড়াক। তবে প্রত্যেক মেয়ের বাড়ীতে Muller's exercise—যাহার জন্য কোন সরঞ্জামের আবশ্যক নাই সেইরূপ কোন ব্যায়াম করা উচিত। স্বামী কিম্বা অন্য কোন আত্মীয়ের সহিত খোলা মাঠে কিম্বা বাড়ীর বড় উঠানে, দিনে অন্ততঃ দুই ঘণ্টা বেড়ান উচিত। এই সব করিলে মেয়েদের শরীর সবল হইবে ও আজকালকার দুর্দ্দিনে তাঁহারা আত্মরক্ষা করিতে পারিবেন। এই যে পাঞ্জাবে একমুষ্টি শিখ রমণী আছেন কে, তাঁহাদের উপর অত্যাচারের কথা কখনও শোনা

যায় না কেন? শিখ রমণী বলিষ্ঠ ও আত্মরক্ষা করিতে জানেন। প্রত্যেক বাঙ্গালী রমণীরও এবিষয়ে যত্নবান হওয়া উচিত।

মানসিক।

শরীরে বল হইলেই যে রমণী আত্মরক্ষা করিতে পারেন তাহা নহে। মনের বলও অত্যন্ত দরকার। যদি মনের জোর না থাকে তাহা হইলে শরীরে সামর্থ্য থাকিলেও কাপুরুষের মত সে সামর্থ্যের কোন ফলই হইবে না। শুধু যে আত্মরক্ষার জন্য মানসিক সামর্থ্যের প্রয়োজন তাহা নহে; আপদ বিপদে মনের বল না থাকিলে আপনাকে বিপদ হইতে রক্ষা করিতে পারিবেন না। অনেক সময় দেখা যায় যে, দুর্ব্বল দেহধারী রমণী, মানসিক বলের দ্বারা আশ্চর্য্য ঘটনা ঘটাইয়াছেন। কত নারী শৈশবে বিধবা হইয়া দরিদ্রতার মধ্যে সন্তানগণকে লালন পালন করিয়া তাহাদিগকে মানুষ করিয়াছেন। কেহ কেহ আপনার বিষয়-আশয় দেখিয়া সম্পত্তি রক্ষা করিয়াছেন। প্রত্যেক রমণীর মনে রাখা উচিত যে পুরুষদিগের মনের ভিতর যে বল আছে, সে বল পুরুষের একচেটে নহে, সে বলের ভাগী রমণীও সহজেই হইতে পারেন। আর না হইলে দুর্ব্বল দেহ ও দুর্ব্বল চিত্ত লইয়া তাঁহাদিগের কষ্টের অবধি থাকিবে না।

নৈতিক (Intellectual) স্ত্রীশিক্ষা।

স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে আমার বলিবার বিশেষ অধিকার আছে। কারণ আমার স্বর্গীয় পিতৃদেব বাঙ্গলা বেহার উড়িষ্যার মধ্যে প্রথম আমাদের গ্রামে আজ প্রায় ৭০ বৎসর পূর্ব্বে বালিকা বিদ্যালয় স্থাপন করেন। তাহার জন্য তিনি অনেক লাঞ্ছিত হইয়াছিলেন কিন্তু তাঁহার বীরহৃদয় স্ত্রীশিক্ষা একান্ত আবশ্যক মনে করিয়া আদৌ টলে নাই। আমিও নিজে রাঁচিতে বালিকাবিদ্যালয়ে পাঁচ বৎসর কাল secretary (সম্পাদক) ছিলাম, সুতরাং আশা করি স্ত্রীশিক্ষা সম্বন্ধে যাহা বলিতেছি তাহা আপনারা ধৃষ্টতা মনে করিবেন না।

মানসিক বললাভ করিতে হইলে স্ত্রীশিক্ষার বিশেষ প্রয়োজন। আসুরিক বলে ও জ্ঞানের বলে অনেক প্রভেদ। মেয়ে লেখাপড়া না শিখিলে তাহার জ্ঞান হইবে না, জ্ঞান না হইলে মনেরও বল হইবে না। আমরা ছেলেকে প্রথম শিক্ষা হইতে বিএ, এম-এ, পাশ করা পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে কত খরচ করি। কিন্তু আমরা পয়সা খরচ করিয়া মেয়েকে লেখাপড়া শিখাইতে একেবারে নারাজ। এটা আমরা বুঝি না যে, মেয়ের লেখাপড়ার ভার ছয়-সাত বৎসরের অধিক বহন করিতে হয় না, কিন্তু ছেলের লেখাপড়া কুড়ি বৎসর সময় সাপেক্ষ। মেয়েরা চাকরী করিবে না সুতরাং তাহাদের লেখাপড়া শেখার প্রয়োজন নাই, ইহা বিষম ভুল ধারণা। মনু হইতে আদি ঋষিগণ সকলেই বলিয়াছেন যে, কন্যাকে উপযুক্ত শিক্ষাদান করা পিতার বিশেষ কর্ত্তব্য। আমরা চাই, মেয়ে স্কুলে পড়িবে, অথচ মেয়ের স্কুলের মাহিনা দিতে রাজি নই; বই কিনিয়া দিতে কষ্ট বোধ হয়; বাড়ীতে মাষ্টার রাখিয়া মেয়েকে লেখাপড়া শিখান নেহাৎ অপব্যয় বলিয়া মনে করি। অবশ্য ইহা আমি বলিতে চাহি না যে প্রত্যেক মেয়েকে বি. এ, এম-এ, পর্য্যন্ত পড়ান উচিত। যে মেয়ের সে সখ আছে, যে পিতামাতা মেয়েকে সে পর্য্যন্ত শিক্ষা দিতে চান, সে মেয়ে বি-এ, এম-এ, পাশ দিক। কিন্তু সাধারণতঃ প্রত্যেক মেয়ের মাতৃভাষা লিখিবার ও পড়িবার ক্ষমতা এবং সামান্য অঙ্ক জানা উচিত। তা' না হইলে মেয়েরা চাকরদিগের কাছে বাজার খরচে ঠকিবে—দেনাপাওনার হিসাব করিতে পারিবে না; চিঠিপত্র লিখিবার অনুপযুক্ত হইবে—এমন কি, সামান্য ইংরাজি জানা মন্দ নহে। আমার মনে হয় যে, যদি সাধারণ মেয়ে অন্ততঃ First Book পর্য্যন্ত ইংরাজি পড়েন তাহা হইলে আরও উপকার হয়। আমি দেখিয়াছি হঠাৎ একটা টেলিগ্রাম আসিলে মেয়েরা পড়িতে না পারার দরুণ, মিথ্যা বিপদ আশঙ্কা করিয়া কাঁদিয়া পাড়া মাতাইয়াছেন এবং টেলিগ্রাম পড়াইবার জন্য এ বাড়ী ও বাড়ী লোক পাঠাইয়া ব্যস্ত হইয়াছেন। যে বিদ্বান পুরুষ টেলিগ্রাম পাঠ করিয়া বুঝাইয়া দিবেন, তিনি হয় ত মূর্খ, ফলে "উদোর পিণ্ডি বুদোর ঘাড়ে" চাপাইয়া মেয়েদের মনে আরও ত্রাস উৎপাদন করেন।

এখনকার মেয়েদের শিক্ষার কয়েকটী বাধা দেখিতে পাই। প্রথমতঃ স্কুলে একজামিনের ভয়ে পুরুষেরাই শুকাইয়া যায়, মেয়েদের কথা ত দূরে! আমি অনেকগুলি একজামিন দিয়াছি আর আমার একজামিনের আতঙ্ক এত বেশী ছিল যে এ বয়সেও স্বপ্নে পরীক্ষা দিতেছি দেখিয়া ভয়ে শিহরিয়া উঠি। আমেরিকায় মেয়েদের যে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে তাহাতে একজামিন নাই। মার্কিনজাতি পৃথিবীর ভিতর খুব অগ্রসর। মার্কিন রমণী শিক্ষিতা রমণীগণের ভিতর পৃথিবীর মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা চতুর। অবশ্য তাঁহাদের অনেক দোষও আছে যাহার উল্লেখ করিতে চাহি না। কিন্তু তাহারা স্কুলে প্রত্যেকেই মোটামুটী মাতৃভাষা, হিসাব, রান্না, সেলাই ও শিশুলালন-পালন করিবার পদ্ধতি শিখে। শিখিয়া খালি একটী certificate পায়—পরীক্ষা দিতে হয় না। আমার মনে হয় আমাদের দেশের মেয়ে স্কুলগুলিতে পরীক্ষা উঠিয়া যাওয়া উচিত এবং মেয়েদের মোটামুটি সেই সকল বিষয়ে শিক্ষা দেওয়া উচিত যাহাতে

তাহারা চতুর গৃহলক্ষ্মী হইতে পারে। দেখিতে পাই যদিও ১০॥০ কিম্বা ১১টায় স্কুল আরম্ভ হয়, তবু মেয়েরা আধপেটা খাইয়া নয়টা বাজিতে না বাজিতে স্কুলের গাড়ী আসিলেই চলিয়া যায়। স্কুলে উপযুক্ত জলযোগের ব্যবস্থা থাকে না, ফলে স্কুলে গিয়া স্বাভাবিক সুস্থ দেহের পরিবর্ত্তে, কতকগুলি অনাবশ্যকীয় জিনিস শিখিয়া মেয়েরা বর্ত্তমান শিক্ষা লাভ করে। প্রত্যেক বাঙ্গালী স্ত্রীলোকের দেখা উচিত যে তাঁহার কন্যা মোটামুটি শিক্ষা লাভ করে। এই মোটামুটি শিক্ষা থাকিলে বই দেখিয়া বিনা ডাক্তার ডাকিয়া হঠাৎ আবশ্যক হইলে ঔষধ পত্র দিতে পারিবে।

সামাজিক।

সামাজিক প্রথা সম্বন্ধে কোন কথা বলিতে গেলে অনেক সময় অপ্রিয় হইতে হয়। অবরোধপ্রথা সম্বন্ধে পূর্ব্বেই বলিয়াছি, এখন অল্প বয়সে মেয়ে বিবাহ সম্বন্ধে দু' এক কথা বলিব। প্রথমতঃ অল্প বয়সে বিবাহ দিলে মেয়েদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থাকে, কারণ বিয়ের পর স্কুলে পড়া অনেক শ্বশুর-শাশুড়ীর আপত্তিজনক মনে হয়। সুতরাং একটু বেশী বয়সে বিবাহ হইলে মেয়েকে লেখাপড়া, সেলাই রান্না ইত্যাদি কাজে উপযুক্ত শিক্ষা দেওয়ার সময় পাওয়া যায়। দ্বিতীয়তঃ মেয়েরা দেখিতে পাই girlhood অর্থাৎ কুমারী জীবন বলিয়া কোন অবস্থা অনুভব করে না। দশ বৎসর হইলেই তাহারা দিবারাত্র বিবাহের কথা শুনে। যদি মেয়ে হাসে অথবা কৌতুক করে তাহা হইলে তাহাকে আমরা "বেহায়া" বলি। বার বৎসরে শ্বশুর বাড়ী চলিয়া গেলে তখনি সে গৃহিণী বলিয়া গণ্য হয়। অথচ কুড়ি বৎসরের "ছোট খোকা" আমাদের ঘরে ঘরে বিরাজমান। তাহার দৌরাত্ম্য আমরা হাসিমুখে সহ্য করিতেছি। মাতার নিকট উহা বালকস্বভাবসুলভ চাপল্য বলিয়া পরিগণিত হয়। বাঙ্গালীর মেয়েরা "কুড়ি পেরুলেই বুড়ি" হয়। বেচারারা বালিকাভাব কাহাকে বলে তাহা জানিতে পারে না। মুক্ত আকাশ, মুক্ত বাতাস, বিমল হাসি, নির্দ্দোষ উপহাস, যাহা সব সরল স্বভাবের লক্ষণ, এ সমস্ত বালিকার বেলায়, আমরা অসময়ে উৎপাটন করিয়া দিই। সেইজন্য একটু বেশী বয়সে মেয়েদের বিবাহ হইলেই ভাল। তাই বলিয়া আমি বলি না যে, মেয়েকে চেষ্টা করিয়া ২০।২৫ বৎসর পর্য্যন্ত অবিবাহিত রাখা উচিত। তবে হয় ১৪।১৫ বৎসর বয়সে বিবাহ হইলে ভাল হয়। আজকাল উপযুক্ত বর পাওয়া যেরূপ দুর্ঘট হইয়া দাঁড়াইয়াছে তাহাতে কার্য্যতঃ মেয়ের বিবাহ এই বয়সেই হইতেছে। ইহা দুঃখের কারণ না হইয়া সুখের কারণ হওয়া উচিত। গৌরীদান করিয়া কন্যার অকালে বৈধব্যযোগ হইলে সে কন্যার পুনরায় বিবাহ দেওয়া উচিত। অনেক স্থলে দেখিতে পাই ১০।১১ বৎসরের কন্যা বিধবা হইয়াছে। যে স্বামী কিম্বা বিবাহিত জীবন জানিল না তাহাকে বিধবা কি প্রকারে বলা যাইতে পারে? যাঁহার ঘরে অল্পবয়স্কা বিধবা কন্যা নাই তিনি বালবিধবার দুঃখ বুঝিতে পারেন না। এই সব অবলার বিবাহ পুনরায় ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যেই দেওয়া উচিত। এ সম্বন্ধে আরও অনেক কথা বলিতে পারি, কিন্তু সে সব আরও অনেক সময় লাগিবার ভয়ে সংক্ষেপে বলিলাম।

আমাদের সমাজে একটী ভীষণ প্রথা ইদানীং চলিতেছে। সভাসমিতিতে বক্তৃতার ছড়াছড়ি, ছেলেরা দলে দলে প্রতিজ্ঞাপত্রে সহি করিতেছে যে বিবাহে পণ লওয়া উচিত নয়। কিন্তু যখন বিবাহের সময় উপস্থিত হয়, তখন পাত্রের পিতামাতা এসব কথা ভুলিয়া যান। কন্যাদায়গ্রস্ত কত লোক পণদায়ে সর্ব্বস্বান্ত হইয়াছেন; শ্বশুর-শাশুড়ী উপযুক্ত পরিমাণ পণ না পাইয়া লক্ষ্মীস্বরূপিণী বধূমাতাকে নৃশংস নির্য্যাতন করিয়াছেন; কত "স্নেহলতা" পিতার পণদানে অক্ষমতা দেখিয়া আত্মবিসর্জন করিয়াছে. তবুও বাঙ্গালী জাতির চক্ষু ফুটে নাই। যে পিতা নিজের কন্যার পণদান সম্বন্ধে বিরুদ্ধবাদী হন, তিনি নিজ পুত্রের বিবাহের সময় পাত্রীর পিতার উপর প্রতিশোধ লইতে চেষ্টা করেন। প্রত্যেক পুত্রের মাতার নিকট আমার সবিনয় নিবেদন যে, তাঁহারা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়া এই পণপ্রথা বন্ধ করুন। অন্ততঃ কন্যার পিতা স্বেচ্ছায় ও অবস্থানুসারে যাহা কিছু দিতে পারেন, তাহার অতিরিক্ত উৎপীড়ন করিয়া না লওয়াই ভাল।

আগে বাঙ্গালী ঘরে "বার মাসে তের পার্ব্বণ" ছিল। বিয়ে, পৈতে, সাধ, অন্নপ্রাশন, দোল, দুর্গাপূজা, চণ্ডীপাঠ, সত্যনারায়ণের কথা ইত্যাদি নানা উৎসব হইত। এখন অর্থাভাবে ও আস্থাভাবে প্রায় এ সকল উঠিয়া যাইতেছে। এই সব সামাজিক ও পারলৌকিক পার্ব্বণ উপলক্ষে গ্রামের যত স্ত্রীলোক একত্রিত হইয়া কত আনন্দ উপভোগ করিতেন। এখন মেয়েদের আপনাদের ভিতর মেশামেশীর সুযোগ অত্যন্ত কমিয়া গিয়াছে। সারাদিন গৃহস্থালীর কাজ করিয়াও লজ্জাহীনা বলিবার ভয়ে মুখটী বুজিয়া মেয়েরা ঘরের ভিতরেই বেশী থাকেন। বাঙ্গালী জাতির মুখে হাসি দেখিতে পাই না—কই মেয়েদের মুখে আজকাল হাসি কোথায়? কত কবি স্ত্রীলোকের সহাস বদন কবিতায় অমর করিয়া গিয়াছেন। কিন্তু সেই হাস্যসুধাযুক্ত রমণীর মুখ আজকাল কোথায়? চিন্তা, ক্লেশ, ব্যাধি, দারিদ্র্য, এমন কি কোন কোন স্থানে গঞ্জনা, তাড়না ভোগ করিয়া মেয়েদের মুখের হাসি লোপ পাইয়াছে! যাহাতে মেয়েরা মাঝে মাঝে আপনার

স্ত্রীলোক বন্ধুগণের সহিত মিশিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা পুরুষদের করা উচিত। এই সকল কারণে মহিলাসমিতি ইত্যাদি সভার প্রয়োজন। আমি ইহা বলি না যে এই সকল সভায় মেয়েরা খালি আড়ষ্ট শালগ্রাম শিলার মত বসিয়া মন্ত্রমুগ্ধের ন্যায় বক্তৃতা শুনেন। এই সব সভায় তাঁহাদের অবাধে গল্প, তামাসা ও তাসখেলা ইত্যাদি আমোদপ্রমোদে কিছু সময় কাটান উচিত। কোন সদ্‌বিষয়ে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া, সেলাই যাহারা জানেন না তাঁহাদের সেলাই শিক্ষা দিয়া, যাঁহারা গান করিতে পারেন তাঁহারা নিঃসঙ্কোচে গান করিয়া সময় কাটাইতে পারেন; কারণ আপন ঘরে গান করিলে "বেহায়া" বলিয়া নিন্দা হইতে পারে।

আমার মনে হয় যে, গান একটী প্রশংসনীয় বিদ্যা। সঙ্গীতে শোক-দুঃখ ভুলাইয়া দেয়, ভগবৎসঙ্গীতে হৃদয়ে ভগবৎভক্তি জাগরিত করে, ক্ষণিকের তরে শ্রোতা ও গায়িকা কোন এক স্বপ্নরাজ্যে চলিয়া যান। যে হিন্দুদের শাস্ত্রে লেখা আছে যে স্বর্গে কিন্নরী, অপ্সরী, গন্ধর্ব্বরমণী সঙ্গীতে দেবদেবীদের হৃদয় মাতাইয়া দেন, সেই হিন্দুরমণীরা গান করিলে দোষের বলিয়া মনে করা অন্যায়।

আজকাল আমরা অতিথিসেবা করিতেও কুণ্ঠিত। আগে দেখিয়াছি বাড়ীতে খাওয়ান হইলে পিসী মাসী, পাড়াপ্রতিবাসী স্ত্রীলোকদের কি আনন্দ! কি উৎসাহ! এখন একটী লোককে খাওয়াইতে গেলে আমরা বাজারে ছুটাছুটী করিয়া খাবার আনাইয়া দিই। যে হিন্দু-রমণী রন্ধনকার্য্যে নিপুণা বলিয়া বিশ্ববিখ্যাত, সেই হিন্দু-রমণী রন্ধন করিয়া অতিথিসেবা করিতে আজ কুণ্ঠিত। আমরা বিলাতী সভ্যতার অনুকরণে এক পেয়ালা চা ও দুটো বিস্কুট, খুব জোর না হয় এক খণ্ড শুষ্ক কেক্ খাওয়াইয়া অতিথিসৎকার করি। এখন "জলপানের" বদলে "চা-পান" বা Tea-party দিই। তৎসম্বন্ধেও আপনাদের কাছে আমার নিবেদন এই যে, বরং ঘরের তৈয়ারী সামান্য খাবার দিয়া অতিথিসৎকার করিবেন, কিন্তু বিলাতি "চা-পার্টি" করিলে বাঙ্গালী রমণীর গৌরব ক্ষুণ্ণ হইবে। বাজারের খাবার খাইয়া আমরা ব্যাধিগ্রস্ত হইয়া পড়িতেছি। তাহার পরিবর্ত্তে ঘরে ছানা কাটাইয়া সন্দেশ, রসগোল্লা, তাও যদি কষ্টকর হয় তবে শুধু ছানা ও চিনি মাখিয়া খাওয়া গেল, এমন কি মুড় বা চিড়ে ভাজা, তাও উৎকৃষ্ট খাবার। ঘরের তৈয়ারী রুটী কি লুচি, একটু তরকারী কিম্বা মোহন-ভোগ অতি উপকারী জিনিষ। ছোট ছেলেদেরও জলখাবার হিসাবে শুধু যদি মোহনভোগ দেওয়া যায় তাহা হইলেও পুষ্টিকর খাদ্য হইবে। তবে যাহাদের লিভার কিম্বা প্লীহার অসুখ আছে তাহাদের পক্ষে ঘিয়ের দ্রব্য আদৌ ভাল নহে। বাঙ্গালীর ঘরে সর্ব্বাপেক্ষা পুষ্টিকর খাদ্য বোধ হয় ডাল বলা যাইতে পারে। ইহা মাছ-মাংস অপেক্ষা উৎকৃষ্ট। যাঁহারা ডাল হজম করিতে পারেন তাঁহাদের মাছ-মাংস খাইবার শারীরিক কোন আবশ্যকতা নাই। একসের ডালের দাম চারি আনা অথচ মাছ কি মাংসের দাম বার আনা, অধিকন্তু মাছমাংসের তুলনায় ডাল পরিমাণ হিসাবে প্রায় আটগুণ পুষ্টিকর। একমাত্র ডাল হইতে বড়ি, ডালভাতে, ডালের ধোকা, ডালের বড়া, চাপডাল, ঝোলডাল, খিচুড়ী, মুগের নাড়ু, পাঁপড় ইত্যাদি কত প্রকার রুচিকর খাদ্য আমরা করিতে পারি।

সামাজিক আর একটী প্রথা সম্বন্ধে দু'একটী কথা বলিব, আশা করি আপনারা ক্ষমা করিবেন। আমরা পুরুষেরা জুতা, মোজা, কোট, প্যান্টলুন, টাই, কলার, টুপি ইত্যাদি নানারূপ পোষাকে ভূষিত থাকি। অথচ শীতপ্রধান দেশে কিম্বা খারাপ রাস্তায় মেয়েদের বিনা জুতাপায়ে হাঁটাইয়া লইয়া যাই। শীতে গরম কাপড় দিতে কুণ্ঠিত হই। এমন কি কোন কোন বাড়ীতে মেয়েরা জামা পরিলে আপত্তি হয়। ইহা অন্যায়। ঠাণ্ডা লাগাইলে মেয়েদের নানা প্রকার রোগ হয়। রাস্তায় চলা-ফেরার সময় মেয়েদেরও পায়ে জুতা পরা একান্ত আবশ্যক। অবশ্য আমি ইহা বলি না যে ঘরের ভিতর তাঁহারা দিবারাত্র জুতামোজা পরিয়া বসিয়া থাকিবেন।

হিন্দু রমণী আদর্শ গৃহিণী বলিয়া জগতে বিখ্যাত। রান্নায়, সেবায়, পতিভক্তিতে ও নানাগুণে বিভূষিতা। কিন্তু দুঃখের বিষয় তাঁহাদের মধ্যে অনেকে স্বামীর সহচরী হইতে পারেন নাই। কি করিয়া হইবেন? যে বালিকা শ্বশুরবাড়ী আসিয়া স্বামীকে দেখিয়াই ঘোম্‌টা দিবেন, গুরুজন সমক্ষে স্বামীর সহিত কথা কহিলে নিন্দাভাজন হইবেন, দিবাভাগে গুরুজন সমক্ষে স্বামীর মুখদর্শন করিলে যাঁহার মহা পাপ হইবে, সে বালিকা কি করিয়া বয়স হইলে স্বামীর সহচরী হইবেন? কি করিয়া স্বামী তাঁহাকে নিজের ইচ্ছামত শিক্ষা দিয়া স্ত্রীকে জীবনের সঙ্গিনী করিয়া লইবেন? হিন্দুরমণী অর্দ্ধাঙ্গিনী, সহধর্ম্মিণী ও লক্ষ্মীস্বরূপিণী হইতে পারেন, কিন্তু এখনও কর্ম্মক্ষেত্রে স্বামীর সহচরী এবং সহধর্ম্মিণী হইবার সুযোগ ও শিক্ষালাভ করেন নাই। এ দোষ রমণীর নয়—শিক্ষার। স্বামী সারাদিন কর্ম্মক্ষেত্রে খাটিয়া বাড়ী ফিরিলেন, পত্নী রান্নাঘরে বা অন্য কোন স্থানে, গৃহকার্য্যে ব্যাপৃতা। ইউরোপ ও আমেরিকার রমণীগণ বাঙ্গালী রমণীর ন্যায় পতিব্রতা, ভক্তিমতী ও

ত্যাগী না হইতে পারেন কিন্তু বাস্তবিক তাঁহারা স্বামীর সহচরী। স্বামীর সর্ব্বপ্রকার আনন্দে তাঁহারা যোগদান করেন, সর্ব্বপ্রকার আমোদের ভাগ পাইবার জন্য লালায়িতা হন। কিন্তু আমাদের সমাজে স্বামী স্ত্রীকে লইয়া বেড়াইলে, কিম্বা বায়স্কোপ অথবা সার্কাস দেখিতে লইয়া গেলে তাহা কেন নিন্দার বিষয় হয়, বুঝিতে পারি না। আশা করি প্রত্যেক মাতা ও প্রত্যেক শাশুড়ী এই বিষয়ে একটু দৃষ্টিপাত করিবেন যাহাতে তাঁহাদের পুত্রেরা পত্নীদিগকে সহচরী জ্ঞান করিতে পারেন।

আধ্যাত্মিক।

এইবার আমি আপনাদের ধর্ম্ম সম্বন্ধে সামান্য কিছু বলিতে চাই। বিষয়টী এত বড় ও এত জটিল যে অল্প সময়ে ও অল্প কথায় বুঝান বড় শক্ত। আজ পর্য্যন্ত কেহ স্বর্গে গিয়া ফিরিয়া আসিয়া আমাদের বলিতে পারেন নাই যে, বাস্তবিক ভগবান আছেন কি না, কিম্বা তাঁহার স্বরূপ কি? আমরা কেহই বিশ্বাস করি না যে, হিন্দুদিগের জন্য একটী ভগবান, খৃষ্টানদিগের জন্য দ্বিতীয় ভগবান, অথবা অন্যান্য জাতিদিগের জন্য ভিন্ন ভিন্ন ভগবান আছেন। ভগবানের অস্তিত্ব মানিয়া ধর্ম্মপথে চলার প্রয়োজন কি? অধর্ম্মপথে থাকিলে সমাজ চলিতে পারে না। যেরূপ অন্যায় করিলে আদালতে শাস্তি পাইবার ভয় থাকে, সেইরূপ অনেক অপরাধ আছে, যাহা মানুষের চক্ষে না আসিলেও কিম্বা প্রকাশ না পাইলেও সমাজের বিচারে তাহা নিতান্ত অন্যায়। সমাজশাসন ও পরিবারপালনের জন্য ধর্ম্মবিশ্বাস আবশ্যক। যদি আমরা দয়ালু পরোপকারী সত্যবাদী জিতেন্দ্রিয় পরদুঃখকাতর এবং কায়মনোবাক্যে পবিত্র হই, তাহা হইলে আমরা ভগবানের অস্তিত্ব সম্বন্ধে চর্চ্চা না করিলেও ইহজগতে আমরা নিজেরা সুখ ও শান্তি পাইব এবং অন্যান্য সকলকে সুখী করিতে পারিব। যদি সত্যই ভগবান থাকেন তাহা হইলে, এইরূপ আচরণে আমরা তাঁহার চরণে স্থান পাইব। আর যদিই বা তাঁহার অস্তিত্বে বিশ্বাস আমাদের ভ্রান্ত ধারণা হয়, তাহা হইলেও এই পৃথিবীতে আমাদের আচরণের দ্বারা, স্বর্গসুখ ভোগ করিব। অনেক সময় দেখিতে পাই, কাহারও বাড়ীতে অসুখ হইয়াছে দেখিবার লোক নাই। কোনও ভদ্ররমণীর অর্থকষ্ট হইয়াছে লজ্জায় কাহারও নিকট ভিক্ষা চাহিতে পারেন না। কাহারও আত্মীয় স্বজনের মৃত্যু হইয়াছে সংকার করিবার লোক নাই। এ সকল স্থলে আমাদের পরস্পর জাতি-বর্ণ-ধর্ম্ম সব ভুলিয়া আতুরের সেবা, দীনের সাহায্য, ও মৃতের অন্তিম কার্য্য করা উচিত। ইহজগতে সেবা ব্রতই প্রকৃত ধর্ম্ম।

আপনারা বোধ হয় জানেন, যে এই বিশাল হিন্দু-ধর্ম্মে সকল প্রকার মতাবলম্বীর স্থান আছে। এই ধর্ম্মে শৈব, শাক্ত, বৈষ্ণব, একেশ্বরবাদী, সাকার ও নিরাকার-বাদী সকলেরই অধিকার আছে। অথচ দেখুন সেই একই ভগবানের পূজা সকলেই করেন। আবার দেখুন খৃষ্টান কিম্বা মুসলমানেরা—তাঁহারাও সেই একই ভগবানের পূজা করিতেছেন। কাহারও বলা উচিত নয় যে তাঁহার নিজের ধর্ম্মই একমাত্র সার ধর্ম্ম ও অন্য ধর্ম্ম মিথ্যা। কোন ধর্ম্ম চুরি করিতে, কিম্বা অন্যায় আচরণ করিতে বলে না। সকল ধর্ম্মেরই ভিত্তি এক। যেমন কোন এক স্থানে যাইতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন পথ দিয়া যাওয়া যায়, সেইরূপ সেই একই ভগবানকে পাইতে গেলে ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্ম দিয়া পাওয়া যায়। যিনি যে ধর্ম্মে থাকুন না কেন যদি কায়মনোবাক্যে ভগবানকে ডাকিতে পারেন, যদি তাঁহার চরণে অচলা ভক্তি থাকে, তাহা হইলে নিশ্চয় ভগবান তাঁহার উপর দয়া করিবেন।

ধর্ম্মের বিভিন্নতা শুধু উপরে মাত্র। মনে করুন বাড়ীতে একটা মাছ আসিয়াছে—আপনার পাঁচটী ছেলে। কেহ মাছভাজা খাইতে ভালবাসে, কেহ চর্চ্চড়ী, কেহ বা ঝোল, কেহ অম্বল, কেহ বা ভাতে দেওয়া মাছ খাইতে চাহিল। মা এই পাঁচ রকম রাঁধিয়া সকলের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করিলেন। সেইরূপ যাঁহার যে ধর্ম্মে অধিকতর প্রীতিলাভ হয়, তিনি সেই ধর্ম্মে বিশ্বাস করেন। এইজন্য তাঁহাকে হেয় জ্ঞান করা উচিত নয়।

মেয়েরা স্তোত্র ও স্তবপাঠ শৈশব হইতেই করিতে পারেন, তাহাতে ধর্ম্মে মতি হয়। যাঁহারা হিন্দু তাঁহারা ইচ্ছা করিলে ফল-ফুল নৈবেদ্য সাজাইয়া ভগবানকে পূজা করিতে পারেন। মালা লইয়া ভগবানের নাম জপ করিতে পারেন। কিন্তু এই সব আয়োজন না করিলে যে ভগবানকে ডাকা যায় না, তাহা নহে; ঠাকুর ঘরে কিম্বা মন্দিরে না গেলে যে পূজা হয় না তাহাও নয়। ভগবান সর্ব্বত্রই আছেন, যেখানে সেখানে, যখন তখন তাঁহাকে ডাকিবার অধিকার সকলেরই আছে—তাহার জন্য পুরোহিত কিম্বা মন্ত্রের আবশ্যক করে না। পাখীর মত মানে না বুঝিয়া মন্ত্র পড়িলে ভক্তির উদ্রেক হয় না। আপনারা যখন পূজার মন্ত্র পড়িবেন, তখন তাহার মানে বুঝিয়া বলিবেন, দেখিবেন মন্ত্রগুলি কি সুন্দর ভাবপূর্ণ। তাহাতে ভক্তিভাব আসিবে। মনে ভক্তি না থাকিলে মন্ত্রপাঠ করিলে, কিম্বা নানা আড়ম্বর করিয়া পূজা করিলেও কোন ফল হইবে না। শাস্ত্রে আছে—

"যদি অন্তর্গতো হরিঃ তপস্যা ততঃ কিম্।
যদি নান্তর্গতো হরিঃ তপস্যা ততঃ কিম্॥"

অর্থাৎ যদি মনেতে হরি থাকেন, তাহা হইলে তপস্যার আবশ্যক নাই, আর যদি মনে হরি না থাকেন, তাহা হইলে হাজার তপস্যা করুন কিছুই হইবে না।

তাই বলি, যদি প্রাণ ভরিয়া সেই বিশ্বজননীকে কিম্বা সেই বিশ্বেশ্বর ভগবানকে মনে মনে দিনান্তে, অন্ততঃ একবারও ডাকিতে পারেন, তাহা হইলে মনের অশান্তি, গ্লানি ও ক্লেশ ঘুচিয়া যাইবে। বাস্তবিক যদি ভগবানের উপর বিশ্বাস না থাকে, তাহা হইলে এই অকূল ভবসমুদ্রে পারের কাণ্ডারী কোথায় খুঁজিয়া পাইব? দারুণ শোকে, দারুণ বিপদে কাহাকে ডাকিয়া মনের জ্বালা জুড়াইব?

আপনারা সর্ব্বদাই মনে রাখিবেন যে আপনারা সামান্য নারী নহেন। যে ভারতবর্ষ পতিভক্তিতে সতী, সাবিত্রী, সীতা, দময়ন্তী, বেহুলা, চিন্তা, গান্ধারীর জন্য আজও জগতে পূজিত; বুদ্ধিতে রাণী ভবানী, শৌর্য্যে পদ্মিনী দুর্গাবতী তারাবাই, বিদ্যায় খনা লীলাবতী গার্গীর জন্য আজও জগতে বরেণ্য, সেই ভারতরমণীগণের দেশে আপনাদের জন্ম। সেই জন্ম সার্থক করুন। অন্তরনিহিত শক্তিকে জাগাইয়া তুলুন, "উত্তিষ্ঠত জাগ্রত" হউন। জ্ঞান ও ভক্তি, কর্ম্ম ও ধর্ম্মমার্গে কর্ত্তব্য সাধন করিয়া অন্তিম কালে যেন ভগবানকে বলিতে পারেন :—

> ফুরাল ভবের খেলা,
> পদতলে দাও স্থান।
> জনমে জনমে যেন,
> তোমা পানে ছুটে প্রাণ॥

বৈয়াসিক ন্যায়মালা।

(শ্রীরামচন্দ্র শাস্ত্রী এবং শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর তত্ত্বনিধি)

(তৃতীয়ে জীবব্রহ্মণোরেব গুহাপ্রবেশাধিকরণে সূত্রে —)

গুহাং প্রবিষ্টাবাত্মানৌ হি তদ্দর্শনাৎ॥ ১১॥

বিশেষণাচ্চ॥ ১২॥

তৃতীয়াধিকরণমারচয়তি—

> গুহাং প্রবিষ্টৌ ধীজীবৌ জীবেশৌ বা হৃদি স্থিতেঃ।
> ছায়াতপাভ্যাং দৃষ্টান্তাদ্ধীজীবৌ স্তো বিলক্ষণৌ॥ ৫॥
> পিবন্তাবিতি চৈতন্যং দ্বয়োর্জীবেশ্বরৌ ততঃ।
> হৃৎস্থানমুপলব্ধ্যৈ স্যাদ্বৈলক্ষণ্যমুপাধিতঃ॥ ৬॥

কঠবল্লীষু তৃতীয়বল্ল্যাদৌ শ্রূয়তে—

> "ঋতং পিবন্তৌ সুকৃতস্য লোকে
> গুহাং প্রবিষ্টৌ পরমে পরার্দ্ধে।
> ছায়াতপৌ ব্রহ্মবিদো বদন্তি
> পঞ্চাগ্নয়ো যে চ ত্রিণাচিকেতাঃ"॥ ইতি

অয়মর্থঃ—"সুকৃতস্য ফলভূতং যদ্ ব্রাহ্মণাদিশরীরং তৎ পরস্যার্দ্ধং পরব্রহ্মণ উপলব্ধিস্থানং। তচ্চ পরমং, বিদ্যাধিকারহেতুশমদমাদ্যুপেতত্বাৎ। তাদৃশস্য শরীরস্য মধ্যে স্থিতং হৃদয়পুণ্ডরীকং গুহা তাং প্রবিষ্টৌ। যদ্বা—ঋতশব্দবাচ্যং কর্ম্মফলং পিবন্তৌ ছায়াতপবৎ পরস্পরবিলক্ষণৌ বেদবিদো বদন্তি" ইতি। 'তৌ যৌ বুদ্ধিজীবৌ, জীবেশৌ বা' ইতি সন্দেহঃ। 'বুদ্ধিজীবৌ' ইতি প্রাপ্তং, তয়োঃ পরিচ্ছিন্নয়োর্গুহাপ্রবেশসম্ভবাৎ। জড়াজড়রূপত্বেন ছায়াতপবৎ বৈলক্ষণ্যাচ্চ।

অত্রোচ্যতে—'পিবন্তৌ' ইতি দ্বিবচনেন দ্বয়োশ্চেতনত্বং প্রতীয়তে। ততঃ—চেতনাবিহ জীবেশ্বরৌ ভবতঃ। সর্ব্বগতস্যাপীশ্বরস্য হৃদয়েঽবস্থানমুপলব্ধ্যৈ বর্ণ্যতে। দ্বয়োশ্চেতনত্বসাম্যেঽপি সোপাধিকত্বনিরুপাধিকত্বাভ্যাং বৈলক্ষণ্যমুপপদ্যতে।

(তৃতীয় জীব ও ব্রহ্মেরই গুহাপ্রবেশ অধিকরণে দুইটী সূত্র—)

সূত্রের অনুবাদ। গুহাপ্রবিষ্ট আত্মাদ্বয়, শ্রুতিতে উহার দর্শন হেতু॥ ১১॥ এবং বিশেষণ হেতু॥ ১২॥

(দ্বিতীয় পাদের) তৃতীয় অধিকরণ রচিত হইতেছে—

শ্লোকের অনুবাদ। গুহাপ্রবিষ্ট বুদ্ধি ও জীব অথবা জীব ও ঈশ্বর? হৃদয়ে অবস্থিতির কারণে ছায়া ও আতপের দ্বারা দৃষ্টান্ত হেতু বিরুদ্ধধর্ম্মী বুদ্ধি ও জীব (গুহাপ্রবিষ্ট) হইতেছে॥ ৫॥ "(উভয়ে) পান করিতেছে" এই (কথায়) উভয়ের চৈতন্য (প্রকাশ পাইতেছে); অতএব জীব ও ঈশ্বর (প্রতিপাদ্য)। হৃৎস্থান উপলব্ধির জন্য এবং বিরুদ্ধধর্ম্মিত্ব উপাধি হেতু॥ ৬॥

টীকার অনুবাদ। কঠবল্লীর তৃতীয় বল্লীর প্রারম্ভে শ্রুত হয়—

শরীরে স্বকৃত কর্ম্মের ফলভোক্তা দুই জন গুহারূপ উৎকৃষ্ট স্থানে ছায়া ও আতপের ন্যায় প্রবিষ্ট হইয়া আছেন, ইহা ব্রহ্মজ্ঞ, পঞ্চাগ্নির অনুষ্ঠাতা এবং ত্রিণাচিকেত কর্ম্মীরাও বলেন।

এই অর্থ:—সুকৃতের ফলস্বরূপ যে ব্রাহ্মণাদি শরীর তাহা পরের অর্দ্ধ—পরব্রহ্মের উপলব্ধিস্থান। এবং তাহা শ্রেষ্ঠ—বিদ্যালাভের অধিকার হেতু এবং শমদমাদি যুক্ত থাকা প্রযুক্ত। এইরূপ শরীরের মধ্যে স্থিত হৃদয়পদ্মরূপ যে গুহা তাহাতে প্রবিষ্ট দুইজন। অথবা—ঋতশব্দবাচ্য কর্ম্মফলভোক্তা ছায়াতপের ন্যায় পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী দুই জন, ইহা বেদজ্ঞেরা বলেন। সেই দুই জন বুদ্ধি ও জীব অথবা জীব ও ঈশ্বর, ইহাই জিজ্ঞাস্য। বুদ্ধি ও জীব, ইহাই ধরা গেল, পরিচ্ছিন্ন তাহাদের উভয়ের গুহাপ্রবেশের সম্ভাবনা হেতু। এবং জড় ও অজড়রূপ হওয়া প্রযুক্ত ছায়া ও আতপের ন্যায় পার্থক্য হেতু।

এস্থলে উক্ত হইতেছে—"পিবন্তৌ" শব্দ দ্বিবচন হও-

য়ায় উভয়ের চেতনধর্ম্মিত্ব প্রতীত হইতেছে। অতএব এস্থলে চেতনদ্বয় জীব ও ঈশ্বর হইতেছেন। সর্ব্বগত হইলেও ঈশ্বরের হৃদয়ে অবস্থান উপলব্ধির জন্য বর্ণিত হইয়াছে। উভয়ের চেতনত্বে সাম্য থাকিলেও সোপাধিকত্ব ও নিরুপাধিকত্বের দ্বারা পার্থক্য উপপন্ন হইতেছে।

তাৎপর্য্য। সূত্রে আছে—গুহাপ্রবিষ্ট আত্মাদ্বয় শ্রুতিতে উক্ত হইয়াছে। সূত্রকার নিশ্চয়াত্মক 'হি' শব্দের দ্বারা আত্মাদ্বয় অর্থাৎ জীবাত্মা ও পরমাত্মাকেই গুহাপ্রবিষ্টরূপে বলিয়াছেন। তাঁহার এরূপ উক্তির ভিত্তি হইতেছে কঠোপনিষদুক্ত "ঋতং পিবন্তৌ" ইত্যাদি শ্রুতি। কিন্তু এই শ্রুতির কোনও স্থলে "আত্ম" শব্দের উল্লেখ নাই, অথচ "পিবন্তৌ" এই শব্দটীকে দ্বিবচনে প্রয়োগ করা হইয়াছে। এই কারণে সংশয় উপস্থিত হইতেছে যে, "পিবন্তৌ" শব্দে কোন্ দুইজনকে বুঝাইতেছে? এই সূত্রে পূর্ব্বপক্ষের মনে গুরুতর সন্দেহ উপস্থিত হইল যে, ঐ দুইজন বুদ্ধি ও জীব অথবা জীব ও ঈশ্বর? প্রথমত তিনি বলিতেছেন যে, বুদ্ধি ও জীবকেই ঐ দুইজন ধরা যাউক, কারণ শরীরের মধ্যে অবস্থিত গুহাতে অর্থাৎ হৃদয়ে পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ বুদ্ধি ও জীবাত্মারই প্রবেশ সম্ভব। উক্ত কঠশ্রুতিতে উক্ত দুইজনের দৃষ্টান্তস্বরূপে ছায়া ও আতপ উল্লিখিত হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষের মতে বুদ্ধি ও জীবাত্মার পক্ষে উক্ত দৃষ্টান্তের প্রয়োগ সুসঙ্গত, কারণ ছায়া ও আতপের ন্যায় বুদ্ধি ও জীবাত্মা পরস্পর বিরুদ্ধধর্ম্মী—আস্তিক দার্শনিকদিগের মতে একটী জড় এবং অপরটী অজড় অর্থাৎ চেতনধর্ম্মা। ইহার উত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে, ঐ দুইজন অর্থে বুদ্ধি ও জীবাত্মা ধরা যাইতে পারে না। কারণ, "পিবন্তৌ" অর্থে পান করিতেছে অর্থাৎ ভোগ করিতেছে। পান করা বা ভোগ করা-সূচক শব্দের দ্বারা জড় কোন কিছু উপলক্ষিত হইবার পক্ষে বাধা পড়িতেছে। সুতরাং বলিতে হইবে যে, পান বা ভোগ করিতেছে দুইজন—ইহা দ্বারা চেতনধর্ম্মী দুই জনই সূচিত হইতেছে। তখন পূর্ব্বপক্ষ প্রশ্ন করিলেন যে, পরিচ্ছিন্ন অর্থাৎ সীমাবদ্ধ জীবাত্মার শরীরাভ্যন্তরস্থ সীমাবদ্ধ হৃদয়পদ্মে না হয় প্রবেশ করা সম্ভব ধরিলাম, কিন্তু সর্ব্বব্যাপী ঈশ্বরের সীমাবদ্ধ হৃদয়ের মধ্যে প্রবেশ কি প্রকারে সম্ভব হয়? তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলিতেছেন যে, ঈশ্বর সর্ব্বব্যাপী হইলেও হৃদয়ে তাঁহাকে উপলব্ধি করা যায়, ইহা বুঝাইবার জন্যই জীবাত্মার ন্যায় ঈশ্বরকেও গুহাতে অর্থাৎ হৃদয়ে প্রবিষ্ট বলিয়া বলা হইয়াছে। পূর্ব্বপক্ষের তখন এই আশঙ্কা হইল যে, জীব ও ঈশ্বর উভয়েই যদি চেতনধর্ম্মা হইলেন, তবে তাঁহাদের উভয়ের প্রতি ছায়া ও আতপের দৃষ্টান্ত সঙ্গত হয় কিরূপে? তদুত্তরে সিদ্ধান্তপক্ষ বলেন যে, জীবাত্মা বুদ্ধি মন প্রভৃতি দ্বারা সীমাবদ্ধ বা সসীম এবং ঈশ্বর সর্ব্বগত সুতরাং সকল সীমার অতীত বা অসীম, ইহা পূর্ব্বপক্ষ ও সিদ্ধান্তপক্ষ উভয়েরই সম্মত। তাহা না হইলে সে বিষয়ে পূর্ব্বপক্ষ সংশয় উপস্থিত করিতেন। সুতরাং জীব ও ঈশ্বরের সসীমতা ও অসীমতার দিক হইতে ছায়া ও আতপের দৃষ্টান্ত অসঙ্গত হইবার পরিবর্ত্তে সুসঙ্গতই হয়।

Indian Music and Simultaneous Harmony, (2)

By Miss Bani Tagore.

12. WANT OF CONGREGATIONAL SPIRIT, ANOTHER REASON FOR DISAPPEARANCE OF HARMONY FROM INDIAN MUSIC.

Want of the congregational spirit is perhaps another reason for the disappearance of harmony from Indian music. We see in the present times that, as a result of the great European War, the true congregational spirit is on the wane. If we study carefully the Mahabharat, the Puranas, and the later history of India, we shall see that in India also, the congregational spirit began to disappear after the great Kurukshetra war and a few isolated or dismembered kingdoms void of sympathy with each other cropped up. Needless to say, the spirit of disunion in those kingdoms spread its influence over the minds of the general people individually as well. In this way, notwithstanding the fact that the shadow of the congregational spirit could be seen in the limited sphere of village quarrels with disunion as their base, the true spirit of congregational unity disappeared from the country, and with it, harmony in music.

13. HARMONY, WHY DEVELOPED IN NORTH EUROPE?

In the northern countries of the Western world, where, owing to excessive cold and to other causes, the congregational spirit has naturally developed well, harmony is seen at its best. In the southern countries of Europe, like Spain, Italy, etc., where, owing to the climate being warmer, and an ancient civilization being in existence, the congregational spirit is less developed, we see that harmony in music has, as it were,

received a set-back, and in its place madrigals, serenades, etc., corresponding to the tunes having more melody in them have come more to the front. The derivation of the above words also gives support to this view. •

14. Most important reason for want of Harmony—Rise and spread of Religions of Asceticism.

It is our firm conviction that the third and the most important reason for the want of harmony in Indian music is the rise and spread of religions of asceticism. Since the massacre of the Kurukshetra War, national feeling and speculation had undergone a fundamental change. A deep sense of the futility of existence penetrated every thinking mind, and new cults began to rise. Of these, one alone was fated to become a mighty tree—Buddhism. Buddhism, with its characteristic fundamental pessimism, was the national product of the age. Thus since this massacre a deep indifference towards this mundane world, particularly towards the pleasures and gaities of this world, permeated the mind of the Indians. Had it not been so, a religion like Buddhism with asceticism and indifference to all the concerns of the world as its life and soul, could not have become so deep-rooted in the soil of India. Asceticism and indifference are opposed to the idea of a large concourse of men gathering with no other object than enjoying pleasures. Asceticism wants to remain self-centred. Naturally the spirit of playing music and singing in company was gradually lost, and with it harmony in music was altogether lost sight of in course of time. It was then that melodies, by which one could sit in a lonely corner and commune with one's self, or at the most with a few co-religionist devotees, became very popular, and thus very naturally the musicians also directed their attention to the improvement of melodies and were successful. Solitude is the best field for the cultivation of our melodies.

15. Melody and Harmony—Different Methods of Expression.

Notwithstanding the fact that melodious tunes are a great help in expressing one's solitariness and indifference to this world, it is not quite correct to say that it is altogether impossible to express those ideas through harmony as well; but, needless to say, to do it by harmony requires great skill in the musician. Beethoven's Sonata Pathetique and Funeral March are pieces harmonized; but, when played properly, they awake in our minds a feeling of indifference to this world. At the same time, it cannot be gainsaid that, however one may try to express the ideas based on solitariness by harmonized music, one cannot get away from the fact that through it runs an undercurrent of comparative noisiness, the very simultaneous multiplicity of sounds contributing to the formation of that impression of noisiness, etc. Similarly, however much one may try to express by melodies the feeling of pleasure or the heroic spirit, which are best displayed in the presence of a large congregation, one cannot but feel a comparative solitariness, an impression of communing with one's own self peeping through them.

16. Indian Music—Its Ultimate Aim.

The ultimate aim of Indian music is to sing of the relationship of the transient with the Great Eternal, of the human soul with the soul of the cosmos; it tries to waken up man to be in tune with the Infinite, to make the finite lose itself in the Great Infinite. In fact, Indian music in general can be said to have its basis in spirituality, as will be evident from the words "Nada Brahma," which are intended to signify the idea that the basic sound of music is one and the same with God. The busy world by day may in a sense be likened to harmony with its concords and discords; and the still night-world may be compared to melody with its string of simple, consecutive, and quiet silvery sounds. Mr. Fox Strangways has hit the right point when he says: "One (Indian music) shows a rejection of what is transient, a soberness in gaiety, endurance in sorrow, a search after the spiritual ideals of life. The other (Europaan music) shows . . . . . an eager quest after wayside beauty." Harmony imitates, as it were, the nature in its external dress; whereas melody, as expressed in

• "Dictionary of Musical Terms," by Stainer and Barett.

Indian music, tries to delve deep into the innermost secrets of the Divine in man and nature. Hence, it will not perhaps be very far-fetched if we take harmony as the outer or material and melody the inner or spiritual side of music. In the Western world, anyone with eyes open will easily see, that the material side has developed, because there the love of material pleasures is so very strong; in India, on the other hand, the spiritual side of music has taken root as the people here are more prone towards spirituality.* It is for this spiritual leaning that the music of India has attained so high a place that it will take the Westerners years to master its science and to get at its true spirit.

17. Indian Music, "Not Void of Harmony."

Harmony, though obliterated to a large extent, has not totally disappeared from Indian music; there still remains the shadaw of harmony. Rag-raginis cannot disappear altogether from the music of the West, and likewise harmony cannot altogether disappear from the music of the East. The reason is that ordinarly the principal ideas of man, or of a number of men constituting a society, are practically the same in the East as in the West. The people of the East feel joy and sorrow as much as the people of the West. It is not possible for any Indian to keep himself shut up wholly in the cave of asceticism and indifference to worldly matters; at times a spirit of joy, some pleasurable impression, is sure to get the upper hand over him. Neither is it possible for a Westerner to keep himself always immersed in the whirligig of mere pleasures; at times he is sure to feel the pangs of pain and sorrow. The only difference is that the people of the West prefer pleasures to sorrow, and the ingrained spirit of the Indians is to embrace sorrow more than the pleasures of this world. When sorrow is awakened in the heart of a Western musician, he tries to express the tune of sorrow through harmony. It is from such efforts perhaps that Beethoven's Sonata Pathetique, etc, the famous sweet-tuned Irish melodies, and the nocturnal serenades have arisen. Similarly, when a wave of pleasure or any other idea, which should have its full play in society, tries to well out from the heart of an Eastern musician, he tries to express the echo of the same through melody. This has given birth to the light music called *Tappa*.

18. Shadow of Harmony in Method of Setting Strings of Sitar.

We can also perhaps find traces of an effort in harmonizing in the method of setting the strings of a Sitar. There are three principal strings to a Sitar or Tritantri Bina, and hence it came to be called Si (which means in Persian three) tar or strings—*i. e.*, a three-stringed instrument. The principal strings of a Sitar are set to the three principal notes F, C, and G. In the Western music each of these notes is made the basis of the Primary Triads (in the key of C). In the Sitar, besides the above three, four other strings are set to G (below middle C), C (an octave below middle C), C (an octave above middle C) or G (above middle C). Evidently these four strings are set in consonance with the above-mentioned main strings. Of the seven strings, the first three, the fifth, and the sixth strings are fixed. The fourth is variable. This fourth string is more often tuned as stated above; but sometimes it is tuned according to the Badi Swara (the predominant note) of the Rag or Ragini. When this string happens to be tuned to Gandhar (E), as in the case of Ragini Iman Kalyan or Sankara we get the major chord of C from the open strings.

From the method of setting the strings, it is easily seen that the inventors of the musical instruments and the musicians in this country had certainly some knowledge

---

* *Vide* Professor Max Muller's "India: What can it Teach Us?" 1896 W., p. 95 and pp. 98 to 101

Vide also article on Fine arts, Ency. Brit., 11th ed., vol. x. p. 372: "Taine's philosophy of fine art consists in regarding the fine arts as the necessary result of the general conditions under which they are at any time produced—conditions of race and climate, of religious civilization and manners.

of combined harmony. We have tried and found that double stops and chords of three notes, which are practically the nucleus of hermony, can very well be played on the Sitar. The Sitar is made in imitation of the *Been*. If harmony is possible in the Sitar, there is no reason why it should not be possible as well in similar other instruments like the Esraj, Been etc.

19. Renaissance of Harmony in Indian Music, Possible and Desirable.

Because it is not in vogue, the present-day master-musicians of India contened without due consideration, that it is not possible to introduce combined harmony into either vocal music or instrumental music as played on the Sitar, etc. Had it been found impossible, why then did Tansen try to bring out harmony even vocally? Although it is only the melodies that are played on the Indian musical instruments by the musicians of these days, we can still find the elementary form of combined harmony in the production of harmonious sounds, even when playing a melody, by striking simultaneously with the notes of the melody certain strings which form the intervals of the Octave and Fifth, Octave and Octave, Octave and Fourth etc. From the fact that in the stringed instruments like the Sitar etc., there are some strings specially arranged for the production of combined harmonious sounds called *Jhankar*, it is evident that these instruments were not made simply for playing melodies alone, but were invented with the playing of combined harmony directly or indirectly in view as well.

We are not prepared to accept the statement that harmony was unknown in this country, or that it is not possible to introduce or develope harmony in either the vocal or instrumental music of this country; or that even if it is possible, it will not sound pleasant to the ear. Neither should it be said that, if an effort be made in the direction of introducing and developing simultaneous harmony in Indian music, we shall be simply importing the Western music *in toto*. If a tune or a melody is at the present time hamonised, it should not be considered as altogether an innovation. We may call it a renaissance of harmony in Indian music, which will be a powerful unifying force through music between the East and the West.

Om Brahmarpanamastu.

ব্রহ্ম-সঙ্গীত স্বরলিপি।

রাগিণী খট—একতালা।

ধন্য দেব পূর্ণ ব্রহ্ম, প্রাণেশ্বর দীনবন্ধু,
দয়াসিন্ধু করুণা-নিধি, ব্যাকুল-চিত্ত-বারি হে।
ভগবজ্জন-হৃদি-রঞ্জন পাবন জগজ্জীবন,
প্রভু পরম-শরণ পাপীগতি, আশ্রিত-ভয়-হারী হে।
অচ্যুত আনন্দ-ধাম, সত্যাশ্রয় সত্যকাম,
জাগ্রত জীবন্ত দেব সেবককাণ্ডারী ;
জ্ঞানানল দীপ্যমান, হৃদয়াধার হৃদয়েশ্বর,
ভবতারণ হরি কৃপালু, ভকত-মন-বিহারী হে।
অবিনশ্বর পুরাণ পুরুষ ভগবান্ ভক্তবৎসল
কল্যাণ অমর বিশ্ব-ভুবন ধারী ;
জীবিতেশ হৃদয়-রতন, পরমায়ণ সত্যপুরুষ,
সদানন্দ জগদ্গুরু, জগজ্জন-হিত-কারী হে।

গান—৺হেমেন্দ্র নাথ ঠাকুর। স্বরলিপি—শ্রীবাণী দেবী।

২´
[পা -া পা] ৩ ০ ১ ॥ ২´ · ৩
I সা -া সা ! মা গা মা I পা -া পা I পা -া পা I দা -া দা I -া না র্সা I
ধ • ন্য দে • ব পূ • র্ণ ব্র • হ্ম প্রা • ণে • শ্ব র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। নর্সা র্ঋা র্সা। ণদা -া পা I দা দা -া। দা -া ণদা। পা দা পা। -া মা পা I
দী • • ন ব • ন্ধু দ য়া • সি • ন্ধু ক রু ণা • নি ধি

২´ ৩ ০ ১
I মা গা ঋা। সা ন্‌া সা। মা গা মা। পা দা -া II
ব্যা • কু ল চি ত বা • রি হে • •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দা দা দা। -া না না। র্সা র্সা র্সা। -া র্সা র্সা I র্ঋা -া র্ঋা। র্ঋর্সা র্সা র্সা।
ভ গ ব • জ্জ ন হৃ দি য় • র ন পা • ব ন• জ গ

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। নর্সা র্ঋর্সা নদা। পা পা পা I দা র্সা না। র্সা র্সা র্সা। না র্সা না। দা দা পা I
জী• •• ব• ন প্র ভু প র ম শ র ণ পা • পী • গ তি

২´ ৩ ০ ১
I দা -া দা। দা পা পা। মা গা মা। দা -া -া II
আ • শ্রি ত ভ য় হা • রী হে • •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I পা -া পা। পা মগা মা। পা -া পা। পা -া পা I দা -া দা। -া না র্সা।
অ • চ্যু ত আ• • ন • ন্দ ধা • ম স • ত্যা • শ্র য়

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। নর্সা র্ঋা র্সা। না দা পা I দা -া দা। দা দা -া। দা দা দা। দা পা পা I
স• • ত্য কা • ম আ • গ্র ত জী • ব • ন্ধু দে • ব

২´ ৩ ০ ১
I পা মা মা। মা মা -া। গমা পমা পা। -া -া -া I
সে • ব ক কা • ঙা• •• রী • • •

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দা -া দা। -া না র্সা। র্ঋা র্সা র্সা। র্সা -া -া I র্ঋা র্ঋা -া। র্সর্ঋা র্গা র্ঋা।
জা • না ০ ন ন দী • প্য মা • ন হৃ দা • ধা• • র

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। র্সা র্সা র্ঋর্সা। না দা পা I দা র্সা র্সা। -া র্সা র্সা। না র্সা না। না দা পা I
হৃ দ য়ে• • শ্ব র ভ ব তা • র ণ হ রি কৃ পা • নু

২´ ৩ ০ ১
I পা পা দা। পা পা পা। মা গা মা। ণদা -া -া II
ভ ক ত ম ন বি হা • রী হে • •

২´ ৩ ০ ১
I পা পা পা। -া মগা মা। পা পাঃ পঃ। পা পা পা I
অ বি ন • শ্ব• র পু রা ণ পু রু ষ

২´ ৩ ০ ১
I দা দা দা। র্সা না র্সা। -া র্সা নর্সা। না দা পা I
ভ গ বা · ন ভ · ক্ত ব · ৎ স ল

২´ ৩ ০ ১ ২´
I দা -া দা। -া দা দা। দা দা পদা। -া দা পা I পা পা মগা।
ক · ল্যা · ণ অ ম র বি · শ্ব ভু ব ন ধা·

৩ ০ ১
। মা পা -া। -া -া -া। -া -া -া I
· রী · · · · · · ·

২´ ৩ ০ ১ ২´ ৩
I দা -া দা। দা র্সা না। র্সা র্সা র্সা। র্সা র্সা র্সা I র্রা র্রা র্রা। র্সর্রার্গা র্রা র্সা।
জী · বি তে · শ হৃ দ য় র ত ন প র মা · · · র ন

০ ১ ২´ ৩ ০ ১
। না র্সা র্সা। না দা পা I দা দা র্সনা। র্সা -া র্সা। না র্সা না। দা পা -া I
স · ত্য পু রু ষ স না · · ন · ন্দ জ গ দ্ গু রু ·

২´ ৩ ০ ১
I দা দাঃ দঃ। দা দা পা। মা গা মা। পদা -া -া IIII
জ গ জ্জ ন হি ত কা · রী হে · ·'

নানা কথা।

দেশের সুলক্ষণ—বিগত কঙ্গ্রেসের সময় কঙ্গ্রেসের নিকটবর্ত্তী স্থানসমূহে কিপ্রকার জনতা হইয়াছিল, তাহা কাহারও অবিদিত নাই। আশ্চর্য্যের বিষয়, এমন বিরাট জনতা সত্ত্বেও একটীও গোলযোগ আমাদের কর্ণগোচর হয় নাই। শুনিয়াছিলাম, শ্রমিক সঙ্ঘের আগমনে নাকি একবার গোলযোগের সম্ভাবনা হইয়াছিল; কিন্তু মহাত্মা গান্ধির এক ইঙ্গিতেই নাকি সে সম্ভাবনা নির্ব্বাণপ্রাপ্ত হইয়াছিল। আমাদের মতে সে সম্ভাবনা উঠিতে দেওয়াও উচিত হয় নাই। যখন কঙ্গ্রেসের সভাপতি হাবড়া ষ্টেশন হইতে তাঁহার বাসস্থানে নীত হইলেন, সেদিনকার জনতা দর্শকদিগের মনে বহুকাল জাগরূক থাকিবে নিঃসন্দেহ। আশ্চর্য্য এই যে, এমন জনতার ভিতরেও একটুও গোলযোগ বা হিন্দুমুসলমানের বিরোধের কথা শোনা যায় নাই; এমন কি, কোনও প্রকার চুরিচামারি বা গুণ্ডাগিরির কথাও আমরা শুনি নাই। আবার সেদিন কাগজে দেখিলাম যে, ব্রহ্মদেশে মহাত্মা গান্ধীকে দেখিবার জন্য লোক ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল, অথচ সেখানেও গোলযোগের একটী টুঁ শব্দও উঠে নাই। ইহা দ্বারা বোঝা যাইতেছে যে, প্রাচ্যজগতের প্রকৃতি কি প্রকার প্রকৃতই শান্তভাবে পূর্ণ—বাহিরের লোকের দ্বারা বিক্ষুব্ধ না হইলে দেশের প্রকৃত প্রকৃতি স্বভাবতই ফুটিয়া উঠিয়া স্থায়িত্ব লাভ করিতে বাধ্য। কঙ্গ্রেস প্রদর্শনীতে একদিন আমরা যাই; দেখি, যেদিকে বাহির হইবার পথ, সেই দিক দিয়া দুএকটী ইতরশ্রেণীর মুসলমান বলপূর্ব্বক প্রবেশের চেষ্টা করিতেছিল—দ্বারের ভলেণ্টিয়ারগণ তাহাদিগকে বাধা দিলেন এবং আমাদিগকে মৃদুস্বরে বলিলেন ইহারা "পকেটমারা"। কথাটী তাহাদের কানে গেল এবং সেই সূত্রে একটা বিবাদ বাধাইবার উদ্দেশ্যে ভলণ্টিয়ারগণকে অকথ্য ভাষায় গালি দিতে লাগিল। কিন্তু ভলণ্টিয়ারগণের শিক্ষা ও সংযম দেখিয়া আমি তো অবাক্—তাঁহারা প্রত্যুত্তরে একটী কড়া কথাও না বলিয়া কোমলভাবে ও দৃঢ়ভাষায় সেখান হইতে ঐ মুসলমানদিগকে সরাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাদিগকে সশ্রদ্ধ নমস্কার করি। কংগ্রেসের পাড়ায় মুসলমানের সংখ্যা বেশী।

শুনিলাম যে, তাহারা নাকি শেষদিন জোর করিয়া প্রদর্শনীতে প্রবেশ করিয়া লুটতরাজ করিবে। আমরা শুনিয়া ভাবিলাম, ইহা বাজে কথা। যাই হোক, কংগ্রেসকর্তৃপক্ষ ভলাণ্টিয়ারের সংখ্যা দ্বিগুণ করিলেন। ফলে পুলিসের বিনা হস্তক্ষেপেও সমস্তই শান্তভাবে কাটিয়া গেল— কোনও বিষয়ে একটীও গোলযোগ দেখা দেয় নাই। ইহা দেশের খুবই সুলক্ষণ মনে করি। দেশের শাসকবর্গের পক্ষে ইহা বিশেষ লক্ষ্য করিবার বিষয়।

আগুন জ্বলিতে বাকী—উপরে সুলক্ষণের কথা বলিলাম, কিন্তু চারিদিকে কুলক্ষণের যে সমস্ত লক্ষণ দেখিতেছি, তাহাতে নিরাশা ও নিরানন্দের ঘন মেঘ হৃদয় অধিকার করিয়া বসে। আমাদের বাল্যকালে ছাত্রজীবনে দেখিয়াছিলাম যে, কোন এক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের তত্ত্বাবধানে "লণ্ডনরহস্য" "বিলাতী প্রেমকথা" ইত্যাদি নামের বিলাতী পুস্তকের অনুবাদসকল প্রকাশিত হইয়া ছাত্রদিগের মস্তক চর্ব্বণের ব্যবস্থা হইয়াছিল। প্রকাশকগণ উত্তরবংশীয়ের অবস্থা কিরূপ শোচনীয় হইবে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত না করিয়া নিজেদের টাকার ঝুলি ভারী করিবার দিকেই দৃষ্টি রাখিলেন। তাহার ফলে দেশের অন্তরে যে অশ্লীলতার বীজ রোপিত হইল, তাহাই উত্তরোত্তর বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া সম্প্রতি যে অবস্থায় আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, তাহাতে ভদ্রলোকের দেশে বাস করাই কঠিন হইয়া উঠিয়াছে এবং কঠিনতর হইয়া উঠিবে। এখন অশ্লীলভাবের ক্রমাগত চর্চ্চা করিতে করিতে ছেলেদের মন হইতে উহার উপর ঘৃণার ভাব চলিয়া যাইতেছে। তাহার ফলে, আগুন জ্বলিতে বাকী। তুলারাশি কেরোসিন তেলে ভিজানো আছে, কেবল তাহাতে একটা জ্বলন্ত দেশলাইয়ের কাঠি ফেলিতে যা বিলম্ব। যেটুকু সামাজিক বন্ধন আছে, তাহাই সেই কাঠিটুকু ফেলিবার প্রতিবন্ধকতা করিতেছে। এমন অবস্থায় আসিয়া আমরা দাঁড়াইয়াছি যে, কেহ কাহাকে বিশ্বাস করিতে পারি না—উপযুক্ত শিক্ষক পাওয়া যায় না, যাহার উপর সন্তানদিগের শিক্ষার ভার ন্যস্ত করিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারি। যে aesthetic cultureএর দোহাই দিয়া অশ্লীলতাকে প্রশ্রয় দিবার ফলে দেশের এই অবস্থা আসিয়াছে—ধিক্—ধিক্—শত ধিক সেই cultureকে—সেই cultureকে সাগরপারে চালান করিয়া দাও, পদাঘাতে বিদূরিত কর। শুধু শিক্ষক কেন, সেদিন দেখিলাম একটী মাসিকপত্রের একটি গল্পে ভ্রাতুষ্পুত্রীকে কুপথে লইয়া যাওয়া পিতৃব্যের পক্ষে অন্যায় নহে, ইহাই শিক্ষা দেওয়া হইতেছে—হা বিধাতঃ, ইহাই দেখিবার জন্য, শুনিবার জন্য কি আমাদের generationকে বাঁচাইয়া রাখিয়াছ? ইহার পূর্ব্বে আমাদের মরিয়া আমাদের স্মৃতি পর্য্যন্ত মুছিয়া গেলে ভাল ছিল। পল্লীগ্রামে পর্য্যন্ত শুনিতে পাই এই সকল গ্রন্থ ও উপন্যাস প্রভৃতির ধাক্কা গিয়া ব্যভিচারের স্রোত অব্যাহত ভাবে চলিবার উপক্রম করিতেছে। তাই বন্ধুসকল! মনে রাখিবেন, চরিত্রকে ঠিক পথে দাঁড় না করাইলে দেশ কিছুতেই উন্নতির পথে স্থির থাকিতে পারিবে না। যাঁহারা আর্টের দোহাই দিয়া বা যে কোন সূত্রে অশ্লীলতার পোষকতা করিবেন, তাঁহাদের গ্রন্থাদি boycott করা উচিত। শুধু সাময়িক উত্তেজনার খাতিরে এক আধবার বিলাতী বস্ত্র বা দ্রব্য boycott করিলে বিশেষ ফল কিছুই হইবে না—চরিত্রের দৃঢ়তা আসিলে তবেই সাময়িক উত্তেজনার পরিবর্ত্তে প্রকৃত দেশপ্রীতি হৃদয় অধিকার করিবে। কোনও সুপ্রসিদ্ধ মাসিকপত্রে একটা উপন্যাস ধারাবাহিক রূপে প্রকাশিত হইতেছিল, তাহাতে realistic আর্টের নামে পতিতাদিগের গৃহে যে প্রকার অতি অশ্লীল ও কদর্য্য ভাষায় কথাবার্ত্তা চলে, সেই সকল প্রকাশিত হইতে লাগিল। একমাত্র ৺সুরেশচন্দ্র সমাজপতি মহাশয় তাহার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ করিতে সাহস করিয়াছিলেন এবং একমাত্র ৺সার গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ই তাঁহার গৃহ হইতে সেই মাসিকপত্রিকাকে চিরনির্ব্বাসিত করিয়াছিলেন।

সার বিনোদচন্দ্র মিত্র—ইনি প্রিভি কাউন্সিলের পদে নিযুক্ত হইয়াছেন দেখিয়া সুখী হইলাম। ইঁহার পিতা সার রমেশচন্দ্র মিত্র বহুকাল যাবৎ ভবানীপুর সমাজের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে সংলিপ্ত ছিলেন। সার বিনোদচন্দ্র সুদূর ইংলণ্ডে থাকিয়াও ব্রাহ্মসমাজকে নানা ভাবে সাহায্য করিয়া গৌরবান্বিত করিতেছেন দেখিলে গৌরব অনুভব করিব।

ইংলণ্ডে বাল্যবিবাহ—সংবাদপত্রে দেখি, ইংলণ্ডে প্রাচীন রোমীয় আইন অনুযায়ী মেয়েদের পক্ষে ১২ বৎসর এবং ছেলেদের পক্ষে ১৪ বৎসর বৈধ বিবাহের ন্যূনকল্পে বয়স নির্দ্দিষ্ট ছিল। গত দ্বাদশ বৎসরে (১৯১৪—১৯২৬) ১৬ বৎসরের নিম্ন বয়সের ৩০০ বিবাহ হইয়াছে। সেই কারণে বৈধ বিবাহের বয়স ন্যূনকল্পে ১৬ বৎসর করিবার প্রস্তাব হইতেছে। এই সকল হইতে স্পষ্ট বুঝা যাইতেছে যে শীত বা গ্রীষ্মের আধিক্য বালকবালিকার যৌবনে পদার্পণ বিষয়ে বিশেষ কোন পার্থক্য সাধন করে না। মানুষ সর্ব্বত্রই মানুষ। আসল কথা জন্ম, সঙ্গ, শিক্ষা ও সাধনার উপর বালকবালিকার চরিত্রগঠন ও তাহার উপর যৌবনে পদার্পণ নির্ভর করে।

শুদ্ধি—চারিদিকে শুদ্ধিক্রিয়া খুবই প্রসারলাভ করিতেছে। মুসলমানধর্ম্মী প্রভৃতি অনেক নরনারী পুনরায় হিন্দুধর্ম্মের আশ্রয় গ্রহণ করিতেছে। বলা বাহুল্য

আমরা হিন্দুধর্ম্মে যাঁহারা আসিতে চান, তাঁহাদিগকে পুনগ্রহণ করিবার পক্ষপাতী। কাহাকেও কোন ধর্ম্মে বলপূর্ব্বক ধরিয়া রাখিবার পক্ষপাতী আমরা নহি। বহু পূর্ব্বে ব্রাহ্ম সমাজ সর্ব্ব প্রথম একজন খৃষ্টধর্ম্মীকে সমাজে পুনগ্রহণ করিয়া এ বিষয়ে পথ প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা আজ অনেকে জানেন না। তবে দেখিতে হইবে এবং স্থির করিতে হইবে যে, এই সকল পুনর্গৃহীত হিন্দুদিগের status কি হইবে? পরশুরাম যে প্রকার নিজের বলে দাক্ষিণাত্যে এক নূতনতর চাতুর্বর্ণ্য স্থাপন করিয়াছিলেন, আমাদেরও কর্ত্তব্য ব্রাহ্ম, আর্য্য এবং নবোত্থিত উদারমতাবলম্বী হিন্দুগণকে মিলিতভাবে লইয়া স্থির করা যে উহাদের status কি হইবে। এখন যেমন বিক্ষিপ্তভাবে কাজ চলিতেছে, এভাবে কাজ চলিলে সুদীর্ঘকালেও প্রকৃত সাফল্যলাভ হইবে কি না সন্দেহ। এই যে সেদিন একটী খৃষ্টধর্ম্মী মহিলা হিন্দুধর্ম্ম গ্রহণ করিয়া এক ব্রাহ্মণ যুবককে বিবাহ করিলেন, যে বিবাহে নকীপুরের রায় যতীন্দ্রনাথ চৌধুরী, ডাঃ সুনীতি চাটুয্যে, ভাটপাড়ার পণ্ডিত জানকীবল্লভ ভট্টাচার্য্য, পণ্ডিত প্রফুল্লকুমার বেদান্ততীর্থ, ব্রাহ্মণসভার ভূতপূর্ব্ব সম্পাদক শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চাটুয্যে প্রভৃতি অনেক গণ্যমান্য লোক উপস্থিত ছিলেন, (Forward 16, 12. 1928) সেই মহিলা ব্রাহ্মণজায়া ব্রাহ্মণী বলিয়া গৃহীত হইবেন কি না এবং উক্ত ব্রাহ্মণযুবকের ব্রাহ্মণত্ব অক্ষুণ্ণ থাকিবে কি না, এ সকল বিষয় সকল উদারপন্থী সভার সভ্যগণ মিলিত হইয়া স্থির করিলে ভাল হয়।

প্রতিমা লইয়া মোকর্দ্দমা—Statesman ১, ৩, ২৯—উপধর্ম্ম লইয়া সময়ে সময়ে যে কতদূর হাস্যাস্পদ ঘটনা হওয়া সম্ভব হয় তাহা সম্প্রতি জৈন সম্প্রদায়ের একটী মকর্দ্দমায় প্রকটিত হইয়া পড়িয়াছে। একটী জৈন মন্দিরের "ঠাকুর"এর গায়ে পোষাক দেওয়া থাকিবে কি না, ইহার শেষ বিচারের ভার পড়িল বিলাতের প্রিভি কাউন্সিলের উপর! ঝগড়াটা হইল শ্বেতাম্বরী ও দিগম্বরী সম্প্রদায়ের মধ্যে। প্রশ্ন হইল—সেরপুরের (Sherpur) শ্রীঅন্তরীক্ষ পরেশনাথজীর মূর্ত্তির উপরে কটিবস্ত্র ও কটিবন্ধ দেখান হইবে কি না। ১৯ বৎসর ধরিয়া মকদ্দমা চলিতেছে। হায়! ভারতবাসীর অন্তর হইতে ভগবান কবে এই সাম্প্রদায়িক ভাব দূর করিবেন?

—

মানসার-বিবৃতি এবং বাস্তু ও স্থপতিবিদ্যার শব্দকোষ।

(সমালোচনা)

(ডাঃ শ্রীবনওয়ারীলাল চৌধুরী)

কিছুদিন হইল এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের দেশবিশ্রুত অধ্যাপক শ্রীযুক্ত ডাক্তার প্রসন্নকুমার আচার্য্য I. E. S. M. A., Ph. D. (Leiden), D. Lit. (London) তাঁহার বহুকালব্যাপী গভীর শাস্ত্রালোচনার ফলস্বরূপ দুইখানি অতি প্রয়োজনীয় অশেষ গবেষণাপূর্ণ গ্রন্থ প্রণয়ন করিয়া ইংরাজী ভাষায় প্রকাশ করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে এই দুরূহ ও দুরধিগম্য বিষয়ে অতি অল্প গ্রন্থই পাশ্চাত্য ভাষায় প্রকাশিত হইয়াছে, যাহা দ্বারা ভারতের প্রাচীন রমণীয় সৌধনির্ম্মাতা সলাতদের গঠনের কলাকৌশল বা তাহাদের ব্যবহৃত শব্দবিন্যাসের ভাব ও অর্থ পাশ্চাত্য জগতে নিরাকৃত হইতে পারিত। ভারতীয় প্রাচীন শাস্ত্রজলধি বহুকালব্যাপী অধ্যবসায়ে সুকৌশলে মন্থন করিয়া ডাক্তার প্রসন্নকুমার যে রত্নরাজি উত্তোলন করিয়াছেন এই দুইখানি সুবৃহৎ গ্রন্থ তাহার সম্যক সাক্ষ্য প্রদান করিতেছে।

মানসার সম্বন্ধে বিগত ১৯১৪ খৃষ্টাব্দ হইতে আলোচনার ফল ডাক্তার প্রসন্নকুমার মনীষীমণ্ডলে উপস্থিত করিয়া বিশেষ ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। ১৮৩৪ খৃষ্টাব্দে রামরাজ মানসারের কিয়দংশ মাত্র প্রকাশ করিয়া ইহার প্রথম উল্লেখ করেন। তখন এই গ্রন্থের মাত্র অল্প অংশই পাওয়া গিয়াছিল। সুদীর্ঘ গত ৯৪ বৎসরের মধ্যে আর ইহার কোন আলোচনা দেখা যায় নাই। আমাদের গ্রন্থকার ১১ খানা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ পূর্ব্বক ১৯১৪ খৃষ্টাব্দে ইহার আলোচনা প্রকাশ করিতে আরম্ভ করিয়া এই প্রথম পূর্ণাকারে এই মূল্যবান গ্রন্থ প্রকাশ করিয়া আমাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন।

পণ্ডিতেরা ৫০০ হইতে ৭০০ খৃষ্টাব্দের মধ্যে "মানসার" রচিত হওয়া অনুমান করেন। মানসার বা সংক্ষিপ্ত পরিমাণ প্রণালী—শিল্প শাস্ত্রের অন্তর্গত পরিমিতি বিধান। এই শ্রেণীর অন্যান্য গ্রন্থের ন্যায় ইহাতে স্থপতিবিদ্যা, বাস্তুশাস্ত্র, নগরপ্রতিষ্ঠান-প্রণালী, দুর্গপ্রাসাদ প্রভৃতি নির্ম্মাণের নির্দ্দেশের সঙ্গে সঙ্গে রাজবংশে সমারোহযাত্রা, গৃহসজ্জা, রথ ও যানবাহনাদি প্রস্তুত প্রণালী, রত্নখচিত অলঙ্কার প্রস্তুত করার কৌশল পর্য্যন্ত স্থান পাইয়াছে।

এই পরিমিতির সংক্ষিপ্তসার সম্পাদনের সঙ্গে সঙ্গে অধ্যাপক আচার্য্য মহাশয় স্থপতিশাস্ত্র ও বাস্তুবিদ্যা সম্বন্ধে প্রাচীন ধর্ম্মশাস্ত্রে, মহাকাব্যে, পুরাণে, গণিত-জ্যোতিষে এবং অন্যান্য প্রাচীন হিন্দু শিল্পশাস্ত্রে যে সমস্ত তত্ত্বের অবতারণা রহিয়াছে তাহারও সবিশেষ উল্লেখ করিয়া প্রাচীন হিন্দুশিল্পশাস্ত্রের অধ্যাপনা ও আলোচনার সুযোগ করিয়া দিয়াছেন।

রোমক স্থপতিশাস্ত্রবিৎ ভিট্রুবিয়াস সম্বন্ধে গ্রন্থকর্ত্তা

যে বিস্তীর্ণ সমালোচনা ও মানসারের সঙ্গে ভিট্রুবিয়াসের (Vitruvius) গ্রন্থের সাদৃশ্যের যে সমস্ত অত্যাশ্চর্য্য উদাহরণ দিয়াছেন তাহা বিশেষ প্রশংসার্হ। এই গ্রন্থই পাশ্চাত্য স্থপতিশাস্ত্রের সর্ব্বপ্রথম প্ররোচক। কেহ কেহ খ্রীঃ পূঃ ২৫ শতাব্দীতে ইহার প্রথম উল্লেখ দেখিতে পাইয়াছেন। ১৪৮৬ খ্রীঃ অঃ রোমে ইহার পূর্ণাবয়ব প্রথম সংস্করণ মুদ্রিত হইয়াছিল। ইয়োরোপের প্রায় সমস্ত ভাষায় ইহার ১৭ খানি সংস্করণ ক্রমশঃ প্রকাশিত হইয়াছে।

"বাস্তু ও স্থপতিবিদ্যার শব্দকোষ" অধ্যাপক মহাশয়ের অক্লান্ত পরিশ্রমের আর একখানি উপাদেয় সুবৃহৎ গ্রন্থ। মানসারের সুচিন্তিত পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ সংগ্রহ করিতে গিয়া কৃতী পণ্ডিত এই শব্দকোষ প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। নিজের গ্রন্থ সম্পাদনের সহায়করূপে তিনি যে শব্দকোষ সঙ্কলন করিয়াছিলেন, ভবিষ্যৎ শিল্পশাস্ত্র পাঠার্থীর সাহায্যকল্পে সেই সুবৃহৎ সংগ্রহ অভিধান গ্রন্থরূপে প্রকাশ করিয়া তিনি ইহাদের বিশেষ কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। আমরা এই উভয় গ্রন্থের গবেষণাসম্ভারে বিমুগ্ধ হইয়াছি এবং প্রার্থনা করি অধ্যাপকমহাশয় দীর্ঘজীবী হইয়া প্রাচীন ভারতশাস্ত্রসমুদ্র-মন্থনে নূতন উদ্যমে পুনরায় ব্রতী হইয়া ভারতের লুপ্তগৌরবের পুনঃপ্রতিষ্ঠায় কৃতকার্য্য হউন।

——

গ্রন্থপরিচয়।

(শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর)

এদেশের কথা—১ম হইতে ৭ম সংখ্যা—সম্পাদক শ্রীহীরালাল মুখোপাধ্যায় ও শ্রীনলিনীমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়—প্রাপ্তিস্থান ৫২।৭ বহুবাজার ষ্ট্রীট।

১ম সংখ্যা—বিশুদ্ধ ঘৃতের নামে বিক্রীত মন্দ ঘিয়ের গন্ধে প্রাণ কিরূপ আকুল হয় তাহার একটী ছবি দেওয়া হইয়াছে। "করিতে পারি করি না" প্রবন্ধে উক্ত হইয়াছে যে, কলিকাতায় পথিকদিগের উপর বড় বড় অট্টালিকার অনেক বাসিন্দা পিক প্রভৃতি ফেলিয়া আনন্দ উপভোগ করে। আমরাও তাহা প্রত্যক্ষ করিয়াছি। "নট ও নাট্য" প্রবন্ধে থিয়েটারে যাওয়ার বিরোধীদিগকে রুচিবায়ুগ্রস্ত বলিয়া উপহাস করা হইয়াছে। এরূপ টিটকারির আমরা পক্ষপাতী নই। থিয়েটারে যাওয়ার পক্ষপাতীদিগকে উপহাস করার আমরা পক্ষপাতী নই। যিনি যে বিষয়ে honest মতামত পোষণ করেন, তাহা ব্যক্ত করিবার অধিকারও আমরা মান্য করি। লেখকের মতে আমরাও রুচিবায়ুগ্রস্তের মধ্যে পড়িব, কারণ আমরাও বর্ত্তমান প্রচলিত থিয়েটারে যাওয়ার বিরোধী। আমরা পতিতা স্ত্রীলোকদিগকে ঘৃণা করিতে নিশ্চয়ই বলি না, কিন্তু তাহাদের সঙ্গে ভদ্র স্ত্রী বা পুরুষের অবাধ মেশামেশি যে কুফলপ্রসূ তাহা বলিতে দ্বিধা করিব না। আমরা সম্পাদক মহাশয়ের উপদেশমত "আমাদের কর্ত্তব্য আমরা করিলাম।" বিষয়টী এত বিস্তৃত যে ইহা সংক্ষেপে এই সমালোচনার মধ্যে বলিয়া শেষ করা যায় না। "কি খাই" প্রশ্নের উত্তরে সম্পাদক মহাশয় কি বলেন? আমাদের মনে হয়, সেকালের মত প্রাতে মুড়ি, ছোলাভিজা ও গুড়, মধ্যাহ্নে ভাত-ডাল ও তেতুল বা দৈ এবং রাত্রে আটার রুটি ও ডালনা এবং পোয়াটেক দুধ, এই ভাবে খাওয়া চলিলে নবোত্থিত যুবকদের শরীর গড়িয়া উঠিতে পারে, কিন্তু এরকম খাওয়ার tasto তৈরি করিতে গেলে এবং খেয়ে পরিপাক করতে গেলে ব্রহ্মচর্য্য চাই—কথায় কথায় বায়স্কোপ বা থিয়েটারে গিয়া ব্রহ্মচর্য্যকে গঙ্গার জলে ভাসাইয়া দিলে চলিবে না। "আমাদের উত্তরে" লোককে জ্ঞান দিবার বেশ নূতন পন্থা খোলা হইয়াছে। "কাজ ও খেলা"তে খেলার সঙ্গে কিপ্রকারে ব্যবসায় করা যায়, তার ইঙ্গিত করা হয়েছে—বড়ই ভাল লাগিল। আচার্য্য প্রফুল্ল চন্দ্র রায়ের "চা পান না বিষপান" প্রবন্ধটী leaflet এর আকারে ছাপাইয়া হাজারে হাজারে বিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে বিলি করা উচিত।

২য় সংখ্যা—"ভেজাল" প্রবন্ধে চাউল ঘৃত প্রভৃতিতে কি রকম ভেজাল চলিতেছে, তাহা বলা হইয়াছে। "দোষ কাহার" প্রবন্ধে বলা হইয়াছে দুগ্ধ প্রভৃতির অভাবের জন্য "গলদ হিন্দুর ঘরে"। যতদিন না হিন্দুজাতি ভণ্ডামি ও ন্যাকামি না ছাড়েন, ততদিন এই গলদ রহিত হইবে না। মুখে আমরা বলির গাভী আমাদের মাতা ও সাক্ষাৎ ভগবতী—কিন্তু যখন হিন্দু গোয়ালা সেই গাভীকে আহারে বঞ্চিত করে, যখন গাভীর দুধের শেষ বিন্দু পর্য্যন্ত অর্থের লোভে শোষণ করিয়া শাবককে মৃত্যুমুখে ফেলে ও তাহার চামড়ার ভিতরে খড় পুরিয়া গাভীর সম্মুখে রাখে, তখন এই মিথ্যা ব্যবহারের জন্য ভগবান যে আমাদিগকে কশাঘাত করিবেন তাহাতে কি সন্দেহ আছে? "মধ্যবিত্তের খাদ্যসমস্যা" লিখিলে কি হইবে? সমস্যার কি practical lineএ নিরাকরণের ব্যবস্থা নির্দ্দেশ করিতে পারেন? এবারকার "কাজ ও খেলায়" বাজি তৈরির প্রণালী আছে। "করিতে পারি না—করি না" প্রবন্ধে শিক্ষানবীশ মহাশয় যা পরামর্শ দিয়াছেন, তাহা ধরিলে আমাদের আশঙ্কা হয় দেশের বালকেরা উন্নতির পথে অগ্রসর হইবার পরিবর্ত্তে অবনতির পিচ্ছিল পথে পড়িয়া কঠিন আঘাত পাইবে। তিনি বলেন—"অনেকে প্রশ্ন করিবেন লেখাপড়া না শিখিয়া একটা গুণ্ডা তৈয়ারী হইবে এবং পয়সার জন্য

পিতামাতার উপর উপদ্রব করিবে।" প্রশ্নের উত্তরে স্বাধীনতার দোহাই দিয়া উহা সমর্থন করিয়াছেন। তাঁহার জানা উচিত—স্বাধীনতা মানবাত্মায় ভগবন্নিহিত অমোঘ শক্তি, স্বাধীনতার অপব্যবহারে আগত উচ্ছৃংখলতা মানবপ্রবর্ত্তিত তাণ্ডবলীলা—মানবকে নষ্ট করিবার অব্যর্থ সন্ধান। "টোটকা" আজকাল অনেক কাগজেই বাহির হয়, কিন্তু যাঁহারা টোটকা ঔষধ প্রকাশ করেন, তাঁহাদের উচিত ঔষধের গুণাগুণ ঠিক জানিয়া তাহা প্রকাশ করা। বর্ত্তমান সংখ্যায় অর্শের ঔষধ হিসাবে দেওয়া আছে—"তিল, ভেলা, হরিতকী ও ইক্ষুগুড় সমভাবে লইয়া সেবন করিলে অস্তবলী নিরাময় হয়"। আমরা যতদূর জানি ভেলা অত্যন্ত অনিষ্টকর—তাহা ঐ প্রকারে সেবন করিলে শুনিয়াছি প্রাণত্যাগও হইতে পারে।

ধর্ম্মতত্ত্ব—১ মাঘ ১৩৩৫—'উপাসনার অন্তরায়'এ উক্ত হইয়াছে—সাধক যদি "এক ঈশ্বর ছাড়া আর কোন ব্যক্তি নিকটে আছেন, ইহা মনেও করেন, তাহা হইলেই উপাস্য দেবতা অন্তর্হিত হন। এক ঈশ্বর ভিন্ন অন্য কাহারও তুষ্টিসাধন করিতে গেলেই যথার্থ উপাসনা হয় না।" এই কথা আমরা পূর্ব্বাপর ঘোষণা করিয়া আসিতেছি। "নববিধানের উদারতায়" যাহা বলা হইয়াছে, তাহার প্রত্যেক অক্ষর ব্রাহ্মধর্ম্ম সম্বন্ধেই প্রযুক্ত হইতে পারে—যথা, "এই নববিধানকে টানিতে গেলে জড়রাজ্য, মনোরাজ্য, ধর্ম্মরাজ্য সমস্ত সঙ্গে সঙ্গে আকৃষ্ট হয়। বস্তুবিজ্ঞান, প্রকৃতিবিজ্ঞান, মনোবিজ্ঞান, সমাজবিজ্ঞান, রাজ্যবিজ্ঞান, ধর্ম্মবিজ্ঞান, সকলপ্রকার বিজ্ঞান নববিধানের অন্তর্গত। আমরা তো নববিধানাচার্য্যের এই সকল উক্তিতে ব্রাহ্মধর্ম্মের সহিত নববিধানের তিলমাত্র প্রভেদ খুঁজিয়া পাইলাম না।

ভক্তিপ্রভা—অগ্রহায়ণ ১৩৩৫—ব্রাহ্মণ মহাসম্মেলনের একদেশদর্শিতা প্রবন্ধে বৈষ্ণবদীক্ষা দ্বারা জাতি পরিবর্ত্তন হয় কি না, এই বিষয়ে সংক্ষেপে আলোচনা হইয়াছে। আমাদের মতে বর্ত্তমান যুগে এপ্রকার 'চেঁকির কচকচি'তে বিশেষ লাভ আছে মনে হয় না, অর্থাৎ ইহাতে ধর্ম্মভাব বৃদ্ধির সহায়তা করে বলিয়া মনে করি না। আমরা লেখকের উপসংহারের সহিত একমত—

যথা কাঞ্চনতাং যাতি কাংস্যো রসবিধানতঃ।
তথা দীক্ষাপ্রভাবেন দ্বিজত্বং জায়তে নৃণাং॥

এই সংখ্যার সঙ্গে শ্রাদ্ধতত্ত্ববিচার সংলগ্ন আছে। শ্রাদ্ধের প্রকৃত ভাব এই যে শ্রদ্ধার সহিত পিতৃপুরুষদিগের উদ্দেশে দানাদি যে কর্ম্ম করা হয় তাহাকেই শ্রাদ্ধ বলে। এখানে প্রকৃতপক্ষে সম্প্রদায়িকতার কোন কথাই আসিতে পারে না; তবু আমাদের দেশের দুর্ভাগ্যবশত এমন পবিত্র বিষয়েও সাম্প্রদায়িক বিরোধ-বিবাদ আসিয়া পড়ে। সকল সম্প্রদায়ের মধ্যে যদি সাম্প্রদায়িকতা বিদূরিত করিয়া বিবাহ শ্রাদ্ধাদি সকল অনুষ্ঠানকেই ভগবৎপ্রীতি ও তাঁহার প্রিয়কার্য্যসাধনের কেন্দ্রের উপর দাঁড় করাইয়া সরল ও সহজ করিয়া তোলা হয়, তাহা হইলে দ্বন্দ্ববিবাদ নির্মূল হইয়া দেশে মঙ্গল-বায়ু প্রবাহিত হইবে।

ঘরের কথা—অগ্রহায়ণ ১৩৩৫—মদের নরাঙ্ক, প্রসূতি ও শিশু, ঔষধ, খাদ্য ও পথ্যাদি আমদানী, এবং হরীতকী, এই কয়েকটী বিষয় সবিস্তার বর্ণিত হইয়াছে। ইহা দ্বারা দেশের বিশেষ উপকার হইবে। এই কয়টী বিষয়ের প্রত্যেকটী আমরা প্রত্যেক শিক্ষিত নরনারীকে পড়িতে অনুরোধ করি। যৌনবিজ্ঞানের নামে অমঙ্গলসাধক নানা বিষয় প্রকাশ করিবার পরিবর্ত্তে দেশের মঙ্গলসাধক এইরূপ সার সত্যসকল প্রকাশ করিলে এবং সেগুলি দেশের লোক অন্তরে গ্রহণ করিলে স্বরাজলাভের বিলম্ব হইবে না।

Buddhism and Universal Religion by Dhrmaditya Dharmachaya F, B. M.

এটী একটী পুস্তিকা—ইহাতে বৌদ্ধধর্ম্মকে সার্ব্বভৌমিক অর্থাৎ সর্ব্বজনের অবিসম্বাদীরূপে গৃহীত ধর্ম্ম প্রতিপন্ন করিবার চেষ্টা হইয়াছে। চেষ্টা সর্ব্বতোভাবে সফল হইয়াছে বলিতে পারি না। বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতি আমাদের অন্তরের গভীর শ্রদ্ধা আছে। এই কারণে এই পুস্তিকায় সংক্ষেপে বৌদ্ধধর্ম্মের উৎপত্তি ও সারমর্ম্ম দেখিয়া বড়ই আনন্দিত হইয়াছি। কিন্তু ইহাতেও বিলাতী কথার প্রতিই বেশী দৃষ্টি রাখা হইয়াছে। বৈদিক ধর্ম্ম যে চতুর্ব্বর্ণের মধ্যে বিকীর্ণ হইত না, ইহা আমরা সমর্থন করিতে পারি না। পুরাতন বাণীকে নূতন আকারে উপনীত করাই নবোত্থিত ধর্ম্মের মুখ্য লক্ষ্য হয়। বৈদিক ধর্ম্মের প্রথাকে বৌদ্ধধর্ম্ম বিস্তৃত আকার দিয়াছিলেন বলিতে পারি। জাতিভেদ সম্বন্ধেও বৈদিক ধর্ম্ম নির্দিষ্ট করিলেন যে জন্ম দ্বারা নয়, কিন্তু কর্ম্ম দ্বারা মানুষ দ্বিজত্ব প্রাপ্ত হয়; বৌদ্ধধর্ম্ম সেইটীকে দৃঢ়তর করিলেন। বৌদ্ধধর্ম্মে উদারতা বহুল পরিমাণে স্থান পাইয়াছিল সন্দেহ নাই এবং সেই কারণেই উহার এত বহুলপ্রচার হইয়াছিল। ক্ষুদ্র পুস্তিকাতে লেখক বৌদ্ধধর্ম্ম সম্যক্ ফুটাইতে পারেন নাই, আমরাও সমালোচনার ক্ষুদ্র গণ্ডীতে তাহা ফুটাইতে পারিব না, সুতরাং তাহাতে ক্ষান্ত হইলাম।

Nepalese Language and Literature—by Dharmaditya Dharmacharya—লেখক বৌদ্ধ রিসার্চ স্কলার। বলা বাহুল্য যে এই পুস্তিকাটীতে

তাহাতে জ্ঞানের সম্যক বিকাশ দেখিতে পাওয়া যায়। নেপালী ভাষা বিষয়ে বলিতে গিয়া নেপালের ইতিহাস বিষয়ক অনেক কথাও বলা হইয়াছে। ইহাতে আমরা অনেক নূতন কথা জানিতে পারিয়াছি। এই পুস্তিকোক্ত বিষয়সকলের সহিত পুরাণোক্ত বিষয়গুলি আলোচনা করিয়া দেখিলে অনেক নূতন ঐতিহাসিক তথ্য আবিষ্কৃত হইতে পারে বলিয়া আমাদের বিশ্বাস। নেপালী ভাষা ও পার্ব্বতীয় ভাষা এক নহে, এই কথা লেখক খুব জোরের সহিত বলিয়া দুঃখ করিয়াছেন যে কলিকাতা ও পাটনা বিশ্ববিদ্যালয় প্রকারান্তরে এই দুইটী ভাষাকে এক ধরিয়াছেন। আমাদেরও মনে হয় মূল নেপালী ভাষাকে এবং উহার অন্যতর অপভ্রংশ পার্ব্বতীয় ভাষাকে এক ধরিয়া পরীক্ষার জন্য নির্দ্দিষ্ট করা উচিত নয়। ডবল ক্রাউন ৮পেজী আকারের ৩০ পৃষ্ঠার পুস্তিকা হইলেও ইহাকে বহুমূল্য গ্রন্থের সহিত সমান আসন দেওয়া যাইতে পারে। সর্ব্বশেষে নেপালী ভাষায় লিখিত একটী গ্রন্থতালিকা দিয়া লেখক এবিষয়ের অনুসন্ধিৎসুদিগের বড়ই উপকার সাধন করিয়াছেন।

Pali Tipitaka—by Dharma Aditya Dharmachaya F. B. M.

বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে যাঁহারা কিছুমাত্র জানেন তাঁহারাই জানেন যে ত্রিপিটক কি? মোটের উপর বলা যায় যে সমগ্র বৌদ্ধধর্ম্মই ইহাতে সন্নিবদ্ধ আছে। ধর্ম্মাচার্য্য মহাশয় এই সংক্ষিপ্ত পুস্তিকাতে ইহার বিবরণ দিয়া বৌদ্ধধর্ম্মের অনুসন্ধিৎসুদিগের বড়ই উপকার সাধন করিয়াছেন। তাঁহার মত লোকের লেখনী হইতে উহা বাহির হইবার ফলে আমরা প্রয়োজন পড়িলে নির্ভয়ে ইহাকে reference স্বরূপে ব্যবহার করিতে পারিব। এই সকল প্রকাশ করা হইতে বুঝা যায় যে সমস্ত জগতে সকল ধর্ম্মের মিলনের একটা সুবাতাস বহিতে সুরু করিয়াছে। বুঝিয়া হৃদয় আনন্দে ভরিয়া উঠে।

Santarakshita as a Philosopher by Dr. Benoytosh Bhattacharya M.A. Ph D. (Dacca)

ইহাতে শান্তরক্ষিত রচিত তত্ত্বসংগ্রহের বিবরণ এবং প্রসঙ্গতঃ বৌদ্ধমতের বিবরণ সংক্ষেপে সুলিখিত হইয়াছে। ডাঃ ভট্টাচার্য্য গুইকুমার প্রাচ্য গ্রন্থাবলীর সাধারণ সম্পাদক। তিনি যখন বাঙ্গালী, তখন আমরা তাঁহার নিকট বাংলা ভাষায় অনেক প্রবন্ধ ও গ্রন্থ লিখিত দেখিতে ইচ্ছা করি। সকলেই যদি ইংরাজীতে লেখেন, তবে আমাদের দুঃখিনী বঙ্গভাষা শ্রীসম্পদে সমৃদ্ধ হইবেন কিরূপে?

কাজের কথা—১৫ ফাল্গুন,১৩৩৫—"বাল্যবিবাহ" প্রবন্ধে উহার সমর্থক যুক্তি যাহা বলিয়াছেন, তাহা convincing হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। তিনি বাল্যবিবাহ করিয়া বালকদিগকে উপযুক্ত বয়স পর্য্যন্ত সংযম অভ্যাস করিতে ও দৈর্য্য ধারণে উপদেশ দিয়াছেন! যে যুগে বালকদিগের অভিভাবকেরা যৌনাবস্থানের নামে চারিদিকে বিষের ঝরি ঢালিয়া শিবকল্প বালক ও পার্ব্বতীকল্প বালিকাদিগকে নরনারীর আদিমতম পূর্ব্বপুরুষে পরিণত করিবার দিকে ঝুঁকিয়াছেন, সে যুগে সংযত হইতে উপদেশ দেওয়া বা বালকবালিকাদিগকে সংযত হইবার আশা করা বৃথা—নিঃসন্দেহই বৃথা! তদপেক্ষা বাল্যবিবাহ উঠাইয়া দিয়া শাস্ত্রানুযায়ী যৌবনবিবাহ প্রচলিত হইতে দেওয়াই সঙ্গত মনে করি। "আলুমিনিয়ম বাসন" প্রবন্ধে কতকগুলি জ্ঞাতব্য কথার এক কিস্তি দেওয়া হইছে। "সন্ধ্যালোকে" লেখক পাঁচুর মুখে বলাইছেন যে, পাঁচু "জর্মানিদের ব্যাপার পাড়ছে ও প্র্যাকটিশ করেছে"। ইহার পরেও সম্পাদক মহাশয় বাল্যবিবাহ চালাইতে চান? সম্পাদক মহাশয়ের নিকট করযোড়ে নিবেদন, এপ্রকার দুর্নীতিমূলক গল্প প্রকাশ করিয়া সন্তানগণের চরিত্র কলুষিত হইবার সুযোগ যেন না দেন। "আর্য্যশাস্ত্রে উদ্ভিজ্জ" প্রবন্ধে বৃক্ষসমূহের দোহনক্রিয়া, এক বৃক্ষকে বৃক্ষান্তরে পরিণত করিবার অনেকগুলি নূতন কথা অগ্নিপুরাণে সন্নিবদ্ধ হইয়াছে বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষিবিৎগণ এবিষয়ে পরীক্ষা করিলে মন্দ হয় না। "কামাখ্যাভ্রমণে" অম্বুবাচীর সময়ের একটী ঘৃণিত প্রথা লিপিবদ্ধ হইয়াছে। হৃদয় দুঃখে ক্ষোভে ঘৃণায় অভিভূত হইয়া উঠে, যখন দেখি যে, যে কামাখ্যা দেবীকে হিন্দুগণ মাতৃসম্বোধন করিতেছেন, সেই কামাখ্যা দেবীর অশুদ্ধ বস্ত্রখণ্ড পবিত্র বলিয়া সংগ্রহ করিতে তাঁহারা দ্বিধা ও লজ্জাবোধ করেন না! উপধর্ম্মের এইরূপই পরিণাম। এইরূপ কুপ্রথাসকল উঠাইয়া দিবার জন্য হিন্দুসভাসমূহের উঠিয়া পড়িয়া লাগা উচিত। "গোসামীর রস"এর মত উপন্যাস লিখিবার রহস্য খুঁজিয়া পাইলাম না। "ছোটখাটো মেয়েলি ব্যবসা" অনেক গৃহস্থের পয়সা বাঁচাইবার সহায়তা করিবে।

স্বর্গীয় ডাক্তার বলাই চন্দ্র সেনের সংক্ষিপ্ত জীবনী—শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র সেন বিরচিত—নির্ম্মলবাবু বলাই বাবুর পৌত্র। কাজেই জীবনীটা বেশ মিষ্ট হইয়াছে। আমরা এইরূপ আত্মীয়-স্বজনের লিখিত জীবনীর পক্ষপাতী, কারণ ইহাতে আলেখ্য জীবনের ভালগুলিই বেশী পরিস্ফুট হয়। বলাই বাবু মথুর সেনের বংশোদ্ভূত। আমরাও বাল্যকালে মথুর সেনের নাম শুনিয়াছি। বলাই বাবু একজন বড় ডাক্তার ছিলেন, তাহা তাঁহার জীবনী এবং জীবনী সম্বন্ধীয় মন্তব্য হইতে সুস্পষ্ট প্রমাণিত হয়। পাশকরা ধাত্রী প্রবর্ত্তনের প্রথম উদ্যোক্তা

ছিলেন বলাই বাবু। সমাজ সংস্কারের তিনি বিশেষ পক্ষপাতী ছিলেন। একটী কথার অভাব জীবনীতে দেখিলাম। আমরা তাঁহার পুত্র ক্ষীরোদবাবুর কাছে শুনিয়াছি যে তিনি মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথের নিকট ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষিত হইয়াছিলেন। ব্রাহ্মধর্ম্মের প্রভাবে জীবন যে কিরূপ অগ্রগতি লাভ করিতে পারে, বলাইবাবু তাহার এক উজ্জ্বল দৃষ্টান্ত।

The Nubile Age of Females in India by Bolye Chander Sen L. M. S.

ইহাতে স্ত্রীলোকের ন্যূনকল্পে বিবাহের বয়স কি নির্দ্দিষ্ট হওয়া উচিত তাহা আলোচিত হইয়াছে। এই পুস্তিকা হইতে একটী বুঝিলাম যে, বিলাতে বা এখানে মোটামুটি প্রায় একই বয়সে বালিকাদের যৌবনলাভ হয়। গ্রন্থকার সুন্দর প্রমাণিত করিয়াছেন যে, পরিপার্শ্ব যে পরিমাণে কামভাবের পরিপোষক হয়, তদনুপাতেই যৌবনবিকাশ শীঘ্র দেখা দেয়। পশুজীবন আলোচনা করিলেও ইহা উপলব্ধ হইবে। গ্রন্থকারের মতে মনে হয় ১৪ বৎসরই বিবাহের ন্যূনকল্প বয়স। আমরা তাঁহার পৌত্র শ্রীমান নির্ম্মলচন্দ্রকে ইহার বঙ্গানুবাদ করিয়া বিস্তৃতভাবে প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

সম্মিলনী—১৭ ফাল্গুন ১৩৩৫—সংস্কৃত সাহিত্য পরিষদে প্রকাশিত "পাদুকাতন্ত্রের" বঙ্গানুবাদ প্রকাশিত হইয়াছে। খুব ভাল কাজ হইয়াছে। এইরূপ কার্য্য ইতিহাস রচনায় বড়ই সহায়তা করে। "শিক্ষা ও জীবন" প্রবন্ধে অনেকগুলি home-hit সত্য বলা হইয়াছে, কিন্তু কয়জন পাঠক ঐ সকল সত্য অন্তরে লইবেন? "গোল-আলুর মূল্য" গোল আলুর উপকারিতা বিষয়ে অনেক তথ্য পাওয়া যাইবে।

ব্রহ্মবাদী— ফাল্গুন ১৩৩৫—"নিবেদন"টী মিষ্ট লাগিল।

Navavidhan—Jany 3 & 10 1929—ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্রের উপর জার্ম্মাণির ভূতপূর্ব্ব কনসাল-জেনেরল গত ৮ই জানুয়ারি এলবার্ট হলে যে ক্ষুদ্র বক্তৃতা দিয়াছিলেন, তাহা উদ্ধৃত হইয়াছে। তাহার মূল বিষয়—সকল ধর্ম্মে সত্য আছে অথবা সকল ধর্ম্ম সত্য? বক্তা নানাপ্রকারে ঘুরাইয়া ফিরাইয়া যাহা বলিয়াছেন তাহাতে স্পষ্ট মনে হয় যে মুখে তিনি সকল ধর্ম্ম সত্য এই ভাবের প্রশংসা করিলেও তাঁহার অন্তরের কথা এই যে, সকল ধর্ম্মে সত্য আছে। ২০০০ বৎসর পূর্ব্বের খৃষ্টধর্ম্ম এবং প্রাচীন হিন্দুধর্ম্মকে নবভাবে গ্রহণ করিতে হইবে বলাতেই সকল ধর্ম্ম সত্য অর্থাৎ সর্ব্বাংশে অক্ষরশ সত্য ইহা খণ্ডিত হইতেছে। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন লিখিত Keshub's place in the Bengali Letarature" একটী সুপাঠ্য প্রবন্ধ।

ধর্ম্মতত্ত্ব—১৬ মাঘ ও ১ ফাল্গুন ১৩৩৫—"গতি পূর্ণতার দিকে" সুপাঠ্য প্রবন্ধ। শ্রীযুক্ত কুমুদবন্ধু সেন "মহাপুরুষ কেশবচন্দ্র" প্রবন্ধে (বসুধারা হইতে উদ্ধৃত) ব্রহ্মানন্দ বিষয়ে অনেক সত্যতত্ত্ব সুন্দরভাবে বিবৃত করিয়াছেন। "বিধান ভাগবত" উপদেশটী মধুর।

সাধনা—ফাল্গুন ১৩৩৫—"বেদান্তে শঙ্কর ও দ্বৈতবাদ" প্রবন্ধে শঙ্করমতের বিরুদ্ধে ও দ্বৈতবাদের পক্ষে কয়েকটী সুযুক্তি দিয়াছেন—(১) ব্রহ্মে ভ্রমবশতঃ জগৎ প্রতীত হইতেছে, এ ভ্রম কার? ব্রহ্মের যদি ভুলই হয়, তবে তাঁর সঙ্গে মিলিবার সার্থকতা কোথায়? (২) ভ্রম উপলব্ধির জন্য তৃতীয় পুরুষ আবশ্যক—ব্রহ্মে জগৎ-প্রতীতি উপলব্ধির জন্য তৃতীয় পুরুষ কে? (৩) দুইটা বস্তু প্রসিদ্ধ না হইলে ভ্রম সম্ভব হয় না, সেই দুইটী কোন্ বস্তু সর্ব্বপ্রথমে উদ্ভূত হইয়াছিল? আমাদের সহজ বুদ্ধিতে এই সকল যুক্তির গুরুত্ব বিশেষ উপলব্ধ হয়। "শ্রীনাথানন্দে" লেখক বলেন যে "ব্রহ্মানন্দ হইতে শ্রীনাথের আনন্দ সুপ্রচুর"—ইহার ভাবার্থ উপলব্ধ হইল না। "বৈষ্ণবসমাজে বর্ত্তমান অবস্থা" প্রবন্ধে বৈষ্ণবসমাজে ব্যভিচারদোষ প্রবেশ করিয়া কিরূপ সমাজকে অন্তঃসারশূন্য করিতেছে, লেখক তাহা নির্ভীকভাবে প্রকাশ করিতেছেন এবং তাহার প্রতিকারকল্পে যত্নবান হইতেছেন দেখিয়া আমরা সুখী হইলাম। আমরা মনে করি যে, উপধর্ম্মের অনুষঙ্গী গুরুবাদ প্রভৃতি দাসমনোভাবের প্ররোচক মতবাদের হাত অতিক্রম করিতে না পারিলে এই সকল কাটাইয়া উঠা বড়ই কঠিন। একমাত্র ভগবানকে অন্তরের গুরু বলিয়া ধরিলেই এই সকল সমস্যার সহজেই সমাধান হয়।

Industry—February 1929—সম্পাদক আশ্বাস দিয়াছেন যে আগামী এপ্রিলের সংখ্যায় দেশীয়গণ কিভাবে কার্য্য করিয়া বিদেশীয় দ্রব্য বর্জ্জনে সক্ষম হইবেন, তদ্বিষয়ে সবিস্তার লিখিবেন। আমরা প্রতীক্ষা করিয়া রহিলাম।

গার্হস্থ্যসংবাদ।

আদ্যশ্রাদ্ধ—গত ৭ই চৈত্র বৃহস্পতিবার পূর্ব্বাহ্ণ ৮॥ ঘটিকার সময় ৺বলেন্দ্রনাথের বিধবা পত্নী ৺সাহানা দেবীর আদ্যশ্রাদ্ধ তদীয় পুত্রবৎ শ্রীমান অজিনেন্দ্রনাথ ঠাকুর জোড়াসাঁকোর মহর্ষি দেবেন্দ্রভবনে সুসম্পন্ন করিয়াছেন। সর্ব্বাগ্রে পণ্ডিত শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ মহাশয়ের পৌরোহিত্যে ভোজ্যাদি উৎসর্গীকৃত হইলে শ্রদ্ধাস্পদ আচার্য্য শ্রীযুক্ত সুধীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয় বেদীগ্রহণপূর্ব্বক যথারীতি শ্রাদ্ধকার্য্য সম্পন্ন করাইলেন।

তত্ত্ববোধিনী—বিজ্ঞাপনী।

আর্য্যরমণীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা—(দ্বিতীয় সংস্করণ)। শ্রীক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য ১৷৹ আনা। প্রাপ্তিস্থান ৫৫নং অপার চিৎপুর রোড, জোড়াসাঁকো, কলিকাতা। এই বিখ্যাত গ্রন্থ ২৮ বৎসর পূর্ব্বে প্রথম প্রকাশিত হয়। তখন আমরা কিশোর বয়স্ক, খুব আগ্রহের সঙ্গে এই গ্রন্থ পড়িয়াছিলাম। ২৮ বৎসর পরেও দেখিতেছি এই উৎকৃষ্ট গ্রন্থের প্রয়োজনীয়তা কিছুমাত্র কমে নাই। বাঙ্গলা সাহিত্যে ইহা স্থায়ী আসন লাভ করিয়া থাকিবে। যখন ভাবি এরূপ গ্রন্থেরও দ্বিতীয় সংস্করণ হইতে ২৮ বৎসর লাগে, তখন বাঙ্গলার পাঠক পাঠিকাদের প্রতি মনে বিশেষ শ্রদ্ধার উদ্রেক হয় না। বাঙ্গলাদেশে পাশ্চাত্য শিক্ষা ও সভ্যতার সঙ্ঘর্ষে যে সব আন্দোলনের সৃষ্টি হইয়াছিল, স্ত্রীশিক্ষা ও স্বাধীনতার আন্দোলন তাহার মধ্যে প্রধান একটি। সকলেই জানেন অতিরিক্ত উৎসাহের ঝোঁকে ও পরানুকরণ-প্রিয়তাবশতঃ একদল পাশ্চাত্য শিক্ষিত লোক এ বিষয়ে মাত্রা ছাড়াইয়া গিয়াছিলেন। পক্ষান্তরে নারীকে "অবরোধ কারাবদ্ধ" দাসীরূপে রাখাই যে সনাতন হিন্দু আদর্শের প্রধান গৌরব—একদল লোক তাল ঠুকিয়া এই কথা প্রচার করিতেছিলেন। ক্ষিতীন্দ্রবাবু এই গ্রন্থে দেখাইলেন, নারীর শিক্ষা ও স্বাধীনতা সম্পর্কে প্রাচীন আর্য্য ভারতের যথার্থ আদর্শ কি এবং সেই আদর্শই তিনি স্বদেশবাসীকে অনুসরণ করিতে পরামর্শ দিলেন। আজ ২৮ বৎসর পরে দেশের হাওয়া পরিবর্ত্তন হইয়াছে, পরানুকরণস্পৃহা কমিয়াছে, নারীর প্রতি সম্মানবোধ জাগিয়াছে,—আর্য্য সভ্যতার আদর্শও আমরা পুনরায় শ্রদ্ধা করিতে শিখিয়াছি। কিন্তু একদল "ইঙ্গ-বঙ্গ" জাতীয় জীব এখনও উচ্ছৃঙ্খলভাবে সর্ব্বনাশের পথে ধাবমান। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর গ্রন্থ পড়িলে সকলেই পরম উপকৃত হইবেন, চিন্তা করিবার জিনিষ পাইবেন। বিশেষভাবে শিক্ষিত নব্য বাঙ্গালী যুবকদিগকে এই গ্রন্থ আমরা পাঠ করিয়া দেখিতে বলি। ক্ষিতীন্দ্রবাবুর গভীর পাণ্ডিত্য ও চিন্তাশীলতা এই গ্রন্থের পত্রে পত্রে বিদ্যমান;—তাঁহার ভাষাও ওজস্বিনী, প্রাণস্পর্শী। বলা বাহুল্য এরূপ গ্রন্থের আমরা বহুল প্রচার কামনা করি।

আনন্দবাজার পত্রিকা—৫ই চৈত্র, ১৩৩৫।

—

বর্ষশেষে ব্রহ্মোপাসনা।

আগামী ৩০শে চৈত্র শনিবার বর্ষশেষ প্রত্যেক জীবনের একটী বৎসর নিঃশেষিত হইবে। জন্মমৃত্যুর মধ্য দিয়া যিনি আমাদিগকে অনন্তের পথে অগ্রসর করিতেছেন, এই বর্ষশেষ দিনে সন্ধ্যা ৭ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজ-গৃহে তাঁহার বিশেষ উপাসনা হইবে। তদুপলক্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ ঠাকুর উপদেশ দিবেন।

—

নববর্ষে ব্রহ্মোপাসনা।

পরদিন ১লা বৈশাখ রবিবার নববর্ষ। এ দিনে সকলকেই অনন্ত জীবনের আর একটী নূতন সোপানে উঠিতে হইবে। এই দিনে মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথপ্রতিষ্ঠিত মাসিক ব্রহ্মোপাসনার দিন পড়িয়াছে। তদুপলক্ষে প্রাতে ৮৷৷ ঘটিকায় আদিব্রাহ্মসমাজগৃহে বিশেষ ব্রহ্মোপাসনা হইবে। তদুপলক্ষে আচার্য্য শ্রীযুক্ত ক্ষিতীন্দ্রনাথ "ব্রাহ্মধর্ম্মের মর্ম্মকথা" বিষয়ে উপদেশ দিবেন। উপাসনান্তে অধ্যাপক শ্রীযুক্ত মন্মথমোহন বসু এম-এ এবং সস্ত্রীক শ্রীযুক্ত যোগানন্দ সিংহ ব্রাহ্মধর্ম্মে দীক্ষাগ্রহণ করিবেন। সর্ব্বসাধারণের যথাসময়ে উপস্থিত হইয়া ব্রহ্মোপাসনায় যোগদান প্রার্থনীয়।

শ্রীসুরেশচন্দ্র সাংখ্য-বেদান্ততীর্থ
কর্ম্মাধ্যক্ষ।

—